সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

প্রথম ভাগ।

ইহাতে সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবর) আর স্বল্প-বিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর), এই দু রকম জ্বর ও তার নানা রকম উপসর্গের চিকিৎসা, আর অনেক শক্ত শক্ত রোগীর চিকিৎসার কথা খুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে।

কথায় কথায় দৃষ্টান্ত আর প্রেস্ক্রিপ্‌শন্ দেওয়া হইয়াছে।

নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাজে প্রাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিনের চেয়ে কম হইবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

দশম সংস্করণ।

কলিকাতা, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।
১৩১৩। বৈশাখ।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ।১০।

কলিকাতা
৭৬ নং বলরাম দে ষ্ট্রীট্‌,
মেট্‌কাফ্‌ প্রেসে মুদ্রিত।

বিজ্ঞাপন।

অনেক দিন থেকে জ্বর-চিকিৎসার একখানি বৈ লিখিবার ইচ্ছা ছিল। অবকাশ না থাকায়, এত দিন লিখিতে পারি নাই। বাঙ্গালায় এমন সকল ভাল ভাল, ডাক্তারি বৈ —প্রাক্‌টিস্ অব মেডিসিন প্রভৃতি—থাকিতে আবার জ্বর-চিকিৎসার এক খানা বৈ আলাদা করিয়া লিখিবার দরকার কি? এ রকম ইচ্ছাই বা কেন হইল? দরকার কি তাও বলি। এ রকম ইচ্ছা কেন হইল, তাও বলি। আমাদের দেশে আজ কাল ম্যালেরিয়া-জ্বরের যে রকম বাড়াবাড়ি, তাতে গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তর থাকিলে ভাল হয়। বাড়ীতে বাড়ীতে থাকিলে আরো ভাল হয়। কাজে, তাই-ই ঘটিয়া উঠিয়াছে। আমাদের যেটী প্রার্থনা, সেইটীই ঘটিয়াছে। কেমন করিয়া, তা বলি। চাকুরি মেলে না। বি এ, এম্ এ সব গড়াগড়ি যাইতেছেন। টাকা নৈইলে চাষ বাস হয় না; কোনও ব্যবসা হয় না। ঘরে বসিয়া থাকিলে খাওয়া পরা চলে না। বাপ মায়ে তেমন খরচ করিয়া পড়াইতে পারেন নাই। সংসার চালাইবার কোনও উপায় দেখি না। আজ কাল দেখিতেছি কেবল ডাক্তরদেরই উপায় বেশী। কিন্তু ডাক্তর হওয়া সোজা নয়। বাঙ্গালা ক্লাশে পড়িতে গেলেও বাঙ্গালা ছাত্রবৃত্তি পাস চাই। তা পাস থাকিলেই বা সেখানকার তিন বছরের খরচ দেয় কে? আজ খাই ঘরে এমন নাই। দিন কতক কাম্পাউণ্ডারি করিয়া,

গোটা পাঁচ ছয় অসুদের নাম শিখিয়া, অমুক আজ্ কাল বেশ দশ টাকা উপায় করিতেছে; বেশ গুছিয়ে উঠেছে! আজ খায় ঘরে এমন ছিল না। টাকাও উপায় করিতেছে। দশ জন লোকও বাধ্য হইয়াছে। এর বাড়া সুখ আর কি আছে? আমাকেও কোন ডাক্তরের কাছে দিন কতক থাকিয়া, কম্পাউণ্ডারি শিখিতে হইল। তা নৈলে আর চলিল না। গোটা কতক অসুদের নাম শিখিয়া সহজ সহজ গোটা কতক রোগের মোটামুটি চিকিৎসা শিখিয়া আসিতে পারিলে, এক রকম করিয়া খাইতে পারিব। শক্ত রোগী হাতে লইব না; তার কাছেও যাইব না। কেবল সোজাসুজি জ্বর জাড়িরই চিকিৎসা করিব। তার পর ভাল শিখিতে পারি, তখন দুই একটা শক্ত রোগের চিকিৎসা করিবার চেষ্টা করিব। এই রকম ভাবিয়া, আর ঠিক এই রকম করিয়া আজ কাল আমাদের দেশে এত লোক ডাক্তর হইয়াছেন, আর ডাক্তরি করিতেছেন যে, প্রায় গাঁয়ে গাঁয়ে এক জন করিয়া ডাক্তর আছেন। অনেকে মনে করিতে পারেন, দেশে এত হাতুড়ে হইলে, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হবে। কিন্তু আমি তা বলি না। এই সব হাতুড়ে ডাক্তর, নিত্য নিত্য দেশের যে হিত করিতেছেন, বড় বড় ডাক্তর, বৈদ্যদের দিয়া তা কখনই সম্ভব হইতে পারে না। বড় বড় ডাক্তরদের, বড় বড় বৈদ্যদের মাসে মাসে অনেক টাকার দরকার। শহরে না থাকিলে, তাঁদের কোন মতেই চলে না। যে গাঁয়ের লোকে দু বেলা পেট ভরিয়া ভাত খাইতে পায়

না, এই সব হাতুড়ে ডাক্তর সে সব গাঁয়ের লোকের ত্রাণ-কর্ত্তা। এঁদের ভিন্ন তাদের জীবন রক্ষার আর উপায় নাই। এঁদের হাতুড়ে বলিতে আমার যথার্থই কষ্ট হয়। সমাজের যাঁরা এত হিত করেন, তাঁদের এ রকম তুচ্ছ তাচ্ছিল্য না করিয়া, বিশেষ আদর করাই উচিত। যদি বল, পেটের ভাতের জন্যে সব গাঁয়ে গাঁয়ে হাতুড়ে ডাক্তর হইয়া বসিয়াছেন। তাঁরা আবার সমাজের কেমন করিয়া হিতকারী হইলেন? তা নয়? সৎপথে থাকিয়া টাকা উপায় করিবার জন্যে, যিনি যা করেন, তাতেই তাঁর সমাজের হিত করা হয়। সমাজের হিত করিব বলিয়া, তিনি কিছু সে কাজ করেন না। টাকা উপায় করিবার জন্যেই তিনি সে কাজ করেন। টাকা নৈলে, পেটের ভাত, পরণের কাপড় হয় না। আবার, না খাটিলে টাকা উপায় হয় না। কাজেই, সকলকেই খাটিতে হয়। কারই বসিয়া থাকিবার যো নাই। এ দিকে সংসারের এম্‌নি বন্দোবস্ত যে, খাটিলেই সমাজের হিত করা হয়। তা তুমি চাস-বাসই কর, ব্যবসাই কর, আর চাকরিই কর। সব তাতেই সমাজের হিত হয়। মান, সম্ভ্রম, নাম, যশ, সুখ্যাতির জন্যে যা করিবে, তাতেও সমাজের হিত। যা করিবে, তাতেই সমাজের হিত। সমাজের হিত ছাড়া কথা নাই। কেবল যারা অন্যের গলগ্রহ হইয়া, নিতান্ত বসিয়া দিন কাটায়, তাদেরই দিয়া সমাজের কোনও হিত হয় না। তারাই সমাজের ওঁছা। সামান্য মজুরি করিলেও যদি সমাজের হিত করা হয়, তবে লোকের জীবন রক্ষা করিলে, সমাজের

হিত করা হইল না ? এঁরা এই রকম করিয়া, গাঁয়ে গাঁয়ে ডাক্তরি করিতেছেন বলিয়া, দিন দিন যে কত শত গরিব, দুঃখী, কাঙালের জীবন রক্ষা হইতেছে, তা বলিতে পারা যায় না। যখন ডাক্তরি এত চলিত ছিল না, তখন গাঁয়ে গাঁয়ে হাতুড়ে—হাতুড়ে বলিতে কষ্ট হয়—বৈদ্যেরা এই রকম গরিব, দুঃখী, কাঙালের জীবন রক্ষা করিয়া বেড়াইতেন। আমাদের দেশের পোনর আনা লোক গরিব। পরিবারের দস্তুর মত ভাত কাপড় দিয়া, বিনা কষ্টে চিকিৎসার খরচ—এখনকার ডাক্তরি চিকিৎসার খরচ—চালাইতে পারেন, এমন লোক আমাদের দেশে হাজারের মধ্যে ৫০। ৬০ জনও আছেন কি না, সন্দেহ। গরিব, লোকের গরিব ডাক্তর বৈ আর উপায় নাই। বড় বড় ডাক্তর কি বৈদ্যদের কাছেও তারা ঘেঁষিতে পারে না। তাঁদের নাম করিতেও তারা ভয় পায়। কাজেই, এই সব ডাক্তরেরই হাতে আমাদের দেশের পোনর আনা লোকের জীবন। এঁরা দিন কতক কম্পাউণ্ডারি করিয়া যা কিছু শিখিয়াছিলেন, আর দেখে, শুনে, ঠেকে যা কিছু শিখিয়াছেন, তাতে তাঁরা ভরসা করিয়া কোন শক্ত রোগী হাতে লইতে পারেন না। কাজেই গরিব, দুঃখী কাঙালের একটু শক্ত রকম জ্বর জাড়ি হইলে, বিনা চিকিৎসায় তারা মারা যায়। এখন, এই ডাক্তরদের ভাল করিয়া শিখাইতে পারিলে, গরীব, দুঃখী, কাঙাল সব বাঁচিয়া যায়; বিনা চিকিৎসায় আর মারা যায় না। এখন দেখা যাক, এঁদের ভাল করিয়া শিখাইবার কোনও উপায় আছে কি না।

বাঙ্গালায় যে সব ডাক্তুরি বৈ—প্রাকটিস্ অব মেডিসিন্ প্রভৃতি—আছে, তাঁরা তা বেশ বুঝিতে পারেন না। কাজেই, তার মত কাজও করিতে পারেন না। এই জন্যে, সে সব বৈ তাঁদের তেমন কাজে আসে না। যে বৈ পড়িয়া সহজে বুঝা যায় না, সে বৈ পড়িয়া কেমন করিয়া চিকিৎসা করিবেন? কষ্ট করিয়া যে বই পড়িতে হয়, বা বুঝিতে হয়, তাঁদের পক্ষে সে বই নয়। পড়িলেই বুঝা যায়, আর তার মত কাজ করিতেও পারা যায়, এই রকম বৈ-ই তাঁদের উপযুক্ত। যে বৈ পড়িয়া এঁদের ভাল ড্যাক্তর করিতে চাও, সে বৈ উপন্যাসের বৈয়ের মত হইলে ভাল হয়। উপন্যাসের বৈ পড়িতে কেউ কষ্ট বোধ করেন না; সকলে ইচ্ছা করিয়া পড়েন। তাতে যে সব উপদেশ থাকে, তাও কষ্ট করিয়া শিখিতে হয় না পড়িবার সঙ্গে সঙ্গেই শিক্ষা হইয়া যায়। উদাহরণ পাইলে যেমন বুঝা যায়, যেমন মনে থাকে, এমন আর কিছুতেই নয়। কথা-বার্ত্তা কৈতে কৈতে, গল্প করিতে করিতে পথ চলিলে, পথ হাঁটার কষ্ট জানিতে পারা যায় না, অথচ পথ হাঁটা হয়। এঁদের বৈও সেই রকম হওয়া চাই। ছেলেদের যেমন করিয়া শিখাইতে হয়, এঁদেরও তেমনি করিয়া শিখাইতে হয়। তারা যা কখনও দেখে নাই, শুনে নাই, তাদের তাই দেখাইতে হয়, শুনাইতে হয়। কাজেই কথায় কথায় দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতে হয়, আঁকিয়া দেখাইতে হয়। এ রকম না করিলে, তারা কখনই বুঝিতে পারে না। যে কখনও মন্দির দেখে নাই, শিবও দেখে নাই. রোজ

আমি শিবের মন্দিরে গিয়া পূজা করিয়া আসি, বলিলে, সে কিছুই বুঝিতে পারে না। মন্দির কি রকম, বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিলে, আঁকিয়া দেখাইলে, তবে বুঝিতে পারে। এঁদেরও এই রকম করিয়া শিখাইলে, তবে চিকিৎসা শিখিতে পারেন; আর সেই রকম কাজও করিতে পারেন। ফল কথা, যিনি যা কখনও দেখেন নাই, শুনেন নাই, লিখিয়া তাঁকে তা ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিতে হইলে যে উপায়, যে কৌশল, যে ফিকির করিতে হয়, এ বৈতে তার কোনও ত্রুটি করি নাই। এখন, যা ভাবিয়া বৈ খানি লিখিলাম, তা যদি সিদ্ধ হয়, তবেই আমার সব শ্রম সফল হইবে। 'যিনি রোগ ভাল করিতে পারেন, তিনিই যথার্থ চিকিৎসক। যে অসুদে ব্যামো সারে, সেইই যথার্থ অসুদ'। এ কথা যদি সত্য হয়—সত্য না হবে কেন। এ ত আর যে সে লোকের কথা নয়। আমাদের বৈদ্য-শাস্ত্রের প্রধান গ্রন্থকর্ত্তা মহামুনি চরক এ কথা বলিয়া গিয়াছেন। তিনি বলিয়া গিয়াছেন বলিই যে, এ খুব সার কথা বলিতেছি, তা নয়। যদি বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখ, তবে যথার্থই এর চেয়ে সার কথা আর নাই। তাতেই বলি, অমুক হাতুড়ে, অমুক পণ্ডিত, এ কথা কথাই নয়— এ কথা বলাই উচিত নয়। যিনি কাজে পণ্ডিত, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। এম ডি পাস করিয়াছেন; কিন্তু সামান্য একটা জ্বরের চিকিৎসায় চোকে অন্ধকার দেখেন; দু বেলা অসুদ বদলান; রোগীকেও ভোগান, গৃহস্থকেও ভোগান। সে এম ডি তে আমার দরকার কি? আমার

দরকার ব্যামো ভাল হওয়া। যিনি আমার ব্যামো সারিয়া দিতে পারেন, তিনিই আমার মাথার মণি। যদি বল, তবে কেন আমাদের শাস্ত্রে বলে যে, পণ্ডিতের হাতে মরাও ভাল, তবু মূর্খের হাতে বাঁচাও কিছু না। এ কথার কি উত্তর দিবে? এ কথার আর উত্তর কি? মূর্খ কারে বলে, আগে জিজ্ঞাসা করি। যে, যে কাজ করে, সে কাজে সে পারগ হইলে, তাকে কি মূর্খ বলিবে? সে অন্য কাজে মূর্খ হইতে পারে। কিন্তু সে নিজের কাজে মূর্খ নয়। নাপিতে ভাল কামাইতে পারিলে, তার কাছে আর কি চাও? ঘরামিতে ভাল ঘর ছাইতে পারিলে, তার কাছে আর কি চাও? ময়রা ভাল সন্দেশ মিঠাই তয়ের করিতে পারিলে, তার কাছে আর কি চাও? উকিলে মোকদ্দামা জিতাইয়া দিতে পারিলে, তাঁর কাছে আর কি চাও? ডাক্তরে রোগ ভাল করিয়া দিতে পারিলে, তাঁর কাছে আর কি চাও? জ্বর জাড়ির বেশ চিকিৎসা করিতে পারেন। রোগী তাঁর হাতে বেজায় হয় না। কিন্তু তিনি ইংরাজী ত জানেনই না; বাঙ্গালাও ভাল জানেন না। এতেই কি তাঁকে অশ্রদ্ধা করিতে হইবে? অমুক বিষয় ভাল জানি বলিয়া, কাজে যিনি তার পরিচয় দিতে না পারেন, তাঁকেই অশ্রদ্ধা করা উচিত। যদি বল, তবে দেশে হাতুড়ে ডাক্তরের সংখ্যা বেশী করাই তোমার ইচ্ছা। ইচ্ছা কেমন করিয়া? অমৃতে অরুচি কার? ডাক্তর পণ্ডিত হবেন, অথচ ভাল চিকিৎসক হবেন—এমনটী ত মিলিলে হয়। এ রকম পাইলে অন্য রকম কে চায়?

কিন্তু তা পাই কোথায়? আমরা পাড়াগাঁয়ে বাস করি। দিন আনি দিন খাই,। শহরে ভাল ডাক্তর থাকিলে, তাতে আমাদের লাভ কি? বেল পাকিলে কাকের কি? আমরা যেমন মানুষ, আমাদের ডাক্তরও সব তেমনি আছেন। তাঁরা গরিবের ছেলে। পয়সা খরচ করিয়া বাপ মায়ে তাঁদের ভাল লেখা পড়া শিখাইতে পারেন নাই। কাজেই, পেটের ভাত পরণের কাপড়ের আর কোনও উপায় না দেখিয়া, তাঁরা কোনও গতিকে সোজাসুজি জ্বর জাড়ির একটু আধটু চিকিৎসা শিখিয়া আসিয়া আমাদের জীবন রক্ষা করিতেছেন। এতে তাঁদেরও দু পয়সা হইতেছে, আমরাও বাঁচিয়া যাইতেছি। তাঁরা এ রকম ডাক্তরি না শিখিলে, আমাদের আর উপায় ছিল না। ঈশ্বরের নিকট প্রার্থনা করি, তাঁরা সুখে স্বচ্ছন্দে থাকুন, আর দীর্ঘজীবী হউন। তাঁদের হাতেই আমাদের জীবন। তাঁরাই আমাদের বাস্তু দেবতা। তাঁদের সংখ্যা যত বাড়ে আমাদের ততই মঙ্গল। তা হইলে আমাদের পাড়াগাঁয়ে চিকিৎসার অভাবে আর কেউ মারা যায় না। পাড়াগাঁয়ের দু চারিটী ছেলে, যাঁরা বেশ লেখা পড়া শিখিয়া ভাল ডাক্তর হইয়াছেন, তাঁরাও শহরে গিয়া ডাক্তরি করিতেছেন। তাঁদের বিদ্যা বেশী; আশাও বেশী। কাজেই, পাড়াগাঁয়ে থাকিলে তাঁদের পেট ভরে না। যেখানে পেট ভরে, তাঁরা সেই খানেই যান। আমাদের দিকে ফিরেও চান না। এতে সেই সব গরিব ডাক্তর ভিন্ন আমাদের জীবন রক্ষা আর কে করে? তাঁদের ভিন্ন আমাদের আর

গতি নাই। কি ভদ্র, কি ইতর, পাড়াগাঁয়ের সকলেরই মুখে এই কথা। তাতেই বলি, এই সব ডাক্তর নিজের ব্যবসা ভাল্ল করিয়া শিখিতে পারেন, এমন উপায় করিয়া দিতে পারিলে, সমাজের যথার্থই হিত করা হয়। এঁদেরই শিখাইবার জন্যে, এই বৈ খানি লিখিলাম। বৈ খানি পড়িয়া যদি তাঁরা আপন আপন কাজে ভাল পারগ হন, শহরের ডাক্তরদের সঙ্গে পাল্লা দিয়া রোগী ভাল করিতে পারেন, তবেই আমার শ্রম সফল হবে।

অনেকে বলিতে পারেন, মেডিকেল কলেজে বা মেডি-কেল্ স্কুলে যাঁরা কখনও পড়েন নাই, হাজার শিখাইলেও তাঁরা ভাল ডাক্তর হইতে পারেন না। রোগ চিনিতে পারিলে, আর রোগ ভাল করিতে পারিলে যদি ভাল ডাক্তর হয়, তবে এ কথা আমি মানি না। কেন না মেডি-কেল কলেজ কি মেডিকেল স্কুলের উঠান দিয়াও যাঁরা কখনও হাঁটেন নাই, তাঁহারাও আমার চিকিৎসা-দর্পণ—এর চেয়ে সে ঢের শক্ত বৈ, পড়িয়া অনেক জায়গায় ইংরিজি ক্লাশের ভাল ভাল ডাক্তরদেরও হারাইয়া দিয়াছেন। এতেও কি তাঁরা ভাল ডাক্তর হইলেন না? আমি জানি, ইংরিজি ক্লাশের অনেক ডাক্তার অসুদের নাম বানান করিতে ভুল করেন; যার কোষ্ঠবদ্ধ, তাকে ধারক অসুদ খাওয়াইয়া বসিয়া থাকেন। এতেও তাঁদের মন্দ ডাক্তর বলে, সাধ্য কার? চাপরাসের এমনিই জোর! তাতেই বলি, বুদ্ধি, শিখিবার ইচ্ছা, আর শিখিবার উপায়—এই তিনই যাঁর আছে, তিনি নিজের কাজে কখনই অপারগ হন না।

আগে ভাবিয়াছিলাম, এই বৈতেই সব সারা করিব। কিন্তু তা হইল না। তা কেমন করিয়া হবে? বৈখানির নাম জ্বর-চিকিৎসা; কিন্তু কাজে, এতে সকল রোগেরই চিকিৎসা থাকিবে। কেন না, এমন রোগই নাই, যার সঙ্গে জ্বর নাই। কাজেই, যে বৈয়ের নাম জ্বর-চিকিৎসা, সে বৈতে সকল রোগেরই কথা থাকা চাই। এই জন্যে, এক খান বৈতে সে সব লিখিতে পারিলাম না। এ বৈতে কেবল সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর) আর স্বল্প-বিরাম জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবার), এই দু রকম জ্বরের কথা লিখিলাম। স্বল্প-বিরাম-জ্বরের ১৮টী উপসর্গের নাম করিছি। তার মধ্যে কেবল ব্রংকাইটিস্ রোগের কথা এতে বিশেষ করিয়া বলিছি। আর ১৭রকম উপসর্গের কথা এতে বলিতে গেলে বৈ খানি খুব বড় হইয়া যায়। বড় বৈয়ের দামও বেশী। এই জন্যে, জ্বর-চিকিৎসার দ্বিতীয় ভাগে ঐ ১৭ রকম উপসর্গের কথা বলিব।

দিন পোনের কি তারও বেশী হইল, এক জন ডাক্তর আমার সঙ্গে দেখা করিতে আসিয়াছিলেন। তিনি ইংরিজি ক্লাশের নব্য ডাক্তরদিগের মধ্যে একটী উজ্জ্বল রত্ন *। জ্বর-চিকিৎসার এখানে খানিক, ওখানে খানিক পড়িয়া (তখন দু শ পৃষ্ঠা আন্দাজ ছাপা হইছিল) বলিলেন—আপনার ধাত্রী-শিক্ষা আমাদের দেশের সকলেরই যেমন আদরের সামগ্রী হইয়াছে, এ বৈ খানিও সেই রকম আদরের জিনিশ

* কালীঘাট নিবাসী শ্রীযুক্ত বাবু অবিনাশচন্দ্র বন্দ্যোপাধ্যায়

হইবে ; বরং তার চেয়ে আরো বেশী হইবে। কেন না গর্ভাবস্থায়, সূতিকাগৃহে, আর শিশু-পালনের বেলাই ধাত্রী-শিক্ষার দরকার। কিন্তু এ বৈ খানি সব সময়, আর সকলেরই দরকার হবে। ধাত্রী-শিক্ষা লিখিয়া সূতিকাগৃহে প্রসূতি ও শিশুদের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিয়াছেন। এ বৈ খানি লিখিয়া, পরে তাদের জীবন রক্ষার উপায় করিয়া দিলেন। ঘরে ঘরে, এ বৈ এক এক খানি থাকিলে, গৃহস্থ-দের ডাক্তর ডাকিবার খুব কম দরকার হবে। তাঁর এই কথায় আমার এই বৈ খানি লেখার শ্রম যেন অনেক সার্থক হইল। এখন সাধারণেরও যদি সেই মত হয়, আর কাজে এ থেকে সেই রকম ফল পান, তবেই আমার শ্রম সম্পূর্ণ সফল হইবে।

রসস্থ হইয়া জ্বর হইয়াছে; রসের পরিপাক না হইলে কুইনাইন খাওয়ান হইবে না; খাওয়াইলে রোগী বড়ই ভুগিবে—বড়ই কষ্ট পাবে। পাড়াগাঁয়ে—সহরেও নয়, এমন নয়—ছেলে, বুড়, জোওয়ানের মুখে এই কথা। শুদু এই ভুলেই যে, কত লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে, আর হইতেছে, তা বলা যায় না। রসের পরিপাক করিতে গিয়া অনেক জায়গায়—অনেক জায়গায় কেন, প্রায়ই—আমরা রোগীর জীবন পরিপাক করিয়া ফেলি। আজ জ্বর হইয়াছে, আজই কি কুইনাইন দেওয়া যায়? আর দুই একটা জ্বর না দেখে কুইনাইন দেওয়া হবে না। এ রকম বন্দোবস্ত কোনও রোগেরই সঙ্গে—বিশেষ ম্যালেরিয়া-জ্বরের সঙ্গে—খাটে না। আজ যেমন জ্বর ছাড়িল, কাল তেমন ছাড়িবে

কি না, তার ঠিক কি? কাল্ জ্বরে রোগীর কি অবস্থা ঘটিবে, কে বলিতে পারে? লোকের এ রকম ভয়ও নাই— এ রকম ভাবনাও নাই—কেমন করিয়া থাকিবে? এ সব যে জ্ঞানের কাজ। এই জন্যে, ম্যালেরিয়া-জ্বরের এমন ব্রহ্মাস্ত্র—কুইনাইন্—থাকিতে আমাদের দেশে এত লোক মরে। গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন খাইতে নাই; খাইলে জ্বর বাড়ে—জ্বর আট্কাইয়া যায়—রোগী ভোগে। এ ভুলেও যে কত লোকের জীবন নষ্ট হইয়াছে আর হইতেছে, তা বলা যায় না। আমাদের দেশের লোকের এই রকম ভুল শুদ্রে দিতে পারিলে, দেশের যথার্থই হিত করা হয়। ছোট খাট হিত নয়—দেশের লোকের জীবন রক্ষা করা হয়। এই জন্যে, এ সব ভুল শুদ্রে দিতে যত দূর চেষ্টা করিতে হয়, তা করিছি।

খুট্‌-আখুরেরাও বৈ পড়িয়া রোগী ভাল করিতে পারিবেন—চিকিৎসা করিয়া লোকের কাছে যশ পাবেন—এটী আমার বড়ই ইচ্ছা। এই ইচ্ছা বজায় রাখিয়া বৈ খানি লিখিছি। এ বৈ খানিতে আমার সে ইচ্ছা কতদূর সফল হইবে, সাধারণেই তা বিচার করিবেন।

খুট্‌-আখুরেদের জন্যে বৈ লিখিলাম বটে; কিন্তু পড়ো পণ্ডিতদেরও শিখিবার এতে অনেক কথা থাকিল।

বৈ খানির জ্বর-চিকিৎসা নাম দিইছি; কিন্তু এতে শুদ্রু জ্বরের চিকিৎসা নাই। ডাক্তরদের কুসংস্কার-রোগেরও অনেক চিকিৎসা আছে; সমাজেরও অনেক কুসংস্কার-রোগের চিকিৎসার কথা আছে।

বৈ খানির মাঝে মাঝে লেখা আছে—কাল রাত্রে একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম; দিন আষ্টেক হইল একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম; দিন পোনর হইল একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। কোন্ তারিখে দেখিছিলাম, তা লেখা নাই। চৈত্র আর বৈশাখ এই দুই মাসের মধ্যে সে সব রোগী দেখিছি।

কলিকাতা
১৬০ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট্ } শ্রীযদুনাথ মুখোপাধ্যায়।
২১শে জ্যৈষ্ঠ, ১২৮৭।

শ্রীশ্রীহরিপদ

ভরসা।

(প্রথম ও দ্বিতীয় ভাগ পড়িয়া)

সেবক শ্রীজগবন্ধু সেন গুপ্তস্য প্রণাম শত সহস্র পূর্ব্বক নিবেদন মিদম্। মহাশয় আপনার নিকট মাদৃশ ব্যক্তির কোনরূপ বাক্য প্রয়োগ কেবল বাচালতা ভিন্ন আর কিছুই নহে, ইহা জানিয়াও আপনার অসাধারণ পাণ্ডিত্য এবং গুণবত্তা, আমাকে এরূপ চঞ্চল করিয়া তুলিয়াছে যে, আমি যত্ন করিয়াও তুষ্ণীম্ভাব অবলম্বন করিতে পারিলাম না।

আমার বৈদ্যবংশে জন্ম, স্বর্গীয় পূর্ব্বপুরুষেরা ৺পিতৃঠাকুর অবধি অতি সম্মানের সহিত জাতীয় ব্যবসায়ের অনুষ্ঠান করিয়া গিয়াছেন; বোধ হয় ত্রিবেণীর ঈশ্বরচন্দ্র কবিভূষণের নাম আপনার মত সুবিজ্ঞ চিকিৎসকের অবিদিত নাই; কারণ বঙ্গদেশে অনেকেই অনুগ্রহ করিয়া তাঁহাকে সুচিকিৎসকের মধ্যে গণনা করেন, সেই মহাত্মা আমার পিতা; এইরূপ পূর্ব্ব পরিচয় আমার পক্ষে গৌরবের হইলেও আমি আর তাহাতে অধিকারী নই। কাল প্রভাবে বাল্যকালে জাতীয় ব্যবসায়ের মাহাত্ম্য বুঝিতে অক্ষম হইয়া ইংরাজি পড়িতে প্রবৃত্ত হই, এবং যৎকিঞ্চিন্মাত্র ইংরাজি অভ্যাস করিয়া বিষয় কর্ম্ম করিতে আরম্ভ করি। পরে জ্ঞানোদয় এবং বয়সের কিঞ্চিৎ পরিমাণ হইলে মনে মনে স্ববৃত্তি পরিত্যাগের জন্য ক্ষোভের উদয় হয়। কিন্তু তৎকালে সংস্কৃত ভাষা রীতিমত অভ্যাস ক'রে আদ্যোপান্ত আয়ুর্ব্বেদ শাস্ত্র বা মেডিকেল কলেজে নিয়মিত অধ্যয়নের কাল না থাকায়, নিজে নিজে যতদূর পারা যায়, চিকিৎসা-শাস্ত্রের অনুশীলনে প্রবৃত্ত হইলাম। ডাক্তারি, বৈদ্য ও হোমিওপ্যাথিক বিষয়ের ইংরাজী, বাঙ্গলা, ও সংস্কৃত ভাষার মুদ্রিত পুস্তক সকল অধ্যয়ন ও সঙ্গে সঙ্গে চিকিৎসা আরম্ভ করিলাম। প্রায় বার বৎসর গত হইল এই কার্য্য করিতেছি, সুতরাং বুঝিতে পারি বা না পারি, অনেক চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক অধ্যয়ন করিয়াছি। ইংরাজি বাঙ্গলা, বা সংস্কৃত ভাষার চিকিৎসা বিষয়ে নূতন পুস্তক প্রকাশিত হইলেই আমি উহা ক্রয় করিয়া থাকি।

এইরূপে অনেক পুস্তক পড়িয়াছি বটে, কিন্তু আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসার মত পুস্তক এতাবৎকাল পর্য্যন্ত আমার নয়নগোচর হয় নাই। এই পুস্তক খানি চিকিৎসা-শাস্ত্র সাগরের একটি মহামূল্য রত্ন ইহার ভাষা যেরূপ প্রাঞ্জল, চিকিৎসার রীতিও সেইরূপ নৈপুণ্যের সহিত লিখিত। এই পুস্তক খানি যাদৃশ হাতুড়ে চিকিৎসকের এবং দরিদ্র গৃহস্থের পক্ষে যে কত উপকারী, তাহা বর্ণনাতীত। অধিক কি, ইহা ম্যালেরিয়া দগ্ধ দেশের অমৃতভাণ্ডস্বরূপ বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমার ভাষার প্রসর অতি অল্প—এতাদৃশ মহামূল্য পুস্তকের সমুদায় গুণ প্রকাশ করিতে অক্ষম। তবে এইমাত্র বলিতে পারি যে, যে উদ্দেশ্যে ইহা রচিত হইয়াছে, ইহা দ্বারা তাহা সম্পূর্ণরূপে সাধিত হইবে সন্দেহ নাই। আর ইহা রচনা করিয়া আপনার অন্য কোনরূপ লাভ হউক বা না হউক, সহস্র সহস্র দরিদ্র ব্যক্তির প্রাণরক্ষার জন্য যে অসীম পুণ্য সঞ্চয় হইবে, সে বিষয়ে কোন সংশয় নাই। এক্ষণে পরমেশ্বরের নিকট প্রার্থনা এই যে, তিনি আপনাকে দীর্ঘজীবী করিয়া শশানাবস্থা প্রাপ্ত বঙ্গদেশকে পুনরায় লোকালয় করুন। উপসংহার সময়ে জিজ্ঞাস্য এই যে, সরল জ্বর-চিকিৎসা কি দ্বিতীয় খণ্ডেই সম্পূর্ণ হইয়াছে, অথবা আরও চলিবে? আপনি যে দ্বিতীয় খণ্ডে লিখিয়াছেন পল্লিগ্রামস্থ ডাক্তারদিগের জন্য একখানি মেটিরিয়া মেডিকা লিখিবেন, তাহা কি সম্পূর্ণ হইয়াছে? কৃপা করিয়া যদি এই পত্রের উত্তর দেন, তবে আমি শ্রীচরণে চিরবাধিত হইব। ইতি—

তাং ২০ কার্ত্তিক ১২৮৯।

লোকো আফিস,

এস, পি, ডি, রেলওয়ে. লাহোর।

আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশ হইয়াছে কি না জানিতে ইচ্ছা করি। প্রথম ভাগ প্রকাশ করিয়া বঙ্গদেশের বিশেষ উপকার করিয়াছেন। এমন কি, আমার এত দৃঢ় বিশ্বাস যে, আপনার জ্বর-চিকিৎসার নিয়মানুসারে জ্বর-রোগী চিকিৎসিত হইলে পরে আর রোগী মরিবে না।' আপনার জ্বর-চিকিৎসা প্রকাশের পর হইতে আমি যত গুলি জ্বর-রোগী দেখিয়াছি, একটীও মরে নাই।

আমার তের বৎসরের বহুদর্শিতায় যাহা না হইয়াছে আপনার জ্বর-চিকিৎসায় তাহা হইয়াছে। ১৮৮১, ৫ই ফেব্রুয়ারি।

শ্রীশ্রীশচন্দ্র রায়। নেটিব ডাক্তার

হরিনাভি দাতব্য চিকিৎসালয়।

মান্যবরেষু—

মহাশয়! অনেক দিন হইল আপনি দুই খণ্ড "সরল জ্বর-চিকিসা" লিখিয়াছেন ইহার মধ্যে অনেক প্রশংসা পত্রও পাইয়াছেন, সুতরাং এ সম্বন্ধে আমার আর অধিক লেখা বাহুল্য। কিন্তু গ্রন্থ দুখানি পড়িয়া, আমি এত সুখী হইয়াছি যে দু কথা না বলিয়া থাকিতে পারিলাম না।

আপনি এই বৈ দুখানি লিখিয়া অনেক হাতুড়ে ডাক্তরকে বিজ্ঞ ডাক্তার করিয়াছেন। যে সকল গৃহস্থ চিকিৎসাভাবে মারা যাইতেছিল, এই বৈ পড়িয়া তাহারা নিজেই সুচিকিৎসায় ধন প্রাণ উভয়ই রক্ষা করিতেছে।

মেড়িকেল স্কুলে তিন বৎসর বড় বড় নাম জাদা ডাক্তরের উপদেশ শুনিয়া ও বৈ পড়িয়া যে ফল না হয় আপনার বৈ আগাগোড়া একবার পড়িলেই সে ফল হয়। তাঁহাদের মৌখিক ও লিখিত উপদেশ উভয়ই এত নীরস ও গোলমেলে যে কোন রূপেই তাহাতে মন নিবিষ্ট হইতে চায় না। এই জন্য অনেক ছাত্র স্কুলের বেঞ্চে বসিয়া নিদ্রার কোলে শান্তি লাভ করেন। বলা বাহুল্য যে এক খানা নভেল পড়িতে যে সুখ, আপনার বৈ পড়িতেও সেই সুখ; এতেও যদি শিক্ষা না হয় তবে আর শিক্ষা হবে কিসে? ফলতঃ কিরূপে শিক্ষা দিতে হয় তাহা আপনি যেমন বুঝেন এমন বুঝি বড় বড় ডাক্তরেরাও বুঝেন না। এবং কেবল এই কারণেই তাঁহাদের পরিবর্ত্তে আপনি শিক্ষক হইলে ইংরাজি ক্লাসের ছাত্রেরা বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রদের সঙ্গে আটিতে পারিতেন না।

ইংরেজী ক্লাসের ছাত্রগণ বোধ হয় আপনার বৈ পড়া ঘৃণা জনক মনে করেন। কিন্তু এ ঘৃণা রাখিয়া তাঁহারা বা ঠকেন। যাহা হউক বাঙ্গালা ক্লাসের ছাত্রদিগকে আমার অনুরোধ তাঁহারা পরীক্ষায় পাশ

হইবার জন্য যে বৈ কেন পাঠ করুন না প্রকৃত শিক্ষা লাভ করিবার জন্য যেন যদু বাবুর বৈ গুলি সঙ্গে সঙ্গে রাখেন।

আপনি যেমন সরল ভাষায় ভাল বৈ লিখিয়াছেন, তেমন ইহার মূল্যও সুলভ করিয়াছেন। ইহাতেও যদি লোকে আপনাকে উৎসাহ না দেয়, তবে আর কিসে দিবে?

যাহা হউক ভরসা করি আপনি অর্থের দিকে দৃষ্টি না করিয়া ক্রমে প্রাক্‌টিস অব মেডিসিনের যাবতীয় রোগের এইরূপ সুন্দর বর্ণনা করিয়া দেশের হিত করিবেন। ধন স্থায়ী নয়, কিন্তু কীর্ত্তি স্থায়ী। ১২৯০। ৩০ পৌষ। টাঙ্গাইল কেদারপুর।

বিনয়াবনত

শ্রীচন্দ্রকিশোর বসু ডাক্তর।

মহাত্মন!

আপনার নিকট এই পত্রখানি লিখিতেছি আর আমার চক্ষু দিয়া টস্‌টস্ করিয়া জল পড়িতেছে। কেন? এই মাত্র আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসা পড়িতেছিলাম। শুভক্ষণে আপনার জন্ম হইয়াছিল। শুভক্ষণে আপনি ডাক্তরি চিকিৎসা শিখিয়াছিলেন। আর কয়েকজন ডাক্তরও যদি আপনার মত হইতেন, তবে কি আজি বাঙ্গালা দেশে এত লোক অকালে মরিত? আপনার "ধাত্রী-শিক্ষা" আপনার "শরীর-পালন" আপনার অন্য আর বৈ যাহা না করিয়াছে, এক 'সরল জ্বর-চিকিৎসাতে' তাহা করিবে। এ বৈ খানি পড়িয়া যাঁহার যাহা ইচ্ছা বলুন আমার হৃদয় আপনার প্রতি এত কৃতজ্ঞ হয়, যে আমার কান্না আসে। পুস্তকের প্রতি পত্রে আপনার দেশ হিতৈষিতার অনন্ত দৃষ্টান্ত দেখিয়া আমি অবাক্ হই। এক একবার মনে হয়, আপনাকে কাছে পাইলে চক্ষুর জল দিয়া আপনার পা দু খানি ধুইয়া দিতাম। ধন্য আপনি। যোড়হাতে ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করি, আপনাকে তিনি দীর্ঘজীবী করুন। আপনি যে দেশহিত ব্রত গ্রহণ করিয়াছেন; তাহা যেন দীর্ঘকাল ধরিয়া পালন করিতে পারেন। আপনি কি পুরস্কার চাহেন? যদি চাহেন তবে তাহারও অভাব নাই। যে আপনার বৈ পড়িয়াছে, সেই যে আপনাকে কত ধন্যবাদ দিয়াছে তাহা কে বলিয়া শেষ করিবে? সেই ধন্যবাদগুলির

যদি আকৃতি থাকিত, আপনার ঘরে বাড়ীতে আটিত না। আমি প্রতিজ্ঞা করিয়াছি এখানে যত গ্রাম্য চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদিগকে আপনার বৈ পাড়তে প্রবৃত্তি দিব। না শুনিলে পায় ধরিয়া পড়াইব।

১২৯০ সাল ৩রা আশ্বিন। প্রণত শ্রীশশধর রায়

ভাঙ্গা পোঃ আঃ জেলা ফরিদপুর, মাণিকদহ।

শ্রদ্ধাস্পদেষু—

যাহারা পৃথিবীতে আসিয়াছে কিসে তাহাদের রক্ষা হয়, কিসে তাহারা দৃঢ় ও বলবান হইতে পারে এটি প্রথম চিন্তার বিষয়। তারপর বিদ্যা, ধর্ম্ম ও বিষয় কার্য্য। কিন্তু আমাদের দেশের লোক আগের কাজ আগে না করিয়া, গোড়ার দিকে না তাকাইয়া আগায় জল ঢালিতেছেন। রোগে রোগে যদি দেশটাই উচ্ছিন্ন গেল তবে আর রাজনৈতিক আন্দোলন ও ধর্ম্মের আন্দোলনে কি হইবে? দেশের বড় লোকদিগের এই অবশ্য কর্ত্তব্য প্রথম ও প্রধান কার্য্যে অনবধান যার পর নাই আক্ষেপের বিষয়।

কিন্তু আপনার জ্বর চিকিৎসা প্রভৃতি পুস্তকগুলি দেখিলে ও আপনাকে মনে পড়িলে এই আক্ষেপের অনেক সান্ত্বনা হয়, বঙ্গ দেশ আপনার নিকট অপরিশোধ্য ঋণে আবদ্ধ! আপনি চিকিৎসা বিষয়ে বঙ্গ দেশে যুগান্তর উপস্থিত করিয়াছেন।

আপনার দুই খণ্ড জ্বর-চিকিৎসার প্রচারের পর অবধি অসংখ্য লোক আসন্ন মৃত্যু হইতে রক্ষা পাইতেছে, ডাক্তরের ভিজিটের দায় ও অনর্থক উদ্বেগ হইতে মুক্ত হইয়াছে। ইতিপূর্ব্বে বাটীতে জ্বর হইলে দশ দিক অন্ধকার দেখিতাম, এখন ডাক্তরের সহিত তর্ক করি এবং অনেক সময়ে তাঁহাদের ভ্রম বুঝিতে পারি। তাই বলি আপনি চিকিৎসা বিষয়ে বঙ্গ দেশে যুগান্তর আনয়ন করিয়াছেন। গোবরডাঙ্গা ৪ঠা, কার্ত্তিক

বশম্বদ

শ্রীবরদাকান্ত মুখোপাধ্যায়।

মাননীয় মহাশয়!

আমি অজ্ঞান অথচ দরিদ্র, সুতরাং সংসারের পদদলিত অথবা অগণ্য। প্রকৃতি আমাকে কেবল এই একটী জ্ঞান দিয়াছেন, যে জীবন

ও অর্থ তুল্যমূল্য নহে। জীবন রক্ষার্থ সর্ব্বস্বান্ত করা যাইতে পারে। এই একমাত্র জ্ঞানেই আমি ধনে প্রাণে মারা পড়িয়াছি এবং এমন সুখের সংসার আমার পক্ষে নরক-তুল্য ঘৃণার সামগ্রী হইয়াছে। পূর্ব্বোক্ত জ্ঞান থাকাতে বাটীতে কাহার পীড়া হইবামাত্র ডাক্তর আনি, এবং তাঁহার প্রত্যেক আদেশ প্রতিপালন করিয়া থাকি। কেন না চিকিৎসা সম্বন্ধে নিজে কিছু শিখি নাই। ডাক্তরও যে সে নহে—য়্যাসিষ্ট্যাণ্ট-সার্জ্জন। ইহার ফল এই হইয়াছে যে, বার মাসের মধ্যে আমার গৃহে এক মাসও ভাল যায় না। ১২ বৎসরের মধ্যে ৩ জনের ভয়ানক বাতঃ-শ্লেষ্ম-বিকার হয়। এবং তিনজনই ৩০ দিনের কমে অন্ন পায় নাই। শুদ্ধ ইহাই নহে দুটি হৃষ্টপুষ্ট বলবান পুত্র-রত্ন হইতে বঞ্চিত হইয়াছি। আমার বয়ঃক্রম চল্লিশ বৎসর। দারুণ পুত্র শোক, সাংসারিক কষ্ট অর্থ-নাশ ও ক্রমাগত সাংসারিক পীড়ায় আমি ইহারই মধ্যে বলিপলিতাদিতে আক্রান্ত হইয়াছি। লোকে বৃদ্ধেরও কত আশা ও কত ভরসা দেখা যায়, আমি ঘোর নৈরাশ্যে ভাসিতেছি। এতদিন ভাবিতেছিলাম দৈব উপদ্রব নিবারণার্থে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াও যখন কিছুই করিতে পারিলাম না, তখন পূর্ব্ব জন্মের মহাপাতকই আমার সকল ক্লেশের হেতু।

কিন্তু দুর্ভাগ্যক্রমে কয়েক দিন হইল আপনার জ্বর-চিকিৎসা আমার নয়ন পথে পড়িয়াছে, নিস্তব্ধ শোকসিন্ধু আবার উথলিয়া উঠিয়াছে। পড়িতে পড়িতে আপনার পবিত্র পুস্তক অশ্রুজলে অপবিত্র করিয়াছি। বেশ করিয়া দেখিলাম ১॥০ মাস পূর্ব্বেও যদি ইহা পাইতাম, তবে নিশ্চয় বলিতে পারি আমার গৃহ চিরদিনের জন্য এমন অন্ধকারময় হইতে দিতাম না। জ্ঞানপূর্ণ ডাক্তরের চিকিৎসা প্রণালীর সহিত আমার মূঢ় চিত্তের স্বতই অনৈক্য ঘটিতেছিল, কিন্তু ভয়ে তাঁহার বিরুদ্ধ কার্য্য করিতে পারি নাই। তখন এই পুস্তক পাইলে আমার মনের জোর দ্বিগুণ বাড়িত, সন্তানটিও বাঁচিত।

আমি তো জন্মের মত গিয়াছি। যদি শীঘ্র না মরি, তবে শেষকালে ভিক্ষাবৃত্তি উদ্বন্ধন অথবা বিষ ইহার একতম আশ্রয় করিতে হইবে। কিন্তু আমার মত সামান্য প্রাণী থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই। কিন্তু ঐ যে দুটী শিশু আমার অদৃষ্টে ডাক্তরের লোমহর্ষণ ভ্রমে ঘটনা স্রোতে ভাসিয়া গেল, তাহারা থাকিলে হয় ত কালে অনেক কাজ করিতে পারিত। কিছুই হইল না, সমস্তই আমার স্বপ্নবৎ বোধ হই-তেছে। আমার অদৃষ্টে যাহাই হউক, আপনার এই পুস্তক দ্বারা অপর

সাধারণের সবিশেষ উপকার হইবে, অনেক পিতা মাতা শোকের জ্বালা হইতে রক্ষা পাইবে সন্দেহ নাই। একণে ঠিক এই ধরণে একখানি সাধারণ রোগের চিকিৎসা পুস্তক প্রস্তুত করিয়া রাজার অনুমোদিত হত্যাকারিগণ হইতে স্বদেশকে রক্ষা করুন। এই সকল অসম্বদ্ধ প্রলাপ লিখিয়া কি হইল কেনই বা লিখিলাম? মনের আবেগ, শোকের তীব্র দহনে অস্থির হইয়া এই কাণ্ড করিয়া ফেলিলাম; অপরাধ মার্জ্জনা করিবেন। ডাক্তার কিরূপে জীবন্ত মস্তক চইবায় চিবাইয়া চিবাইয়া খাইয়াছেন, যদি জানিতে চান তবে পরে লিখিব।

১২৮৯। ৮ই পৌষ। নিবেদক শ্রীমহিমচন্দ্র মুখোপাধ্যায়

গোবরডাঙ্গা স্কুলের হেড পণ্ডিতের নিকট।

পরম পূজনীয় শ্রীলশ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়

ডাক্তর মহাশয় শ্রীচরণ কমলেষু।

মহোদয়—

আমি একজন সামান্য হাতুড়ে ডাক্তর। চিকিৎসা ব্যবসায় অবলম্বন করিয়া যৎসামান্য উপার্জ্জন করিয়া থাকি। প্রথমতঃ প্রাক্‌টিস অব মেডিসিন ও মেটিরিয়া মেডিকা প্রভৃতি কতিপয় চিকিৎসা বিষয়ক পুস্তক কিঞ্চিৎ কিঞ্চিৎ পাঠ করিয়া তদ্দ্বারা যৎসামান্য প্রকার চিকিৎসা চালাইতেছিলাম। কিন্তু উক্ত পুস্তক সকল অত্যন্ত দুরূহ এবং সকল অংশ সহজে বোধগম্য নহে। গুরু উপদেশ ব্যতীত তাহাতে সহজে জ্ঞানলাভের সম্ভাবনা অতি অল্প, সুতরাং ঐ সকল পুস্তক বিশেষ আয়ত্ত করিতে পারি নাই। তদনন্তর আপনার কৃত সরল জ্বরচিকিৎসা পুস্তক উভয় খণ্ড পাঠ করিয়া জন সমাজে চিকিৎসক বলিয়া পরিচয় দিতে আর পূর্ব্বের ন্যায় তত সঙ্কোচ বোধ হয় না, প্রত্যুত স্থল বিশেষে বড় বড় ডাক্তরদিগের সমকক্ষ হইতে পারিব, এমত আশা করি।

মহাশয় যে এদেশের কীদৃশ উপকার করিয়াছেন, তাহা মৎসদৃশ ক্ষুদ্র জনের সাধ্য কি যে লিখিয়া ব্যক্ত করে?

সন ১২৮৯। ১৭ই পৌষ। শ্রীরামতারক কোঙর।

পোষ্টাফিস বোলপুর, জিলা বীরভূম। সাং বিলাতি।

সম্পাদক মহাশয়ের কলমে যাহা বাহির হইবে, তাহাই অব্যর্থ গুরু-মন্ত্র। যদিও মেডিকেল কলেজের দ্বিতীয় বার্ষিক বাঙ্গালা শ্রেণীতে কিছুকাল পড়িয়া প্রায় ১৪।১৫ বৎসর এই ব্যবসা করিয়া আসিতেছি, এবং অনেক সময় অনেক বিজ্ঞ (আমা অপেক্ষা) চিকিৎসকের চিকিৎসা-প্রণালীও দেখিয়াছি, কিন্তু জ্বর-চিকিৎসার এমন সুপ্রণালী আর দেখি নাই।

আমরা পাড়াগাঁয়ে থাকি, জ্বর লইয়াই আমাদিগের যত বুজরগি—ইহার পুর্ব্বে যে সমস্ত জ্বরে রোগী গুলি ছট্‌ ফট্‌ করিয়া মরিত, জ্বর চিকিৎসার উপদেশ অনুসারে কাজ করিতে আরম্ভ করিয়া অবধি মৃত্যু দূরে থাকুক, ৩।৪ দিনের মধ্যেই অধিকাংশ আরোগ্য লাভ করে, আর আমাদের দেশের কবিরাজ মহাশয়েরা অবাক্‌ হইয়া চাহিয়া থাকেন। ১৮৮০ ১০শে নবেম্বর।

শ্রীপ্যারিলাল সেন গুপ্ত—পাঁজিয়া।

মহাশয়!

অদ্য কয়েক দিন হইল আপনার "সরল জ্বর-চিকিৎসা" আনাইয়া পড়িয়া যার পর নাই উপকৃত হইয়াছি। আমি কলেজে পড়ি নাই, কিন্তু রাবার্টসনের থিয়রি এবং প্রাক্‌টিস প্রভৃতি কতকগুলি ইংরাজী এবং বাঙ্গালা বৈ দেখিয়া যত উপকার না পাইয়াছি, এই পুস্তকে সে সমস্ত উপদেশ পাইয়াছি। যিনি এরূপ করিয়া গরুকে মানুষ করিতে পারেন, তাঁকে আমি সাষ্টাঙ্গে প্রণিপাত করি!

আপনার রচনার প্রতি আমার এমন শ্রদ্ধা হইয়াছে যে আপনার রচিত যে কয়েক খানি বৈ আছে সকল গুলিই না পড়িয়া থাকিতে পারিতেছি না।

নিবেদক শ্রীশ্যামকিশোর রায়।

গ্রাম—ঘুড়কা, পোঃ—রায়গঞ্জ, (সিরাজগঞ্জ)

সেবক শ্রীপ্রাণহরি শর্ম্মণ, প্রণাম নিবেদনম্—

আপনার কৃত সরল জ্বর-চিকিৎসা বা প্রাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিন ১ম ও ২য় ভাগ যাহার প্রভাবে নেটীব ডাক্তার মহাশয়গণ সর্ব্বত্রে সুখ্যাতি ও সন্তোষলাভ করিতেছেন উক্ত ২ খানি পুস্তক এবং ওলাউঠা ও কুইনাইন্ প্রয়োগ নামক একখানি আপনার প্রণীত ক্ষুদ্র পুস্তক এই কয়খানি অল্প মূল্যের পুস্তক আমার পক্ষে বহু মূল্য হইলেও ক্রয় করিয়া ও আপনার অনুমতি মতে একটী তাপমান-যন্ত্র ক্রয় করিয়া প্রত্যেক রোগীকে আপনার মতে চিকিৎসা করিয়া সর্ব্বত্রে কৃতকার্য্য হইয়াছি। মহাশয়,আপনার পুস্তক সমূহের অসাম গুণ ও আপনার অসীম উদারতার পরিচয় উক্ত পুস্তক সমূহের প্রত্যেক পংক্তিতে প্রকাশ পাইতেছে। বোধ করি আমি ও আমার ন্যায় বিদ্যাহীন হইয়াও চিকিৎসা করেন, এমন ব্যক্তিগণ কখনও ব্রংকাইটিস নিয়মোনিয়া, প্লূরিসি ইত্যাদি সকল রোগের নাম, স্বভাব কারণ, পরীক্ষা ও চিকিৎসা করিতে কখনই সক্ষম হইত না। কিন্তু মহাশয়ের অসীম করুণা গুণে কেবল মাত্র ২৲ টাকা ব্যয় করিয়া সকলই অনায়াসেই কার্য্য চালাইতে পারিতেছে।

মহাশয় যথার্থ বলিতেছি যে, আমি আপনাকে দেবতা তুল্য মনে করিয়া পূজা করি।

আপনার অনুগৃহীত ও প্রতিপালিত
শ্রীপ্রাণহরি চট্টোপাধ্যায়।
সাং ডুমরদহ, নসরাই পোষ্টাফিস।

প্রিয় মহাশয়!

সরল জ্বর-চিকিৎসা যে প্রণালীতে লিখিত হইয়াছে তদ্দ্বারা অব্যবসায়ী কেন ব্যবসায়ীদেরও যথেষ্ট উপকার হইবে। ইহার দ্বিতীয় ভাগ প্রকাশিত হইয়াছে কি না জানাইলে সুখী হইব। এ পর্য্যন্ত যত চিকিৎসা গ্রন্থ বাহির হইয়াছে আপনার ন্যায় উৎকৃষ্ট প্রণালীর লেখা আমি দেখিতে পাই নাই।

চিকিৎসা দর্পণ পাঠে নিত্য নূতন নূতন চিকিৎসা-প্রণালী জানিতে

পারিতাম ; কিন্তু দুর্ভাগ্য বশতঃ আপনি নিদয় হইয়া সে সুখে বঞ্চিত করিয়াছেন। ১২৮৯, ১৪ ফাল্গুন।

একান্ত বশীভূত শ্রীকৃষ্ণগোবিন্দ মজুমদার।
সুসঙ্গ, দুর্গাপুর, জেলা ময়মন সিং।

মহাশয় আপনার প্রণীত সরল জ্বর-চিকিৎসা পুস্তক খানি পাঠ করিয়া যে কি পর্য্যন্ত প্রীতিলাভ করিয়াছি, তাহা লিখিয়া শেষ করিতে পারি না। আমি নিশ্চয়ই বলিতেছি, যাহারা এই পুস্তক খানি ক্রয় করিয়া পাঠ করত উহার ঔষধগুলি ক্রয় করিয়া গৃহে রাখিবেন, তাঁহাদিগকে আর ডাক্তার ডাকিতে হইবে না। এমন উৎকৃষ্ট পুস্তক আর হয় নাই, হইবেও না।

১৮৮০। ১৮ই অক্টোবর। শ্রীনকুড়চন্দ্র চট্টোপাধ্যায়।
মনিহাবাদ।

সম্প্রতি মহাশয় সরল জ্বর-চিকিৎসা নাম দিয়া যে পুস্তক খানি প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহা কিবা দীন কিবা ধনী সকলের জ্বররূপ তমোনাশের মরকত মণিস্বরূপ হইয়াছে। তাহাতে জগতের যে কত উপকার হই-তেছে ও হইবে তাহার সীমা নাই। এমন অত্যুৎকৃষ্ট গ্রন্থ কখনও মুদ্রিত হয় নাই বলিলে অত্যুক্তি হয় না। আমি যে কেবল ঐ গ্রন্থ এক খানি ডাকে আনাইয়া পাঠ করিয়া এই কথা বলিতেছি, এমন নহে। এখানে ভাল চিকিৎসকের অভাবে অগত্যা আমাকে ৮।৯টী বালকের ৩টী বালিকার, ৪টি স্ত্রীলোকের, ৫টি পুরুষের চিকিৎসা করিতে হইয়াছে। কেবল আপনার জ্বরচিকিৎসার উপর নির্ভর করিয়া রোগীর অভিভাবকের দ্বারা সালফেট অব কুইনাইন ক্রয় করিয়া আনাইয়া আপনার ব্যবস্থানুযায়ী সেবন করাইয়া সকলকেই আরোগ্য করিয়াছি।

১৮৮০। ২০শে ডিসেম্বর। শ্রীগোপালচন্দ্র দত্ত।
কালিকাপুর মডেল স্কুল।

বোধ হয় আপনাদের কাহারও অবিদিত নাই যে, আমাদের এই মহেশপুর গ্রাম তিন বৎসর হইতে ম্যালেরিয়া জ্বরে প্রপীড়িত হইতেছে।

ডাক্তর পেরি সাহেব প্রভৃতি অনেক অনেক বিজ্ঞ ডাক্তর ও কবি-রাজের চিকিৎসা দ্বারা কোন উপকার না দেখিয়া, আমি বনগ্রাম সব ডিভিজনের ভূতপূর্ব্ব ডেপুটী মাজিষ্ট্রেট, দেশহিতৈষী মান্যবর শ্রীযুক্ত বাবু তারাপ্রসাদ বন্দ্যোপাধ্যায় কর্ত্তৃক অত্রস্থ মিউনিসিপাল আফিসে প্রদত্ত আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসা পুস্তক দৃষ্টে ঐ ব্যাধি হইতে প্রায় ছয় শত লোককে মুক্ত করিয়াছি। প্রত্যেক গৃহেই আপনার এই পুস্তক এক এক খানি থাকিলে দেশের যে বহুল উপকার সাধিত হইবে, তাহা বলা বাহুল্য। পুস্তকের ভাষা এরূপ সরল হইয়াছে যে, সকলেই অনায়াসে বুঝিতে পারেন। আমরা কায়মনোবাক্যে প্রার্থনা করি, আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করিয়া এই প্রকার মূল্যবান পুস্তক প্রণয়ন করত দেশের মঙ্গল বর্দ্ধন করিতে থাকুন। ১২৮৮। ১১ই ভাদ্র।

শ্রীকৈলাশনাথ রায়চৌধুরী, মহেশপুর।

মহিমাবরেষু—

প্রণতি পূর্ব্বক সবিনয় নিবেদন মিদম্।

মহাত্মন্! ভয়ঙ্করী (ম্যালেরিয়া) পীড়া পিশাচীর প্রভূত পরাক্রমে, অস্মদ্দেশ একবারে উৎসন্নপ্রায় হইয়া গিয়াছে। তথাপিও, সেই দুর্দ্দান্তার ভীষণ উদর এখনও যে পূর্ণ হইয়াছে, তাহা বোধ হয় না। প্রতি বৎসর শরৎ ঋতুর শেষ ও হেমন্তের আগমন সময় প্রাপ্ত হইলেই, সেই রাক্ষসী বিকট বদন ব্যাদান পূর্ব্বক উৎসন্নাবশিষ্ট পল্লী গুলিকে গ্রাস করতঃ এক-বারে ক্রন্দন রবাকীর্ণ করে। দুর্ভাগ্য ক্রমে, এ প্রদেশে উপযুক্ত ডাক্তর কি বৈদ্য, উভয় প্রকার চিকিৎসকেরই নিতান্ত অভাব। যাঁহারা ধনবান, তাঁহারা দূর হইতে (বহু অর্থ ব্যয় করিয়া) উপযুক্ত চিকিৎসক আনাইয়া চিকিৎসিত হন। দরিদ্রদিগের (আমার মত লোকদিগের) রক্ষার ভার কেবল করুণাময় পরমেশ্বরের অপার করুণার উপর নির্ভর করে। একে সঙ্গতি বিহীন, তাহাতে আবার স্বদেশ মধ্যে চিকিৎসক নাই। ইহাতে ঈশ্বরের উপর নির্ভর ভিন্ন উপায় কি। যে সকল চিকিৎসক আছেন, তাঁহাদের চিকিৎসায় অপকার ভিন্ন উপকারের কিছু মাত্র সম্ভাবনা নাই। মহোদয়! বিগত সন ১২৭৯ সাল হইতে ১২৮৩ সাল পর্য্যন্ত প্রায় পাঁচ

বৎসর অসীম যন্ত্রণা (রোগ শোক) ভোগ করিয়া পরিশেষে (১২৮৩ সালের কার্ত্তিক মাসে) আমার একটী পরম বন্ধুর উপদেশ ক্রমে আপনার প্রণীত 'কুইনাইন প্রয়োগ প্রণালী' নামক পুস্তক খানি ও তল্লিখিত ঔষধ কয়েকটী ক্রয় করিয়া ব্যবস্থা দৃষ্ট পূর্ব্বক ব্যবহার করিয়া, কৃতান্তের করাল কবল হইতে (এক প্রকার) নিষ্কৃতি লাভ করিয়াছিলাম। তৎপরে ১২৮৯ সালে আপনার প্রণীত 'সরল জ্বর-চিকিৎসা' নামক প্রাক্‌টিস্ অব মেডিসন (দরিদ্রের জীবন সর্ব্বস্ব বলিলেও অত্যুক্তি হয় না) ক্রয় করিয়া তদ্দৃষ্টে চিকিৎসিত হইয়া (ও আত্মীয় স্বজনের চিকিৎসা করিয়া) পুনর্জন্ম লাভ করিয়াছি। জ্বরাদি কয়েকটী রোগের চিকিৎসার নিমিত্ত এদেশীয় চিকিৎসকদিগকে ডাকিবার (বেশী) প্রয়োজন করে না। কিন্তু অন্যান্য রোগের চিকিৎসার কোন উপায় করিতে না পারিয়া নিতান্ত ক্ষোভিত হইতে হয়। রিমিটেণ্ট জ্বরের যে কয়েকটী উপসর্গের কথা লিখিয়াছেন, যদি সেই (১৮টী) কয়েকটী উপসর্গের নিদান ও চিকিৎসা বিস্তৃতরূপে জানিতে পারিতাম, তাহা হইলে এদেশীয় চিকিৎসকদিগকে টাকা না দিয়া, তাহাদের বাড়ী হইতে টাকা লইয়া আসিতে পারিতাম। অস্মদ্দেশের সমস্ত অধিবাসীর সহিত এ অধীনের প্রার্থনা যে, অবশিষ্ট উপসর্গগুলির (লেখা চারিটী বাদে ১৪টীর) নিদান ও চিকিৎসাদি বিশদরূপে লিখিয়া জ্বর-চিকিৎসার তৃতীয় ভাগ খানি শীঘ্র প্রকাশ করিলে আমাদের সমস্ত দেশবাসীর জীবন রক্ষা হয়। আর অধিক লিখিলে পাঠ করিতে বিরক্ত হইবেন, অথবা ভবাদৃশ ব্যক্তির বিরক্তের কথা, কোথায়?

ভৃত্য শ্রীযজ্ঞেশ্বর সর্ব্বাধিকারী। জলামুঠা বরুড় ভেড়ী গ্রাম।
- পোঃ আঃ ভগবানপুর, জেলা মেদিনীপুর।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

সেবকস্য প্রণামা পায় পরার্দ্ধ নিবেদনঞ্চ বিশেষ মহাশয়ের সরল জ্বর চিকিৎসা নামক দুই খণ্ড পুস্তক পাঠ করিয়া আমার মূঢ় চিত্তে জ্ঞানের উদয় হইল। আজি প্রায় ২০ বৎসর চিকিৎসা ব্যবসা করিতেছি, কিন্তু এরূপ পুস্তক কখন দেখি নাই। ইহাতে যেরূপ উপদেশ আছে বোধ

হয় স্ত্রীলোকে চিকিৎসা করিতে সমর্থ হয়, এবং দীন দরিদ্রদের যে ধন প্রাণ বাঁচান যায়, তাহাও যথার্থ।

সেবক শ্রীকালীপদ মজুমদার
মোকাম কুটী পোড়াহাটী, জেমেস টুইডি সাহেবের জমিদারী।

অসংখ্য প্রণতি পূর্ব্বক নিবেদন—

মহাশয় আমি নবদ্বীপে সভয়ে হোমিওপ্যাথিক ও এ্যালোপেথিক মতে চিকিৎসা করিতেছিলাম। আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসা পাঠ করিয়া ও তদনুসারে চিকিৎসা করিয়া আমার এতদূর সাহস বৃদ্ধি হইয়াছে যে বড় বড় ডাক্তরদের সমক্ষে চিকিৎসা করিতে আর কিছু মাত্র ভীত হই না। আপনার কৃপায় এখন অধিকাংশ ভদ্রলোকের বাড়ীতে চিকিৎসা করিতেছি। ওলাউঠার চিকিৎসা হোমিওপ্যাথিক মতে করিতাম। গত ৮৭ সালের পৌষ মাসের ওলাউঠায় উক্ত মতের চিকিৎসায় ১টী রোগীও আরোগ্য না হওয়াতে অত্যন্ত দুঃখিত হইয়া ঐ ভয়ানক রোগের চিকিৎসার আর কোন ভাল পুস্তক হইয়াছে কিনা সন্ধান করিতে ছিলাম। আপনার বিসূচিকারোগের পুস্তক সংগ্রহ করিয়া মহাশয়ের উপদেশ মত ৮৮।৮৯ সালের উক্ত রোগের চিকিৎসা করিয়া বিশেষ ফলপ্রাপ্ত হইয়াছি। গত মাঘমাসে ১৯টী রোগীর মধ্যে দুইটীর জীবন রক্ষা হয় নাই। বিদিতার্থ শ্রীচরণে কৃতজ্ঞতার উপহার প্রদান করিলাম ইতি।

শীঘ্র সরল জ্বর চিকিৎসার তৃতীয় ভাগে বিবৃদ্ধি প্লীহা ও যকৃত সংযুক্ত পুরাতন জ্বরের চিকিৎসা বিশেষ করিয়া লিখিয়া পল্লীগ্রামস্থ দুঃখী রোগীদিগের জীবন রক্ষা করিয়া অক্ষয় কীর্ত্তি স্থাপন করুন।

২৩শে ফাল্গুন। — আপনার অপরিচিত ছাত্র
নবদ্বীপ, দেয়াড়া পাড়া — শ্রীপ্রহ্লাদচন্দ্র ভট্টাচার্য্য।

মহাশয়—

আমি চিকিৎসা ব্যবসায়ী। যথারীতি আয়ুর্ব্বেদোক্ত ঔষধাদি দ্বারায় চিকিৎসা করিতেছিলাম এবং আয়ুর্ব্বেদীয় গ্রন্থাদিও উপদেশ সহ যথা বিধি অধ্যয়ন করিয়াছিলাম। পরে প্রথম ভাগ সরল জ্বর চিকিৎসা প্রাপ্ত হইয়া দেখিলাম পুস্তক পাঠ করিলে কাহারই উপদেশ লওয়া

কোনই প্রয়োজন রাখে না। আপনার কৃত গ্রন্থ গুলি যে অন্ধের যষ্ঠি এবং নব্য চিকিৎসকগণের দিব্য চক্ষু, তদ্বিষয়ে কিছু মাত্রও সন্দেহ নাই।

একান্তানুগত

জামুপোঁতা—ইসলামগাতি পোঃ আঃ শ্রীগোবিন্দরাম ভৌমিক।

এন্, বি, এস, রেল, দি আত্রাই।

শ্রীশ্রীচরণকমলেষু—

আপনার প্রণীত সরল জ্বর চিকিৎসা দুই খণ্ড অতি কষ্টে সংগ্রহ করিয়াছি এবং তল্লিখিত চিকিৎসা প্রণালী যে আমাদের ন্যায় বিদ্যা বুদ্ধি হীন ব্যক্তির বিশেষ উপযুক্ত এবং আদরের সামগ্রী, তাহা বলা বাহুল্য। মহাশয় যে এতদ্দ্বারা অর্থ বিহীন নিস্ব লোকদিগের সঙ্কটাপন্ন ব্যাধি হইতে সহজে ও অল্প ব্যয়ে পরিত্রাণ পাইবার উপদেষ্টা তাহা বলা বাহুল্য। এমন কোন ব্যক্তি নাই যে, তজ্জন্য আপনাকে ধন্যবাদ দিতে বিস্মৃত হইবে।

প্রণত

সেবক শ্রীগোপালচন্দ্র পাল

লক্ষ্মীকোণ, রাজবাড়ী পোষ্ট (গোয়ালন্দ)।

মহাশয়ের প্রকাশিত সরল জ্বর চিকিৎসা পাঠ করিয়া যে কতদূর উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা এই সামান্য লেখনী দ্বারায় প্রকাশ করিতে অক্ষম। আপনি যথার্থই একজন দেশহিতৈষী, ও আপনার এই ক্ষুদ্র পুস্তকে যে দেশের হিতসাধন করিবে, তাহা আমি বলিতে চাই না। দেশের সকল লোক যাহার পড়িবার ক্ষমতা আছে, তাহারই স্বীকার করিবে, তাহার আর সন্দেহ নাই। আপনার পুস্তক খানির বাঁধাই ও কলেবর দেখিতে যেমন সুন্দর হইয়াছে, গুণ যে ইহার কত তাহা বলিতে পারি না। যদি সাত আট দিন সর্ব্বদাই আপনার পুস্তকের গুণের উপর লেখনী রাখি, তাহা হইলে যে আপনার পুস্তকের গুণ বর্ণনা করিতে পারি এমত নহে, যদি কিছু অংশ পারি তাহাও সন্দেহ। নিজে পুস্তক পাঠ করিয়া যে উপকার প্রাপ্ত হইয়াছি, তাহা লিখিতেছি। যে রিমি-টেণ্ট ফীবরে ৮।১০ দিন চিকিৎসা করিয়া কিছুমাত্র উপশম করিতে পারিতাম না, সেই রিমিটেণ্ট ফীবরে আজ আপনার পুস্তকের ব্যবস্থার অনু-

সারে চিকিৎসা করিয়া ৪।৫ দিনে বিনা ক্লেশে রোগী ভাল করিয়া উঠিতেছি।

শ্রীযদুনাথ ভট্টাচার্য্য।

১২৮৭। ৫ই পৌষ। কালপুর গ্রাম।

মহাশয়,

বঙ্গদর্শনে সমালোচনা দেখিয়া আপনার সরল জ্বর চিকিৎসা ১ম ভাগ ক্রয় করিয়া চিকিৎসা করিতে আরম্ভ করি। এ পর্য্যন্ত যত গুলি রোগীকে দেখিয়াছি, সকলেই আরোগ্য লাভ করিয়াছে। এরূপ সরল ভাষায় বহু মূল্য গ্রন্থ বঙ্গভাষায় কখন প্রকাশিত হয় নাই। আপনার ভাষা যেমন প্রাঞ্জল বুঝাইয়া দিবার শক্তি তেমনি অদ্বিতীয়। ঔষধ গুলি এমন অব্যর্থ যে, রীতিমত প্রয়োগ করিলে রোগী নিশ্চয়ই আরোগ্য হইবে।
২৪শে ফেব্রুয়ারি।

১৮৮৬। জলপাইগুড়ি। শ্রীদামোদরপ্রসাদ সরকার
প্রধান শিক্ষক, নর্ম্যাল স্কুল।

আপনার প্রণীত জ্বর চিকিৎসা গ্রন্থখানি আনাইয়া যে কতদূর ফল পাইয়াছি, তাহা পত্রে লেখা বাহুল্য। এ কেবল আপনকার অন্ধের হাতে যষ্টি প্রদান করা হইয়াছে। আমি ২।৩ বৎসর প্রাকৃটিস্ আরম্ভ করিয়াছিলাম মাত্র, কিন্তু সাহস ছিল না। আপনকার ধাত্রীশিক্ষা ও জ্বর চিকিৎসা এই দুই খানি পুস্তক পাওয়াতে ক্ষমতা বৃদ্ধি হইয়াছে এবং চিকিৎসার উন্নতি হইয়াছে—অধিক লেখা বাহুল্য।

১২৮৭। ১২ই আশ্বিন।
শ্রীহৃষীকেশ রায়। জগুর বাঁধ।

বৈ খানি যে প্রস্তুত করিয়াছেন, তাহাতে অল্প বুদ্ধির লোককে উত্তম মনুষ্য করিলেন। কারণ বৈ খানির এমন গুণ যে, একবার দৃষ্টি করিলে সকল কথা ও দৃষ্টান্ত সকলি স্মরণ থাকে ও বুঝিতে পারে। যাহারা পাঠ করিতে জানেন, তাঁহারাই বুঝিতে পারেন। এমন সরল বহি আর দৃষ্টি করি নাই যে, কাহার নিকট আর উপদেশ আবশ্যক করে না। অতি আশ্চর্য্য বহি হইয়াছে। অবশিষ্ট বহি খানি ত্বরায় প্রস্তুত করিবেন

তাহা হইলে পাড়াগাঁয়ের লোকের যে কতদূর উপকার করিলেন, তাহা আমার এক মুখে বলা যায় না। ১২৮৭। ৩১শে শ্রাবণ।

শ্রীপ্রাণনাথ শর্ম্মণঃ, সাং দোস্ত।

বৈ খানি আদ্যোপান্ত পড়িয়া দেখিলাম যে, এ বৈ খানি জ্বর চিকিৎসা না বলিয়া এখানি জীবনরক্ষক বলিয়াই আমার বিশ্বাস হইল। আপনি যেমন ধাত্রী-শিক্ষা করিয়া প্রসূতিদিগের প্রাণ বাঁচাইবার উপায় করিয়াছেন; শরীর পালন দ্বারা যেমন রোগের হস্তে না পড়িতে হয়, তাহার উপায় করিয়া দিয়াছেন। সেইরূপ সরল জ্বরচিকিৎসা করিয়া বঙ্গবাসীদিগকে, শুধু বঙ্গবাসী কেন, সর্ব্ব দেশী লোকেরই জীবন রক্ষার উপায় বিধান করিয়াছেন। এমন উপকারী বৈ, যে পড়িতে জানে সেই বুঝিতে পারিবে এবং রোগের হাত এড়াইবার উপায় করিতে পারিবে। এমন বৈ হয় না, হইবে না। আপনার নিকট আমরা চিরকাল কৃতজ্ঞতা পাশে বদ্ধ থাকিলাম। এ বৈ প্রচার করিয়া আপনি আমাদিগকে ভাল চিকিৎসক করিলেন। এ জ্বরচিকিৎসা অন্ধের হাতে যষ্টি। বাঙ্গালীর ধন প্রাণ রক্ষক। ১২৮৭। ২রা পৌষ।

শ্রীনবদ্বীপচন্দ্র রায়। নসরৎপুর।

পরম শ্রদ্ধাস্পদ শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায়
মহাশয় সমীপেষু।

মহোদয়!

বলিতে পারি না আপনার জন্ম কি শুভক্ষণেই হইয়াছিল! আপনিই দুস্থা বঙ্গমাতার প্রকৃত প্রিয় সন্তান! আপনিই প্রকৃত বঙ্গের সুস্থতার জন্য উৎসৃষ্ট জীবন! রুগ্ন বঙ্গবাসীদিগের আপনিই প্রকৃত সহায়! আপনিই তাহাদিগের অসুস্থতা-মরুভূমির মধ্যে সুশীতল আশ্রয় পাদপের তুল্য! ইহা অতুল আনন্দের বিষয় যে আপনার লেখনী বিনির্গত সুধারসে এই বঙ্গদেশ প্লাবিত হইয়া ম্যালেরিয়া-পীড়িত বঙ্গবাসী সকলকে পুনর্ব্বার জীবনীশক্তি প্রদান করিতেছে। বলিতে কি, যে ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র অশিক্ষিত নির্ধন পল্লিতে প্রতিবৎসর চিকিৎসাভাবে শত

শত লোক অকালে কালগ্রাসে পতিত হইত এবং ভীষণ শ্মশানের ন্যায় দর্শকের হৃদয়ে যাহা অনুভূত হইত, তাহা এক্ষণে আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসার গুণে অতীব স্বাস্থ্যকর রূপে প্রতীয়মান হইতেছে! যেখানে চিকিৎসকের নাম গন্ধও ছিল না, সামান্য হাতুড়ীয়ারা যেখানে যমের দ্বিতীয় অবতারের ন্যায় বিরাজ করিত, সেই স্থানে এক্ষণে আপনার "সরল জ্বর-চিকিৎসা" প্রকৃতই ভিষক বেশ ধারণ করিয়া উক্ত স্থানস্থ পীড়িত নির্ধন ব্যক্তিদিগের জীবনের প্রধান উপায় হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এবং যেন স্বীয় পবিত্র হস্ত দ্বারা উক্ত নিরুপায় ব্যক্তিদিগকে আশ্বাস প্রদান করিতেছে! সুতরাং যমোপম হাতুড়িয়াদিগের সুকরাল মূর্ত্তিসকল দূরীভূত হইয়া তৎপরিবর্ত্তে আপনার 'সরল স্বাস্থ্যদায়িনী-ব্যবস্থা-সুধাপায়ী' বঙ্গীয় যুবকগণ বিরাজমান! যে অঞ্চলে বা যে গ্রামে একটী ডাক্তারও ছিল না, তথায় গ্রামে গ্রামে ডাক্তার! ঘরে ঘরে "সরল জ্বর-চিকিৎসা"। নেটিব ডাক্তারদিগের গর্ব্ব সত্যই চূর্ণ হইয়াছে! আপনার ছাত্রেরা "সরল জ্বর-চিকিৎসা" রূপ অব্যর্থ ব্রহ্ম-অস্ত্র প্রদান করিয়া দুর্দ্দান্ত জ্বররূপ-অসুর নিধনে সক্ষম!! (মহাশয়! আমরা আপনার নিশ্চয়ই ছাত্র বা শিষ্য হইয়া আপনাকে গুরু বলিয়া মানিয়া লইয়াছি!) সুতরাং আপনিই তাহাদের পসার কমিল। ভিজিট কুড়াইবার দিন গেল! দেশের গরিবগণের ধনপ্রাণ রক্ষার উপায় হইল! কাজে কাজেই বলি আপনিই বঙ্গমাতার প্রিয় পুত্র! যথার্থ পুত্রের কার্য্য করিছেন।

"এই বঙ্গ-ভূমি-পরে,
সুযশঃ সমীর ভরে।
উড়ুক সঘনে তব কীর্ত্তির নিশান!
করুন সুদীর্ঘ জীবী সর্ব্বশক্তিমান্।"

পোষ্ট মৌড়েশ্বর, জেলা বীরভূম। প্রণতঃ ছাত্র
ভায়া—সিন্থিয়া, লোক চিকিৎসালয়। শ্রীরামব্রহ্ম রায় (শর্ম্মা)।

OPINION ON

SARALA JWARA-CHIKITSA

—(•:•:•)—

THE best allopathic treatise written in Bengali during the year, was Babu Jadunath Mukherji's *Sarala Jwara Chikitsa*, part I, or Simple Treatment of Fever. The manner in which the subject is treated is such as to make it useful alike to laymen and to the members of the medical profession, and its chief value seems to consist in the cognisance it makes of the circumstances of the different classes of the Indian people, and of the different condition of village and city life in this country in prescribing diet and the other details of treatment for fever. *Bengal Administration Report*, 1880-81, *page* 456.

Babu Jadunath Mukherji has rendered an eminent service to this country by the many useful medical works he has already written in

Bengali. His *Sarir Palan* is the best Sanitary Primer used in the Schools of Bengal. The work under notice is another admirable contribution made by him to Bengali medical literature. It is a treatise describing the treatment of fever. We cannot help confessing that we have read the treatise with a feeling of unmixed delight and admiration. We have not seen another exposition of a scientific subject so simple, so lucid, so entertainig, so free from scientific heaviness. Dr. Jadu Nath has evidently faculty for popularising medical science such as few in any country possess. The work has another important feature. In describing the treatment of fever, it takes due notice of differences in rank and wealth, and the different conditions of town life and village life in this country. It is a work of rare merit, creditably got up.

Calcutta Review for July 1883.

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা

পুরাণ (ক্রণিক) ব্রংকাইটিস্

প্রায় সকল ব্যামোই দু রকম—নূতন আর পুরাণ

নূতন আর পুরাণ ব্যামোতে তফাত কি

নূতন ব্যামো ক্রমে পুরাণ পড়িয়া যাইতে পারে।

আবার অনেক ব্যামোর গোড়া থেকেই পুরাণ ভাব হইতে পারে ...

সরল

জ্বর-চিকিৎসা

প্রথম ভাগ

আমাদের দেশে সচরাচর দু রকম জ্বর দেখা যায়। ইংরিজিতে এই দু রকম জ্বরকে ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট আর রিমিটেণ্ট ফীবার বলে। বৈদ্যরা এই দু রকম জ্বরকে বিষম-জ্বর বলেন। ম্যালেরিয়া (এক রকম দুষ্ট বাষ্প—বাতাস) এই দু রকম জ্বরের আসল কারণ। আজ কাল ডাক্তারেরা ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবারের বাঙ্গালা সবিরাম-জ্বর, আর রিমিটেণ্ট ফীবারের বাঙ্গালা স্বল্পবিরাম-জ্বর, করিয়াছেন। এ রকম অনুবাদ মন্দ হয় নাই। এতে বেশ অর্থবোধ হয়। এই জন্যে, আমরা ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবারের বদলে সবিরাম-জ্বর, আর রিমিটেণ্ট ফীবারের বদলে স্বল্পবিরাম-জ্বর বলিব।

সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বর, এই দুই রকম জ্বরের প্রভেদ সকলে বেশ জানে না। এই প্রভেদ বেশ জানা না থাকায়, অনেক জায়গায় ঠিক চিকিৎসা হয় না। এই জন্যে, এই দু রকম জ্বরের প্রভেদ এখানে আগেই মোটামুটি বলিলাম।

সবিরাম-জ্বরের আর স্বল্পবিরাম-জ্বরের প্রভেদ —— সবিরাম-জ্বরে জ্বর একবারে ছাড়ে, জ্বর ছাড়িলে রোগী আপনাকে বেশ সচ্ছন্দ বোধ করে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে জ্বর একবারে ছাড়ে না. একটু কম হয় মাত্র, তার পর আবার জ্বরের প্রকোপ হয়, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসে। মোটা কথায়, সবিরাম-জ্বরে গা ঠাণ্ডা হইয়া আবার জ্বর আসে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে গা ঠাণ্ডা হয় না, গায়ে তাত কমে মাত্র, তার পর আবার গায়ের তাত বাড়ে।

এ ছাড়া সবিরাম-জ্বরের সূত্রপাতে কম বা বেশী শীত হয়। চাদর বা উড়ুনী গায়ে দিয়া কারো শীত ভাঙে, কারো বা লেপ মুড়ি দিলেও শীত ভাঙে না। এ রকম বেশী শীত হইয়া যে জ্বর আসে, সেই জ্বরকে কম্পজ্বর বলে। কম্পজ্বরকে ডাক্তরেরা এগিয়ু বলেন। এই শীত গেলেই গায়ের তাত বাড়ে আর দাহ হয়, গায়ে কাপড় সয় না। এই জন্যে, লেপ দিয়া চাপিয়া ধরিয়াও যার শীত নিবারণ হইতেছিল না, সে এখন উড়ুনি খান পর্য্যন্ত গায়ে রাখিতে পারে না। গায়ের এই রকম তাত আর দাহ কয় ঘণ্টা প্রায় সমান থাকে। তার পর ক্রমে কমে। জ্বর ছাড়িবার আগে কপালে, নাকে, ওষ্ঠের উপর, গলায়, বুকে বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়। এই ঘাম ক্রমে ক্রমে সর্ব্বাঙ্গে দেখা দেয়। শেষে এত ঘাম হয় যে, রোগীর পরণের কাপড়, গায়ের কাপড়, মাথার চুল, সব ভিজিয়া যায়। রোগী যেন একবারে নেয়ে উঠে। সব রোগীর সমান ঘাম হয় না। কারো বেশী হয়, কারো কম হয়। কিন্তু সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িবার আগে

ঘাম হইবেই হইবে। ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে গায়ের তাত ক্রমে কমিতে থাকে। শেষে গায়ের তাত আর কিছুই থাকে না। ঠিক সহজ গায়ের মত হইয়া যায়। এই রকম সহজ গা কয় ঘণ্টা থাকিয়া, আবার ঐ রকম করিয়া জ্বর আসে। যখন জ্বর হয়, তখনই জ্বরের ঐ রকম তিনটী অবস্থা ঘটে। অর্থাৎ জ্বরের সূত্রপাতে শীত বা কম্প হয়, শীত বা কম্প গেলে গায়ের তাত আর দাহ হয়, গায়ের তাত আর দাহ কমিলে ঘাম হয়। সবিরাম জ্বরে এই তিনটী ব্যাপার ঘটিতেই চায়। এই জন্যে, ডাক্তরেরা বলেন, এ জ্বরের তিনটী অবস্থা—আর প্রত্যেক অবস্থায় তাঁরা ভিন্ন ভিন্ন ব্যবস্থা দেন। ভাল কথায় তাঁরা শীত বা কম্পের অবস্থাকে শীতলাবস্থা, গায়ের তাত আর দাহের অবস্থাকে উষ্ণাবস্থা আর ঘাম হওয়ার অবস্থাকে ঘর্ম্মাবস্থা বলিয়া থাকেন। ঠিক চিকিৎসার জন্যে এ রকম ভাগ বিলি ভাল। এই জন্যে, এ রকম ভাগ বিলি মনে করিয়া রাখা উচিত। স্থূল কথা যে জ্বরে এই তিনটী অবস্থা স্পষ্ট ঘটে, সেই জ্বরই সবিরাম-জ্বর নিশ্চয় জানিবে।

স্বল্পবিরাম-জ্বরে ওরকম তিনটী অবস্থা স্পষ্ট ঘটে না। জ্বরের প্রকোপ হইবার আগে অল্প শীত হইতে পারে, কিন্তু কম্প কখনও হয় না। গায়ের তাত কমিবার আগে অল্প ঘাম হইতে পারে, কিন্তু পরণের কাপড়, গায়ের কাপড়, মাথার চুল ভিজিয়া যায়, এমন ঘাম হয় না। যদিই হয়, ত গা জুড়োয় না। ঘামের সময় বোধ হয়, যেন এই বার গা জুড়বে, কিন্তু ঘাম শুকাইয়া গেলে গায়ের যে তাত, সেই

তাত। ঘাম হওয়ার পর রোগী আপনাকে বেশ সচ্ছন্দ বোধ করে না।

সবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত তত বেশী হয় না, জ্বরের ভোগ কম, বিরাম বা বিচ্ছেদ কাল বেশী, কি দুই সমান সমান। স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত বড় বেশী হয়, জ্বরের ভোগ অধিক, গায়ের তাত কিছু কমে বটে, কিন্তু একটু বাদেই আবার যে সেই।

সবিরাম-জ্বরে উপসর্গ আর বিপদ কম, সুচিকিৎসা হইলে রোগী শীঘ্র সারে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে উপসর্গ আর বিপদ অনেক, সুচিকিৎসা হইলেও রোগী শীঘ্র সারে না। যখন কেউ বলে, অমুকের জ্বর-বিকারে মৃত্যু হইয়াছে, তখন স্থির করিবে যে, রোগীর স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়াছিল।

সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা সহজ। স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা সহজ নয়, রোগীর বিশেষ তদ্বির আর চিকিৎসকের বিবেচনা আবশ্যক।

অমুক আজ ছয় দিন একজ্বরি হইয়া আছে বলিলে, দিন রাতের মধ্যে তার জ্বর একবারও একটু কমে না, এ রকম মনে করা হইবে না। অবশ্যই কোন না কোন সময়ে তার জ্বরের প্রকোপ কিছু কমে, গায়ের তাতও কিছু কমে; কিন্তু সে এত কম যে, গায়ে হাত দিয়া ঠিক করা যায় না। এই জন্যে, দিন রাত জ্বরের সমান ভোগ বলিয়া বোধ হয়। ফল কিন্তু তা নয়। এ রকম জ্বর স্বল্পবিরাম-জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া, আর বগলে আর একটী যন্ত্র রাখিয়া এই জ্বরের কম বেশী ঠিক করিতে হয়।

এই যন্ত্রটী এ রকম জ্বরের চিকিৎসায় বড় আবশ্যক। আজ কাল এর ব্যবহারও খুব দেখা যায়। ইংরিজিতে এই যন্ত্র-টাকে থর্ম্মমিটর বলে। বাঙ্গালায় একে তাপমান-যন্ত্র বলা যায়। গায়ের তাপ লেশ মাত্র কমিলেও এই যন্ত্র দিয়া তা জানিতে পারা যায়। আগে এই যন্ত্রের ব্যবহার ছিল না। এই জন্যে, এ রকম জ্বরে রোগী অনেক দিন ভুগিত, আর অনেক রোগী মারাও পড়িত। এখন এ যন্ত্রের ব্যবহার যাঁরা বেশ শিখিয়াছেন, আর যাঁরা ঠিক্ চিকিৎসা করিতে পারেন, তাঁদের হাতে এ রকম রোগী বেশী দিন্ ভোগে না, আর তাঁদের হাতে রোগীর বিপদও কম।

স্বল্পবিরাম-জ্বরে নাড়ী দেখিতে ঘড়ি কম আবশ্যক নয়। গায়ের তাত লেশ মাত্র কমিলেও যেমন তাপমান-যন্ত্র দিয়া তা জানিতে পারা যায়, নাড়ীর বেগেরও কম বেশী তেমনি ঘড়ি দেখিয়া বেশ জানিতে পারা যায়। গায়ের তাত কিছু মাত্র কমিলেও নাড়ীর বেগ কিছু কমে। কিন্তু সে এত কম যে, শুদ্ধু হাত ধরিয়া দেখিয়া তা ঠিক্ করা শক্ত। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলে তা ঠিক্ করিতে পারা যায়। কিন্তু তাপমান-যন্ত্রে যেমন সূক্ষ্ম জানা যায়, আর ওর উপর যত নির্ভর করিতে পারা যায়, ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলে তেমন হয় না। তবে তাপমান-যন্ত্র দিয়া গায়ের তাতের কমি বেশী, আর ঘড়ি দেখিয়া নাড়ীর বেগের কমি বেশী ঠিক্ করাই ভাল। এতে দুটী প্রধান বিষয়েরই (গায়ের তাত আর নাড়ীর বেগ) ঠিক্ রাখা হয়। এই জন্যে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায় তাপমান-যন্ত্র আর ঘড়ি বড় দরকার। এমন কি

নৈলে নয়। অল্প খরচেই এই দুটী দ্রব্য সংগ্রহ করিতে পারা যায়। ৫।৬ টাকায় তাপমান-যন্ত্র পাওয়া যায়। আজ কাল ১০।১৫ টাকায় ঘড়ি কিনিতে পাওয়া যায়। এক বারে এত টাকা খরচ করিতে যাঁরা না পারেন, তাঁরা প্রথমে যেন শুদ্ধ তাপমান-যন্ত্রই কেনেন। শুদ্ধ এতেই তাঁদের কাজ চলিবে। তার পর সুবিধা হইলে ঘড়ি কিনিতে পারেন। কিন্তু এটি জানিয়া রাখুন ঘড়ি নৈলে চলে, তাপমান-যন্ত্র নৈলে চলে না। সব চিকিৎসকেরই যেন এটী বেশ মনে থাকে।

যখন গায়ে হাত দেওয়া যায়, তখনই গায়ের সমান তাত। যখন নাড়ী দেখা যায়, তখনই নাড়ীর সমান বেগ। এতে কাজেই যে বলিতে হয়, দিন রাত জ্বরের সমান ভোগ। এমন জ্বরে কুইনাইন কেমন করিয়া দেওয়া যায়? এই রকম ভ্রমে পড়িয়া কি চিকিৎসক, কি বাড়ীর লোক, রোগীকে মিছামিছি ভোগান। তাপমান-যন্ত্র কাছে থাকিলে এ রকম ভুল হইতে পারে না। সকালে, দুপরে, সন্ধ্যায়, রাত্রে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিলে, গায়ের তাতের কমি বেশী ছাপা থাকে না।

সবিরাম-জ্বরে তাপমান-যন্ত্রেরও দরকার নাই; ঘড়িরও দরকার নাই। শীত করিয়া বা কম্প দিয়া জ্বর আসা, আর ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়া, মেয়েরা পর্য্যন্ত বুঝিতে পারে।

সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বর, দুয়েরই কুইনাইন্ মহৌষধ। সবিরাম-জ্বরে কুইনাইন্ ব্রহ্মাস্ত্র বলিয়া সকলেই জানেন। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্বরেরও যে কুইনাইন্ মহৌষধ,

সকলে তা জানেন না। জানেন না বলিয়াই স্বল্পবিরাম-জ্বরে রোগী এত ভোগে। গা ঠাণ্ডা না হইলে কুইনাইন্ দিতে নাই—এ সংস্কার সাধারণের ত আছেই, চিকিৎসকদেরও মধ্যে বেশ আছে। এই জন্যে, স্বল্পবিরাম জ্বরে সময় মত কুইনাইন্ না পাইয়া অনেক রোগী মারা পড়ে। কুইনাইন্ না পাইলে জ্বর আর উপসর্গ ক্রমেই বাড়িতে থাকে, শেষে রোগী মারা যায়। আমার বিবেচনায় কুইনাইন্ থাকিতে সবিরাম-জ্বরে আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে রোগীর মৃত্যু হওয়া উচিত নয়। এই দু রকম জ্বরে কি নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, এর পর বিশেষ করিয়া বলিব।

সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্বল্পবিরাম-জ্বর কম ঘটে। সবল ব্যক্তিদের সচরাচর সবিরাম-জ্বর হয়। রোগা আর দুর্ব্বল লোকদের সচরাচর স্বল্পবিরাম-জ্বর হয়। সবিরাম-জ্বরে গুরুতর উপসর্গ প্রায়ই ঘটে না। স্বল্পবিরাম-জ্বরে গুরুতর উপসর্গ প্রায় সর্ব্বদাই ঘটে।

এখন বোধ করি, পাঠকবর্গ সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বর, এ দু রকম জ্বরের প্রভেদ আর স্বভাব এক রকম মোটামুটি বুঝিতে পারিবেন। এদের প্রভেদ আর স্বভাব মোটামুটি বুঝিতে পারিলে, চিকিৎসাও বেশ সহজে বুঝিতে পারিবেন।

তাপমান-যন্ত্র দ্রব্যটা, কি, আর এ কেমন করিয়া ব্যবহার করিতে হয়, এখন তাই বলিব। এ যন্ত্রটার ব্যবহার বেশ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। নৈলে, শক্ত জ্বরের চিকিৎসায় চিকিৎসক অপ্রতিভ হইতে পারেন।

তাপমান-যন্ত্র—ছোট একটী কাচের নল, দুই মুখই বন্ধ। এর গোড়ার দিকে ডুগডুগির মাজার মত দুটী খাঁচ আছে। গোড়ার খাঁচটীর নীচে পারা থাকে। নলটী ধরিয়া দেখিলে এইগুলি বেশ দেখা যায়। তার পর যদি বেশ ঠাউরে দেখ, তবে নলের মধ্যে সরু একটী শাদা রেখা নীচের খাঁচ থেকে (পারার উপর থেকে) বরাবর নলের আগা পর্য্যন্ত চলিয়া গিয়াছে, দেখিতে পাইবে। নলটী আড় করিয়া আলোতে ভাল করিয়া দেখিলে, এই শাদা সরু রেখাটী বেশ দেখা যায়। এই সরু রেখাটী নলের ভিতরকার সরু খোল। নলের গোড়ায় তাত পাইলে এই সরু খোল দিয়া পারা উপরে উঠে। এই সরু খোল বা চুঙি দিয়া যখন পারা উপরে উঠিতে থাকে, তখন বোধ হয় ঠিক্ যেন একটী সরু কাল রেখা বা কালির দাগ উঠিতেছে। আলোতে ধরিলে এই কাল রেখাটী বেশ দেখা যাইবে বলিয়া, এর পেছন দিক্‌টি অর্থাৎ নলের বেড়ের প্রায় অর্দ্ধেক খানি শাদা। নলের গায়ে ছোট বড় অনেকগুলি দাগ কাটা। ছোট নলগুলিতে ৯৫ থেকে ১১০ পর্য্যন্ত ১৬টা বড় দাগ আছে। বড় নলগুলিতে ৯০ থেকে ১১৫ পর্য্যন্ত ২৬টা বড় দাগ আছে। এই দাগ গুলির এক একটীকে ইংরিজিতে ডিগ্রী বলে। বাঙ্গালায় ডিগ্রীকে অংশ বলা যায়। যেমন ১০০র দাগে পারা উঠিলে তাত ১০০ ডিগ্রী বা ১০০ অংশ হইয়াছে বলি। দুটী দুটী বড় দাগের মধ্যে চারিটী করিয়া ছোট দাগ আছে। এই ছোট দাগের এক একটী এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ ভাগের এক ভাগ। যেমন ১০০র

দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিলে, তাত ১০০ ডিগ্রী বা অংশ আর এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ ভাগের দু ভাগ হইয়াছে বলি। ছোট চারিটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিলে, ১০০ ডিগ্রী বা অংশ আর এক ডিগ্রী বা অংশের পাঁচ ভাগের চারি ভাগ হইয়াছে বলি। ছোট চারিটী দাগের উপর আর ছোট দাগ নাই, বড় একটি দাগ আছে। এই দাগে পারা উঠিলে তাত ১০১ ডিগ্রী বা অংশ হইয়াছে বলি। এই রকম করিয়া হিসাব করিতে হইবে। চারিটী অন্তর একটা বড় দাগের গায়ে অঙ্ক লেখা আছে। ছোট দাগ গুলির গায়ে কিছুই লেখা নাই।

তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিবার নিয়ম—রোগীর বগলে তাপমান-যন্ত্র রাখিয়া তার গায়ের তাত পরীক্ষা করিতে হয়। রোগীর বগলে দিবার আগে তাপমান-যন্ত্রের গোড়াটি তোমার হাতের মুঠোর মধ্যে খানিক ক্ষণ রাখিবে। তার পর, হাতের তাত পাইয়া ৯৫ ডিগ্রী বা অংশ পর্য্যন্ত পারা উঠিলে, যন্ত্রটী রোগীর বগলে বেশ জুত করিয়া দিবে। কাপড় দিয়া আগে বগল মুচিয়া ফেলা চাই। বগলে যন্ত্রটী এমনি জুত সরাত করিয়া রাখিতে হইবে যে, ওর ঠিক্ গোড়াটী (অর্থাৎ যার মধ্যে পারা আছে) যেন বগলের মধ্যে থাকে, আর বগল থেকে না পড়িয়া যায়। পড়িয়া গেলে কি ক্ষতি, তা বুঝিতে পারিতেছ। রোগীর পরীক্ষা ত হইলই না, লাভের মধ্যে যন্ত্রটী ভাঙ্গিয়া গেল। এই জন্যে চিকিৎসকেরও খুব সাবধান হওয়া চাই, রোগীরও খুব সতর্ক হওয়া চাই।

রোগী যদি শুইয়া থাকে, তবে তাকে কাইত হইয়া শুতে

বলিবে। সে কাইত হইয়া শুলে তার বগলে তাপমান-যন্ত্র ঐ রকম সাবধানে রাখিতে বলিবে। ডাইন পাশে শোয় ত বাঁ বগলে, আর বাঁ পাশে শোয় ত ডাইন বগলে যন্ত্র দিবে। রোগী যদি বসিয়া থাকে, তবে বগলে যন্ত্র রাখিয়া তাকে এক হাত দিয়া ওর আগাটা ধরিয়া রাখিতে বলিবে। ডাইন বগলে যন্ত্র দেও ত বাঁ হাত দিয়া ধরিতে বলিবে। আর বাঁ বগলে যন্ত্র দেও ত ডাইন হাত দিয়া ধরিতে বলিবে। এ রকম সাবধান হইলে যন্ত্রটা ভাঙ্গিয়া যাইবার ভয় থাকিবে না।

প্রাচীন কি বড় কাহিল রোগীর বগলে তাপমান-যন্ত্র খুব সাবধানে রাখিতে হইবে। কেন না, তাদের বগলের মধ্যে খোল, খুব সতর্ক হইয়া হাত দিয়া ধরিয়া না রাখিলে, বগল থেকে যন্ত্র পড়িয়া যাইতে পারে! এই জন্যে, এ রকম রোগীর পরীক্ষার সময় এ কথাটা যেন মনে থাকে।

তাপমান-যন্ত্র বগলে ১০ মিনিট রাখিবে। তারপর ঠাউরে দেখিবে পারা কতদূর উঠিয়াছে। কত ডিগ্রা উঠিয়াছে, আর তার উপর কয়টা ছোট দাগ ছাড়াইয়াছে, বেশ করিয়া দেখিয়া তবে বগল থেকে যন্ত্র লইবে। কেন না, বগল থেকে যন্ত্র লইলেই পারা নামিতে আরম্ভ করে; কাযেই তখন কিছুই ঠিক্ করিতে পারা যায় না। এই রকম, যন্ত্রের অনেক অসুবিধা। কেন না, রোগীর বগলে যন্ত্র থাকিতে, পারা কত দূর উঠিয়াছে ঠিক করা চাই, নৈলে পরে ঠিক্ করা যায় না। আগে এই রকম যন্ত্রের ব্যবহার ছিল।

আজ কাল্ আমরা যে যন্ত্র ব্যবহার করিয়া থাকি, তাতে ও অসুবিধা নাই। বগলে দশ মিনিট্ রাখিলে পারা যেখানে

উঠে, বগল থেকে যন্ত্র লইলেও পারার খানিকটে, যেন একটু ছোট কালির কসি সেই খানেই থাকে। সে পারা টুকু ঘা দিয়া নীচে নামাইয়া না দিলে আর নামে না। যত দিন না নামাইয়া দিবে, তত দিন সেই খানেই থাকিবে। যন্ত্র পুনরায় ব্যবহার করিবার সময়, অর্থাৎ আবার সেই রোগীর কি অন্য রোগীর বগলে দিবার সময়, ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত ঐ পারা টুকু ঘা দিয়া নামাইয়া দিতে হইবে। যন্ত্রের গোড়াটা ডান্ হাতে মুটো করিয়া ধরিয়া বাঁ হাতের তেলোয় একটু জোরে বার কতক ঘা দিলে, পারা টুকু ঐ পর্য্যন্ত নামিয়া আসিবে। যতক্ষণ ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত না নামিবে; ততক্ষণ ঐ রকম করিয়া ঘা দিবে। কিন্তু যন্ত্রের গোড়া যেন হাতের মুটোর বাহিরে না থাকে, থাকিলে হাতের তেলোয় জোরে ঘা লাগিলে ভাঙ্গিয়া যাইতে পারে। ঐ রকম ঘা দিয়া ঐ পারা টুকু ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত নামাইবে। তার পর, আগের মত হাতের তাত দিয়া নীচের পারা ৯৫র দাগ পর্য্যন্ত উঠাইবে। নীচে থেকে পারা উঠিয়া উপরকার পারা টুকুর সঙ্গে মিলিলে, যন্ত্র রোগীর বগলে দিবে। বেশ ঠাউরে দেখিলে জানিতে পারিবে যে, উপরকার পারা টুকুর সঙ্গে নীচের পারা একবারে মিলিয়া যায় না। দুয়ের মধ্যে একটু ফাক থাকে। এই ফাক টুকু বাতাস। বাতাস টুকুর জন্যে উপরকার পারা টুকু নীচে নামিতে পারে না। যেখানে উঠে, সেই খানেই থাকে। যন্ত্রের গোড়ায় তাত লাগিলে নীচে থেকে পারা উঠিয়া উপরকার পারা টুকুকে ঠেলিয়া উপরে লইয়া যায়। তার পর বগল থেকে যন্ত্র লইলে নীচের

পারা ক্রমে ক্রমে একবারে নামিয়া পড়ে। কিন্তু উপরকার পারা টুকু যেখানকার, সেই খানেই থাকে। ঐ বাতাস টুকুর জন্যে নামিয়া পড়িতে পারে না। বগলে যন্ত্র রাখিয়া যখন দেখিবে যে, পারা অনেকক্ষণ এক জায়গায় আছে, আর উঠিতেছে না, তখনই বগল্ থেকে যন্ত্র লইবে। মোটামুটি দশ মিনিট রাখিলেই হয়।

শিশুদের পীড়ায় আরও সাবধানে তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার করিতে হয়। তারা সহজেই চঞ্চল ; পীড়া হইলে তারা বড় খিট্‌খিটে হয়। বগলে কোন্ মতেই যন্ত্র রাখিতে দেয় না। ফেলিয়া দিতে কি হাত দিয়া ধরিতে নিয়ত চেষ্টা করে। এই জন্যে অনেক ভুলিয়ে ভালিয়ে তাদের বগলে যন্ত্র রাখিতে হয়। যতক্ষণ বগলে যন্ত্র থাকিবে, ততক্ষণ তার হাত দুখানি কৌশল করিয়া ধরিয়া রাখিবে। আর তার বাউর উপর হাত দিয়া বগল চাপিয়া রাখিবে।

সহজ গায়ের তাত ৯৮ৣ ডিগ্রী বা অংশ। সহজ মানুষের বগলে তাপমান-যন্ত্র দশ মিনিট রাখিলে, ৯৮র দাগ ছাড়াইয়া পারা ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠে ; তার উপরে আর উঠে না। সব সহজ মানুষেরই যে গায়ের তাত সমান, তা নয়। যদি পাঁচ জন সহজ মানুষের গায়ের তাত অমনি করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে যে কারো গায়ের তাত ৯৮, কারো ৯৮ৠ, কারো ৯৮ , কারো ৯৮ৣ কারো বা ৯৯ ডিগ্রী বা অংশ। এই জন্যে সহজ মানুষের গায়ের তাত গড়ে ৯৮ৣ ডিগ্রী বা অংশ স্থির করা হইয়াছে। সহজ মানুষের গায়ের তাত মনে করিয়া রাখা

চাই। নৈলে, জ্বরে গায়ের তাত কত বাড়িল, কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? যে দাগে পারা উঠিলে সহজ গায়ের তাত বুঝায়, সেই দাগে একটী বড়্সা আঁকা আছে। চিকিৎ-সকদের সুবিধার জন্যে এ দাগটীতে এ রকম চিহ্ন দেওয়া হইয়াছে। এ চিহ্নটী থাকায় সহজ গায়ের তাত ভুল হয় না। দাগ গুলি ঠাউরে দেখিলে ৯৮র দাগের উপর ছোট দুয়ের দাগে ঐ চিহ্নটী দেখিতে পাইবে।

৯৯র দাগের উপর পারা উঠিলে, কিন্তু ১০০র নীচে থাকিলে, অল্প জ্বরভাব ঠিক্ করিবে। ১০০র দাগে পারা উঠিলে স্পষ্ট জ্বরভাব স্থির করিবে ১০০র উপর যত উঠিবে, জ্বরের ততই প্রকোপ ঠিক্ করিবে। ১০২র কিম্বা ১০৩র দাগে পারা উঠিলে, জ্বর খুব বেশীও নয়, কমও নয় স্থির করিবে। ১০৩র দাগ ছাড়াইয়া পারা যত উপরে উঠিবে, ততই ভারি জ্বর হইয়াছে জানিবে। এর পর এ সব ভাল করিয়া বলিব।

ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাড়ি দেখিতে হয়, এখন তাই বলিব। সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে গড়ে ৭২ বার পড়ে। সকলের নাড়ী সমান চলে না। যদি পাঁচ জন সহজ মানুষের নাড়ী ঘড়ি ধরিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে দেখিবে যে, কারো নাড়ী প্রতি মিনিটে ৮০ বার, কারো ৭৫ বার, কারো ৭২ বার, কারো ৭০ বার, কারো বা ৬৫ বার পড়ে। এই জন্যে, সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে গড়ে ৭২ বার পড়ে বলিয়া স্থির করা হইয়াছে। এটী মনে

করিয়া রাখা চাই। নৈলে, জ্বরে নাড়ীর বেগ কত বাড়িল, কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে?

গায়ের তাতের সঙ্গে নাড়ীর বেগের একটী বেশ সম্বন্ধ আছে। এই সম্বন্ধটী চিকিৎসকদের মনে করিয়া রাখা উচিত। গায়ের তাত এক ডিগ্রী বা অংশ বাড়িলে, "প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০ বার বেশী পড়ে। যেমন, গায়ের তাত ৯৯ ডিগ্রী বা অংশ হইলে, প্রতি মিনিটে ৭৫ বার নারী পড়ে। গায়ের তাত ১০০ ডিগ্রী হইলে, প্রতি মিনিটে ৮৫ বার নাড়ী পড়ে। গায়ের তাত ১০১ ডিগ্রী হইলে, প্রতিমিনিটে ৯৫ বার নাড়ী পড়ে। গায়ের তাত ১০২ ডিগ্রী হইলে, প্রতি মিনিটে ১০৫ বার নাড়ী পড়ে। তাপমান-যন্ত্র বগলে রাখিয়া আর ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া প্রায় এই রকম ফল পাবে।

অনেক কারণে নাড়ীর বেগের ইতর-বিশেষ ঘটে (যেমন চিন্তা হইলে, দুঃখ হইলে, বা রাগ হইলে নাড়ীর বেগের ইতর-বিশেষ ঘটে)। কিন্তু গায়ের তাতের সে রকম ইতর-বিশেষ ঘটে না। এই জন্যে, জ্বরের চিকিৎসায় গায়ের তাতের উপরই বেশী নির্ভর করা উচিত। আর এই জন্যেই, ঘড়ির চেয়ে তাপমান-যন্ত্র এত আবশ্যক।

ইণ্টর্মিটেণ্ট্ ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা।

কম্প বা শীত—গিয়া দেখিলে রোগীর কম্প দিয়া জ্বর

আসিয়াছে। দুটো লেপ চাপা দিয়া এক জন ধরিয়া রাখিয়াছে, তবু কম্প নিবারণ হইতেছে না। এ অবস্থায় কি করিবে? একবার ভাবিয়া দেখিবে, কিসে এ কম্প নিবারণ হয়। কম্প নিবারণ করিবার কত গুলি উপায় জানি।

(১) গরম জলের টপে রোগীকে খানিক ক্ষণ গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসিতে দিলে কম্প তখনই নিবারণ হয়, আর রোগী বড়ই আরাম বোধ করে। যথার্থই কম্প নিবারণের এমন উপায় আর নাই! কিন্তু ঘরে যদি গরম জল তয়ের থাকে, আর বড় গামলা বা টপ থাকে, তবেই এ ব্যবস্থা হইতে পারে। নৈলে যে আনিতে নিতেই সময় যাবে। গরিব দুঃখীদের বাড়ীতে ত এ ব্যবস্থা হইতেই পারে না।

(২) গরম জলের টপে বসাইবার কোনও উপায় নাই। এখন কি করিবে? ভাবিয়া দেখিবে, আর কিসে শীত নিবারণ হয়। গরম জলের বোতল উপর-পেটে অর্থাৎ বুকের কড়ার নীচে, দুই বগলে দুই উরুতের মাঝখানে, দুই হাতের তেলোয়, আর দুই পারের তেলোয়, খানিক ক্ষণ ধরিয়া রাখিলে বেশ শীত ভাঙে। এখানেও গরম জল দরকার, তবে অল্প বলিয়া শীঘ্র প্রস্তুত হইতে পারে। এক বগুনো বা এক পাতলে গরম জল করিতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না। বোতল বা শিশিতে গরম জল পুরিয়া কাৰ্ক আঁটিয়া দিবে। তার পর, বোতল বা শিশির গায়ে ন্যাকড়া জড়াইয়া উপর-পেটে, দুই বগলে, দুই উরুতের মাঝ-খানে, দুই হাতের তেলোয় আর দুই পায়ের তেলোয় ধরিয়া রাখিবে।

জলটা খুব গরম হওয়া চাই, নৈলে শীঘ্র জুড়াইয়া যাইবে, আর ভাল শীতও ভাঙিবে না।

(৩) ঘরে বোতল কি শিশি যদি না থাকে ত কি করিবে? চারি খান পাতলা ইট আগুনে তাতাইয়া তাতে অম্নি করিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া দুই হাতের তেলোয়, দুই উরতের মাঝ-খানে, আর দুই পায়ের তেলোয় ধরিয়া রাখিলে বেশ শীত ভাঙে। ঐ রকম গরম গরম আর ন্যাকড়া জড়ান আর দুই খান ইট লেপের মধ্যে দুই পাঁজরে ধরিয়া রাখিলে আরও ভাল হয়।

(৪) রোগীর বাড়ীতে কি তার নিকটে যদি ইট না পাওয়া যায় ত কি করিবে? বালি ভাজিয়া সেই তপ্ত বালি দুই তিন পুরু কাপড়ে বড় একটা পুঁটলি করিবে। এই পুঁটলি দিয়া উপর-পেটে, দুই উরতে, দুই পায়ের তেলোয়, দুই হাতের তেলোয়, আর দুই বগলে, আর পাঁজরে সেক দিবে। ঐ রকম গোটা আষ্টেক পুঁটলি একবারে তয়ের করিতে পারিলেই ভাল হয়। তা হইলে সেক দিবার বেশ সুবিধা হয়। হাতে, পায়ে, উরতে, বগলে, পাঁজরে ও পেটে একবারে সেক পায়। বালি শীঘ্র জুড়াইয়া যায়, এই জন্যে, বারে বারে বালি ভাজিয়া লইতে হয়। এক প্রস্ত বালি ভাজিতে থাকিবে, আর এক প্রস্ত ভাজা বালি দিয়া সেক দিতে থাকিবে। ভাজা বালির এ রকম সেক সব গৃহস্থেরই বাড়ীতে ঘটিতে পারে।

(৫) কম্বল কি কাঁথা আগুনে তাতাইয়া সেই তপ্ত কম্বল কি কাঁথা দিয়া রোগীর সব গা ঢাকিয়া দিবে। তার উপর

লেপ, কাঁথা, কি আর কোন মোটা কাপড় চাপা দিবে। এতেও বেশ শীত নিবারণ হয়।

তার পর দেখিবে, কম্প নিবারণের এই পাঁচটী উপায় ছাড়া আর কোনও যুক্তি আছে কি না? আছে। রোগীর পেটে কোনও গরম জিনিষ পড়িলে তার শীত ভাঙিতে পারে। গরম দুধ, গরম জল, কি গরম চা, খানিক খানিক খাওয়াইয়া দিলে বেশ শীত ভাঙে, আর রোগী আরাম বোধ করে। সব গৃহস্থের বাড়ী চা থাকে না। কাজেই, সব জায়গায় গরম চা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করা যায় না। শুদু গরম জল খাওয়া কষ্ট গা ন্যাকার ন্যাকার করে। আবার শুদু গরম দুধ খাইলেও পেট ভার হয়। এই জন্যে, একভাগ গরম দুধ আর তিন ভাগ গরম জল একত্র মিশাইয়া বারে বারে খাইতে দিবে। চা-ই হোক্, আর জল-মিশনো দুধই হোক্, খুব গরম গরম খাওয়া চাই। যতক্ষণ কম্প বা শীত থাকিবে, ততক্ষণ মাঝে মাঝে গরম চা বা গরম দুধ খাওয়া চাই। এক এক বারে খানিক খানিক চুমুক দিয়া খাইবে। হাতে, পায়ে, উরুতে, বগলে, গায়ে এই রকম সেক বা তাত পাইলে, আর পেটে গরম চা বা গরম দুধ পড়িলে, কম্প বা শীত অনেক ক্ষণ থাকিতে পারে না, শীঘ্রই যায়।

কম্প না হইয়া যদি সামান্য শীত বোধ হয়, তবে বেশী কিছুই করিতে হইবে না। মোটা তোয়ালে কি শুক্‌নো মোটা গামোচা দিয়া গা খুব জোরে ঘষিয়া ফেলিলে ও রকম শীত শীত ভাব দূর হইয়া যায়। এই রকম করিয়া গা ঘষিয়া গরম জামা, গরম কাপড়, বা শাদা মোটা কাপড় গায়ে দিবে।

তার পর, এক বাটী গরম চা, কি গরম দুধ (ঐ গরম জল-মিশানো) চুমুক দিয়া খাবে।

এই মুষ্টিযোগ গুলির মধ্যে যেখানে যেটী সুবিধা, সেখানে সেইটি খাটাইবে। তার পর, একবার ভাবিয়া দেখিবে, খাওয়াইলে কম্প নিবারণ হয়, এমন কোন অসুদ আছে কি না। আছে। লডেনম্ (আফিঙের আরোক) খাওয়াইলে কম্প নিবারণ হয়। কম্প আরম্ভ হইতেই, কি কম্প আরম্ভ হওয়ার পরেও আধছটাক জলের সঙ্গে ৭০।৭৫ ফোটা* লডেনম (টিংচর ওপিয়াই) খাওয়াইয়া দিলে শীঘ্রই কম্প নিবারণ হয়। কম্প নিবারণ ছাড়া, এতে আর একটা বিশেষ উপকার হয়। জ্বরের ভোগ আর যাতনা কম হয়। যে অসুদ একবারে খাওয়াইলে কম্প নিবারণ হয়, জ্বরের ভোগ আর যাতনা কম হয়, সে অসুদটা মনে করিয়া রাখা উচিত। এতে জ্বরের ভোগ কমুক না কমুক, যাতনা ত নিশ্চয়ই কমে। এ অসুদের এমন গুণ আছে জানিতে পারিলে, চিকিৎসক না দিলেও রোগী অসুদ চাহিয়া খায়।

ছেলেদের কম্প আসিতেই টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) আর সোপ লিনিমেণ্ট সমান ভাগে মিশাইয়া তাদের পিঠের

* ১৮ বছরের উপর যাদের বয়স, তাদেরই পক্ষে এই মাত্রা। ১২ বছরের উপর আর ১৮ বছরের নীচে যাদের বয়স, তাদের পক্ষে অর্দ্ধেক মাত্রা। ১২ বছরের কম বয়স হইলে এ অসুদ খাওয়াইবে না, তার বদলে পিঠের দাঁড়ায় লডেনম্ আর সোপ লিনিমেণ্ট সমান ভাগে মিশাইয়া মালিশ করিবে।

দাঁড়ায় মালিশ করিলে কম্প নিবারণ ত হয়ই, অনেক জায়গায় জ্বর আসাও বারণ হয়।

মুষ্টিযোগেই হোক্, আর অসুদ খাওয়াইয়াই হোক, যত শীঘ্র পার, কম্প নিবারণ করিবে। কেন না, কম্প অনেক ক্ষণ থাকা ভাল নয়। এ ছাড়া কম্পকে সহজ জ্ঞান করা হইবে না। যদি কম্প বেশী হয়, আর অনেক ক্ষণ থাকে, তবে অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। কম্পের সময় গায়ের উপরকার রক্ত সব শরীরের ভিতরে চলিয়া যায়। এই জন্যে, হাত পা এত ঠাণ্ডা হয়। আর হাত দেখিলে নাড়ী এত সরু আর কম জোর বোধ হয়। শরীরের মধ্যে যে রক্ত চলিয়া যায় বলিলাম, রক্ত কোথায় যায়? শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, সেই সব যন্ত্রের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। পিলের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। যকৃতের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। যাকে মেটে, পাত, বা অগ্রমাস বল, তাকেই ভাল কথায় যকৃৎ বলে। ফুক্কোর মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। ফুক্কোর ভাল কথা ফুস্ফুস। মাথার মগজের মধ্যে গিয়া রক্ত জমা হয়। মগজের ভাল কথা মস্তিষ্ক। কম্প অনেক ক্ষণ থাকিলে, কাজেই এই সব যন্ত্রের মধ্যে রক্তও অনেক ক্ষণ জমিয়া থাকে। কম্প গেলে ক্রমে ক্রমে সব যন্ত্র থেকে রক্ত গায়ের উপরে ফিরে আসে। পিলে আর পাত, এই দুই যন্ত্রে সব চেয়ে বেশী রক্ত জমা হয়। এই জন্যে কম্পের সময় এই দুই যন্ত্রের আকার সব চেয়ে বড় হয়। কম্প গেলে আর আর সব যন্ত্র আগের মত হয়, কিন্তু পিলে আর ঠিক আগের মত হয় না, একটু বড় থাকে। এই রকম করিয়া

যত বার কম্প হয়, প্রতি বারেই পিলে আর পাত একটু করিয়া বাড়িয়া যায়। শেষে এত বড় হয় যে, নাই পর্য্যন্ত বা তার নীচেও নামে। পিলে, পাত কেবল বাড়ে এমন নয়, অনেক জায়গায় খুব শক্তও হয়। পিলে পাত শক্ত হইলে শীঘ্র সারে না। ছোট ছেলেদের পাত শক্ত হইলে প্রায়ই তারা মারা যায়। এ সব এর পর বেশ করিয়া বলিব।

তাতেই বলিতেছি, কম্প যদি বারে বারে না হইতে দেও, আর অনেকক্ষণ না থাকিতে দেও, তবে পিলে পাত কখনই অত বাড়িতে পারে না—শক্তও হয় না। এ কি কম সুবিধার কথা? শুদ্ধু এক কম্প নিবারণ করিই চিকিৎসক কত কাজ করিলেন।

কম্পের সময় উপসর্গ—বারে বারে কম্প হইলে যে কেবল পিলে পাতই বাড়ে আর শক্ত হয়, এমন নয়। কখন কখন তার চেয়েও ভারি রকম অপকার হয়। যথাঃ—

১। অনেক জায়গায় দেখা যায়, কম্প দিয়া জ্বর আসিল আর রোগী অচৈতন্য হইয়া গেল। বিশেষ তদ্বির না করিলে রোগীর আর চৈতন্য হয় না। শীঘ্রই মারা যায়।

২। মৃগি রোগে যেমন খেঁচুনি হইয়া থাকে। কম্প দিয়া জ্বর আসিলে কারো কারো সেই রকম খেঁচুনি হয়। কম্প দিয়া জ্বর আসিলে অনেক ছেলে-পিলের তড়কা হয়। একে তড়কাও বলে, দড়কাও বলে। বেশী রকম জ্বর হইলে কচি ছেলে পিলের প্রায়ই তড়কা হয়। কোন

কোন ছেলের কম্প দিয়া জ্বর আসিতেই তড়্‌কা হয়। আবার কোন কোন ছেলের গায়ের তাত খুব বাড়িলে তড়্‌কা হয়।

৩। কম্প দিয়া জ্বর আসিলে কেহ কেহ যেন মূর্চ্ছা যাওয়ার মত হয়, অর্থাৎ ঠিক্ যেন ভ্রমি যায়।

৪। কম্প দিয়া জ্বর আসিলে কারো কারো হাতে পায়ে ভারি খাল্‌ ধরে।

১। কম্প দিয়া জ্বর আসিল আর রোগী অচৈতন্য হইয়া গেল—এ অবস্থায় কি করিবে? হাত, পায়ে, বগলে, উপর-পেটে, উরতে যে রকম করিয়া সেক দিবার কথা আগে বলিছি, সেই রকম সেক দিবার ব্যবস্থা ত করিবেই। তা ছাড়া, দু পায়ের ডিমে দুখান, আর দুপায়ের তেলোয় দুখান রাইয়ের পলস্তারা দিবে। রাইয়ের পলস্তারাকে ইংরাজিতে মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টর বলে। মাষ্টার্ড প্ল্যাষ্টর বলিলে আজ কাল ব্যবসায়ী অব্যবসায়ী প্রায় সকলেই বুঝিতে পারেন। তার পর, মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিবে। শুদু হিম জলে সরু ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া মাথায় পটি করিয়া দিলেও হয়। এক ভাগ ওডিকলোঁ আর আট ভাগ হিম জল একত্র মিশাইয়া তাতে সরু ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া মাথায় দিলেও হয়। ১ ঔন্স মিয়ুরিয়েট অব্‌ য়্যামোনিয়া (নিশেদল), ১ ঔন্স রেক্‌টি-ফাইড্‌ স্পিরিট্, আর ৭ ঔন্স হিম জল একত্র মিশাইয়া, তাতে সরু ন্যাকৃড়া ভিজাইয়া মাথায় দিলে সব চেয়ে ভাল হয়। এতে মাথা বড় ঠাণ্ডা হয়। একে ইংরাজিতে ইবা-পোরেটিং লোশন্ বলে। জ্বর-বিকারে রোগীর মাথা ঠাণ্ডা

করিবার এটা বড় অসুদ। এ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, সকলেরেই জানিয়া রাখা উচিত। আর এ তয়ের করাও বড় সহজ। যথাঃ—

মিয়ুরিয়েট্ অব য়্যামোনিয়া (নিশেদল) ... ১ ড্রাম
রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ ... ১ ঔন্স
হিম জল ... ... ৭ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশি কিম্বা বোতলে রাখিয়া দেও। শিশি কিম্বা বোতলের মুখ কাক্ দিয়া আঁটিয়া রাখা ভাল। এই ভাগ বিলি মনে থাকিলে, যত খানি ইচ্ছা তত খানি আরোক তয়ের করিয়া লইতে পার।

রোগীর মাথায় জল-পটি দিতে বলিলে অনেকে এক খান মোটা ন্যাক্‌ড়া, তা কালই হোক্, আর ফর্শাই হোক্, তিন চারি পুরু করিয়া জলে ভিজাইয়া মাথায় দিয়া থাকেন। এতে উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হয়। মাথায় গরমপুল্‌টিস্ দিলেও যে ফল হয়, এ রকম তিন চারি পুরু ন্যাক্‌ড়া ভিজাইয়া মাথায় দিলেও সেই ফল হয়। কেন না, মাথা থেকে আগুনের মত যে ভাব বাহির হয়, সে ভাব ত ন্যাক্‌ড়া ফুঁড়িয়া বাহির হইতে পারে না। কাজেই, খানিকক্ষণ পরে ন্যাকড়া খানি যেন আগুন হইয়া উঠে। এতে মাথা কেমন করিয়া ঠাণ্ডা হইতে পারে, বুঝিতেই পারিতেছ। এ রকম ভুল গৃহস্থের ত হয়ই। অনেক চিকিৎসকেরও হয়। এই জন্য, চিকিৎসক যখন রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার ব্যবস্থা করিবেন, তখন স্পষ্ট করিয়া বলিয়া দিবেন যে, ন্যাকড়া খানি যেন ফর্শা, সরু, আর এক পুরু হয়। দু তিন পুরু

করিয়া দিলে কি অপকার হয়, তাও বলিয়া দিবেন। মাথায় জল-পটি দিয়া, তার উপর পাখার বাতাস দিলে আরও ভাল হয়। জল শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া যায়, আর মাথা ঠাণ্ডা হয়। ন্যাকড়া এক বারে শুকাইতে দেওয়া হইবে না। শুক্‌নো শুক্‌নো হইলেই আবার জল দিয়া ভিজাইয়া দিবে।

এতেও যদি চৈতন্য না হয়, তবে ঘাড়ে বেলস্তরা দিবে। বেলস্তরা দু রকম। বেলস্তরার আরোক আর বেলস্তরার পটি। বেলস্তরার আরোককে ডাক্তরেরা লাইকর লিটি বলেন। আর বেলস্তরার পটিকে এমপ্ল্যাষ্টর লিটি বলেন। দুয়েতেই ফোস্কা হয়। এই জন্যে, যেখানে যাঁর যেটি সুবিধা, সেখানে তিনি সেইটা ব্যবহার করিতে পারেন। মূল কথা, বেলস্তরা খুব তেজাল হওয়া চাই, নৈলে ফোস্কা হইবে না।

এ ছাড়া, রোগীর যদি গিলিবার শক্তি থাকে, তবে তাকে একটী অসুদ খাওয়াইয়া দিবে। সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলামঃ—

ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম	...	১৫ গ্রেন
টিংচর অব বেলাডনা	...	১০ মিনিম্‌
হিম জল ...	...	১ ঔন্স (আধ ছটাক)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখিয়া দেও। ব্রোমাইড অব পোটাশিয়ম বেশ গলিয়া গেলে, রোগীকে আরোক খানি সব খাওয়াইয়া দিবে। এই যে আরোক খানি তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা অর্থাৎ এক বার খাওয়াই-বার মত। এই মাত্রা মনে রাখিয়া, যত খানি ইচ্ছা তত

খানি অসুদ তয়ের করিতে পার। রোগীর যতক্ষণ বেশ চৈতন্য না হয়, ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এই অসুদ নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া দিবে।

এর আগেই বলিছি যে, কম্পের সময় গায়ের উপরকার রক্ত পাত, পিলে, ফুল্কো, মাথার মগজ—এই সব যন্ত্রে গিয়া জমা হয়। মাথার মগজে বেশী রক্ত জমা হইলে, রোগী অচৈতন্য হইয়া যায়। মাথার মগজ থেকে এই রক্ত নামাইবার যেমন অসুদ ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ আর বেলাডনা তেমন আর নাই। এই জন্যে, এ অসুদ দুটী সকল চিকিৎসকেরই সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত।

আমাদের দেশে গদখালি, শ্রীনগর, আর উলোর মহা-মারীর কথা সকলেই শুনিয়া থাকিবেন। অনেকেই শুনিয়া-ছেন, সে সময় ঐ সব গাঁয়ে বাড়ী বাড়ী, ঘরে ঘরে, সব মরিয়া থাকিত। কম্প দিয়া জ্বর আসিলে, যে যেখানে লেপ কাঁথা মুড়ি দিয়া শুইত, সে সেই খানেই থাকিত, আর উঠিত না। এর আগেই বলিছি যে অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, কম্প দিয়া জ্বর আসিলে রোগী অচৈতন্য হইয়া যায়। বিশেষ তদ্বির না করিলে তার আর চৈতন্য হয় না। শীঘ্রই মারা যায়। এ সব জায়গায়ও ঠিক্ এই রকম ঘটিছিল।

২। কম্প দিয়া জ্বর আসিল, আর মৃগি রোগে যেমন খেঁচুনি হইয়া থাকে, রোগী সেই রকম খেঁচিতে লাগিল। ঐ অবস্থায় কি করিবে? কি করিবে, তা পরে বলিব। সবিরাম জ্বরের শীত বা কম্পের অবস্থায় শীত বা কম্প না

হইয়া, কখন কখন এই রকম খেঁচুনি হয়। আমি একবার এই রকম খেঁচুনি দেখিছিলাম। ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইয়া তার খেঁচুনি নিবারণ করিছিলাম। শীত বা কম্প গেলে যেমন গায়ের তাত বাড়ে অর্থাৎ জ্বর ফোটে, এখানে খেঁচুনি গেলে সেই রকম গায়ের তাত বাড়িয়াছিল। এ রকম খেঁচুনি হইলে কি করিবে, এখন বলি।

ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইয়া তার খেঁচুনি নিবারণ করিবে। কিন্তু ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকান সহজ নয়। কেন না এতে রোগীর বিপদ্ আছে। ভাল জুত বরাত করিয়া, আর সাবধান হইয়া না শুঁকাইতে পারিলে রোগী মারা পড়িতে পারে। আর অনেক জায়গায় এমন মারাও পড়েছে। এই জন্যে, ক্লোরোফর্ম্মকে লোকে এত ডরায়। কিন্তু সাবধান হইয়া ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইতে পারিলে কোনও বিপদ ঘটে না।

এক খান রুমাল বা পাতলা ন্যাকড়া দু তিন পুরু করিয়া একটা ঠোঙা তয়ের কর। ময়রারা শাল-পাতের যেমন ঠোঙা তয়ের করিয়া থাকে, এ ঠোঙাও ঠিক সেই রকম করিয়া করিবে। এই ঠোঙায় এক ড্রাম (৬০ ফোটা) আন্দাজ ক্লোরোফর্ম্ম ঢালিয়া দেও। এক জায়গায় যেন ঢালিয়া দিও না—ঠোঙার মধ্যে চারি দিকে ছড়াইয়া ঢালিয়া দিবে। ঢালিয়া দিয়াই ঠোঙাটা রোগীর নাকের গোড়ায় ধর। ঠোঙা এমনি জুত করিয়া ধরিবে যে, ঠোঙার নীচে দিয়া যেন নাকে বাতাস যাইতে পারে। খানিক ক্ষণ ঠোঙাটা এই রকম করিয়া রাখ। তার পর ঠোঙা

তুলিয়া শুঁকিয়া দেখ। যদি ক্লোরোফর্ম্মের গন্ধ ভাল রকম না পাও, তবে, আর ড্রাম খানেক ক্লোরোফর্ম্ম ওতে ঐ রকম করিয়া ঢালিয়া দেও। যত ক্ষণ খেঁচুনি থাকিবে, তত ক্ষণ এই রকম করিয়া ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইবে। ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইবার সময়, রোগীর মাথা এক জন ধরিয়া রাখিলে ভাল হয়।

ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকিলে সব রকম খেঁচুনি নিবারণ হয়। মৃগির খেঁচুনি, হিষ্টিরিয়ার* খেঁচুনি, এমন কি, ছেলেদের তড়কা পর্য্যন্ত নিবারণ হয়।

ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইয়া খেঁচুনি নিবারণ হইলে, রোগীর যদি সহজেই জ্ঞান হয় ত ভালই।। নৈলে, রোগী অচৈতন্য হইলে, যে যে রকম করিতে হয়, এর আগে বলিছি, ঠিক সেই রকম করিবে।

কম্পের সময় যদি কোন ছেলের তড়্‌কা হয়, তবে তার দু পায়ের ডিমে দুখান রাইয়ের পলস্তরা (মষ্টার্ড প্ল্যাষ্টর) দিবে। আর গাড়ু বা ঘটি করিয়া হিম জল উচু থেকে সরু ধারে মাথায় উপর নিয়ত ঢালিবে। এ ছাড়া চোকে মুখে হিম জলের আছড়া বারে বারে দিবে। যতক্ষণ খেঁচুনি থাকিবে, তত ক্ষণ এই রকম করিবে। ছেলের গলা পর্য্যন্ত কাপড় চোপড় দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া, মাথায় ঐ রকম করিয়া জল ঢালিলে আরও ভাল হয়। খেঁচুনি গেলে হাতে, পায়ে, বগলে গরম জল-পোরা শিশির তাত নিয়ত

* হিষ্টিরিয়াকে বৈদ্যেরা গুল্ম-বায়ু (বাই গোলা) বলেন। এ রোগ স্ত্রীলোকদেরই হয়। পুরুষেরও কখন কখন হইয়া থাকে।

লাগাইবে। মাথা কামাইয়া হিম জলের পটি দিবে। জল যত হিম হয়, ততই ভাল। মাথায় যে পটি দিবে, তা সরু আর এক পুরু হওয়া চাই। এর আগেই এ সব বেশ করিয়া বলিছি। ন্যাকড়ার জল শীঘ্র শীঘ্র শুকাইয়া দিবার জন্যে মাথার উপর আস্তে আস্তে পাখার বাতাস দিবে। গলা থেকে পা পর্য্যন্ত মোটা কাপড় চোপড় দিয়া বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখা চাই। শিশুর চৈতন্য হইলে, অর্থাৎ অসুদ গিলিতে পারিবে এমন বোধ হইলে, তাহাকে একটী অসুদ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

আয়োডাইড অব্ পোটাসিয়ম্	...	...	৩ গ্রেণ
ব্রোমাইড অব্ পোটাসিয়ম্	...	...	১০ গ্রেণ
টিংচার অব বেলাডনা	...	...	৩ মিনিম্
সিরপ অব্ জিঞ্জর	...	...	২০ মিনিম্
ডিল ওয়াটার বা মৌরি-ভিজের জল		...	৬ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে করিয়া রাখ। এই যে আরোক খানি তয়ের করিলে, এ ছয় মাত্রা অর্থাৎ ছয় বার খাওয়াইবার মত। এক এক বারে ছয় ভাগের এক ভাগ করিয়া খাওয়াইবে। সুবিধার জন্যে, শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া লইবে। এক এক বারে এক এক দাগ ঢালিয়া খাওয়াইয়া দিবে। এক বছরের ছেলের পক্ষে এই মাত্রা। ছেলের বয়স বুঝিয়া অসুদের মাত্রার ইতর-বিশেষ করিবে। বয়স বুঝিয়া অসুদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয়, এর পর বেশ করিয়া বলিব।

তড়্কা হইবে কি না, ছেলের ভাব ভঙ্গি দেখিয়া অনেক

বুঝা যায়। আগে বুঝিতে পারিয়া যদি সাবধান হইতে পার, তবে ছেলের তড়্কা হওয়া নিবারণ করিতে পার। তড়্কা হইবার আগে ছেলে থেকে থেকে চম্‌ক্যে উঠে। মুখ চোকের ভাব দেখে বোধ হয়, ছেলে যেন কোন রকম ভয় পাইয়াছে। চোক চেয়ে থাকিতে পারে না। চোকের কোণ খুব রাঙা হয়। হাতের তেলো, পায়ের তেলো হিম হয়। গলা আর কপাল খুব গরম হয়। মাথার মধ্যে দিয়া যেন ভাপ উঠিতে থাকে। এই গুলিরমধ্যে, থেকে থেকে চম্‌ক্যে উঠাই তড়্কা হওয়ার নিশ্চয় চিহ্ন জানিবে। তড়্কা হওয়ার ঠিক আগেই ছেলে ঘন ঘন চম্‌কায়, আর বেশী চম্‌কায়। এই লক্ষণগুলি দেখিলেই ঠিক করিবে যে ছেলের নিশ্চয়ই তড়্কা হবে। এইগুলি দেখিলে, দেরি না করিয়া ছেলের দু পায়ের ডিমে দু খান মাষ্টার্ড বসাইয়া দিবে। পলস্তারা উঠিয়া না যাইতে পারে, এই জন্যে ওর উপর বেশ করিয়া ন্যাকড়া জড়াইয়া দিবে। তার পর হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়, দু বগলে গরম জল-পোরা শিশির তাত দিবে। শিশির গা যদি বড় গরম হয়, তবে তাতে ন্যাকড়া জড়াইয়া হাতে, পায়ে, বগলে দিবে। নৈলে, ফোস্কা পড়িবে। তার পর, ছেলের মাথা কামাইয়া দিবে। মাথা কামান হইলে, হিম জলে সরু ন্যাকড়া ভিজাইয়া মাথায় পটি করিয়া দিবে। তার পর উপরের লিখিত আরোক এক দাগ করিয়া দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

মাষ্টার্ডের জ্বালা ধরিলে, ছেলের সে রকম ভাব ভঙ্গি আর থাকে না। সে রকম থেকে থেকে আর চমক্যে উঠে

না। আর সে রকম অঘোর হইয়াও থাকে না। বেশ চৈতন্য হয়। সে রকম আর চোক বুজিয়া থাকে না। ফল কথা তড়্কা হইবার আর ভয় থাকে না। আধ ঘণ্টার বেশী মাষ্টার্ড রাখিবার দরকার নাই। অর্থাৎ খুব জ্বালা ধরিলেই ও তুলিয়া ফেলিবে। যদি বল, জ্বালা ধরিয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিতে পারিব। খুব ছোট ছেলে ত আর বলিতে পারিবে না। ছেলে যদি কাঁদে, বারে বারে পা নাড়ে আর বারে বারে জ্বালার জায়গায় হাত দেয় বা পলস্তারা খুলিয়া ফেলিতে চায়, তা হলেই জালা ধরিয়াছে ঠিক করিবে। ছেলে একটু বড় হয় ত সে নিজেই জ্বালার কথা বলিবে। মাষ্টার্ড তুলিয়া ফেলিয়া গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া সেই দুই জায়গা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেলিবে। তার পর, ওর উপর নারিকেলের তেল দিয়া দিবে। অলিব অইল্ অর্থাৎ স্নুইট্ অইল্ দিতে পার ত আরও ভাল।

পায়ের ডিমে মষ্টার্ড দিলে আর মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি বসাইলে, মাথার মগজের রক্ত নামিয়া আসে। এই জন্যে তড়্কা হইবার ভয় যায়। এটী সকলেরই মনে রাখা উচিত। এই সঙ্গে উপরের লিখিত আরোক, অর্থাৎ আয়োডাইড অব্ পোটাসিয়ম্ আর ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম্ ঘটিত আরোক, ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে আরও ভাল হয়। তড়্কা হইবার ভয়টা এক বারেই যায়। এক বছরের ছেলেকে যে মাত্রা দেওয়া যায়, এখানে সেই মাত্রাই লিখিয়া দিইছি। বয়স বুঝিয়া মাত্রার ইতর-বিশেষ করিবে।

৩। **কম্প** দিয়া জ্বর আসিল, আর রোগী যেন মূর্চ্ছা অর্থাৎ ভ্রমি যাওয়ার মত হইল—এ অবস্থায় কি করিবে? হাতে, পায়ে, বগলে, উপর পেটে, উরতে যে রকম করিয়া সেক দিবার কথা আগে বলিছি, সে রকম সেক ত দিবেই। তা ছাড়া, রোগীকে একটী অসুদ বারে বারে খাওয়াইবে। অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া	...	২০ মিনিম্
ব্রাণ্ডি (একের নম্বর)	... ...	২ ড্রাম
অল্প গরম জল	... ...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দেও। যতক্ষণ রোগী চাঙ্গা না হইবে, ততক্ষণ আধ ঘণ্টা অন্তর কি এক ঘণ্টা অন্তর এই অসুদ খাওয়াইবে। অসুদ যদি বারে বারে তয়ের করিতে না চাও, তবে ছয়বার খাওয়াইবার মত অসুদ একবারে তয়ের করিয়া লইবে। এখন যে আরক খানি তয়ের করিলে, সে এক মাত্রা অর্থাৎ একবার খাওয়াইবার মত। এই মাত্রা মনে রাখিয়া, যত বারের ইচ্ছা, অসুদ তয়ের করিয়া লইতে পার।

৪। কম্প দিয়া জ্বর আসিল আর রোগীর হাঁতে পায়ে ভারি খাল্ ধরিতে লাগিল—এ অবস্থায় কি করিবে? দুই বগলে আর উপর-পেটে ঐ রকম করিয়া সেক দিবার ব্যবস্থা ত করিবেই। তা ছাড়া শুঁঠের গুঁড়ো দিয়া হাত পা খুব জোরে ঘষিয়া দিতে বলিবে। আর যেখানে যেখানে খাল ধরিবে, সেখানে সেখানে খুব জোরে টানিয়া দিতে বলিবে। খানিক ক্ষণ এই রকম করিলেই খাল ধরা ক্ষান্ত হইবে।

৫। জ্বর আসিবার আগে কখন কখন মাথার কামড়, হাত পায়ের কামড়, কিম্বা বাউ-শূলের জন্যে রোগী অস্থির হয়। এই সময় যদি সে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খায়, তবে খানিক পরে তাহার হাত পায়ের কামড় ত যায়ই; জ্বর আসাও বারণ হয়। যাঁর কুইনাইন খাওয়া অভ্যাস আছে, তাঁর ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইলে ভাল হয়।

৬। কম্পের সময় কখন কখন রোগীর সকল গা আর চোক হলুদ বর্ণ হয়। যকৃতে (যাকে পাত বা মেটে বল) বেশী রক্ত জমা হয় বলিয়া এমন ঘটে। কম্প গেলে, এ রকম হলুদ-বর্ণ ক্রমে কমিয়া যায়।

৭। কম্পের সময় কখন কখন রোগীর আমরক্ত ভেদ হয়। অন্ত্রের (যাকে আঁত বল) মধ্যে বেশী রক্ত জমা হইলে, এমন ঘটে। কম্প গেলে এ উপসর্গ ক্রমে যায়।

কম্পের সময় কখন কখন যে যে উপসর্গ হয় বলিলাম, জ্বর ফুটিলেও কখন কখন সেই সব উপসর্গ হইয়া থাকে। এর পর এ সব বেশ করিয়া বলিব।

সম্প্রতি আমার কম্পজ্বর হইয়াছিল। কম্প আসিতেই দশ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইলাম। কুইনাইন্ খাইয়া তাড়াতাড়ি গরম জামা গরম মোজা পরিলাম। তার পর, তিন চারি খান কম্বল গায়ে দিয়া শুইলাম। তার পর, খুব গরম চা এক বাটি চুমুক দিয়া খাইলাম। এই রকম করায় কম্প শীঘ্রই গেল। আর এতে বিশেষ লাভ হইল এই যে জ্বর আর বড় ফুটিতে পারিল না। জ্বরের যে একটা কষ্ট তাও বড় হইল না। তেমন গাত্রদাহও হইল না, পিপাসাও

হইল না। কম্প গেলে, খানিক পরে বিন্দু বিন্দু ঘাম হইতে লাগিল। এই সময়ে বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০১র দাগে উঠিল। এর পর আর পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইলাম। কুইনাইন্ খাওয়ার খানিক পরেই খুব ঘাম হইতে লাগিল। ঘণ্টা খানেক পরে বগলে আবার তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ৯৯র দাগ ছাড়াইয়া ছোট তিনটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। খানিক পরেই গায়ের তাত সহজ হইল।

এখানে কম্প এত শীঘ্র গেল কেন? কম্পের পর জ্বর বেশী ফুটিতে পারিল না কেন? জ্বরে দাহ, পিপাসা প্রভৃতি যে সব কষ্ট হইয়া থাকে তা হইল না কেন? আর জ্বর অত শীঘ্রই বা ছাড়িয়া গেল কেন? কম্প আসিতেই দশ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াছিলাম বলিয়া, এই সব সুবিধা হইছিল। নৈলে, কম্প জ্বরে যে তিনটী অবস্থা যে নিয়মে ঘটিয়া থাকে, তাই ঘটিত। আর জ্বরের যে অসুখ, তাও এড়াইতে পারিতাম না। কম্প আসিতেই যে দশ গ্রেন্ কুইনাইন খাইয়াছিলাম, সেই কুইনাইন যেমন ধরিল (কানের মধ্যে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হওয়া কুইনাইন ধরার চিহ্ন), অমনি একটু একটু গ্রীষ্ম বোধ হইতে লাগিল। গ্রীষ্ম বোধ হইলে কম্প আর কোথায় থাকে?

ম্যালেরিয়া-জ্বরের পক্ষে কুইনাইন যথার্থই ব্রহ্মাস্ত্র। ম্যালেরিয়া-জ্বরে জুত বরাত করিয়া সময় মত কুইনাইন খাওয়াইতে পারিলে, রোগী কখনও মারা পড়ে না।

কম্প নিবারণের জন্যে যতই কেন কর না, রোগীর কিছু-

তেই* এক বারে শীত ভাঙে না*। ও ত আর সহজ শীত নয় যে, লেপ কাঁথা চাঁপা দিলে, আর হাতে, পায়ে, গায়ে তাত দিলে শীত ভাঙিবে। ও যে রোগের শীত। তা যদি না হবে, তবে গায়ের এত তাত, তার উপর আবার এত শীত! এ দিকে হাত পা এত ঠাণ্ডা, আর রোগী শীতে থর্-থর্ করিয়া কাঁপিতেছে, কিন্তু বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখ, পারা ১০৫র দাগে উঠিবে, কখন কখন তা ছাড়াইয়াও উঠিবে। তবে, এর আগে যেমন বলিছি, হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়, দুই বগলে, উপর-পেটে, আর দুই উরতের মধ্যে ঐ রকম সেক পাইলে, আর খুব গরম গরম চা কিম্বা জল-মিশন দুধ (খুব গরম) এক বাটি চুমুক দিয়া খাইলে, রোগীর তত কষ্ট থাকে না। কম্প আর বেশী হইতে পারে না আর বিস্তর ক্ষণ থাকেও না। এ ছাড়া, এ রকম করায়, কম্পের সময় শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্রে রক্ত গিয়া জমা হয়, সে সব যন্ত্র থেকে রক্ত শীঘ্র ফিরিয়া আসে। এইটীই এর বিশেষ উপকার জানিবে। কম্পের সময় সব যন্ত্রে রক্ত জমা হইয়াই না অনিষ্ট করে। সে অনিষ্ট যদি না হইতে দিলে, ওবে ঢের করিলে। কিন্তু কম্প আসিতেই কুইনাইন খাইয়া এই গুলি করিলে আরও ভাল হয়। আমার নিজের দৃষ্টান্ত দিয়া এর আগেই তা বলিছি।

এখানে একটি রোগীর কথা বলি। মাস খানেক হইল, একটী পোআতির চিকিৎসা করিছিলাম। উপরো উপরি

* কেবল গরম জলের টপে গলা পর্য্যন্ত ডুবাইয়া থাকিলে, তখনই শীত ভাঙে।

তার দু দিন কম্প দিয়া জ্বর আসে। বাড়ীর লোক তাতে বড় একটা মনোযোগ করেন নাই। তিন দিনের দিন বেলা ৯টার সময় যেমন কম্প দিয়া জ্বর আসিল, আর পোআতি অচৈতন্য হইয়া গেল। আট মেসে পোআতি কম্প জ্বরে এই রকম অচৈতন্য হইয়া গেল দেখিয়া, গৃহস্থের চৈতন্য হইল। বেলা ৪টার সময় যখন দেখিলেন যে পোআতি ক্রমেই খারাপ হইতে লাগিল, তখন তাড়াতাড়ি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। সন্ধ্যার একটু আগে আমি গিয়া দেখিলাম পোআতি অস্থির; নিয়ত হাত পা ছুড়িতেছে, বালিশ বিছানা, লেপ ধরিয়া টানিতেছে। দু জন স্ত্রীলোক তাকে ধরিয়া রাখিতে পারিতেছে না; হাত পা সব গা ঠাণ্ডা যেন পাথর। হাতের তেলো, পায়ের তেলোও তেমনি বা তার চেয়েও ঠাণ্ডা*। নাড়ী অমনি সুতর মত বোধ হইতে লাগিল। হাত দেখিবার সময় আমার জামার হাতা এমনি জোরে ধরিছিল যে, আমি তা সহজে ছাড়াইতে পারি নাই। পোআতির এই অবস্থা দেখিয়া তার যে রকম চিকিৎসা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

তার হাতে, পায়ে, বুকে, পাঁজরে, শুঁঠের গুঁড়ো খুব করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম। বাজার থেকে শুঁঠ এনে ঘরে তার গুঁড়ো তয়ের করিতে দেরি হবে। সে দেরি এখানে সৈবে না বলিয়া ডিস্পেনসরি থেকে তখনই এক পোআ আন্দাজ শুঁঠের গুঁড়ো কিনিয়া আনিতে বলিলাম।

---

* হাতের তেলো, পায়ের তেলো এই রকম ঠাণ্ডা হওয়া সন্নিপাতের চিহ্ন।

দুই বগলে গরম-জল-পোরা দুটি শিশি বা বোতল রাখিতে বলিলাম। গুলের আগুনে ন্যাকড়া তাতাইয়া, হাতে, পায়ে সকল গায়ে বেশ করিয়া সেক দিতে বলিলাম। যত ক্ষণ হাত, পা, সব গা বেশ গরম না হইয়া উঠিবে, ততক্ষণ ঐ রকম করিয়া শুঁঠের গুঁড়োর মালিশ, আর আগুনের সেক করিতে বলিলাম। বুকের বাঁ দিকে অর্থাৎ যেখানে হাত দিলে বুক ধুড়্ধুড় জানিতে পারা যায়, সেই খানে শুঁঠের গুড়ো বেশ করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম। খাওয়াইবার দুটি অসুদ দিলাম। একটি, নাড়ী ভাল করিবার জন্যে। আর একটী, চৈতন্য করিবার জন্যে। অসুদ দুটী নীচে লিখিয়া দিলাম। যথাঃ—

নাড়ী ভাল করিবার জন্যে।

য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া	...	২ ড্রাম
স্পিরিট অব ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক ঈথর)	...	২ ড্রাম
ব্রাণ্ডি (একের নম্বর)	...	১½ ঔন্স
টিংচর সিংকোনি কো ...	...	৩ ড্রাম
টিংচর ডিজিটেলিস্ ...	...	½ ড্রাম
সিরপ অব জিঞ্জর ...	...	৬ ড্রাম
য়্যাকুই য়্যানিথাই (ডিল ওয়াটর)	...	৩ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে করিয়া রাখ। এই যে আরোক খানি তয়ের করিলে, এ ছয় মাত্রা অর্থাৎ ছয় বার খাওয়াইবার মত। এক এক বারে ছয় ভাগের এক ভাগ করিয়া খাওয়াইবে। সুবিধার জন্যে, শিশির গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া লইবে। এই অসুদ এক এক দাগ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে বলিলাম। এই অসুদটাকে ষ্টিমুলেণ্ট

ছাড়া, আর একটা লেপ তার গায়ে দিয়া দিলাম। এক ঘণ্টার মধ্যেই কম্প, শীত সব গেল। আর জ্ঞানেরও কোন তফাত হইল না।

কাল যে কম্প তিন চারি ঘণ্টা ছিল; যে কম্পে পোআতি এক বারে অচৈতন্য হইয়া গিইছিল; আর যে কম্পের শেষে তার নাড়ী অমন ছিন্ন ভিন্ন, আর তার অমন দুর্দ্দশা হইছিল; আজ সে কম্পে তার কিছুই করিতে পারিল না কেন? আর সে কম্প এত শীঘ্রই বা গেল কেন? সে বিষম কম্পের হাতে পোআতিকে আজ কে বাঁচাইল? কুইনাইন্। ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইনকে কি সাধে ব্রহ্মাস্ত্র বলি? ম্যালেরিয়া-জ্বরে যে অবস্থাতেই কেন কুইনাইন্ দেও না, উপকার হবেই হবে। অপকার কখনও হবে না। কুই-নাইন্ থাকিতে ম্যালেরিয়া-জ্বরে জীবন নষ্ট হওয়া উচিত নয়। এর পর, এ সব বেশ করিয়া বলিব।

কম্প দিয়া জ্বর আসার কথা পড়িতে পড়িতে এই যে পোআতির বৃত্তান্তটী পড়িলে এতে কিছু শিখিলে কি না? যদি ভাবিয়া দেখ ত অনেক শিখিলে। গোড়া থেকে ধর। (১) কম্প দিয়া জ্বর আসা অর্থাৎ ম্যালেরিয়া-জ্বর সহজ ব্যাপার নয়। একে সহজ জ্ঞান করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা কখনই উচিত নয়। এতে না ঘটিতে পারে, এমন বিপদই নাই। অতি অল্পে জীবন নষ্ট হইয়া থাকে; আর হয়ও। (২) জ্বরে এই রকম সান্নিপাতিক বিকার হইলে মোটামুটি কি করিতে হয়, তাও শিখিলে। (৩) কম্প দিয়া জ্বর আসিলেও কুইনাইন্ খাওয়াইলে উপকার হয়। এমন কি, অনেক

জায়গায় রোগীর জীবন রক্ষা করা হয়। এখানে কম্পের সময় কুইনাইন্ দেওয়াতেই ত পোআতির জীবন রক্ষা হইছিল। জ্বরের উপর কুইনাইন্ খাওয়াইয়া অনেক জায়গায় বাঁকা জ্বর সোজা করিছি। জ্বরের ভোগ কমাইয়া দিইছি। জ্বরে বেশী উপসর্গ হইতে দিই নাই। আর রোগীকে শীঘ্রই চাঙ্গা করিছি। এর পর, এ সব বেশ করিয়া বলিব। শীঘ্র কাজ করিবে বলিয়া এমন তর জায়গায় শুদ্ধ কুইনাইন্ না দিয়া, কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ দিবে— যেমন এখানে দিইছিলাম।

কম্প আসিবার খানিক আগে, অর্থাৎ ঘণ্টা দুই আগে, কুইনাইন্ খাইতে পারিলে কোনও উৎপাত হইতে পারে না।

যদি বল, জ্বর হইবে কি না, কেমন করিয়া জানিতে পারিব। তা জানিবার সঙ্কেত আছে। কোন খানে কিছু নাই, অমনি কম্প দিয়া জ্বর আসিল—এ রকম প্রায় ঘটে না। জ্বর হইবার আগে অনেক রকম অসুখ হয়। গা মাটি মাটি করে; কোন কাজ করিতে ইচ্ছা হয় না; বারে বারে হাই উঠে আলিস্যি ছাড়িতে হয়; আড়া মোড়া ভাঙিতে হয়; শুয়ে থাকিতে ইচ্ছা করে; হাতে পায়ে বল থাকে না, আর হাত পা যেমন কুকুরে চিবুতে থাকে। এই গুলি জ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিবে। এই পূর্ব্ব-লক্ষণ গুলি না মানিয়া যদি দস্তুর মত স্নান, আহার কর ত নিশ্চয়ই জ্বরে পড়িবে। আহার করিতে ভর সয় না। শরীরের এ অবস্থায় স্নান করিবা মাত্র কম্প দিয়া জ্বর আসে। আর এই সকল পূর্ব্ব-

লক্ষণ জানিতে পারিয়া যদি ১০ গ্রেন্ কুইনান্ খাও, গায়ে বেশ করিয়া কাপড় দেও, কোন পরিশ্রম না কর, রৌদ্রে না বেড়াও, জলে না ভেজ, স্নান আহার না কর, আর খুব গরম গরম একবাটি চা বা জল-মিশনো দুধ (বেশ গরম) চুমুক দিয়া খাও, তবে জ্বরের হাত নিশ্চয়ই এড়াইতে পার। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বরের যে রকম উপদ্রব, তাতে এ নিয়মটী সকলেরই যত্ন করিয়া মনে রাখা উচিত।

কারো কারো জ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষণ এমন ঠিক্ জানা আছে যে, সে বলিতে পারে যে আমার আজ, কি কাল জ্বর হবে। পায়ের ডিমে ব্যথা, বাউ-শূলনো, পায়ের গোছের রেঁায়ার গোড়ায় ব্যথা—এই কয়টী লক্ষণের একটী হইলেই আমি নিশ্চয় জানিতে পারি, আমার জ্বর হইবার আর দেরি নাই। এ লক্ষণ মানিয়া যদি কুইনাইন্ খাই, ত জ্বর আসে না। না মানি ত জ্বরের হাত এড়াইতে পারি না। এ লক্ষণ না মানিলে জ্বর যে নিশ্চয়ই হয়, কুইনাইন্ না খাইয়া তা বেশ পরীক্ষা করিয়া দেখিছি।

অনেক কচি ছেলের কান কামড়াইলে হয় সেই দিনই নয় তার পর দিন জ্বর হয়। এই জন্যে, ছেলের কান কামড়াইতেছে জানিতে পারিলে, অনেক জায়গায় মা বাপে জ্বর হওয়া যেন গুণিয়া বলিতে পারেন।

গায়ের তাত বাড়া আর দাহ—কম্প গেলে রোগী আর গায়ে কাপড় রাখিতে পারে না। লেপ, কাঁতা, কম্বল, জামা যা গায়ে থাকে, সব খুলিয়া ফেলে। গায়ের তাত ক্রমে বাড়িতে থাকে। শেষে এত বাড়ে যে, বগলে তাপমান-যন্ত্র

দিলে, পারা ১০৬র দাগ পর্য্যন্ত উঠে। গায়ের এই রকম তাত যে, সব রোগীরই হয়, তা নয়। অনেক জায়গায় পারা ১০৩র দাগ ছাড়ায় না। রোগী আর বিছানায় থাকিতে চায় না। হিম মাটিতে শুতে চায়। বিছানা থেকে হাত, পা মাটিতে ছড়াইয়া দেয় (যদি মেজেতে থাকে)। হিম জল হাতে, পায়ে, গায়ে, মাথায় মাখিতে চায়। হিম জিনিশ (যেমন ফেঁরো, বাটি, থাল) হাতে করিয়া রাখিতে চায়। গায়ের দাহতে বিছানায় স্থির হইয়া থাকিতে পারে না—এ অবস্থায় কি করিবে? গাত্রদাহ কিসে নিবারণ করিবে? গাত্র-দাহ নিবারণ করিবার অতি চমৎকার অসুদ আছে। তিন ভাগ হিম জলে এক ভাগ বিনিগার (স্বকা) মিশাইয়া সেই জলে ফর্শা তোয়ালে গামোছা, বা ন্যাক্‌ড়া ডুবাইয়া নিংড়াইয়া রোগীর সব গা বেশ করিয়া মুছাইয়া দিবে। গা এমনি করিয়া মুছাইয়া দিবে যে, গায়ে যেন জলের দাগ পড়ে। অর্থাৎ তোয়ালে, গামোছা, বা ন্যাক্‌ড়া খুব জোরে নিংড়ান হইবে না; তাতে যেন একটু জল থাকে। এই রকম করিয়া বারে বারে গা মুছাইয়া দিবে। বার কতক এই রকম করিয়া গা মুছাইয়া দিলে, রোগীর গাত্র-দাহ এমনি নিবারণ হয় যে, আগুনে যেন জল পড়ে। এরকম করিয়া গা মুছাইয়া দিলে রোগী যে কি আরাম বোধ করে, তা বলা যায় না। বিনিগার যদি ঘরে না থাকে, তবে শুদ্ধ গরম জলে ঐ রকম করিয়া গা মুছাইয়া দিলেও হইতে পারে। গায়ের তাত যেমন, যে জল দিয়া গা মুছাইয়া দিবে, সে জলের তাত তার চেঁয়ে অনেক কম হওয়া চাই। নৈলে, রোগীর আরাম বোধ হবে না।

পিপাসা——ঐ রকম করিয়া, বারে বারে গা মুছাইয়া রোগীর গাত্র-দাহ নিবারণ করিলে। এখন তার পিপাসা শান্তি করিবার উপায় কি? তার মুখ-শোষ কিসে নিবারণ করিবে? গাত্রদাহ যেমন সহজে নিবারণ করিলে, পিপাসা শান্তি করিবার সেই রকম সহজ উপায় আছে। রোগীকে অন্য জল না দিয়া, এক বোতল জল তয়ের করিয়া দিবে। সেই জল সে বার কতক খাইলেই, মুখ-শোষ আর পিপাসা দুই-ই দূর হবে। মুখ শোষ আর পিপাসা শান্তি করিবার জল এই রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়ঃ—

ক্লরেট অব্ পটাশ্	... ...	১ ড্রাম।
সিট্রিক য়্যাসিড	... ...	১ ড্রাম।
হিম জল	...	২০ ঔন্স (আড়াই পোওয়া)।

একত্র মিশাইয়া একটা বোতলে বা পাথরের বাটিতে রাখিয়া দেও।

যখন জল খাইতে চাহিবে, তখনই এই জল খাইতে দিবে। একটু একটু করিয়া জল দিবার দরকার নাই। এক এক বারে আশ মিটাইয়া জল খাইতে দিবে। তাতে কোনও ভয় করিবে না। জল ফুরাইয়া গেলে, আবার জল তয়ের করিয়া লইবে। এই জল এই রকম করিয়া বার কতক খাইলে মুখ আর জিব বেশ সরস হইবে।

মাথা-ধরা—গাত্র-দাহ গেল, পিপাসা গেল। কিন্তু মাথার যাতনায় রোগী অস্থির। এখন কি করিবে? মাথার যাতনা দূর করিবার উপায় কি? মাথা-ধরা অনেক রকম। মাথার কি রকম যাতনা হইতেছে, রোগীকে জিজ্ঞাসা করিয়া ঠিক্ করিবে। নৈলে, আন্দাজে অসুদ দিলে উপকার হবে

না। বরং হিতে বিপরীত হইতে পারে। মাথার কামড় আর শূলনি যে অসুদে সারে, মাথার ভার সে অসুদে সারে না। রোগী যদি বলে, মাথার-মধ্যে যেন জিয়ল মাছে হানিতেছে, কি ছুঁচ ফুটাইতেছে, কিম্বা কটকট করিয়া কামড়াইতেছে, বা যেন চিবাইতেছে, আর সেই যাতনায় সে অস্থির হয়, তবে তাকে মাথা নাড়িয়া দেখিতে বলিবে। সে যদি বলে মাথা নাড়িলে ভার বোধ হয় না, আর তার চোক লাল না দেখ, তবে নীচে যে অসুদ লিখিয়া দিলাম, সেই অসুদ তাকে ২ ঘণ্টা অন্তর বার কতক খাইতে দিবে। দু তিন বার অসুদ খাইলে তার মাথার ও রকম যাতনা থাকিবে না। তিন বার খাওয়াইবার মত অসুদ এক বারে তয়ের করিয়া লও।

মর্ফিয়া	... ...	½ গ্রেন্ (আধ গ্রেন্)
স্পিরিট্ অব ক্লোরোফর্ম্ম		১ ড্রাম
হিম জল	... ...	৩ ঔন্স (দেড় ছটাক)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে কাগজের তিনটা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ, এক এক বারে খাইতে বলিয়া দিবে। যদি একবার অসুদ খাইয়াই মাথার যাতনা যায়, তবে আর খাইবার দরকার নাই। মাথার যাতনা যত ক্ষণ না যাবে ততক্ষণ নিয়ম মত অসুদ খাইবে। স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্মে (একে ক্লোরিক ঈথরও বলে) মর্ফিয়া গলে, অসুদ তয়ের করিবার সময় তা যেন মনে থাকে। ১ ড্রাম স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম মাপের গ্লাসে লইয়া, তাতে আধ গ্রেন্ মর্ফিয়া ফেলিয়া দেও।

একটু একটু করিয়া গ্লাসটা খানিক ক্ষণ নাড়িলে, মর্ফিয়া বেশ গলিয়া যাবে। মর্ফিয়া বেশ গলিয়া গেলে, তবে তাতে জল মিশাইবে। মর্ফিয়া ওজন করিবার জন্য ভাল নিক্তি চাই। ডিস্পেন্সরির জন্যে ভাল নিক্তিরই দরকার।

রোগী যদি বলে যে, মাথা এত ভার যেন বোঝা আর মাথার উপর যেন জলের কলসী বসাইয়া রাখিয়াছে, আর বালিশ থেকে মাথা তুলিতে ভার বোধ হয়, তবে ও অসুদ না দিয়া আর একটা অসুদ দিবে। মাথা ভার কি না, মাথা নাড়িয়া দেখিলেই তা বেশ জানিতে পারা যায়। মাথা নাড়িলে বোধ হয়, যেন দুই রগে দুই পেরেক হানা রহিয়াছে। এ রকম মাথা ভারে কিছু কম কষ্ট হয় না। বেশ জোর করিয়া তাকান যায় না। এ রকম মাথা ভারে চোক লাল হয়, আর চোকের কোণে যেন রক্ত ঢালিয়া দিয়াছে, এমনি বোধ হয়। মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে, মাথা এই রকম ভার হয়—এ অবস্থায় রোগীর মাথা মুড়াইয়া দিবে। মাথা মুড়াইয়া জল-পটি দিবে। কম্পের সময় অচৈতন্য হইলে, রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার যে রকম নিয়ম বলিয়া দিইছি, এখানেও ঠিক সেই রকম নিয়ম করিবে। তার পর, নীচে যে অসুদটি লিখিয়া দিলাম, সেই অসুদটা তাকে বার কতক খাওয়াইবে। ছয় বার খাওয়াইবার মত অসুদ এক বারে তয়ের করিয়া লইবে।

ব্রোমাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্	...	১½ ড্রাম (দেড় ড্রাম)
টিংচর অব্ বেলাডনা	...	১ ড্রাম।
হিমজল	...	৬ ঔন্স।

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া লও। যত ক্ষণ মাথার ভার না যাবে, তিন চারি ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ অসুদ খাবে। ব্রোমাইড্ অব পোটাসিয়ম্ আর টিংচর অব্ বেলডোনা, মাথার মগজ হইতে রক্ত নামাইবার চমৎকার অসুদ। এ অসুদ খাইলে আবার ঘুম আসে। ঘুম আসিলে রোগীকে ঘুমাইতে দিবে। জাগাইয়া অসুদ খাওয়াইবার দরকার নাই। ঘুম ভাঙিলে যদি বলে, মাথার ভার একেবারে যায় নাই, তবে আর এক দাগ অসুদ খাওয়াইবে।

প্রলাপ অর্থাৎ ভুল বকা——জ্বর ফুটিলে কখন কখন রোগী ভুল বকে। মাথার মগজে রক্ত জমা হইলে, রোগী এই রকম ভুল বকে। কবিরাজেরা একেই বিকার বলিয়া থাকেন। ভুল-বকা, মাথা খুব গরম হওয়া, আর দুই চোক লাল হওয়া, এই তিনটীই বিকারের লক্ষণ। এ রকম দেখিলে, তখনই রোগীর মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিবে। তার পর ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম্ আর টিংচর অব বেলা-ডনা-ঘটিত ঐ অসুদ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। ব্রোমাইড অব্ পোটাসিয়ম্ আর টিংচর অব বেলাডনা, বিকারের বড় অসুদ। বিকারের লক্ষণ গেলে, আর রোগী সহজ হইলে, এ অসুদ আর খাইয়াবে না। কেমন করিয়া মাথায় জল-পটি দিতে হয়, আর মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়, এর আগেই তা বেশ করিয়া বলিছি। এখানেও ঠিক সেই রকম করিবে। এই রকম করিয়া মাথায় জল-পটি দিলে, আর ঐ অসুদ খাওয়াইলে রোগীর বিকার কেটে যাবে। এতে যদি বিশেষ উপকার না পাও, আর রোগীর ভুল-বকা

ক্রমে বাড়ে (এ রকম কিন্তু প্রায় ঘটে না) তবে কম্পের সময় রোগী অচৈতন্য হইয়া গেলে, যে রকম যে রকম করিতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম করিবে। ঘাড়ে এক খান বেলাস্তরা, আর দুই পায়ের ডিমে দু খান মষ্টার্ড প্ল্যাষ্টর বসাইয়া দিবে। এর নিয়মও আগে বলিছি। এখানেও সেই নিয়ম করিবে।

জ্বর ফুটিলে তড়্কা—এর আগেই বলিছি, কোন কোন ছেলের কম্প আসিতেই তড়্কা হয়। জ্বর ফুটিবার আগে অর্থাৎ হাত পা ঠাণ্ডা থাকিতে তড়্কা হইলে যে রকম যে রকম করিতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। জ্বর ফুটিলে পর তড়্কা হইলেও ঠিক সেই রকম করিবে; কেবল হাতে, পায়, বগলে গরম জল-পোরা শিশির তাত দিতে হইবে না। কেন না, জ্বর ফুটিলে ত আর হাত পা ঠাণ্ডা থাকে না।

জ্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, ছেলেদের তড়্কা হইতে পারে, আর প্রায়ই হইয়া থাকে। এ কথাটা যেন সকলেরই বেশ মনে থাকে। বারে বারে চম্‌কে ওঠা যে তড়্কার পূর্ব্ব-লক্ষণ, এর আগেই তা বলিছি। আর কি উপায়ে তড়্কা নিবারণ করা যায়, আর তড়্কা হইলেই বা কি করিতে হয়, তাও এর আগে বলিছি।

গায়ের তাত বেশী হইলে ছেলেদের প্রায়ই তড়্কা হইয়া থাকে—এ কথাটা গৃহস্থদেরও খুব মনে রাখা চাই। এখানে একটী ছেলের কথা বলি। মাস দুই হইল, একটী ভদ্র লোক আমার কাছে তাঁর ছেলের জন্য ব্যবস্থা জানিতে আসিয়াছিলেন। বলিলেন, আমার ছোট ছেলেটীর (বয়স

বছর খানেক) কাল বেলা দশটার সময় ভারি জ্বর হইছিল ; গায়ের তাত বড়ই বেশী হইছিল। যত ক্ষণ গায়ের তাত ছিল, ছেলে কেবল চম্‌কে চম্‌কে উঠেছে। তার পর, রাত্রি দশটা বেজে গেলে গা জুড়াইল। গা জুড়াইলে পর, ছেলে তবে চোক মেলিল। রাত্রে বেশ ছিল, আর কোনও অসুখ হয় নাই। আজ সকালেও বেশ আছে, দেখিয়া আসিয়াছি। কাল ত তাকে কোনও অসুদ দিই নাই। আজ তাকে কোনও অসুদ দিতে হবে? অসুদ দিতে হবে কি না আবার জিজ্ঞাসা করিতেছেন? আজ আবার সে রকম জ্বর হইলে কি ছেলে বাঁচিবে? হয় ত ভয়ানক তড়্‌কা হইয়াই মারা যাবে। ছেলেটী যদি বাঁচাইতে চান, তবে এখনই গিয়া তাকে ৩ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিন। তার পর কাল যে সময় জ্বর আসিয়াছিল, আজ তার ঘণ্টা খানেক আগে আর ৩ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবেন। কাল রাত্রে গা জুড়াইয়া গেলে ৩ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ বার তিন চারি খওয়াইতে পারিলে, আর আজ সকালে বার দুই খাওয়াইলে জ্বর আর আসিত না। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি বলিলেন, অত টুকু ছেলেকে কুইনাইন্ খাওয়াব? আর এক দিনের জ্বরেই কুইনাইন্ দিব? ভাল দেখি—বলিয়া চলিয়া গেলেন। তার পর দিন শুনিলাম, ভারি রকম তড়্‌কা হইয়া ছেলেটী মারা গিয়াছে। কুই-নাইন্ তাকে ১ গ্রেনও খাওয়ান হয় নাই, জিজ্ঞাসা করায় জানিতে পারিলাম। এই ভদ্র লোকটীর ব্যবহার, কামারকে ইস্পাত ফাঁকি দিবার মত হইছিল। এখানে সামান্য বুদ্ধির

ভুলে ছেলেটা মারা গেল। গা জুড়াইয়া গেলে ৩ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ বার তিন চারি খাওয়াইলে, ছেলেটার জীবন রক্ষা হইত। এই ব্যক্তি ছেলেটার জীবন হেলায় হারাইলেন। পাড়াগাঁয়ে অনেক ছেলে পিলে এই রকম করিয়া মারা পড়ে। পাড়াগাঁয়ে বলিয়া কেন, জানা শুনা না থাকিলে, সকল জায়গায়ই এই রকম ঘটে। সাধে কি বলি, ম্যালেরিয়া-জ্বরকে সহজ জ্ঞান করা উচিত নয়। এই জন্যেই বলি, জ্বরের উপরও কুইনাইন্ খাওয়ান ভাল। জীবনটা ত রক্ষা হয়। জ্বর আসিবার আগে কুইনান্ খাওয়াইলে সুবিধার ত কথাই নাই। এই জন্যে, ছেলেদের একটু অসুখ হইলে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল। কেন না, তারা ত আর জ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষণ বুঝিতে পারিবে না। এর পর, এ সব বেশ করিয়া বলিব।

জ্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, জোআন রোগীরও কখন কখন খেঁচুনি হয়। ছেলেদের হইলে এ রকম খেঁচু-নিকে তড়্কা বলে। বসন্ত-জ্বরে গায়ের তাত বড়ই বেশী হয়। এই জন্যে, অনেক জায়গায় সেই জ্বরের তাড়সে রোগীর মৃগির মত খেঁচুনি হয়। এ রকম হইলে, আগে যেমন বলিছি, ক্লোরোফর্ম্ম শুঁকাইয়া খেঁচুনি বন্ধ করিবে। তার পর মাথা নেড়া করিয়া জল-পটি দিবে। আর ব্রোমাইড অব্ পোটাসিয়ম আর টিংচর অব বেলাডনা-ঘটিত ঐ অসুদ দুই, তিন বা চারি ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। জ্বরেতেই হোক, আর অন্য কোন কারণেই হোক, মৃগির মত খেঁচুনি হইলেই, এই নিয়মে চিকিৎসা করিবে।

জ্বর ফুটিলে, সব রোগীর সমান অসুখ হয় না। শীত বা কম্প যেমন সকলের সমান হয় না, জ্বরও তেমনি সকলের সমান হয় না। কারো কারো জ্বর সামান্যই হয়। গায়ের তাত, দাহ, পিপাসা, মাথার যাতনা—এ সবই কম হয়। আবার কারো কারো জ্বরে কাট্ ফাটিতে থাকে। গায়ের এমনি তাত যে, ধান দিলে খৈ হয়। গাত্র-দাহতে মাটিতে ভিন্ন থাকিতে চায় না। পিপাসায় নিয়ত জল জল করিতে থাকে। আর মাথার যাতনায় অস্থির হয়। এ সব ভারি জ্বরের লক্ষণ। কিন্তু ভারি জ্বরই হোক্, আর সামান্য জ্বরই হোক্, খানিক ভোগ করিয়া আপনিই ছাড়িয়া যায়। এ জ্বরের স্বভাবই এই। আর এই জন্যে একে সবিরাম-জ্বর বলে।

এ জ্বর আপনিই ছাড়িয়া যায় বলিয়া, রোগীকে বড় একটা অসুদ খাওয়াইবার দরকার হয় না। তবে গাত্র-দাহ, পিপাসা, মাথার যাতনা—এ সব কষ্ট দূর করিবার জন্যে, আগে যে যে অসুদের কথা বলিছি, সেই সব অসুদ খাওয়াইতে হয়। শুদু এই করিলেই এ জ্বরের চিকিৎসা করা হইল। কিন্তু ও সব অসুদ ছাড়া, ঘর্ম্মকারক (যা খাওয়াইলে ঘাম হয়) কোন অসুদ খাওয়াইলে রোগীর কষ্টের আরও লাঘব হয়, আর জ্বরও বোধ হয় শীঘ্র ছাড়ে। নীচে একটী অসুদ লিখিয়া দিলাম। এই অসুদটী আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি! সবিরাম-জ্বরই হোক্, আর স্বল্প-বিরাম জ্বরই হোক্, জ্বরের ভারি প্রকোপ হইলে, এ অসুদটি খাওয়ালে যেন আগুনে জল পড়ে, এমনি হয়। ছয়

বার খাওয়াইবার মত অসুদ একেবারে তয়ের করিয়া লও।

ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্	১ ড্রাম
বাইনম্ ইপেকা	৬ বিন্দু
স্পিরিট অব ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক য়্যাসিড ঈথর)	২ ড্রাম
টিংচর সিঙ্কোনি কো	৩ ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম্ কো	৩ ড্রাম
ডিকক্শন্ সিঙ্কোনা	৫ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ দুই কি তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। জ্বরের তাড়শে রোগীকে যদি বেশী অবসন্ন কি দুর্ব্বল দেখ, তবে এক এক মাত্রা অর্থাৎ এক এক দাগ অসুদ ঢালিয়া, তাতে ২ ড্রাম করিয়া বাইনম্ গ্যালিসাই যোগ করিয়া দিবে। কিম্বা অসুদ তয়ের করিবার সময়, ছয় বার খাওয়াইবার অসুদে একবারে ১২ ড্রাম অর্থাৎ দেড় ঔন্স গ্যালিসাই যোগ করিয়া লইবে। ব্রাণ্ডিকে বাইনম্ গ্যালিসাই বলে। প্রেস্ক্রপ্শনে বাইনম্ গ্যালিসাই লেখে।

রোগীর যদি পেট একটু ফাঁপ ফাঁপ বোধ হয়, তবে ডিকক্শন্ সিংকোনার বদলে ডিল ওয়াটার দিবে। ডিল ওয়াটারকে য়্যাকুঈ য়্যানিথাইও বলে। রোগীর পেট-ফাঁপা থাকিলে (তা যে রোগেই কেন হোক না), ডিকক্শন্ সিং-কোনা কখনই দিবে না। আগে যদি পেটফাঁপা না থাকে, আর অসুদ খাওয়াইতে খাওয়াইতে পেটের ফাঁপ হয়, তবে

তখনই ডিককৃসন সিঙ্কোনা বন্ধ করিয়া, তার বদলে ডিল-ওয়াটার দিবে। ডিল-ওয়াটায় পেট ফাঁপার বড় অসুদ। রোগীর পেট ফাঁপিয়া ঢাক হইয়াছে, তবু ডিককৃশন সিঙ্কোনা বন্ধ করিতেছে না—এ রকম ভুল অনেক চিকিৎসকেই করিয়া থাকেন। বুঝাইয়া বলিতে গেলে তাঁরা আবার রাগ করেন।

বাইন্নম্ গ্যালিসাই (ব্রাণ্ডি) দু রকম। একের নম্বর আর দুয়ের নম্বর। একের নম্বরের দাম বেশী। এই জন্যে অনেক জায়গায় ডাক্তরেরা দুয়ের নম্বর ব্যবহার করিয়া থাকেন। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা একের নম্বর কখনও ব্যবহার করেন না, বলিলেই হয়। কিন্তু একের নম্বরে যে উপকার হয়, দুয়ের নম্বরে তার সিকি উপকারও হয় না। এই জন্যে ডিস্পেন্সারিতে সর্ব্বদাই একের নম্বর গ্যালিসাই (ব্রাণ্ডি) রাখিবে। দাম বেশী বলিয়া অসুদে কখনও খারাপ জিনিস ব্যবহার করিবে না। খারাপ জিনিস ব্যবহার করেন বলিয়া, পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের অসুদে অনেক সময় তেমন কাজ হয় না, কাজেই পশারের অনেক হানি হয়। সকল ডাক্তরেরই এটী মনে করিয়া রাখা উচিত। পুরাণ হইয়া গেলে, অনেক অসুদের তেজ থাকে না। এই জন্যে, তাতে তেমন উপকার হয় না। এটীও পাড়াগাঁয়ের চিকিৎসকদের জানিয়া রাখা উচিত। কেন না, তাঁরা অনেক দিনের পুরাণ অসুদ ব্যবহার করেন বলিয়া এমন কি অনেক জায়গায় অপ্রতিভও হন। তবু পুরাণ অসুদের মায়া ছাড়িতে পারেন না। সকল রোগের চিকিৎসায় দুটী

জিনিসের বড় দরকার। ভাল চিকিৎসক আর ভাল অসুদ। চিকিৎসকের জ্ঞান থাকা চাই, অসুদের তেজ থাকা চাই। এ নৈলে যেমন আশা, তেমন ফল পাওয়া যায় না। আমি দেখিছি, পাড়াগাঁয়ের অনেক চিকিৎসক বেশ চিকিৎসা করেন, চিকিৎসার বেশ প্রণালী জানেন আর রোগও চিনেন। কিন্তু অসুদের তেমন তেজ না থাকায় তাঁরা গৃহস্থকে তেমন তুষ্ট করিতে পারেন না।

ঘাম হওয়া আর জ্বর ছাড়া—যে জ্বর রোজ আসে, সে জ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্টা। জ্বর ছাড়িবার আগে ঘাম হয়। ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই গায়ের তাত কমিতে থাকে, গায়ের তাত এত শীঘ্র কমিয়া যায় যে, তাপমান-যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখ ত আশ্চর্য্য হইবে। যতক্ষণ গায়ের তাত সহজ না হয়, ততক্ষণ প্রতি দশ মিনিটে তাপমান-যন্ত্রের ছোট এক দাগ অর্থাৎ এক ডিগ্রি বা অংশের ⅕ (পাঁচ ভাগের এক ভাগ) করিয়া তাত কমিয়া যায়। তাপমান-যন্ত্রের গায়ে দাগ কাটা, তার ভাগ বিলি আর হিসাব, এর আগেই বেশ করিয়া বলিছি। আর সহজ গায়ের তাত, যে গড়ে ৯৮⅖ ডিগ্রি বা অংশ তাও এর আগে বলিছি। গা জুড়াইলে রোগীর আর কোনও অসুখ থাকে না। ঠিক সহজ মানুষের মত হয়। কোথায় বা গাত্রদাহ, কোথায় বা পিপাসা, আর কোথায়ই বা মাথার যাতনা। রোগীকে দেখিলে, রোগী বলিয়াই বোধ হয় না।

ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে আর হিম জল খেতে দিবে না, পাখার বাতাস দিবে না, বাইরের বাতাস গায়ে লাগিতে

দিবে না। গা আদুল না রাখিয়া বরং একখান মোটা কাপড় গায়ে দিলে ভাল হয়। গা ঢাকিয়া রাখিলে ঘামটা বেশী হয়। ঘাম হইতে দেওয়া বড় ভাল। বেশী ঘাম হইলে শুকনো কাপড় দিয়া ঘাম মুছাইয়া দিবে।

যখন দেখিবে যে, আর একটুও ঘাম হইতেছে না, তখন গরম জলে ফর্শা তোয়ালে, গামছা বা ন্যাকড়া ডুবাইয়া, নিংড়াইয়া সব গা বেশ করিয়া মুছাইয়া দিবে। মুছাইয়া দিয়া, তখনই শুকনো কাপড় দিয়া আবার সব গা বেশ করিয়া, মুছাইয়া লইবে। পরণের কাপড় ছাড়িয়া, আর এক খান পরিষ্কার কাপড় পরিতে বলিবে। তার পর গা নিতান্ত খোলা না রাখিলে ভাল হয়।

জ্বর ছাড়িল, রোগী সুস্থ হইল। এখন কি করিবে? এ জ্বরের প্রকৃতি একবার ভাবিয়া দেখিবে। ছেড়ে যায় আবার আসে। এই রকম বারে বারে ছাড়ে আর বারে বারে আসে। এ জ্বরের প্রকৃতিই এই। তবেই, একবার জ্বর ছাড়িলে আর না আসিতে পারে এমন উপায় করা চাই। এমন উপায় আছে কি না, তাও একবার দেখিবে। উপায় ছোট খাটো নাই। এমন উপায় আছে যে, আর কোনও রোগের তেমন উপায় নাই। সে উপায় আর কি—কুইনাইন। কুইনাইন ত সবিরাম জ্বরের অসুদ নয়—ব্রহ্মাস্ত্র! এমন অসুদ যদি আর দুটা থাকিত, তা হইলে ত ডাক্তরদের লোকে দেবতা বলিত। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িলে, ঠিক ব্যবস্থা মত কুইনাইন খাওয়াইতে পারিলে, জ্বর আসা নিশ্চয়ই বন্ধ হয়। বিজ্বরে কুইনাইন খাওয়াইয়া যদি জ্বর বন্ধ

করিতে না পার, তবে স্থির করিবে যে, হয় কুইনাইন ভাল নয়, নয় উপযুক্ত মাত্রায়, কিম্বা সময় মত কুইনাইন খাওয়ান হয় নাই।

কুইনাইন খাওয়াইবার আগে ঠিক কর, জ্বরটা সোজা কি বাঁকা। কেন না, সোজা জ্বর হইলে সহজেই জ্বর বন্ধ করিতে পারা যায়। জ্বর বাঁকা রকম হইলে, তত সহজে বন্ধ করিতে পারা যায় না। যদি বল, জ্বর সোজা কি বাঁকা তা আগে থাকিতে কেমন করিয়া জানিব? তা জানিবার বেশ উপায় আছে। সে উপায় এই—সহজ জ্বরে কম্পের সময় জিব পরিষ্কার থাকে, জ্বর ফুটিলে শাদা হয়, আর ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে আবার পরিষ্কার হয়। এ সঙ্কেতটা সব চিকিৎসকেরই মনে করিয়া রাখা উচিত। জ্বর বাঁকা হইলে, সকল সময়েই জিব শাদা থাকে। কম্পের সময়ও শাদা থাকে, জ্বর ফুটিলেও শাদা থাকে, ঘামের সময়ও শাদা থাকে এমন কি, জ্বর ছাড়িলেও শাদা থাকে। আবার, এর চেয়েও শক্ত জ্বরে, সকল সময়েই জিব কটাশে দেখা যায়। যদি বল, জ্বর যেখানে এক বারে ছাড়িয়া যায়, আর বিজ্বরে কুইনাইন খাওয়াইলে জ্বর আসা বন্ধ হয়, তবে সোজা, বাঁকা কি শক্ত জ্বর, এ জানিবার দরকার কি? দরকার বেশ আছে। সহজ জ্বর ছেড়ে, দু বারের জায়গায় চারি বার আসিলেও তত হানি নাই। কিন্তু বাঁকা বা শক্ত জ্বরে তা কখনই ভাবা হইবে না। কেন না, এক বারের জ্বরেই রোগী আধ-মরা হইয়া যায়। এর উপর আর দুই এক বার জ্বর আসিলে কি আর রোগী জীয়ন্ত থাকে? তবেই দেখ,

সোজা, বাঁকা, কি শক্ত জ্বর, জানা দরকার নয় ? এই গুলি জানা না থাকিলেই চিকিৎসক অপ্রতিভ হন। রোগীর আত্মীয় স্বজন জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলেন কোনও ভয় নাই ; রোগী দুই এক দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইবে। কিন্তু তিনি জানেন না যে, সেই দুই এক দিনের মধ্যেই রোগী মারা যাবে। এরূপ ঘটনা চিকিৎসকের পক্ষে বড়ই অপযশের বিষয়।

এর আগেই বলিছি যে, সবিরাম-জ্বরের আর স্বল্পবিরাম-জ্বরের আসল কারণ ম্যালেরিয়া। এই জন্যে, এ দু রকম জ্বরকে ম্যালেরিয়া-জ্বর বলে। ম্যালেরিয়া শরীরের মধ্যে যত অধিক প্রবেশ করে, জ্বরও তত বাঁকা আর শক্ত হয়। ম্যালেরিয়া এক রকম গ্যাস। গ্যাস ইংরেজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা বাষ্প। ভিজে মাটি শুকাইবার সময় সেই মাটি থেকে উঠে। এই জন্যে, আমাদের দেশে বর্ষার শেষে শরতের রৌদ্রের যখন ভারি তেজ হয়, তখনই জ্বরের এত বাড়াবাড়ি দেখা যায়। এই বাষ্পকে ডাক্তরেরা ম্যালেরিয়া বলেন। জীবন নষ্ট করিবার ক্ষমতা ম্যালেরিয়ার খুবই আছে। একবারে অধিক ম্যালেরিয়া শরীরে প্রবেশ করিলে জীবন তখনই নষ্ট হয়। গদখালি, শ্রীনগর, উলো প্রভৃতি গ্রামের মহামারীর কথা শুনিয়া থাকিবে। সেই মহামারীর সময়, কেউ দু ঘণ্টার মধ্যে, কেউ তিন ঘণ্টার মধ্যে, কেউ চারি ঘণ্টার মধ্যে মরিয়াছিল। এতে ম্যালেরিয়াকে বিষ না বলিয়া আর কি বলিবে ? বাঁকা বা শক্ত জ্বরের লক্ষণ দেখিলেই ঠিক করিবে যে, শরীরের মধ্যে

এই বিষ অধিক আছে। কাজেই, সতর্ক আর সাবধান হইয়া চিকিৎসা না করিতে পারিলে, রোগীর মৃত্যু এক রকম নিশ্চিত—তবেই দেখ, সহজ, বাঁকা কি শক্ত জ্বরের লক্ষণ জানিয়া রাখা দরকার কি না? তা নৈলে, শরীরে বেশী ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, কি কম ম্যালেরিয়া প্রবেশ করিয়াছে, তাহা জানিবার আর উপায় নাই।

কুইনাইন্ খাওয়াইবার কথা বলিবার আগে, এ জ্বরে রোগীর আকার প্রকার আর নাড়ীর অবস্থা কখন্ কি রকম হয় বলিব। কেন না, এ গুলিও চিকিৎসকদের জানিয়া রাখা বড় দরকার। (১) কম্পের সময়—রোগীর বর্ণ ফ্যাকাশে হয়, কান, ঠোঁট, আর নখ নীল বর্ণ হয়, মুখ খানি যেন চুপ্‌সে যায়, আর সব গায়ের চামড়া কুঁচ্‌কে কাঁটা-কাঁটা হয়। নাড়ী সরু হয়, বেগ ভারি বাড়ে আর মাঝে মাঝে অসমান পড়ে, নিশ্বাসও ঘন ঘন পড়ে। (২) গায়ের তাত বাড়িলে—গায়ের চামড়া যেন ফুলে উঠে আর রাঙা হয়। মুখ চোক লাল হয়। নাড়ীর বেগ আর পুষ্টি বাড়ে, আর নাড়ী যেন শক্ত হয়। (৩) ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে—নাড়ী ক্রমে সহজ হইয়া আসে। এ জ্বরে প্রস্রাব কখন্ কেমন হয়, জানা উচিত। কম্পের সময় প্রস্রাব কম হয়, কিন্তু পরিষ্কার হয়। কম্পের শেষে প্রস্রাবে জলের ভাগ খুব বেশী হয়। গায়ের যখন খুব তাত, তখন প্রস্রাব কম হয়, আর ঘন হয়। গায়ের তাত কমিবার আগে, জলের ভাগ একটু একটু করিয়া কমে। আর ঘাম হইতে আরম্ভ হইলে, জলের ভাগ খুব শীঘ্র শীঘ্র

কমিয়া যায়। এই জন্যে কম্পের শেষে রোগী পরিষ্কার জলের মত অনেক খানি প্রস্রাব করে। গায়ের তাত কমিবার আগে প্রস্রাব তার চেয়ে কম হয়। আর ঘাম হইয়া গা জুড়াইয়া গেলে রোগীর প্রস্রাব কমও হয় রাঙাও হয়।

কুইনাইন্ খাওয়াইবার ব্যবস্থা——আমাদের দেশে সবিরাম-জ্বরে জ্বর ভোগের পর রোগীর ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই, কুইনাইন খাওয়ান উচিত। নৈলে, অনেক জায়-গায় কুইনাইন খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িল, চিকিৎসক নিশ্চিন্ত হইলেন। নিয়ম মত কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিয়া গেলেন। কিন্তু এমন অনেক জায়গায় ঘটে যে, ডিস্পেন্সেরি থেকে কুইনাইন আসিয়া পৌঁছিবার আগেই আবার জ্বর আসে। এই জন্যে ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই, কুইনাইন খাওয়ান ভাল। এতে কুইনাইন খাওয়াইবার অনেক সময় পাওয়া যায়। রোগীর গা বেশ ঠাণ্ডা না হইলে, কুইনাইন্ খাওয়াইতে গৃহস্থও ভয় পান, চিকিৎসকও বড় সাহস করেন না। গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ খাওয়াইলে, সেই জ্বর এক বারে আর কখনও ছাড়ে না—জ্বরটা আটকাইয়া যায়। এ সংস্কারও ছেলে, বুড়ো, জোআন সকলেরই আছে। এই রকম সংস্কার থাকায়, অনেক জায়গায় ভারি অনিষ্ট হয়। গা একেবারে পাথরের মত ঠাণ্ডা না হইলে কুইনাইন্ খাওয়ান হয় না। এ দিকে গা যদিই পাতরের মত ঠাণ্ডা হয়, ত সে জ্বর আসিবার এক আধ ঘণ্টা আগে হয়।

তখন কুইনান্ খাওয়াইলে জ্বর আসা বারণ হয় না। কেমন করিয়া হবে? কুইনাইন্ পেটে পড়িয়া কাজ করিবার সময় পাইল কৈ? এই রকম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়ান হয়, কিন্তু জ্বর-আসা বন্ধ হয় না। এতে রোগীও ভোগে, কুইনাইনেরও অপযশ হয়।

গা ঠাণ্ডা হইলে, কুইনাইন্ খওয়াইলে আর জ্বর আসে না। কুইনাইনের এই ধর্ম্মটাই সকলের জানা আছে। কিন্তু কুইনাইন্ খাওয়াইলে যে আবার গায়ের তাত কমে, তা, বোধ হয় অনেকে জানেন না, চিকিৎসকদের এটা জানিয়া রাখা ভারি দরকার। তা হইলে, অনেক জায়গায় ভারি জ্বরে রোগী বেজায় হইতে পারে না। বিশেষ, স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায়, কুইনাইনের এ ধর্ম্মটা তাঁদের ভারি কাজে লাগে। এ সব এর পর বেশ করিয়া বলিব।

এখানে আমার একটা রোগীর কথা-বলি। রোগীর বগলে তাপমান যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৬র দাগ ছাড়াইয়া উঠিয়াছে। গায়ের এ রকম তাত অনেক ক্ষণ থাকিলে, রোগী অচৈতন্য হইয়া যাইতে পারে, মৃগির মত খেঁচুনি হইতে পারে, আর জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে। এই ভাবিয়া তাকে দশ গ্রেন্ (পাঁচ রতি) কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। পেটে গিয়া শীঘ্র কাজ করিতে পারিবে বলিয়া, শুদ্ধ কুইনাইন্ না দিয়া, কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ করিয়া খাওয়াইয়া দিলাম। কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, আজ্ কাল্ অব্যবসায়ারাও তা জানেন। আধ পলা খাঁনেক জলে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্

বেশ করিয়া মিশাইয়া, তাতে ১০ ফোটা ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড (জল-মিশনো মহাদ্রাবক) ফোটায় ফোটায় ঢালিয়া দিলে, কুইনাইন্ বেশ গলিয়া যায়। বেশ গলিয়া গেলে, তাতে আধ ছটাক আন্দাজ জল ঢালিয়া দিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিবে। কুইনাইন্ খাওয়ান হইলে এক ঘণ্টা পরে আবার তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, ১০৬র দাগ ছাড়াইয়া পারা যত খানি উপরে উঠিছিল, ১০৫র দাগের তত খানি নীচে পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আবার ঘণ্টা খানেক পরে দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগেও উঠিল না। এই সময় তাকে আর দশ গ্রেন্ কুইনাইন্ ঐ রকম (অর্থাৎ মিক্‌শ্চর্) করিয়া খাওয়াইয়া দিলাম। এ বারে ঘণ্টা দেড়েক পরে দেখিলাম, পারা প্রায় ১০২র দাগ পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। গায়ের তাত ১০২ অংশ থাকিলে কোনও ভয় নাই। কেন না, খুব সামান্য জ্বরেও গায়ের তাত ১০২ অংশ হইয়া থাকে। এই জন্যে, রোগীকে আর কুইনাইন্ দিলাম না। বিশেষ, তার কান ঝাঁ-ঝাঁ করিতে লাগিল। আর কুইনাইন্ দিতেও হইল না। গায়ের তাত ক্রমে কমিয়া সহজ হইল।

কুইনাইনের তিনটী বিশেষ গুণ আছে। সকল চিকিৎসকেরই এ তিনটী গুণ জানিয়া রাখা উচিত। জানিয়া রাখিলে ম্যালেরিয়া জ্বরের চিকিৎসায় তিনি কোথাও অপ্রতিভ হইবেন না। (১) একটী গুণ এই যে, জ্বর-বিচ্ছেদে কুইনাইন্ খাইলে আর জ্বর আসে না—এই গুণটী সকলের বেশ জানা আছে। (২) আর একটী গুণ এই যে, জ্বরের

পূর্ব্ব-লক্ষণ জানিতে পারিয়া, কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আসা বারণ হয়। জ্বরের পূর্ব্ব-লক্ষণ এর আগেই বেশ করিয়া বলিছি। এ গুণটা সকলের বেশ জানা নাই। এ গুণটী যাঁদের জানা আছে, জ্বরের হাত এড়াবার উপায় তাঁদের জানা আছে। এই গুণটী প্রথম গুণটির মত সকলের বেশ জানা থাকিলে, গৃহস্থেরা অনেক জায়গায় চিকিৎসার খরচ এড়াইতে পারেন। (৩) আর একটী গুণ এই যে, কুইনান্ খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে এই গুণের পরিচয় এই মাত্র দিইছি! এই গুণটী যাঁর ভাল রকম জানা আছে, তাঁর হাতে ভারি জ্বরেও রোগী মারা যায় না। জ্বরে গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, অনেক রকম উপসর্গ ঘটিতে পারে। এ ছাড়া, জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইতে পারে।

এখন কুইনাইন্ খাওয়াইবার কথা বলি। এর আগেই বলিছি যে, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই রোগীকে কুইনাইন্ দিবে। নৈলে, অনেক জায়গায় কুইনাইন্ খাওয়াইবার সময় পাওয়া যায় না। কুইনাইন্ খাওয়াইবার নিয়ম অনেকে অনেক রকম বলেন। কিন্তু আমি দেখিছি, ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই ১০ গ্রেন্, আবার জ্বর আসিবার দু ঘণ্টা আন্দাজ আগে ১০ গ্রেন্, আর এর মধ্যে দু ঘণ্টা অন্তর দু গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। এ রকম নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়াইলে চিকিৎসক কোনও জায়গায় অপ্রতিভ হইবেন না। মনে কর, আজ বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিল সেই জ্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়িল। জ্বর যেমন ছাড়িল, অর্থাৎ

যেমন ঘাম হইতে আরম্ভ হইল, অমনি ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলে। তার পর দু ঘণ্টা অন্তর, অর্থাৎ রাত্রি ১০টার সময় একবার, ১২টার সময় একবার, ২ টার সময় একবার, ৪টার সময় একবার, দু গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে। ভোর ৬ টার সময় অর্থাৎ জ্বর আসিবার দু ঘণ্টা আগে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলে। বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কিন্তু জ্বর আসিল না। রোগীর কান ভোঁ-ভোঁ করিতে লাগিল। তিন ঘণ্টা রোগীকে কুইনাইন্ দিলে না। বেলা ১১টার সময় ২ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিলে। বেলা ২ টার সময় আর ২ গ্রেন্ দিলে। তার পর ৬টার সময় একবারে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলে। যদি বল, ৬টার সময় আবার ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিবার দরকার কি? আমি অনেক যায়গায় দেখিছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া যদি সে সময় জ্বর আসিতে না দেও, তবে তার ১২ ঘণ্টা পরে আবার জ্বর আসে। বেলা ৮টার সময় জ্বর আসিবার কথা, কুইনাইন্ খাওয়ান হইছিল বলিয়া, সে সময় জ্বর আসিল না। রোগী মনে করিল আজ্ আর জ্বর আসিবে না। চিকিৎসকও তাই বলিয়া চলিয়া গেলেন। কিন্তু রাত্রি ৮ টার সময় আবার জ্বর আসিল। চিকিৎসকের কাছে সংবাদ গেল। চিকিৎসক আসিয়া বলিলেন, তাই ত, জ্বর আসিবার ত কথা নয়; তবে কেন এ রকম হইল? সেই জন্যে বল্‌ছি, যে সময় জ্বর আসিবার কথা, সে সময় জ্বর না আসিলে, তার দশ ঘণ্টা পরে দশ গ্রেন্ কুইনাইন খাওয়াইয়া দেওয়া ভাল।

তার পর দেখিলে, রাত্রি ৮টার সময়ও জ্বর আসিল না। তখন নিশ্চিন্ত হইলে। রাত্রে রোগীকে আর কুইনাইন্ না দিলেও চলে। কিন্তু ভোর ৬টায় আবার ১০ গ্রেন্ কুই-নাইন্ দেওয়া চাই। তার পর বেলা ৩টা পর্য্যন্ত দুই তিন ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ দিলে। ৬টার সময় এক বারে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলে। রাত্রি ১০ টার সময় ২ গ্রেন্ দিলে। রাত্রে আর কুইনাইন্ দিবার দরকার নাই। তার পর ভোর ৬টায় ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া চাই।

মনে কর, সোমবারের দিন বেলা ৮টার সময় জ্বর আসে, আর সেই জ্বর রাত্রি ৮টার সময় ছাড়ে। তার পর ঐ নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়াইয়া বৃহস্পতিবারের ভোর পর্য্যন্ত জ্বর আসিতে দিলে না। এখন কি করিবে? কুইনাইন্ বন্ধ করিবে? না, এখনও জ্বর আসার আশঙ্কা করিয়া, অল্প মাত্রায় দিন কতক কুইনাইন্ খাওয়াইবে? একটু ভাবিয়া দেখিলেই আর দিন কতক কুইনাইন্ খাওয়ানই উচিত বলিয়া বোধ হইবে। কেন না, যে জ্বর রোজ আসে কুইনাইন্ খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন্ না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জ্বর আসে। এতেই লোকে বলে কুইনাইন খাইলে জ্বর আট্‌-কাইয়া যায়। শরীর থেকে জ্বর একবারে যায় না। ফল কিন্তু তা নয়। এ রকম ভাবাই লোকের ভুল। এই ভুলের জন্যেই সাধারণের কাছে, বিশেষ ইতর লোকদের মধ্যে, কুইনাইনের তত আদর নাই। জ্বরে জ্বরে খোলা

করিয়া ফেলিতেছে, তবু জ্বর আটকাইয়া যাইবার ভয়ে, কুই-নাইনের কাছেও যাইতেছে না। ইতর লোকদের মধ্যে এ রকম সর্ব্বদাই ঘটে। এর ফল এই যে, চারি আনার কুই-নাইন আনিয়া খাইলে যে জ্বর সারিত, সেই জ্বরে জীবনটা নস্ট হয়। এ দুঃখ কি রাখিবার জায়গা আছে? পাড়াগাঁয়ে ত এই জন্যেই জ্বরে এত মরে। তবেই দেখ যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, আট দিন পর্য্যন্ত কুইনাইন্ খাওয়ান বড় দর-কার। তবে, জ্বর বন্ধ হওয়ার পর, দুই তিন দিন যেমন বাঁধা-বাঁধি করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, তার পর তেমন করিবার দরকার নাই। বাঁধা-বাঁধি করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার কথা এই মাত্র বলিছি। রোজ সকালে ৫ গ্রেন আর সন্ধ্যার আগে ৩ গ্রেন খাইলেই হয়। আট দিন পর্য্যন্ত এই নিয়মে কুইনাইন্ খাওয়া চাই। তার পর একটা টনিক্ অর্থাৎ বলকারক অসুদ খাওয়াইলে ভাল হয়।

অনেকে বলেন, বলকারক অসুদ খাওয়াইবার দরকার নাই। কিন্তু বাস্তবিক তা নয়। দরকার বিলক্ষণ আছে। জ্বরে শরীরের যে বলের হানি করে, সে বল টুকু যাতে শীঘ্র হয়, তার উপায় করা কি ভাল নয়? এ ছাড়া, জ্বর থেকে উঠে যদি বেশ ক্ষুধা হয়, আহারে বেশ রুচি হয়, বেশ আহার করিতে পারে, আর যা খায় তা বেশ পরিপাক হয় তবেই রোগী শীঘ্র সেরে উঠিতে পারে। বলকারক অসুদ না খাওয়াইলে অনেক জায়গায় এ গুলি ঘটে না। কাজে

কাজেই, রোগীও বেশ সেরে উঠিতে পারে না। হাতে পায়ে বল পায় না। কোন পরিশ্রমের কাজ করিতে পারে না। শরীরেও বেশ জুত পায় না। এ ছাড়া; সামান্য একটু অনিয়ম করিলেই আবার জ্বরে পড়ে। তবেই দেখ, বলকারক অস্থদ না খাওয়াইবার দোষ কত। বলকারক অস্থদ ত অনেক রকম। তার মধ্যে কোন্‌টী বাছিয়া দিবে? নীচে সে অস্থদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অস্থদটী আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। যথাঃ—

কুইনাইন	... ...	২৪ গ্রেন
টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস	...	২ ড্রাম
ডাইলিয়ুট নাইট্রিক য়্যাসিড	...	১ ড্রাম
ইনফিয়ুশন কোয়াসিয়া	...	১২ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ, আর শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও।

এক এক দাগ এক এক বারে খাইবে। প্রতি দিন তিন দাগ করিয়া খাইবে। সকালে এক দাগ, ডুপরে এক দাগ, সন্ধ্যার সময় এক দাগ। চারিদিনে ১২ দাগ অস্থদ ফুরাইবে। ফুরাইয়া গেলে, অস্থদ আবার তয়ের করিয়া লইবে। যত দিন না শরীর বেশ সচ্ছন্দ আর সবল হইবে তত দিন বেশ নিয়ম করিয়া এই বলকারক অস্থদটী খাইবে।

এর আগে যে; কুইনাইন্‌ খাওয়াইবার কথা বলিলাম, শুদু কুইনাইন্‌ খাওয়াইবে, না কোন অস্থদের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে? মহাদ্রাবক (সলফিয়ুরিক য়্যাসিড) দিয়া গুলিয়া খাওয়াইলে, পেটে গিয়া কুইনাইন্‌ খুব শীঘ্র কাজ

করে। এ কথা আগেই বেশ করিয়া বলিছি। আফিং শেঁখো (আর্সেনিক), হিরেকস (সলফেট্ অব আয়র্ণ বা ফেরি সল্ফ)—এই তিনটী অসুদের যে সে একটীর সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে, কুইনাইনের তেজ বাড়ে। সকল চিকিৎসকেরই এটি মনে করিয়া রাখা উচিত। কেন না, শুদ্ধ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া যেখানে ভাল ফল পাওয়া না যায়, সেখানে ঐ তিনটী অসুদের যে সে একটীর সঙ্গে মিশাইয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে, বেশ কাজ হয়। এই জন্যে, জ্বর ছাড়িলে. রোগীকে সলফেট্ অব আয়র্ণ অর্থাৎ হীরেকশ দিয়া কুইনাইন মিক্শ্চর দিয়া থাকি। সে মিক্শ্চর নীচে লিখিয়া দিলাম। যথাঃ—

কুইনাইন	... ...	১০ গ্রেন
হীরেকশ (ফেরিসল্ফ)	... ...	২ গ্রেন
ডাইলিয়ুট সলফিয়ুরিক য়্যাসিড	...	১০ মিনিম
পরিষ্কার হিম জল ...		১ এক ঔন্স (আধ ছটাক)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার মত। এই রকম হিসাব করিয়া ৬ বার খাওয়াইবার মত অসুদ এক বারে তয়ের করিয়া একটা শিশিতে রাখিয়া দিতে পার। শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দিলেই হইল। এক এক বারে এক দাগ করিয়া খাওয়াইবে। জ্বর ছাড়িলে মাঝে মাঝে দশ গ্রেন্ করিয়া যে কুইনাইন্ খাওয়াইবার কথা এর আগে বলিছি, হীরেকশের সঙ্গে তার মিক্শ্চর এই রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়।

আর দু ঘণ্টা অন্তর ২ গ্রেন করিয়া যে কুইনাইন খাওয়াইবার কথা বলিছি, তার মিক্‌শ্চর যে রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কুইনাইন্	...	... ...	১২ গ্রেন।
হীরেকশ (ফেরিসল্ফ)	...	...	৩ গ্রেন।
ডাইলিয়ুট্ সলফিয়ুরিক য়্যাসিড্		...	১২ মিনিম্
পরিষ্কার হিম জল	...		৬ ঔন্স (৩ ছটাক)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখিয়া দেও।

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাট। এক এক দাগ এক এক বারে খাইবে।

পাঁচ গ্রেন কুইনাইনের মিক্‌শ্চর এই রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়। যথা—

কুইনাইন	...	... ...	৫ গ্রেন
হীরেকশ (ফেরিসলফ)	...	...	১ গ্রেন
ডাইলিয়ুট্ সলফিয়ুরিক য়্যাসিড্		...	৫ মিনিম
পরিষ্কার হিম জল			১ ঔন্স (আধ ছটাক)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ তয়ের করিলে, এ এক বার খাইবার মত। এক বার খাইবার মত অসুদকে ভাল কথায় এক মাত্রা অসুদ বলে। যদি ইচ্ছা হয় ত এক বারে ছয় মাত্রা অসুদ তয়ের করিয়া রাখিতে পার।

শিশির গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া, অসুদের মাত্রা ঠিক করিয়া দেওয়া বড় ভাল। শিশির গায়ে দাগ কাটা থাকিলে, বাড়ীর মেয়েরাও অসুদ খাওয়াইতে পারে। এ ছাড়া, সক-

লেরই এক রকম জানা আছে যে, খাওয়াইবার অসুদেরই শিশির গায়ে দাগ কাটা থাকে। এই জন্যে, খাওয়াইবার অসুদের বদলে অন্য রকম অসুদ খাওয়ান সচরাচর ঘটে না। সহরে ডাক্তরেরা প্রায়ই শিশির গায়ে এই রকম দাগ কাটিয়া দিয়া থাকেন। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে ডাক্তরেরা দাম বেশী বলিয়া, শিশি প্রায়ই ব্যবহার করেন না। শিশির বদলে বোতলে অসুদ দেন। কাল বোতলের মধ্যে যে অসুদ থাকে, বাইরে থেকে তা কিছু দেখা যায় না। কাজেই তার গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া অসুদের মাত্রা ঠিক করিয়া দেওয়া যায় না। এই জন্যে সহরে ডাক্তরেরা যেমন বলিয়া থাকেন, এক দাগ করিয়া অসুদ খাইবে, পাড়াগাঁয়ে সে রকম বলিলে চলে না। সেখানে বলিতে হয়, আধ ছটাক, এক কাঁচ্চা, কিম্বা আধ কাঁচ্চা করিয়া খাইবে। আধ ছটাক এক কাঁচ্চা, কিম্বা আধ কাঁচ্চা কত টুকু, আন্দাজ করিয়া ঠিক করা সোজা নয়। এই জন্যে, অনেক জায়গায়, রোগী ছয় বারের অসুদ চারি বারে খাইয়া ফেলে, নয়, চারি বারের অসুদ আট বারে খায়। পাড়াগাঁয়ে, বিশেষ ইতর লোক-দের মধ্যে, অসুদ খাইবার এ রকম অনিয়ম প্রায়ই হইয়া থাকে। এ রকম অসুদ খাওয়ায় যে অনেক জায়গায়, উপকারের চেয়ে অপকার বেশী হয়, তা বেশ বুঝা যাইতেছে। এই জন্যে, পাড়াগাঁয়ে আরোক অসুদ বোতলে করিয়া না দিয়া, শিশিতে করিয়া দেওয়াই ভাল। কুলি করিবার অসুদ, ধুইবার অসুদ, কিম্বা মালিশ করিবার অসুদ শিশিতে না দিলেও চলে। কিন্তু খাইবার অসুদ শিশিতে করিয়া দিবে।

আর তার গায়ে কাগজের দাগ কাটিয়া দিবে। এক বারে গোটা পঞ্চাশ ৬ ঔন্স শিশি কিনিয়া রাখিলেই মোটামুটি কাজ চলিতে পারে। পঞ্চাশটে শিশির দামও কিছু বেশী নয়, দু টাকাতেই পাওয়া যায়। অসুদ খাওয়া হইয়া গেলে, শিশি ফিরিয়া দিবার যদি নিয়ম করিয়া দেও, তা হইলে ত শিশির অভাব হইতে পারে না। এ ছাড়া, বারে বারে নূতন শিশিতে অসুদ দিবে না। প্রথম বার যে শিশিতে অসুদ দিবে, ফিরে বারে অসুদ আনিতে আসিবার সময় রোগীকে সেই শিশি আনিতে বলিবে। পাড়াগাঁয়ে ডাক্তারেরা এই নিয়ম করিলে, পয়সা খরচের ভয়ে তাঁদের শিশির বদলে বোতলে করিয়া অসুদ দিতে হয় না।

এর আগেই বলিছি, হীরেকশ (ফেরি সল্‌ফ্) আফিং (ওপিয়ম্) আর শেঁখো (আর্সেনিক) এই তিনটী অসুদের যে সে একটার সঙ্গে মিশাইলে, কুইনাইনের তেজ বাড়ে। কুইনাইনের সঙ্গে হীরেকশ কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। কুইনাইনের সঙ্গে আফিং কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম ঃ—

কুইনাইন্	... ...	১০ গ্রেন্
ডাইলয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্	...	১০ মিনিম্
টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্)	...	১০ মিনিম্
হিম জল	... ...	১ ঔন্স (আধ ছটাক)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ তয়ের করিলে, এ এক বার খাইবার

মত। এই রকম হিসাব করিয়া যত বারের ইচ্ছা, অষুধ তয়ের করিয়া লইতে পার।

আফিঙের সঙ্গে মিশাইলে কুইনাইনের শুদ্ধু তেজ বাড়ে না। তা ছাড়াও অনেক উপকার হয়। জ্বরের সঙ্গে পেটের ব্যামো থাকে ত, কুইনাইনের সঙ্গে আফিং দিলে ভারি উপকার হয়। পেট ব্যথা করা, পেট কামড়ান, ভাল ঘুম না হওয়া—এ সব উপসর্গও আফিঙে সারে। আফিঙের এ বড় গুণ। এ গুণটী সকল চিকিৎসকেরই যেন মনে থাকে।

কুইনাইনের সঙ্গে শেঁখো (আর্সেনিক) কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে লিখিয়া দিলাম। শেঁখোর সঙ্গে কুইনাইন মিক্‌শ্চার (আরোক) তয়ের করা সোজা নয়। এই জন্যে, কুইনাইনের পিল্ অর্থাৎ বড়ি করিয়া দিবে:—

কুইনাইন্	...	...	২ গ্রেন্
আর্সেনিক্ (শেঁখো)	...	...	১/২৪ গ্রেন্
	(এক গ্রেণের ২৪ ভাগের এক ভাগ)		
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্	...		যত টুকু দরকার।

একত্র মিশাইয়া একটী বড়ি তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া, যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি বড়ি তয়ের করিয়া লইতে পার। জ্বর ছাড়িলে ৩ ঘণ্টা অন্তর এক একটী বড়ি খাইতে বলিবে।

১ গ্রেনের ২৪ ভাগের ১ ভাগ ওজন করা সোজা নয়। এই জন্যে, কুইনাইন্ ১২ গ্রেন্, আর্সেনিক্ ।।০ আধ গ্রেন্, আর এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্ যত টুকু দরকার, একত্র মিশাইয়া

তাতে ১২টা বড়ি তয়ের কর। তা হইলে এক একটী বড়িতে ১/১২ গ্রেন করিয়া আসেনিক থাকিবে।

আফিঙের সঙ্গে কুইনাইনের যদি বড়ি করিয়া দিতে চাও, তবে এই রকম করিয়া দিবে ঃ—

কুইনাইন্	...	...	১০ গ্রেন্
আফিং	...	...	১ গ্রেন্
একৃষ্ট্রাক্ট্ জেন্শন্	...		যত টুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া একটী বড়ি তয়ের কর।

বড়ি যদি কিছু বড় হয়, আর তা গিলিতে কষ্ট হইবে বলিয়া বোধ হয়, তবে ওতে একটা বড়ি না করিয়া, ছুটী বড়ি তয়ের করিবে। একটার পর আর একটী বড়ি খাইবে।

ভারি তিত আর বিকট বলিয়া অনেকে কুইনাইন্ মিক্‌শ্চর খাইতে চায় না, কুইনাইনের বড়ি খাইতে চায়। জুত ররাত করিয়া, বড়ি গিলিয়া খাইতে পারিলে, মোটেই তিত জানিতে পারা যায় না। কেউ কেউ তিত লাগিবার ভয়ে কুইনাইন মিক্‌শ্চরও খায় না; আবার বড়িও গিলিয়া খাইতে পারে না। বড়ি গিলিতে গেলেই তাঁদের গলায় বাধে। মুখে জল লইয়া শাদা কুইনাইন্ গিলিয়া খাওয়া ভিন্ন এদের আর উপায় নাই। মেয়েদের মধ্যে অনেকে বড়ি গিলিতে পারে না। বিশেষ যাদের হিষ্টিরিয়া অর্থাৎ গুল্মবায়ু রোগ আছে, তারা বড়ির নামে ভয় পায়। আমার বেশ মনে আছে, একটা স্ত্রীলোক মুসূরির চেয়েও ছোট বড়ি গিলিতে পারিত না। এই নিমিত্তে মেয়েদের জন্যে

অস্থদ ব্যবস্থা করিবার সময় তাদের জিজ্ঞাসা করিয়া আরোক, বড়ি, কি গুঁড়ো লিখিয়া দেওয়া ভাল। নৈলে দাম দিয়া অস্থদ আনিয়া, হয় ত, তা কোন কাজে না লাগিতে পারে। ছেলেদেরও মধ্যে অনেকে বড়ি গিলিতে পারে না। আমার একটী ছেলে (দশ বছরের কম নয়) কোন মতেই বড়ি খাইতে চায় না। বড়ির নামে সে ডরায়। যথার্থই সে বড়ি গিলিতে পারে না। গিলিতে গেলেই তার গলায় বাধে। আবার তার চেয়ে যারা চারি পাঁচ বছরের ছোট, তারাও সহজে বড়ি গিলিয়া খায়।

অনেক জিনিষ দিয়া কুইনাইনের বড়ি তয়ের করিতে পারা যায়; কিন্তু একৃষ্ট্রাক্ট্ জেন্‌শন্ দিয়া বড়ি তয়ের করা সব চেয়ে ভাল। কেন না, নিজে জেন্‌শন্‌ই জরঘ্ন আর বলকারক (টনিক্)। কাজেই, জেন্‌শনের সঙ্গে মিশাইলে কুইনাইনের তেজ বাড়ে বৈ কমে না।

এর আগেই বলিছি, ডাইলিউট্ সল্‌ফিউরিক্ য়্যাসিডে গুলিয়া খাওয়াইলে, পেটে গিয়া কুইনাইন্ শীঘ্র কাজ করে। এই জন্যে, যেখানে কুইনাইন্ খাওয়াইবার বেশী সময় না পাবে, সেখানে কুইনাইন্ মিক্‌শ্চর্ ছাড়া আর কিছু দিবে না। আর, এক বারে পূর মাত্রা অর্থাৎ ১০ গ্রেন্ দিবে। জ্বর আসিতে বেশী দেরি না থাকিলেও, এই নিয়মে কুই-নাইন্ খাওয়াইলে, অনেক জায়গায় জ্বর আসা বন্ধ হয়। জ্বর আসা এক বারে বন্ধ না হইলেও, জ্বরের তেজ আর ভোগ এত কম হয় যে, তাতে রোগী বিশেষ কোন কষ্ট পায় না।

কুইনাইন্ যে তিত আর বিকট, তাতে ছোট ছেলেদের কুইনাইন্ খাওয়ান সোজা নয়। জোর করিয়া খাওয়াইয়া দিলেই বমি করিয়া ফেলে। এই জন্যে, এমন কোন ফিকির করা উচিত, যাতে ছেলেরা কুইনাইনের তিত না জানিতে পারে। এমন কোন ফিকির আছে কি না? আছে।

(১) ট্যানিক য়্যাসিডের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইলে, কুইনাইনের তিত মোটেই জানিতে পারে না। ১০ গ্রেন্ কুইনাইনের সঙ্গে ২ গ্রেন্ ট্যানিক্ য়্যাসিড্, ৫ গ্রেনের সঙ্গে ১ গ্রেন্, ২॥০ আড়াই গ্রেনের সঙ্গে ॥০ গ্রেন্, এই নিয়মে মিশাইবে। কুইনাইনের সঙ্গে ট্যানিক্ য়্যাসিড্ বেশ করিয়া মিশাইয়া, তাতে একটু মিষ্টি আর জল দিয়া খাওয়াইয়া দিলে, বেশ খায়। উপস্থিত মতে যে মিষ্টি পাও, তাই দিতে পার। গুড়, চিনি, মধু, সিরপ্ এর মধ্যে যে সে একটা দিলেই হইল। যেখানে জ্বরের সঙ্গে পেটের ব্যামো থাকে, সেখানে ট্যানিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়াইলে, দুটী উপকার হয়। এক, এর তিত জানিতে পারে না। আর, জ্বরের সঙ্গে পেটের-ব্যামোও সারিয়া যায়। ট্যানিক্ য়্যাসিডে কিছু কোষ্ঠ বদ্ধ করে। কিন্তু গরম দুধ খাওয়াইয়া তা দূর করিতে পারা যায়।

(২) হরীতকী (হর্তুকী) চিবাইয়া খাইয়া, তার পর কুইনাইন্ খাইলে কুইনাইনের তিত মোটেই জানিতে পারা যায় না। এই জন্যে, ট্যানিক্ য়্যাসিডের বদলে হরীতকীর গুঁড়োর সঙ্গে মিশাইয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলেও হইতে

পারে। 'শুদু হরীতকী বলিয়া নয়, যাতে বেশী কষ আছে, তাতেই কুইনাইনের তিত ঢাকে।

(৩) কাফিরও (কাওয়ার) সঙ্গে খাইলে কুইনাইনের তিত কিছুই জানিতে পারা যায় না। খাইবার জন্যে, চা, কাফি (কাওয়া) কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, আজ্ কাল্ প্রায় সকলেই তা জানেন। কাফির ঘন ক্কাথের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। কাফির সঙ্গে মিশাইয়া কুই-নাইন খাইলে দুটী উপকার হয়। একটী উপকার এই যে, কুইনাইনের তিত জানিতে পারা যায় না। আর একটী উপকার, এই যে. কুইনাইনের তেজ বাড়ে। কেন না কাফি নিজেই জ্বরঘ্ন।

যেখানে পেটে অসুদ থাকে না, খাওয়াইলেই বমি হইয়া যায়, সেখানে জ্বর ছাড়িলে রোগীকে কুইনাইন্ খাওয়াইবার কি ফিকির করিবে? কুইনাইন্ মিক্শ্চর খাওয়াইলে, পেটে থাকিল না, তখনই উঠিয়া পড়িল। শাদা কুইনাইন্ খাওয়া-ইলে, তাও উঠিয়া পড়িল। বড়ি করিয়া খাওয়াইলে তাও উঠিয়া পড়িল। এখন কি করিবে? কুইনাইন্ খাওয়াই-লেও যে ফল হয়, চামড়ার নীচে কুইনাইন্ পিচকিরি করিয়া দিলেও সেই ফল হয়। আবার গুহ্যদ্বার দিয়া আঁতের মধ্যে কুইনাইন্ পিচ্কিরি করিয়া দিলেও সেই ফল হয়। এ জানা থাকিলে আর ভাবনা কি? চামড়ার নীচে, আর আঁতের মধ্যে পিচ্কিরি করিয়া কুইনাইন্ দিলে যখন জ্বর আসা বারণ হয়, তখন কুইনাইন্ খাওয়াই-বার উপায় না থাকিলে, কি কুইনাইন্ পেটে না

থাকিলে, চিকিৎসককে অপ্রতিভ হইয়া চলিয়া আসিতে হয় না।

কুইনাইন্ খাওয়াইবার উপায় না থাকিলে যে বলিলাম, তাতে বুঝিলে কি? অচৈতন্য হইয়া গেলে রোগীকে কুই-নাইন্ খাওয়ান যায় না। কুইনাইন্ বলিয়া কেন? কোন অস্থদই খাওয়াইতে পারা যায় না। আহার দেওয়াও চলে না, তা অস্থদ! জ্বরে রোগী অচৈতন্য হইয়া গিয়াছে। কুইনাইন্ ভিন্ন তাকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। কিন্তু কুইনাইন্ খাওয়াইবার উপায় নাই। রোগী অচৈতন্য; খায় কে? এ রকম অবস্থায় তার শরীরের মধ্যে কুইনাইন্ প্রবেশ করাইয়া দিবার দুটী উপায় আছে। একটা উপায়, চাম-ড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া কুইনাইন্ দেওয়া; আর একটা উপায়, গুহ্যদ্বার দিয়া আঁতের মধ্যে কুইনাইন্ পিচ্‌-কিরি করিয়া দেওয়া। শেষের উপায়টার চেয়ে, আগের উপায়টাতে বেশী ফল পাওয়া যায়।

(ক) চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া কুইনাইন্ দেওয়া —ইংরাজিতে একে সব্‌কিউটেনিয়স্ ইঞ্জেক্‌শন্ বলে। চামড়ার নীচে এই রকম পিচ্‌কিরি করিয়া অস্থদ দেওয়া আজ কাল খুব চলিত হইয়াছে। আগে এ রকম ছিল না, প্রায় সকল ভাল ডাক্তারেরই এই রকম পিচ্‌কিরি করিবার একটী করিয়া যন্ত্র আছে। এই যন্ত্রকে ইংরিজিতে হাইপো-ডর্ম্মিক সিরিঞ্জ বলে। এই যন্ত্র কাচের খুব ছোট একটী পিচ্‌কিরি বৈ আর কিছুই নয়। এই পিচ্‌কিরির আগায় পিতলের খুব সরু একটী নল লাগান আছে। এই নলের

আগা কলম্‌ছে করিয়া কাটা। এই জন্যে, নলের অজ. আগাটী ছুঁচের আগার মত সরু। এ রকম সরু না হইলে, চামড়া বিঁধন যাবে কেন? মাপের গ্লাশের গায়ে যেমন দাগ কাটা, এই পিচ্‌কিরিরও গায়ে সেই রকম দাগ কাটা। সব পিচ্‌কিরির গায়ে এক রকম দাগ কাটা নয়। কোন কোন পিচ্‌কিরির গায়ে ৮টা দাগ আছে। দাগে দাগে ১. ২. ৩. ৪. ৫. ৬. ৭. ৮—এই রকম অঙ্ক লেখা আছে। ১র দাগ আর অঙ্ক সব নীচে আছে, বুঝিয়া লইতে হয়। এই ৮টী দাগ, ৮ মিনিমের মাপ। চামড়ার নীচে যে কয় মিনিম্ অস্যুদ পিচ্‌কিরি করিতে চাও, পিচ্‌কিরিতে করিয়া সেই কয় মিনিম্ লইবে। আবার, কোন কোন পিচ্‌কিরির গায়ে ২০টি দাগ কাটা। আর ৫র দাগে, ১০র দাগে, ১৫র দাগে, আর ২০র দাগে অঙ্ক লেখা। এখানেও ২০টী দাগ ২০ মিনিমের মাপ। এক মিনিম্ প্রায় দু ফোটা।

চামড়ার নীচে কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিবে? চামড়ার নীচে যে কয় মিনিম্ অস্যুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে চাও, আগে পিচ্‌কিরিতে করিয়া টানিয়া লইবে। তার পর পিচ্‌কিরির কলমছে ছুঁচলো আগাটী চামড়ার ভিতরে আড়ভাবে চালাইয়া দিবে। নলের আগা যতটুকু কলমছে কাটা, চামড়ার ভিতরে তত টুকু চালাইয়া দেওয়া চাই। চামড়ার ভিতরে কলম্‌ছের সব খানি বেশ গিয়াছে দেখিয়া, পিচ্‌কিরির বাঁটটী আস্তে আস্তে ঠেলিয়া দিবে। অস্যুদ খানি চামড়ার ভিতরে গেলেই, সেই জায়গায় চামড়া ফুলিয়া উচ হইয়া উঠে। চামড়া এই রকম উচ হইয়া উঠিয়াছে

দেখিয়া, তবে কলমছে আগা টুকু চামড়ার ভিতর থেকে আস্তে আস্তে বাহির করিয়া লইবে। খানিক পরে চামড়ার সে ফুলো টুকু আর থাকে না। কেবল একটু নীল দাগ থাকে। উপরকার শির বাঁচাইয়া চামড়া ফুঁড়িবে। কেন না, শির ফুঁড়িলে রোগীর অনেক বিপদ ঘটিতে পারে। বাউতে যেখানে ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার ভিতরে ঐ রকম করিয়া অসুদ চালাইয়া দিবে।

কুইনাইন্ ছাড়া আরও কোন কোন অসুদ সময় বিশেষে চামড়ার ভিতরে এই রকম করিয়া দিতে হয়। সেই সব অসুদের মধ্যে মর্ফিয়া আর য়্যাট্রোপিয়া প্রধান। মর্ফিয়া খাওয়াইলে যে উপকার হয়, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে কখন কখন তার চেয়েও বেশী উপকার হয়। এ ছাড়া, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, তখনই তখনই উপকার পাওয়া যায়। খাওয়াইয়া দিলে কিছু দেরিতে ফল পাওয়া যায়। জ্বরে চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া কুইনাইন্ দেয়। ব্যথা শূলোয় পিচ্‌কিরি করিয়া মর্ফিয়া আর য়্যাট্রোপিয়া দেয়। বাউতে, যেখানে টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া কুইনাইন্ দেয়। ব্যথা শূলোয় বাউতে না দিয়া, ব্যথা শূলোর কাছে চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া মর্ফিয়া কি য়্যাট্রোপিয়া দিতে হয়। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

এখন কুইনাইনের কথা বলি। মোটামুটি জানিয়া রাখ যে, কুইনাইন্ খাওয়াইলে যে ফল হয়, চামড়ার ভিতরে পিচ-

কিরি করিয়া দিলেও সেই ফল হয়। বরং পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, সেই ফল খুব শীঘ্র পাওয়া যায়। এ ছাড়া, যত খানি কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, তত খানি কুইনাইন্ পিচ্‌কিরি করিতে লাগে না। তার চেয়ে ঢের কম কুইনাইন্ পিচ্‌কিরি করিলে সমান ফল পাওয়া যায়। তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) যেমন সকল ডাক্তারেরই এক একটী রাখা উচিত; তেমনি চামড়ার ভিতরে অসুদ দিবার এই রকম এক একটী পিচ্‌কিরিও রাখা উচিত। তবে তাপমান-যন্ত্রের চেয়ে এ পিচ্‌কিরির দাম কিছু বেশী। দাম বেশী বলিয়া, এ রকম দরকারী যন্ত্র কাছে না রাখা পরামর্শ নয়। বিশেষ, একবার কিনিলে, পাঁচ সাত বছরের মধ্যে হয় ত, আর কিনিবার দরকার হয় না। এই পিচ্‌কিরি কাছে থাকিলে, অনেক জায়গায় মরা রোগী বাঁচাইতে পার। চৈতন্য নাই, গিলিবার শক্তি নাই, আহারও দিবার যো নাই, অসুদও খাওয়াইবার উপায় নাই। বাঁচিবে না বলিয়া ডাক্তর, বৈদ্য জবাব দিয়া গিয়াছেন। এই রকম রোগীকেই মরা রোগী বলিতেছি।

এর আগেই বলিছি যে, কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে। আর গায়ের তাত বেশী হইলে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া সে তাত শীঘ্র কমাইয়া না দিলে, রোগীর কি কি বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাও এর আগে বলিছি (৫৮—৫৯র পাত দেখ)। রোগী অচৈতন্য হইয়া গেলে ত, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া কুইনাইন্ দিবেই। তা ছাড়া, গায়ের তাত খুব শীঘ্র কমান যেখানে দরকার, সেখানে কুই-

নাইন্‌ না খাওয়াইয়া, চামড়ার ভিতরে ঐ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি দিবে। কেন না, খাওয়ানর চেয়ে পিচ্‌কিরিতে খুব শীঘ্র কাজ হয়। এ কথা এর আগেই বলিছি। যদি বল, গায়ের তাত কমান খুব শীঘ্র দরকার কিনা, কেমন করিয়া জানিব? তা জানা শক্ত নয়। কেন না, যখন দেখিবে যে গায়ের তাত যত বাড়িতেছে, রোগীর উপসর্গও তত বাড়িতেছে? তখন গায়ের তাত না কমাইলে কি আর রক্ষা আছে? রোগী নিশ্চয়ই মারা যায়। এই রকম অবস্থায় চামড়ার ভিতর কুইনাইন্‌ পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে।

অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, যত ক্ষণ জ্বর থাকে, ততক্ষণ রোগী অচৈতন্য থাকে। জ্বর ছাড়িলে চৈতন্য হয়। আবার যে জ্বর আসে, সেই অচৈতন্য হয়। ফিরে বারে আর চৈতন্য হয় না। রোগী মারা যায়। এ জ্বরের আবার বিচ্ছেদ-কাল বড় কম। কাজেই, কুইনাইন্‌ খাওয়াইয়া নিশ্চিন্ত থাকা যায় না। পেটে গিয়া কুইনাইন্‌ কাজ করিতে না করিতেই, আবার জ্বর আসিয়া পড়ে। এমনতর জায়গায় চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্‌ পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেই ভাল হয়। কুইনাইন্‌ একবার পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেই কাজ হয়, এমন নয়। অবস্থা বুঝিয়া, দু বারও দিতে হয়, তিন বারও দিতে হয়, চারি বারও দিতে হয়।

(খ) যে রকম অবস্থায়, চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্‌ পিচ্‌-কিরি করিয়া দিতে হয়, সে রকম অবস্থায় গুহ্যদ্বার দিয়া আঁতের মধ্যে কুইনাইন্‌ পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও হইতে পারে। তবে, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিলে যেমন

ফল পাওয়া যায়, আর কুইনাইনের কাজ যেমন শীঘ্র হয়, এতে তেমন হয় না। ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ ২।৩ ঔন্স জলের সঙ্গে মিশাইয়া, কাঁচের পিচ্‌কিরি করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া আঁতের মধ্যে দিবে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া, এ পিচ্‌কিরিও বারে বারে করিতে হয়।

(গ) অনেকে বলেন, ৮ গ্রেন্ কুইনাইন্ এক কাঁচ্চা (চারি ড্রাম) স্পিরিটে গলাইয়া, শীত বা কম্প আরম্ভ হইতেই, পিঠের দাঁড়ায় অর্দ্ধেক খানি (আধ কাঁচ্চা) মালিশ করিয়া, পোনর মিনিট পরে, পিঠের দাঁড়ায় আর অর্দ্ধেক খানি আবার মালিশ করিলে, প্রায়ই জ্বর আসা বন্ধ হয়।

বমির দরুণই হোক, আর রোগী অচৈতন্য হইয়া গেলেই হোক্, কুইনাইন্ খাওয়াইবার উপায় না থাকিলে, হয় চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে, নয়, গুহ্যদ্বার দিয়া আঁতের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে; নয়, পিঠের দাঁড়ায় ঐ রকম করিয়া কুইনাইন্ মালিশ করিবে। কিন্তু চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করাই সব চেয়ে ভাল, এটা যেন মনে থাকে।

খাওয়াইবার জন্যে, কুইনাইন্ মিক্‌শ্চর্ যেমন করিয়া তয়ের কর, চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিবার জন্য সে রকম মিক্‌শ্চর তয়ের করিলে হবে না। চামড়ার ভিতরে পিচ্‌কিরি করিবার জন্যে আর এক রকম মিক্‌শ্চর্ চাই। সে মিক্‌শ্চর্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে লিখিয়া দিলাম ঃ—

যে কুইনাইন্ সচরাচর খাওয়ান যায়, তাকে সল্‌ফেট

অব্ কুইনাইন বলে। বাজারে যে সোণা-মার্কা হাওয়ার্ড কুইনাইন্ বিক্রি হয়, তাকেই সল্‌ফেট অব্ কুইনাইন্ বলে। পিচ্‌কিরি করিবার জন্যে সল্‌ফেট্ অব্ কুইনাইন্ দরকার হয় না। পিচ্‌কিরি করিবার জন্যে, বাজারে আলাদা কুইনাইন্ বিক্রি হয়। এই কুইনাইনকে ইংরিজিতে নিয়ুট্রাল কুইনাইন্ বলে। নিয়ুট্রাল কুইনাইন্ বলিয়া চাইলেই বাজারে পাওয়া যায়। এ কুইনাইন্ যেখানে সেখানে পাওয়া যায় না। সাহেবদের ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায়। পিচ্‌কিরি করিবার জন্যে, জলের সঙ্গে এই কুইনাইন্ কেমন করিয়া মিশাইতে হয়, নীচে লিখিয়া দিলাম ঃ—

১০ গ্রেন্ নিয়ুট্রাল কুইনাইন্ খলে করিয়া লও। তাতে এক ড্রাম পরিস্রুত (চোআন) জল ঢালিয়া দিও। পরিস্রুত জলকে ইংরিজিতে ডিষ্টিল্ ওয়াটর বলে। যতক্ষণ কুইনাইন্ বেশ গলিয়া না যায়, ততক্ষণ নুড়ি দিয়া খুব করিয়া ঘোঁটো। শুদু ঘুঁটিলেই যদি কুইনাইন্ গলিয়া যায়, ত ভালই। নৈলে, কখন কখন তাতে একটু তাতও দিতে হয়। এই রকম করিয়া তয়ের করিলে এক ড্রামে ১০ গ্রেন করিয়া নিয়ুট্রাল কুইনাইন্ থাকে।

যদি ১০ গ্রেন কুইনাইন্ একবারে পিচ্‌কিরি করিতে চাও, তবে ২০ মিনিম্ ধরে—এমন একটা পিচ্‌কিরি করিয়া ৩ বার ৩ জায়গায় পিচ্‌কিরি করিবে। তা হইলে, এক ড্রাম পিচ্‌কিরি করা হবে। ১৫ গ্রেন পিচ্‌কিরি করিতে চাও ত, এক বার ২০ মিনিম, আর এক বার ১০ মিনিম পিচ্‌কিরি করিবে।

অনেকে বলিতে পারেন, "কুইনাইন্ পিচ্কিরি করা, তবে ত খুব ফেসাদ দেখিতেছি। সচরাচর বাজারে যে কুইনাইন্ পাওয়া যায়, সে কুইনাইন্ হবে না। তা ছাড়া, ও আবার অত কষ্ট করিয়া গলাতে হয়"—এ সবই সত্য। কিন্তু যেখানে কুইনাইন্ খাওয়াইবার কোনও উপায় নাই, কি খাওয়াইলে পেটে থাকে না, সেখানে, যে উপায়ে রোগীর প্রাণ বাঁচাইতে পারা যায়, তাকে ফেসাদ মনে করা হবে না। বিশেষ, সচরাচর যা ব্যবহার কর না, প্রথম প্রথম তা বাধ-বাধ লাগে। কিন্তু অভ্যাস হইয়া গেলে, সেই কাজই আবার সব চেয়ে সোজা বলিয়া বোধ হয়।

ম্যালেরিয়া-বিষ শরীরের মধ্যে আছে, আর সেই বিষে রোগীর জীবন নষ্ট করিতেছে—এটা ঠিক্ জানিতে পারিলে, রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন উপস্থিত থাক না, যে কোন রকমে হোক্ তার শরীরের মধ্যে কুইনাইন্ দিবে। গিলিবার শক্তি থাকে ত কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ করিয়া খাওয়াইয়া দিবে। আর সে শক্তি না থাকে ত, চামড়ার ভিতরে কুইনাইন্ পিচ্কিরি করিয়া দিবে। বিকারের চিকিৎসায় যা যা করিতে হয়, তা ত করিবেই। মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিবে। পিচ্কিরি দিয়া বাহ্যে করাইয়া দিবে। আর ঘাড়ে বেলেস্তরা দিবে। তা ছাড়া, চামড়ার ভিতরে পিচ্কিরি করিয়া কুইনাইন্ দিবে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া ৩ঘণ্টা, ৪ঘণ্টা, কি ৬ঘণ্টা অন্তর কুইনাইনের পিচ্কিরি দিবে। গায়ের তাত সহজ হইলে, নাড়ীর অবস্থা

ভাল হইলে, আর রোগীর চৈতন্য হইলে, তবে কুইনাইনের পিচ্‌কিরি বন্ধ করিবে।

অনেকে বলেন, সন্নিপাত (কল্ল্যাপ্স) অবস্থায় কুইনাইন্ দিলে অপকার হয়। এমন কি রোগী মারা যায়। কিন্তু আমি তা বলি না। আগে দেখিতে হবে, সন্নিপাতের কারণ কি? যদি ম্যালেরিয়া-বিষের জন্যে সন্নিপাত ঘটিয়া থাকে, তবে কুইনাইন্ দিলে অপকার হবে কেন? বরং তার বিপরীত হবে। যার জন্যে সন্নিপাত, কুইনাইন্ তাকে আগে নষ্ট করিবে। সন্নিপাতের কারণ ঘুচে গেলে, সামান্য ষ্টিমুলেণ্ট্ অসুদেই সন্নিপাত দূর হয়। ষ্টিমুলেণ্ট্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা উত্তেজক। অনেক জায়গায় ষ্টিমুলেণ্ট্ (উত্তেজক) অসুদ রাশি রাশি খাওয়াইয়াও যে, রোগীর সন্নিপাত ঘুচাইতে পারা যায় না, তার কারণ কি? ম্যালেরিয়া-বিষে রোগীর জীবন নষ্ট করিতেছে। শুদু ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদে কি করিবে? ডাক্তরেরা ষ্টিমুলেণ্ট্ (উত্তেজক) অসুদের সঙ্গে, টিংচর সিংকোনা, ডিকক্‌শন্ সিংকোনা দেন বলিয়াই, অনেক জায়গায় ম্যালেরিয়া-বিষের তেজ কমাইতে পারেন। ফল কথা, সিংকোনারই প্রসাদে তাঁরা এমনতর রোগীদের চাঙ্গা করিতে পারেন। ম্যালেরিয়া-বিষের তত তেজ না থাকিলে, তাঁহা শুদু সিংকোনা দিয়াই পার পান। কিন্তু যেখানে ম্যালেরিয়া-বিষের বড় তেজ, সেখানে শুদু সিংকোনা দিলে কাজ হয় না। সেখানে টিংচর সিংকোনা আর ডিকক্‌শন্ সিংকোনার চেয়ে তেজাল রকম অসুদ চাই। নৈলে,

ম্যালেরিয়া-বিষের সে তেজ নষ্ট করে কে? ম্যালেরিয়া-বিষের সে রকম তেজ থাকিতে, হাজার ষ্টিমুলেণ্ট্ (উত্তেজক) অসুদ খাওয়াও, রোগীকে কখনও বাঁচাইতে পারিবে না। তবে সচরাচর ম্যালেরিয়া অত তেজাল ভাবে উপস্থিত হয় না বলিয়াই রক্ষা। নৈলে, তাঁদের নিশ্চয়ই বলিতে হয়—"তাইত, রোগীটিকে কিছুতেই বাঁচাইতে পারিলাম না। এত ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ খাওয়াইলাম! এত তদ্বির করিলাম—সব বৃথা হইল!" "সাপের বিষে শরীর জ্বলিতেছে, মাখন মাখিলে কি, সে জ্বালা থামে? কখনই না। ম্যালেরিয়া-বিষে শরীরের সব যন্ত্র নষ্ট করিতেছে, নাড়ী বসাইয়া দিতেছে, জীবন নষ্ট করিতেছে। শুদু ষ্টিমু-লেণ্ট্ (উত্তেজক) অসুদে কি করিবে?"

এখানে আমার একটী রোগীর কথা বলি। অনেক দিন হইল, একটা রোগী দেখিয়াছিলাম। সাত আট বছরের একটা মেয়ে। বৈকালে তার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তার ভাই ডাক্তর। বাড়ীতেই ডিস্পেন্সরি। কাজেই, ডাক্তর, কি অসুদ, আনিবার জন্যে, বাইরে যাইতে হইল না। ডাক্তর একটী ফীবর্ মিক্শ্চর তয়ের করিয়া দিলেন। জ্বরের সময় যে আরোক-অসুদ দেয়, তাকে ইংরিজিতে ফীবর্ মিক্শ্চর বলে। ভগিনী ফিবর্ মিক্শ্চর খাইতেছে বলিয়া, ভাই নিশ্চিন্ত হইলেন। রাত্রে তার বড় খোঁজ খবর লইলেন না। শেষ রাত্রে জ্বরও ছাড়িল, নাড়ীও ছাড়িল। হিমাঙ্গ হইল, ছট্ফট্ করিতে লাগিল। তার পিতার কাছে সে শুইয়া ছিল। তার ছটফটানিতে, এ পাশ

ও পাশ করাতে তাঁর ঘুম ভাঙিয়া গেল। তার পর তিনি মেয়ের গায়ে হাত দিয়া দেখেন, গা-যেন পাঁক—এমনি ভিজে আর ঠাণ্ডা। এই দেখে ভয় পাইয়া, তাড়াতাড়ি তাঁর ছেলেকে ডাকিলেন। ছেলে (ডাক্তর) আসিয়া, ভগিনীর ঐ রকম অবস্থা দেখিয়া তিনিও খুব ভয় পাইলেন। বলিলেন তাইত! এরই মধ্যে এত খারাপ হইয়াছে। আমি ভাবিয়াছিলাম সোজা জ্বর। যা হোক, আর দেরি করা হবে না। এই বলিয়া, সে রকম অবস্থায় যে যে ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক—যাতে গা গরম হয়, নাড়ী হয়) অসুদ দিতে হয়, সব দিলেন। কিন্তু তাতে কিছুই হইল না। ক্রমেই তার অবস্থা খারাপ হইতে লাগিল। সকাল বেলা, তার ভাই এক জন প্রাচীন ডাক্তরকে লইয়া আসিলেন। বাইরের ডাক্তর, মেয়েটীর অবস্থা দেখিয়া, তাঁর ভাইকে ডাকিয়া বলিলেন—এর বাঁচিবার আর কোন আশাই নাই। বিশেষ, যখন এত ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ দিয়াও কোন ফল দর্শে নাই, তখন এর আশা ভরসা ছাড়িয়া দেও। এই বলিয়া তিনি চলিয়া গেলেন। ভাই বাইরের ডাক্তরের মতে মত দিয়া এক রকম নিশ্চিন্ত হইলেন। কিন্তু বাপ নিশ্চিন্ত হইতে পারিলেন না। নিয়ত বলিতে লাগিলেন আর কি কোন ডাক্তর নাই? ডাক্তরের অভাব কি বলিয়া, ছেলে বাড়ী থেকে বেরুলেন। শেষে আমাকে সঙ্গে করিয়া তিনি বাড়ী গেলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, ওলাউঠার সন্নিপাত অবস্থায় রোগী যেমন ছট্‌ফট্‌ করে, এ পাশ ও পাশ করে, মেয়েটীও প্রায় সেই রকম করিতেছে।

হাত, পা, গা, ঠাণ্ডা যেন পাঁক। হাতের তেলো, পায়ের তেলো পর্য্যন্ত যেন বেঙের গা, এমনি ঠাণ্ডা। বগলেও নাড়ী পাওয়া গেল না। নাক, মুখ যেন চুপ্সে গিয়াছে, চোক বসিয়া গিয়াছে। আঙ্গুলের নখ সব নীল বর্ণ হইয়া গিয়াছে। কথা নাকে উঠিয়াছে। কেবল জ্ঞানের বেশী তফাত হয় নাই। গিলিবার শক্তিও বেশ আছে*। মেয়েটীর এই অবস্থা দেখিয়া, তার ভাইকে বলিলাম, আপনারা ত এর আশা ভরসা ছাড়িয়াই দিয়াছেন। এখন আমি যা বলি, তাই করুন। তাতে কোনও কথা কইবেন না। আপনি ত এক জন সুবিজ্ঞ ডাক্তর। ম্যালেরিয়া-বিষে মেয়েটীর জীবন নষ্ট করিতেছে. তা আপনি বুঝিতে পারিতেছেন না। এ বিষের অসুদ না দিয়া, শুদ্ধু ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) দিলে কি হবে? এ বিষের তেজ নষ্ট না করিলে, কোনও ষ্টিমুলেণ্টই (উত্তেজক) খাটিবে না। তাই বলি, সন্নিপাতেরও দস্তুর মত চিকিৎসা করুন, আর, ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট করিবার জন্যে কুইনাইনও খাওয়াইয়া দিন। কুইনাইন্ খাওয়াইবার কথা বলায় তিনি এক বারে চম্‌কিয়া উঠিলেন। এ অবস্থায় কুইনাইন্!—বলিয়া আর কিছু বলিলেন না। তা, এখন আপনি যা ইচ্ছা, করিতে পারেন। আমি ত ওর আশা ভরসা ছাড়িয়াই দিইছি।

* ওলাউঠার সন্নিপাতে রোগীর অবস্থা যেমন হয়, ম্যালেরিয়া-জ্বরের সন্নিপাত অবস্থায়ও রোগীর অবস্থা প্রায় তেমন হয়। এতেই বলি, ওলাউঠা-বিষের আর ম্যালেরিয়া-বিষের প্রকৃতি এক রকম।

এই রকম কথা বার্ত্তার পর, তার কি রকম চিকিৎসা করিয়াছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম ঃ—

গা ভারি ঠাণ্ডা, শুঁঠের গুঁড়োর মালিশে কাজ হবে না ভাবিয়া, তেজাল মষ্টার্ড (রাইয়ের গুঁড়ো) দিয়া সব গা, বিশেষ বাঁ বুকটা, খুব মালিশ করিয়া দিতে বলিলাম। হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয়, বগলে গরম জল-পোরা শিশি দিতে বলিলাম। তার পর, দু ঘণ্টা অন্তর ব্রাণ্ডির সঙ্গে কুইনাইন, আর ১৫ মিনিট্ অন্তর একটা ষ্টিমুলেণ্ট্ (উত্তেজক) অসুদ খাওয়াইতে বলিলাম। অসুদ দুটা নীচে লিখিয়া দিলামঃ—

(১) ব্রাণ্ডির সঙ্গে কুইনাইন্।

কুইনাইন্	... ...	২৪ গ্রেন্
ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক য়্যাসিড	...	২৪ মিনিম্
বাইনম গ্যালিসাই (১ নম্বর)	...	২ ড্রাম
য়্যাকুই য়্যানিথাই (ডিল ওয়াটর)		২½ (আড়াই) ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ছয়টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াও।

(২) ষ্টিমুলেণ্ট্ মিক্‌শ্চর (উত্তেজক মিশ্রণ)

য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া		১ ড্রাম
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক ঈথর)		১ ড্রাম
স্পিরিট বাইনম্ গ্যালিসাই (১র নম্বর)		৬ ড্রাম
টিংচর ডিজিটেলিস্	...	২০ মিনিম
টিংচর সিংকোনি কো	...	২ ড্রাম

সিরপ্ জিঞ্জর ... ... ৪ ড্রাম
য়্যাকুই য়্যানিথাই (ডিল ওয়াটর) ৪ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ১৫ মিনিট অন্তর খাওয়াও।

এই রকম তদ্বির করিলে, ৫।৬ ঘণ্টার মধ্যে মেয়েটীর অবস্থা অনেক ভাল হইল। অবস্থা যেমন ভাল হইতে লাগিল, ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) তেমনি তফাত তফাত দিতে বলিলাম। সন্ধ্যার আগেই, তার সন্নিপাত ঘুচিল। রাত্রে কোন উপসর্গ বা উপদ্রব ঘটিল না। পরদিন সকালে, মেয়েটিকে বেশ চাঙ্গা দেখা গেল। তার ভাই ডাক্তর, কাজেই, আর কোন তদ্বির বা চিকিৎসার কথা আমাকে বেশী কিছু বলিতে হইল না।

য়্যামোনিয়া, ঈথর, আর ব্রাণ্ডি যে ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অস্থদ, তা প্রায় সকলেই জানেন। হিমাঙ্গ হইলে, নাড়ী না থাকিলে, কি নাড়ী খারাপ হইলে, অর্থাৎ সন্নিপাত ঘটিলে, এই কয়েকটী অস্থদ দিতে হয়, তাও অনেকের জানা আছে। কিন্তু সন্নিপাত অবস্থায় ডিজিটেলিস্ কেন দেয়, তা অনেকে জানেন না। য়্যামোনিয়া আর ব্রাণ্ডির চেয়ে, ডিজিটেলিসের ক্ষমতা বেশী বৈ কম নয়। ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তে-জক) অস্থদে কেমন করিয়া কাজ করে জানিলে, সন্নিপাতের বেশ চিকিৎসা করা যায়। এইজন্যে, এখানে তাই একটু লিখিয়া দিলাম।

বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে যে ধুক-ধুক করা জানিতে

পার, সে রকম ধুক-ধুক করার একটী যন্ত্র আছে। রোগা, কাহিল মানুষের বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে, ঐ রকম ধুক-ধুক করা বেশ জানিতে পারা যায়। ঐ যন্ত্রটীকে ইংরিজিতে হার্ট বলে, ভাল বাঙ্গালা কথায় হৃৎপিণ্ড বলে, হৃদয়ও বলে। এই হৃৎপিণ্ডের কাজ (অর্থাৎ ধুক-ধুক করা) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত চলা ফেরা করে, আর ততক্ষণ জীবন থাকে। ওঁর কাজ বন্ধ হইলেই, রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর জীবনও যায়। শরীরের মধ্যে যে রক্ত চলে, সে কার বলে চলে? এই যন্ত্রের বলে চলে। পিচ্‌কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের মধ্যে এমনি কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে যে ঠিক সেই রকম পিচ্‌কিরির মত সব শিরের মধ্যে রক্ত চালাইয়া দেয়। আবার, শির গুলির এমনি শক্তি যে, সেই রক্ত আবার সেই যন্ত্রে লইয়া উপস্থিত করে। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে।

যতক্ষণ এই যন্ত্রের বল ঠিক থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত চলা ফেরার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু এমন অনেক বিষ আছে, যা শরীরের মধ্যে প্রবেশ করিলে, এই যন্ত্রের বল, হয় এক বারেই নষ্ট হয়, নয়, ক্রমে ক্রমে একটু একটু করিয়া নষ্ট হয়। একবারেই নষ্ট হইলে, তখনই রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর তখনই মৃত্যু হয়। ম্যালেরিয়া-বিষও এই রকম করিয়া ঐ যন্ত্রের বল নষ্ট করে। কাজেই, কুইনাইন দিয়া, ম্যালেরিয়া বিষ নষ্ট না করিলে

আর হৃৎপিণ্ডের যে বল নষ্ট হইয়াছে, ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ খাওয়াইয়া সেই বল আবার না করিয়া দিলে, রোগীকে বাঁচাইতে পারা যায় না। সন্নিপাত ঘটিলে যে সব ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ দেওয়া যায়, হৃৎপিণ্ডের বল বাড়ানই তাদের কাজ। যে সব অসুদ তখনই তখনই হৃৎপিণ্ডের বল বাড়ায়, তাদের ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) বলে। এই সব ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদের মধ্যে ডিজিটেলিস্ একটা প্রধান অসুদ। এইজন্যে, এখানে আর আর ষ্টিমুলেণ্টের (উত্তেজকের) সঙ্গে টিংচর ডিজিটেলিস্ দিই-ছিলাম। হৃৎপিণ্ডের বল কমিয়াছে জানিতে পারিলেই ডিজিটেলিস্ দিবে। সন্নিপাত অবস্থায় অন্য অন্য ষ্টিমুলে-ণ্টের সঙ্গে দিবে। সহজ রোগে টনিক্ অর্থাৎ বলকারক অসুদের সঙ্গে দিবে।

যদি বল, হৃৎপিণ্ডের বল কমিয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিব? তা জানা শক্ত নয়। হাত ধরিয়া দেখিলেই সব জানিতে পার। হাত ধরিয়া যে নাড়ী দেখ, সে নাড়ী কি? আর নাড়ী ক্ষীণ হইয়াছে, বা নাড়ী নাই বলিলেই বা কি বুঝ? যতক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত বেশ চলা ফেরা করে, ততক্ষণই হাত ধরিয়া বেশ নাড়ী পাও। রক্তের চলা ফেরা কম হইলে, নাড়া ক্ষীণ হইয়াছে বুঝ। রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হইলে, আর নাড়ী পাও না—তখন বল নাড়ী নাই। ফল, কিন্তু নাড়ী বা শির যেখানকার, সেইখানেই থাকে। কেবল তার মধ্যে দিয়া রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হইয়া যায়। তবেই হৃৎপিণ্ডের বল কমিয়াছে কি

না, নাড়ী দেখিয়া তা বেশ ঠিক করিতে পার। সন্নিপাত অবস্থায় কখন কখন হাতে নাড়ী পাওয়া যায় না, কিন্তু বাউতে কি বগলে নাড়ী পাওয়া যায়। এর কারণ কি? এ রকম ঘটিলে কি বুঝিবে? হৃৎপিণ্ডের বল এত কম হইয়াছে যে, হাতের কব্জা পর্য্যন্ত রক্ত আসিয়া পঁহুছিতেছে না, এই বুঝিতে হইবে। ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ দিয়া হৃৎপিণ্ডের বল বাড়াইতে পারিলেই সন্নিপাত ঘুচাইতে পার।

এর আগেই বলিছি যে, ম্যালেরিয়া জ্বরে যে রকম উপসর্গই কেন থাক না, আর রোগীর অবস্থা যে রকমই কেন হোক না, কুইনাইন দিতে কখনও ভুলিবে না, কি ইতস্ততঃ করিবে না। নির্ভয়ে কুইনাইন দিবে। কুইনাইন দিলে উপসর্গ কি উপদ্রব বাড়িবে, এ একবারও মনে করিবে না। কেন না, উপসর্গ, কি উপদ্রবের কারণই ত ম্যালেরিয়া। কুইনাইন দিয়া যদি ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট করিতে পারিলে, তবে উপসর্গ কি উপদ্রবের আসল কারণই ত নষ্ট করিলে। কুইনাইন খাওয়াইলে উপসর্গ বাড়িবে বলিয়া যদি কুইনাইন না দেও, তবে তোমার হাতে সে রোগীর মৃত্যু, এক রকম ধরিয়া রাখ। তবে যদি বল, কুইনাইন না দিয়াও ত অনেক শক্ত রোগী বাঁচাইয়াছি। সে সব তেমন শক্ত রোগ নয়। সে সব রোগীর এমন শক্ত রোগ হয় নাই, যার এক একটা উপসর্গেই প্রাণ নষ্ট হইবার কথা। যে রোগে এই রকম ভয়ানক উপসর্গ দু তিনটী উপস্থিত থাকে, সেই রোগই আদত শক্ত। আর সেই রোগই চিকিৎসককে

হমশিম খাইয়ে দেয়। মাঝারি রকম শক্ত রোগীও যদি কখনও বাঁচাইয়া থাক, তাও সিংকোনার প্রসাদে বাঁচাইয়াছ। এ কথা, এর আগেই বলিছি (৮২—৮৩র পাত)। যে রকম শক্ত রোগীর কথা বলিলাম, সেই রকম একটী শক্ত রোগীর চিকিৎসা নীচে লিখিয়া দিলাম। সেই চিকিৎসায় দেখিবে ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইনে, মরা রোগীকেও বাঁচাইতে পারে। মরা রোগী কাকে বলে, এর আগেই তা বলিছি (৭৭র পাত)। এই চিকিৎসায় দেখিবে, উপসর্গ নিবারণের অসুদ, আর মূল রোগের আসল অসুদ, কেমন যুক্তি করিয়া দেওয়া হইয়াছিল। মূল রোগ যে ম্যালেরিয়া আর অর আসল অসুদ যে কুইনাইন, তা বুঝিতেই পারিতেছ।

এখানে আমার একটী রোগীর কথা বলি। বছর অনেক হইল, এক দিন বৈকালে একটী রোগী দেখিতে গইছিলাম। রোগীর বয়স ৪০।৪৫ বছরের কম নয়। ঘামো যতদূর বাড়িতে হয়, তা বাড়িয়াছিল। ঘড়ি ধরিয়া নাড়া দেখিলাম, প্রতি মিনিটে ১৪৪ বার নাড়া পড়িতেছে। গায়ের তাত ঠিক করিবার জন্যে, তার বগলে তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিলাম। ১০৪র দাগে পারা উঠিল। জিব খুব শুকনো আর রাঙা। ডান কোঁকের মধ্যে যেখানে লিবর থাকে, সেখানে ভারি ব্যথা। লিবর ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা যকৃত। ভাষা কথায় মেটেও বলে, পাতও বলে। পাঁটার যে মেটে দেখেছ, সেই মেটেকে লিবরও বলে, যকৃতও বলে, পাতও বলে। ডান কোঁকে

পাঁজরের উপর আর তার নীচে বাঁ হাতের দুটী আঙ্গুল উপুড় করিয়া রাখিয়া, তার উপর ডান হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া, একটু জোরে ঘা দিতেই রোগীর ভারি ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, তার মেটের (লিবরের) মধ্যে রক্ত জমা হইয়াছে। কোন যন্ত্রে রক্ত জমা হইলে তাতে ভারি ব্যথা হয়। এই রকম ঘা দিয়া সে ব্যথা ঠিক করিতে হয়। বাঁ হাতের আঙুল সরাইয়া সরাইয়া দিতে হয়, আর তার উপর ডান হাতের আঙুল দিয়া ঐ রকম করিয়া ঘা দিতে হয়। কত দূর লইয়া ব্যথা হইয়াছে, এতে তাও জানিতে পারা যায়। নাড়ীর অবস্থা, গায়ের তাত, জিব, আর লিবরে ব্যথা—এই রকম করিয়া পরীক্ষা করিবার সময়, তার চারি পাঁচ বার হিক্কি উঠিল; আর দুই চারিটে ভুল কথাও বলিল। এ ছাড়াও মাঝে মাঝে পেটের কামড় আর শূলনিতে এক এক বার অস্থির হইতে লাগিল। আমি সেখানে বসিয়া থাকিতে থাকিতেই, তার দু বার আমরক্ত ভেদ হইল। এর আগে, আর এক জন ডাক্তর তার চিকিৎসা করিয়াছিলেন। তিনি অনেক অসুদ বিসুদ দিইছিলেন; কিন্তু কিছুতেই তার ব্যামো খাটো করিতে পারেন নাই। পর পর তার ব্যামো বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, তিনি তার আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যান। তাঁর আত্মীয় স্বজন সকলেই বলিল যে, জ্বরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই এই সব উপসর্গ ঘটিয়াছে।

এর আগেই বলিছি যে, ম্যালেরিয়া বিষে না ঘটাইতে পারে, এমন রোগই নাই। ম্যালেরিয়া জ্বরে যে সব উপসর্গ

দেখিতে পাও, আর যে সব উপসর্গের কথা শুনিতে পাও, সে সব উপসর্গ ম্যালেরিয়া-বিষেতেই ঘটায়। এ জানা না থাকিলে, সে সব উপসর্গ আসল রোগ বলিয়া ভুল হইতে পারে। এ রকম ভুল হইলে, রোগীকে যতই কেন অসুদ খাওয়াও না, কখনই তার রোগ সারিতে পারিবে না। এ রকম ভুল অনেকেরই হইয়া থাকে। এই রোগীটার যিনি চিকিৎসা করিছিলেন, তাঁরও এই রকম ভুল হইছিল। এই জন্যে, তিনি এর আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া যান। উপ-সর্গেরও চিকিৎসা করা চাই। মূল রোগেরও চিকিৎসা করা চাই। তা হইলেই রোগীকে বাঁচাইতে পারা যায়।

তার পর, এর যে রকম চিকিৎসা করিছিলাম, এখন বলি। ডান্ কোঁকে অর্থাৎ লিবরের (যকৃতের) জায়গায় এক খান বেলস্তরা বসাইয়া দিলাম। তার পর, যে সব অসুদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

রোগীকে চাঙ্গা করিবার জন্যে।

(১) য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট অব্ য়্যামোনিয়া		৪ ড্রাম
স্পিরিট অব্ ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক ঈথর)		৪ ড্রাম
স্পিরিট্ বাইনম্ গ্যালিসাই (ব্রাণ্ডি) ১র নম্বর		৩ ঔন্স
টিংচর সিংকোনি কো	...	৬ ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম্ কো	...	৬ ড্রাম
ডিককৃশন্ সিংকোনো	...	১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ অসুদ্ধ ছু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম।

পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে।

(২) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্)	...	৪ ড্রাম
মিয়ুসিলেজ (গঁদ-ভিজের জল)	...	৪ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ তিন ঘণ্টা অন্তর, গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম। এ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি দিবার জন্য, কাচের একটা ছোট পিচ্‌কিরি দরকার। এ রকম পিচ্‌কিরি বাজারে কিনিতে পাওয়া যায়। এর দামও বেশী নয়। তিন আনা, চৌদ্দ পয়সায় পাওয়া যায়।

ভুল-বকা সারিবার জন্যে।

(৩) ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম্	...	১½ দেড় ড্রাম
টিংচর অব্ বেলাডনা	...	১ ড্রাম
সিরপ জিঞ্জর	... ...	৬ ড্রাম
ডিল্ ওয়াটর (য়্যাকুই য়্যানিথাই)		৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ৬ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াতে বলিলাম।

পথ্য——দুধ, য়্যারারুট্, আর মাংসের কাথ দিতে বলিলাম।

তার পর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থা আগের চেয়ে অনেক ভাল। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলাম, প্রতি মিনিটে নাড়ী ১২০ বার পড়িতেছে। তাপমান-যন্ত্র

(থর্ম্মমিটর) বগলে দিয়া দেখিলাম, ৯৯র দাগ ছাড়াইয়া ছোট ৪টী দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিয়াছে। কিন্তু জিব প্রায় তেমনি শুক্‌নো আর রাঙা আছে, হিক্কি আগের চেয়ে কিছু কমিয়াছে। পেটের কামড়, শূলনি, আর বেগ তত নাই। ভুল-বকাও তত নাই। আর রোগীকে আগের চেয়ে কিছু যেন চাঙ্গা দেখিলাম।

গায়ের তাত সহজ হইয়াছে। আর কি দেরি করা যায়? জ্বর আর আসিতে না দিলে, সব উপসর্গ আপনিই যাবে। যে জ্বরে এ সব উপসর্গ আনিয়াছে, সে জ্বর গেলে, কি আর উপসর্গ থাকিতে পারে? আর জ্বর গেলে উপসর্গ কার আশ্রয় লইয়া থাকিবে? তবে জ্বর আসা বারণ করিবারও অসুদ দেওয়া চাই, আর তার সঙ্গে উপস্থিত উপ-সর্গ নিবারণের অসুদ দেওয়া চাই। নৈলে, দু কাজ এক বারে সিদ্ধি হবে কেন? এই বলিয়া আর দেরি না করিয়া, তখনই কুইনাইন্ মিক্‌শ্চর খাওয়াইয়া দিলাম। কুইনাইন্ মিক্‌শ্চরে কি কি অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কুইনাইন্	...	...	১ ড্রাম
ডাইলিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক য়্যাসিড		...	১ "
টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্)		...	১ "
বাইনম ইপেকা	...	...	৬ "
ডিল ওয়াটর	...	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যখন

জ্বর না থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এই অসুদ এক এক দাগ খাওয়াইবে।

সন্ধ্যার একটু আগে গিয়া দেখিলাম, রোগীর অবস্থা এক বারে ফিরে গিয়াছে। জ্বর আসে নাই। ভুল-বকা নাই। হিক্কি অনেক কম। জিব তত শুক্‌নো নয়, আগের চেয়ে ঢের সরস, আর তত রাঙাও নয়।* বারে বারে বাহ্যে যাওয়া, পেটের কামড়, আর শূলনি অনেক কম। সঞ্চিত মল অনেক নিঃসরণ হইয়াছে।

চারি দিন ঠিক এই রকম নিয়ম করিয়া অসুদ আর পথ্য দিলে, রোগী বেশ আরোগ্য হইল। কেবল হিক্কি থামাই-বার জন্যে, তাকে আর একটী অসুদ দিতে হইছিল। সে অসুদটি নীচে লিখিয়া দিলাম।

সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর	... ...	৪ ড্রাম
ডিলওয়াটর (য়্যাকুইয়্যানিথাই)	...	১০ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। যত বার হিক্কি হইবে, তত বার এই অসুদ এক এক দাগ করিয়া খাওয়াইবে। এটী হিক্কির বড় চমৎকার অসুদ। খাওয়া-ইবা মাত্র হিক্কি বন্ধ হয়। কিন্তু খানিক পরে আবার হয়। আবার এক দাগ অসুদ খাওয়াইলেই বন্ধ হয়। এই রকম করিয়া বারে বারে খাওয়াইতে হয়। হিক্কি যদি নিতান্ত বাঁকা রকম না হয়, তবে, পাঁচ সাত বার অসুদ খাওয়াইলেই

* রাঙা জিব, পেটের দোষের আর আঁতের দোষের চিহ্ন। অমন রক্ত-আমাশায় জিব রাঙা হইবে আশ্চর্য্য কি?

হিক্কি থামিয়া যায়। নৈলে, অনেক বার খাওয়াইতে হয়। ফল কথা, এর চেয়ে হিক্কির ভাল অসুদ আর নাই।

এখানে যে সব উপসর্গ ঘটিছিল, সে সব উপসর্গ থাকিতে রোগীকে কুইনাইন্ দেওয়া উচিত নয়, আর, এ সব উপসর্গ থাকিতে কুইনাইন্ দেয়ও না? কুইনাইন্ দিলে উপসর্গ বাড়ে বৈ কমে না। এ রকম ভাবিয়া, আমি যদি তাকে ঐ রকম করিয়া কুইনাইন্ না খাওয়াইতাম, তবে তাকে কখনই বাঁচাইতে পারিতাম না। কুইনাইন্ খাওয়াইলে হিক্কি বাড়িবে, জিব আরও শুক্‌নো হইবে, ভুল-বকা আরও বাড়িবে, রক্ত-আমাশা আরও বাড়িবে—এ যদি ভাব, তবে এ রকম রোগীর চিকিৎসা করিয়া কখনও যশ পাইবে না। কুইনাইন্ না দিলে অপ্রতিভ হইবে। এই সব উপসর্গ দেখিয়া যাঁরা কুইনাইন্ দিতে ভয় পান, তাঁদের হাতে এ রকম রোগী প্রায়ই মারা যায়।

এখানে কুইনাইনের সঙ্গে টিংচর ওপিয়াই আর বাইনম্ ইপেকা দিবার কারণ কি? এ কথা জিজ্ঞাসা করিতে পার। এর আগেই বলিছি যে, মূল রোগের অসুদ, আর উপসর্গ নিবারণের অসুদ, দুই অসুদই এক সঙ্গে দেওয়া চাই। নৈলে, তেমন কাজ হয় না। এখানে মূল রোগের অসুদ কুইনাইন্। আর উপসর্গ অর্থাৎ আমরক্ত ভেদ, পেটের কামড়, আর শূলনির অসুদ টিংচর ওপিয়াই আর বাইনম্ ইপেকা। এ ছাড়া, আফিঙের সঙ্গে মিশাইলে, কুইনাইনের যে তেজ বাড়ে, তা এর আগেই বলিছি। আর, বাইনম্ ইপেকা শুদ্ধু রক্ত-আমাশার অসুদ নয়, জ্বরেরও

অসুদ। কাজেই, এ রকম কুইনাইন্ মিক্শচর্ খাওয়াইলে যে, জ্বর আর উপসর্গ দুই-ই দমন হবে, তা বেশ বুঝা যাইতেছে।

আমার বেশ মনে আছে, এই রকম কুইনাইন্ মিক্শচর্ খাওয়াইয়া, আর লডেনমেঘ্ন (আফিঙের আরোকের) ঐ রকম পিচ্কিরি বারে বারে দিয়া আর একটী রোগীর জ্বর আর রক্ত-ভেদ ভাল করিছিলাম। তার পেটের কামড়ও ছিল, বেগ শূলনিও ছিল। রক্ত-ভেদ হইতেছে, তার উপর আবার কুইনাইন্ খাওয়াইবে? এ কথা, রোগীর আত্মীয় স্বজনে ত বলেই। অনেক চিকিৎসকেও বলেন। কিন্তু কি জন্যে রক্ত-ভেদ হইতেছে, সেটা আগে ভাবিয়া দেখা উচিত। এ রক্ত-ভেদ, ম্যালেরিয়া-জ্বরের একটা উপসর্গ বৈ ত না। কাজেই, উপসর্গেরও অসুদ দেওয়া চাই, আর সেই সঙ্গে ম্যালেরিয়া-জ্বরের 'আসল অসুদ, কুইনাইনও দেওয়া চাই। এ রকম বুঝিয়া সুঝিয়া চিকিৎসা করিতে পারিলে, হাজার কেন উপসর্গ থাক না, আর রোগীর অবস্থা যতই কেন খারাপ হোক না, কখনও অপ্রতিভ হইবে না।

মোটামুটি জানিয়া রাখ—ম্যালেরিয়া-জ্বরে কোনও উপসর্গ মানিবে না। জ্বর ছাড়িলে, কি জ্বর কমিলে, উপ-সর্গ নিবারণের অসুদ, আর কুইনাইন্ একত্র মিশাইয়া দিবে। উপসর্গকে কখনও মূল রোগ বলিয়া ভুল করিও না। জ্বরের তেজ কম, কিন্তু মাথার কামড়ে রোগী অস্থির! এখানে মাথার কামড়কে কি বলিবে? মূল রোগ বলিবে, না উপ-সর্গ বলিবে? মূল রোগ বলিয়া চিকিৎসা কর ত ঠকিবে।

কেন না, অমুদ বিমুদ দিয়া মাথার যন্ত্রণা কমাইলে। রোগী একটু আরাম পাইল। কিন্তু আবার জ্বর যে আসিল, সেই মাথার কামড় চারি গুণ বাড়িল। এতে তোমার উপর রোগীর ভক্তি থাকিবে কেন? যখন জ্বর ছিল না, বা কম ছিল, তখন মাথার কামড়ের অমুদের সঙ্গে কুইনাইন্ খাওয়াইলে, মাথার কামড়ও সারিত, জ্বর আসাও বারণ হইত। সব জায়গায় এই রকম বুঝিয়া কাজ করিবে।

এর আগেই বলিছি যে, কুইনাইন্ খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে। কুইনাইন্ ছাড়া আর একটী অমুদ আছে, যা খাওয়াইলেও গায়ের তাত কমে। এ অমুদের নাম য়্যাকোনাইট্। কাঠ বিষকে ইংরিজিতে য়্যাকোনাইট বলে। জ্বরে যদি বড়ই গায়ের তাত হয়, তবে ৫০র পাতে যে হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিক্‌শ্চর লিখিয়া দিইছি, সেই মিক্‌শ্চরের (আরোকের) সঙ্গে ৬ ফোটা টিংচর য়্যাকোনাইট্ মিশাইয়া লইবে। তা হইলে, একবার খাওয়াইবার অমুদে এক ফোটা করিয়া টিংচর য়্যাকোনাইট্ থাকিবে। এ অমুদ কম মাত্রায় খাওয়াইলে বেশী উপকার হয়। এ অমুদ খাওয়াইলে, গায়ের তাত কমে আর খুব শীঘ্র ঘাম হয়; আর ঘামও খুব হয়। শুদু একটু জলের সঙ্গে, এক ফোটা কি আধ ফোটা করিয়া টিংচর য়্যাকোনাইট্ খাওয়াইলেও গায়ের তাত কমে, আর খুব ঘাম হয়। ছেলেরা অমুদ খাইতে বড় নারাজ। তাদের সোজাসুজি জ্বরে শুদু য়্যাকোনাইট্ খাওয়াইলেই বেশ কাজ হয়। গায়ের তাতও কমে, ঘামও হয়। গায়ের তাত কমিলে, আর

ঘাম হইলে, কুইনাইন্ দিয়া জ্বর আসা বন্ধ করিতে পার। ৪।৫ ঔন্স জলে এক ফোটা টিংচর য়্যাকোনাইট্ দিয়া ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক (চা খাবার চামচের এক চামচ) অর্থাৎ এক ড্রাম করিয়া সেই জল এক বছরের ছেলেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে পার। বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া অসুদ দিবে।

ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-জ্বরের লক্ষণ, উপসর্গ আর চিকিৎসা এক রকম মোটামুটি বলিলাম। ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-জ্বর কত রকম, এখন তাই বলিব।

আমাদের দেশে সচরাচর চারি রকম সবিরাম-জ্বর দেখা যায়।

(১) যে জ্বর রোজ এক বার আসে। এতক্ষণ এই জ্বরের কথা বলিতেছিলাম। এ জ্বরের ভোগ ১২ ঘণ্টার বেশী বৈ কম নয়। বিচ্ছেদ-কাল, ১২ ঘণ্টার কিছু কম। এ জ্বর সচরাচর সকাল বেলা হয়। আমাদের দেশে এই জ্বরই খুব সাধারণ।

(২) যে জ্বর এক দিন অন্তর আসে। একে পালাজ্বর বলে। এর পালা এক দিন অন্তর। এ জ্বরের ভোগ ৮ ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাল ১৬ ঘণ্টার কম নয়। এ জ্বর সচরাচর দুপর বেলা হয়।

(৩) যে জ্বর দু দিন অন্তর আসে। একেও পালা-জ্বর বলে। এর পালা দু দিন অন্তর। এ জ্বরের ভোগ ৬ ঘণ্টার বেশী নয়। বিচ্ছেদ-কাল ১৮ ঘণ্টার কম নয়। এ

জ্বর সচরাচর বিকেল বেলা হয়। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরের চেয়ে, দু দিন অন্তর পালা-জ্বর শক্ত। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরে, গায়ের তাত সব চেয়ে বেশীক্ষণ থাকে। দু দিন অন্তর পালা-জ্বরে শীত বা কম্প সব চেয়ে অনেকক্ষণ থাকে। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরের চেয়ে দু দিন অন্তর পালা-জ্বর কম।

(৪) যে জ্বর রোজ দু বার আসে। একে দুকালীন জ্বর বলে। এ জ্বরের নামে লোকে ডরায়। এ বড় শক্ত জ্বর। এ জ্বর ছাড়ান বড় শক্ত। বিশেষ, এ জ্বরের সঙ্গে যদি পিলে পাত্ থাকে, তবে রোগীকে বাঁচানই ভার। দিনের বেলায় যে সময় জ্বর আসে, রাত্রেও সেই সময় জ্বর আসে। কখন কখন, এ নিয়মের একটু এদিক ওদিক হয়।

(১) যে জ্বর রোজ একবার আসে, তার চিকিৎসা কেমন করিয়া করিতে হয়, তা এর আগেই বলিছি।

(২) যে জ্বর এক দিন অন্তর আসে, তাকে এক দিন অন্তর পালা-জ্বর বলে। অসুদ দিয়া পালা বন্ধ না করিলে, পালা-জ্বর অনেক দিন থাকে। ৬।৭ মাসও থাকে, এক বছরও থাকে। কখন কখন, কিছু দিন পরে পালা আপনিই বন্ধ হইয়া যায়। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পালা-জ্বরে, জ্বর আসিবার আগে প্রায়ই কম্প হইয়া থাকে। কম্পতেই পিলে আর পাত বাড়ে এ কথা এর আগেই বলিছি। এই জন্যে, পালা-জ্বরকেও সোজা জ্ঞান করা হবে না। যত শীঘ্র পার, পালা বন্ধ করিয়া দিবে।

চিকিৎসা—মনে কর, রবিবারের দিন বেলা দুপরের

সময় কম্প দিয়া জ্বর আসিল। তার পর, রাত্রি ৮টার সময় ঘাম দিয়া সেই জ্বর ছাড়িল। যেই জ্বর ছাড়িল, সেই দশ গ্রেন কুইনাইন্ খাও। তারপর, মঙ্গলবারের দিন (সেই দিন জ্বরের পালা) সকাল পর্য্যন্ত, ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ ২ ঘণ্টা অন্তর খাও। তারপর বেলা ৮টার সময় ১০ গ্রেন্ আর বেলা ১০টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাও। বেলা দুপরের সময় যে জ্বর আসিবার কথা, সে জ্বর আর আসিবে না। তবেই দেখ, এই রকম করিয়া কুইনাইন্ খাইলে, এক দিনেতেই পালা বন্ধ হইয়া যায়। মঙ্গলবারের দিন দুপরের সময় পালা বন্ধ হইয়া গেল। তারপর, বৃহস্পতি বারের সকাল পর্য্যন্ত, আবার ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ ৩ ঘণ্টা অন্তর খাও। তারপর, বেলা ৮টার সময় ১০ গ্রেন্, আর বেলা ১০টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাও। বৃহস্পতি বারের দিন, বেলা দুপুরের পর থেকে, শনিবারের দিন সকাল পর্য্যান্ত ২ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ ৪ ঘণ্টা অন্তর খাও। তার পর, বেলা ১০টার সময় ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাও। এই রকম করিয়া ৩ পালা বন্ধ হইয়া গেলে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ১৪ দিন পর্য্যন্ত একটা বলকারক অসুদ খাও। ৬৪র পাতে এই বলকারক অসুদ লেখা আছে। ৬৫র আর ৬৬র পাতে ১০ গ্রেনের মিকশ্চর, আর ২ গ্রেনের মিকশ্চর লেখা আছে। এখানেও সেই রকম করিয়া অসুদ তয়ের করিয়া লইবে।

(৬) যে জ্বর দু দিন অন্তর আসে, তাকে দু দিন অন্তর পালা-জ্বর বলে। এক দিন অন্তর পালা-জ্বরের যে রকম

চিকিৎসা বলিলাম, দু দিন অন্তর পালা-জ্বরেও ঠিক্ সেই রকম চিকিৎসা করিবে। উপরো উপ্রি ৩ পালা বন্ধ হইয়া গেলে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার দিন থেকে ২১ দিন পর্য্যন্ত ঐ বলকারক অসুদটী খাবে।

যদি বল, পালা বন্ধ হইয়া গেলে, ১৪ দিন কি ২১ দিন পর্য্যন্ত অত বাঁধা-বাঁধি করিয়া কুইনাইন্ খাইবার দরকার কি? দরকার কি, তা বলি। এর আগেই বলিছি (৬২র পাতে) যে জ্বর রোজ আসে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া সে জ্বর বন্ধ করার পর, যদি আর কুইনাইন না খাওয়াও, তবে আট দিনের দিন আবার জ্বর আসে। আবার, এক দিন অন্তর পালা-জ্বরে, প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার পর, যদি আর কুই-নাইন্ না খাও, তবে ১৪ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। সেই রকম দু দিন অন্তর পালা-জ্বরে প্রথম পালা বন্ধ হওয়ার পর, যদি আর কুইনাইন্ না খাও, তবে ২১ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। কাজেই ও রকম বাঁধা বাঁধি করিয়া কুইনাইন্ না খাইলে, জ্বরের হাত এড়ান ভার। এ সব জ্বরের যে এ রকম স্বভাব, তা সকলের জানা নাই। এই জন্যে, সাধারণের বিশ্বাস যে কুইনাইন্ খাইলে জ্বর আট-কাইয়া যায়। ফল, কিন্তু তা নয়। কুইনাইন্ খাইলেই জ্বর বন্ধ হয়। জ্বর বন্ধ হওয়ার পর আর কুইনাইন্ না খাইলে, ৮ দিনের দিন, ১৪ দিনের দিন, কি ২১ দিনের দিন আবার জ্বর আসে। কোন্ রকম জ্বর কবে ফিরে আসে, এই মাত্র তা বলিছি। এ সব জ্বরের এ রকম স্বভাব যখন সাধারণে জানিতে পারিবে, তখন কুইনাইনে জ্বর আটকাইয়া

দেয়—এ বিশ্বাসটা আর থাকিবে না। তখন ইতর লোকে-রাও কুইনাইন্ খাইতে ডরাবে না। তখন ম্যালেরিয়া-জ্বরে লোকও খুব কম মরিবে। কুইনাইনে জ্বর আটকাইয়া দেয় বলিই না, লোকে কুইনাইন্ খাইতে ডরায়। জ্বরে ভুগে ভুগে মরে, তবু কুইনাইন খায় না।

(৪) যে জ্বর রোজ দু বার আসে, তাকে দুকালীন-জ্বর বলে। দু কালীন-জ্বর শীঘ্র ছাড়িতে চায় না। অনেক দিনের হইলে, জ্বর ছাড়ান ভারি শক্ত হইয়া পড়ে। খুব সাহস করিয়া বেশী কুইনাইন্ না দিতে পারিলে, জ্বর ছাড়ান ভার। সম্প্রতি আমার ৫ বছরের একটী ছেলের দুকালীন-জ্বর হইছিল। সচরাচর পুরাণ-জ্বর ভোগ করিতে করিতে দুকালীন-জ্বর প্রকাশ পাইয়া থাকে। কিন্তু এর নব জ্বরেই দু বার করিয়া জ্বর আসিত। যে দিন প্রথম জ্বর আসিল, সেই দিনেই দু বার জ্বর হইল। হিসাব করিয়া দেখিছি, ৪ দিন উপরো উপরি তাকে রোজ ২১ গ্রেন্ করিয়া কুই-নাইন্ খাওয়াইতে হইছিল। তবে জ্বর ত্যাগ হইছিল। বেলা ১১টার সময়, আর রাত্রি ১১টার সময় জ্বর আসিত। তিন দিনের দিন, দিনমানের জ্বরটা বন্ধ হইয়া গেল। কুই-নাইন্ নিয়ম মত খাওয়াইতে লাগিলাম। ভাবিলাম, রাত্রে আর জ্বর আসিবে না! কিন্তু রাত্রি ১টার সময় জ্বর আসিল। এই টুকু ছেলেকে এত কুইনাইন্ খাওয়াইলাম, তবু তিন দিনেতেও তার দু বার জ্বর আসা বন্ধ হইল না। এতে বোধ হইতেছে; অবশ্যই তার লিবরের (যকৃতের, মেটের) দোষ আছে। তা না থাকিলে কুইনাইনের ঠিক কাজ হইতেছে না

কেন ? এই ভাবিয়া, তার ডান কোঁকে পাঁজরের উপর আর তার নীচে—বাঁ হাতের দুটী আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া, তার উপর ডান হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া একটু জোরে, বার কতক ঘা দিলাম। ঘা দিতেই ব্যথা ব্যথা বলিয়া কাঁদিয়া উঠিল। এতেই জানিলাম লিবরে (যকৃতের) মধ্যে রক্ত জমা হইয়াছে। তাতেই জ্বরটুকু একবারে ছাড়িতেছে না। এর আগেই বলিছি (৯১—৯৩র পাত) যে, কোন যন্ত্রে রক্ত জমা হইলে, তাতে ভারি ব্যথা হয়। এই রকম ঘা দিয়া সে ব্যথা ঠিক করিতে হয়। জ্বর একটু শক্ত হইলে প্রায়ই লিবরে (যকৃতে) ব্যথা হইয়া থাকে। লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমা থাকিতে, কুইনাইন খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়ান ভার। এই জন্যে, যখন দেখিবে যে, জ্বর বিচ্ছেদে নিয়ম করিয়া কুইনাইন খাওয়াইয়াও জ্বর ছাড়াইতে পারিলে না তখন লিবরের (যকৃতের) জায়গায়, ঐ রকম করিয়া ঘা দিয়া দেখিবে। ঐ রকম করিয়া ঘা দিয়া যদি ব্যথা বলে, তবে লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমা হইয়াছে, ঠিক করিবে। তার পর বলি। বেশী কষ্ট পাবে বলিয়া, সে রাত্রে ছেলের লিবরের (যকৃতের) উপর কিছু লাগাইলাম না। কিন্তু জ্বর ছাড়িলে, যেমন কুইনাইন দিতে হয়, তা দিলাম। তার পর দিন, তার ডান কোঁকে তুলি করিয়া আয়োডিনের আরোক এক পোঁচ লাগাইয়া দিলাম। খানিক পরে, তার ভারি জ্বালা ধরিল। জ্বালাতে শিশু কাঁদিয়া অস্থির হইল। অনেক ক্ষণের পর তবে জ্বালা থামিল। সে দিন, দিনের বেলায়ও জ্বর আসিল না, রাত্রেও

জ্বর আসিল না। সেই দিন থেকে তার জ্বর বন্ধ হইয়া গেল। জ্বর বন্ধ হইয়া গেলেও, তাকে ১০।১২ দিন কুইনাইন খাওয়াইয়াছিলাম। এখানে যে আয়োডীনের আরোকের কথা বলিলাম, সে কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

আয়োডীন	...	...	...	২০ গ্রেন্
আয়োডাইড্ অব পোটাসিয়ম্		...	...	২০ গ্রেন্
রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্		...	...	৪ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির মুখ কাক দিয়া ভাল করিয়া আঁটিয়া রাখিবে। নৈলে, আয়োডীন উপিয়া যাবে। কাটির আগায় ন্যাকড়া জড়াইয়া তুলি করিতে হয়। প্রথম এক পোঁচ দিয়া দেখিবে, যদি খানিক পরে জ্বালা না ধরে, তবে তার উপর আর এক পোঁচ দিবে। জ্বালা ধরে ত আর দিওনা। সচরাচর এক পোঁচেই খুব জ্বালা ধরে। ফল কথা, খুব জ্বালা ধরা চাই। নৈলে, লিবরের (যকৃতের) মধ্যে রক্ত-জমা সারিবে না। যেই খুব জ্বালা ধরে, সেই লিবরের (যকৃতের) মধ্যে জমা রক্ত সারিয়া যাইতে আরম্ভ করে।

জ্বর ছাড়িলে, যে রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয়, এর আগেই তা বলিছি দ্বকালীন জ্বরেও ঠিক সেই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে। বরং এ জ্বরে আরও বেশী বেশী করিয়া কুইনাইন্ খাওয়ান উচিত। কেন না, যে জ্বর রোজ একবার আসে সে জ্বরের বিচ্ছেদকাল ১২ ঘণ্টার কম নয়। কাজেই কুইনাইন্ খাওয়াইবার

ঢের সময় পাওয়া যায়। কিন্তু দুকালীন জ্বরের বিচ্ছেদ-কাল বড় কম। চারি, পাঁচ, কি বড় জোর ছ ঘণ্টা। এই চারি, পাঁচ, কি ছ ঘণ্টার মধ্যে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইতে পার ত ভাল হয়। তা হইলে, হয় ত এক দিনেই জ্বর আসা বন্ধ হইতে পারে। জ্বর যেই ছাড়িল, সেই ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিবে। জ্বর আসার এক ঘণ্টা কি দেড় ঘণ্টা আগে আর ১০ গ্রেন্ দিবে। এর মধ্যে দু বারে ৫ গ্রেন্ করিয়া ১০ গ্রেন্ দিবে। যে কয় দিন জ্বর আসা বন্ধ না হইবে, সে কয় দিন এই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ দিবে। দু দিন এই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ দিয়া, যদি দেখ যে, জ্বর আসা এক বারে বন্ধ হইল না, তবে লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমা হইয়াছে, ঠিক করিবে *। ডান কোঁকে ঘা দিয়া কেমন করিয়া রক্ত জমা ঠিক করিতে হয়, এর আগেই তা বলিছি। তার পর ঐ রকম করিয়া আয়োডানের আরোক লাগাইয়া দিবে।

দুকালীন জ্বর সোজা নয়। এ জ্বরকে লোকে বড়ই ভয় করে। সাধারণ লোকের বিশ্বাস যে, এ জ্বর সারে না। দুকালীন জ্বর যার হয়, সে বাঁচে না। এ রকম বিশ্বাস নিতান্ত ভুল নয়। কেন না, যে জ্বর রোজ এক বার আসে, সেই জ্বরের ধাক্কা সামলান যায় না। তাতে রোজ

* যদি বল লিবর (যকৃত) ছাড়া কি আর কোনও যন্ত্রে রক্ত জমা হয় না? হয়। ১৯—২০র পাত দেখ। লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমা হইয়া থাকিলে, জ্বর যেমন একবারে ছাড়িতে চায় না; আর কোনও যন্ত্রে রক্ত জমা হইলে সে রকম প্রায় ঘটে না।

দু বার জ্বর ভোগ করিলে কি আর বাঁচন আছে ? এই জন্যে , দুকালীন-জ্বর যত শীঘ্র পার, বন্ধ করিয়া দিবে।

যে জ্বর রোজ একবার আসে, সে জ্বরের চিকিৎসায় যা যা করিতে হয় বলিছি, পালা-জ্বর আর দুকালীন-জ্বরেরও চিকিৎসা ঠিক সেই রকম নিয়মে করিবে। শীত বা কম্পের সময় যা যা করিতে হয়, জ্বর ফুটিলে যা যা করিতে হয়, দাহ, পিপাসা, মাথা-ধরার চিকিৎসা যে রকম করিয়া করিতে হয়, এর আগে (১৪—৫১র পাতে) সে সব বেশ করিয়া বলিছি। এই জন্যে, এখানে সে সব কথা আর বলিলাম না।

এখানে যে চারি রকম সবিরাম-জ্বরের কথা বলিলাম, সেই চারি রকম জ্বরই সচরাচর ঘটে। তা ছাড়া, আরও কয় রকম সবিরাম জ্বর আছে। সে গুলিরও কথা এখানে বলা ভাল। নৈলে, সে রকম একটী রোগী পাইলে বলিবে, কৈ, এ রকম জ্বরের কথা ত বৈতে লেখা নাই। তাতেই সে গুলির কথা এখানে বলিলাম।

(ক) জ্বর রোজ এক বার আসে। কিন্তু এক দিন অন্তর জ্বরের ভোগ আর তেজ বাড়ে।

(খ) এক দিন দু বার জ্বর আসে। তার পর দিন এক বার জ্বর আসে।

(গ) এক দিন অন্তর দু বার জ্বর হয়।

(ঘ) দু দিন উপরো-উপরি জ্বর হয়। তার পর দিন ভাল যায়। অবেই কেবল তিন দিনের দিন জ্বর থাকে না।

(ঙ) জ্বরের দিন দু বার জ্বর হয়। তার পর, উপরো-উপরি দু দিন ভাল যায়।

(চ) উপরো-উপরি দু দিন অল্প জ্বর হয়। তিন দিনের দিন ভারি জ্বর আসে।

(ছ) পাঁচ দিন অন্তর, ছয় দিন অন্তর, সাত দিন অন্তর আট দিন অন্তর, নয় দিন অন্তর, দশ দিন অন্তর, এক মাস অন্তর, কি এক বছর অন্তর জ্বর হয়।

আগে যে চারি রকম জ্বরের কথা বলিছি, সে চারি রকম জ্বরেরও যেমন চিকিৎসা, এ সব জ্বরেরও সেই রকম চিকিৎসা জানিবে।

সবিরাম-জ্বরের কথা মোটামুটি এক রকম সব বলিলাম। এখন কুইনাইন্ ছাড়া, এ জ্বরের আর কোনও অসুদ আছে কি না, বলিব।

১। কুইনাইন্ এ জ্বরের যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর আছে কি, না? নাই! ভারতে আবার নাই কি? কুইনাইন্ ত আমাদের দেশে কাল আসিয়াছে বলিলেই হয়। কিন্তু এ জ্বর ত আমাদের দেশের নূতন রোগ নয়। আজই যেন কুইনাইনের এত আদর হইয়াছে! আগে এ জ্বরে কি অসুদ দিত? বৈদ্যরা এ জ্বরে যে অসুদ দিতেন, সে অসুদের শক্তি কুইনাইনের চেয়ে বেশী বৈ কম নয়। সে অসুদ আর কি? আর্সেনিক। আর্সেনিক ইংরিজি কথা। বাঙ্গালায় একে শেঁকো বিষ বলে। কেউ কেউ বলেন, কুইনাইনের চেয়েও আর্সেনিক (শেঁকো) ম্যালেরিয়া-জ্বরের ভাল অসুদ। আবার কেউ কেউ বলেন, কুইনাইনের

নীচেই আর্সেনিক (শেঁকো)। যিনি যাই বলুন—কুই-নাইনের চেয়ে আর্সেনিকের (শেঁকোর) শক্তি কখনই কম নয়, বরং বেশী। পুরাণ-জ্বরে, অনেক জায়গায়, কুইনাইনের চেয়ে আর্সেনিকে (শেঁকোতে) বেশী কাজ করে। এ ছাড়া, কুইনাইনের মত আর্সেনিক (শেঁকো) অত বিকটও নয়। দামীও নয়। তবেই দেখ, সব দিক ধরিতে গেলে, কুই-নাইনের চেয়ে আর্সেনিক শ্রেষ্ঠ।

কম্প-জ্বরে আর্সেনিকে যেমন উপকার হয়, কুইনাইনে তেমন হয় না। অনেকে হয় ত এ কথা বিশ্বাস করিবেন না। কিন্তু আমি নিজের শরীরের উপর পরীক্ষা করিয়া দেখিছি, আর্সেনিক কম্প জ্বরের যথার্থ ই ব্রহ্মাস্ত্র।

আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, আমার এক বার কম্প-জ্বর হইছিল। আমার বয়স তখন ১৪।১৫ বছ-রের কম নয়। রোজ বেলা ৮ টার সময় কম্প দিয়া জ্বর আসিত। এক ঘণ্টা দেড় ঘণ্টা কম্প থাকিত। কম্পের সময় দাঁতে দাঁতে এমন শব্দ হইত যে, ঘরের বাইরে যারা থাকিত, তারা পর্য্যন্ত শুনিতে পাইত। এখন পাড়াগাঁয়ে কুইনাইন্ যেমন চলিত হইয়াছে, তখন সে রকম ছিল না। কাজেই টোটকা অসুদ যে যা বলিত, তাই করিতাম, আর রোজ কম্প-জ্বর ভোগ করিতাম। আমাদের গাঁয়ে এক জন চাষা বৈদ্য ছিল। সে জাতিতে নাপিত। তার বাপেরও চিকিৎসা ব্যবসা ছিল। আমি কম্প-জ্বরে এত কষ্ট পাই-তেছি দেখিয়া, সে এক দিন, আমাকে তার বাড়ীতে ডাকিয়া লইয়া গেল। তার ঘরে দু তিন খান পেঁতে ছিল। সেই

পেঁতে দেখিয়া সে অসুদও তয়ের করিত, চিকিৎসাও করিত। তারই মধ্যে যে খানায় কম্প-জ্বরের চিকিৎসা লেখা ছিল, সেই খান লইয়া আমার কাছে কম্প-জ্বরের চিকিৎসা পড়িল। পড়িয়া বলিল, এতে যেমন যেমন লেখা আছে, যদি ঠিক সেই রকম করিয়া, অসুদ তয়ের করিয়া তোমাকে দিতে পারি, তবে তিন দিনেই তোমাকে নীরোগ করিতে পারি। আমিও দেখিলাম অসুদটা তয়ের করা শক্ত নয়। সে আমার সম্মুখেই অসুদ তয়ের করিল। সে যেমন করিয়া তয়ের করিছিল, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

হত্তেলের* গুঁড়ো (হরিতাল চুর্ণ) এক তোলা, আর গুঁড়ো চূণ এক তোলা ওজন করিয়া, বাঁ হাতের তেলোতে লইল। তার পর, ডান হাতের তেলো দিয়া এমনি করিয়া ঘাঁষিল যে, হত্তেল আর চূণ, এক বারে বেশ মিশিয়া গেল। তার পর, এক খান খুরিতে সেই গুঁড়ো ঢালিল। আর এক খান খুরি উপুড় করিয়া, তার উপর চাপা দিল। তার পর, গোবর মাটী দিয়া খুরি দু খানির চারিদিক বেশ পুরু করিয়া লেপিল। তার পর, উঠনে গিয়া একটা গর্ত্ত করিল। গর্ত্তটা এক হাত গভীর করিল। আর পরিসর আধ হাত করিল। তার পর, সেই গোবর মাটী লেপা খুরি গর্ত্তের মধ্যে বেশ জুত বরাত করিয়া রাখিল। শুক্‌নো ঘুঁটে দিয়া গর্ত্তটা পুরাইয়া দিল।

* হত্তেল খনিতে জন্মে। এতে গন্ধক আর শেঁকো আছে। অসুদে যে হত্তেল লাগে, তাকে তবকি হত্তেল বলে। তবকি অর্থাৎ তবকে তবকে থাকে। তবকি হত্তেল বলিয়া চাইলে বাজারে পাওয়া যায়।

শেষে সেই ঘুঁটেতে আগুন ধরাইয়া দিল। সমস্ত রাত্রি অসুদ সেই ঘুঁটের পোড়েই থাকিল। তার পর দিন খুব ভোরে, গর্ত্ত থেকে খুরি উঠাইয়া খুরির মধ্য থেকে অসুদ বাহির করিয়া লইল। তিন যব অসুদ ওজন করিয়া, তাতে তিনটী পুরিয়া বাঁধিয়া আমাকে দিল। কম্প দিয়া জ্বর আসিবার ঘণ্টা খানেক আগে চিনির ঠুঙিতে করিয়া তিন দিনে তিনটী পুরিয়া খাইতে বলিল। অসুদটির কি আশ্চর্য্য শক্তি! একেই যথার্থ ব্রহ্মাস্ত্র বলিতে হয়। প্রথম দিন অসুদ খাইয়া নামে মাত্র কম্প হইল। জ্বরও খুব কম হইল। তার পর দিন মোটেই কম্প হইল না, জ্বরও আসিল না। তার পর দিন, কেবল নিয়ম পালিবার জন্যে অসুদ খাইলাম; নৈলে খাইবার দরকার ছিল না। কখনও যে জ্বর হইছিল, সে দিন তাও বোধ হইল না। আমাকে আর কোনও অসুদ খাইতে হয় নাই। সেই তিন দিন যা খাইয়াছিলাম। সে বছর আমার জ্বর হইছিল কি না, বলিতে পারি না। এখন জিজ্ঞাসা করি, এমন কম্প-জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইয়া কি এমন চটক দেখাইতে পার? কখনই না। তা যদি পারিতে, তবে অত বাঁধা-বাঁধি করিয়া (৬০—৬৩র পাত দেখ) কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিতে না।

এখন তবে জানিলে যে, কুইনাইন্ নৈলেও সবিরাম জ্বরের বেশ চিকিৎসা করিতে পারা যায়। কুইনাইন্ নৈলে চলিবে না—এ কথা মুখেও আনিও না। কেন না, কুইনাইন্ আমাদের দেশী অসুদ নয়। মার্কিন দেশ (আমেরিকা) থেকে কুইনাইন না আসিলে, এ দেশের লোকের জ্বরের

চিকিৎসা হইবে না! এ কি অসঙ্গত কথা! ঈশ্বর এক দেশে রোগ দিলেন, আর এক দেশে তার অসুদ সৃষ্টি করিলেন! এ কি কখনও সম্ভব হয়? কখনই না। কুইনাইনের চেয়েও যে আমাদের দেশে ভাল গাছড়া অসুদ নাই, তার প্রমাণ কি? কে কটা অসুদ খুঁজিয়া বাহির করিয়াছে? যদি কোনও দেশে কোনও রোগের, কোনও ভাল অসুদ থাকে, তবে সে এ দেশেই আছে। কেন না, আর কোনও দেশে এত রোগও নাই, এত গাছড়া অসুদও নাই।

পুরাণ-জ্বরের চিকিৎসায় যেখানে দেখিবে, কুইনাইন্ দিয়া বেশ উপকার হইতেছে না, সেখানে আর্সেনিক (শেঁকো) দিবে। কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়ার সঙ্গে দিলে আর্সেনিকের তেজ বাড়ে। কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়ার সঙ্গে আর্সেনিক যেমন করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়া	...	৩০ গ্রেন্
লাইকর আর্সেনিকেলিস	...	৩৬ মিনিম
হিম জল	...	৬ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যখন জ্বর না থাকিবে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাওয়াইবে।

অসুদে আর্সেনিকের গুঁড়োও ব্যবহার করা যায়, আরোকও ব্যবহার করা যায়। গুঁড়ো আর্সেনিকের মাত্রা এক গ্রেনের ১২ ভাগের এক ভাগ থেকে সিকি গ্রেন্।

আর্সেনিকের আরোকের মাত্রা ২ ফোটা থেকে ৮ ফোটা কি ১০ ফোটা। গুঁড়ো আর্সেনিক ব্যবহার করিয়া, যেখানে বেশ উপকার না পাবে, সেখানে আর্সেনিকের আরোক ব্যবহার করিবে। আর্সেনিকের আরোককে লাই-কর আর্সেনিকেলিস বলে।° কুইনাইনে উপকার না হইলে; দাম বেশী বলিয়া রোগী কুইনাইন্ কিনিতে না পারিলে; পাড়াগাঁয়ে গরিব লোকের চিকিৎসায় এ রকম প্রায়ই ঘটে —কুইনাইনের বদলে আর্সেনিক ব্যবহার করিবে। পুরাণ জ্বরে, পিলে, পাত, খুব বড় হইলে, অনেক জায়গায় কুই-নাইনের চেয়ে আর্সেনিক বেশী উপকার হয়। এমন সকল জায়গায়, খুব কম মাত্রায় গুঁড়ো আর্সেনিক ব্যবহার করিবে। যেখানে কুইনাইনেও উপকার পাবে না, আর্সে-নিকেও উপকার পাবে না, সেখানে কুইনাইন আর আর্সেনিক একত্র দিবে। তা হইলেই ফল পাবে।

আর্সেনিক (শেঁকো) আমাদের দেশী অসুদ। কুইনাইন্ আমাদের দেশী অসুদ নয়। আর্সেনিক সস্তা। কুইনাইন দামী। গরিব লোকে কুইনাইন কিনিয়া খাইতে পারে না। আর্সেনিক সকলেই কিনিতে পারে। আর্সেনিক খাইতে তত বিকট নয়। কুইনাইন্ ভয়ানক বিকট! আর্সেনিক অল্প খাইলেই কাজ হয়। কুইনাইন অনেক খাইতে হয়। কুইনাইন ম্যালেরিয়া-জ্বরের যেমন ব্রহ্মাস্ত্র, আর্সেনিকও সেই রকম ব্রহ্মাস্ত্র। তবে কুইনাইনেরই বা এত আদর কেন? আর আর্সেনিকেরই প্রতি বা এত অশ্রদ্ধা কেন?

এর উত্তর এক কথায় দিতেছি। অসুদের কথা চুলোয়

যাক্। দেশী কোন্ জিনিসটের আদর আছে ? দেশী কাপড়ের এত অনাদর কেন ? বিলিতি কাপড়ের চেয়ে বেশী টেকে, তবু লোকে বিলিতি কাপড় কেনে। যদি বল, বিলিতি কাপড় সস্তা। তা যে জিনিষের খরিদদার অনেক, তা সস্তা দেওয়া যায়। যত লোকে বিলিতি কাপড় কেনে, তারা যদি সকলে দেশী কাপড় কিনিয়া পরে, তবে দেশী কাপড় সস্তাও হয়, আর দেশী কাপড়ের অবস্থাও ভাল হয়। বিলিতি কাপড় যে রকম ছেঁড়ে, তাতে তার সস্তা দাম পোষাইয়া যায়। যে জিনিষের আদর নাই, তার উন্নতিও নাই।—আমাদের দেশে এখন যে ভাল বৈদ্য প্রায় মেলে না, তার কারণ কি ? মিলিবে কেন ? বৈদ্যদের কি আর তেমন আদর আছে ? রোগ হইলেই ডাক্তার দেখায়। ডাক্তারি অসুদ খায়। এ অবস্থায়, বৈদ্যদেরও ছেলেদের ডাক্তারি না শিখাইলে চলে না। দিন চলা ত চাই। এতে আর ভাল বৈদ্য মিলিবে কেন ? যার আদর নাই, তার উন্নতিও নাই। এতেই বৈদ্য শাস্ত্রটাই লোপ পাইয়া যাইবার মত হইল।—ডাক্তারি শিখিলে, শরীরের মধ্যে কোথায় কি আছে জানিতে পারিলে, কেমন করিয়া রোগ চিনিতে হয় শিখিলে, অসুদের গুণ অগুণ পরীক্ষা করিতে শিখিলে, আপনার দেশের চিকিৎসা শাস্ত্রের উন্নতি কর যে, দেশের লোক গুলো বাঁচুক। ডাক্তারি চিকিৎসায়, আমাদের দেশের লোক ধনে প্রাণে গেল। ডাক্তারের বিজিট আর অসুদের দাম দিতে লোকে মারা গেল। প্রাণের দায়ে করে কি ? ঘটি বাটি বাঁধা দিয়াও চিকিৎসা করায়।

একটা সামান্য জ্বরেও ৮টা টাকা খরচ না করিলে, ডাক্তর দেখানও হয় না, ডাক্তরি অসুদও খাওয়ান হয় না! এক শিশি ফীবর মিক্‌শ্চরের দাম দু টাকা। এক শিশি কুইনাইন্ মিক্‌শ্চরের দাম দু টাকা। তার ডাক্তরের ২ টো বিজিট ৪ চারি টাকা। এরই মধ্যে ডাক্তর যদি একটু দয়ালু হন, তবেই রোগী ৮ টাকায় পার পায়। নৈলে, তিনি অমনি বলিয়া বসেন, আমি আর এক বার না দেখিলে অন্ন পথ্য দিতে পারিব না। পাড়াগাঁয়ে ডাক্তরেরা বিজিট কম লন সত্য, কিন্তু তাঁরা অসুদে তা পোষাইয়া লন। এতে আমাদের দেশের লোকে আর কেমন করিয়া বাঁচে? একে খাদ্য সামগ্রী দুর্ম্মূল্য, তাতে চিকিৎসায় এই ব্যয়। নিত্য রোগ, নিত্য এই ব্যয়। এতেই লোকের একবারে অচল হইয়া উঠিয়াছে।

আগে বেশ নিয়ম ছিল। যার যেমন অবস্থা, তার কাছে তেমনি লইয়া বৈদ্য সন্তুষ্ট হইতেন। কেউ প্রথম দিন আট আনা দিয়া আরোগ্য স্নান করিয়া আর আট আনা দিত। কেউ বা দু বারে আট আনা দিত। বৈদ্য ১৫ দিনেই হোক, আর এক মাসেই হোক, যাঁর কাছে দু বারে দু টাকা লইতেন, সে রকম লোকের কাছে, ডাক্তরেরা প্রথম দিনেই বিজিটে আর অসুদে আট টাকা আদায় করিয়া লন। আমাদের দেশের লোকের যে দুরবস্থা, রোগের যে রকম বৃদ্ধি, তাতে আগেকার চিকিৎসার নিয়ম ফের চলিত না হইলে আর রক্ষা নাই।—যদি বল, তুমি ত নিজেই ডাক্তর; তবে কেন, ডাক্তরের আর ডাক্তরি

চিকিৎসার নিন্দা করিতেছ? এ ত নিন্দার কথা নয়। এ যে সত্য কথা। সত্য কথা বলিতে দোষ কি? তা নিজের হইলে বলিতে হয়। আমাদের দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোক নিঃস্ব। অনেক কষ্টে পরিবার প্রতিপালন করে। ডাক্তারি চিকিৎসায় যে খরচ, তারা তা দিয়া উঠিতে পারে না। কঞ্চির কলম, কয়লার কালি, তাল পাতা, আর কলার পাতা, যে দেশের লোকের লেখা পড়া শিখিবার উপকরণ, রোগের চিকিৎসায় সে দেশের লোকের কি এত ব্যয় করা সম্ভব? কখনই না। তাতেই বলি ডাক্তারেরা দেশী অসুদ ব্যবহার করিতে আরম্ভ করিলেই ভাল হয়।

ডাক্তারেরা বিলাতী অসুদের বদলে, দেশী অসুদ ব্যবহার করিলে, কত কম খরচে যে গরিব লোকের জীবন রক্ষা হয়, তা বলা যায় না। যদি বল ইংরিজি অসুদে ব্যামো যত শীঘ্র সারে, দেশী অসুদে তেমন হয় না। তেমন হয় না, কি করিয়া জানিলে? সাহেবেরা যে রকম চেষ্টা করিয়া, তাঁহাদের দেশের অসুদের এমন সকল ভাল ভাল গুণ বাহির করিয়াছেন, তোমরা সেই রকম করিয়া দেশী অসুদের গুণ বাহির কর দেখি—কেমন না দেশী অসুদে কাজ হয়? ডাক্তারি শিখে, যদি দেশী অসুদ ব্যবহার না করিলে, আর দেশী চিকিৎসার উন্নতি না করিলে, তবে দেশের কি উপকারে আসিলে?

তার পর বলি। সবিরাম-জ্বরের দেশী অসুদ আর আছে কি না? অসুদ অনেক আছে। তার মধ্যে,

এখানে যে কটার কথা বলিলাম, সেই কটা অস্থুদই প্রধান।

২। হীরাকশ—হীরেকশকে ইংরেজিতে সলফেট্ অব আয়র্ণ বলে। হীরেকশও সবিরাম-জ্বরের একটী ভাল অস্থুদ। পিলে থাকিলে এ অস্থুদে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোন অস্থুদে হয় না। পিলে-জ্বরের কথা যখন বলিব, তখন এ অস্থুদের কথা ভাল করিয়া বলিব। গরিব দুঃখী, যারা কুইনাইন্ কিনিয়া খাইতে পারে না, তাদের কুইনাইন্ হীরেকশ। নীচে যে অস্থুদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অস্থুদ দিয়া অনেক কাঙাল গরিবের সবিরাম-জ্বর ভাল করিছি। এ অস্থুদটী পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারেরা সর্ব্বদা ব্যবহার করেন ত ভাল হয়। কেন না, পয়সা খরচ করিয়া অস্থুদ খাইতে পারে, এমন রোগী তাঁহাদের খুব কম জোটে। ফল কথা, মনে করিলে পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারেরা কাঙাল গরিবের যেমন উপকার করিতে পারেন, তেমন আর কেউ নয়।

সলফেট্ অব আয়র্ণ (হীরেকশ)	...	৩০ গ্রেন
ডাইলিয়ুট্ সলফিয়ুরিক্ য়্যাসিড	...	১ ড্রাম
ইনফিয়ুসন্ কোআশিয়া	... ...	১২ ঔন্স

একত্রে মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দাও। জ্বর-বিচ্ছেদে, এক এক দাগ রোজ ৩।৪ বার করিয়া খাইবে। অনেক দিনের পুরাণ পিলে-জ্বরও এতে বেশ সারে।

হীরেকশের আরও অনেক গুণ আছে। আর আর সব অসুদের কথা যখন বলিব তখনই সে সব কথা বলিব।

৩। নাটার বিচির শাঁস—এ অসুদটীকে আমাদের দেশী কুইনাইন্ বলিলেও চলে। যথার্থই এ কুইনাইনের মত কাজ করে। নাটার বিচির শাঁস রৌদ্রে শুকাও। তার পর বেশ করিয়া গুঁড়ো কর। এই গুঁড়ো ৫রতি (১০ গ্রেন্), আর গোল মরিচের গুঁড়ো ১ রতি (২গ্রেন) একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া বাঁধ। এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। জ্বর-বিচ্ছেদে, এই পুরিয়া রোজ ৩।৪টা করিয়া খাইলে জ্বর বন্ধ হয়। এক একটী পুরিয়ার সঙ্গে এক রতি (২ গ্রেন) করিয়া হীরেকশের গুঁড়ো মিশাইলে, অসুদের তেজ আরও বাড়ে। হীরেকশের কথা এই মাত্র বলিছি। এই পুরিয়া চিরতা-ভিজার জলের সঙ্গে খাইলে খুব উপ-কার হয়। হীরেকশ-মিশানো এই পুরিয়া পুরাণ পিলে জ্বরেরও খুব অসুদ। নাটার বিচি জ্বরের এমনি অসুদ যে সাহেবদের কেতাবে পর্য্যন্ত উঠেছে। কিন্তু আমাদের কাছে এর তেমন আদর নাই। এ যদি বিলিতি অসুদ হইত, তবে এর আদরের সীমা থাকিত না। বিলিতি অসু-দেই ত আমাদের মাথা খাইতেছে। ডাক্তারেরা ভাবেন দেশী অসুদে কোন ব্যামোই সারে না। তাঁদের এই ভুলেই ত আমাদের দেশের লোকের এমন দুর্দ্দশা হইতেছে। চারি পয়সা খরচ করিলে যে রোগটা সারে, চার টাকা খরচ করিয়াও তারা সে রোগ থেকে অব্যাহতি পায় না।

কেউ কেউ বলেন, নাটার বিচি চেয়েও নাটার শিকর জ্বরের আরও ভাল অসুদ।

পাড়াগাঁয়ে যাঁরা ডাক্তারি করেন, কুইনাইনের চেয়ে তাঁদের নাটার বিচির আদর করা উচিত। কেন না, কুই-নাইন্ কিনিয়া খাইতে পারে, এমন রোগী তাঁদের খুব কম জোটে। তবে কুইনাইন্ ছাড়া আর জ্বরের অসুদ নাই, ডাক্তারে এ কথা বলিলে, তারা ঘটী বাটি বেচিয়াও অসুদের দাম দেয়; অসুদের দাম দিতে পারিবে না বলিয়া, অনেকে ডাক্তারের কাছেও যায় না। ডাক্তারের কাছে গেলেই, এখনি বলিবে, অসুদের দাম দেড় টাকা লইয়া আইস। কিন্তু দেড়টাকা আমি কখনও এক জায়গায় দেখি নাই। পাড়াগাঁয়ে এই রকম রোগীই বেশী। পাড়া-গাঁয়ের ডাক্তারেরা দেশী অসুদ তয়ের করিয়া, দু আনা, চারি আনায় যদি এক একটী রোগী ফুরাইয়া লন, তবে তাঁদের যে কত রোগী জোটে, তা বলা যায় না। মোটের উপর তাঁদের ঢের আয় হয়। অথচ কাঙাল গরিব লোক অবাধে বাঁচিয়া যায়। দেড় টাকা, দু টাকা দিয়া অসুদ কিনিতে পারে, এমন রোগী যদি মাসে দশটা জোটে, তবে তিনি অসুদ বেচিয়া মাসে বড় জোর ১৫ টাকা, কি ২০ টাকা পান। কিন্তু চারি আনার অসুদের খরিদদার যদি রোজ ১০টা জোটে, তবে মাসে তিনি ৭৫ টাকা পান। এতে তাঁর নাম, যশ, ধর্ম্ম, অর্থ সবই হয়।

৪। নিম—আর্সেনিক (শেঁকো) আর সিংকোনা সবিরাম-জ্বরের যেমন অসুদ, নিমও প্রায় সেই রকম।

নিমের ছাল শুকাইয়া গুঁড়ো করিয়া, জ্বর বিচ্ছেদে ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে, জ্বর আসা বারণ হয়। এই গুঁড়ো এক এক বারে এক ড্রাম (৩০ রতি) করিয়া খাওয়াইতে হয়। ভারি জ্বরের চেয়ে, সামান্য জ্বরেই নিমের ছালে বেশী উপকার হয়। নিমের ছাল ভারি বল-কারক (টনিক)। জ্বর সারিয়া গেলে, রোগী যখন বড় কাহিল থাকে, তখন যদি রোজ দু বার কি তিন বার করিয়া তাকে নিমের ছালের পাচন খাওয়াও, তবে তার গায়ে খুব শীঘ্র বল হয়। এই পাচন এক এক বারে এক ছটাক করিয়া খাইতে হয়। আবার জ্বর-বিচ্ছেদে যদি এই পাচন দু ঘণ্টা অন্তর খাইতে দেও, তবে জ্বর আসাও বারণ হয়। তবেই দেখ, নিমের ছাল জ্বরের কি চমৎকার অস্নুদ। সিংকোনার চেয়ে কোনও মতে কম নয়। এমন জিনিশ থাকিতে, আমরা হা সিংকোনা, যো সিংকোনা করিয়া বেড়াই। শুদু জ্বরের অস্নুদ কি? নিম যে কত রোগের অস্নুদ, তা বলা যায় না। নিমের ছাল, নিমের ফল, নিমের পাতা, এ সবই অস্নুদে লাগে। আমাদের দেশে একটা প্রবাদ আছে—"নিম নিশিন্দে যেথা, মানুষ মরে সেথা?" এ কথাটা নিতান্ত উপহাস করিয়া উড়িয়া দেওয়া হবে না। এর বেশ অর্থ আছে। নিম আর নিশিন্দে এত রোগের অস্নুদ যে, নিম নিশিন্দে থাকিতে রোগে মানুষ মরে না। এমন জিনিষ আমাদের দেশে বাড়ীতে বাড়ীতে থাকিতে, আমেরিকাতেই বা যাই কেন? আর বিলেতেই বা যাই কেন? নিমের ছায়ায় থাকিলে ব্যামো সারে। নিমের

হাওয়ায় ব্যামো সারে। নিমের ছড়ি হাতে করিলে ব্যামো সারে। নিমের পাতা খাইলে কুড়ি ভাল হয়। নিমের পাতার পুল্‌টিশেতে আব আর ঘা ভাল হয়। নিমের ছাল খাইলে জ্বর ভাল হয়। নিমের ফলের তৈল খাইলে ক্রিমি ভাল হয়। সেই তেল মাখিলে কি মালিশ করিলে বাত ভাল হয়। রৌদ্রে মাথা ধরিলে, সেই তেল মাথায় দিলে, মাথা ধরা সারে। সেই তেল পচা ঘায়ে দিলে ঘা ভাল হয়। চারা গাছের গুঁড়ির ভিতর থেকে, এক রকম মিষ্টি রস পাওয়া যায়। সেই রস ঘরে রাখিলে এক রকম মদ তয়ের হয়। এই মদকে নিমের মদ বলে। আধ ছটাক করিয়া এই মদ রোজ সকালে খাইলে, বেশ পরিপাক হয়, আর খিদে বাড়ে। যে গাছের এত গুণ, সে গাছ, যে দেশের লোকের বাড়ীতে বাড়ীতে আছে, সে দেশের লোক আবার অসুদের জন্যে বিদেশে যায়? আর কোনও দেশের লোক বলুক দেখি যে, "নিম গাছের যে সব গুণ বলিলে, আমাদের দেশে এক রকম গাছ আছে, সে গাছে-রও সেই সব গুণ আছে।" নিমের যে কটা গুণ আমি জানিতাম তাই বলিলাম। এ গাছের যে আর কত গুণ আছে, তা কে জানে? নিমের গুণ যদি সব খুলিয়া লিখি, তবে তাতে বড় একখান বৈ তয়ের হয়। বেশী কথা আর কি বলিব?

নিমের ছালের পাচন যেমন করিয়া তয়ের করিতে হয় নীচে তা লিখিয়া দিলাম:—

এক ছটাক নিমের ছাল হামাম দিস্তেতে থেঁতো করিয়া,

এক সের জলে ১৫ মিনিট সিদ্ধ কর। তার পর খুব গরম থাকিতে থাকিতে ছাঁকিয়া লও। গ্রীষ্ম কালে এই পাচন রোজ তয়ের করিতে হয়; নৈলে পচিয়া যায়।

সাহেবেরা সিংকোনার গাছ থেকে যত রকম অসুদ তয়ের করিয়াছেন, নিম গাছ থেকেও, আমাদের সেই সব রকম অসুদ তয়ের করিতে চেষ্টা করা উচিত। আমাদের এ সব চেষ্টা থাকিলে ভাবনা কি? তা হইলে কথায় কথায় বিলেতে দৌড়িতে হইত না। এ সব চেষ্টা থাকিবে কি? আমরা কি অন্যের ভাবনা ভাবি? তা হইলে কি আর আমাদের দেশের এমন দুর্দ্দশা হইত? সাহেবেরা বিলেত থেকে আসিয়া, আমাদের দেশের যে অসুদের যে গুণ বলিয়া গেল, আর আজ ৪০ বছর হইল, মেডিকেল কলেজ হইয়াছে, কত হাজার হাজার বাঙ্গালি ডাক্তর হইয়া গেল। এ পর্য্যন্ত দেশী অসুদের এক খানা ভাল বাঙ্গালা বই তয়ের হইল না! এ কি কম দুঃখের কথা? বড় বড় সব ডাক্তরেরা চাঁদা করিয়া টাকা তুলিয়া, বড় বড় সভা করিয়াছেন। মেডিকেল কলেজেও যে ইংরিজি, যে পড়া এ সব সভাতেও সেই ইংরিজি, সেই পড়া, তবে আর আমা-দের গরিব বাঙ্গালা চিকিৎসার কেমন করিয়া উন্নতি হইবে? আর কাঙ্গাল গরিব লোকেই বা কেমন করিয়া বাঁচিবে? তাদের সেই ডাক্তরি চিকিৎসা, আর বিলিতি অসুদ বৈ আর উপায় রৈল না। কৃতি হইয়া যদি দীন দুঃখী মা বাপের দুঃখ না ঘুচাইলে, তবে তোমার বিদ্যাতেই বা কাজ কি? বাঁচিয়া থাকাতেই বা ফল কি? তেমনি ডাক্তরি শিখিয়া

যদি দেশী চিকিৎসার উন্নতি না করিলে, তবে তোমার ডাক্তরিতেই বা কাজ কি? আর বাঁচিয়া থাকারই বা ফল কি? সাহেবেরা দেখ, আমাদের দেশের হিতের জন্যে কত ব্যস্ত। সাহেবদের দেখিয়াও আমাদের জ্ঞান হয় না। একি কম দুঃখের কথা? এ সব কথায় আর কাজ নাই। ঢের বলিছি, আর বলিব না। আর বলিলে পাছে ধান ভানিতে শিবের গীত হয়। কিন্তু শিবের গীত কিছু না গাইলেও চলে না।

৫। গুলঞ্চ—যে জ্বর রোজ আসে, সে জ্বরের শীত বা কম্প আরম্ভ হইতেই, যদি গুলঞ্চের ক্বাথ, কি পাচন এক বারে অনেক খানি খাওয়াইয়া দেও, তবে শীত বা কম্প এক বারে বারণ হয়। কিন্তু জ্বর আসা বারণ হয় না, জ্বরের তেজও খাটো হয় না, যাতনাও কমে না। এর আগেই বলিছি, (১৮—১৯র পাতে) যে, কম্প আরম্ভ হইতেই, কি কম্প হওয়ার পরেও, আধ ছটাক জলের সঙ্গে ৭০।৭৫ ফোটা লডেনম (টিংচর ওপিয়াই) খাওয়াইয়া দিলে, প্রায় তখনই কম্প নিবারণ হয়। তবেই দেখ, আফিং আর গুলঞ্চ, দুটিই কম্প নিবারণের অতি চমৎকার অসুদ। আফিঙে আর একটী উপকার হয়—জ্বরের যাতনা কমে, গুলঞ্চে তা হয় না। গুলঞ্চ শুদু কম্পেরই উপকার করে, জ্বরের কোনও উপকার করে না। গুলঞ্চের এটী অতি অসাধারণ গুণ বলিতে হইবে।

গুলঞ্চের দাঁটা থেকে চিনির মত এক রকম জিনিস তয়ের হয়। তাকে গুলঞ্চের পালো বা গুলঞ্চের চিনি

বলে। গুলঞ্চের পালো বা চিনি কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, পাড়াগাঁয়ের প্রায় সকলেই তা জানেন। কল্পের জন্য, গুলঞ্চের পালো তয়ের করিয়া রাখা ভাল। তার পর বলি, গুলঞ্চ থেকে কি কি তয়ের হয়। গুলঞ্চের ক্বাথ (ইন্‌ফিয়ুশন্) হয়, পাচন (ডিকক্‌শন্) হয়, এক্‌ষ্ট্রাক্ট্ হয়, টিংচর্ হয়, আর পালো বা চিনি হয়।

গুলঞ্চ আর কলম্বো এক জাতি। যে সব রোগে কলম্বো ব্যবহার করা যায়, গুলঞ্চও সেই সব রোগে ব্যবহার করিলে খুব উপকার হয়। গুলঞ্চকে আমাদের দেশী কলম্বো বলিলেই হয়।

যে সব ভাল ভাল ইংরিজি অসুদ আমাদের জানা আছে, খুঁজিলে তার চেয়েও ভাল ভাল দেশী অসুদ মিলে। সোণার ভারতে কিসের অমিল ? আমেরিকায় সিংকোনার গাছ পাওয়া গিয়াছে। সকলের বিশ্বাস পৃথিবীতে তেমন গাছ আর নাই। কিন্তু ভারতে যে সিংকোনার চেয়েও জ্বরের ভাল অসুদ নাই, এমন কথা কখনই বলা উচিত নয়। আমরা দেশী অসুদের কোনও খোঁজ খবরও রাখি না, কোনও ধারও ধারি না। আমরা ঘরের লক্ষ্মী পা দিয়া ঠেলি। নৈলে, আমাদের এমন দুর্দ্দশা ?

এ পর্য্যন্ত ত জ্বরের কেবল অসুদ বিসুদেরই কথা বলিলাম। পথ্যের কথা এখনও কিছু বলি নাই। এখন তাই বলিব।

পথ্য—আজ কাল মেয়েরাও জানে যে, ব্যামো হইলে, রোগীকে সাগু আর য্যারারুট দিতে হয়। সাগুর চেয়ে

য়্যারারুট আরও হাল্‌কি। জল দিয়া সাগু তয়ের করিয়া তাতে একটু দুধ আর মিছরির গুঁড়ো দিলে, রোগীর পথ্য বলিয়া সাগুতে আর ঘৃণা থাকে না। য়্যারারুটও এই রকম করিয়া তয়ের করিবে। রোগীকে কি নিয়মে পথ্য দিতে হয়, সকলে তা বেশ জানেন না। সহজ মানুষে যেমন এক বারে পেট ভরিয়া খায়, রোগীকে সে রকম খাইতে দেওয়া হবে না। কেন না, রোগ হইলে অগ্নিমান্দ্য হয়। পেট ভরিয়া খাইলে পরিপাক হয় না। যা আহার করিলে, তা পরিপাক না হইলে, পেটের অসুখ হইতে পারে, পেট ভার হইতে পারে, পেট ফাঁপিতে পারে; পেট নাবিতে পারে। এই জন্যে, রোগীকে দু বারের জায়গায় চারি বার খাইতে দিবে। তবু এক বারে পেট ভরিয়া খাইতে দিবে না। রোগে অসুদও যেমন দরকার পথ্যও তেমনি দরকার। যেমন রোগ, তার মত অসুদ না পড়িলে, রোগ সারে না। তেমনি, উপযুক্ত প্রথ্য না পাইলে, রোগী শীঘ্র দুর্ব্বল আর কাবু হইয়া পড়ে। রোগী যত দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রোগ তত চাপিয়া ধরে। এই জন্যে সকল রোগেই, রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা করিবে। বিশেষ যে রোগের ভোগ অনেক দিন, সে রোগে ভাল রকম পথ্য চাই। যে চিকিৎসক রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা করেন, অসুদের চেয়ে পথ্যের দিকে বেশী নজর রাখেন, তাঁর হাতে রোগী কম মারা যায়। যেখানে দেখিবে, রোগী ভারি দুর্ব্বল আর কাবু হইয়া পড়িয়াছে, সেখানে শুদ্ধু সাগু আর য়্যারারুট দিয়া নিশ্চিন্ত থাকিবে

না। ঐ রকম করিয়া দুধ আর মিছরির গুঁড়ো দিয়া সাগু আর য়্যারারুট ত দিবেই। তা ছাড়া, এক বল্কা দুধও মাঝে মাঝে খাইতে দিবে। সবিরাম-জ্বরে গোড়া থেকে ভাল চিকিৎসা হইলে, রোগী সদ্য আরাম হয়। এই জন্যে, এ জ্বরে পথ্যের তত ধরাধর করিতে হয় না। তবে জ্বর পুরণ হইলে, রোগী কাহিল হইয়া পড়িলে, পথ্যের ধরাধর করা দরকার। এর পর, এ সব ভাল করিয়া বলিব।

আজ্‌ কাল্‌ বৈদ্যরাও রোগে সাগু আর য়্যারারুট পথ্য দিয়া থাকেন। আগে জ্বরে খৈ, মিছরি, আর বাতাসা পথ্য দিবার নিয়ম ছিল। আজ্‌ও পাড়াগাঁয়ে অনেক জায়গায় সে নিয়ম আছে। খৈ, মিছরি, বাতাসা মন্দ পথ্য নয়। কিন্তু এ রকম পথ্য বড় জোর দু এক দিন চলে। শুদ্ধু এর উপর নির্ভর করিয়া থাকিলে, রোগী শীঘ্রই দুর্ব্বল হইয়া পড়ে।

পেট-ফাঁপা থাকিলে সাগু, য়্যারারুট, খৈ, যব (বার্লি) এ সব পথ্য দেওয়া ভাল নয়। দিলে পেট-ফাঁপা বাড়ে। পেট-ফাঁপা থাকিলে তবে কি পথ্য দিবে? মাংসের ক্বাথ দিবে। যদি বল, মাংসের ক্বাথ দেওয়া সহজ নয়। গরিব দুঃখী লোকের ত এ পথ্য হইতেই পারে না। পাড়াগাঁয়ে মাংস মিলনই কঠিন। রোজ একটা পাঁটা না মারিতে পারিলে আর হয় না। সহরে মাংস বিক্রী হয়। দশ বার পয়সা খরচ করিলেই রোগীকে মাংসের ক্বাথ দেওয়া যায়। কিন্তু পাড়াগাঁয়ে রোগীরা তা কোথায় পাবে? এ কথা সত্য। মাংসের ক্বাথ দেওয়া যেখানে নিতান্ত অসুবিধা

দেখিবে, সেখানে তিন ভাগ কাঁচা দুধে এক ভাগ চূণের জল মিশাইয়া, রোগীকে তাই খাইতে দিবে। চূণের জলকে ইংরিজিতে লাইম্ ওয়াটর্ বলে। লাইম্ ওয়াটর্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, এর পর বলিব।

পাঁটার মাংস নৈলে যে, মাংসের ক্বাথ তয়ের হয় না, তা নয়। পাখীর মাংসেও বেশ ক্বাথ তয়ের হয়। মুসলমান্ রোগীর চিকিৎসায়, মাংসের ক্বাথ ব্যবস্থা করা সহজ। মুর্গির শুরুয়া দিও বলিলেই তারা সব বুঝিয়া লয়। এ ছাড়া, মুর্গি পোষে না, এমন মুসলমান নাই বলিলেই হয়। কিন্তু হিন্দু রোগীর সে ব্যবস্থায় চলে না। পাড়াগাঁয়ে কৈতর সব জায়গাতেই মেলে। কৈতরের মাংসের ক্বাথ করিয়া দিলেই বেশ হয়। তবেই দেখ, রোগীকে মাংসের ক্বাথ দিবার নিতান্ত দরকার হইলে, পাড়াগাঁয়েতেও তা দেওয়া যায়। আর তার জন্যে, বেশী পয়সা খরচ করিবারও দরকার নাই।

সোজাসুজি জ্বরে মাংসের ক্বাথ দিবার তত দরকার নাই। পেট-ফাঁপা থাকিলে রোগীকে ঐ রকম চূণের জল-মিশন দুধ দিবে। শক্ত জ্বরে রোগী দুর্ব্বল আর বড় কাবু হইয়া পড়িলে, তাকে মাংসের ক্বাথ দেওয়া চাই-ই। এ রকম জ্বরের কথা এখনই বলিব।

মাংসের ক্বাথ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, সকলে তা বেশ জানেন না। এই জন্যে, এখানে তা লিখিয়া দিলাম।

বৈদ্যরা যে রকম করিয়া পাঁচন তয়ের করিয়া থাকেন,

মাংসের ক্বাথও প্রায় সেই রকম করিয়া তয়ের করিতে হয়। পাঁটার মাংসই হোক, আর পাখীর মাংসই হোক, আধ সের ওজন করিয়া লইবে। মাংসের চর্ব্বি সব বেশ করিয়া বাচিয়া ফেলিয়া দিবে। তার পর বটিতে সেই মাংস খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিবে। তার পর, সেই মাংস আর হাড় হামামদিস্তেতে খুব করিয়া থেঁতো করিবে। তার পর, একটা হাঁড়িতে করিয়া দু সের ঠাণ্ডা জলে, সেই থেঁতো মাংস, আর হাড়, দু ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিবে। মাংসেতে জল দিবার নিয়ম—যত খানি মাংস, তার চারি গুণ জল। তার পর, সেই থেঁতো মাংস আর হাড় সেই জলে সিদ্ধ করিবে। অল্প জ্বালে সিদ্ধ করিবে। তার পর, সিকি আন্দাজ (আধ সের) জল থাকিতে নামাইবে। ঝোলটা একটা পাত্রে ঢালিবে, আর মাংস একটা পাতরে ঢালিয়া কাটি দিয়া বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিবে। বেশ জুড়াইয়া গেলে, হাড়ের কুচি বেশ করিয়া বাচিয়া ফেলিবে। তার পর, সেই সিদ্ধ মাংস খুব করিয়া চট্‌কাইবে। তার পর, সেই চট্‌কান মাংস একটা মোটা কাপড়ে করিয়া খুব করিয়া নিংড়ে তা থেকে দুধের মত শাদা ক্বাথ বাহির করিয়া লইবে। এই শাদা ক্বাথ, আর আগেকার আধ সের ঝোল একত্র মিশাইয়া, একটা বড় পাতর-বাটিতে রাখিয়া দিবে। খানিক পরে দেখিবে যে, সব চর্ব্বি ক্বাথের উপর ভাসিয়া উঠিয়াছে। সরু ন্যাকড়া দিয়া, বেশ জুত বরাত করিয়া, আস্তে আস্তে সব চর্ব্বি উঠাইয়া লইবে। তার পর, সুগন্ধ করিবার জন্যে, কড়ি প্রমাণ ঘি, খান দুই

তেজপাত, আর গোটাকতক মৌরি দিয়া ঝোল খানি সম্বরে লইবে। এই করিলেই তোমার ক্বাথ তয়ের হইয়া গেল। ধাতু পাত্রে রাখিলে ক্বাথ খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, পাথরের বাটিতে রাখিবে। এক খান ফর্সা সরু ন্যাকড়া দিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। কোন পাত্র দিয়া ঢাকিয়া রাখিলে তাতে বাতাস যাইতে পারিবে না। বাতাস না গেলে হাপশান আর বট্‌কা বট্‌কা গন্ধ হইবে। ৬ বারে হোক, ৭ বারে হোক, আর ৮ বারেই হোক, এই ক্বাথ খানি রোগীকে সব খাওয়াইয়া দিবে। রোজ এই রকম করিয়া ক্বাথ তয়ের করিবে।

যদি বল, সিদ্ধ করিবার আগে ঠাণ্ডা জলে মাংস ভিজাইয়া রাখিবার দরকার কি ? না ভিজাইয়া রাখিলে কি সিদ্ধ হয় না ? সিদ্ধ হয় না বলিয়া নয়। ঠাণ্ডা জলে না ভিজাইলে মাংসের যে আসল বস্তু, তা বাহির হয় না। তাত পাইলেই মাংসের মধ্যে তা জমিয়া যায়। তার পর হাজার সিদ্ধ কর, তা আর বাহির হয় না। এই জন্যে, মাংসের ক্বাথ তয়ের করিতে হইলে, সিদ্ধ করিবার আগে, ঠাণ্ডা জলে মাংস দু ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখিতে হয়। মাংসের যে আসল বস্তুর কথা বলিলাম, সে বস্তুটী কি ? য়্যালবিয়ুমেন। য়্যালবিয়ুমেন ইংরিজি কথা। ডিমের ভিতর লালের মত শাদা এক রকম জিনিস আছে। এই জিনিসকে ইংরিজিতে য়্যালবিয়ুমেন বলে। তাত পাইলে এও জমিয়া যায়। হাঁসের ডিম তাতে দিয়া দেখিয়াছ, খোলা ছাড়াইয়া ফেলিলে, খুব পুরু, আর শক্ত রকম শাদা একটী

বস্তু দেখিতে পাও। এই শাদা বস্তুটীর মধ্যে হলদে একটী বস্তু আছে। এই হলদে বস্তুটীকে ডিমের কুসুম বলে। তাত পাইয়া, শাদা বস্তুটী ঐ রকম শক্ত হইয়া যায়। নৈলে, সহজে অমনি টল টল করিতে থাকে। কাঁচা ডিম ভাঙিয়া দেখিলেই এ সব বেশ জানিতে পারা যায়। মাংসের যে আসল বস্তুর কথা বলিতেছিলাম, সে এই শাদা বস্তু। এই শাদা বস্তুটী সব জীব জন্তুর রক্তের একটী প্রধান জিনিস।

জ্বর ভাল হইয়া গেলেও, দিন কতক পথ্যের একটু ধরাধর করিতে হয়। নৈলে, আবার শীঘ্রই অগ্নিমান্দ্য হইয়া যায়। জ্বর থেকে উঠে খুব খিদে হয়। সেই খিদে রাখিয়া খাওয়া চাই। তা হইলে আর অগ্নিমান্দ্য হইতে পারে না। খড়ের জ্বালে সুঁদরির চলা দিলে আগুনই নিবে যায়; চলা কিছু ধরে না। সেই জ্বালে কঞ্চি, বাখারি, কাঠের কুচি দিয়া আগুন জমকাইয়া দিলে, তবে বড় বড় চলা ধরে। তেমনি রোগ থেকে উঠে যে খিদে হয়, সে খিদেও খড়ের আগুনের মত। দুই চারি দিন লঘু আহার করিয়া আগুন জমকাইয়া দিলে, তবে তাতে সুঁদ-রির চলা ধরিতে পারে। আগুনের এমন তেজ হইলে, আগেকার মত আহারাদি করিতে আরম্ভ করিবে। তার পর, স্নানের কথা বলি।

স্নান—ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান ভারি কুপথ্য। জ্বর বেশ সারিয়া গিয়াছে। রোগী দু বেলা নিয়ম মত বেশ আহার করিতেছে। গায়েতেও বল হইয়াছে। রোগী মনে করিল,

আমি বেশ আরাম হইয়াছি। অনেক দিন স্নান করি নাই। আজ স্নানটা করিয়া দেখি। এই বলিয়া স্নান করিল। স্নান করিয়া আহার করিল। বৈকালে একটু মাথা ধরিল। ক্রমে গা' গরম হইতে লাগিল। রাত্রে বেশ জ্বর হইল। তখন তাঁর মনে হইল—আজ স্নানটা না করিলেই ভাল ছিল। তাই বা কেমন করিয়া জানিব যে, স্নান করিলে জ্বর হইবে! জ্বর সারিয়া গেল। গায়ে বল হইল। তবু স্নান সৈবে না! তবে আর কি করিব? ম্যালেরিয়া-জ্বরে এ রকম প্রায়ই ঘটিয়া থাকে। ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান সয় না। এই জন্যে, বেশ বুঝিয়া সুঝিয়া আরোগ্য-স্নানের ব্যবস্থা দেওয়া উচিত। পাড়াগাঁয়ে দেখিছি, পোনর আনা লোক জ্বর থেকে উঠে স্নান করিয়া আবার জ্বরে পড়ে। এই জন্যে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নানের খুব ধরাধর করা চাই। যে চিকিৎসকের এটী বেশ জানা আছে, তাঁর রোগী শীঘ্র স্নান করিতে পায় না। দু বেলা আহার করিতেছে। কাজ কর্ম্মও একটু আধটু করিতেছে। কিন্তু স্নান করিতে পায় না। স্নান করিতে চাইলেই বলেন, আরো দু দিন যাক, তার পর স্নান করিও। যদি নিতান্তই স্নান করিতে ইচ্ছা হইয়া থাকে, তবে মাথায় একটু তেল দিয়া ঠাণ্ডা জল দিয়া মাথাটা ধুইয়া ফেল। আর অল্প গরম জলে তোয়ালে বা গামোছা ভিজাইয়া নিংড়ে সব গা বেশ করিয়া মুছিয়া ফেল। এই করিলেই তোমার স্নান হইয়া গেল। দুই এক দিন অন্তর এই রকম করিয়া স্নান করিতে পার। স্নান করিয়া রোগী আবার জ্বরে পড়িয়াছে, এ রকম চিকিৎ-

সককে এ কথা শুনিতে হয় না। জ্বর থেকে উঠে, বিবেচনা না করিয়া, স্নানাদি করিলে রোগীর কি দুর্দ্দশা ঘটিতে পারে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

এখানে একটী রোগীর কথা বলি। রোগীর বয়স ২২।২৩ বছরের কম নয়। অনেক দিন পুরণ পিলে-জ্বরে ভোগে। তার পর অসুদ বিসুদ খাইয়া এক রকম আরাম হয়। কিন্তু কাহিল সারিতে পারে নাই। এই অবস্থায় এক দিন পুকুরে গিয়া স্নান করে। স্নান করিয়া উঠিয়া মাথা মুচিতে মুচিতেই তার এমনি শীত করিতে লাগিল যে, সেখানে সে আর দাঁড়াইতে পারিল না। দৌড়িয়া বাড়ীতে আসিল। বাড়ীতে আসিয়া তাড়াতাড়ি কাপড় ছাড়িয়া লেপ মুড়ি দিয়া শুইল। একটা লেপে শীত ভাঙ্গিল না। তিন চারিটে লেপ দিয়া এক জন চাপিয়া ধরিল। সেই যে লেপ মুড়ি দিয়া শুইল, আর উঠিল না। ঘণ্টা দেড়েক পরে কম্প গেলে, লেপ চাপা দিয়া যে ধরিয়া রাখিয়াছিল, সে এক একটা করিয়া লেপ খুলিয়া ফেলিল। লেপ খুলিয়া দেখে, রোগী অচৈতন্য হইয়া গিয়াছে। এত ডাকা ডাকি করিল, কোন শাড়া শব্দ পাইল না। নিকটে ভাল চিকিৎসক ছিল না। কাজেই, তৎপর কোনও ভাল চিকিৎসা হইল না। তার পর দিনই রোগীটী মারা গেল। এ রকম অবিবেচনা করিয়া স্নান না করিলে কি এ রোগীটী মরিত? কখনই না। চিকিৎসক যদি তাকে বলিয়া দিতেন যে, জ্বর থেকে উঠে শীঘ্র স্নান করা ভাল নয়; বিশেষ, অমন করিয়া পুকুরে ডুব দিয়া স্নান করিলে, এমন কি, জীবন নষ্ট

হইতে পারে—তা হইলে রোগী ও রকম করিয়া স্নানও করিত না, অমন করিয়া মারাও পড়িত না। রোগীর জীবন মৃত্যু চিকিৎসকের হাতে। চিকিৎসকের যদি এ সব বেশ জানা থাকে, আর রোগীকে খুব সাবধান করিয়া দেন, তবে তাঁর রোগী এমন করিয়া কখনও মারা যায় না।

জ্বর সারিয়া গেলে, তবে কি নিয়মে স্নান করিবে? জ্বর সারিয়া গেলে আট দিন স্নান করিবে না। জ্বর ছাড়িলে তিন দিন পরে ভাত খাইবে। আজ জ্বর আসিল না বলিয়া, যদি কাল ভাত খাও, তবে উপরো উপরি দু দিনও ভাত খাওয়া সৈবে কি না, বলা যায় না। ডাক্তরদের উপর রোগীরা যেমন সন্তুষ্ট, বৈদ্যদের উপর তেমন নয়। ডাক্তরেরা রোগীদের খুব খাইতে দেন। বৈদ্যরা রোগীদের শুকাইয়া মারেন। জ্বর সারিয়া গেলে, ডাক্তরদের রোগীরা যা ইচ্ছা তাই খায়। যা মনে হয়, তাই করে। কোনও মান্ বিচ করে না। বৈদ্যদের রোগীদের কত তলি তর্পণে থাকিতে হয়। কিন্তু ডাক্তরদের রোগীদের প্রথমে যেমন সুখ, শেষে তেম্নি দুঃখ। বৈদ্যদের রোগীদের প্রথমে যেমন দুঃখ, শেষে তেমনি সুখ। ডাক্তরদের রোগীরা প্রথমে খাওয়ার ভোগে যেমন সুখ পান, শেষে রোগ ভোগে তেমনি দুঃখ পান। বৈদ্যদের রোগীদের প্রথমে যা কিছু কষ্ট, শেষে কোনও কষ্টই নাই। এই জন্যে, বৈদ্যরা রোগীদের যে রকম কটকিনায় আর তলি তর্পণে থাকিতে বলেন, ডাক্তরদের সেই রকম করা উচিত। তাড়াতাড়ি পথ্য দেওয়া যশ নাই। যিনি শেষ রক্ষা করিতে পারেন,

তাঁরই যশ। যাঁর রোগী পথ্য পাইয়া ভোগে, তাঁর অপ-যশের সীমা নাই। ডাক্তরদের এ অপযশটী খুব আছে। বৈদ্যদের এ অপযশ খুব কম। পথ্যের বেলা ডাক্তরেরা বৈদ্যের মত কাজ করিলে, এ অপযশ সহজেই ঘুচাইতে পারেন। তার পর বলি। জ্বর ছাড়িলে, তিন দিনের দিন ওগরা খাইবে। ওগরা মুগের ডাইলের এক রকম খিচুড়ি। তাতে কোন মসলা বা ঘি দেওয়া নয়। চারি দিনের দিন, মাছের ঝোল আর ভাত এক বেলা খাইবে। পাঁচ দিনের দিনও এক বেলা ভাত খাইবে। ছয় দিনের দিন থেকে দু বেলা ভাত খাইতে আরম্ভ করিবে। আজ কাল দু বেলা ভাত খাওয়া সকলের অভ্যাস নয়। রাত্রে কেউ বা রুটি খান; কেউ বা লুচি খান। তাঁদের পক্ষেও এই ব্যবস্থা। নয় দিনের দিন, অল্প গরম জলে স্নান করিবে। বাইরের বাতাসে স্নান না করিয়া, ঘরের মধ্যে স্নান করিলে ভাল হয়। স্নান করিয়া আদুল গায়ে না বেড়াইয়া, গায়ে একটা কাপড় দিয়া রাখা ভাল। যে দিন প্রথম স্নান করিবে, তার পর দু দিন আর স্নান করিবে না; গা মুচিয়া ফেলিবে। বার দিনের দিন, আবার সেই রকম করিয়া গরম জলে স্নান করিবে। পোনের দিনের দিন কাঁচা পাকা জল একত্র মিশাইয়া, তাতে স্নান করিবে। যদি গ্রীষ্মকাল হয়, তবে ১৮ দিনের দিন কাঁচা জলে স্নান করিবে। এক মাস না গেলে আর রোজ স্নান অভ্যাস করিবে না। বাদলা বৃষ্টির দিন স্নান করিবে না। শীত কালে কাঁচা জলে স্নান অভ্যাস করিবার দরকার নাই। কাঁচা পাকা জলে ঐ নিয়মে বরা-

বরিই স্নান করিবে। স্নানের যেমন ধরাধর করিবে, আহারাদিরও তেমনি ধরাধর করা চাই। শরীরের বল বুঝিয়া, পরিশ্রমও মাঝারি রকম করা চাই। নৈলে, কেবল এক রকম নিয়ম পালন করিলেই হইবে না। আবার বলি। ম্যালেরিয়া জ্বর থেকে উঠে, খুব সাবধানে স্নান আহার করা চাই।

রিমিটেণ্ট-ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের কথা বলিবার আগে, ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ সবিরাম-জ্বরের আরও দুই একটী কথা বলিব। ১০০র পাতে যে তিন রকম সবিরাম-জ্বরের কথা বলিছি, সে তিন রকম জ্বরের স্বভাব আবার কখন কখন বদলে যায়। যেমন, এক দিন অন্তর পালা-জ্বর, আর দু দিন অন্তর পালাজ্বরের পালা বন্ধ হইয়া গিয়া, রোজ এক বার করিয়া জ্বর আসে। আর, যে জ্বর রোজ এক বার করিয়া আসে, আর বেশ ছাড়িয়া যায়, সেই জ্বর অর্থাৎ সবিরাম-জ্বর বদলে গিয়া স্বল্পবিরাম-জ্বর হয়। আবার কখন কখন এমনও ঘটে যে, এ সব জ্বরের মোটেই বিচ্ছেদ হয় না, অর্থাৎ জ্বর একতাড়া হইয়া যায়।

বেশী কুইনাইন্ খাইলে কান ভোঁ-ভোঁ করে। কানে ঝাঁ-ঝাঁ শব্দ হয়। কানে তালা লাগে। কানে কম শুনা যায়। কুইনাইন্ খাওয়া যে কাজ হইয়াছে, এ সব তারই চিহ্ন। যেখানে জ্বর ছাড়ান বড় শক্ত, সেখানে কানের মধ্যে যত ক্ষণ এই রকম শব্দ না হইবে, তত ক্ষণ কুইনাইন্ বন্ধ করিবে না। ভাল পথ্য পাইলে, কানের মধ্যে এ রকম অসুখ কম হয়। আবার ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম্

খাইলে, কান ভোঁ-ভোঁ করা সারিয়া যায়। ব্রোমাইড অব পোটাসিয়মের এ গুণটী সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। ১০ গ্রেন্ করিয়া বার দুই তিন খাইলে, ও অসুখ আর থাকে না।

রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরে চিকিৎসা।

সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বর, এই দু রকম জ্বরের প্রভেদ কি, এর আগেই তা বলিছি। ২—৭র পাত দেখ। এই প্রভেদ জানা থাকিলে রোগীর সবিরাম-জ্বর হইয়াছে, কি স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়াছে, এক বারেই তা জানা যায়। সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা যে শক্ত, তাও এর আগে বলিছি। স্বল্পবিরাম-জ্বরে রোগীর বিশেষ তদ্বির আর চিকিৎসকের বিশেষ বিবেচনার দরকার। কুইনাইন্ সবিরাম-জ্বরেরও যেমন ব্রহ্মাস্ত্র, স্বল্পবিরাম-জ্বরেরও তেমনি ব্রহ্মাস্ত্র। ফল কথা, দু রকম জ্বরেরই চিকিৎসা ঠিক এক বলিলেই হয়। গা ঠাণ্ডা হইলে, কুইনাইন্ খাওয়াইলে আর জ্বর আসে না, আজ কাল চাষারাও তা জানে। কিন্তু গায়ের তাত কমিলে যে কুইনাইন্ দিতে হয়, তা বোধ হয়, অনেক চিকিৎসকেরও বেশ জানা নাই। সবিরাম-জ্বরে, জ্বর ছাড়িলে, কুইনাইন্ দিতে কেউ শঙ্কা করে না। কেউ

বারণও করে না। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্বরে গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন্ দিতে কেউ সাহস করে না। কুইনাইন্ দিতে গেলেও লোকে বারণ করে। এই জন্যই, স্বল্পবিরাম-জ্বরে রোগী এত ভোগে, আর মারাও যায়। অমুকের বাত-শ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছিল। ১৮ দিনের দিন মারা গিয়াছে। অমু-কের বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছিল ; ৪২ দিনের দিন পথ্য পাই-য়াছে। অমুকের আজ ১০ দিন পিত্তশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছে, রক্ষা পায় কিনা, বলা যায় না। এই সব জ্বর-বিকার, স্বল্প-বিরাম-জ্বর ভিন্ন আর কিছুই নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বর হইলেই যে অমনি বাতশ্লেষ্ম-বিকার কি পিত্তশ্লেষ্ম-বিকার আসিয়া উপস্থিত হয়, তা নয়। জ্বর ত এক বারে ছাড়িতেছে না। জ্বরের উপর জ্বর আসিতেছে। এর উপায় আর কি করিব ? জ্বরের যে কয় দিন ভোগ, সে কয় দিন জ্বর আসিবেই। ডাক্তরেরও এই কথা, বৈদ্যেরও এই কথা, গৃহস্থেরও এই কথা। এতে কেন না বাতশ্লেষ্ম-বিকার আসিয়া উপস্থিত হইবে ? পিত্তশ্লেষ্ম-বিকারই বা কেন না হইবে ? এতে সকল রকম বিকারই হইবার কথা। এ রকম বন্দোবস্তে রোগীর ত জীবন যাইবারই কথা। ঘটেও তাই।

আজ বেলা ৮টার সময় অল্প শীত করিয়া জ্বর আসিল। ক্রমে জ্বর বাড়িতে লাগিল। গায়ের তাত খুব বাড়িল। একটা ফীবর মিক্শ্চার তয়ের করিয়া দিলে। (জ্বরের সময় যে আরোক অসুদ খাওয়ায়, ইংরিজিতে তাকে ফীবর মিক্শ্চর বলে)। জ্বর, যত বাড়িতে লাগিল, রোগীর যাতনাও তত বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার সময় গায়ের তাত

একটু কমিল। যাতনাও একটু কম হইল। গা ঠাণ্ডা হইলে কুইনাইন্ দিতে হয়, জান। গায়ের তাত কমিলে কুইনাইন্ দিতে হয়, জান না। কাজেই গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন্ দিলে না, ফীবর মিক্‌শ্চর্ খাওয়াইতে লাগিলে। শেষ রাত্রে আবার জ্বর আসিল। এবারে জ্বরের তেজ খুব বাড়িল। কাল জ্বরে যে যাতনা ছিল, আজ তার চেয়ে ঢের বেশী হইল। রোগী কিছু কাবু হইয়া পড়িল। তুমি ফীবর মিক্‌শ্চর খাওয়াইতে লাগিলে। বেলা দুপরের পর, গায়ের তাত একটু কমিল, যাতনাও একটু কম হইল, গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্ দেয় না, জান। কাজেই কুইনাইন্ দিলে না। ফীবর মিক্‌শ্চরই খাওয়াইতে লাগিলে। রাত্রি দশটার সময় আবার জ্বর আসিল। এই বারের জ্বরে রোগীর অবস্থা অনেক খারাপ হইল। বিকারের দুই একটা লক্ষণ দেখা দিল। জিব শুক্‌নো হইল। মাঝে মাঝে এক আধটা ভুল বকিতে লাগিল। নাড়ী দেখিবার সময়, তার হাতের অল্প কাঁপনি জানিতে পারা গেল। ফিরে জ্বরে রোগীর অবস্থা আরো খারাপ হইল। তোমার ফীবর মিকশ্চর বৈ আর অসুদ নাই। গা ঠাণ্ডা হয় না। কেমন করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে ? কাজেই, জ্বরের যে ক দিন ভোগ, রোগী সে ক দিন ভুগিবেই, এই বলিয়া আপনার মনকেও বুঝাও, গৃহস্থকেও বুঝাও। ৮ দিনের মধ্যে যদি জ্বর না সারিল, তবে ১৪ দিন পর্য্যন্ত মেয়াদ নিলে। ১৪ দিনে সারিল না, ২১

ব্যামো ভাল হইবে বলিলে। ২৮ দিনে ব্যামো ভাল হওয়া দূরে থাক, আরো বাড়িল। তখন বলিলে, বাতশ্লেষ্ম-বিকার কি ৪২ দিনের কমে সারে? বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীকে বাঁচানই ভার। যার পরমায়ুর ভারি জোর, সেই বাঁচিয়া যায়। এ কথাটী খুব সত্য; এ রকম চিকিৎসায়ও যে রোগী বাঁচে, তার যথার্থই অখণ্ড পরমায়ু।

ডাক্তরেরা বাতশ্লেষ্ম-বিকার বলেন না। তাঁরা বলেন টাইফয়িড ফীবর্। রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বর একটু শক্ত রকম হইলেই, তাঁরা অমনি বলিয়া বসেন, এর টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে। কোন কোন ডাক্তরের মুখে টাইফয়িড ফীবর ছাড়া আর কথা নাই। স্বল্পবিরাম-জ্বরের রোগী সব তাঁদের কাছে টাইফয়িড ফীবরের রোগী। ৪১। ৪২ দিনের কমে কোন রোগীই আরাম হয় না। আরাম হয় না—কি আরাম করেন না—কি আরাম করিতে পারেন না, তা বলা যায় না। ৪১। ৪২ দিনে যদি রোগী বাঁচিল ত ভালই। আরাম হইয়া কোন রকমে খাটিয়া খুটিয়া, সংসার চালাইতে পারে। নৈলে, সে ধনে প্রাণে গেল। বিজিটে আর অসুদে তার যথা সর্ব্বস্ব যায়। তার পরিবারদের উদরান্নেরও সংস্থান থাকে না। রোগী বাঁচিলে, টাইফয়িড ফীবর থেকে রোগী বাঁচাইয়াছি বলিয়া, ডাক্তর সব জায়গায় বাড়ীতে বাড়ীতে জাঁক করিয়া বেড়ান। যাদের রোগী, তারাও ভাবে, এর মত ভাল ডাক্তর আর মেলে না। মরা রোগীকে বাঁচাইয়াছে। বিজিট আর অসুদের দাম দিতে

রের হাতে না হইলে, রোগী কখনই বাঁচিত না। তারা কি জানে যে, ডাক্তর যথা সর্ব্বস্ব লইয়া, যে রোগীকে ৪১।৪২ দিনে কত কষ্টে ভাল করিলেন, সেই রোগী ৭।৮ দিনে কি তারও আগে ভাল হইতে পারিত। বিলেতে যে টাই-ফয়িড ফীবর হইয়া থাকে, এখানে সে টাইফয়িড ফীবর্ কখনও হয় কিঁ না সন্দেহ। তবে রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের গোড়ায়, ভাল চিকিৎসা না হইলে, ব্যামো ভারি বাড়িয়া গেলে, শেষে রোগীর অবস্থা, বিলিতি টাই-ফয়িড ফীবরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে অনেক মেলে। নৈলে আমরা এখানে কথায় কথায় টাইফয়িড ফীবরের রোগী পাই না। আমরা এখানে টাইফয়িড ফীবর তয়ের করি; আর গৃহস্থদের ধনে প্রাণে সারি। আমাদের ব্যবসা মন্দ নয়। এ রকম ব্যবসা আর দশ বছর চলিলে, এ দেশের লোক শুদ্ধু ডাক্তরি চিকিৎসাতেই ফকির হবে। তবে, সব জায়গাতেই যে, ডাক্তরের দোষে রোগী অমন ভোগে, তা নয়। অনেক জায়গায় ব্যামো খুব না বাড়িলে আর ডাক্তর দেখান হয় না। সেখানে গৃহস্থেরই দোষে রোগী ভোগে বা মারা যায়। তবু ডাক্তরে খুব হিসাব করিয়া চিকিৎসা করিলে সেখানেও রোগীর ব্যামো শীঘ্র সারিয়া দিতে পারেন। আমি এ সব কথা আন্দাজে বলিতেছি না। আমি বার বার, বিশেষ পরীক্ষা করিয়া দেখিছি রোগে যত ভোগে, চিকিৎসকের ভুলে রোগী তার চেয়ে বেশী ভোগে। খরচের ভয়ে লোকে শীঘ্র ডাক্তর দেখাইতে চায় না। নৈলে,

একটু শক্ত জ্বরে, ডাক্তর ডাকিলেই এক শ, সওয়া শ টাকার কমে পার পাইব না। এতে সকলে কি সাহস করিয়া প্রথমেই ডাক্তর দেখাইতে পারে? আগে সস্তার দিকেই যায়, শেষে প্রাণের দায়ে ডাক্তর দেখায়। প্রথমে ডাক্তর দেখাইলে, খুব কম খরচে আর শীঘ্র ব্যামো সারে—এ রকম বিশ্বাস থাকিলে লোকে কখনই ব্যামো বাড়াইয়া ডাক্তর ডাকিত না। আগে ছোট খাটো বৈদ্য কি হাতুড়ে দিয়া দেখায়। তারা যদি ব্যামো ভাল করিতে পারে, তবে ডাক্তরের কাছে ঘেসে না। আমার বিশ্বাস হাজারের মধ্যে পাঁচটা রোগও গোড়া থেকেই শক্ত হয় কি না, সন্দেহ। চিকিৎসকের ভুলে চৌদ্দ আনা রোগ শক্ত হইয়া পড়ে। চিকিৎসক নিজের ভুল স্বীকার করেন না; বা ভুল হইতেছে কি না, জানেন না। গৃহস্থ চিকিৎসকের হাতে রোগী দিয়া নিশ্চিন্ত।

প্রথমে সকল রোগই সোজা থাকে। তার পর চিকিৎসার অভাবে, বা ভাল চিকিৎসা না হইলে, রোগ ক্রমে শক্ত হইয়া পড়ে। প্রথমে হেলায় যে রোগ সারে, শেষে প্রাণপণে চেষ্টা করিলেও সে রোগ সারে কি না, সন্দেহ। ওলাউঠা রোগে প্রথমে দুই এক বার ভেদ হইতেই, যদি ধারক অষুদ খাওয়াইয়া ভেদ বন্ধ করিয়া দেও, আর সব পেটে খুব বড় রকম, আর তেজাল রাইয়ের পলস্তরা এক খান বসাইয়া দেও, তবে রোগ আর বাড়িতে পায় না। তাতেই ক্ষান্ত হয়। এই রকম ভেদ বন্ধ করিবার জন্য

বিস্মথ যেমন অসুদ, তেমন আর নাই। দুই অসুদেরই মাত্রা ১৫ গ্রেন্, একত্র মিশাইয়া একটা পুরিয়া তয়ের করিবে। এই রকম ২।৩টী পুরিয়া খাওয়াইলেই ভেদ বন্ধ হইয়া যায়। তবেই দেখ, ওলাউঠার মত ভয়ানক রোগও প্রথমে কত সহজে নিবারণ করা যায়। কিন্তু সেই রোগ বাড়িতে দিলে, শেষে সর্ব্বস্ব অন্ত করিলেও রোগীকে বাঁচাইতে পারা যায় কি না, সন্দেহ। প্রথমে ভাল চিকিৎসা না হইলে, শেষে সহজ রোগও অসাধ্য হইয়া পড়ে। আবার, গোড়া থেকে ভাল চিকিৎসা হইলে, শক্ত রোগও সোজা রোগের মত শীঘ্র সারিয়া যায়। তার পর, এখন রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের কথা বলি:—

এর আগে বলিছি। (৩—৪র পাত) যে সবিরাম-জ্বরে, শীত বা কম্পের অবস্থা, হাত পায়ের ও গায়ের তাত বাড়ার অবস্থা, আর ঘাম হওয়ার অবস্থা—এই তিনটী অবস্থা যেমন স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, স্বল্পবিরাম-জ্বরে সে তিনটী অবস্থা তেমন স্পষ্ট জানা যায় না। সবিরাম-জ্বরে ঘাম দিয়া জ্বর ছাড়িলে, গা সহজের মত হইয়া যায় বলিয়া, মেয়েরাও বুঝিতে পারে যে, জ্বর ছাড়িয়াছে। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্বরে জ্বর কমিল কি না, খুব ঠাউরে দেখিতে হয়। নৈলে, জানা যায় না। এই জন্যে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায় তাপমান যন্ত্রের (থর্ম্মমিটরের) ভারি দরকার। এমন কি, নৈলে নয়। ঐ কথাও এর আগে বলিছি (৪—৬র পাত দেখ)। সবিরাম-জ্বরের তিনটী

পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায়, পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার যেমন দরকার, স্বল্পবিরাম-জ্বরেও তিনটী পৃথক্ পৃথক্ অবস্থায়, পৃথক্ পৃথক্ চিকিৎসার তেমনি দরকার। সবিরাম-জ্বরের শীত বা কম্পের অবস্থায় যে রকম যে রকম করিতে হয় বলিছি, (১৪—১৮র পাত দেখ) স্বল্পবিরাম-জ্বরেও জ্বরের প্রকোপ হইবার আগে, হাত পা ঠাণ্ডা, আর শীত হইলে, ঠিক সেই রকম করিবে। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ফুটিলে দাহ, পিপাসা, মাথা-ধরা, ভুল-বকা ও তড়কা নিবারণের জন্যে যে যে অসুদ দিতে হয়, আর যা যা করিতে হয় বলিছি, (৪০—৫০র পাত দেখ), স্বল্পবিরাম-জ্বরেও জ্বর ফুটিলে দাহ, পিপাসা, মাথা-ধরা, ভুল-বকা ও তড়কা নিবারণের জন্যে সেই সব অসুদ দিবে; আর ঠিক সেই রকম করিবে। গাত্র-দাহ কেমন করিয়া নিবারণ করিতে হয়, ৪১—৪২র পাতে তা লেখা আছে। পিপাসার অসুদ ৪২র পাতে লেখা আছে। মাথা-ধরার অসুদ ৪৩য় পাতে আর ৪৪র পাতে লেখা আছে। ভুল-বকার অসুদও ৪৫র পাতে লেখা আছে। তড়কার অসুদ ৪৫—৪৬র পাতে লেখা আছে। জ্বর খাটো করিবার জন্যে আর জ্বরের কষ্ট দূর করিবার জন্যে, ফীবর্ মিক্শ্চর (হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিক্শ্চর) ৫০র পাতে লেখা আছে। সবিরাম-জ্বরে হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিক্শ্চরের সঙ্গে বাইনম গ্যালিসাই (ব্রাণ্ডি) না দিলেও চলে। কিন্তু স্বল্পবিরাম-জ্বরে ও মিক্শ্চরের সঙ্গে গ্যালিসাই দেওয়া ভারি দরকার। কেন না, স্বল্পবিরাম-জ্বরে, জ্বরের উপর জ্বর আসে বলিয়া, রোগী শীঘ্র কাবু হইয়া পড়ে, আর

উপসর্গও বেশী হয়। ফীবর মিক্‌শ্চরের সঙ্গে গ্যালিসাই দিলে রোগী শীঘ্র কাবুও হয় না, উপসর্গও বেশী হইতে পারে না। রোগীর বল গেলেই না উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। সবিরাম-জ্বরে, জ্বর ছাড়িলে কুইনাইন্ যে রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে হয় বলিছি, (৬৮—৭০এর পাত দেখ) স্বল্পবিরাম-জ্বরেও গায়ের তাত কমিলে, সেই রকম নিয়ম করিয়া কুই-নাইন্ খাওয়াইবে। ফল কথা, সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম-জ্বর, দু রকম জ্বরেরই ঠিক এক চিকিৎসা। সবিরাম-জ্বরের চিকিৎসা যেমন সহজ, তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) কাছে থাকিলে, স্বল্পবিরাম-জ্বরেরও চিকিৎসা তেমনি সহজ জানিবে। গায়ের তাত কখন্ একটু কমিল, কখনই বা একটু বাড়িল, গায়ে হাত দিয়া ঠিক করা সোজা নয়। কাজেই, গায়ের তাত কমা বাড়া বেশ ঠিক করিতে না পারিলে, কুইনাইন্‌ও ঠিক নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে পার না। সেই জন্যে, তেমন উপকারও হয় না। রিমিটেণ্ট ফীবর অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা যে রকম ভয় করিয়া থাকেন ; এ জ্বর হইলে গৃহস্থেরা যে রকম ভয় পাইয়া থাকে ; সে রকম ভয় এ জ্বরে নাই। আমরাই এ জ্বরকে ভয়ানক করিয়া তুলি। টাইফয়িড ফীবরে রোগীর যে দশা হয়, এ জ্বরে আমরা রোগীর সেই দশা ঘটাইয়া থাকি। রোগেরও দোষ নয়, রোগীরও দোষ নয় ; চিকিৎসকেরই দোষ। জ্বরের উপর জ্বর আসিতে দিই কেন ? জ্বর কমিয়া যদি আবার জ্বর বাড়িল, তবে তাপমান-যন্ত্রই বা কেন ? আর কুইনাইনই বা কেন ? সবিরাম-জ্বরে, ডাক্ত-

রেরা কুইনাইন্ যেমন ব্যবহার করিয়া থাকেন, স্বল্পবিরাম-জ্বরেও যদি তাঁরা কুইনাইন্ তেমনি ব্যবহার করেন, তবে কথায় কথায় তাঁদের টাইফয়িড ফীবরের রোগীর চিকিৎসা করিতে হয় না। ১৪ দিন, ২১ দিন, ২৮ দিন, ৩৫ দিন, ৪২ দিন পর্য্যন্তও রোগীরা ভোগে না। গৃহস্থেরাও ধনে প্রাণে মারা যায় না। আমার দৃঢ় বিশ্বাস, তাপমান যন্ত্র আর কুইনাইন্ কাছে থাকিলে, আর, ম্যালেরিয়া-বিষ, সবিরাম-জ্বরের যেমন কারণ, স্বল্পবিরাম-জ্বরেরও তেম্নি কারণ, এ জ্ঞান থাকিলে; আর ম্যালেরিয়া-বিষ নষ্ট করিবার যেমন অসুদ কুইনাইন, তেমন অসুদ আর নাই—এ বেশ জানা থাকিলে; স্বল্পবিরাম-জ্বর কখনও বাতশ্লেস্ম কি পিত্ত-শ্লেস্ম বিকারে গিয়া পঁহুছিতে পারে না।

এখানে একটী রোগীর কথা বলি। আমার দশ বছরের একটী ছেলে স্কুলে পড়িতে গিইছিল। স্কুল থেকে বেলা ১টার সময় বাড়ীতে আসিয়া শোয়। তার অসুখের কথা আমাকে কিছুই বলে নাই। কখন্ স্কুল থেকে আসিয়াছে, কখনই বা শুইয়াছে, আমি তার কিছুই জানিতাম না। অসময়ে শুইয়া আছে বলিয়া, তার গায়ে হাত দিয়া দেখিলাম। গা খুব গরম হইয়াছে দেখিয়া, তখনই তাকে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। জ্বর হইবে, কি হইয়াছে, জানিতে পারিলেই আমি কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিই। জ্বরের অবস্থা, কি রোগীর অবস্থা কিছুই বিবেচনা করি না। আমি নিজেও এই নিয়ম রক্ষা করিয়া থাকি। কম্প দিয়া জ্বর আসিতেই, কুইনাইন্ খাইয়া আমি কি উপকার পাইয়া-

ছিলাম, ৩১—৩২র পাতে তা লিখিয়া দিইছি। গোড়াতে কুইনাইন্ খাওয়াইলে জ্বর মুখ-ছোপ পায়, জ্বরে আলি বাঁধা হয়। সে জ্বর হঠাৎ বাড়িয়া রোগীর জীবন নষ্ট করিতে পারে না। এ কি কম কথা মনে কর? জ্বরের উপর কুই-নাইন্ খাওয়াইলে কত উপকার হয়, ৩৮—৩৯র পাতে তা বলিছি। তার পর, তার হাতে পায়ে হাত দিয়া দেখিলাম ঠাণ্ডা। এর আগেই বলিছি (১৯র পাত) যে, জ্বর ফুটিবার আগে অর্থাৎ জ্বরের প্রথম অবস্থায়, গায়ের উপরকার রক্ত সব শরীরের মধ্যে চলিয়া যায়। তাতেই হাত পা অত ঠাণ্ডা হয়। হাতে পা ঠাণ্ডা থাকা ভাল নয়। বিশেষ, তার তড়কার ধা'ত। (আগে জ্বর হইলেই তার তড়কা হইত)। এই জন্যে, চারটী শিশিতে গরম জল পরিয়া কাক্ আঁটিয়া, দুই পায়ের তেলোয় দুটী শিশি, আর দুই হাতের তেলোয় দুটী শিশি দিলাম। ঘণ্টা খানেক মধ্যে হাত পা বেশ গরম হইয়া উঠিল গায়ের তাতও খুব বাড়িল। বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৫র দাগে উঠিল। জ্বরের প্রথম অবস্থায় ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়াছিলাম, তবু গায়ের এত তাত? এতে বোধ হইতেছে, জ্বর সোজা নয়। রিমিটেণ্ট ফীবর্ অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বর হওয়াই সম্ভব। এই ভাবিয়া ৫০র পাতে যে, হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিক্শ্চর্ লিখিয়া দিইছি, সেই মিক্শ্চর্ ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে লাগিলাম। ছেলের বয়স দশ বছর, এই জন্যে, অর্দ্ধেক মাত্রায় সেই অষুদ দিলাম। আর, গায়ের তাত একটু কমিলেই কুইনাইন্

খাওয়াইব, এই ভাবিয়া, বারে বারে তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া, তার গায়ের তাত দেখিতে লাগিলাম। উপ্রো-উপ্রি দু বার দেখিলাম। দু বারই পারা ১০৫র দাগে উঠিল। তিন বারের বার দেখিলাম, ১০৫র দাগের নীচে ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। গায়ের তাত যদিও চুল মাত্র কমিয়াছে, তবু কমিয়াছে—এই বলিয়া তখনই ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিলাম। কেন না, গায়ের তাত লেশমাত্র কমি-লেও, দেরি না করিয়া কুইনাইন্ খাওয়ানই স্বল্পবিরাম-জ্বর থেকে রোগীকে বাঁচাইবার এক মাত্র উপায়। এ রকম উপায় করিলে, ডাক্তরদের আর টাইফয়িড্ ফীবর্ ভয়ের করিতে হয় না। ১৪ দিনের কমে, কি ২১ দিনের কমে জ্বর ছাড়িবে না, এ কথাও বলিতে হয় না। দু ঘণ্টা পরে বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগের উপর ছোট ৩টী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। আবার ৫ গ্রেন কুই-নাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। ঘণ্টা দুই আড়াই পরে আবার তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, ১০১র দাগের উপর ছোট ৪টী দাগ পর্য্যন্ত পারা উঠিল। শেষ বারে যখন কুই-নাইন্ খাওয়াইলাম, তখন রাত্রি দশটা। বেলা ১টার পর থেকে রাত্রি দশটার মধ্যে, চারি বারে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়ান হইল। আজ রাত্রে আর কুইনাইন্ দিব না, এই বলিয়া তার কাছে এক জনকে বসাইয়া রাখিয়া, আমি শুইলাম। তাহার কাছে যে বসিয়াছিল, ভোরে উঠে তাকে জিজ্ঞাসা করায়, সে বলিল কাল রাত্রে ছেলের আর কোনও অসুখ হয় নাই। আমি তখনই তাকে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্

খাওয়াইয়া দিলাম। বেলা ৭॥টা কি ৮টার সময় তার মাথা ব্যথা করিতে লাগিল। আগের দিনও জ্বরের প্রকোপের সময় মাথার ব্যথায় অস্থির হইছিল। গায়ের তাত কমিলে তবে মাথার যাতনা কমিছিল। আবার মাথা ব্যথা করিতেছে তবে বুঝি আবার জ্বর আসিল। এই মনে করিয়া, তার বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০২র দাগ ছাড়াইয়া উঠিল। কাল্ ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াছিল। আজ্ ভোরে ৫গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াছে। তবু জ্বর আসা বন্ধ হইল না, অর্থাৎ জ্বরের উপর জ্বর আসিল। তবে এর লিবরে (যকৃতে) অবশ্য রক্ত জমিয়াছে! এই বলিয়া তার লিবর (যকৃত) পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ডান কোঁকে আঙুলের ঘা দিতেই ভারি ব্যথা লাগে বলিল। লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিলে, কেমন করিয়া তা ঠিক করিতে হয়, এর আগে তা বলিছি। ৯১—৯২র পাত, আর ১০৫র পাত দেখ। আর, লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিলে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া জ্বর আসা শীঘ্র বন্ধ করা যায় না। এ কথাও এর আগে বলিছি (১০৫র পাত দেখ)। এই জন্যে, ১০৬র পাতে যে আয়োডীন লিনিমেণ্ট লিখিয়া দিইছি, সেই লিনিমেণ্ট তুলি করিয়া তার ডান কোঁকে লাগাইয়া দিলাম। উপ্রো উপ্রি দু পোঁচ দিলেও, জ্বালা ধরিল না। তার পর আর এক পোঁচ দিতেই খুব জ্বালা ধরিল। মাথার যন্ত্রণাও খুব হইছিল বলিয়া, জ্বালা তত বুঝিতে পারিল না। আর মাথার যন্ত্রণা ছিল বলিয়াই, উপ্রো-উপ্রি দু পোঁচ লাগাইলেও জ্বালা ধরা বুঝিতে

পারে নাই। নৈলে, ও লিনিমেণ্ট, এক পোঁচ লাগাইতেই খুব জ্বালা ধরে। জ্বালার চেয়ে মাথার যন্ত্রণাতেই বেশী অস্থির হইল! এই জন্যে, ৪৩র পাতে মাথার কামড় আর শূলনির যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, সেই অসুদ ২ ঘণ্টা অন্তর বার দুই খাইতে দিলাম। একবার খাইতেই মাথার যাতনা অর্দ্ধেক গেল। আর একবার খাইতেই মাথার যন্ত্রণা কিছুই থাকিল না। ৪৩র পাতে পূর মাত্রা অসুদ লেখা আছে। ছেলের বয়স দশ বছর। এই জন্যে তাকে তার অর্দ্ধেক খাইতে দিলাম। মাথার যাতনায় আয়োড নের জ্বালা তত বুঝিতে পারিতেছিল না। এখন মাথার যাতনা গেল, আয়োডীনের জ্বালায় অস্থির হইল। অনেক ক্ষণ পরে তবে জ্বালা থামিল। জ্বালা থামিলে তার বগলে তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম। পারা ১০৪র দাগে উঠিল। ফীবর মিক্‌শ্চর্ (হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড মিক্‌শ্চর্) একবার খাওয়াইয়া দিলাম। দু ঘণ্টা পরে আবার তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, সে বারও পারা ১০৪র দাগে উঠিল। আর একবার ফীবার মিক্‌শ্চার্ খাওয়াইয়া দিলাম। ঘণ্টা দেড়েক পরে আবার তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগের নীচে ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। গায়ের তাত একটু কমিয়াছে দেখিয়া, তখনই ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। যখন কুইনাইন্ খাওয়াইলাম, তখন বেলা ৪ টে। ৬টার সময় তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগের নীচে ছোট দুটি দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। আবার ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। রাত্রি ৮টার সময়

গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পারা ১০২র দাগের নীচে ছোট তিনটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। ফের ৫ গ্রেন কুই-নাইন্ খাওয়াইলাম। রাত্রি ১০টার সময় তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। আবার ৫ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইলাম। ভোর থেকে রাত্রি দশটা পর্য্যন্ত, পাঁচ বারে ২৫ গ্রেন কুই-নাইন্ খাওয়ান হইয়াছে। রাত্রে আর কুইনাইন্ দিব না, দিবার দরকারও নাই। লিবরে (যকৃতে) আর রক্ত জমিয়া নাই। আর জ্বর আসিবে না। কাল্ ভোরে ৫ গ্রেন কুইনাইন্ দিব। এই বলিয়া তাকে খানিক দুধ খাইতে দিলাম। দুধ খাইয়া সে ঘুমাইতে লাগিল। তার পর দিন ভোরে ৫ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইলাম। কুইনাইন্ খাওয়া-ইয়া তাপমান-যন্ত্র দিয়া গায়ের তাত দেখিলাম, পারা ৯৯র দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। বেলা ৮টার সময় আবার ৫ গ্রেন কুইনাইন্ দিলাম। তাপমান যন্ত্র দিয়া দেখিলাম পারা ৯৯র দাগের নীচে ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। কাল্ বেলা ৮টার সময় মাথা কামড়াইয়া জ্বর আসিয়াছিল। আজ সেই বেলা ৮টার সময় গায়ের তাত সহজ। আর জ্বর আসিবারও কোন লক্ষণ দেখিতেছি না। এখন দিন কতক নিয়ন করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে, জ্বর আর আসিতে পারিবে না। এই মনে করিয়া, সে দিন, রাত্রি ১০টার মধ্যে তাকে তিন বারে আর ১৫ গ্রেন কুই-নাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। তার পর দিন থেকে, রোজ তিন বেলা ৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন খাওয়াইবার নিয়ম

করিয়া দিলাম। দিন চারি উপ্রো উপ্রি রোজ তিনবার করিয়া কুইনাইন্ খাইল। তার পর, দিন চারি পাঁচ রোজ ২ বার করিয়া খাইল। শেষ দিন পাঁচেক রোজ এক বার করিয়া খাইল। তাকে আর কোন অসুদই দিতে হইল না।

এই ছেলেটীর যে রকম শক্ত জ্বর হইছিল, তাতে এ রকম তদ্বির না করিলে, আর এ রকম বাঁধা-বাঁধি করিয়া কুইনাইন্ না খাওয়াইলে, তাকে বাঁচাইতে পারা যাইত কি না, সন্দেহ। যদি বাঁচিত, সে মরিয়া বাঁচিত। এখনকার ডাক্তরদের টাইফয়িড ফীবরের রোগী হইয়া ৪১।৪২ দিনে সারিত। আমাদের ডাক্তরেরা যে রোগে বলেন, ২১ দিনের কমে কখন রোগী ভাল হয় না, সে রোগী তিন দিনে ভাল হইল। ডাক্তরেরা সব জায়গায় এ রকম হাত দেখাইতে পারিলে, রোগীও ভোগে না, গৃহস্থও ধনে প্রাণে মারা যায় না। যদি বল, এ তত শক্ত জ্বর হয় নাই বলিয়াই এত শীঘ্র সারিয়া গেল। শক্ত জ্বর নয় কেমন করিয়া? গায়ের তাত ১০৫ অংশের (ডিগ্রীর) উপর! আবার জ্বরের উপর জ্বর! আরও বেশী চাও? এর চেয়ে কম জ্বরেই ডাক্তরেরা ভিটে মাটি উচ্ছিন্ন করেন। এর চেয়ে শক্ত জ্বরে তাঁরা না জানি কি করেন? আজ দিন দুই তিন হইল যে, রোগিটী দেখিছি, তার পরিচয়ই এর প্রমাণ!

আজ দিন দুই তিন হইল, এখানকার কোন ভদ্র লোকের একটি ছেলের চিকিৎসা করিতে গিইছিলাম। ছেলের বয়স ৬ বছর। এখানকার এক জন ভাল ডাক্তর

তার চিকিৎসা করিতেছিলেন। ছেলেটী ৮ দিন তাঁর হাতে ছিল। ছেলের ব্যামো সারিতে দেরি হইতেছে বলিয়া, গৃহস্থ তাঁকে জিজ্ঞাসা করিছিলেন, কত দিনে ছেলেটী আরাম হইবে? আপনি ত রোজ দু বেলা আসিতেছেন, আর বলিতেছেন, কেবল ফীবর মিক্শ্চর খাওয়াও। আপনাদের আর কি কোন অসুদ নাই, যাতে ছেলেটী শীঘ্র সারে? সেই এক অসুদ আর কত দিন খাবে? তিনি উত্তর করিলেন, এ জ্বরের ভোগ ২১ দিন। তার আগে কখন সারিবে না। তার আগে ব্যামো সারিয়া দিতে পারে, এমন সাধ্য কারো নাই। প্রথম দিন আসিয়া যে অসুদ ব্যবস্থা করিছি, সেই অসুদই বরাবরি খাওয়াইতে হবে। সেই অসুদেই ব্যামো সারিবে। অসুদ আর বদলাইতে হবে না। ছেলেটীর ব্যামো ক্রমেই বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, ডাক্তরের কথায় গৃহস্থ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারিলেন না। বিশেষ, এর কিছু দিন আগে, এই ছেলেটীর ছোট একটী ভাই মারা গিয়াছে বলিয়া, গৃহস্থ বেশী ব্যস্ত হইলেন। নৈলে, বোধ হয় এত ব্যস্ত হইতেন না। ২১ দিনই হোক, ২৮ দিনই হোক, আর ৪২ দিনই হোক, ছেলেকে সেই ডাক্তরেরই হাতে রাখিতেন। ভাগ্য ক্রমে ছেলেটি যদি আরাম হইত, তবে পাড়ায় পাড়ায় ডাক্তরের যশ গাইয়া বেড়াইতেন। আর যদি মারা যাইত, তবে ওর নিতান্ত পরমায়ু নাই, নৈলে, এমন ডাক্তরের হাতে ভাল হইল না—এই বলিয়া আপনার মনকেও বুঝাইতেন, পরিবারদেরও বুঝাইতেন। তার পর বলি। ৯ দিনের দিন সকাল বেলা আমাকে

ডাকিলেন। আমি গিয়া তাপমান-যন্ত্র দিয়া, আগে তার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৪র দাগে উঠিল। রাত্রে গায়ের তাত এর চেয়ে বেশী ছিল কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, বাড়ীর মেয়েরা বলিল, গায়ের তাত দিন রাতই সমান; এক বারও ত কমে না। ডাক্তরও বলিয়া গিয়াছেন, এ জ্বর এম্‌নি এক তাড়াই থাকে। এ কথা খুব সত্য। গায়ের তাত কমা বাড়া, মেয়েরা কেমন করিয়া বুঝিবে? তাপমান-যন্ত্র ব্যবহার না করিলে, ডাক্তরেরাই ভুল করিয়া বসিয়া থাকেন। তার পর জিজ্ঞাসা করিলাম, ছেলে এখন যেমন স্থির আছে, কাল রাত্রেও এমনি স্থির ছিল? না, এর চেয়ে অস্থির ছিল? তারা বলিল, বেলা দুপর দুটো পর্য্যন্ত এই রকম স্থির থাকে। তার পর থেকে অস্থির হয়; বারে বারে জল খাইতে চায়। রাত্রে আরও ছটফট করে। এতেই বোধ করি, বেলা ২টো পর্য্যন্ত জ্বর কম থাকে, তার পর জ্বর বাড়ে। কিন্তু গায়ের তাত কমা বাড়া আমরা বেশ বুঝিতে পারি না। আমাদের বোধ হয়, গায়ের আগুন দিন রাতই সমান থাকে। এ সব শুনিয়া আমি ছেলের বাপকে বলিলাম, বেলা ২টো পর্য্যন্ত গায়ের তাত কম থাকে, তার পর থেকে বাড়িতে আরম্ভ করে। বেলা ১টার আগে ছেলেকে ১০।১২ গ্রেন কুইনাইন খাওয়াইতে পারিলে, বেলা দুটোর সময় গায়ের যে তাত বাড়িয়া থাকে. তা আর বাড়িবে না। তার পর ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে, ক্রমে গায়ের তাত সহজ হইয়া আসিবে। আজ যে রকম নিয়ম করিয়া

কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিলাম। উপরো উপরি দিন ৪।৫ সেই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে ছেলেটী নীরোগ হবে। তোমাকে আর ডাক্তরও দেখাইতে হবে না, আর কোন অসুদও খাওয়াইতে হবে না। ২১ দিনের কমে যে ব্যামো সারিয়া দিবার কাঁরো সাধ্য নাই, তোমার ডাক্তর বলিয়া গিয়াছেন, সেই ব্যামো দু দিনে সারিবে। প্রথম যে দিন জ্বর হইছিল, সে দিন এই রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন খাওয়াইলে, তার পর দিনই হোক, আর তার পর পর দিনই হোক্, ছেলে ভাল হইত। তার পর বলি। লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়াছে কি না, জানিবার জন্যে, ছেলের ডান কোঁকে আঙুলের ঘা দিয়া দেখিলাম। ঘা দিতে তার খুব ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়াছে। এর আগে (১০৬র পাতে) বলিছি যে, জ্বর একটু শক্ত হইলে, প্রায়ই লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমে, আর তাতে ব্যথা হয়। আর লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়া থাকিলে, কুইনাইন খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়ান ভার। এই জন্যে, তার ডান কোঁকে যেখানে ঘা দিলে তার ব্যথা লাগিয়াছিল, সেই খানে আয়োডীনের আরোক এক পোঁচ কি দু পোঁচ লাগাইতে বলিলাম। ১০৬র পাতে আয়োডীনের আরোক লেখা আছে। ডান কোঁকে ঘা দিয়া লিবরে রক্ত জমা কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয়, ৯১—৯২র পাতে আর ১০৫র পাতে তা লেখা আছে। জ্বরের সময় খাওয়াইবার জন্যে, একটা অসুদ লিখিয়া দিলাম। গায়ের তাত যদি ক্রমে কমিয়া যায়, তবে সে অসুদ না

দিলেও চলিবে। আর যদি গায়ের তাত বাড়ে, তবে যত ক্ষণ গায়ের তাত বাড়া থাকিবে, সে অসুদ ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। সে অসুদ নীচে লিখিয়া দিলাম ঃ—

য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ য়্যামোনিয়া			১ ড্রাম
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক ঈথর)			১ ড্রাম
ব্রাণ্ডি ১র নম্বর	...	...	৬ ড্রাম
টিংচর সিংকোনি কো	...	...	১½ দেড় ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম্ কো	...	...	১½ দেড় ড্রাম
সিরপ্ জিঞ্জর	...	...	৩ ড্রাম
য়্যাকুই য়্যানিথাই (ডিল ওয়াটর)			৩ ঔন্স (পুরাইয়া)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। জ্বর একটু শক্ত হইলে, ফীবর মিক্শ্চরে আমি হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড দিয়া থাকি। ফীবর মিকশ্চরে, হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড দিলে যে উপকার হয়, (৫০র) পাতে তা লিখিয়া দিইছি। যদি বল, এখানে তবে হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড দিলে না কেন? জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকিলে, হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড দিলে কাশি বাড়ে। এই জন্যে, রোগীর কাশি আছে কি না, জিজ্ঞাসা করিয়া তবে ফীবর মিকশ্চর লিখিয়া দিই। কাশি থাকে ত হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড দিই না। তার বদলে য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট্ অব য়্যামোনিয়া দিই। কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়াও দিয়া থাকি। কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়ার ঝাঁজ বেশী বলিয়া ছোট ছেলেদের য়্যারো-ম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া দিয়া থাকি। য়্যামোনিয়া

না দিলেও চলে। কিন্তু দিলে উপকার বৈ অপকার হয় না। তার পর, পিঠে আর পাঁজরে মালিশ করিবার জন্যে একটী অসুদ লিখিয়া দিলাম। এই মালিশে কাশির বড় উপকার করে। রোজ ৩।৪ বার করিয়া মালিশ করিতে হয়। মালিশের অসুদের বড় ঝাঁজ বলিয়া ছেলেদের বুকে মালিশ করিতে দিই না। বুকে মালিশ করিতে গেলে, নাকে, মুখে, চোকে, ঝাঁজ লাগিয়া তাদের যেন দম আটকাইয়া যাইবার মত হয়। মালিশের অসুদ নীচে লিখিয়া দিলাম :—

য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বলেটাইল্ লিনিমেণ্ট)	৪ ড্রাম
অলিব অইল (সুইট অইল) ...	৪ ড্রাম
ক্যাজুপট অইল (ভূর্জ্জপত্রের তেল ...	১ ঔন্স
তার্পিণ	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখিয়া দেও।

শিশির গায়ে যে কাগজ (লেবেল) লাগান থাকিবে, তাতে "বিষ" বলিয়া লিখিয়া দিবে। কেন না, ভুলে এ অসুদ খাওয়াইলে কি সর্ব্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। ছেলেদের লিনিমেণ্ট খুব ঝাঁজাল না হইলে ভাল হয়। এই জন্যে, অর্দ্ধেক য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট আর অর্দ্ধেক অলিব অইল, একত্র মিশাইয়া দিয়া থাকি। নৈলে, কেবল য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্টই এক ঔন্স দিই। তার সঙ্গে আর অলিব অইল দিই না। এই রকম ব্যবস্থা মত অসুদ বিসুদ খাওয়াইতে, ছেলেটী দু দিনেই ভাল হইল। গৃহস্থকে আর ডাক্তরও ডাকিতে হইল না, আর অন্য কোন অসুদের

চেষ্টা করিতে হইল না। গৃহস্থকে কেবল একটী তাপমান যন্ত্র কিনিতে হইল। তাতেই যা ৪।৫ টাকা খরচ করিতে হইল। কিন্তু এ খরচ গায়ে লাগিল না। কেন না, ৪।৫ টাকায় ডাক্তরের ঢের ভিজিটের দায় এড়াইলেন। আর পরেও অনেক সময় এড়াইতে পারিবেন।

এখানে আর একটী রোগীর কথা বলি। দিন দুই হইল, রাত্রি প্রায় ১টার সময় দুটী মেম কাঁদিতে কাঁদিতে আমার বাড়ীতে উপস্থিত হয়। তারা বলিল, কোন সাহেবের ১৭।১৮ বছরের একটী মেয়ে, আজ ২২ দিন জ্বরে ভুগিতেছে। এখানকার এক জন ভাল ডাক্তর (সাহেব) তার চিকিৎসা করিতেছেন। তিনি রোজই আসেন আর বলিয়া যান, এ জ্বরের অনেক দিন ভোগ। তোমরা কিছু ভাবিও না। যে অসুদ খাইতেছে, সেই অসুদেই আরাম হইবে। আজ সন্ধ্যা বেলা আসিয়া, তার লিবরের উপর এক খান বেলস্তরা বসাইয়া গিয়াছেন। এখন তার, অবস্থা ভারি খারাপ হইয়া উঠিয়াছে। ভোর পর্য্যন্ত বাঁচে কি না, বলিতে পারি না। আপনাকে এখনই যাইতে হইবে। এই বলিয়া তারা আমাকে তাদের বাড়ীতে সঙ্গে করিয়া লইয়া গেল। গিয়া দেখিলাম, সে চিত হইয়া শুইয়া আছে। চোক বুজিয়া কেবল বকিতেছে। মাথা ভারি গরম। নাড়ী ফি মিনিটে ১৫৬ বার পড়িতেছে। নিশ্বাসও ঘন ঘন পড়িতেছে। জিজ্ঞাসা করিলাম, ডাক্তর সাহেব যে ২২ দিন, এর চিকিৎসা করিতেছেন, তার মধ্যে কোনও দিন তাপমান-যন্ত্র দিয়া এর গায়ের তাত পরীক্ষা

করিয়াছেন? তারা বলিল, এই ২২ দিনের মধ্যে কেবল আজ এর গায়ের তাত, সেই যন্ত্র দিয়া পরীক্ষা করিয়াছেন। যে রোগী ২২ দিন স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) ভুগিতেছে, তাপমান-যন্ত্র দিয়া এক দিনও তার গায়ের তাত পরীক্ষা করেন নাই! ডাক্তর সাহেবের ধন্য চিকিৎসা! এ অবস্থায় তাকে কুইনাইন দেওয়া হইছিল কি না, এ কথা জিজ্ঞাসা করাই উচিত নয়। তবু একবার জিজ্ঞাসা করিলাম। তারা বলিল ১৭ দিনের দিন, গ্রেন্ কতক কুইনাইন দিইছিলেন। কি মনে করিয়া সে দিন তিনি কুইনাইন দিইছিলেন, তা তিনিই বলিতে পারেন। এর মধ্যে আবার দিন চারি পাঁচের জন্যে হাওয়া বদলাইতে, রোগীকে অন্য জায়গায়ও পাঠান হইছিল। অনুষ্ঠানের কোনও ক্রুটি হয় নাই। ২২ দিনের দিন গায়ের তাত পরীক্ষা করিলেন। ২২ দিনের দিন লিবরে ব্লেস্তরা বসাইলেন। ২২ দিনের দিন তাঁর ঘুম ভাঙ্গিল। রোগীর আর বেশী অপেক্ষা নাই দেখিয়া, আমি আর কোন অসুদের ব্যবস্থা করিলাম না। জানি কি, ডাক্তর সাহেব পাছে বলেন, কাল রাত্রে যে বাঙ্গালী ডাক্তরকে আনিয়াছিলে, তারই অসুদ খাইয়া আমার রোগী মারা গিয়াছে। চোকে আর মাথায় মাঝে মাঝে বরফের জল দেও বলিয়া, আমি সেখান থেকে চলিয়া আসিলাম। তার পর, জানিতে পারিলাম ভোর বেলা রোগী মারা গিয়াছে। এখানে কার দোষে রোগী মারা গেল? ডাক্তর সাহেবেরই দোষে বলিতে হইবে। কেন না, গৃহস্থ গোড়া থেকেই তাঁর হাতে রোগী দিয়া নিশ্চিন্ত

ছিল। গৃহস্থের বিশ্বাস, ডাক্তার সাহেব যখন বলিয়াছেন, এ রোগের অনেক দিন ভোগ, আর এই অসুদেই সারিবে, তখন রোগীর কোন ভয়ই নাই। কিন্তু ডাক্তার সাহেবের যে এত বিদ্যা, তারা কি তা জানে? স্বল্পবিরাম-জ্বরের রোগীর যে রকম ধরাধর করিয়া চিকিৎসা করিতে হয়, এর আগেই বলিছি; এ মেয়েটিরও যদি সেই রকম ধরাধর করিয়া চিকিৎসা করা হইত, তবে কি আর এমন করিয়া মারা যাইত? কখনই না। জীবন ত রক্ষা হইতই। এত দিন ভুগিতও না। বড় জোর তিন চারি দিনের মধ্যেই আরাম হইত। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন না খাওয়াইলে, যে অনেক জায়গায় রোগী মারা যায়, তার এই একটা প্রমাণ পাইলে। অর্দ্ধেক রোগী মরিয়া বাঁচে। যে সব রোগী এই রকম করিয়া মরিয়া বাঁচে, তারা ২১ দিনের কমে কেউ আরাম হয় না। যাঁরা টাইফয়িড্ ফীবর তয়ের করিতে ভাল বাসেন, রোগীদের ২১ দিন ভোগাইয়া তাঁদের আশ মেটে না। ৪১।৪২ দিনের কমে তাঁদের হাতে অব্যাহতি নাই। অনেকের বিশ্বাস, এ সব জ্বরের ভোগ ধরা আছে। ৭ দিনে না সারে ত ১৪ দিনে। ১৪ দিনে না সারে ত ২১ দিনে। ২১ দিনে না সারে ত ২৮ দিনে। ২৮ দিনে না সারে ত ৪২ দিনে সারে। রোগ বাড়েও এই এই দিনে। আবার রোগী মরেও এই এই দিনে। তাঁদের এ কথা কত দূর সত্য, তা ঠিক বলিতে পারি না। তবে গায়ের তাত কমিলে, সে তাত আর বাড়িতে না পারে, এ রকম উপায় বিধি মতে না

করিলে, (তাপমান-যন্ত্র আর কুইনাইন কাছে থাকিলে, এ উপায় সহজেই করা যায়), ঐ ঐ দিনে রোগের হ্রাস বৃদ্ধি হইতেও পারে। কিন্তু ঐ ঐ দিন ভিন্ন রোগ সারিবে না বলিয়া, সেই রকম কাজ করা আর গৃহস্থকে ধনে প্রাণে মারা সমান। গৃহস্থেরা এই রকম করিয়া যে কত জায়গায় ধনে প্রাণে সারা হয়, তা বলা যায় না। কত সহজে, এ সব জ্বর সত্ত্ব আরাম করিতে পারা যায়, তিন চারিটী রোগীর কথা বলিয়া, তার পরিচয় দিইছি। এখানে আর একটী রোগীর পরিচয় দিই।

পরশু সকালে একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। রোগীর বয়স ২০।২১ বছরের বেশী নয়। মেডিকেল কালেজে পড়েন। ২।১ বছর পরে ডাক্তর হবেন। এই জন্যে, তাঁর চিকিৎসকের অভাব ছিল না। নাপিতে নাপিতের কাছে কড়ি লয় না। বাসায় দুই এক জনের বসন্ত হইছিল বলিয়া তাঁরও বসন্ত হবে ভাবিয়া, জ্বর হইলে, ২।৩ দিন কোনও অসুদ বিসুদ খান নাই। তার পর, বসন্ত হওয়ার আশঙ্কা গেল। জ্বরের চিকিৎসা করাইতে লাগিলেন। তিন চারি দিনেও জ্বরের কিছু প্রতিকার হইল না দেখিয়া, তিনি আমাকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। তাঁর সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল। আর, আমার উপর তাঁর একটু ভক্তিও ছিল। আমি গিয়া প্রথমে তাঁর গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৫র দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। তার পর, ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলাম। মিনিটে ১১০ বার নাড়ী পড়িতেছে। তার পর,

লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়াছে কি না, ডান কোঁকে আঙুলের ঘা দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। ঘা দিতেই তাঁর খুব ব্যথা লাগিল। এর আগেই (১০৫র পাতে) বলিছি যে, জ্বর একটু শক্ত হইলে, লিবরে প্রায়ই ব্যথা হইয়া থাকে। লিবরে এই রকম ব্যথা হওয়া, তাতে রক্ত-জমার একটী চিহ্ন। ডান কোঁকে কেমন করিয়া ঘা দিয়া, লিবরে রক্ত-জমা ঠিক করিতে হয়, ৯১—৯৩র পাতে, আর ১০৫ পাতে তা লিখিয়া দিইছি। ভারি জ্বরে, অর্থাৎ গায়ের তাত খুব বেশী হইলে, লিবর ছাড়া আরও অনেক যন্ত্রে রক্ত জমে। এই জন্যে, তাঁর বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। যে যন্ত্র দিয়া বুকের মধ্যেকার ফুস্কো পরীক্ষা করিতে হয়, সে যন্ত্রকে ইংরিজিতে ষ্টিথস্কোপ বলে। এ কথাটা আজও বেশ চলিত হয় নাই। এই জন্যে, একে বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র বলাই ভাল। ডাক্তরদের হাতে যে একটী করিয়া চোঙ থাকে, সে এই যন্ত্র। এই যন্ত্র তাঁর পিঠে দিয়া শুনিলাম ফুস্কোর মধ্যে বাতাস বেশ সহজে যাওয়া আসা করিতেছে। তার পর, তাঁকে বার দুই কাশিতে বলিলাম। খুব সরু নলে, খুব আস্তে, একটু একটু করিয়া ফুঁ দিলে, যেমন শব্দ হয়, কাশিবার সময়, তাঁর বুকের মধ্যে থেকে সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ফুস্কোর মধ্যে খুব সরু সরু হাজার হাজার নলি আছে। এই সব নলি দিয়া ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যায়। এই সব নলির ভিতরে রক্ত জমিলে, ওদের খোল আরও সরু হইয়া যায়। সরু হইয়া গেলে, জোরে নিশ্বাস নিলে, কি কাশিলে, বুকের মধ্যে থেকে ঐ রকম বাঁশির

মত শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। বুক-পরীক্ষা করার যন্ত্রে কান দিয়া শুনিলেও হয়; বুক, পিঠ, কি পাঁজরের উপর কান দিয়া শুনিলেও হয়। এই সব নলির ভিতরে খুব বেশী রক্ত জমিলে আর এই রকম খুব বেশী রক্ত-জমা ২।৪ দিন থাকিলে, নলির ভিতরে, ফোলে আর ব্যথা হয়, আর নলির খোল আরও সরু হইয়া যায়। এই জন্যে, ঐ রকম সরু বাঁশির শব্দ আরো খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। তার পর, সেই সব নলির মধ্যে শ্লেষ্মা জমে। এই সময় যদি ঐ যন্ত্র দিয়া, বুক, পিঠ বা পাঁজরের উপর কান রাখিয়া বেশ মন দিয়া শুন, তবে বুকের মধ্যে আর এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। জলের মধ্যে খুব সরু নল দিয়া, খুব আস্তে বুড়্-বুড়ি তুলিলে যে রকম শব্দ হয়, এ শব্দও ঠিক সেই রকম। ডাক্তরদের মুখে যে "ব্রংকাইটিস্" রোগের কথা শুনিয়া থাক, সেই ব্রংকাইটিস্ রোগে বুকের মধ্যে এই দু রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শক্ত জ্বরে, সব জায়গায় বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এই রকম শব্দ শুনিতে পাইলে ব্রংকাইটিস্ হইয়াছে ঠিক করিবে। ব্রংকাইটিস ইংরিজি কথা। আজ কাল ডাক্তরেরা এর বাঙ্গালা করিয়াছেন। কিন্তু সে বাঙ্গালা ইংরিজির চেয়ে শক্ত। এই জন্যে, ইংরিজি কথাটা মনে করিয়া রাখাই ভাল। ব্রংকাইটিসের বাঙ্গালা বায়ুনলিভুজ-প্রদাহ। তার পর বলি। রোগীর গায়ের তাত, লিবরে (যকৃতে) রক্ত-জমা, ফুস্কোতে আর ফুস্কোর ভিতরকার নলিতে রক্ত-জমা এ সব ঐ রকম করিয়া পরীক্ষা করিলাম। তার পর, যে

যে অসুদ ব্যবস্থা করিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম—৫০র পাতে যে হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড মিক্শ্চর লিখিয়া দিইছি, সেই আরোক অসুদ এক এক দাগ ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম। এর আগেই (৯৯র পাতে) বলিছি যে, য়্যাকোনাইট (কাঠবিষ) খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে। এই জন্যে, হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিকশ্চ-রের সঙ্গে ৬ ফোটা টিংচর য়্যাকোনাইট মিশাইয়া দিতে বলিলাম। তার পর, (১০৬র পাতে) আয়োডীনের যে আরোক লিখিয়া দিইছি, তার চেয়েও তেজাল করিয়া ডান কোঁকে লাগাইতে বলিলাম। এখানে ৪ ড্রাম স্পিরিটে ২৫ গ্রেন্ আয়োডীন আর ২৫ গ্রেন্ আয়োডাইড অব পোটাসিয়ম্ দিলাম। যতক্ষণ খুব জ্বালা না ধরিবে, ততক্ষণ আয়োডীন্ লাগাইবে। কেন না, লিবরে (যকৃতে) রক্ত-জমা থাকিতে কুইনাইন্ খাওয়াইয়াও জ্বর ছাড়ান ভার। এ কথা এর আগেই (১০৫র পাতে) বলিছি। কুইনাইন্ মিকশ্চর খাইতে রোগী রাজি নয় বলিয়া, কুইনাইনের বড়ি লিখিয়া দিলাম। একষ্ট্রাক্ট জেন্‌শনের সঙ্গে ৫ গ্রেন্ কুই-নাইনের এক একটা বড়ি তয়ের করিতে বলিলাম। জেন-শন্ দিয়া বড়ি তয়ের করা সব চেয়ে ভাল, এ কথা এর আগেই (৭১র পাতে) বলিছি। গায়ের ভারি তাত। মাথার ঘিলুতে রক্ত জমিবার কোনও আটক নাই। মাথার ঘিলুতে রক্ত জমিয়াই বিকার হয়। এই জন্যে, মাথা ঠাণ্ডা করিয়া জল-পটি দিতে বলিলাম। কি রকম করিয়া জল-পটি দিলে, মাথা খুব ঠাণ্ডা হয়, এর আগেই (২২—২৩র

পাতে) তা বলিছি। তার পর, গায়ের তাত এক চুল কমি-লেও কুইনাইন খাওয়াইতে বলিলাম। ঘণ্টায় ঘণ্টায় তাপ-মান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া লিখিয়া রাখিতে বলিলাম। আর গায়ের তাত যেমন কমিয়া আসিবে, কুইনাইনও সেই সঙ্গে সঙ্গে খাওয়াইতে হইবে বলিলাম। রোগী নিজে মেডিকেল কলেজের ছাত্র। আবার তাঁর বাসার প্রায় সব গুলিই অন্য অন্য স্কুলে বা কলেজে পড়েন, কেউ বা পড়ান। এই জন্যে, আমি যেমন যেমন বলিছিলাম, তাঁরা ঠিক্ সেই রকম কাজ করিয়া, একটা কাগজে সব বেশ করিয়া লিখিয়া রাখিয়া ছিলেন। শুদু সেই কাগজ খানি পড়িলেই, এ জ্বরের চিকিৎসা অনেক শেখা যায়। এ রকম সুবিধা ডাক্তরদের প্রায় ঘটে না। এ রকম সুবিধা পাইলে, আমি ঘরের কড়ি খরচ করিয়া রোগী ভাল করি। সেই কাগজ খানিতে যা যা লেখা ছিল, নীচে তা লিখিয়া দিলাম ঃ—

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	নাড়ী ফি মিনিটে
২ই এপ্রেল	বেলা ৯টা	১০৫.৪*	১১০ বার
„	„ ১১॥টা	১০৫.৮	

* ১০—১১র পাতে বলিছি যে, তাপমান-যন্ত্রের গায়ে দুটি দুটি বড় দাগের মধ্যে চারিটি করিয়া ছোট দাগ আছে। এই ছোট দাগের এক একটি দাগ এক ডিগ্রা বা অংশের ৫ ভাগের এক ভাগ কিম্বা দশ ভাগের ২ ভাগ। সব নীচেকার ছোট দাগটী ১০ ভাগের ২ ভাগ। তার উপরকার দাগটি ১০ ভাগের ৪ ভাগ। তার উপ-রের দাগটি ১০ ভাগের ৬ ভাগ। তার উপরের দাগটী ১০ ভাগের

তারিখ	সময়	গায়ের তাত
„	„ ১॥টা*	১০৪.৪
,,	„ ২টো ১০ মিনিটে	ঐ

৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়ান হয়। (এক বারে ১০ গ্রেন্ খাওয়াইলে ভাল হইত। গায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই পূর মাত্রায় কুইনাইন্ দিবে)।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত
৫ই	বেলা ৩টে ১০ মিনিট	১০৪.৪
„	„ ৪টে ১০ „	ঐ
„	„ ৫টা ৪০ „	ঐ

এই সময় আমি তাঁকে আবার দেখিতে গিইছিলাম। গিয়া শুনিলাম ২টো ১০ মিনিটে যে ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়ান হইয়াছে, তার পর আর কুইনাইন্ দেওয়া হয় নাই। তাঁদের দোষ নাই। জ্বরের উপর কুইনাইন্ খাওয়ান তাঁদের এই প্রথম শিক্ষা। আমি দেরি না করিয়া তখনই ৭॥ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। এক বারে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিলেই ভাল হইত। আমার ইচ্ছাও তাই ছিল; কিন্তু ২॥ গ্রেন্ করিয়া এক একটা বড়ি তয়ের ছিল বলিয়া, ৩টে বড়ির বেশী দিতে পারিলাম না। উপরো-উপরি আর কটা বড়ি গেলা যায়?

---

৮ ভাগ। এই ১০ ভাগের ২ ভাগ, ৪ ভাগ, ৬ ভাগ আর ৮ ভাগ সংক্ষেপে লিখিবার বা বলিবার একটি সংকেত আছে। সে সংকেত এই:—.২, .৪, .৬, .৮।

*বেলা ১॥টার সময় অর্থাৎ গায়ের তাত প্রথম কমিতেই ১০ গ্রেন্ কুইনাইন দেওয়া উচিত ছিল।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত
৫ই	সন্ধ্যা ৭॥টা	১০৪
		কুইনাইন্ ৫গ্রেন্ খাওয়ান হয়।
”	রাত্রি ৮টা৫০ মিনিট	১০২.২
”	„ ৯॥টা	গায়ের তাত পরীক্ষা করা হয় নাই
		৫ গ্রেন্ কুইনান্ খাওয়ান হয়।

রাত্রে আর কুইনাইন্ দেওয়া হয় নাই। আমি রাত্রের মধ্যে ৩০ গ্রেন্ খাওয়াইতে বলিছিলাম। কিন্তু ২২॥ গ্রেনের বেশী দেওয়া হয় নাই।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	নাড়ী কি মিনিটে
৬ই এপ্রেল	সকাল ৬টা ১০ মিনিট	১০০.১	
	১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়ান হয়।		
” ”	বেলা ১১টা	৯৯.৭	৪৮ বার
	কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হইল।		
” ”	” ১টা	১০১.৩	

যদি বল, এত নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে, তবে কেন বেলা ১টার সময় আবার গায়ের তাত বাড়িল? গায়ের তাত বাড়িবার বেশ কারণ আছে। সে কারণ এই। প্রথম ধর, আয়োডীনে খুব জ্বালা ধরে নাই বলিয়া, লিবরে (যকৃতে) রক্ত-জমা ঘুচে নাই। লিবরে রক্ত-জমা থাকিতে, কুইনাইন্ খাওয়াইয়া জ্বর ছাড়ান ভার। এ কথা এর আগেই (১০৫র পাতে) বলিছি। তার পর ধর, ৫ই রাত্রে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইবার কথা; মোটে ২২॥ গ্রেন্ খাওয়ান হইছিল। তার পর ধর, ৬ই সকালে ৬টা ১০ মিনিটে ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া হয়। তার

পর বেলা ১১টার আগে আর কুইনাইন্ খাওয়ান হয় নাই। এই ৫ ঘণ্টার মধ্যে দু বারে ৫ গ্রেন্ করিয়া ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া উচিত ছিল।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত
৬ই	বেলা ২টো ১০ মিনিট	১০২.৫
”	” ৩টে	১০১.৬
”	” ৪টে	১০১.৮
”	” ৫॥টা	১০১.৪
”	সন্ধ্যা ৭টা	১০১.৪

কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ খাওয়ান হয়। বেলা সাড়ে ৫টার সময়, অর্থাৎ গায়ের তাত কমিলেই কুইনাইন্ দেওয়া উচিত ছিল। রাত্রে আর কুইনাইন্ দেওয়া হয় নাই।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত
৭ই	সকাল ৬টা	৯৯.৬
	কুইনাইন্ ১০ গ্রেন্ দেওয়া হয়।	
”	বেলা ৮টা ৪৫ মিনিট	৯৮.৮
	কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়।	

গায়ের তাত আর বাড়ে নাই। রোগীর আর কোনও অসুখ হয় নাই। কুইনাইন্ ছাড়া আর কোনও অসুদও দিতে হয় নাই। ব্যামো বেশ সারিয়া গেলেও ৮।১০ দিন কুইনাইন্ খাওয়াইবে; আর শীঘ্র স্নান করিবে না—এ কথা রোগীকে আগেই বলিয়া রাখিয়াছিলাম।

আয়োডীন এত বেশী করিয়া দিলাম, তবু জ্বালা ধরিল না। আয়োডীনের তেজ থাকিলে অবশ্যই জ্বালা ধরিত

এই মনে ভাবিয়া, আমার নিজের ডিস্পেন্সরি থেকে আয়োডীনের আরোক তয়ের করিয়া দিলাম। এই আয়োডীন এক পোঁচ লাগাইতেই রোগী জ্বালায় অস্থির হইল। জ্বালা যেমন ধরিল, কাজও তেমনি হইল। লিবরের (যকৃতের) রক্ত-জমা ঘুচিয়া গেল। জ্বর আসারও ভয় গেল।

তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) আর কুইনাইন্ কাছে থাকিলে আর গোড়া থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) রোগীর চিকিৎসা করিতে পাইলে, ভাল ডাক্তরের হাতে রোগীর কোন ভয়ই নাই। জীবনের ত আশঙ্কা নাই-ই। ভোগেও না, কোন উপসর্গও হইতে পায় না, ২। ৪ দিনেই আরাম হয়। ভাল ডাক্তর কাকে বলে? যিনি রোগ ভাল করিতে পারেন, তিনিই ভাল ডাক্তর। মেডিকেল কলেজে পড়িলেই যে ভাল ডাক্তর হয়, তা নয়। মেডিকেল কলেজ কোন দুওরি, তাও কখনও দেখেন নাই। অথচ চিকিৎসার এমন জুত বরাত বুঝেন, শক্ত শক্ত ব্যামোও এমন ব্যবস্থা করিয়া আরাম করেন যে মেডিকেল কলেজের চাপরাশ-ওয়ালা ডাক্তরদেরও মধ্যে অনেকের বুদ্ধিতে তেমন আসে না। এ রকম ডাক্তর আমি অনেক দেখিছি। চিকিৎসার বেশ জুত বরাত বুঝেন, আর ভাল চিকিৎসা করেন বলিয়া এঁদের উপর আমার যে ভক্তি আছে, অনেক বড় বড় ডাক্তরের উপর আমার সে ভক্তি নাই। অনেক ডাক্তর নামে বড়, কাজে বড়র কাছ দিয়াও যান না। তার পর বলি। ব্যামোর গোড়াতে চিকিৎসা

করিতে পাইলে ত রোগ শীঘ্র ভাল করিলে। কিন্তু রোগ খুব বাড়িয়া গেলে পর যদি তোমাকে ডাকে, তখন কি করিবে? তখনও তাপমান-যন্ত্র আর কুইনাইন্ তোমার প্রধান সহায় মনে করিবে। কেবল উপসর্গ গুলির দিকে নজর রাখিয়া চিকিৎসা করিবে। কেন না, উপসর্গ বাড়িতে দিলে, রোগী বাঁচাইতে পারিবে না। এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে।

এখানে আমার একটী রোগীর কথা বলি। ব্যামোর বাড়াবাড়ি না হইলে সে চিকিৎসক ডাকে নাই। ৭।৮ দিন সে কোনও অসুদও খায় নাই; পথ্যেরও কোন ধরাধর করে নাই। যে দিন ব্যামো খুব বাড়িল, বাঁচিবে না বলিয়া তার আত্মীয় স্বজনের মনে ভয় হইল। সেই দিন আমাকে তারা ডাকিয়া লইয়া গেল। আমি গিয়া প্রথমে তার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৬র দাগে উঠিল। ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলাম, মিনিটে ১৪৫ বার নাড়ী পড়িতেছে। জিব শুক্‌নো আর ফাটা-ফাটা, যেন চলা কাঠ। ডান কোঁকে আঙুলের ঘা দিতেই, তার ভারি ব্যথা লাগিল। এতেই জানিলাম, তার লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিয়া আছে। বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র পিঠে দিয়া শুনিলাম, ১৬২র আর ১৬৩র পাতে যে দু রকম শব্দের কথা লিখিছি, বুকের মধ্যে থেকে সেই দু রকম শব্দ খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া গেল। এতেই জানিলাম তার ব্রংকাইটিস হইয়াছে। ব্রংকাইটিস রোগের কথা (১৬৩র পাতে) বলিছি। ভুল বকে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, তারা বলিল, দিনমানে বেশী ভুল বকে

না। দশটা ভাল কথা কৈতে কৈতে দু চারটী ভুল বলে। কিন্তু রাত্রে কেবল এলোমেলো বকিতে থাকে। একটুও স্থির হইয়া ঘুমোয় না। পিপাসা খুব। কেবল জল আর ঠাণ্ডা জিনিস খাইতে চায়। পেটের কোনও ব্যামো নাই। বরং কোষ্ঠবদ্ধ আছে। এই সব বেশ করিয়া জানিয়া, তার পর, তাকে যে যে অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) কার্ব্বনেট অব্ য়্যামোনিয়া	...	১ ড্রাম
বাইনম ইপেকা ...	...	১ ড্রাম
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক ঈথর)		৪ ড্রাম
ব্রাণ্ডি ১র নম্বর ...	...	৩ ঔন্স
টিংচর সিংকোনি কো	...	৬ ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম্ ...	...	৬ ড্রাম
সিরপ্ জিঞ্জর ...	...	১ ঔন্স
ইনফিয়ুসন সেনিগা	...	১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ২।৩ ঘণ্টা অন্তর খাইবে।

রোগীর কাশি (ব্রংকাইটিস্) না থাকিলে, ৫০র পাতে যে হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড মিক্শ্চর লেখা আছে, সেই মিক্শ্চর দিতাম। কাশি ছিল বলিয়া, তা না দিয়া কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর দিলাম। অমন তর ক্ষীণ রোগীর শ্লেষ্মা সরল করিতে কার্ব্বনেট অব য়্যামোনিয়ার মত অসুদ আর নাই। বাইনম ইপেকাও শ্লেষ্মা খুব সরল

করে। তা ছাড়া, বাইনম ইপেকায় শুক্‌নো জিবও সরস হয়।

(২) য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বলেটাইল লিনিমেণ্ট)	১ ঔন্স
ক্যাজুপুটু অইল	১ ঔন্স
তার্পিণ	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে "বিষ" বলিয়া লিখিয়া দেও। পিঠে আর পাঁজরে রোজ ৩।৪ বার করিয়া মালিশ করিবে। এ মালিশেও শ্লেষ্মা সরল করে, আর কাশির খুব উপকার করে।

(৩) পিঠে আর পাঁজরে ঐ রকম করিয়া মালিশ করা হইলে পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিবে। তার্পিণের সেক যেমন করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

খুব গরম জলে ফ্ল্যানেল কি কম্বল ছেঁড়া ডুবাইয়া নিংড়াও। তার পর, তার উপর ৮০।৯০ কি ১০০ ফোটা তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া দেও। তার পর, যে দিকে তার্পিণ ছড়াইয়া দিলে, সেই দিকটে তার পিটে আর পাঁজরে দিয়া সেক দেও। এক ঘণ্টা ধরিয়া এই রকম সেক দিবে। দিনের মধ্যে ২।৩ বার সেক দেওয়া চাই। ফ্ল্যানেলের উপর ফি বারে তার্পিণ ছড়াইয়া দিতে হয়। তার্পিণ তেলের সেকে কাশির ভারি উপকার করে। কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর, মালিশের ঐ অসুদটী, আর তার্পিণের ঐই সেক, এই তিনটীই কাশির ভারি অসুদ। এতে কাশি সারিতেই চায়।

(৪) ৪২র পাতে পিপাসার যে অসুদ লেখা আছে, সেই অসুদ দিলাম। এ অসুদটীর অনেক গুণ। দাহ আর পিপাসা শান্তি করে। জিব সরস করে। জ্বরের বাগ ফিরাইয়া দেয়। বাঁকা জ্বর সোজা করে। যত দিন জ্বর থাকিবে, রোজ এই জল তৈয়ের করিয়া দিবে। জ্বর একটু শক্ত রকম হইলে, এ অসুদটী দিতে কখনও ভুলিবে না। আমি এ অসুদ সব জ্বরেই দিয়া থাকি।

(৫) ১০৬র পাতে আয়োডীনের যে আরোক লেখা আছে, সেই আরোক দু তিন পোঁচ তার ডান কোঁকে লাগাইয়া দিলাম।

(৬) ২৩র পাতে যে ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম মিক্শ্চর লেখা আছে, সেই মিক্শ্চর ৪ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম। ভুল-বকা, ঘুম না হওয়া, আর হাত পায়ের কাঁপনি,—এ সব উপসর্গের এটী যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর নাই। এ ছাড়া এতে আরো অনেক উপকার হয়। এর আগেই তা বলিছি।

(৭) মাথা ভারি গরম ছিল বলিয়া, মাথা মুড়াইয়া তাতে জল-পটি দিতে বলিলাম।

পথ্য—মাংসের কাথ আর দুধ দিতে বলিলাম।

এক দিন এক রাত এই নিয়মে অসুদ আর পথ্য পাইলে, রোগী অনেক চাঙ্গা হইল। জিব তত শুক্নো আর ফাটা-ফাটা রৈল না। পিপাসা কমিল। ভুল-বকাও অনেক কমিল। গায়ের তাতও ঢের কমিল। তাপমান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগে উঠিল। অসুদ ঠিক সেই

রকম নিয়মে খাওয়াইতে বলিলাম। আর, রোজ বেলা ৪টের আগে, অর্থাৎ গায়ের তাত বাড়িবার আগে, তিন বারে ১৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন দিতে বলিলাম। ৫।৭ দিনের মধ্যেই এমন মরা রোগী সারিয়া গেল। বেশ জুত বরাত করিয়া চিকিৎসা করিতে পারিলে, আর তদ্বির ঠিক হইলে, সব জায়গাতেই, শক্ত রোগী এমনি করিয়া বাঁচাইতে পারা যায়। সে পনর দিন পর্য্যন্ত নিয়ম করিয়া অসুদ খাইয়াছিল।

এই রোগীটীর আর ২।১ দিন চিকিৎসা না হইলে, তার ঘোর সন্নিপাত আসিয়া উপস্থিত হইত। চিকিৎসা না হইলে, কি কুচিকিৎসা হইলে, স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) রোগীর এই রকম ঘোর সন্নিপাত ঘটিয়া তবে মৃত্যু হয়। ঘোর সন্নিপাতে রোগীর বল এককালে থাকে না। এ অবস্থার রোগী যিনি একবার দেখিয়াছেন, তাঁর আর ভুল হয় না। রোগী চিত হইয়া শুইয়া থাকে। নাড়ীর ভারি বেগ, আর যেন সূতর মত বোধ হয়। বিড়-বিড় করিয়া বকিতে থাকে। কিম্বা জড়ের মত হইয়া থাকে। কিম্বা এক রকম অচৈতন্য হইয়া থাকে। চোকের দীপ্তি থাকে না। আর চোক দুটী স্থির হইয়া থাকে। সচরাচর শিব-নেত্র হইয়া থাকে। মুখ খোলা থাকে। মুখ থেকে ভারি দুর্গন্ধ বাহির হয়। শক্ত শুক্নো আর কটাশে জিব দেখিতে পাওয়া যায়। ঠোঁটে আর দাঁতে কাল ছাতা দেখা যায়। প্রস্রাব বাহ্যে বিছানাতেই হয়। হাত দু খানির কাঁপনি আর খেঁচুনি হয়। খেঁচুনির ভাল কথা আক্ষেপ।

আক্ষেপ হইতেছে বলিলে কি বুঝায়? হাতের মুটো এক বার করিয়া বাঁধিতেছে আর খুলিতেছে, এই বুঝায়। বিছানা বালিশ টানে, আর বিছানার সব জায়গায় যেন হাতড়াইতে থাকে। কখন কখন দু হাত উচ করিয়া যেন কিছু ধরিতে যায়। এ অবস্থায় রোগীর আর দুটী উপসর্গ ঘটিতে পারে। (১) রোগী নিয়ত চিত হইয়া শুইয়া থাকে বলিয়া, যেখানে যেখানে বেশী চাপ পায়, সেই খানে সেই খানে ঘা হয়। এই ঘাকে ইংরিজিতে বেড-সোর বলে। ভাল বাঙ্গালায় শয্যা-ক্ষত বলা যাইতে পারে। রোগীর বল এককালে নষ্ট না হইলে আর এ ঘা হয় না। এ সোজা ঘা নয়। প্রায়ই সারে না বলিলেই হয়। ঘা হইলে চৌদ্দ আনা জায়গায়, রোগীর আশা ভরসা ছাড়িয়া দিতে হয়। যে অবস্থায় এই ঘা হয়, শুদু সে অবস্থা থেকেই রোগীকে বাঁচান ভার। তার উপর আবার এই ঘা! এতে রোগীর জীবনের আশা কত টুকু, তা বুঝিতেই পারিতেছ। রোগীর গায়ে বলের সম্পর্ক নাই; রক্তের তেজ নাই, ঘা কেমন করিয়া সারিবে? বরং ঘা না হইলেও বা রোগী যে দু দিন বাঁচিত, ঘা ফুটিলে আবার সে দু দিনও বাঁচে না। দু দিনেই ঘা পচিয়া উঠে। না পচিবে কেন? রক্তের তেজ নাই বলিয়া, এক জায়গায় চাপ পাইয়া পাইয়া ঘা হইল। আবার সেই ঘায়ের উপর নিয়ত চাপ পাইতে লাগিল। কেন না, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি নাই। এতে এক দিনেই বাঘের ঘা হইয়া পড়ে। এই জন্যে, সন্নিপাত অবস্থায় এ রকম ঘা না হইতে পারে, সকলের

আগে তার উপায় করা চাই। সে উপায় কি, এখনই বলিব। তার পর বলি। (২) চোকের মণিতে ঘা হওয়া আর একটী উপসর্গ। ভাল রকম চিকিৎসা আর তদ্বির না হইলে, সন্নিপাতে চোক প্রায়ই নষ্ট হয়। সন্নিপাত বিকার হইছিল, কোন রকমে প্রাণটা বাঁচিয়াছে, কিন্তু একটা চোক গিয়াছে, অনেকের মুখে এ রকম শুনিতে পাওয়া যায়। কখন কখন দুটী চোকই যায়। কাণা অন্ধদের জিজ্ঞাসা করিলে, তাদের মধ্যে অনেকেই বলিয়া থাকে, সন্নিপাত-বিকারে চোকটী নষ্ট হইয়াছে; সন্নিপাত-বিকারে আমার দুটী চোকই গিয়াছে। সন্নিপাত বিকারে যাদের চোক যায়, তাদের চোকে প্রায়ই ঢেলা বেরোয়। চোকে "ঢেলা বেরন" কাকে বলে, সকলেই জানেন। সন্নিপাত বিকারে কেমন করিয়া চোক যায়, কেমন করিয়া ঢেলা বাহির হয়, এখন তাই বলিব। এ গুলি সকল চিকিৎসকেরই বেশ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। কেন না, শুদু জীবন রক্ষা হইলেই যে চিকিৎসকের খুব বাহাদুরি হইল, তা নয়। ভারি রোগে রোগীর কোন অঙ্গ হানি না হইতে পারে, সেটীও তাঁকে বিশেষ করিয়া দেখিতে হইবে। তা যদি না দেখেন, তবে রোগীকে বাঁচাইয়া তিনি তেমন যশ পাইবেন না।

চোকের দুটী ক্ষেত। শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত। কাল ক্ষেতকে চোখের মণি বলে। চোকের মণি নিজে কাল নয়। পরিষ্কার জল কি কাচ যেমন স্বচ্ছ, চোকের মণিও তেমনি স্বচ্ছ। যার মধ্যে দিয়া দেখা যায়, তাকে

ভাল কথায় স্বচ্ছ বলে। যদি বেশ করিয়া ঠাউরে দেখ, তবে মণির ঠিক পিছনে একটী কাল পর্দ্দা দেখিতে পাইবে। এই পর্দ্দাটী গোল। একে উপতারা বলে। এর ঠিক মাঝ-খানে একটী সরু ছাঁদা আছে। এই ছাঁদাটীকে চোকের তারা বলে, পুত্‌লোও বলে। এই পুত্‌লো দিয়া চোকের ভিতরে আলো যায়। আলো গেলে তবে আমরা দেখিতে পাই। পুত্‌লোর ভিতর দিয়া আলো যাইবার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে, আর দেখিতে পাওয়া যায় না। সূর্য্যের আলোতেই হোক্, আর প্রদীপের আলোতেই হোক্, এই পুত্‌লো খুব ছোট হইয়া যায়। আলো যত বেশী হয়, পুত্‌লোও তত ছোট হইয়া যায়। আবার আলো যত কম হয়, পুতলোও (ঐ ছাঁদা) তত বড় হয়। পরীক্ষা করিয়া দেখিলেই এ সব বেশ জানিতে পার। বিড়ালের চোকে এইটী সব চেয়ে ভাল দেখা যায়। রাত্রে বিড়ালের চোকের পুতলো এত বড় হয় যে, মণির পিছনের ঐ পর্দ্দাটা (উপতারা) যেন ঠিক একটী সরু আংটির মত হইয়া যায়। দিনমানে বিড়ালের চোকের সেই পুত্‌লো আবার একটী রেখার মত দেখায়। ঐ পর্দ্দার (উপতারার) রং এক জনের এক রকম নয়। এক রকম নয় বলিয়াই চোকের মণির রং সকলের সমান নয়। ঐ পর্দ্দার (উপতারা) যাদের খুব কাল, চোকের মণিও তাদের খুব কাল দেখায়। আবার ঐ পর্দ্দার (উপতারার) রং কটা হইলে, চোকের মণিও কটা দেখায়। অমুকের চোকের মণি খুব কাল বলিলে, কি বুঝিবে? মণির

পিছনকার ঐ পর্দ্দার (উপতারার) রং খুব কাল, এই বুঝিতে হবে। অমুকের চোকের মণি কটা বলিলে কি বুঝায় ? ঐ পর্দ্দার (উপতারার) রং কটা, এই বুঝায়। তার পর বলি। সহজ শরীরেও চোকের মণিতে খুব কম রক্ত যাতায়াত করে। এই জন্যে, সহজেই চোকের মণির তেজ কিছু কম। এর উপর অমনতর শক্ত ব্যামো হইয়া শরীরে রক্ত কমিয়া গেল, রক্তের তেজ এত খাটো হইয়া যায় যে, মণি এক রকম রক্ত-হীন হইয়া পড়ে। রক্তই শরীরের জীবন। শরীরের যে অংশে রক্ত যাওয়া বন্ধ হয়, সেই অংশই নষ্ট হয়। এমন কি, একটী চুলের গোড়ায় রক্ত যাওয়া বন্ধ হইলে, সে চুলটিও নষ্ট হয়, পাকিয়া যায়, পড়িয়া যায়। ইচ্ছা করিয়াও যদি শরীরের কোন অংশে রক্ত যাইতে না দেও, তবে সে অংশও নষ্ট হয়। ঊর্দ্ধবাহু সন্ন্যাসীদের বাউ আর হাত শুক্‌নোই এর প্রমাণ। যাতে শরীরের তেজ কমে, তাতেই চোকের মণি নষ্ট হইতে পারে। সহজেই চোকের মণির তেজ কম বলিয়া, সকলের আগে চোকের মণি নষ্ট হয়। উপ্‌রো-উপ্‌রি উপস করিলে চোকের মণি নষ্ট হয়। প্রাচীন হইলে, ভাল আহার না জুটিলে চোকের মণি নষ্ট হয়। এতে সন্নিপাত-বিকারে চোকের মণি নষ্ট হইবে, আশ্চর্য্য কি ? যে কারণেই হোক্‌, শরীরের তেজ হঠাৎ একবারে নষ্ট হইলে, চোকের মণি, এমন কি খসিয়া যায়। নৈলে, প্রথমে চোকের মণিতে ঘা হয়। সেই ঘা বাড়িতে না পায়, এমন উপায় না করিলে, ঘা ক্রমে বাড়িয়া, মণি ফুটো হইয়া যায়। ফুটো হইয়া গেলে, মণির

পিছনে যে পর্দ্দা (উপতারা) আছে বলিছি, সেই পর্দ্দা (উপতারা) বাহির হইয়া পড়ে। একেই "ঢেলা বেরন" বলে। চোকের ভিতরে লালের মত এক রকম জল আছে। ঐ পর্দ্দার (উপতারার) সঙ্গে এই জলও খানিকটে বাহির হইয়া যায়। এই জলে ঐ পর্দ্দা (উপতারা) খাড়া ভাবে ভাসিয়া থাকে। ফুটো বড় না হইলে আর সব পর্দ্দা বাহির হইয়া আসে না। প্রথমে ফুটো ছোটই হইয়া থাকে। এই জন্যে, ঐ পর্দ্দার (উপতারার) কেবল একটু খানি ফুঁড়িয়া বাহির হয়। তার পর, ক্রমে যেমন ফুটো বড় হইতে থাকে, পর্দ্দাও (উপতারাও) বেশী বেশী বাহির হইতে থাকে। চোকের মণিতে ঘা কি এক দিনেই হয়? না, আগে তার কোন লক্ষণ জানিতে পারা যায়? আগে থাকিতে, অবশ্যই তার কোন চিহ্ন টের পাওয়া যায়। সে সব এখনই বলিব। আগে শয্যাক্ষতের (বেড্‌সোরের) কথা বলি।

(১) শয্যাক্ষত (বেড্‌সোর)——এর আগেই বলিছি যে, খুব দুর্ব্বল রোগী বিছানায় নিয়ত শুইয়া থাকিলে, যেখানে যেখানে বেশী চাপ পায়, সেই খানে সেই খানে ঘা হয়। শরীরের যে সব জায়গায় মাংস আর চর্ব্বি কম, হাড়, চামড়া দিয়া ঢাকা, সেই সব জায়গাতেই এই ঘা বেশী হয়। যেমন জম্মকাঠের উপর, কন্ন-কোণায়, আর পাকয়োয়। সব জায়গার চেয়ে জম্মকাঠের উপরেই এই ঘা বেশী হয়। কেম না, চিত্ত হইয়া শুইলে জম্মকাঠের উপর যেমন চাপ পায়, এমন আর কোন জায়গায় নয়। জম্মকাঠকে ডাক্ত-

রেরা সেক্‌রম বলেন। সেক্‌রম ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা ত্রিকাস্থি। ত্রিকাস্থির অর্থ তে-কোণা হাড়। জন্ম-কাঠ খান তে-কোণা বলিয়া, এর এই নাম দেওয়া হইয়াছে। সবল রোগীর এ রকম ঘা হয় না। কেন না, অনেকক্ষণ চিত কি কাইত হইয়া শুইয়া কষ্ট বোধ হইলেই, সে পাশ ফিরিয়া শোয়। পাশ ফিরিয়া শুইলে যেখানে চাপ পাইয়া রক্ত জন্মিয়াছিল, সেখানে আর রক্ত জমিয়া থাকিতে পারে না। কাজেই, সেখানে কোন ঘা ঘোও হয় না। কিন্তু দুর্ব্বল রোগী, যে সহজে পাশ ফিরিতে পারে না, পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়; তারই এই ঘা হইয়া থাকে। একে রক্তের তেজ কম, নাই বলিলেও হয়, তাতে রোগী অস্থিচর্ম্ম সার। শুইয়া থাকিলে, যে সব জায়গায় বেশী চাপ পায়, সে সব জায়গার হাড় কেবল এক খানি চামড়া দিয়া ঢাকা। এর উপর এক জায়গায় অনেকক্ষণ চাপ পাইলে সে জায়গার রক্ত জমিয়া, আর সে জায়গার চামড়া নষ্ট হইয়া ঘা হবে, আশ্চর্য্য কি? তাই কি সহজ ঘা হয়? সহজ ঘা হবে কেন? সহজ গা ত নয়, যে সহজ ঘা হবে। যে ঘায়ে রক্ত পায় না, সে ঘা কি করিয়া সহজ হবে? যখন ঘা ফোটে, তখন এক বারেই পচা ঘা দেখা যায়। বিছানা শক্ত হইলে, এ ঘা ফুটিতে একটুও দেরি হবে না। এ ঘা সারিতে চায় না। এই জন্যে, এ ঘাকে চিকিৎসকেরা এত ভয় করেন। যে রোগকে ভয় করিতে হয়, সে রোগ না হইতে পায়, এমন উপায় করাই উচিত। এই জন্যে খুব দুর্ব্বল রোগীর বিছানা

পুরু আর নরম করিয়া দিবে। সে যদি নিজে পাশ ফিরিয়া শুইতে না পারে, তবে মাঝে মাঝে পাশ ফিরাইয়া দিবে। তার পরণের কাপড়, আর বিছানা বালিশ, খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন রাখিবে। তার গায়ে কোনও খানে ময়লা থাকিতে দিবে না। বিছানায় প্রস্রাব বাহ্যে করিল কি না, সর্ব্বদা তদারক করিয়া দেখিবে। কেন না, রোগীকে খুব পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন না রাখিতে পারিলে, ও ঘা কখনই বারণ করিয়া রাখিতে পারিবে না। শুইয়া থাকিলে, যে সব জায়গায় চাপ পায়, রোজ দু বেলা, সেই সব জায়গা বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিবে। যদি দেখ কোন জায়গা রাঙা কি বিবর্ণ হইয়াছে, তবে দেরি না করিয়া, তখনই রেক্‌টিফাইড্‌ স্পিরিটে কিম্বা ব্রাণ্ডিতে ন্যাকড়া ভিজাইয়া, সে সব জায়গা বারে বারে মুছাইয়া দিবে। রেক্‌টিফাইড্‌ স্পিরিটে একটু কর্পূর গুলিয়া লইলে আরো উপকার হয়। সেই সব জায়গার চামড়ার তেজ আরো শীঘ্র বাড়ে। ঘা হইবার শঙ্কা যত দিন না যাবে, তত দিন রোজ ৪। ৫ বার এই রকম করিয়া মুছাইয়া দিবে। যদি বল, ঘা হইবার শঙ্কা গিয়াছে কি না, কি করিয়া জানিবে? তা জানা শক্ত নয়। রক্তের তেজ খুব না কমিলে, আর গায়ের বল এক কালে না গেলে, এ রকম ঘা ঘো হয় না। কাজেই, রোগীর গায়ে যদি ফের বল করিয়া না দিতে পার, তবে ও রকম ঘা ঘো হওয়া কখনও বারণ করিতে পারিবে না। এমন তর রোগীকে চাঙ্গা করিবার জন্যে ভাল অসুদও চাই, ভাল পথ্যও চাই। যদি কাশি (ব্রংকাইটিস্‌) থাকে,

তবে ১৭১র পাতে যে কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চর লেখা আছে, সেই মিক্‌শ্চর সেই রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইবে। আর যদি কাশি না থাকে, তবে ঐ মিক্‌শ্চর্ থেকে বাইনম ইপেকা বাদ দিয়া দিবে। আর ইন্‌ফিয়ুশন্ সেনিগার বদলে ডিকক্‌শন সিংকোনা দিবে। পথ্য—মাংসের ক্বাথ আর দুধ দিবে। মাংসের ক্বাথ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, ১২৮—১৩১র পাতে তা লিখিয়া দিইছি। অমন অবস্থায় রোগীর প্রায়ই পেটের দোষ হইয়া থাকে। এই জন্যে, শুদু দুধ না দিয়া, তার সঙ্গে চূণের জল মিশাইয়া দিবে। তিন ভাগ দুধে এক ভাগ চূণের জল দিবে। দুধের সঙ্গে চূণের জল এক বারে মিশাইয়া রাখিবে না। তা হইলে দুধ খারাপ হইয়া যাবে। দুধ খাওয়াইবার সময় চূণের জল মিশাইয়া লইবে। কাঁশার কি পিতলের পাত্রে দুধ রাখিলেও খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, পাতরের বাটিতে দুধ রাখিবে। এই রকম নিয়ম করিয়া অসুদ আর পথ্য দিয়াও যদি দেখ যে, রোগী বেশ চাঙ্গা হইতেছে না, তবে মাংসের ক্বাথের সঙ্গে ফি বারে ১ ড্রাম কি ২ ড্রাম ব্রাণ্ডি মিশাইয়া খাওয়াইবে। রোগীকে ১র নম্বর ভিন্ন অন্য ব্রাণ্ডি কখনও দিও না। এ কথা এর আগেই (৫১—৫২র পাতে) বলিছি। এ সব রোগীর কি গায়ের তাত পরীক্ষা করিবে না? তা না করিলে কখন্ কুইনাইন্ দিতে হবে, কেমন করিয়া জানিবে? রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, ম্যালেরিয়া-জ্বরে কুইনাইন্ দেওয়া চাই-ই। এ কথা

এর আগে (৮১—৮৩র পাতে) এত বার করিয়া বলিছি যে, এখানে তা আর বলিলাম না।

শয্যা-ক্ষত (বেড্‌সোর্‌) না হইতে পারে, তার উপায় মোটা-মুটি এক রকম করিলে। কিন্তু ঘা ফুটিলে পর যদি তোমাকে ডাকে, তখন কি করিবে? কোন অসুদ বিসুদ দিবে? না, ও ঘা সারিবে না বলিয়া, চলিয়া আসিবে? চলিয়া আসিলে হবে কেন? ও ঘায়ের ত বেশ অসুদ আছে। ২ ভাগ ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে, ১ ভাগ বল্‌সম্‌ পেরু মিশাইয়া, লিণ্ট কি ন্যাক্‌ড়ার উপর পুরু করিয়া লাগাইবে। তার পর, ঐ লিণ্ট কি ন্যাক্‌ড়া ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবে। তার উপর মসিনার খৈলের পুল্‌টিশ দিবে। রোজ তিন চারি বার করিয়া এ সব বদলাইয়া দিবে। লিণ্ট পাও ত ভালই। নৈলে, যে ন্যাক্‌ড়া ব্যবহার করিবে, তা পুরণ আর পুরু হওয়া চাই। পুরণ লেপের তূল হইলেও হয়। ক্যাষ্টর অইল (রেড়ির তেল) আর বল্‌-সম্‌ পেরু, এ ঘায়ের যেমন অসুদ, তেমন আর নাই। আমি অনেক জায়গায়, এ অসুদ ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পাইয়াছি। ক্যাষ্টর অইল খাইলে বাহ্যে হয়; আর প্রদীপে পোড়ায়; লোকে এই-ই জানে। এ যে আবার ঘায়ের এমন অসুদ, তা অনেকে জানেন না। আমি দেখিছি, ক্যাষ্টর অইলে প্রায় সকল ঘাই সারে। ক্যাষ্টর অইল পোড়া-ঘায়েরও চমৎকার অসুদ। বল্‌সম্‌ পেরু জিনিশটে কি? গাছের আঠা। গাছের গুঁড়িতে ছুরি দিয়া চির দিলে, ঐ আঠা বাহির হয়। মার্কিন্‌ দেশে এই

গাছ হয়। অক্‌সাইড্ অব্ জিঙ্ক অইণ্টমেণ্টও (মলমও) এ ঘায়ের মন্দ অসুদ নয়। ঘায়ে যে অসুদই দেও, রোগীর গায়ে শীঘ্র বল করিয়া দিবার চেষ্টা বিধি মতে করিবে। নৈলে, সব মিথ্যা হবে।

(২) চোকের মণিতে ঘা—চোকের মণিতে যে অমনি এক দিনেই ঘা হইয়া পড়ে, তা নয়। সব রোগেরই পূর্ব্ব-লক্ষণ আছে। এই সব পূর্ব্ব-লক্ষণ জানা থাকিলে, অনেক জায়গায় রোগের হাত এড়াইতে পারা যায়। ঘা হইবার আগে, চোকে বারে বারে পিচুটি পড়ে। এই মুছাইয়া দিলে, আবার খানিক পরেই পিচুটি জমিল। অমন তর দুর্ব্বল রোগীর চোকে, বারে বারে এ রকম পিচুটি পড়িতে দেখিলেই, এক বারে ঠিক্ করিবে যে, তার চোকের মণিতে ঘা হইবার আর দেরি নাই। এখন যদি খুব সাবধান হও, তবে রোগীর চোকটী বাঁচাইতে পার। সচরাচর এক চোকেই ঘা হইয়া থাকে। কখন কখন দু চোকেও হয়। খুব দুর্ব্বল রোগীর চোকে বারে বারে পিচুটি পড়িতেছে দেখিলেই, ফট্‌কিরির জল দিয়া তার চোক বারে বারে ধোওয়াইয়া দিবে। চোক যত পরিষ্কার রাখিবে, ততই ভাল। গায়ের বল আর রক্তের তেজ, খুব না কমিয়া গেলে আর চোকের মণিতে ঘা হয় না। এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। নৈলে, শুদু ফট্‌কিরির জল দিয়া চোক ধোওয়া-ইলে কাজ হবে না। এর আগে, যে অসুদ আর পথ্যের কথা বলিছি এখানেও সেই অসুদ আর পথ্য দিবে। অপরিষ্কার জলে ফট্‌কিরি গুলিয়া, সেই জল দিয়া চোক

ধুইলে, উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। সে জল দিয়া চোক ধোওয়া, আর কাদা-গোলা জল চোকে দেওয়া সমান। কেন না, অপরিষ্কার জলে ফট্‌কিরি দিলে, ফট্‌-কিরির গুণে জলের ময়লা কাটিয়া নীচে সব জমা হয়। কাজেই, সে জল দিয়া চোক ধোওয়াইতে গেলে, সেই ময়লা ত চোকে লাগিবেই। এই জন্যে, ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটরে ফট্‌কিরি গুলিয়া দিলে ভাল হয়। ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটর্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা পরিশ্রুত জল। এ জল ডিস্পেন্সেরিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এ জলের বদলে গোল্যাপ জলও ব্যবহার করিতে পার। আজ্ কাল্ কলিকাতায় যে কলের জল হইয়াছে, তাতেও ফট্‌কিরি গুলিয়া দেওয়া যায়। ফট্‌কিরির জল কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম ঃ—

ফট্‌কিরি য়্যালম্	... ...	৪০ গ্রেন
ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটর বা গোলাপ জল		৮ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে "চোক ধোআইবার অসুদ" বলিয়া লিখিয়া দেও। কাচের কি পাতরের বাটিতে এই জল টুকু ঢাল। তাতে খুব সরু ফর্শা, আর পুরাণ ন্যাকড়া ভিজাও। তার পর বাঁ হাতের দুটী আঙুল দিয়া চোকের দুই পাতা ফাক করিয়া চোকের একটু উপরে ঐ ভিজে ন্যাকড়া এমনি করিয়া টিপিবে যে, তা থেকে জল বাহির হইয়া, চোকের পিচুটী বা ময়লা সব ধুইয়া লইয়া যাইতে পারে। তার পর, কোন খানে এক আধটু পিচুটি লাগিয়া থাকিলে, সেই

ন্যাকড়া দিয়া সব বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে। ঘণ্টার মধ্যে ৩।৪ বার এই রকম করিয়া চোক পরিষ্কার করিয়া দিবে। এই রকম করিলে, দু দিনেই চোক পিচ্‌টন ভাল হইয়া যাইবে। ঘা হইবার আশঙ্কা আর থাকিবে না। ঘায়ের যদি সূত্রপাত হইয়া থাকে, তবে তাও জানিতে পারা যায়। চোকের মণিতে যে ঘা হয়, শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত যেখানে মিলেছে, সে ঘা ঠিক সেই খানে আরম্ভ হয়। যদি বেশ ঠাউরে দেখ, তবে সেই খানে খুব সরু দুটী কি তিনটী রাঙা শির দেখিতে পাবে। বোধ হইবে, শির কটী ঠিক যেন একটী জায়গা থেকে বাহির হইয়াছে, কিম্বা চারি দিক থেকে ঠিক্ সেই জায়গাতেই শির গুলি যাইতেছে। এইটিই ঘায়ের জায়গা ঠিক করিবে। দুই এক দিন পরে, কি তারও আগে এই জায়গায় খুব সরু এক খানি আঁইসের মত দেখা যায়। এই আঁইস দেখিতে দেখিতে, কাল ক্ষেতের দিকে বাড়িয়া যায়। চোক পিচ-টুতে আরম্ভ করিলে, ঐ রকম করিয়া ধোআইয়া দিলে, আর রোগীর গায়ে শীঘ্র বল করিয়া দিবার উপায় করিলে (অসুদ আর পথ্য দিয়া), ঘা আর বাড়িতে পারে না। গোড়া থেকে চিকিৎসা করিয়াও যদি চোকের মণিতে ঘা হওয়া বা ঘা বাড়া বারণ করিতে না পার, তবে সে তোমার দোষ। তুমি চিকিৎসক। রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ জান। গোড়া থেকে রোগের চিকিৎসা করিতেছ। তুমি যা বলিতেছ, গৃহস্থ তখনই তাই করিতেছে। এতে যদি রোগ বাড়ে, তবে সে কার দোষ? গৃহস্থের নয়, পাড়া প্রতিবাসিরও

নয়। সে তোমারই দোষ। চোকের মণিতে ঘা হইলে পর, যদি তোমাকে ডাকে, তবে তখন কি করিবে? তখনও পিচুটি-পড়া বন্ধ করিবার জন্য, ফট্‌কিরির জল দিয়া বারে বারে চোক ধোআইয়া দিবে। কেন না, ফট্‌কিরির জল দিয়া অমন করিয়া ধোআইয়া না দিলে, পিচুটি-পড়া ক্রমেই বাড়িতে থাকে। এ দিকে, যেমন ঘা বাড়িতে থাকে, পিচুটি পড়াও তেমনি বাড়িতে থাকে। তার পর, বেশ ঠাউরে দেখিবে, ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি খাইয়া গিয়া পাতলা হইয়া গিয়াছে কি না। যদি তা না গিয়া থাকে, তবে ফট্‌কিরির জল দিয়া অমনি করিয়া ধোআন আর ঐ রকম পথ্য দেওয়া ছাড়া, আর কিছুই করিতে হইবে না। কিন্তু যদি ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি পাতলা হইয়া গিয়া থাকে, তবে মণির পিছনকার সেই পর্দ্দা (উপতারা), সেই খান দিয়া যেন ঠেলে বেরবে, এমনি বোধ হয়। বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলে, এইটী জানিতে পারিবে। ফল কথা, ঘা হইয়া চোকের মণি যত পাতলা হয়, মণির পিছনকার পর্দ্দা (উপতারা) তত ঠেলিয়া আসে। তার পর, ঘায়ের জায়গায় মণি যে ফুটিয়া যায়, সেই ঐ পর্দ্দা (উপতারা) তার ভিতর দিয়া বাহির হইয়া আসে। একেই "ঢেলা বেরন" বলে। এর আগেই (১৭৮র পাতে) এ কথা বলিছি। ঢেলা বাহির হয় নাই, কিন্তু ঘা হইয়া, ঘায়ের জায়গায় চোকের মণি এত পাতলা হইয়া গিয়াছে যে, শীঘ্রই ঢেলা বাহির হইতে পারে। এ অবস্থায় কি করিবে? এ অবস্থায় যা যা করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

চোকে ঢেলা বাহির না হইতে পায়, তার উপায়—১৭৮’র পাতে বলিছি, রাত্রে বিড়ালের চোকের পুত্‌লো এত বড় হয় যে, মণির পিছনকার পর্দ্দাটী (উপতারা) যেন ঠিক একটী সরু আংটির মত হইয়া যায়। চোকের কাল ক্ষেত অর্থাৎ মণি যত বড়, মণির পিছনকার ঐ পর্দ্দাও (উপতারাও) তত বড়। কাজেই, মণির চারিদিক বেড়িয়া, অর্থাৎ যেখানে শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত মিলিয়াছে, সেই খানে ঐ আংটি থাকে। এ আংটিটী কি, তা যেন ভুল হয় না। আংটির বেড় ঐ পর্দ্দা (উপতারা) আর, আংটির ফাক, চোকের তারা (পুত্‌লো) এ যেন মনে থাকে। চোকের শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত যেখানে মিলেছে, সেখানে যদি ঐ পর্দ্দা (উপতারা) গোটো হইয়া আংটির মত বেড়িয়া থাকে, তবে ঘা হইয়া মণি ফুটিয়া গেলেও, ও পর্দ্দা (উপতারা) সেই ফুটো দিয়া বাহির হইয়া আসিতে পারে না। কাজেই ঢেলাও বাহির হয় না। তবেই দেখ, চোকের তারা (পুত্‌লো) খুব বড় করিয়া দিতে পারিলে, “ঢেলা বেরুতে” পারে না। চোকের তারা (পুত্‌লো) যত বড় হয়, ঐ পর্দ্দাও (উপতারা) গোটো হইয়া আংটীর মত তত সরু হইয়া যায়। অর্থাৎ উপতারা (ঐ পর্দ্দা) গোটো হইয়া আংটির মত সরু হইয়া যাওয়া, আর তারা (পুত্‌লো) খুব বড় হওয়া একই কথা। তার পর, এখন দেখ, এমন কোনও অসুদ আছে কি না, যা চোকে দিলে তারা (পুত্‌লো) খুব বড় হয়। যদি থাকে, তবে “ঢলা বেরুতে” না দিবার সেই-ই অসুদ। সে অসুদ

আর কি ? বেলাডনা। বেলাডনার জল চোকে দিলে, কি চোকের উপর বেলাডনার প্রলেপ দিলে, চোকের তারা (পুত্‌লো) খুব বড় হয়। এই মাত্র বলিছি যে, চোকের তারা খুব বড় করিয়া দিতে পারিলে, ঢেলা বাহির হইবার ভয় থাকে না তবেই দেখ, চোখের মণিতে ঘা হইলে, ঢেলা বেরুতে না দেওয়ার উপায় খুব সহজ। ফট্‌কিরির জল দিয়া চোক ধোয়ান, বেলাডনার জল চোকে দেওয়া, কিম্বা চোকের উপর বেলাডনার প্রলেপ দেওয়া, আর রোগীর গায়ে শীঘ্র বল করিয়া দেওয়া—এই তিনটী করিতে পারিলে, এ রোগের চিকিৎসা করা হইল। তার পর বলি ;—বেলাডনার জল কেমন করিয়া তয়ের করে ; আর বেলাডনার প্রলেপই বা কেমন করিয়া দেয়।

বেলাডনার জল।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডনা	...	৫ গ্রেন।
ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটর কি গোলাপ জল		২ ড্রাম।

এই জলে বেলাডনা বেশ করিয়া গুলিয়া, মাপের গ্লাসে, কিম্বা কাচের ছোট একটা বাটিতে খানিক ক্ষণ রাখিয়া দেও। তার পর ব্লটিং পেপার (কাগজ) দিয়া ছাঁকিয়া লও। যে কাগজ দিয়া কালি চুপশে লয়, তাকে ব্লটিং পেপার বলে। ব্লটিং পেপার না পাও ত, পাঁচ ছয় পুরু ন্যাকড়া দিয়া ছাঁকিয়া লইবে। ন্যাকড়া খুব ফর্শা আর সরু হওয়া চাই। তার পর, সেই জল একটা শিশিতে করিয়া রাখ। এই তোমার বেলাডনার জল তয়ের হইয়া গেল। এই জল, এক ফোটাই হোক, আর দু ফোটাই

হোক, রোজ তিন বেলা তিন বার চোকে দিয়া দিবে। পেনের কলমে করিয়া লইয়া চোকে ফোটা দিবে। লেখা কলমে হবে না। কলমের মোচ বাদ দিয়া ফেলিবে। চোকে ফোটা শীঘ্র পড়িতেছে না বলিয়া, চোকের উপরেই যেন কলম ঝাড়িও না। কেন, তা আর বলিতে হবে না। বুঝিতেই পারিতেছ। চোকের ঢেলা বেরন বারণ করিতে গিয়া চোকে খোঁচা লাগাইয়া দিলে! রোগী চোকের মণির ঘায়ের যাতনায় অস্থির! তার উপর আবার কলমের খোঁচা!

বেলাডনার প্রলেপ।

এক তোলা আন্দাজ একষ্ট্রাক্ট বেলাডনা লইয়া, তাতে একটু জল দিয়া, বেশ করিয়া আঙুল দিয়া নাড়ো। তার পর, বেশ প্রলেপ দিবার মত হইলে, চোকের দুই পাতার উপর, ভ্রূর উপর, আর কপালে ওর প্রলেপ দেও। প্রলেপ দিয়া আর চোক খোলা হইবে না। খুলিলে চোকের মধ্যে বেলাডনা যাবে। এই জন্যে, প্রলেপ দেওয়ার পর কচি কলাপাত গোল করিয়া কাটিয়া তার উপর বসাইয়া দিবে। কলাপাতের উপর তুলোই হোক, আর ল্যাক্‌ড়াই হোক, দিয়া ব্যাণ্ডেজ দিয়া সব বাঁধিয়া রাখিবে। ফট্‌কিরির জল দিয়া চোক ধোআইবার সময়, এ সব খুলিয়া ফেলে, প্রলেপ ধুইয়া ফেলিবে। তার পর আবার, ঐ রকম করিয়া প্রলেপ দিবে আর বাঁধিয়া রাখিবে।

বেলাডনার প্রলেপে যে শুদ্ধু পুতলো বড় হয়, তা নয়। চোকের মণিতে ঘা হইলে, যে যন্ত্রণা হইয়া থাকে, সে যন্ত্রণাও দূর হয়!

সিংকোনা থেকে যেমন কুইনাইন তয়ের হয়; আফিং থেকে যেমন মর্ফিয়া তয়ের হয়; বেলাডনা থেকে তেম্‌নি একটী জিনিশ তয়ের হয়। তাকে য়্যাট্রোপিয়া বলে য়্যাট্রোপীনও বলে। বেলাডনার জল চোকে দিলে যেমন তারা (পুত্‌লো) বড় হয়, য়্যাট্রোপীনের জলও চোকে দিলে, পুত্‌লো সেই রকম বড় হয়। বরং বেলাডনার জলের চেয়ে য়্যাট্রোপীনের জলে আরো শীঘ্র কাজ করে। তবে, য়্যাট্রোপীনের দাম খুব বেশী বলিয়া রোগীদের বেলাডনার জল দেওয়াই ভাল। য়্যাট্রোপীনের জল কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, নীচে লিখিয়া দিলাম।

য়্যাট্রোপীন	... ...	১ গ্রেন।
ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটর বা গোলাপ জল	...	১ ঔন্স।

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

বেলাডনার জল যে রকম করিয়া চোকে দিতে হয় বলিছি, য়্যাট্রোপীনের জলও সেই রকম করিয়া চোকে দিবে।

ঢেলা বেরুলে পর, যদি তোমাকে ডাকে, তবে তখন কি করিবে? ঢেলা যা বাহির হইয়াছে, তার চেয়ে আর বেশী বাহির হইতে না পারে, তখন তাই করিতে হবে। চোকের মণির যেখানে দিয়া উপতারা (মণির পিছনকার পর্দ্দা) ফুঁড়িয়া বাহির হইয়াছে, সেই খানে, রোজ এক বার করিয়া কাষ্টকির বাতি ছোঁআইয়া দিলে, মণিতে আর উপতারাতে (ঐ পর্দ্দাতে), ঐ খানে যোগ হইয়া যায়। উপতারা (ঐ পর্দ্দা) আর বাহির হইতে পারে না। এ ছাড়া

ফটকিরির জল দিয়া যে রকম করিয়া চোক ধোআইতে হয় বলিছি, আর যে রকম করিয়া চোকের তারা (পুত্‌লো) বড় করিয়া দিতে বলিছি, সে সবই করা চাই।

এর আগেই (১৮৫—১৮৬র পাতে) বলিছি যে, চোকের শাদা ক্ষেত আর কাল ক্ষেত (মণি) যেখানে মিশেছে, সেই খানেই প্রথমে ঘা হয়। মণির অন্য জায়গাতেও হয়। তার পর, সেই ঘা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে মণির অনেক খানি ঘিরিয়া লয়। যত দিন পুত্‌লোর উপরে ঘা না যায়, তত দিন দৃষ্টির কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। এই জন্যে, ঢেলা বেরুতে না দেওয়ার উপায় করা যেমন দরকার, ঘা বাড়িয়া পুত্‌লোর উপর গিয়া না পড়িতে পারে, তার উপায় করাও তেমনি দরকার। এর আগে যা যা করিতে বলিছি, তা করিলে, ঢেলাও বেরোয় না, ঘাও বাড়িতে পারে না। অন্য জায়গার ঘা হইয়া সারিয়া গেলে, যে রকম জামড়ো পড়ে, চোকের মণিতে ঘা হইয়া সারিয়া গেলেও সেই রকম জামড়ো পড়ে। এই জামড়ো, চোকের মণিতে একটী শাদা পুরু দাগ হইয়া থাকে। এ দাগ যদি পুত্‌লো থেকে তফাত থাকে, তবে দেখিবার কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। পুত্‌লোর উপর হইলে আর দৃষ্টি চলে না। তা চলিবে কেন? কাচের উপর চূণ মাখাইয়া দিলে কি তার ভিতর দিয়া দেখা যায়? কখনই না। চোকের মণি কাচের মত স্বচ্ছ বলিয়া তারার (পুত্‌লোর) ভিতর দিয়া চোকের মধ্যে আলো যায়। আলো গেলে তবে আমরা দেখিতে পাই। এ কথা এর আগেই (১৭৬—১৭৭র পাতে) বলিছি।

কাজেই পুত্‌লোর উপর অমন শাদা দাগ থাকিলে, চোকের মধ্যে কেমন করিয়া আলো যাবে ? চোকের মণির উপর, এই জামড়ো বা শাদা দাগ কি রকম, অনেকে তা দেখিয়াছেন। যাদের মুখে বসন্তের দাগ বেশী, তাদের মধ্যে অনেকের চোকে, এই রকম শাদা দাগ খুব স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়। চোকের মণিতে এ রকম শাদা দাগ থাকিলে, চোকের তেমন শ্রী থাকে না। এই জন্যে রোগী ভাল হইয়াও চোকের মণির শাদা দাগটীর জন্যে দুঃখিত থাকে। ডাক্তরদের জিজ্ঞাসা করিয়া বেড়ায়—কোন অসুদ দিলে, চোকের ও শাদা দাগটী কি উঠিয়া যায় না ? আপনাদের কি এমত অসুদ নাই ? চোকের মণির ও রকম শাদা দাগ উঠাইয়া ফেলিবার একটী ভাল অসুদ আছে। সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম ঃ—

আয়োডীন	১	গ্রেন।
আয়োডাইড অব্ পোটাসিয়ম ...	২	গ্রেন।
ডিষ্টীল্‌ড্ ওয়াটর বা গোলাপ জল	৬	ড্রাম।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

পেনের কলমে করিয়া রোজ ২ বেলা দু ফোটা চোকে দিবে। যত দিন দাগটী না উঠিয়া যায়, তত দিন রোজ ঐ রকম করিয়া চোকে অসুদ দিবে। আমি এই অসুদ দিয়া অনেকের চোকের ঐ রকম শাদা দাগ উঠাইয়া দিইছি। এ অসুদটী সকলেরই মনে করিয়া রাখা উচিত।

শাদা দাগটী যদি পুত্‌লোর উপর থাকে, আর এই অসুদ্ চোকে দিয়া দাগটী উঠাইয়া ফেলিতে না পার, তবে কি

করিবে? শুদ্ধু একটী শাদা দাগের জন্যে, চোকটী কানা হইয়া থাকিবে। ঐ দাগটী যদি পুত্‌লো ছাড়া করিয়া দিতে পার, তবেই দৃষ্টিটী বাজায় থাকে। শাদা দাগটী যে জায়গায় আছে, সে জায়গা থেকেও সরাইয়া দিবার কোনও উপায় নাই। কিন্তু সে দাগটী যদি খুব অনেক দূর লইয়া না থাকে, তবে যেখানে পুত্‌লো আছে, সেখান থেকে পুত্‌লো সরাইয়া দেওয়া যাইতে পারে, এমন উপায় আছে। পুত্‌লো দাগ ছাড়া হইলেই, তার ভিতর আলো যাইবার আর কোনও ব্যাঘাত থাকিল না। কেন না, চোকের মণি খানি সবই কাচের মত স্বচ্ছ। দাগটি ছাড়া, আর যেখানে পুত্‌লো লইয়া যাইবে, সেই খান দিয়াই পুত্‌লোর মধ্যে আলো যাইবে। আলো গেলেই দেখিতে পাইবে। কিন্তু চোকে কোনও অসুদ দিয়া, পুত্‌লো এ রকম করিয়া সরাইয়া দেওয়া যায় না। এ কাজে ছুরি, কাঁচি, চিম্‌টের দরকার। সে সব কথা এখানে বলিব না। সে সব কথা এখানে বলা বৃথা। কেন না, যাঁদের জন্যে এ বৈ লিখি-তেছি, তাঁরা তা ভাল বুঝিতে পরিবেন না।

সন্নিপাত-বিকারে রোগীর যে অবস্থা হয়, ১৭৪—১৭৫র পাতে তা বলিছি। সে অবস্থা থেকে রোগীকে বাঁচান সোজা নয়। এই জন্যে, সে অবস্থা যাতে না হইতে পারে, সকল চিকিৎসকেরই তার উপায় করা উচিত। তাপমান যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) আর কুইনাইন্ থাকিতে, সে অবস্থা কখনই হইতে দেওয়া উচিত নয়। যাঁর হাতের রোগীর এ অবস্থা হয়, তাঁরই ভুলে যে রোগীর এমন দশা ঘটে, গৃহস্থের সেটী

বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। ডাক্তরদের কথায় তাঁরা যেন আর ভুলেন না। ২১ দিনের কমে এ জ্বর সারিবে না। এ জ্বরের ভোগ ৪২ দিন। এ সব কথা বলা, এখন আর ভাল দেখায় না। সে কাল গিয়াছে। গৃহস্থকে ধনে প্রাণে সারার কাল আর নাই। তার পর বলি। সন্নিপাত-বিকারে রোগীর যে অবস্থা হয় বলিছি, সে অবস্থায় কি অস্থুদ দিবে? মৃগনাভি (কস্তুরী) আর কর্পূর, এ অবস্থার যেমন অস্থুদ, তেমন অস্থুদ আর নাই। শুদু এই দুটী অস্থুদ খাওয়াইয়া, এমন তর রোগীকেও বাঁচাইতে পারা যায়। এ দুটী অস্থুদ কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

মৃগনাভি (মস্ক)	...	...	৫ গ্রেন।
কর্পূর (ক্যাম্ফর)	...	...	১ গ্রেন।

একত্র মিশাইয়া একটি পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া, যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। দু ঘণ্টা অন্তর এক একটী পুরিয়া খাওয়াইবে। রোগীর অবস্থা যেমন ভাল হইয়া আসিবে, পুরিয়াও তেমনি তফাত তফাত খাওয়াইবে। এ দুটী অস্থুদের আশ্চর্য্য শক্তি। অমনতর মরা রোগীও এতে ভাল হয়। এ দুটীই আমাদের দেশী অস্থুদ। বৈদ্যরাও এ দুটা অস্থুদের ভারি আদর করিয়া থাকেন। আদরের জিনিস, আদর না করিবেন কেন? মৃগনাভি ভারি দামী। এই জন্যে, আসল মৃগনাভি প্রায়ই পাওয়া যায় না। বাজারে যা পাওয়া যায়, তা প্রায়ই ভেল। এই জন্যেই,

অসুদে তেমন উপকার হয় না। চিকিৎসক, মৃগনাভি (কস্তুরী) ব্যবস্থা করিলেন। গৃহস্থ জানিল, রোগীকে মৃগনাভি (কস্তুরী) দেওয়া হইল। কিন্তু রোগের কোনও প্রতীকার হইল না। প্রতীকার হইবে কেন? রোগী ত আর মৃগনাভি (কস্তুরী) খাইতেছে না যে, রোগ সারিবে। এই জন্যে, আসল মৃগনাভির চেষ্টা করিবে। যদি বল, আসল কি ভেল, কেমন করিয়া জানিব? তা জানিতে পারা যায়, এমন উপায় আছে। কস্তুরীর গন্ধ যিনি এক বার শুঁকিয়াছেন, তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। এক রতি কস্তুরীর গন্ধে সকল ঘর আমোদ করে। কস্তুরী জিবে দিলে তিত আর ঝাল ঝাল লাগে। জ্বলন্ত আগুনে ধরিলে তখনই জ্বলিয়া যায়। আর রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিটে আর সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথরে বেশ গলিয়া যায়। মৃগনাভি (কস্তুরী) কিনিবার সময়, এই রকম পরীক্ষা করিয়া লইবে। তা নৈলে নিশ্চয়ই ঠকিবে। ঠকিলে যে কেবল পয়সা নষ্ট হইবে, তা নয়। সে কস্তুরী খাওয়াইয়া রোগীকে বাঁচা-ইতে পারিবে না। কস্তুরী-হরিণের নাইতে কস্তুরী থাকে। যারা কস্তুরীর ব্যবসা করে, তারা সেই নাই থেকে কস্তুরী বাহির করিয়া লইয়া তার মধ্যে রক্ত পুরিয়া রাখে। এই রক্ত তার মধ্যে শুকাইয়া থাকে। এই শুক্‌নো রক্তের গন্ধ ঠিক্ কস্তুরীর মত হয়। আসল কস্তুরী বলিয়া বাজারে এই রক্ত বিক্রী হয়। তবেই দেখ, কস্তুরী কিনিবার সময়, ভাল রকম পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত কি না। তার পর বলি। ৯৩র পাতে রোগীকে চাঙ্গা করিবার জন্যে, যে ষ্টিমুলেণ্ট

(উত্তেজক) অসুদ লিখিয়া দিইছি, সেই অসুদের সঙ্গে, কস্তুরী আর কর্পূরের ঐ পুরিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে পার, তাতে বরং উপকার আরো বেশী হয়।

কস্তুরী আর কর্পূরের যে পুরিয়া তয়ের করিতে বলিলে, তা কেমন করিয়া তয়ের হবে? কর্পূর ত গুঁড়ো করা যায় না। গুঁড়ো করিতে গেলে চেপ্টে যায়। শুদু কর্পূর গুঁড়ো করিতে পারা যায় না। তাতে ২। ৪ ফোটা রেক্‌টিফাইড্ স্পিরিট্ দিয়া গুঁড়ো করিলে, বেশ গুঁড়ো হয়। কর্পূরের পুরিয়া তয়ের করিবার সময়, এ কথাটা যেন মনে থাকে।

সন্নিপাত-বিকারের যে ২টী উপসর্গের কথা এত ক্ষণ বলিতেছিলাম, সে ২টী উপসর্গ (শয্যাক্ষত আর চোকের মণিতে ঘা), যে কেবল সন্নিপাত-বিকারেই ঘটে, তা নয়। সে অবস্থা হইবার পূর্ব্বেও ঘটে; আর ঘটিয়াও থাকে। ঘোর সন্নিপাত অর্থাৎ সন্নিপাত-বিকার ঘটিবার আগে শয্যা-ক্ষত আর চোকের মণিতে ঘা হওয়া ছাড়া, আরো অনেক উপসর্গ ঘটিয়া থাকে। সে সব উপসর্গ চিকিৎসকদের জানিয়া রাখা ভারি দরকার। কেন না, রোগের চেয়ে উপসর্গতেই চিকিৎসকদের বেশী হক্ চকিয়ে দেয়। আর, সে সব উপসর্গ নিবারণ করিতে না পারিলে, রোগীকে কখনই বাঁচাইতে পারিবে না। উপসর্গের জন্যেই ত রোগ শক্ত হয়। যে রোগের যত উপসর্গ, সে রোগ তত শক্ত। সবিরাম-জ্বরের (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরের) চেয়ে স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) উপসর্গ বেশী। এই জন্যে,

সবিরাম-জ্বরের চেয়ে স্বল্পবিরাম জ্বর শক্ত। এ সব কথা, এর আগেই (৩—৪র পাতে) বলিছি। রোগ যত বাড়ে, উপসর্গও তত আসিয়া উপস্থিত হয়। যদি বল, গোড়া থেকে চিকিৎসা করিলে ত কোন উপসর্গই হইতে পারে না। তবে, 'সে সব উপসর্গের কথা অত করিয়া বলিবার দরকার কি? দরকার নয়? কটা রোগী, রোগ হইতেই ডাক্তর দেখায়? চৌদ্দ আনা জায়গায়, রোগের বাড়াবাড়ি না হইলে, ডাক্তরের কাছে খবর যায় না। তবেই দেখ, রোগের বাড়াবাড়ি হইলে, কত রকম উপসর্গ হইতে পারে, জানা উচিত কি না? এ সব যদি তোমার জানা না থাকে তবে তোমার হাতে রোগীর জীবন রক্ষা হওয়া ভার। এই জন্যে, এখানে সে সব উপসর্গের কথা এক এক করিয়া বলিলাম।

১। ব্রংকাইটিস্ (এক রকম কাশি)।

২। নিয়ুমোনিয়া (এও এক রকম কাশ রোগ)।

৩। প্লুরিসি (এও এক রকম কাশ রোগ)।

৪। পেট-নাবা (অতিসার)।

৫। রক্ত-আমাশা।

৬। রক্ত-ভেদ।

৭। বমি।—ক্রিমি।

৮। হিক্কি।

৯। পেট-ফাঁপা।

১০। প্রস্রাব বন্ধ।

১১। বাহ্যে বন্ধ।

১২। পক্ষাঘাত।

১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা।

১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘা।

১৫। উর্ব্বাণ——বাক্-রোধ

১৬। কানে পূয হওয়া।

১৭। কানে কম শুনা।

১৮। কর্ণমূল ফোলা।

এই যে ১৮ রকম উপসর্গের কথা বলিলাম, সে সব রকমই যে, সকল রোগীর হইয়া থাকে, বা হইতে চায়, তা নয়। সব রোগীর এক রকম উপসর্গ হয় না। তবে এ উপসর্গ গুলির মোটামোটি চিকিৎসা জানিয়া রাখিলে, শক্ত জ্বরেরও চিকিৎসায় কোনও জায়গায় ঠকিবে না।

১। **ব্রংকাইটিস্**——১৬২—১৬৩র পাতে ব্রংকাইটিস রোগের কথা মোটামুটি এক রকম বলিছি। ফুস্কোর মধ্যে যে হাজার হাজার নলি আছে বলিছি, সে সব আবার সমান নয়। কতকগুলি মোটা, কতকগুলি মাঝারি রকম, কতকগুলি খুব সরু। মোটা আর মাঝারি রকম, নলি গুলির ভিতরে খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে আর ব্যথা হইলে, তত ভয় নাই। কিন্তু খুব সরু নলি গুলির ভিতরে সেই রকম রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর ব্যথা হইলে, রোগীর জীবন সংশয়। কেন না, এ সব সরু নলির এ রকম অবস্থা হইলে, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার খুব ব্যাঘাত ঘটে। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার এমন ব্যাঘাত ঘটিলে জীবন ক দিন থাকে? শরীরের কোনও

জায়গায় খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর ব্যথা হইলে, সেই জায়গায় সে রকম অবস্থাকে ইনফ্ল্যামেশন্ বলে। ইন্-ফ্ল্যামেশন্ ইংরিজি কথা। ভাল বাঙ্গালায় একে প্রদাহ বলে, সন্তাপও বলে। খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর ব্যথা হইলে—এ সব, বারে বারে না বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে "প্রদাহ" হইলে বলিব। খুব রক্ত জমিয়াছে, ফুলিয়াছে, আর ব্যথা হইয়াছে—এ সব, বারে বারে না বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে "প্রদাহ" হইয়াছে বলিব। খুব রক্ত জমিবে, ফুলিবে, আর ব্যথা হইবে—এ সব, বারে বারে না বলিয়া, তার বদলে, এখন থেকে "প্রদাহ" হইবে বলিব। "প্রদাহ" বলিলে, তার অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। মোটা আর মাঝারি রকম নলি গুলির প্রদা-হকে সহজ ব্রংকাইটিস বলে। কেন না, এতে রোগীর বিপদ কম। আর খুব সরু নলি গুলির প্রদাহকে ইংরি-জিতে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস বলে। ক্যাপিলারি ব্রংকাই-টিস ভারি শক্ত ব্যামো। ডাক্তরেরা একে বড় ভয় করেন। ছেলেদেরই এ রোগ খুব বেশী হয়। বুড়োদেরও হয়। কিন্তু জোআন রোগীদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস (খুব ছোট নলি গুলির প্রদাহ) খুব কম হয়। যদি বল, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিব? তা জানিবার বেশ উপায় আছে। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস অর্থাৎ খুব সরু নলি গুলির প্রদাহের সঙ্গে, জ্বর খুব বেশী থাকে; কাশিও খুব বেশী হয়; আর বারে বারে হয়। শ্লেষ্মা সহজে উঠে না, হাঁপও বেশী হয়।

ছেলেদেরই হাঁপ খুব বেশী দেখা যায়। মিনিটে ৫০ বারেরও বেশী নিশ্বাস পড়ে। জোআন রোগীদের হাঁপ থেকে থেকে হয়। ছেলেদের হাঁপ নিয়তই থাকে। আর তারা যে কষ্ট পায়, তাদের মুখে তা যেন লেখা থাকে—তাদের মুখ এমনি ম্লান আর বিষণ্ণ হইয়া যায়। হাঁপও ভারি রকম হয়, তারা ভারি অস্থির হয়। চোক তাদের রাঙা হয়, আর ভারি ভারি হয়। নাড়ী যেমন ক্ষীণ হয়, ওর বেগও তেমনি বাড়ে।

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ) পিঠে দিয়া শুনিলে, ১৬৩র পাতে যে দু রকম শব্দের কথা বলিছি, সেই দু রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সরু বাঁশির শব্দ (শিশ দেওয়ার মত শব্দ) আর সরু বুড়্-বুড়ি। প্রথমে, অর্থাৎ নলি গুলির মধ্যে শ্লেষ্মা জমিবার আগে ঐ রকম সরু বাঁশির বা শিশ দেওয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। তার পর, শ্লেষ্মা জমিলে ঐ রকম সরু বুড়-বুড়ির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। শ্লেষ্মা জমিবার আগে, যে শব্দ শুনা যায়, সে শব্দকে শুক্নো শব্দ বলে। আবার শ্লেষ্মা জমিলে পর যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সে শব্দকে ভিজে শব্দ বলে। শুক্নো শব্দ আর ভিজে শব্দ বলিলে বেশ অর্থ বোধ হয়। বুক পরীক্ষা করার ঐ যন্ত্রের উপর কান দিয়া, যদি কেবল ঐ রকম সরু বাঁশির, কি শিশ দেওয়ার মত শব্দ শুনিতে পাও, তবে বলিবে যে কেবল শুক্নো শব্দ শুনিতে পাই-তেছি ; এখনও শ্লেষ্মা জমে নাই, নলি গুলির ভিতর খুব শুক্নো হইয়াছে আর ফুলিয়াছে। যদি ঐ রকম সরু

বুড়-বুড়ির শব্দ শুনিতে পাও, তবে বলিবে যে, ভিজে শব্দ শুনিতে পাইতেছি, নলি গুলির ভিতর তেমন আর শুক্‌নো নাই, শ্লেষ্মা জমিয়াছে। মোটা, মাঝারি রকম, আর খুব সরু; এই যে, তিন রকম নলির কথা বলিছি, সেই তিন রকম নলিরই ভিতরে, শুক্‌নো আর ভিজে দু রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। যদি বল, বড় নলি গুলি থেকে শব্দ হইতেছে, কি, ছোট নলি গুলি থেকে শব্দ হইতেছে, তা কেমন করিয়া বুঝিব ? তা বুঝা শক্ত নয়। খুব সরু নলি গুলি থেকে যে শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তা খুব চিকণ। শুক্‌নো শব্দ যেমন চিকণ, ভিজে শব্দও তেম্‌নি চিকণ। নলি যত সরু, শব্দও তত চিকণ। আর নলি যত মোটা, শব্দও তত মোটা। শব্দ যত চিকণ, রোগীর বিপদও তত বেশী। শব্দ যত মোটা, রোগীর বিপদও তত কম; চিকিৎসকের আশা ভরসাও তত বেশী। ব্রংকাইটিস্ রোগ পরীক্ষা করিতে হইলে, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র পিঠে দিয়া শুনিবে। কেন না, বুক আর পাঁজরের চেয়ে পিঠে ওসব শব্দ বেশ শুনিতে পাওয়া যায়। পিঠের মাঝা-মাঝি, বুকেরও মাঝা-মাঝি (অর্থাৎ ফুস্কোর গোড়ার দিকে), মোটা আর মাঝারি রকম নলির শব্দ ভাল শুনিতে পাওয়া যায়। যখন কেবল মোটা আর মাঝারি রকম নলি গুলির প্রদাহ হয়, তখন পিঠের নীচে দিকে, আর কণ্ঠার কাছাকাছি, প্রায়ই সহজ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইলে, সব পিঠে আর পাঁজরে, বিশেষ পিঠের নীচে দিকে খুব সরু নলি গুলির খুব চিকণ শব্দ ভাল শুনা যায়।

তাতেই, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ) হইয়াছে কি না, জানিবার জন্য, পিঠের নীচে দিক পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। শুক্‌নো শব্দ, ভিজে শব্দ, মোটা নলির শব্দ, খুব সরু নলির শব্দ—এ সব রকম শব্দই এক জায়গায় শুনিতে পাওয়া যায়। কাজেই, বুকের মধ্যে যেন নানা রকমের বাজনা বাজিতেছে বলিয়া বোধ হয়। যদি বল, এক জায়গায় সব রকম শব্দ কেমন করিয়া শোনা যাবে? এক জায়গায় বলিলে, যে একটী নলিই বুঝায়, তা নয়। এক জায়গায় এমন শত শত নলি আছে। সেই সব নলির কতকগুলির মধ্যে শ্লেষ্মা জমিয়াছে, কতকগুলির মধ্যে এখনও শুক্‌নো আছে। আবার তারই মধ্যে কতক গুলি নলি মোটা, কতকগুলি মাঝারি রকম, আর কতক গুলি খুব সরু। কাজেই, ও ক রকম শব্দ এক বারেই শুনিতে পাওয়া যায়।

ব্রংকাইটিস রোগে মোটে চারি রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। মোটা নলির শুক্‌নো শব্দ আর ভিজে শব্দ। আর, খুব সরু নলির শুক্‌নো শব্দ, আর ভিজে শব্দ। মোটা নলির শুক্‌নো শব্দকে মোটা শাঁই শাঁই, কি মোটা শিশ দেওয়ার মত শব্দ বলে। মোটা নলির ভিজে শব্দকে মোটা বুড়-বুড়ির শব্দ বলে। খুব সরু নলির শুক্‌নো শব্দকে খুব সরু শাঁই শাঁই, কি খুব সরু শিশ দেওয়ার মত শব্দ বলে। আর খুব সরু নলির ভিজে শব্দকে খুব চিকণ বুড়-বুড়ি বলে। এই চারি রকম শব্দের সঙ্গে বেশ পরিচয় থাকিলে, ব্রংকাইটিস রোগের বেশ চিকি-

ৎসা করিতে পারা যায়। রোগের কখন কোন্ অবস্থা হইল, রোগ শক্ত হইল কি না, রোগীর জীবনের কোন আশঙ্কা আছে কি না, সে সবও বেশ জানিতে পারা যায়। কাজেই, ব্রংকাইটিস রোগই তোমার বশের মধ্যে থাকিল। আর এক বার বলি। "মোটা আর মাঝারি রকম নলির প্রদাহকে সহজ ব্রংকাইটিস বলে। এতে রোগীর যাতনাও কম, বিপদও কম। কিন্তু খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ (ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস) ভারি শক্ত ব্যামো। এতে রোগীর যাতনাও বেশী, বিপদও বেশী। এই জন্যে, সহজ ব্রংকাইটিস হইয়াছে, কি ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইয়াছে, যত শীঘ্র পার, ঠিক করিবে। এবং দু রকম ব্রংকাইটিস কেমন করিয়া ঠিক করিতে হয়, এই মাত্র তা বলিছি। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইলে, খুব সতর্ক আর সাবধান হইয়া রোগীর চিকিৎসা করিবে। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস নিজেই ভারি শক্ত রোগ। তাতে স্বল্প-বিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) এ উপসর্গ ঘটিলে, রোগীর যে কত বিপদ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। ১৭১—১৭২র পাতে কাশির যে অসুদ, মালিশ, আর সেক দিবার ব্যবস্থা লিখিয়া দিইছি, এখানেও ঠিক সেই অসুদ, সেই মালিশ, আর সেই রকম করিয়া সেক দিবে। ১৭২র পাতে বলিছি, ঐ কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর্, মালিশের ঐ অসুদটী, আর তার্পিনের এই সেক, এই তিনটিই কাশির ভারি অসুদ। এতে কাশি সারিতেই চায়। এ কথা

গুলি এখানেও মনে করিয়া রাখিবে। এই তিনটী অস্থুদ জুত বরাত করিয়া দিলে, ব্রংকাইটিস রোগের চিকিৎসায় কখনও অপ্রতিভ হইবে না।

এর আগেই বলিছি যে, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস (খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ) ছেলেদেরই খুব বেশী হইয়া থাকে। কত ছেলে যে এ রোগে মারা যায়, তা বলা যায় না। এ ব্যামোর একটু বাড়াবাড়ি হইলে, ছেলেদের ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া এক রকম প্রায় বন্ধ হইয়া যায়। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার এ রকম ব্যাঘাত ঘটিলে, ছেলে কতক ক্ষণ বাঁচিয়া থাকিতে পারে? দেখিতে দেখিতে নীল মূর্ত্তি হইয়া মারা যায়। ছেলেদের ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত কেমন করিয়া ঘটে, এখন তাই বলিব। এটি জানিয়া রাখা ভারি দরকার। কেন না, ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস হইলে এই রকম উপসর্গ হইয়াই তারা মারা যায়। এ রকম উপসর্গ কেমন করিয়া ঘটে, জানা থাকিলে, আগে থেকে অবশ্যই তার উপায় করিতে পার। ছেলেরা সহজেই দুর্ব্বল। তার উপর ভারি রকম জ্বর জ্বালা হইলে, একবারে নেতিয়ে পড়ে। কাজেই, তেমন সব সরু নলিতে চট্‌-চটে আটাল শ্লেষ্মা জমিলে, তারা তা কখনই কাশিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারে না। তার পর, অনেকক্ষণ ধরিয়া খক্ খক্ করিয়া কাশে, কিন্তু শ্লেষ্মা তুলিবার যো কি? সে শক্তি কোথায়? এ রকম কাশিতে হিত না হইয়া বরং তার বিপরীত হয়। যখন খক্ খক্ করিয়া কাশে, সরু নলি গুলির ভিতরে যে

শ্লেষ্মা জমিয়া আছে, সেই শ্লেষ্মার পাশ দিয়া, ফুস্কোর ভিতর থেকে বাতাস জোরে বাহির হইয়া আসে। নিশ্বাস লইলে, সেই বাতাসের জোরে, নলির আরো আগার দিকে শ্লেষ্মা সরিয়া গিয়া খুব আঁটিয়া বসে। সেই জন্যে, সে শ্লেষ্মা টুকু ঠেলিয়া, তার ও দিকে বাতাস আর যাইতে পারে না। এই রকম করিয়া, ফি বারে ফুস্কোর ভিতর থেকে বাতাস বাহির হইয়া আসে, কিন্তু তার জায়গায় আর বাতাস যায় না। কাজেই, যে নলির মধ্যে শ্লেষ্মা জমিয়া আছে, সে নলির ওদিক্‌কার ফুস্কো টুকুর মধ্যে এক বারেই বাতাস থাকে না। বাতাস না থাকিলেই, ফুস্কো ক্রমে চেপ্টা, শক্ত, আর জমাট হইয়া যায়। তাতে আর কোনও কাজ হয় না। এই রকম করিয়া যদি অনেক খানি ফুস্কো অকেজো হইয়া যায়, তবে জীবন কতক্ষণ থাকে? নিশ্বাস বন্ধ হইয়া গেলে যে ফল হয়, এ রকম হইলেও শেষে সেই ফল হয়। দুয়েতেই রোগী হাঁপাইয়া মরে। এ ছাড়া, ক্যাপি-লারি ব্রংকাইটিস রোগে খুব সরু নলি গুলির ভিতর ফুলিয়া যায় বলিয়া, তাদের ভিতর দিয়া ফুস্কোর মধ্যে সহজে বাতাস যাইতে পারে না। শেষে মোটেই যায় না। কাজেই, রোগী হাঁপাইয়া মরে। ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস রোগের এই ভয়ানক উপসর্গটীর কথা সকলেরই বিশেষ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ও রকম ব্যাঘাত ঘটিলে, নিশ্বাস লইবার সময় বুক না ফুলিয়া বরং আরো নুইয়া যায়, বুকের কড়ার নীচেটা খোল হইয়া যায়। বুকের কড়ার নীচেটা খোল হইয়া

যাওয়া, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস খুব কম যাওয়ার যেমন চিহ্ন, তেমন চিহ্ন আর নাই। এই জন্যে, এ চিহ্নটী মনে করিয়া রাখা উচিত। যখন দেখিবে, ছেলে নিশ্বাস লইতেছে, কিন্তু বুকের নীচেটা উচ না হইয়া, বরং খোল হইয়া যাইতেছে, তখন ঠিক করিবে, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস বেশ যাইতেছে না। ফি নিশ্বাসে নাকের ফুটো দুটী বড় হওয়া, ফি নিশ্বাসে নাকের পাতা দুটী ফোলা, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস বেশ না যাওয়ার আর একটী ভাল চিহ্ন। এ সঙ্কেতটীও মনে করিয়া রাখা উচিত। এ সব সঙ্কেত বেশ জানা থাকিলে, রোগ চিনিতে একটুও ভুল হয় না। ছেলেদের ব্রংকাইটিস্ রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া, এই সব চিহ্ন আগে বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিবে। ছেলের যদি হাঁপ বাড়ে, আর তার সঙ্গে গায়ের তাত না বাড়ে, তবে তার ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার খুব ব্যাঘাত ঘটিয়াছে, তখনই ঠিক করিবে। এই মাত্র বলিছি যে, খুব ছোট ছোট নলি গুলির ভিতরে, আটা আটা অনেক শ্লেষ্মা জমিলে, ছেলেরা তা কাশিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারে না। কাজেই, নলি গুলি ক্রমেই বুজিয়া যায়। নলি গুলি বুজিয়া গেলে, ফুস্কোর মধ্যে কেমন করিয়া বাতাস যাবে? ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে, জীবন কি থাকে? ছেলের আকার প্রকার আর লক্ষণ দেখিয়া, সব বেশ বুঝা যায়। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাইবার খুব ব্যাঘাত ঘটিলে, নিশ্বাস বন্ধ হইয়া (হাঁপাইয়া) মরিবার আগে যেমন হয়, ঠিক তেমনি হয়। প্রথমে, নিশ্বাস লইবার জন্যে হাঁচড় পাঁচড় করে, ছট্ ফট্

করে, তার পর সে সব বন্ধ হইয়া যায়। বুক, পিঠ, আর পাঁজরের উপর ষ্টিথস্কোপ্ (বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র) দিয়া শুনিলে, তার মধ্যে যে শিশ দেওয়ার মত শব্দ, আর শাঁই শাঁই শব্দ আগে বেশ শুনিতে পাওয়া যাইতেছিল, সে সব শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। গা প্রথমে ফ্যাকাশে হয়, তার পর নীলবর্ণ, আর ঠাণ্ডা যেন পাঁকের মত হইয়া যায়। নিশ্বাস ফেলা ভাসা ভাসা হয়, আর নিশ্বাস ঠাণ্ডা হয়। নিশ্বাস ঠাণ্ডা হইলে, এ দিকেও ঠাণ্ডা হইতে বড় দেরি থাকে না। এই সব লক্ষণ কখন কখন ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। কখন কখন, এক বারেই হঠাৎ উপস্থিত হয়। নলি গুলি এক বারে শীঘ্রই শ্লেষ্মাতে পুরিয়া গেলে, ও সব লক্ষণ ঘটিতেও দেরি হয় না। কখন কখন সন্নিপাত আসিয়া ঘটে। কখন কখন দু রকম লক্ষণই দেখা দেয়।

কাশিয়া শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিতে পারে না বলিয়াই, যখন ছেলেদের এত বিপদ ঘটে, তখন অসুদ খাওয়াইয়া সেই শ্লেষ্মা উঠাইয়া ফেলিতে পারিলেই ত তাদের জীবন রক্ষা হইতে পারে। এখন দেখ, তেমন অসুদ আছে কি না? আছে। ভাল অসুদই আছে। বাইনম্ ইপেকা শ্লেষ্মা উঠাইবার বড় অসুদ, বাইনম্ ইপেকা, ছেলেদের কাশির যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর নাই। শুদু ছেলে-দের কেন? জোওয়ান ও বুড়োদেরও এ তেমনি অসুদ। ১৭১—১৭২র পাতে যে কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিকশ্চর, যে লিনিমেণ্ট (মালিশের অসুদ), আর তার্পিনের সেক

দিবার যে ব্যবস্থা লিখিয়া দিইছি, জোওয়ান রোগীদের ব্রংকাইটিস্ হইলে, তা ছাড়া আর কোনও অসুদ দিতে হয় না, দিবার দরকারও হয় না। তাতেই বেশ সারিয়া যায়। ছেলেদের ব্রংকাইটিস্ হইলে, তা ছাড়া, কেবল একটা অসুদ বেশী দিতে হয়। শ্লেস্মা উঠাইয়া ফেলিবার জন্যে বাইনম ইপেকা বেশী করিয়া খাওয়াইয়া দিতে হয়। রোজ সকালে একবার করিয়া বমি করাইয়া দিলেই ভাল হয়। তা ছাড়া, অন্য কোন সময়ে যদি ছেলে বেশী হাঁস-ফাঁস করে, বুকে শ্লেস্মা খুব জমিয়াছে, কাশিয়া তুলিয়া ফেলিতে পারিতেছে না বলিয়া অস্থির হয়, তবে তখনই বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিবে। খানিক শ্লেস্মা উঠিয়া পড়িলেই ছেলে অনেক সুস্থ হবে। তেমন অস্থির থাকিবে না। ফল কথা, বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করানই, ব্রংকাইটিস রোগ থেকে, ছেলেদের বাঁচাইবার একমাত্র উপায়। এ কথাটা যেন সকল চিকিৎসকেরই খুব মনে থাকে। বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিলে, শ্লেস্মা ত উঠিয়া যায়ই। তা ছাড়া, আর একটা ভারি উপকার হয়। বমি হইবার আগে উপরো উপরি বার কতক যে দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে হয়, তাতেই খুব সরু নলি গুলিরও ভিতর দিয়া ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যায়। কাজেই বাতাসের অভাবে ফুস্কো তেমন চেপ্টা, শক্ত, আর জমাট হইয়া যাইবার ভয় থাকে না। তবেই দেখ, বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিলে, শিশুর কি উপকারই করা হয়। যথার্থই তার জীবন রক্ষা করা হয়। এটি মনে

করিয়া রাখা চাই। এক বছরের ছেলেকে ৩০।৪০ ফোটা বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া দিলে বমি হয়। একটু গরম জলের সঙ্গে খাওয়াইয়া দিলে বমি শীঘ্র হয়। একটু চিনি কি মিছরির গুঁড়ো দিয়া মিষ্টি করিয়া দিলে, ছেলেরা তা আনন্দ করিয়া খায়। খালি পেটে খাওয়াইলে বমি শীঘ্র হয় না। বারে বারে ওয়াক তোলে। তাতে ছেলেদের ভারি কষ্ট হয়। এই জন্যে, বাইনম ইপেকা খাওয়াইবার আগে, ঝিনুক আদ্ধেক গরম দুধ খাওয়াইয়া দিবে। তা করিলে খুব শীঘ্রই বমি হবে। ছেলের কোনও কষ্ট হবে না। কখন কখন, ছেলেদের এক বারে অনেক খানি বাইনম ইপেকা খাওয়াইয়া না দিলে বমি হয় না। সচরাচর ছেলেদের ইপেকাকুয়ানা খুব সয়। বেশী করিয়া না খাওয়াইলে বমি হয় না। প্রথম দিন যত টুকু খাওয়াইলে বমি হয়, তার পর দিন সে টুকুতে বমি হয় না। তার চেয়ে বেশী দিতে হয়। এ সব বেশ করিয়া জানিয়া রাখা উচিত। আমি অনেক জায়গায় দেখেছি, এক বছর, দেড় বছরের ছেলে ২।৩ ড্রাম কি তার চেয়েও বেশী বাইনম ইপেকা খাইয়াও বমি করে নাই। শেষে বাইনম ইপেকার সঙ্গে ইপেকাকুয়ানার গুঁড়ো (ইপেকা পাউডার) ২।৩ গ্রেন খাওয়াইয়া দিলে, তবে বমি করে। ইপেকাকুয়ানা ছাড়া বমি করাইবার কি আর অসুদ নাই? অসুদ অনেক আছে। সে সব অসুদ, বিশেষ টার্টার এমিটীক, খাওয়াইয়া বমি করাইলে, ছেলে শীঘ্রই নির্জীব হইয়া পড়ে। ছেলে নির্জীব হইয়া গেলে, বমি

করাইয়া ত খুব কাজ করিলে! তার যে শক্তি টুকু ছিল, তাও ঘুচাইলে। যেটী করা উচিত নয়, সেইটীই আগে করিলে। এই জন্যে, ইপেকাকুয়ানা ছাড়া, বমি করাইবার জন্যে, ছেলেদের আর কোনও অসুদ দিবে না। ১৭১র পাতে যে কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া মিকশ্চর লিখিয়া দিইছি সে পূরা মাত্রা। এক বছরের ছেলেকে তার ২০ ভাগের এক ভাগ দিবে। ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া অসুদ তয়ের করিবে। ১৭২র পাতে যে লিনিমেণ্ট (মালিশের অসুদ) লিখিয়া দিইছি, তার বড় ঝাঁজ। ছোট ছেলে যদি সে রকম ঝাঁজাল মালিশ না সৈতে পারে, তবে তার সঙ্গে এক ঔন্স অলিব অইল (সুইট্ অইল) মিশাইয়া লইবে। ঝাঁজাল মালিশ ছেলেদের বুকে মালিশ না করিয়া, পিঠে আর পাঁজরে মালিশ করিলেই ভাল হয়। এ কথা এর আগেই (১৫৭র পাতে) বলিছি।

এর আগেই বলিছি যে, ব্রংকাইটিস আসল রোগও হইতে পারে, জ্বরের উপসর্গও হইতে পারে। এখানে স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গ বলিয়াই, ব্রংকাইটিস রোগের কথা বলিতে আরম্ভ করিছি। বলিতে গেলে ব্রংকাইটিস রোগ আসল হইলেও তার যে চিকিৎসা, জ্বরের উপসর্গ হইলেও তার সেই চিকিৎসা। তবে তফাত এই যে ব্রংকাইটিস রোগ আসল হইলে, শুদু তারই চিকিৎসা করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু জ্বরের উপসর্গ হইলে, আসল রোগ অর্থাৎ জ্বরকে খাটো করিতে পারিলে, তবে ব্রংকাইটিস রোগকে খাটো করা যায়। এ সব কথা

যেন খুব মনে থাকে। এই জন্যে, এখানেও তোমার সেই কুইনাইন্ বৈ আর উপায় নাই। উপসর্গ যাই কেন থাক না, কুইনাইন্ খাওয়াইবার বাধা কিছুতেই নাই। এ কথাটা যেন কখনও ভুলো না। এর আগে, এ কথা মাথার দিব্যি দিয়া বলিছি। স্বল্পবিরাম-জ্বরে যে রকম নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিছি, ব্রংকাইটিস, কি আর কোনও উপসর্গ আছে বলিয়া, সে নিয়মের যেন কোনও ত্রুটি করিও না। ত্রুটি করিলেই ঠকিবে। জ্বরও কমিবে না, উপসর্গও কমিবে না। জ্বর না কমিলে, উপসর্গ কেমন করিয়া কমিবে? জ্বরেই না উপসর্গ আনিয়াছে। যার জন্যে উপসর্গ, তা থাকিতে কি উপসর্গ যাইতে পারে? কখনই না। এ ছাড়া, কুইনাইন্ যে কেবল জ্বরেরই অসুদ তা নয়, ব্রংকাইটিস্ রোগেরও এ চমৎকার অসুদ। আমি বারে বারে পরীক্ষা করিয়া দেখিছি ব্রংকাইটিস্ আর নিয়ুমোনিয়া রোগে, (এর পরই নিয়ুমোনিয়ার কথা বলিব), কুইনাইন্ খাওয়াইলে ভারি উপকার হয়। ব্রংকাইটিস্ রোগে নলি গুলির মধ্যে শ্লেষ্মা জন্মে। রোগ যত বাড়ে, রোগী যত দুর্ব্বল হয়, শ্লেষ্মাও তত বেশী জন্মে। কুইনাইন্ খাওয়াইলে, শ্লেষ্মা তেমন জন্মিতে পারে না। কুইনাইনে যদি শ্লেষ্মা জন্মিতে না দিল, তবে না করিল কি? শ্লেষ্মা জমিয়াই ত ব্রংকাইটিস্ রোগে এত বিপদ্ ঘটায়। কুইনাইনের এই আশ্চর্য্য ধর্ম্মটা সকল চিকিৎসকেরই মনে করিয়া রাখা উচিত। আসল রোগেরও যেমন অসুদ, উপসর্গেরও তেমনি অসুদ। তার চেয়ে ভাল অসুদ আর কি আছে?

কুইনাইনের ক্ষমতার পরিচয় এখানে আর একবার দিই। এর আগে ত অনেক বারই দিইছি।

দিন পোনর হইল একটী আঁতুড়ে ছেলেকে দেখিতে গিইছিলাম। ছেলেটীর সবিরাম জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর) হইছিল। বাপ নেটিব ডাক্তর। চিকিৎসার ত্রুটি হইছিল, এ কথা বলা যায় না। তবে, জ্বর ছাড়াইতে পারেন নাই বলিয়া, আমার পরামর্শ চাহিয়াছিলেন। জিজ্ঞাসা করায় তিনি বলিলেন, অত টুকু ছেলেকে সাহস করিয়া আধ গ্রেনের বেশী কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারি নাই। জ্বর ছাড়িলেই ২ গ্রেন, আর জ্বর আসিবার দু ঘণ্টা আগে দু গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াও আর, এর মধ্যে ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর আধ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ দেও। এতে এক দিনেই জ্বর-আসা বন্ধ হবে। তার পর, দিন আষ্টেক রোজ ৩।৪ গ্রেন করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে, ছেলে নীরোগ হবে। আমার এই কথা শুনিয়া তিনি চম্‌কে উঠিলেন। ১৭ দিনের ছেলেকে একবারে ২ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইব! তা ত কখনই পারিব না। তবে, আপনি যখন বলিতেছেন, তখন দু বারে দু গ্রেন্ কুইনাইন দিব। আর, মাঝে ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর আধ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইব। এতেও তোমার ছেলের জ্বর আসা এক দিনেই বন্ধ হইবে। এই কথা বলিয়া সকাল বেলা তাঁকে বিদায় করিয়া দিলাম। সন্ধ্যাকালে তাঁর অনুরোধ ছাড়াইতে না পারিয়া ছেলেটীকে দেখিতে তাঁর বাড়ীতে গেলাম। ছেলের বগলে তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিয়া দেখিলাম,

পারা ৯৯র দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। জ্বর আসিবার এখনও ২।৩ ঘণ্টা দেরি আছে শুনিয়া, তখনই আর ১ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিতে বলিলাম। সেই কুইনাইন্ খাওয়ান হইলে পর, শিশুর আর জ্বর আসে নাই। ছেলেকে অষুদ বিষুদ খাওয়াইবার এই রকম ব্যবস্থা করিয়া দিয়া, অন্য অন্য কথা বার্ত্তা কহিতেছি, এমন সময়, আর এক জন নেটিব ডাক্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এঁরও সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল। এঁদের দু জনেরই বাড়ী এক জায়গায়। এত কাহিল হইয়াছ কেন, জিজ্ঞাসা করিলে, তিনি বলিলেন, এ বারে তিনটী মেয়ের ব্যামোতে আমাকে বড়ই কষ্ট পাইতে হইয়াছে। দুটী মেয়ের ব্যামো সারিয়াছে, আর একটী এখনও ভুগিতেছে। একটী মেয়ে ৩০ দিনের দিন পথ্য পাইয়াছে। একটী ২৮ দিনে পথ্য পাইয়াছে। আর, এ মেয়েটী আজ্ ১৬ দিন ভুগিতেছে। তিনি ভাবিয়াছিলেন, এই পরিচয় পাইয়া আমি তাঁর চিকিৎসার সুখ্যাতি করিব। এমন শক্ত রোগী বাঁচাইয়াছেন, অবশ্যই তাঁর যশ করিব। কিন্তু যখন শুনিলেন, যে জ্বর ৩০ দিনে, কি ২৮ দিনে ভাল হয়, সে জ্বর চিকিৎসকের গুণে সারিয়াছে বলা যায় না; সে জ্বর আপনি সারিয়াছে; পরমায়ুর জোর ছিল বলিয়াই, রোগী বাঁচিয়া গিয়াছে। জ্বরে ৩০ দিন, কি ২৮ দিন ভোগাইবার কাল আর নাই। সে কাল গিয়াছে। তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) যখন না ছিল, তখন যিনি যা বলিয়াছেন, তাই বিশ্বাস করিতে হইয়াছে। এখন আর সে সব কথা বিশ্বাস করি না।

অমুক রোগী ২১ দিন জ্বর ভোগ করিয়াছে, না বলিয়া, অমুক রোগীকে চিকিৎসক ২১দিন ভোগাইয়াছেন, এই কথা বলি। সম্প্রতি সরল জ্বর-চিকিৎসা নাম দিয়া, একখানি বৈ লিখিতেছি; সেই বৈতে এ সব কথা বেশ করিয়া লিখিয়া দিইছি। সেই বৈ পড়িলে, জ্বরে রোগী ভোগে, কি চিকিৎসক তাহাকে ভোগান, বেশ জানিতে পারিবেন। যখন এই সব কথা শুনিলেন, তখন বেশ বিরক্ত হইয়া বলিলেন, যে জ্বরের দিন রাত সমান ভোগ, গায়ের তাত একটুও কমে না, সে জ্বরে কুইনাইন্ কেমন করিয়া দেওয়া যায়। কুইনাইন দিবার সময় কৈ ? কেবল এক দিন গায়ের তাত একটু কমি ছিল, তাতেই কুইনাইন্ দিইছিলাম। কিন্তু কুইনাইন্ দিয়া অবধি জ্বর বরং আরো বাড়িয়াছে।—এ সব কথার কি উত্তর আছে ? যা বলিলেন, সবই বিপরীত। এ দিকে আবার তিনি কিছু তেজী আর অভিমানী। বুঝাইতে গেলে বিপরীত বলিবেন, এই ভয়ে তাঁকে বেশী কিছু বলিলাম না। এখন আর ঝগড়া করিব না। আমি জ্বর-চিকিৎসার যে বৈ লিখিতেছি, ছাপাইলে, সে বৈ এক খানি তোমার কাছে পাঠাইয়া দিব। সেই বৈতে যা যা লেখা আছে, তার সঙ্গে মিলাইয়া চিকিৎসা করিয়া দেখিও—রোগে বেশী ভোগে, না চিকিৎসকের ভুলে রোগী বেশী ভোগে। তোমরা ভোগাও বলিয়া রোগী ভোগে, না রোগের ধর্ম্মে রোগী ভোগে।—সেখানে একজন বিচক্ষণ বৈদ্য বসিয়াছিলেন। তিনি বলিলেন, গ্রন্থে যাহা লিখিয়াছেন, বা লিখিতেছেন, গ্রন্থকর্ত্তা হাতে কলমে তা

লাগিল। তখনই সেই মেয়েটীকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে তার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৩র দাগ ছাড়াইয়া ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। তার পর ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিলাম। ফি মিনিটে ১১৬ বার পড়িতেছে। নাড়ী দেখিবার সময় তার হাতের অল্প কাঁপনি জানিতে পারা গেল। রোগী ভারি দুর্ব্বল হইয়া না পড়িলে, তার হাতের এ রকম কাঁপনি হয় না। জিব শুক্‌নো যেন কাঠের চলা। দুই ঠোঁটে আর দাঁতের উপর কাল ছাতা পড়িয়াছে। রোগী খুব দুর্ব্বল আর অবসন্ন না হইলে, ঠোঁটে আর দাঁতে এ রকম কাল ছাতা পড়ে না। ঘোর সন্নিপাতে রোগীর যে অবস্থা হয়, ১৭৪র পাতে তা লিখিয়া দিইছি। ঠোঁটে আর দাঁতে কাল ছাতা পড়ার কথা সেই খানেই বলিছি। মেয়েটী জ্বরে ভুগে এত কাহিল হইছিল যে, প্রায় এক রকম কালা হইয়া গিইছিল। খুব বড় করিয়া না বলিলে শুনিতে পাইত না। তার পর, তার ডাইন কোঁকে (লিবরের) জায়গায় আঙ্গুলের ঘা দিয়া দেখিলাম। ঘা দিতেই তার ভারি ব্যথা লাগিল। এতেই ঠিক্ করিলাম, তার লিবরে (যকৃতে) খুব রক্ত জমিয়াছে। তার পর, তার পিঠে ষ্টীথস্কোপ্ (বুক পরীক্ষা করিবার যন্ত্র) দিয়া শুনিলাম, খুব সরু নলি গুলির ভিজা শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। সকল পিঠে আর পাঁজরে এই রকম শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিঠের নীচের দিকেই সব চেয়ে বেশ শুনিতে পাওয়া গেল। পিঠে কান দিয়া কি ষ্টীথস্কোপ দিয়া এ রকম শব্দ শুনিতে পাইলাম। পিঠের নীচের দিকেই

কি ষ্টিথস্কোপ দিয়া এ রকম শব্দ শুনিতে পাইলে, কি রোগ হইয়াছে ঠিক্ করিবে ? এর আগে যা যা বলিছি, সে সব যদি বেশ মনে থাকে, তবে বলিবে যে, ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইয়াছে ; আর খুব ছোট নলি গুলির মধ্যে শ্লেষ্মা জমিয়াছে। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ কি রকম শক্ত রোগ, এর আগে তা বেশ করিয়া বলিছি। ফল কথা, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর যে রকম অবস্থা হইয়া থাকে, এ মেয়েটীরও ঠিক্ সেই রকম অবস্থা হইয়াছিল। ভুল বকে কি না, জিজ্ঞাসা করিলে, তাঁরা সকলেই বলেন, ভুল বকে না। তাঁদের এ. কথা আমি বিশ্বাস করিলাম না। ভুল বকে কি না, তাঁরা তা লক্ষ্য করেন নাই, এই ভাবিয়া লইলাম। কেন না, এ রকম অবস্থায় রোগীর ভুল বকা থাকিতেই চায়। তার পর জানিতে পারা গেল যে, সে মাঝে মাঝে দু চারিটা ভুল বকে। এই রকম করিয়া তার গায়ের তাত, নাড়ী, জিব, লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমা, ভুল-বকা, আর ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস সব ঠিক করিলাম। তার পর, অসুদ আর পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম। ১৭১—১৭৪র পাতে যে কার্ব্বণেট্ আর য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর, যে লিনিমেণ্ট (মালিশের অসুদ), আর তার্পিনের সেক দিবার যে ব্যবস্থা লিখিয়া দিইছি, এখানেও সেই সব অসুদ, আর সেই রকম সেক দিবার ব্যবস্থা করিলাম। মেয়ের বয়স ১৪ বছর। এই জন্যে, খাওয়াইবার অসুদ পূর মাত্রায় না দিয়া, তিন ভাগের দু ভাগ দিলাম। রোগীর বয়স ২০ বছর হইলে পূর মাত্রা

শ্চর পূর মাত্রায় লেখা আছে। মালিশের অসুদ তাই দিলাম; তার আর কোন বদল করিলাম না। ১৩১র পাতে আয়োডীনের যে আরোক লেখা আছে, সেই আরোক ডাইন কোঁকে (লিবর অর্থাৎ যকৃতের জায়-গায়) লাগাইতে বলিলাম। আয়োডীনের খুব জ্বালা না ধরিলে, কোনও কাজ হয় না। এ কথা এর আগে বারে বারেই বলিছি। তার পর, গায়ের তাত এক চুল কমিলেও ফুইনাইন্ খাওয়াতে বলিলাম। ২ ঘণ্টা অন্তর গায়ের তাত পরীক্ষা করিবে আর কুইনাইন্ খাওয়াইবে। ফল কথা, গায়ের তাত বাড়িবার আগে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়ান চাই-ই। রোগীর বয়স ২০ বছর বা তার উপর হইলে গায়ের তাত বাড়িবার আগে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইতে বলিতাম। সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরে), জ্বর ছাড়িলে অর্থাৎ আবার জ্বর আসিবার আগে ৩০ গ্রেন কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারিলে আর জ্বর আসে না। স্বল্প-বিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে), রিমিশনে (যখন গায়ের তাত কম থাকে, অর্থাৎ গায়ের তাত বাড়িবার আগে) ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইতে পারিলে, গায়ের তাত আর বাড়ে না। ক্রমে কমিয়া সহজ হয়। এই দু রকম জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইবার মোটামুটি নিয়মই নাই। তুমি নিজে ডাক্তর, তোমার মেয়ের এমন শক্ত ব্যামো! তোমারই দোষে ব্যামো এমন শক্ত হইয়াছে। কুইনাইন্ আর তাপ-মান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) থাকিতে, এ জ্বরকে এত শক্ত হইতে দেওয়া কখনই উচিত নয়। গোড়ায় তদ্বির করিলে যে জ্বর

২। ৩ দিনেই সারিত, সেই জ্বরে মেয়েটী আজ ১৬। ১৭ দিন ভুগিতেছে, আর মারা যাইবার মত হইয়াছে। তুমি বলিতেছ, মেয়েটী ভুগিতেছে, কিন্তু আমি তা বলি না। আমি বলি, তুমিই ভোগাইতেছ। যাই হোক, এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত তোমাকেই করিতে হইবে। দিন রাত মেয়েটীর শিয়রে বসিয়া থাক, ২ ঘণ্টা অন্তর গায়ের তাত যেমন পরীক্ষা করিবে, আর ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখিবে, অমনি এক খানি কাগজে সে সব লিখিয়া রাখিবে। যখন যে অসুদ খাওয়াইবে, মালিশ করিবে, সেক দিবে, আর আহার দিবে, সেই কাগজ খানিতে সে সব তখনই লিখিয়া রাখিবে। এখন এই রকম খুব তদ্বির করিতে পারিলে, মেয়েটীকে বাঁচাইতে পারিবে। নৈলে সে আশা খুব কম। এটা যেন বেশ মনে থাকে। রোগটা নিতান্ত বাড়িয়া পড়িয়াছে। নৈলে ২। ৩ দিনেই সারিত। মেয়েটীর যে রকম চিকিৎসা করিতেছিলে, সে রকম চিকিৎসা আর ৩। ৪ দিন করিলে তাকে বাঁচাইতে হইত না। এই সব কথা তাঁকে বেশ করিয়া বুঝাইয়া বলিয়া, সেখান থেকে বিদায় হইলাম। এর আগেই বলিছি যে, তিনি কিছু তেজী আর অভিমানী। এই জন্যে, আমি যা যা করিতে বলিছিলাম, ঠিক সে রকম করেন নাই। করিলে, পাছে লোকে বলে, আমার ব্যবস্থাতেই তাঁর মেয়েটী এবারে বাঁচিয়াছে। তা হইলে ত মানের খাটো হইবে। এই জন্যে, তাঁর নিজের মতও কিছু কিছু তার মধ্যে চালাইয়াছিলেন। এতেই মেয়েটীর ব্যামো তত শীঘ্র সারে নাই। কিন্তু শেষে ওরকম ধরাধর করিয়া কুই-

নাইন্ খাওয়ান হইছিল বলিয়া যে তার জীবন রক্ষা হইল, —এ কথা তিনি ফুটে না বলুন, তাঁর গাঁয়ের সকলেই বলিবে। সে অবস্থাতেও ঠিক্ ঐ রকম নিয়মে অসুদ বিসুদ দিলে, দু দিনেই মেয়েটীর অবস্থা এত দূর ভাল হইল যে, ৫। ৭ দিনেই সে আরাম হইতে পারিবে, এমন বোধ হইল। ১৭ই তারিখে সন্ধ্যার সময় মেয়েটীকে দেখিয়া অসুদের ব্যবস্থা করি। তার পর, ১৯শে তারিখে খুব ভোরে তাকে আবার দেখিতে যাই। এই ৩৪ ঘণ্টার মধ্যে তার গায়ের তাত আর নাড়ীর অবস্থা যখন যে রকম ছিল, আর যখন যত টুকু কুইনাইন্ খাওয়ান হইছিল, মেয়ের বাপ আমার বিশেষ অনুরোধে, এক খানি কাগজে সে সব বেশ করিয়া লিখিয়া রাখিয়াছিলেন। সে কাগজ খানিতে যা যা লেখা ছিল, এখানে তা লিখিয়া দিলাম। কার্ব্বনেট্ অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর আর কুইনাইন্ খাওয়াইয়া, পিঠে আর পাঁজরে য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট মালিশ করিয়া, আর তার্পিন তেলের সেক দিয়া দু দিনের মধ্যেই মেয়েটীর কত শক্ত জ্বর কত সোজা করিয়া তুলিতে পারা গিইছিল, নীচে তা লিখিয়া দিলাম, তাতেই বেশ বুঝা যাবে।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	নাড়ী প্রতি মিনিটে
১৭ই	সন্ধ্যা ৭টা	১০৩.২	১১৬
,,	রাত্রি ১০টা	১০৩	১১২
	(৫ গ্রেন কুইনাইন্ দেওয়া উচিত ছিল)		
,,	রাত্রি ২৷৷টা	১০২.৮	১১২
	(৫ গ্রেন কুইনাইন দেওয়া হয়)		

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	নাড়ী প্রতি মিনিটে
১৮ই	ভোর ৪॥টা	১০৩·৮	১১২
„	„ ৫॥টা	১০৩·৪	১১২

(৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া উচিত ছিল)

„	বেলা ৭॥টা	১০১·৪	১১০

(৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ দেওয়া উচিত ছিল)

„	„ ৯টা	১০২·৮	১১৮

(কুইনাইন ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়)

„	„ ১১টা	১০১·৮	১১৪

(কুইনাইন্ ৫ গ্রেন দেওয়া হয়)

„	বেলা ১॥টা	১০২ ২	১২০

(কুইনাইন্ ৫ গ্রেন দেওয়া হয়)

„	বেলা ৩॥টা	১০১·৭	১১০

(কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়)

„	সন্ধ্যা ৬॥টা	১০১	১১০
„	„ ৭॥টা	১০১·২	১১০
„	রাত্রি ১০টা	১০১	১০৮

(কুইনাইন্ ২॥ গ্রেন দেওয়া হয়)

৭ ঘণ্টার মধ্যে কেবল ১২॥ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিয়া নিশ্চিন্ত থাকা ভাল হয় নাই। আর ৮। ১০ গ্রেন্ দেওয়া উচিত ছিল।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	নাড়ী প্রতি মিনিটে
১৮ই	রাত্রি ৩টা	১০০·৪	৯৮

(কুইনাইন্ ২॥ গ্রেন্ দেওয়া হইছিল)

৫ ঘণ্টা পরে যখন কুইনাইন্ দেওয়া হইল, তখন এক বারে ৫ গ্রেন্ দিলেই ভাল হইত।

১৯শে	ভোর ৫টা	১০০·৪	১০৩

জিব ভিজে আর পরিষ্কার। আগের চেয়ে কানে বেশী শুনিতে লাগিল। খুব ছোট নলির ভিজে শব্দ অর্থাৎ চিকণ বুড়-বুড়ি তেমন শুনিতে পাওয়া গেল না। তার জায়গায় বড় নলির ভিজে শব্দ, বড় বুড় বুড়ি শব্দ শুনিতে পাওয়া গেল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ সারিবার লক্ষণই এই। খুব ছোট নলির ভিজে শব্দ গিয়া, তার জায়গায় বড় নলির ভিজে শব্দ শুনা যায়। তবেই দেখ, দেড় দিনের মধ্যেই এমন বাঁকা জ্বর সোজা হইল। এমন ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ সারিবার পথে আসিল।

(কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়)

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	নাড়ী প্রতি মিনিটে
১৯শে	বেলা ৭৷৵০টা	৯৯·৪	১০৬

(কুইনাইন্ ৫ গ্রেন্ দেওয়া হয়)

দেড় দিনেই গায়ের তাত প্রায়ই সহজ হইল। কুইনাইনের কি আশ্চর্য্য শক্তি! কুইনাইন্ এমন করিয়া না দিলে, তার গায়ের তাত কখনও সহজ হইত কি না, কে বলিতে পারে? জ্বর আর উপসর্গ ক্রমেই বাড়িয়া যাইত। শেষে মেয়েটী মারা যাইত। মেয়েটী মারা যাইত, তাঁর বাপ এ কথা বলিবেন না। গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন দস্তুর মত খাওয়াইতে পারিলে, সব জায়গাতেই এই রকম সুবিধা হয়। ডাক্তরেরা এ সুবিধা হেলায় হারান। জ্বরের এমন বাড়াবাড়ি হইয়াও, যখন কুইনাইনে মেয়েটীকে ২ দিনেই চাঙ্গা করিয়া দিল, তখন জ্বরের গোড়ায় নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ দিলে, জ্বর সদ্য আরাম হবে, আশ্চর্য্য কি? যে জ্বরে এ মেয়ে-

টার এমন অবস্থা হইছিল, তার চেয়েও বেশী জ্বরে রোগীকে সদ্য আরাম করিছি। এ পরিচয় এর আগে অনেকই দিইছি। মেয়েটি যত শীঘ্র সারিবে ভাবিয়াছিলাম, তত শীঘ্র সারে নাই কেন, তা নিশ্চয় বলিতে পারি না। বোধ হয়, যেমন তদ্বির করিতে বলিছিলাম, ঠিক তেমন্ হয় নাই। হইলে মেয়েটি খুব শীঘ্রই আরাম হইতে পারিত। ১৯শে ভোরে তার যে অবস্থা দেখিয়া আসিয়াছিলাম, তাতে তার রোগ ভাল হইবার কিছু অপেক্ষা ছিল না, বলিলেই হয়। রোজ ৩ বার করিয়া, পিঠে, আর পাঁজরে লিনিমেণ্ট মালিশ করিবে। যখন মালিশ করিবে, তখন এক ঘণ্টা ধরিয়া মালিশ করিবে। রোজ ৩ বার করিয়া, পিঠে আর পাঁজরে তাঁপিণের সেক দিবে। ফি বারে এক ঘণ্টা ধরিয়া সেক দিবে। কার্ব্বনেট্ অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর নিয়ম করিয়া ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। যখন পিপাসা হইবে, তখনই সেই বোতলের জল খাইতে দিবে। গায়ের তাত এক চুল কমিলেও কুইনাইন খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। গায়ের তাত বাড়িবার আগে, চারি বারে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন খাও-য়াইবে। তার পর, রোজ যে সময় গায়ের তাত বাড়িয়া থাকে, সে সময় উত্রে গেলে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন দিবে। "রিমিশনে" অর্থাৎ যখন গায়ের তাত কম থাকিবে, (গায়ের তাত এক চুল কমিলেও), রোজ এই রকম করিয়া ৪ বারে ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইবে। আর গায়ের তাত বাড়িবার সময় উৎরে গেলে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর ২।৩ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিবে। গায়ের তাত

সহজ হইলে, আর উপ্‌রো উপরি তিন দিন জ্বরের কোনও লক্ষণ না পাইলে, রোজ সকালে, দুপরে, আর সন্ধ্যায়, তিন বেলা তিন বারে ৫ গ্রেন্‌ করিয়া ১৫ গ্রেন্‌ কুইনাইন দিবে। যত দিন শ্লেষ্মা উঠিতে থাকিবে, তত দিন নিয়ম করিয়া কার্ব্বনেট্‌ অব য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চর খাওয়াইবে। রোগী যেমন সবল হইতে থাকিবে, ও মিকশ্চরও তেমনি তফাত তফাত খাওয়াইবে। যেমন ২ ঘণ্টা অন্তর, ৩ ঘণ্টা অন্তর ৪ ঘণ্টা অন্তর, ৬ ঘণ্টা অন্তর, রোজ ৩ বার, রোজ দু বার, রোজ একবার। যত দিন মেয়েটি নীরোগ আর খুব সবল না হইবে, তত দিন তাকে মাংসের ক্বাথ রোজ নিয়ম করিয়া খাওয়াইবে। এই রকম নিয়ম করিয়া, মেয়েটার চিকিৎসা করিতে বলিছিলাম। মেয়ের বাপ ডাক্তর, তিনি রোগী দেখা ছাড়িয়া দিয়া, মেয়ের কাছে বসিয়া এ সব হাতে কলমে করিছিলেন, এ কখনই বিশ্বাস হয় না। মেয়েদের উপর, এমন তর শক্ত রোগীর সেবা শুশ্রূষার ভার দিলে, যেখানে ষোল আনা ফল পাইবার কথা, সেখানে ছ আনা পাওয়া যায় কি না, সন্দেহ। কাজেই, ৪ দিনে যে রোগী ভাল হইবার কথা, সে রোগী ১০ দিনেও সারে না। এখানেও তাই ঘটিয়া থাকিবে।

যদি বল, এ মেয়েটার কথা এত বেদ বিধানে বলিবার দরকার কি? দরকার নয়! বুঝো লোক অবুঝ হইলে, তাকে বুঝান ভার। মেয়ের বাপ যে ডাক্তর! গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্‌ খাওয়াইলে জ্বর বাড়ে। এক দিন গায়ের তাত একটু কমিয়াছিল, সেই দিন কুইনাইন্‌

খাওয়াইয়াছিলাম, সেই দিন থেকেই জ্বর বাড়িয়াছে। ডাক্তরের মুখে একথা শুনিয়া কি চুপ করিয়া থাকা যায়? আজ কাল ডাক্তরদের হাতে আমাদের দেশের লোকের জীবন। কাজেই তাঁদের ভুল হইলে দেশের লোকের সর্ব্বনাশ। এই জন্যে, এখানে মেয়েটার কথা এত করিয়া বলিলাম। ইনি এক জন নেটিব ডাক্তর এঁর এ রকম ভুল হইলেও হইতে পারে। বড় বড় হুমরো চুমরো ডাক্তরদেরও এ রকম ভুল সচরাচরই হইয়া থাকে। তাঁদের এই রকম ভুলে গৃহস্থেরা ধনে প্রাণে মারা যায়। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। গায়ের তাত থাকিতে তাঁরা নিজেও কুইনাইন্ দেন না, আবার অন্যকেও দিতে বারণ করেন। যদি কেউ দস্তুর মত কুইনাইন্ খাওয়াইয়া- শক্ত জ্বর থেকে রোগীকে শীঘ্র আরাম করে, তবে তাঁরা তার উপর হাড়ে চটেন। ১৬১—১৭০র পাতে যে রোগীর পরিচয় দিইছি, তাঁর জ্বর সারিয়া গেলে প্রথমে যিনি তাঁর চিকিৎসা করিছিলেন, তিনি এক দিন তাঁর বাসায় আসিয়া- ছিলেন। আমাদের রোগী গোড়ায় তাঁর রোগী, শেষে আমার রোগী—কেমন শক্ত জ্বর থেকে কত শীঘ্র আরাম হইয়াছে শুনিয়া, রোগীর দিকে চেয়ে বলিলেন,—বাবা কিছু দিন ভুগিতে হবে। আমি সেখানে উপস্থিত থাকিলে বলিতাম—কাকে? আপনাকে না আমার রোগীকে? ভোগা দূরে থাক, আমার রোগীর এক দিন মাথাও ধরে নাই। ভাল ডাক্তর বলিয়া যাঁরা অভিমান করেন, তাঁদের মুখে এ সব কথা শুনিলে বড়ই কষ্ট হয়। তাঁদের কাছে

শুনিয়া লোকে শিখিবে না তাঁরাই আবার উল্টো বলেন। গুরু মহাশয়ের ভুল হইলে শিষ্যদের ভ্রম ঘুচায় কে? এঁরাই আবার সহরের ভাল ডাক্তর বলিয়া পরিচিত! এঁদেরই হাতে গৃহস্থেরা ধনে প্রাণে মারা যায়। এঁদের নিন্দা করিতেছিনা, সমাজের হিতের জন্যে, সত্য কথা বলিতেছি। এখানে আর গুটী কতক সত্য কথা না বলিলে চলিল না।

পাড়াগাঁ, মাঝারি রকম সহর, আর ভাল সহর, এই তিন রকম জায়গার পরিচয়, ডাক্তরদের বিষয় আমি যেমন জানি তেমন আর কেউ জানেন কি না, সন্দেহ। আমি পাড়াগাঁয়ে ৫ বছর ছিলাম। মাঝারি রকম সহরে ৭ বছর ছিলাম। আর ভাল সহরে আজ প্রায় ৪ বছর আছি। পাড়াগাঁয়ের যে সব ডাক্তর আছেন, তাঁরা সেখানকার হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। তাঁরা যা করেন। তাঁদের উপর সম্পূর্ণ নির্ভর। কাজেই তাঁরা হাতের রোগী ভাল করিবার জন্যে, প্রাণপণে চেষ্টা করেন, শীঘ্র রোগী ভাল করিতে পারিলে, অর্থও হয়, যশও হয়। আমার হাতের রোগী মারা গেলে, রোগ না সারিলে আমারই অযশ, আমারই পশার যাবে; লোকে বিশ্বাস করিয়া, আমাকে দিয়া আর চিকিৎসা করাইবেন না। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা সকলই পরস্পর এই রকম ভাবেন। এই জন্যে, যে কোন উপায়ে হোক, হাতের রোগী ভাল করিতে চেষ্টা করেন। ঈশ্বর তাঁদের ইচ্ছাও সফল করেন। বৈ দেখে হোক, ভাল ডাক্তরের কাছে পরামর্শ লইয়া হোক, রোগীকে ভাল করেন। এই

রকম চেষ্টা করিয়া দশটা রোগী আরাম করিলে, তাঁদের বেশ জ্ঞান জন্মে। তাঁরা ক্রমে বেশ কাজের লোক হন! আমার হাতের রোগী অন্যের হাতে যাইতে দিব না, আমিই ভাল করিব, এ রকম সঙ্কল্প যাঁদের আছে, তাঁদের হাতে রোগী বেজায় হইতে পারে না। আর তাঁরা কালে নিশ্চয়ই ভাল চিকিৎসক হন। পাড়াগাঁয়ে ডাক্তরদের মধ্যে অনেকেই এই রকম। মাঝারি রকম সহরে ডাক্তরেরাও প্রায় পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের মত। সেখানে কেবল এক জন সাহেব ডাক্তর (সিবিল সার্জ্জন) থাকেন। শেষ কাল ভিন্ন তাঁকে প্রায়ই ডাকে না। তাও কি তাঁকে সকলে ডাকিতে পারে? তাঁর বিজিট (দর্শনি) যে আবার ১৬ টাকা। ফল কথা, মাঝারি রকম সহরে সাহেব ডাক্তর দিয়া চিকিৎসা করানর প্রথা খুব কম, নাই বলিলেও হয়। এই জন্য, সেখানেও বাঙ্গালি ডাক্তরেরা হর্ত্তা, কর্ত্তা, বিধাতা। তাঁদের উপর লোকের বিশ্বাসও বেশী। রোগী ভাল করিবার জন্যে তাঁদের চেষ্টাও বেশী। রোগীর প্রতি তাঁদের যত্নও বেশী। কাজেই, গৃহস্থদেরও বেশী হিত হয়। তাঁদেরও যশ, অর্থ দুই-ই হয়। কিন্তু ভাল সহরে (যেমন কলিকাতায়), বাঙ্গালি ডাক্তরদের বড়ই দুর্গতি, তাঁদের উপর লোকের—বিশেষ ধনিলোকের—তেমন বিশ্বাস নাই; তেমন ভক্তি নাই। শক্ত রোগ তাঁরা ভাল করিতে পারেন না, সহরের মেয়েদের পর্য্যন্ত এই বিশ্বাস। তাদের মনে এ রকম বিশ্বাস হবেই ত। তাদের দোষ কি? ডাক্তর মহাশয়রাই ত ইচ্ছা করিয়া নিজের পায়ে কুড়ুল

মারিয়া বসিয়া আছেন। তাঁরা কথায় কথায় সাহেব ডাক্তর ডাকেন। এতে, তাঁদের উপর গৃহস্থদের কেমন করিয়া ভক্তি হইতে পারে? তাঁরা শক্ত রোগী ভাল করিতে পারেন না বলিয়া, সাহেব ডাক্তরকে ডাকেন, কি, সাহেব ডাক্তরদের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্যে, তাঁদের ডাকেন; গৃহস্থরা তা জানে না। অমুক সাহেবের সঙ্গে পরামর্শ করিয়া চিকিৎসা করিতে হবে বলিলে, তারা প্রাণের দায়ে ২ টাকা কি ৪ টাকার জায়গায়, ১৬ টাকা বিজিট (দর্শনি) দিতে প্রস্তুত হয়। যদি শক্ত রোগী ভাল করিতে পারেন না বলিয়া. সাহেব ডাক্তরকে ডাকেন, তবে তাঁদের ডাক্তরি ছাড়িয়া অন্য ব্যবসা করা উচিত। আর যদি সাহেব ডাক্তরদের সঙ্গে ভাব রাখিবার জন্যে, তাঁহাদের প্রিয় হইবার জন্যে, তারা খাতির করিবেন বলিয়া তাঁদের হাতে রাখিলে, ভবিষ্যতে তাঁরা অনেক কাজে আসিবেন বলিয়া—তাঁদের ডাকেন; তবে তাদের এ রকম করিয়া পরের মাথায় কাঁটাল ভাঙ্গিয়া খাওয়া উচিত নয়। সাহেবদের প্রিয় হওয়ার চেয়ে, দেশের লোকের উপর তাঁদের দরদ থাকিলে ভাল হয়। যে রোগ ২ টাকা কি ৪ টাকায় সারে, তার জন্যে কি গৃহস্থ সাধ করিয়া ১৬ টাকা কি ৩২ টাকা খরচ করিতে চায়? অল্প খরচে কাজ পাইলে, বেশীর দিকে কেউ যায় না। তবে অনেক বোকা বড় মানুষ আছে; সাহেব ডাক্তর দিয়া চিকিৎসা করাইলে, লোকের কাছে মান সম্ভ্রম বাড়িবে বলিয়া, ২ টাকার জায়গায় মিছামিছি দশ টাকা খরচ করে। মান, সম্ভ্রম, নাম

বাড়াইবার আর ত উপায় নাই! যে সব সাহেব ডাক্তরের কাছে তোমরা ডাক্তরি শিখিয়াছ, তাঁরাই সহরে ডাক্তরি করিতেছেন। আবার তোমরাও সেই খানে ডাক্তরি করিতেছ। তাঁদের কাছে যে যথার্থ শিখিয়াছ, তার পরিচয় দেও দেখি। কথায় কথায় তাঁদের ডাকিলে, তাঁরা কি ভাবেন? বৃথা পরিশ্রম করিয়া এদের শিখান হইয়াছে। একটা সামান্য রোগের চিকিৎসা করিতে পারে না। বাঙ্গালি ডাক্তর গুলি দেখিতেছি, তবে ত কোনও কাযেরই নয়। আমরা শহরে না থাকিলে, এদের দিয়া তবে ত অভাব ঘোচে না। তাঁরা এই রকম ভাবিলে বা বলিলে, তোমাদের তাতে বড়ই গৌরব বাড়ে! তবে যদি বল, তাঁদের কাছে শিখিছি; আমাদের দ্বারা তাঁদের কিছু পাওয়া উচিত। তোমাদের এ রকম দয়ার পাত্র তাঁরা নন। তাঁরা তোমাদের এ রকম দয়া চান না। তাঁদের জন্যে, এমন করিয়া পরের সর্ব্বনাশ করিতেও তোমাদের বলেন না। পরের টাকা ভিন্ন বুঝি গুরুভক্তি দেখান হয় না? তোমাদের চেয়ে তাঁদের অভাব কম। তাঁদের নৈলে যাদের চলেনা, তাঁদেরই চিকিৎসা করিতে তাঁরা অবকাশ পান না। তোমরা ভারি ভারি রোগ ভাল করিয়া হাত দেখাও যে, তাঁদের শিক্ষা দেওয়া সার্থক হোক। আমাদের দেশের লোকে তোমাদের পূজা করুক। তোমরা কেবল হেলে সাপ ধরিয়া বেড়াইবে; গোক্ষুর সাপ দেখিলেই সাহেব-ডাক্তর ডাকিবে। এতে, গৃহস্থ তোমাকে কেবল হেলে সাপ ধরিতে ডাকিবে

বৈ আর কি? গোক্ষুর সাপের বেলা সাহেব ডাক্তর ডাকিবে। গৃহস্থের দোষ কি? তোমরা যেমন ক্ষমতার পরিচয় দিয়াছ, আদরও তোমাদের তেমনি।

স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) গায়ের তাত কমিলে, কুইনাইন্ না খাওয়াইলে রোগীর যে সব বিপদ হয়, এর আগে তা বলিচি। আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে "রিমিশনে" অর্থাৎ গায়ের তাত কমিলে, বেশী করিয়া কুইনাইন্ খাওয়া-নই যে, রোগীর জীবন রক্ষার এক মাত্র উপায়, এ কথাও এর আগে বলিছি। এ দুটী কথা সকলেরই মনে যেন গাঁথা থাকে। এখানে আমার আর একটী রোগীর কথা বলি। তাতে এ দুটী কথার বিশেষ প্রমাণ পাবে। বছর খানেক হইল, কলিকাতার বাইরে, কোশ দুই তিন তফাতে, কোন এক বড়-মানুষের বাড়ীতে একটী ছেলের চিকিৎসা করিতে গিইছিলাম। ছেলেটীর বয়স দু বছরের বেশী নয়। তার জ্বর হইয়া তড়্কা হয়। সেখান-কার ডাক্তরেরা জ্বরেরও তেমন ব্যবস্থা করিয়া চিকিৎসা করিতে পারেন নাই, তড়্কাও নিবারণ করিতে পারেন নাই। মৃদু ভাবে তড়্কা—হাত পায়ের খেঁচুনি —আক্ষেপ (কন্‌বল্‌শন্) তার নিয়তই থাকিত; মাঝে মাঝে বাড়িত। তড়্কা যে একটা রোগ, তা তাঁরা আদৌ ধরেন নাই। কাজেই, তাঁরা ছেলেটীকে আরাম করিতে পারেন নাই। এই ছেলেটীকে দু দিন দেখিতে গিইছিলাম। শেষের দিন, তার অসুদ বিশুদ ব্যবস্থা করিয়া, সেই বাড়ীতেই আর একটী ছেলেকে

দেখিতে গেলাম। এ ছেলেটীর বয়স ৪। ৫ বছরের বেশী নয়। বাড়ীর যিনি কর্ত্তা, এটী তাঁর বড় ছেলের ছেলে। একটী নেটিব ডাক্তর এই ছেলেটীর চিকিৎসা করিতে ছিলেন। ছেলেটীর স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) হইছিল। জিজ্ঞাসা করায় ডাক্তর বলিলেন,' ছেলেটীর আজ দশ দিন জ্বর হইয়াছে। একটী ফীবর মিক্শ্চর তয়ের করিয়া দিইছি, তাই খাইতেছে। সামান্য জ্বরে ছেলেটীকে মিছামিছি আজ দশ দিন ভোগাইতেছে। যখন গায়ের তাত কমে, তখনও কি সেই ফীবর মিক্শ্চর খাও-য়াও? সেই সময় নিয়ম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইলে ত' দু দিনেই ছেলেটী আরাম হইতে পারে। গোড়ায় এ রকম ব্যবস্থা করিলে, ছেলেটী কখনই এত ভুগিত না। আমার এই কথায় তিনি ভারি চটিলেন, বলিলেন, আমার ঢের দেখা আছে। এ জ্বরে কুইনাইন্ খাওয়াইলে কোনও কাজ হয় না। তাতে জ্বর বাড়ে বই কমে না। গৃহস্থ-দের তোমরা এমনি করিয়াই সর্ব্বনাশ কর বটে! তোমার সঙ্গে ঝগড়া করিলে আর কি হবে? এই বলিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে বলিলাম, যে ছেলেটীর জন্যে, আপনি এত চিন্তিত হইয়াছেন, আর এত খরচ পত্র করিতেছেন, সে ছেলেটা বাঁচিবে। কিন্তু আপনার এই পৌত্রটী রক্ষা পাইবে না। এর যে রকম চিকিৎসা হইতেছে, তাতে এ শীঘ্রই মারা যাবে। আমার কথায় তিনি বড় একটা মনোযোগ করিলেন না। কিছু দিন পরে শুনিলাম, তাঁর ছোট' ছেলেটী আরাম হইয়াছে! কিন্তু পৌত্রটী মারা গিয়াছে।

আট গণ্ডা পয়সার কুইনাইন খাওয়াইলে শিশুর জীবন রক্ষা হইত! এক জন বোকা নেটিব ডাক্তরের হাতে পড়িয়া ছেলেটী অকারণ মারা গেল। ডাক্তরদের বোকামিতে, জ্ঞানের অভাবে এই রকম করিয়া যে কত শত লোকের জীবন নষ্ট হইতেছে, তা বলা যায় না। আমি জানিতাম গুণ না থাকিলে তেজ হয় না। যাকে একটু তেজী দেখা যায়, খুঁজিলে, তার একটা না একটা গুণের পরিচয় পাওয়া যায়ই। কিন্তু এই তেজী ডাক্তরটীর ত কোন গুণই আমি খুঁজিয়া পাইলাম না। এই জন্মেই বুঝি লোকে বলে, পচা আদার ঝাল বেশী।

তার পর, এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা বলি। গুটি কতক রোগ ছাড়া, প্রায় সকল ব্যামোই দু রকম দেখা যায়। নূতন আর পুরাণ। যেমন নূতন জ্বর, আর পুরাণ জ্বর। নূতন জ্বরকে নব জ্বরও বলে, তরুণ জ্বরও বলে। নূতন বাত, আর পুরাণ বাত। নূতন কাশি, আর পুরাণ কাশি। নূতন আর পুরাণ ব্যামোতে তফাত কি? নূতন ব্যামোর লক্ষণ গুলি উগ্র। পুরাণ ব্যামোর লক্ষণ গুলি উগ্র নয়; খুব মৃদু। নূতন ব্যামোতে রোগীর প্রাণের আশঙ্কা বেশী। পুরাণ ব্যামোতে রোগীর প্রাণের আশঙ্কা কম শীঘ্রত কোন আশঙ্কাই নাই। নূতন ব্যামোতে রোগীর যাতনা খুবই বেশী। পুরাণ ব্যামোতে রোগীর যাতনা খুব কম। নূতন ব্যামোতে স্নান আহার সয় না—স্নান আহার ব্যবস্থাই নয়। পুরাণ ব্যামোতে স্নান আহার সবই সয়। নূতন রোগে রোগী কোনও কাজ কর্ম্ম করিতে পারে না; বিছানা

তেই থাকিতে হয়। পুরাণ ব্যামোতে রোগী অনেক কাজ কর্ম্ম করিতে পারে ; করিয়াও থাকে। নূতন ব্যামোর চিকিৎসায়, রোগীকে আরাম করিবার জন্যে, চিকিৎসকের তাড়াতাড়ি করিতে হয়। পুরাণ ব্যামোর চিকিৎসায় তেমন তাড়াতাড়ি করিতে হয় না ; করিবার দরকারও নাই। কেন না, পুরাণ ব্যামো দু দিন, পাঁচ দিন, বা দশ দিনে সারে না। ফল কথা নূতন ব্যামো আর ফোজদারী হাঙ্গাম সমান্। দুয়েতেই ধর, পাখড়, নে, থো করিতে হয়। পুরাণ ব্যামো আর দেওয়ানী মোকদ্দমা সমান। দুয়েতেই রয়ে বসে কাজ করিতে হয়। নূতন ব্যামো ক্রমে পুরাণ পড়িয়া যাইতে পারে। নূতন ব্যামোর উগ্র লক্ষণ গুলি ক্রমে কমিয়া আসে ; কিন্তু ব্যামো নিঃশেষ সারিয়া যায় না ; অনেক তদ্বির করিলে তবে অনেক দিন বাদে ব্যামোটা নিঃশেষ সারিয়া যায়। একেই নূতন ব্যামো ক্রমে পুরাণ পড়িয়া যাওয়া বলে। আবার, অনেক ব্যামোর গোড়া থেকেই পুরাণ ভাব হইতে পারে ; নূতন ব্যামোতে যে সব কষ্ট হইয়া থাকে, তা হয় না ; লক্ষণ গুলিও উগ্র নয়, এ দিকে আবার শীঘ্র নিঃশেষ হইয়াও সারিতে চায় না।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগের কথা দ্বিতীয় ভাগে বিশেষ করিয়া বলিব।

প্রথম ভাগ সারা।

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ইহাতে পুরাণ ব্রংকাইটিস, নিয়ুমোনিয়া, প্লুরিসি, আর ডায়ারিয়া-পেট-নাবা)—রিমিটেণ্ট ফীবার অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায় বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। কথায় কথায় দৃষ্টান্ত আর প্রেস্ক্রপ্‌শন্ দেওয়া হইয়াছে। নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাজে প্রাকটিস অব্ মেডিসিনের চেয়ে কম হইবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

অষ্টম সংস্করণ।

কলিকাতা—৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

১৩১৫ সাল। ভাদ্র।

 মূল্য ১৲ এক টাকা।

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

ইহাতে পুরাণ ব্রংকাইটিস, নিমুমোনিয়া, প্লুরিসি, আর ডায়ারিয়া-
(পেট-নাবা)—রিমিটেণ্ট ফীবার্ অর্থাৎ স্বল্পবিরাম জ্বরের
এই চারি রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায়
বিশেষ করিয়া লেখা হইয়াছে। কথায় কথায়
দৃষ্টান্ত আর প্রেস্কৃপ্শন্ দেওয়া হইয়াছে।
নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাজে প্রাক্‌টিস
অব্ মেডিসিনের চেয়ে
কম হইবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

অষ্টম সংস্করণ।

কলিকাতা

৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্, সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।

১৩১৫ সাল। ভাদ্র।

 মূল্য ১৲ এক টাকা।

সূচীপত্র।

পৃষ্ঠা।

সরল জ্বর-চিকিৎসা।

দ্বিতীয় ভাগ।

প্রথম ভাগে পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা বলা সব সারা হয় নাই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (ফুস্‌ফুসের খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ) যেমন ছেলেদের রোগ, পুরাণ ব্রংকাইটিস্ তেমনি বুড়োদের রোগ। পঞ্চাশ বছরের বেশী বয়স হইয়াছে, কিন্তু পুরাণ ব্রংকাইটিস্ নাই, এমন লোক আমাদের দেশে খুব কম। যেখানে অনেক লোকের বসতি, তার মাঝখানে যদি এক রাত্রি বাস কর, আর খুব ভোরে—রাত্রি থাকিতে উঠ, তবে বুড়োদের খকর খকর কাশি আর গয়ের ফেলার শব্দ ছাড়া আর কিছুই শুনিতে পাইবে না। এই যে বুড়োদের কাশি, একেই পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বলে পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বুড়ো বয়সের রোগ। তবে ছেলেদের এ রোগ হয় না, এমন নয়। শীত কালেই ঐ রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়। শীত কালে এ রোগে কষ্ট পায় না, এমন বুড়ো বুড়ী কম দেখা যায়। এ রোগ কখন কখন জোয়ান বয়সেও আরম্ভ হয়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ কি রকম করিয়া হয়? বারে বারে নূতন ব্রংকাইটিস্ হইতে হইতে, শেষে ব্রংকাইটিসের লক্ষণ গুলি থাকিয়া যায়। কাশি কখনও বাড়ে, কখনও কমে। কিন্তু একবারে নির্দ্দোষ হইয়া সারিয়া যায় না। প্রথম রাত্রে শুইবার সময় কাশি বাড়ে, আর ভোরে কাশি বাড়ে। প্রথমে বৃষ্টিতে ভিজিয়াই হোক্, ভিজে কাপড় পরিয়াই হোক্, শিশির ভোগ করিয়াই হোক্, সোঁতা মাটিতে শুই-য়াই হোক্, কি ঘাম গায়ে হঠাৎ খুব ঠাণ্ডা বাতাস লাগাইয়াই হোক্ শর্দ্দি হইল। গলায় ব্যথা হইল; শর্দ্দি বুকে বসিয়া গেল, কাশি হইল, গা গরম হইল, কাশি ক্রমে বাড়িতে লাগিল, জ্বরের প্রকোপ হইল। অনেক ধরাধর করিয়া চিকিৎসা করায় রোগীর ব্যামো সারিয়া গেল। রোগী কিছু দিন ভাল থাকিল। তার পর এক দিন একটু অত্যাচার হওয়ায় আবার সেই রকম শর্দ্দি আর কাশি হইল। প্রথম বারে যে অত্যাচার করিয়া শর্দ্দি কাশি হইচিল, এবারে তার চেয়ে ঢের কম অত্যাচারে শর্দ্দি কাশি হইল। এ বারেও অষুদ বিষুদ খাইয়া, স্নানাহারের ধরাধর করিয়া কাশি (ব্রংকাইটিস্) সারিল। কিছু দিন পরে আবার ব্রংকাইটিস্ হইল। এবারে কি অত্যাচারে ব্যামো হইল, রোগীও ভাল জানিতেই পারিল না। অনেক অষুদ বিষুদ খাইল, স্নানাহারের খুব ধরাধর করিল, কিন্তু এ বারে রোগটী নিঃশেষ হইয়া সারিল না। এ বারেই তার পুরাণ ব্রংকাইটিস্ হইল।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ যাদের আছে, তাদের গয়ের কি

সহজেই উঠে? সব রোগীর সমান নয়। কারো কারো গয়ের খুব সহজেই উঠে। গয়েরও অনেক খানি উঠে। আর গয়ের উঠিয়া গেলেই বেশ আরাম বোধ হয়। আবার কারো কারো কাশিতে কাশিতে দম লাগিয়া যায়, তবু একটু গয়ের উঠে না। যাও বা একটু উঠে, তা এমনি শক্ত আর আটা আটা যে হাত দিয়ে তা ছেঁড়া ভার।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কি হাঁপ হয়? এ রোগে হাঁপ একটু থাকেই। কারো কারো সময়ে সময়ে হাঁপ বেশী হয়। যাদের বেশী হাঁপ হয়, তাদের হাঁপ-কাশ (শ্বাস-কাস) হইয়াছে বলিয়া চিকিৎসকের ভুল হইতে পারে। কিন্তু আদত হাঁপ-কাশ ও রকম নয়। আদত হাঁপ-কাশকে ইংরিজিতে য়্যাজ্‌মা বলে। আদত হাঁপ-কাশে যখন হাঁপ চাগায়, কেবল তখনই রোগীর যা অসুখ হয়। তার পর আর কোনও অসুখ থাকে না। রোগী বেশ সচ্ছন্দ থাকে। এ ছাড়া, আদত হাঁপ-কাশ প্রায় আহারেরই পর হইয়া থাকে। আদত হাঁপ কাশে ব্রংকাইটিস্ যোগ দিলে রোগীর নিস্তার নাই। কথায় কথায় তার হাঁপ চাগায়, আর হাঁপও খুব বেশী হয়।

বুক পরীক্ষা করার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ) রোগীর পিঠে, পাঁজরে, আর বুকে দিয়ে শুনিলে নানা রকম শব্দ শুনিতে পাইবে। রোগীকে কাশিতে বলিয়া তার পর শুনিলে আবার নূতন নূতন রকম শব্দ শুনা যায়। ফুস্ফোর নলির মধ্যে বেশী শ্লেষ্মা জমিয়া আছে, কি কম আছে, শক্ত আটাল শ্লেষ্মা আছে, কি তরল (পাতলা) শ্লেষ্মা আছে,

শব্দ শুনিয়া তা অনেক ঠিক্ করিতে পারা যায়। ২০১র পাত থেকে ২০৬র পাত পর্য্যন্ত আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে এ সব বেশ বুঝিতে পারিবে। পিঠের নীচে দিকে কান দিয়া শুনিলে মোটা বুড়্ বুড়ির শব্দ শুনিতে পাইবে। পুরাণ ব্রংকাইটিসের এ একটী বেশ চিহ্ন। বুড়োদের পুরাণ ব্রংকাইটিস্ অনেক দিনের হইলে, ফুস্কোর নলি গুলির খোল বড় হয়। এই সব রোগীর এত গয়ের উঠে যে শুনিলে আশ্চর্য্য হবে। কারো কারো দিন রাতের মধ্যে দু সের আড়াই সের গয়ের উঠে। সকাল বেলাই বেশী গয়ের উঠে। রাত্রে গয়ের জমিয়া থাকে। ভোরে বিছানা থেকেই উঠিয়াই, কিম্বা রোগী চলা ফেরা করিতে আরম্ভ করিলেই কাশি আরম্ভ হয়। যে গয়ের খানি জমিয়া আছে, তা উঠিয়া না গেলে আর কাশি থামে না। গয়ের সব উঠিয়া গেলে রোগী খুব আরাম বোধ করে। হাঁপ কি অন্য অসুখ কিছুই থাকে না। কাশিতে কাশিতে এই রকম করিয়া গয়ের উঠিয়া গেলে বেশ আরাম পায় বলিয়া, বুড়োরা ভোরে উঠিয়া ইচ্ছা করিয়া খুব তামাক খায়। যাদের কাশি আছে, তামাক টানিলেই তাদের কাশি আরম্ভ হয়। ফুস্কোর নলি গুলির খোল বড় হইলে তাতে যে গয়ের জমে, সে গয়ের প্রায়ই পচিয়া ভারি দুর্গন্ধ হয়। কাজেই, সে গয়ের কাশিয়া ফেলিলে, তার কাছে যারা বসিয়া থাকে, তাদের পর্য্যন্ত ঘৃণা হয়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ শক্ত রকম হইলে, রোগী ভারি কাহিল আর দুর্ব্বল হইয়া যায়। শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইতে

থাকে। সন্ধ্যাকালে একটু জ্বর হয়, আর রাত্রে ঘাম হয়। এই সব লক্ষণ কেবল পুরাণ ব্রংকাইটিসেরই বলিয়া নিশ্চিন্ত থাকা হইবে না। এ সব লক্ষণ জানিতে পারিলেই ক্ষয়কাশ রোগের সন্দেহ করিবে। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন। থাইসিস্ অর্থাৎ ক্ষয়কাশের কথা এর পর বলিব।

বেশী গয়ের উঠাকে সহজ জ্ঞান করা হইবে না। বেশী প্রস্রাব হইলে, বেশী ঘাম হইলে, বেশী বাহ্যে হইলে শরীর যেমন ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়, বেশী গয়ের উঠিলেও শরীর তেমনি ক্ষয় পাইয়া যায়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ বদ্ধমূল হইলে আর নিঃশেষ হইয়া সারে না। বদ্ধমূল হইবার আগে, অর্থাৎ রোগটা পেকে দাঁড়াইবার আগে, বিশেষ তদ্বির করিলে ব্যামো নির্দ্দোষ সারিয়া যাইতে পারে। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ যাদের আছে, তারা প্রাচীন বয়স পর্য্যন্ত বাঁচিতে পারে; কিন্তু তাদের জীবন অতি কষ্টের। কাশিতে কাশিতে, গয়ের ফেলিতে ফেলিতে তারা ত্যক্ত-বিরক্ত হইয়া যায়। তাদের কাছে যারা থাকে, তারাও জ্বালাতন হয়। এ ছাড়া, কথায় কথায় তাদের হাঁপ লাগে। কাজেই, কোন রকম শ্রম করিতে হইলে তাদের প্রাণান্ত হয়।

পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে বিপদ্—পুরাণ ব্রংকাইটিস্ থেকে রোগীর কি কি বিপদ্ ঘটিতে পারে? ফুস্ফোর সব নলির সমান দোষ হইতে পারে, অর্থাৎ রোগ খুব বৃদ্ধি হইতে পারে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) হইতে পারে। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ হঠাৎ তরুণ হইয়া দাঁড়াইতে পারে, অর্থাৎ তরুণ

যা নূতন ব্রংকাইটিসের সব লক্ষণ এসে উপস্থিত হইতে পারে। এ রকম দুর্ঘটনা হইলে রোগীকে বাঁচান সোজা নয়। নিয়ত কাশিতে কাশিতে, ফুস্ফোর মধ্যে যে সব অতি ছোট ছোট বায়ুকোষ আছে, তা ছিঁড়িয়া যাইতে পারে। তা ছিঁড়িয়া গেলে ফুস্ফোর বাহিরে বাতাস যাইতে পারে। এই বাতাস কণ্ঠার নীচে, কি বুকের অন্য অন্য জায়গায় চামড়ার নীচে আসিয়া জমিতে পারে। এই রকম দুর্ঘটনাকে ইংরিজিতে এম্ফিসিমা বলে। এ রোগের কথা এর পর বলিব। হৃৎপিণ্ডের আকার বাড়িতে পারে। আর উদরী হইতে পারে। উদরীকে ইংরিজিতে ডপ্সি বলে।

নূতন আর পুরাণ ব্রংকাইটিসের তফাত—নূতন আর পুরাণ এই দু রকম ব্রংকাইটিসের তফাত কি? নূতন আর পুরাণ ব্যামোতে যে তফাত, এ দুয়েতেও সেই তফাত। নূতন আর পুরাণ ব্রংকাইটিসের কথা এতক্ষণ যা বলিলাম, তাতেই এ দুই রোগের তফাত এক রকম মোটামুটি জানিতে পারিবে। নূতন ব্রংকাইটিস্ রোগে বেশী বা কম জ্বর নিয়তই থাকে। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে জ্বর থাকে না। তবে রোগ খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে, সন্ধ্যাকালে একটু জ্বর প্রকাশ পায়।

১৯৮ আর ১৯৯র পাতে যে সব রোগের নাম করিছি, সে সব রোগকে যে কেবল স্বল্প-বিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গ বলিয়াই জানিতে হইবে, তা নয়। সে সব রোগ উপসর্গও হইতে পারে, আসল রোগও হইতে পারে। এই জন্যে, সে সব রোগের কথা বিশেষ করিয়াই

বলা উচিত। কেন না, রোগের সঙ্গে পরিচয় না থাকিলে, ভাল চিকিৎসা করা যায় না। যে রোগের সঙ্গে পরিচয় নাই, তাকে বশের মধ্যে আনা সোজা নয়। আর যে রোগকে বশের মধ্যে আনিতে না পারিবে, সে রোগের তুমি চিকিৎসাও করিতে পারিবে না। বলিতে গেলে, সে সব রোগ আসল হইলেও তাদের যে চিকিৎসা, জ্বরের উপসর্গ হইলেও তাদের সেই চিকিৎসা। তবে তফাত এই যে, সে সব রোগ আসল হইলে, শুদু তাদেরই চিকিৎসা করিলে রোগী ভাল হয়। কিন্তু জ্বরের উপসর্গ হইলে, আসল রোগ অর্থাৎ জ্বরকে খাটো করিতে পারিলে, তবে সে সব রোগকে খাটো করা যায়। এ সব কথা এর আগেই বলিছি (২০৫—২০৬র পাত দেগ)।

কারণ সব রোগেরই কারণ আছে। কারণ ছাড়া রোগ নাই। যে রোগের কারণ যত পরিষ্কার, সে রোগের চিকিৎসা তত সহজ। কারণ জানিতে না পারিলে, রোগের ঠিক্ চিকিৎসা হয় না। এ অস্নুদে উপকার হইল না, আর এক রকম অস্নুদ দিয়া দেখি, এই রকম করিয়া কেবল হাতড়াইয়া বেড়াইতে হয়। এই রকম করিয়া যে, হাতড়াইয়া বেড়ায়, তাকেই হাতুড়ে বলে। প'ড়ো প'ণ্ডিতও যদি এই রকম করিয়া হাতড়াইয়া বেড়ান, তবে তাঁকেও হাতুড়ে বলিতে ডরাইব না—বলিবার আপত্তিও নাই।

এক এক রোগের দুই দুই কারণ। সব জায়গায় দুটী কারণ খুজিয়া পাওয়া যায় না। কোন কোন জায়গায় একটী কারণও পাওয়া ভার। যেখানে রোগের কারণ

খুজিয়া না পারে, সেখানে চিকিৎসা করিয়া যশ পাইবে না। এ কথা এই মাত্র বলিছি।

রোগের যে দুটা কারণের কথা এই মাত্র বলিলাম, সে দুটী কারণ কি ? নিকট কারণ আর দূর কারণ। রোগটী হইবার ঠিক্ আগেই যে কারণটী ঘটে, সেই কারণকে নিকট কারণ বলে। নিকট কারণকে উপলক্ষও বলে, ছুতোও বলে। মনে কর বৃষ্টিতে ভিজিয়া এক জনের শর্দ্দি হইল। সেই শর্দ্দি থেকে তার কাশ-রোগ জন্মিয়া গেল। আর সেই কাশ-রোগে তার মৃত্যু হইল। তার বাপের ক্ষয়কাশ রোগ ছিল। এখানে বৃষ্টিতে ভেজা তার কাশ-রোগের নিকট কারণ। আর তার কাশ-রোগের ধাত্ (ধাতু) তার রোগের দূর কারণ। এই ধাত্ বাপেরও ছিল। এই জন্যে সে এই ধাত্ লইয়াই জন্মিছিল। আর এক বার ভাল করিয়া বলি। তার কাশ রোগের ধাত্। কোন একটা উপলক্ষ, অছিলে, কি ছুতো পাইলেই তার কাশ রোগ হইবার কথা। এই যে উপলক্ষ, অছিলে বা ছুতো, একেই নিকট কারণ বলে। আর তার কাশ রোগের ধাত্ অর্থাৎ তার পৈতৃক দোষ তার রোগের দূর কারণ। এর আর একটী দৃষ্টান্ত দিই। ৫৫র পাতে ম্যালেরিয়ার কথা বলিছি। এই ম্যালেরিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে শরীরে প্রবেশ করিলে, কিম্বা খাবার জলের সঙ্গে পেটে গেলে জ্বর হয়। জ্বর যে তখনই হয়, তা নয়। সচরাচর কয়েক দিন না গেলে, আর বিশেষ কোন্ অত্যাচার না করিলে জ্বর প্রকাশ হয় না। মনে কর, বুধবারের দিন সন্ধ্যার পর তোমাকে স্থানান্তরে যাইতে হইল। আর

সেই রাত্রেই বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। রাত্রে যাতায়াতে নিশ্বাসের সঙ্গে ম্যালেরিয়া তোমার শরীরে প্রবেশ করিল। বৃহস্পতি, শুক্র, শনি, রবি, এ কয়েক দিন তুমি বিশেষ কোনও অত্যাচার করিলে না। অসুখও তোমার কিছু হইল না। সোমবারে খুব রৌদ্রের সময় তোমাকে অনেক পথ চলিতে হইল। সন্ধ্যার সময় বাড়ী ফিরিয়া আসিলে। রাত্রে তোমার কম্প দিয়া জ্বর আসিল। এখানে ম্যালেরিয়া তোমার জ্বরের দূর কারণ। আর রৌদ্রে পথ চলা জ্বরের নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ উপস্থিত থাকিয়াও, নিকট কারণের অভাবে রোগ প্রকাশ হইতে পারে না।

এখন ব্রংকাইটিস্ রোগের কারণ বলি। এ রোগের দূর কারণ অনেক। তার মধ্যে এই কয়টী প্রধান:—(১) যারা বাইরে চলা ফেরা কম করে, বাড়ীতে বসিয়া থাকে, বা বাড়ীতে বসিয়া কাজ কর্ম্ম করে, তাদেরই এ রোগ বেশী হয়। তবেই শ্রম না করা, অর্থাৎ শরীরকে না খাটান এ রোগের একটী দূর কারণ। (২) যাদের বাত বা বাত-রক্তের ধাত্ (ধাতু), তাদেরও এ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে বাত আর বাতরক্ত এই দুইটী রোগও ব্রংকাইটিসের দূর কারণ। বাতকে ইংরিজিতে রিউম্যাটিজম্ বলে। বাতরক্তকে গাউট বলে। এ দুই রোগের কথা এর পর বলিব। (৩) যাদের হৃৎপিণ্ড বা মূত্রগ্রন্থির পীড়া আছে, তাদেরও ব্রংকাইটিস্ বেশী হয়। এই জন্যে এই দুই যন্ত্রের পীড়াও ব্রংকাইটিসের দূর কারণ। হৃৎপিণ্ড কাকে বলে ৮৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। হৃৎপিণ্ড যেমন একটী

যন্ত্র, মূত্রগ্রন্থিও তেমনি একটী যন্ত্র। হৃৎপিণ্ডকে ইংরিজিতে হার্ট বলে। মূত্রগ্রন্থিকে ইংরিজিতে কিড্‌নি বলে। মূত্র-গ্রন্থিকে ভাল কথায় বৃক্কও বলে। কিড্‌নি, মূত্রগ্রন্থি, আর বৃক্ক, এর মধ্যে যে নামটী তোমার সোজা বলিয়া বোধ হবে, সেইটীই মনে করিয়া রাখ। শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, তাদের সকলেরই এক একটী কাজ নির্দ্দিষ্ট আছে। হৃৎপিণ্ডের কাজ কি, ৮৮র পাতে তা বলিছি। প্রস্রাব, ঘাম, লাল (লালা), এ সবই রক্ত থেকে তয়ের হয়। রক্ত থেকে এ সব তয়ের করিবার আলাদা আলাদা যন্ত্র আছে। মূত্রগ্রন্থি রক্ত থেকে প্রস্রাব তয়ের করে। এই যন্ত্র দুটী। দুই কোঁকের মধ্যে পিচন দিকে থাকে। বর্‌বটির যেমন আকার, মূত্রগ্রন্থি দুটীরও ঠিক্ তেমনি আকার। তবে বর্‌বটির চেয়ে মূত্রগ্রন্থি অনেক বড়। তার পর বলি। (৪) ছোট ছেলে আর বুড়োদের ব্রংকাইটিস্ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে শিশু কাল আর প্রাচীন বয়স এ রোগের দূর কারণ। এ রোগ যাদের এক বার হইয়াছে, তাদের এ রোগ বেশী হয়। এই জন্যে, এ রোগ এক বার হওয়া এর আর একটী দূর কারণ। ব্রংকাইটিস্ রোগের এই গুলি দূর কারণ।

এখন ব্রংকাইটিস্ রোগের নিকট কারণ বলি। (১) বৃষ্টিতে ভেজা আর শীত বাত ভোগ করা এ রোগের একটী নিকট কারণ। (২) ছেলেদের হাম হইলে তাদের প্রায়ই ব্রংকাইটিস্ হইয়া থাকে, এই জন্যে হাম ছেলেদের ব্রংকাইটিস্ রোগের একটী নিকট কারণ। (৩) হুপিংকফ্‌ও

ছেলেদের ব্রংকাইটিসের আর একটী নিকট কারণ। হুপিং-কফ্ এক রকম কাশ-রোগ। এ কেবল ছেলেদেরই হয়। এ কাশি দমকে দমকে হয়। কাশি এলে, কাশিতে কাশিতে ছেলের চক্ষু মুখ এক বারে রাঙা হইয়া যায়। শেষে বড় রকম একটা "হূপ্" শব্দ হইয়া কাশি থামিয়া যায়। হুপিং-কফ্ খুব শক্ত রোগ। এক বার হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না। এ আবার ছোঁয়াচে রোগ। একটী ছেলের হইলে পাড়ার সব ছেলের হয়। (৪) খুব গরম বা খুব ঠাণ্ডা বাতাস, কিম্বা রাস্তার ধুলো ফুস্ফোর নলিগুলির মধ্যে গেলে ব্রংকাইটিস্ হয়। এই জন্যে এ সবও ব্রংকাইটিসের নিকট কারণ। (৫) যে কারণে হোক্ রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাই-টিস্ হয়। (ক) অনেক রকম জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্ হয়। এই জন্যে স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) ও আর আর অনেক রকম জ্বর ব্রংকাই-টিসের নিকট কারণ। এই জন্যেই স্বল্পবিরাম-জ্বরে ব্রংকাই-টিস্ হয়। আর এই জন্যেই ব্রংকাইটিসকে স্বল্পবিরাম-জ্বরের উপসর্গ বলিছি। (খ) চামড়ার নূতন বা পুরাণ রোগ হঠাৎ মিলাইয়া গেলেও রক্ত খারাপ হয়। রক্ত খারাপ হইলে ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে। এই জন্যে এ রকম ঘটনাও ব্রংকাইটিসের একটী নিকট কারণ। (গ) কোন খান দিয়া রক্ত-পড়া, রস-পড়া, বা পূয-পড়া, যা অনেক দিন থেকে অভ্যাস পাইয়া আসিয়াছে, হঠাৎ তা বন্ধ হইলে রক্ত খারাপ হইয়া ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে। (ঘ) বাত-রক্ত (গাউট), বাত (রিয়ুম্যাটিজম্) বা গর্ম্মির দরুণ রক্ত খারাপ হইলেও

ব্রংকাইটিস্ হয়। এ কথা এর আগেই এক বার বলিছি। (ঙ) কোন কোন অসুদ, বিশেষ আয়োডীন, খাইলেও রক্ত-দোষ হইয়া ব্রংকাইটিস্ হইতে পারে।

ব্রংকাইটিস্ রোগের কারণ বলিতে গিয়া অনেক রোগের অনেক কথা বলিছি।। বেশ মন দিয়া আর হিসাব করিয়া পড়িলে, সে সব কথা বুঝিতে পারিবে। ব্রংকাইটিস্ রোগের দূর আর নিকট কারণ যা যা বলিছি, তাও বুঝিতে পারিবে।

নূতন আর পুরাণ এই দু রকম ব্রংকাইটিসের কথা বলিলাম। আর এক রকম ব্রংকাইটিস্ আছে, তার কথা এখনও বলি নাই। সে ব্রংকাইটিসকে ইংরিজিতে প্লাষ্টিক ব্রংকাইটিস্ বলে। যে দু রকম ব্রংকাইটিসের কথা বলিছি, তাতে ফুস্কোর নলিগুলি থেকে গয়ের, কাশ বা শ্লেস্মা উঠে। এতে ফুস্কোর নলিগুলি থেকে আর এক রকম জিনিষ উঠে। এই জিনিষ ফুস্কোর মাঝারি রকম কি তারও চেয়ে ছোট নলিগুলির ছাঁচ বৈ আর কিছুই নয়। দোল, চড়ক, রথের ... নয় চিনির হাতী, চিনির ঘোড়া, চিনির রথ বিক্রি হয়। চিনির এই সব জিনিষকে আমরা ছাঁচ বলিয়া থাকি। এখানে ছাঁচের যে অর্থ, ফুস্কোর নলিগুলি থেকে যে ছাঁচ উঠে, তারও সেই অর্থ। ফুস্কোর নলিগুলি দেখিতে যে রকম, সেই নলিগুলি থেকে যে জিনিষ উঠে, তাও দেখিতে ঠিক্ সেই রকম। এই জন্যে ঐ জিনিষকে ঐ নলিগুলির ছাঁচ বলে। এই ছাঁচ নিরেটও হইতে পারে, নলিগুলির মত ফাপাও হইতে পারে।

এ রোগ খুব কম হয়। এই জন্যে এর কথা আর বেশী

করিয়া বলিলাম না। নলিগুলি থেকে একটু বড় রকম ছাঁচ উঠিবার আগে হাঁপ হয়, শুক্‌নো কাশি হয়, রক্ত উঠে। কখন কখন অনেক রক্ত উঠে।

এ রোগে জীবনের আশঙ্কা খুব কম। কিন্তু রোগ সারিতে চায় না। অসুদে রোগীর বড় উপকার হয় না। তবে ২০ ফোটা করিয়া টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ রোজ ২।৩ বার খাইলে, আর খুব গরম জলে তার্পিণ ঢালিয়া দিয়া সেই ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে বেশ উপকার হয়। ১০।১৫ গ্রেন্ করিয়া গ্যালিক্ য়্যাসিড্ ৪ ঘণ্টা অন্তর খাইলে রক্ত উঠা বন্ধ হয়। যাদের এ রোগ আছে, খুব গরম জায়গায় তারা যেন কখনও থাকে না। ছেলেদের এ রকম রোগ হইলে, বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে খুব উপকার হয়।

এখন পুরাণ ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার কথা বলি। এর আগেই বলিছি যে, এ রোগ বুড়োদেরই বেশী হয়। আর ১৭১র পাতে বলিছি যে, ক্ষীণ রোগীর শ্লেষ্মা সরল করিতে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়ার মত অসুদ আর নাই। এই জন্যে পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া দিলে যেমন উপকার হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে আমি যে সব অসুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

খাইবার অসুদ।

(১) কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া ... ১ ড্রাম্
বাইনম্ ইপেকা ... ... ২ ড্রাম্

টিংচর ক্যাম্ফর কো ... ... ৬ ড্রাম্
টিংচর সিংকোনি কো ... ... ৬ ড্রাম্
ইন্‌ফিয়ুশন্ সেনিগা ... ... ১২ ঔন্স পুরাইয়া
একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩।৪ বার করিয়া খাইবে। অধিক আর কি বলিব, এ অসুদে উপকার হইল না বলিয়া, পুরাণ ব্রংকাইটিসে আমাকে এ পর্য্যন্ত আর কোনও অসুদ দিতে হয় নাই।

(২) কুইনাইন ... ... ৫ গ্রেন্
একৃষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্ ... ... যত টুকু দরকার
একত্র মিশাইয়া একটী বড়ি তয়ের কর।

এই রকম ১২টা বড়ি তয়ের করিয়া একটী ছোট শিশিতে কি ক'টোয় করিয়া রাখ। রোজ সকালে একটা বড়ি আর সন্ধ্যার আগে একটা বড়ি খাইবে।

যদি বল, পুরাণ ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দিবার দরকার কি? জ্বর থাকিলেই না কুইনাইন্ দিতে হয়। তা জ্বর না থাকিলেও কুইনাইন্ দিতে হয়। কুইনাইন্ যে কেবল জ্বরেরই অসুদ, তা নয়। কুইনাইন্ অনেক রোগের অসুদ। ধরিতে গেলে, কুইনাইন্ যে কোন্ রোগের অসুদ নয়, তা বলিতে পারি না। কোন একটা অসুদে দশটা রোগ সারে বলিলে, লোকে ঠাট্টা করিয়া বলে ও অসুদে তবে গোরু হারাইলেও পাওয়া যায়। কিন্তু কুইনাইন্ সে রকম ঠাট্টার অসুদ নয়। যদি কোন অসুদে গোরু হারাইলেও পাওয়া যায়, সে কুইনাইনে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া

বলিব। ২১২র পাতে বলিছি, ব্রংকাইটিস্ রোগে নলি-গুলির মধ্যে যে শ্লেষ্মা জন্মে, রোগ যত বাড়ে, রোগী যত দুর্ব্বল হয়, শ্লেষ্মাও তত বেশী জন্মে। কুইনাইন্ খাওয়াইলে শ্লেষ্মা তেমন জন্মিতে পারে না। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে কুইনাইনের এই ধর্ম্মটীর পরিচয় হাতে হাতে পাওয়া যায়। এ রোগে বারে বারে খুব বেশী শ্লেষ্মা উঠে বলিয়াই না, রোগী এত কাহিল আর কাবু হইয়া পড়ে। রোজ রোজ যে এত শ্লেষ্মা উঠে, এ শ্লেষ্মা কোথা থেকে আসে? এ শ্লেষ্মা রোজ জন্মে। এই শ্লেষ্মা আর জন্মিতে না পারে, এমন উপায় করিতে না পারিলে, রোগীর শ্লেষ্মা উঠাও বারণ হবে না, তার শরীরের ক্ষয়ও নিবারণ হবে না। সে দিন দিন কাহিল হইতেই থাকিবে। শেষে ক্ষয়কাশ-রোগীর মত সে অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়া পড়িবে। শ্লেষ্মা আর জন্মিতে না পারে, এমন উপায় আর কি? কুইনাইন্। কুইনাইন্ খাওয়াইলে রোগীর শ্লেষ্মা-উঠা ক্রমে কমিয়া আসে। শেষে আর শ্লেষ্মা উঠে না। নলিগুলির অবস্থা সহজ হয়। রোজ দু বেলা ৫ গ্রেন্ করিয়া ১০ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়া যদি রোগীর শ্লেষ্মা-উঠা না কমে, তবে এক এক বারে ১০ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ খাইতে বলিবে। কুইনাইনের এ ধর্ম্মটী কখনও ভুলিও না।

কুইনাইন্ যেমন শ্লেষ্মার সৃষ্টি নিবারণ করে, পূযেরও সৃষ্টি তেম্নি নিবারণ করে। মনে কর, এক জনের ধাতের ব্যামো হইয়াছে। ধাতের ব্যামোকে ইংরিজিতে গনোরিয়া বলে। ছাই ভস্ম তাকে কতই খাওয়াইলে, কিন্তু কিছুতেই

তার ধাত-চলা বন্ধ করিতে পারিলে না। এ অবস্থায় যদি ৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ কাঁচ্চা খানেক পরিষ্কার জলের সঙ্গে মিশাইয়া রোজ এক বার কি দু বার তার প্রস্রাবের দ্বার দিয়া পিচ্‌কিরি কর, তবে ৩। ৪ দিনেই অমন যে ধাত-চলা, তাও বন্ধ হবে। পিচ্‌কিরি করিবার আগে ২। ৫ ফোটা ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ দিয়া কুইনাইন্ গুলিয়া লইতে হয়। ধাতের ব্যামোর (গনোরিয়ার) কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। এই রকম করিয়া কুইনাইন্ পিচ্‌কিরি করিলে ফোড়া থেকেও পূয-পড়া বন্ধ হইয়া যায়। এ সব কথাও এর পর বলিব।

(৩) হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ পুরাণ ব্রংকাইটিসের আর একটী ভাল অসুদ। শুদু পুরাণ ব্রংকাইটিস্ নয়, সব রকম কাশ-রোগেই এ অসুদে খুব উপকার করে। ইন্‌ফিয়ুশন্ কোয়াশিয়া বা চিরতার জলের সঙ্গে এই অসুদ ৫ গ্রেন্ করিয়া রোজ তিন বার খাইলে খুব উপকার হয়। কাশি কমে, গয়ের উঠা কম হয়, রোগী গায়ে সারে আর সবল হয়। দু চারি দিনেই যে এ রকম উপকার পাওয়া যায়, তা নয়। অসুদ কিছু বেশী দিন খাইতে হয়। হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইমের দাম বেশী নয়। এক টাকার অসুদ কিনিলেই যথেষ্ট। এ অসুদ যে-সে ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায় না। খুব ভাল ডিস্পেন্সরি ভিন্ন এ অসুদ মিলে না। খুব ভাল ডিস্পেন্সরি আর কাদের ? সাহেবদের। বাঙ্গালির ভাল ডিস্পেন্সরি নাই, তা বলিতেছি না। বাঙ্গালির ডিস্পেন্সরির মধ্যে কেবল ড্রুগিষ্ট্‌স হল্‌ই ভাল। সাহেব-

দের ডিস্পেন্সারির চেয়ে এ ডিস্পেন্সেরির জাঁক পশার বড় কম নয়। আগে আরও বেশী ছিল। কলিকাতার বড় বাজারে ইংরিজি অস্বুদের যে কয়খান ভাল দোকান আছে, হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইম্ সে সব দোকানেও কিনিতে পাওয়া যায়। ডিস্পেন্সেরিতে যে দামে এ অস্বুদ কিনিতে হয়, সে সব দোকানে তার চেয়ে ঢের শস্তায় পাওয়া যায়।

বাজারে হাইপোফস্ফাইট্ অব লাইমের এক রকম সিরপ্ বিক্রি হয়। অনেক সাহেব অনেক রকম সিরপ্ তয়ের করিয়াছেন। তার মধ্যে গ্রিমোণ্ট্ সাহেবেরই সিরপ্ ভাল। গ্রিমোণ্ট্ সাহেবের সিরপ্ খুব লাল। বাজারে ঢের ভেল সিরপ্ বিক্রি হয়। কাজেই ভাল করিয়া দেখিয়া শুনিয়া না লইলে ঠকিতে হয়। সিরপ্ খাওয়ায় কোনও কষ্ট নাই। ঠিক্ শর্ব্বতের মত খাওয়া যায়। অস্বুদ খাইতেছি বলিয়া বোধ হয় না। এই জন্যে, যাঁরা তিত বা বিকট অস্বুদ খাইতে বড় নারাজ, তাঁদের পক্ষে এই সিরপ্ খুব ভাল। তবে সিরপের দাম বেশী। ডিস্পেন্সরিতে দু টাকার কমে এক শিশি সিরপ্ পাওয়া যায় না। এক শিশিতে ৬ ওন্সের বেশী থাকে না। এক এক বারে বড় চামচের এক চামচ (অর্থাৎ এক কাঁচ্চা বা চারি ড্রাম্) করিয়া খাইতে হয়। প্রথম প্রথম সকালে বিকালে তার পর (এক হপ্তা পরে) রোজ তিন বেলা তিন বার খাইতে হয়। কাজেই এক শিশি অস্বুদে চারি পাঁচ দিনের বেশী হয় না। এই জন্যে যাঁদের সঙ্গতি আছে, কেবল তাঁরাই এ অস্বুদ কিনিয়া খাইতে পারেন। ডিস্পেন্সেরির চেয়ে বাজারে সিরপ্ অনেক শস্তা।

বড় বাজারের ঐ সব দোকানে পাঁচ শিকাতেই এক শিশি পাওয়া যায়। আবার এক বারে ৫।৬ শিশি কিনিলে আরও শস্তা পাওয়া যায়। সিরপ্ই খাও, আর ইন্‌ফিয়ুশন্ কোয়াশিয়া বা চিরতার জলের সঙ্গে আদত অসুদই (শাদা গুঁড়ো) খাও, উপকার দুয়েতেই সমান। ফল কথা, হাইপো-ফস্ফাইট্ অব লাইম্ যে, সব রকম কাশ রোগের একটী খুব ভাল অসুদ, তা যেন সকলেরই বেশ মনে থাকে।

মালিশের অসুদ।

য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বলেটাইল্ লিনিমেণ্ট)		১ ঔন্স
ক্যাজুপুট্ অইল (ভূর্জ্জপত্রের তেল)	...	১ ঔন্স
তার্পিন	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে "বিষ" বলিয়া লিখিয়া দেও। পিঠে, পাঁজরে আর বুকে রোজ ৩।৪ বার করিয়া মালিশ করিবে। এই মালিশ কাশির বড় অসুদ। এতে শ্লেষ্মা সরল হয়, আর কাশিরও খুব উপকার করে।

পিঠে, পাঁজরে আর বুকে ঐ রকম করিয়া মালিশ করা হইলে পর, তার উপর তার্পিণের সেক দিবে। তার্পিণের সেক কেমন করিয়া দিতে হয়, ১৭২র পাতে তা বলিছি।

রোগী যদি প্রাচীন আর খুব দুর্ব্বল হয়, তবে তার পথ্যেরও খুব ধরাধর করিতে হবে। মাংসের কাথ আর ১র নম্বর ব্রাণ্ডি দেওয়া চাই। মাংসের কাথ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, ১২৮—১৩১র পাতে তা বলিছি। মাংসের কাথের সঙ্গে এক এক বারে ২ ড্রাম্ করিয়া ব্রাণ্ডি দিবে।

২।৩ ঘণ্টা অন্তর এই রকম করিয়া মাংসের কাথ আর ব্রাণ্ডি দিবে। দিন কতক এই নিয়মে থাকিলেই রোগী বেশ চাঙ্গা হইয়া উঠিবে। তার পর বেশ খিদে হইলে আর গায়ে বল হইলে, এক বেলা করিয়া মাছের ঝোল আর ভাত খাইতে পারে। রোগীর যদি শোথ বা উদরী থাকে, তবে যে অসুদে প্রস্রাব বাড়ে, কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে সেই অসুদ দিলে খুব উপকার হয়। নাইট্রিক্ ঈথর, টিংচর ডিজিটেলিস আর টিংচর সিলি, এই তিনটী অসুদে প্রস্রাব খুব বাড়ে। প্রস্রাব বেশী হইলেই শোথ (ফুলো) কমিয়া যায়। যে অসুদ খাইলে প্রস্রাব বাড়ে, তাকে ডায়ুরেটিক্ বলে। ডায়ুরেটিক্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা মূত্রকারক। নাইট্রিক ঈথর, ডিজিটেলিস্ আর সিলি, এ তিনটাকেই ডায়ুরেটিক্ অর্থাৎ মূত্রকারক বলে। কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে এই তিনটী অসুদ যোগ করিয়া দিবে। নাইট্রিক্ ঈথরের মাত্রা আধ ড্রাম্ (৩০ মিনিম্)। টিংচর ডিজিটেলিসের মাত্রা ১০ মিনিম্। টিংচর সিলিরও মাত্রা ১০ মিনিম্। কেবল এই তিনটী অসুদই যে মূত্রকারক, তা নয়। মূত্রকারক অসুদ আরও আছে। সে সব এর পর বলিব। রোগীর গা আর হাত পা সর্ব্বদা গরমে রাখিবে। কোন রকমে গায়ে ঠাণ্ডা লাগাইতে দিবে না। রোগীর ঘর দিবা রাত্রি সমান গরম রাখিবে। শীতকালে বাইরে কোন খানে যাইতে হইলে, চাদর কি রুমাল দিয়া নাক মুখ ঢাকিয়া যাইবে। এতে হিমে বাতাসে তত অনিষ্ট করিতে পারিবে না।

ব্রংকাইটিস রোগের কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম। সম্প্রতি দুটী যমক ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা করিয়াছিলাম। এখানে সেই চিকিৎসার কথা কিছু বলিব।

ছেলে দুটীর বয়স সাত মাসের বেশী নয়। মড়ুঞ্চে পোআতির সন্তান, তাতে আবার যমক। 'এ ছেলে যে বাঁচিবে, এমন ভরসা কিছুতেই হয় না। ছেলে দুটী ভূমিষ্ঠ হইলে পর, বাড়ীর লোকে, পাড়ার লোকে, গাঁয়ের লোকে সকলেই এই কথা বলিতে লাগিল। তার পর যখন অনেক যত্নে, অনেক তদ্বিরে ছেলে দুটি তিন চারি মাসের হইল, এ বারে ছেলে দুটী বাঁচিল বলিয়া তখন তাদের মনে বিশ্বাস জন্মিল। অন্নপ্রাশন পর্য্যন্ত ছেলে দুটী এক রকম ভালই থাকিল। অন্নপ্রাশনের জাঁকজমকে ছেলে দুটীর যত্নের অনেক ত্রুটি হইল, অত্যাচারও অনেক হইল। অত্যাচারেই হোক্, আর যাতেই হোক্, দুটী ছেলেরই রক্ত-আমাশা হইল। রক্ত-আমাশাকে ইংরিজিতে ডিসেণ্টরি বলে। শুদ্ধ অত্যাচারেই যে রক্ত-আমাশা হয়, তা নয়। সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর্) আর স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্) যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার তেমনি একটী ফল। অন্নপ্রাশনের আগে ছেলে দুটী যে জায়গায় ছিল, সেখানে ম্যালেরিয়ার তত বাড়াবাড়ি ছিল না। যে গাঁয়ে তাদের অন্নপ্রাশন হইল, সে গাঁয়ে ম্যালেরিয়া-জ্বরের তখন দিশ্ পাশ্ ছিল না। ছেলে দুটির অসুখ ক্রমে বাড়িতে লাগিল দেখিয়া, তারা আগে যেখানে ছিল, তাদের মাতামহ

তাদের আবার সেখানে লইয়া গেলেন। ঠুকো ঠাকা অসুদ বিসুদে রক্ত-আমাশা সারিয়া গেল। কিন্তু তার বদলে দুটীরই একটু একটু কাশি হইল। এ কাশি কিছুই নয়, আপনিই সারিয়া যাবে, এতে কোনও ভয় নাই, এই রকম ভাবিয়া গৃহস্থ নিশ্চিন্ত থাকিলেন। আগে জ্বর ছিল না, কেবল একটু একটু কাশিত। এক দিন রাত্রে দুটী ছেলেরই গা গরম হইল আর কাশিও বাড়িল। তাদের মাতামহ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া, পর দিন সকালে এক জন ডাক্তারকে ডাকিয়া দেখাইলেন। এ শর্দ্দি-কাশি, এতে কোনও ভয় নাই, এর জন্যে চিন্তা করিবারও দরকার নাই, এই বলিয়া ডাক্তর ভরসা দিয়া গেলেন। ডাক্তর এ রকম ভরসা দিয়া গেলে কি গৃহস্থের মনে আর ভয় থাকে? কখ-নই না। কিন্তু ডাক্তরের ভরসা বা কথায় কি করে? ছেলে দুটীর ব্যামো ক্রমেই বৃদ্ধি হইতে লাগিল। যেমন গায়ের তাত, তেমনি কাশি। এ দেখে গৃহস্থ কি আর নিশ্চিন্ত থাকিতে পারেন? আমি তাঁদের বাড়ীতে আগে বরাবরি চিকিৎসা করিতাম। শেষে আমাকে তাঁরা ডাকিয়া পাঠাই-লেন। আমি গিয়া আগা গোড়া সব শুনিয়া তাঁদের বিস্তর ভর্ৎসনা করিলাম। হেলায় যে রোগ সারিত, তার জন্যে এখন প্রাণ পণ করিয়াও কাজ সিদ্ধি করিতে পারিব কি না, সন্দেহ। ব্যামো দুটীরই এক। তবে ছোটটির চেয়ে বড়-টীর ব্যামো বেশী, তফাত এই। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইলে যে রকম হাঁপ হয়, বুকের মধ্যে যে রকম শব্দ হয়, তাতে বুক-পরীক্ষা করিয়া দেখিবার বড় দরকার হয় না।

রোগীর কাছে গেলেই সে সব বেশ জানিতে পারা যায়। তবু প্রথমে এক বার পরীক্ষা করিতেই হয়। বগলে তাপ-মান-যন্ত্র দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটা দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। তার পর, ছেলের পিঠে কান দিয়া শুনিলাম। ছেলেরা প্রায়ই পিঠে বা বুকে ষ্টিথস্কোপ্ (বুক-পরীক্ষা করার যন্ত্র) বসাইতে দেয় না—গায়ে লাগে বলিয়া অস্থির হয়। এই জন্যে, তাদের বুকে বা পিঠে কান দিয়া শুনাই ভাল। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইলে বুকের মধ্যে যে রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এখানেও ঠিক সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইলাম। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের কথা ২০৩—২০৫র পাতে বলিছি। এখানে যে সব অসুদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) কার্ব্বণেট্ অব য়্যামোনিয়া		...	২ গ্রেন্
বাইনম্ ইপেকা	...	...	২০ মিনিম্
টিংচর সিলি	...	...	৪ মিনিম্
টিংচর সিংকোনি কো	...	...	১০ মিনিম্
টিংচর কার্ডেমম্ কো	...	...	১০ মিনিম্
সিরপ্ জিঞ্জর	...	...	২০ মিনিম্
ইন্‌ফিয়ুশন্ সেনিগা	...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। ৬। ৭ মাসের ছেলেকে যে মাত্রা দেওয়া যায়, এখানেও সেই মাত্রা লিখিয়া দিলাম। এক বার খাইবার মত অসুদকে অসুদের মাত্রা বলে। অসু-

দের পূর মাত্রা জানা থাকিলে, বয়স বুঝে অস্সুদের মাত্রা ঠিক্ করা শক্ত নয়। ২০ বছর বয়সের রোগীকে অস্সুদ পূর মাত্রায় দেওয়া যায়। ২০ বছরের উপর ৬০ বছর পর্য্যন্ত সেই এক মাত্রা। তবেই মোটামুটি ধর, বিশ বছরে পূর মাত্রা। দশ বছরে অর্দ্ধেক মাত্রা। পাঁচ বছরে সিকি মাত্রা। এক বছরে বিশ ভাগের এক ভাগ। ৬ মাসের ছেলেকে তার অর্দ্ধেক। ৬ মাসের ছেলেকে যে মাত্রা দিবে, এক মাসের ছেলেকে তার ৬ ভাগের এক ভাগ দিবে। দৃষ্টান্ত দিয়া আর এক বার ভাল করিয়া বুঝাইয়া দিই। মনে কর নাইট্রিক্ ঈথরের পূর মাত্রা ৩০ মিনিম্ (আধ ড্রাম্)। জোআন রোগীকে (যার বয়স ২০ বছরের কম নয়) এই পূর মাত্রা দিবে। ১৫। ১৬ বছরের ছেলেকে ২০ মিনিম্ দিবে। ১০ বছরের ছেলেকে ১৫ মিনিম্ দিবে। ৫ বছরের ছেলেকে ৭॥ মিনিম্ দিবে। এক বছরের ছেলেকে ১॥ মিনিম্ দিবে। ৬ মাসের ছেলেকে পৌনে এক মিনিম্ দিবে। যদি বল, পৌনে এক মিনিম্ কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? তা ঠিক্ করা শক্ত নয়। ১২ মাত্রা অস্সুদে ৯ মিনিম্ দিলেই এক এক মাত্রায় পৌনে এক মিনিম্ করিয়া থাকিবে। সব জায়গায় এই রকম হিসাব করিয়া অস্সুদ দিবে। তা হইলে রোগীর যেমন বয়স, অস্সুদের মাত্রাও ঠিক্ তেমনি হবে। অস্সুদের পূর মাত্রা যদি তোমার জানা থাকে, কত বয়সে পূর মাত্রা দিতে হয় জান, আর বয়স বুঝিয়া কেমন করিয়া মাত্রার ইতর বিশেষ করিতে হয় মনে রাখ, তবে তোমার কাছে অস্সুদের মাত্রার কোনও গোল হইতে পারে না। এর আর

একটা মোটা সংকেত বলিয়া দিই। রোগীর বয়স যা হবে, ২০ দিয়া তাকে ভাগ দিবে। বয়স বিশ বছর বা বিশ বছ-রের বেশী হইলে তাকে ২০ দিয়া ভাগ দিবার দরকার নাই। কেন না, বিশ বছরেও যে মাত্রা, বিশ বচরের উপরেও সেই মাত্রা (পূর মাত্রা)। ভাগ দিয়া যে অঙ্ক পাবে, সেই অঙ্ক দিয়া পূর মাত্রাকে গুণ করিবে। গুণ করিয়া যে অঙ্ক পাবে, সেই অঙ্ক তোমার অসুদের মাত্রা জানিবে। মনে কর, রোগীর বয়স ১৫ বছর। আর তাকে যে অসুদ দিবে, সে অসুদের পূর মাত্রা ৩০ মিনিম্ বা ৩০ গ্রেন্। এখন এই ১৫কে ২০ দিয়া ভাগ দেও। ভাগ দিলে ৷৷৷ অঙ্ক পাবে। এই অঙ্ককে ৪ ভাগের ৩ ভাগ বা পৌনে এক বলে। এই ৷৷৷ দিয়া ৩০কে গুণ কর। গুণ করিলে ২২৷৷ পাবে। এই ২২৷৷ মিনিম বা ২২৷৷ গ্রেন্ ১৫ বছরের ছেলের অসুদের মাত্রা জানিবে। অসুদের মাত্রা ঠিক্ করিবার হিসাব এক রকম মোটামুটি বলিলাম।

২০৯—২১০র পাতে বলিছি যে, বাইনম্ ইপেকা খাওয়া-ইয়া বমি করাণই, ব্রংকাইটিস্ রোগ থেকে ছেলেদের বাঁচাই-বার এক মাত্র উপায়। এখানেও সে কথাটা মনে রাখা চাই। বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করাইলে কি উপ-কার হয়, ২০৯—২১০র পাতে তাও বেশ করিয়া বলিছি। বাই-নম্ ইপেকা কখন্ খাওয়াইতে হয়, ২০৯র পাতে বলিছি।

(২) য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বলেটাইল লিনিমেণ্ট)			২ ড্রাম্
অলিব অইল	...	...	৬ ড্রাম্
ক্যাজুপটি অইল	...	...	১ ঔন্স

তার্পিণ ... ... ১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে "বিষ" বলিয়া লিখিয়া দেও। পিঠে আর পাঁজরে রোজ ৩। ৪ বার করিয়া মালিশ করিবে। মালিশ যত বেশী করিতে পার, ততই ভাল।

(৩) প্রতি বার মালিশ করার পর, পিঠে আর পাঁজরে সেঁয়ে সেঁয়ে তার্পিণের সেক দিবে। কতকক্ষণ ধরিয়া সেক দিবে আর কি রকম করিয়া সেক দিবে, ১৭২—১৭৩র পাতে তা বলিছি।

(৪) কুইনাইন্ ... ... ২৪ গ্রেন্

এতে ১২ মোড়া অসুদ তয়ের কর।

রোজ তিন মোড়া করিয়া অসুদ খাওয়াইবে। তাপমান-যন্ত্র দিয়া গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। গায়ের তাত যে একটু কমিবে—তা এক চুল কমিলেও—এক মোড়া কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। তার পর, গায়ের তাত বাড়িবার আগে আর দু মোড়া অসুদ দিবে। এই নিয়মে অসুদ খাওয়াইবে, আর চূণের জল দিয়া দুধ (৪ ভাগ দুধ আর ১ ভাগ চূণের জল) আর মাংসের ক্বাথ দিবে। হাইপো-ফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপ্ আর একটু জল দিয়া গুলিয়া খাওয়াইলে ছেলেরা কুইনাইন্ বেশ খায়। এতে দুটী উপকার। এক, কুইনাইন্ সহজেই খাওয়ান যায়। আর, হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ কাশির একটী ভাল অসুদ। এই জন্যে, ছেলেদের জ্বর-কাশিতে (জ্বরের সঙ্গে কাশি থাকিলে) হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপের সঙ্গে কুইনাইন্ অমনি

করিয়া দিতে কখনও ভুলিবে না। ছেলে দুটীর অসুদের আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিলাম। এই ব্যবস্থাতেই ছেলে দুটীর ব্যামো সারিয়া গেল।

ব্রংকাইটিসের কথা শেষ করিয়া এ দুটী ছেলের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার কথা এখানে কেন বলিলাম, তা এখনও বলি নাই। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা যাঁদের কাছে চিকিৎসা শিখিবেন, যাঁদের দেখে শিখিবেন; যাঁদের কাছে শুনে শিখিবেন; আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে যে অসুদ সময়ে দিলে খুব শক্ত রোগ থেকেও রোগীকে বাঁচান যায়, সে অসুদকে তাঁরা বাঘ জ্ঞান করেন। তাঁরা যে অসুদকে বাঘ জ্ঞান করিয়া ডরান্, তাঁদের শিষ্যরা (পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা) ভয়ে সে অসুদের নামও করেন না। এই পরিচয়টী দিবার জন্যে এ দুটী ছেলের চিকিৎসার কথা এখানে বলিলাম।—যে দিন ছেলে দুটীর অসুদ আর পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম, সেই দিন সন্ধ্যার সময় আর দু জন ডাক্তর আসিয়া উপস্থিত হইলেন। এঁরা দু জনেই খুব প্রাচীন ডাক্তর। কেউ ২৫ বছর, কেউ বা ৩০ বছর চিকিৎসা করিতেছেন। তাঁরা দু জনেই ছেলে দুটীকে দেখিয়া আসিলেন। দেখিয়া আসিয়া, ছেলে দুটীকে কি কি অসুদ দিইছি, জিজ্ঞাসা করিলেন। এক এক করিয়া অসুদ গুলির নাম শুনিয়া বলিলেন, এর চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। কিন্তু য[illegible]নিলেন যে, গায়ের তাত একটু কমিলেও কুইনাইন্ দিবার [illegible] করা হইয়াছে, তখন তাঁরা একবারে অবাক্ হইলেন। [illegible]পিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্!!!

এ ত আমরা কখনও শুনি নাই! ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দিলে কি উপকার হবে? কুইনাইনে অপকার বৈ উপকার হবে না। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ ব্যবস্থা করিছি শুনিয়া তাঁরা যেমন অবাক্ হইলেন, তাঁদের মুখে এ রকম কথা শুনিয়া আমি তার চেয়ে বেশী অবাক্ হইলাম। যাঁরা ২৫ বছর চিকিৎসা করিতেছেন, ভাল চিকিৎসক বলিয়া যাঁদের সকলেই ভক্তি করে, তাঁরা বলিলেন ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কখনও কুইনাইন্ দিই নাই, দিতে শুনিও নাই। কুইনাইন্ দিলে উপকার না হইয়া অপকারই হইবার কথা। এতে অবাক্ হইব না ত আর কিসে অবাক্ হইব? আমার উপর গৃহস্থের বরাবরি ভারি বিশ্বাস। এই জন্যে, চিকিৎসায় যে আমি একটা ভারি ভুল করিছি, তাঁরা তা ভাবিলেন না। তবে এত বড়, এত বড় দু জন ডাক্তর যখন বলিতেছেন, এ রোগে কুইনাইন্ ব্যবস্থা নয়, তখন আমি তা কেমন করিয়া ব্যবস্থা করিলাম? এই ভাবিয়া তাঁরা যেন একটু কুণ্ঠিত হইলেন। ডাক্তর মহাশয়দের ও রকম কথার আর আমি কি উত্তর দিব? তখন চুপ করিয়া থাকিলাম। তাঁরা চলিয়া গেলে, ছেলে দুটীর মাতামহ—তিনি আমাদের দেশের মধ্যে এক জন অতি সুবুদ্ধি লোক—আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন "আপনি যেমন ব্যবস্থা করিয়াছেন, সেই মত কুইনাইন্ দেওয়া যাবে কি না? যখন এমন দু জন বড় বড় ডাক্তর কুইনাইন্ দিতে নিষেধ করিয়া গেলেন, তখন আজ্ কাল্ দু দিন কুইনাইন্ না দিয়া দেখুন, কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি না? কুইনাইন্ দিলে উপকার হয় কি

অপকার হয়, আজ্ই সব বুঝিতে পারিলেন। আমার এই কথায় তিনি সন্তুষ্ট হইলেন। সন্ধ্যার আগেই কোন দিন বৈকালেই জ্বরের প্রকোপ হয়। সেই জ্বর সমস্ত রাত্রি ভোগ করে। কাজেই, রাত্রে ছেলে দুটী (বিশেষ বড়টা) যেমন কাশে, তেম্নি হাঁপায়। পিপাসায় ডা-ডা করিতে থাকে, আর তেম্নি অস্থির হয়। সে রাত্রি কোন রকমে ঐ রকম করিয়া কাটিল। ভোর বেলা উরি মধ্যে একটু স্থির হইল। কাশিও কিছু কমিল, হাঁপও একটু কমিল। পিপাসায়ও তত ডা-ডা করিতে লাগিল না। তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) বগলে দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগে উঠিল। রাত্রে গায়ের তাত ১০৫ ছিল। সকাল বেলা ছেলে দুটী অনেক সুস্থ থাকিল। অনেক সুস্থ বলিতেছি— রাত্রের সঙ্গে তুলনা করিয়া। বেলা ১০টার সময় গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পারা ১০৩র দাগ ছাড়াইয়া ছোট একটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। বেলা দুটা পর্য্যন্ত ছেলে দুটী উরি মধ্যে একটু সুস্থ থাকিল। তার পর থেকেই কাশিও একটু বাড়িল, হাঁপও একটু বাড়িল। গায়ের তাতও একটু একটু করিয়া বাড়িতে লাগিল। সন্ধ্যার পর ব্যামোর ভারি বাড়াবাড়ি হইল। গায়ের যেমন তাত, তেম্নি কাশি, তেম্নি হাঁপ, আর তেম্নি পিপাসা। কাল্ রাত্রি ত এক রকম কাটিয়া গিয়াছে। আজ্ রাত্রি কাটে, এমন বোধ হয় না। সকাল বেলা একটু ভাল ছিল। তখন কুইনাইন্ দিলে বোধ করি ব্যামোটা এত বাড়িয়া উঠিতে পারিত না। আজ্ রাত্রে ছেলে দুটী যাতে রক্ষা পায়, আপনাকে তা করিতেই হবে।

এই বলিয়া গৃহস্থ অনেক আর্ত্তনাদ করিতে লাগিলেন। তাঁদের অনেক করিয়া বুঝাইলাম, আর বেশী করিয়া মালিশ করিতে বলিলাম। মালিশ করিতে করিতে হাঁপও কমিবে, কাশিও কমিবে। গায়ের ভারি তাত। এই জন্যে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চরের সঙ্গে টিংচর্ য়্যাকোনাইট্ খাইতে দিলাম। ৯৯র পাতে বলিছি, য়্যাকোনাইট্ (কাঠবিষ) খাওয়াইলে গায়ের তাত কমে। ৪। ৫ ঔন্স জলে এক ফোটা টিংচর্ য়্যাকোনাইট্ দিয়া, ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক (ছোট চামচের এক চামচ) করিয়া সেই জল এক বছরের ছেলেকে ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইতে হয়। ছেলে দুটার বয়স ৬। ৭ মাসের বেশী নয়। এই জন্যে, য়্যাকোনাইট্ মিক্শ্চর্ আধ ঝিনুক করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম। রাত্রে আর বিশেষ কোন উপসর্গ হইল না। কোন রকমে রাত্রি কাটিল। সকাল বেলা গায়ের তাত, হাঁপ আর কাশি একটু কমিল বটে, কিন্তু আগের দিন যেমন কমিছিল, তেমন নয়। তাপমান-যন্ত্র বগলে দিয়া দেখিলাম, পারা ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া ছোট দুটী দাগ পর্য্যন্ত উঠিল। রাত্রে গায়ের তাত ১০৫রও উপর ছিল। আজ্ কুইনাইন্ না দিলে আর রক্ষা নাই। রাত্রেই বড় ছেলেটী মারা পড়িবে। কুইনাইন্ দেওয়া দরকার কি না, আমি আর পরীক্ষা করিয়া দেখিতে চাই না। জ্বর যখন কম থাকে, কাশি আর হাঁপও একটু কমে। ছেলে দুটীও উরি মধ্যে একটু সুস্থ থাকে। আবার জ্বর যেমন বাড়ে, কাশি আর হাঁপও তেমনি বাড়ে, ছেলে দুটীও তেমনি অস্থির হয়। যত রকম উপসর্গ আছে, তখন

সব আসিয়া উপস্থিত হয়। এতে জ্বর খাটো করিতে পারিলেই ত ছেলে দুটীর জীবন রক্ষা হইতে পারে। আমরা সামান্য বুদ্ধিতেই এ বেশ বুঝিতে পারিতেছি। তবে অত বড় দু জন প্রাচীন ডাক্তর, এ রোগে কুইনাইন্ দেওয়া নিষেধ. কেমন করিয়া বলিয়া গেলেন? তাঁরা বুঝি কখনও রোগীর কাছে বসিয়া রোগীর অবস্থা কখন্ কি রকম হয়, বেশ ঠাউরে দেখেন নাই। দেখিলে এ কথা কখনও বলিতেন না। যা হোক্, সে কথায় আর কাজ নাই। আপনি আগে যেমন ব্যবস্থা করিছিলেন, আমরা এখন সেই নিয়মেই কুইনাইন্ খাওয়াই। গায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই এক বার দিব। আর গায়ের তাত বাড়িবার আগে আর দু বার দিব। ছেলে দুটীর মাতামহের এই কথায় আমি বড়ই সন্তুষ্ট হইলাম। অত বড় দু জন ডাক্তর ২৫ বছর চিকিৎসা করিয়া ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসে কুইনাইন্ দিতে নাই—কুইনাইন্ দিলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়—স্থির করিয়া রাখিয়াছেন! আর ইনি এক দিন এক রাত্তি ছেলে দুটীর অবস্থা বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিয়া ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসেও যে কুইনাইন্ দেওয়া ভারি দরকার, তা বেশ বুঝিতে পারিলেন! এর চেয়ে আশ্চর্য্যের বিষয় আর কি হইতে পারে? তার পর বলি। সকাল বেলা (৭টার সময়) গায়ের তাত একটু কমিতেই এক মোড়া কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। বেলা দশটার সময় আর এক মোড়া দিলাম। তার পর বেলা একটার সময় আবার এক মোড়া দিলাম। এখন এক বার গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০২র

দাগে উঠিল। গায়ের তাত এত কম আর কোনও দিন হয় নাই। গায়ের তাত যতক্ষণ কম থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর আধ মোড়া করিয়া কুইনাইন খাওয়াইতে বলিলাম। অন্য দিন বেলা সাড়ে তিনটা চারিটার মধ্যেই জ্বর আসে। আজ এখনও পর্য্যন্ত জ্বর আসে নাই। রাত্রি প্রায় আটটা বাজে। মেয়েরা বড়ই খুসী। কুইনাইনের উপর তাদের আজ ভারি ভক্তি হইয়াছে। এমন জ্বরের উপর কুইনাইন্ দিলে যে উপকার হয়, তা আমরা জানিতাম না। আমাদের ডাক্তারেরাই জানেন না, তা আমরা কেমন করিয়া জানিব? ছেলের মাতামহের মুখে এই কথা শুনিয়া আমি ভারি সুখী হইলাম। তাঁকে বলিলাম, কুইনাইনের আর একটী বিশেষ গুণের পরিচয় এখনও পান নাই। এই যে ছেলে দুটীকে রোজই সকালে বাইনম্ ইপেকা খাওয়াইয়া বমি করা'ন্। বমি করিলেই খানিক শ্লেষ্মা উঠিয়া যায়। শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলেই বুকের মধ্যে ঘড়ঘড়ানি তখনই কমে। খানিক পরে আবার যে ঘড়ঘড়ানি, সেই ঘড়ঘড়ানি আসিয়া উপস্থিত হয়। শ্লেষ্মা উঠিয়া গেলে আবার শ্লেষ্মা জমে। শ্লেষ্মা কোথা থেকে জমে? ফুস্ফুসের নলিগুলির মধ্যে শ্লেষ্মা জন্মে। যত বার বমি করাইয়া শ্লেষ্মা উঠাইয়া ফেলিবেন, শ্লেষ্মা তত বার জন্মিবে। কাজেই, শ্লেষ্মা না জন্মিতে পারে, এমন উপায় না করিতে পারিলে তাদের নিস্তার নাই। কত বমি করিবে? কত শ্লেষ্মা তুলিবে? এতে তারা কত দিন সবল থাকিতে পারে? এ রকম ব্যবস্থায় শিশু শীঘ্রই কাবু হইয়া পড়ে। তবে জ্বর কমিয়া গেলে, ভাল রকম পথ্য পাইলে একটু

বলাধান হয়। বলাধান হইলে শ্লেষ্মা আর তেমন জন্মে না—ক্রমে কম হয়। অনেক দিন নৈলে আর এ ঘটে না। আর এ রকম ব্যবস্থায় এস্পার, নয় ওস্পার হয়। ওস্পারই বেশী হয়। না হইবে কেন? জ্বরের উপর জ্বর, কাশি, হাঁপ—এর উপর আবার রোজ বমি! ছোট ছেলে (জোআনেরাই ব. নয় কেন) এ রকম প্রহার ক দিন সৈতে পারে? কুইনাইন্ এই জ্বর খাটো করিয়া, আর তেমন শ্লেষ্মা জন্মিতে না দিয়া যথার্থই শিশুর জীবন রক্ষা করে। কুইনাইন্ যে কেবল জ্বরই খাটো করে তা নয়, শ্লেষ্মার সৃষ্টিও নিবারণ করে। আমার মুখে কুইনাইনের এই সব গুণ শুনিয়া তিনি বলিলেন, তবে কুইনাইনের চেয়ে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের ভাল অসুদ আর নাই। এমন অসুদ থাকিতে আবার ভাবনা? আজ্ ছেলে দুটা যেমন আছে দেখিতেছি, এতে বোধ হয় ৫। ৭ দিনের মধ্যেই আরাম হইতে পারিবে।

কুইনাইন্ যে জ্বর খাটো করে আর শ্লেষ্মা জন্মিতে দেয় না, অর্থাৎ শ্লেষ্মার সৃষ্টি নিবারণ করে, ব্রংকাইটিস্ রোগের চিকিৎসায় তা কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমারও অপযশ, রোগীরও সর্ব্বনাশ। পুরাণ ব্রংকাইটিস্ রোগে বুড়োরা অত গয়ের তুলে তুলেই ত কাবু হইয়া পড়ে। এই রকম করিয়া যারা এক বারে অস্থি-চর্ম্ম-সার হইয়া পড়ে, লোকে তাদেরই যক্ষ্মা রোগী বলে। এমন যে যক্ষ্মা-রোগ, এও কুইনাইন্, খাওয়াইলে নিবারণ হয়। যে ডাক্তর সময়ে কুইনাইন্, হাইপোফস্ফাইট্ অক্লাইম্ আর ভাল আহার (পথ্য) ব্যবস্থা করেন, তাঁর রোগীর কখনও যক্ষ্মা-কাশ হইতে পারে না।

হাইপোফস্ফ.ইট্ অব্ লাইম্ কাশ-রোগের যেমন অসুদ, কড্‌লিবর্ অইলও তেম্‌নি অসুদ। যে রকম কাশ-রোগই কেন হোক্ না, পুরাণ হইলেই তাতে কড্‌লিবর্ অইল্ ব্যবস্থা করা যায়। কড্‌লিবর্ অইল্ দু দিন পাঁচ দিন খাইলে উপকার হয় না। নিয়ম করিয়া অনেক দিন খাইতে হয়, তবে উপকার হয়। কড্‌লিবর্ অইল্ খাইলে খিদে বাড়ে আর শরীর পুষ্টি হয়। তবেই, যে সব রোগে শরীর পাক পাইয়া যায়, রোগী অস্থি চর্ম্ম সার হয়, সেই সব রোগেই কড্‌লিবর্ খাইলে উপকার হয়। আর সেই সব রোগেই কড্‌লিবর্ অইল্ ব্যবস্থা করা উচিত। এই এই রোগে কড্‌লিবর্ দিবে, এমন কোনও নিয়ম ধরা নাই। যে রোগে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই রোগেই কড্‌লিবর অইল্ ব্যবস্থা করিবে। কড্‌লিবর্ অইল্ খাইলে শরীর পুষ্টি হয়, মেয়েরাও জানে। এই জন্যে, ছেলে পিলে রোগা হইলে তারা ডাক্তরকে আর জিজ্ঞাসা করে না। আপনারাই কড্‌লিবর্ অইল্ ব্যবস্থা করে। কড্‌লিবর্ অইল্ জিনিষটা কি? কড্ নামে এক রকম মাছ আছে। সে মাছ সমুদ্রে থাকে। সেই মাছের লিবর্ অর্থাৎ মেটে থেকে এক রকম তেল তয়ের হয়। সেই তেলকে ইংরিজিতে কড্‌লিবর্ অইল্ বলে। কড্‌লিবর্ অইল্ সকলের সয় না। ৫ ফোটা খাইলেও কারো কারো পেটের অসুখ করে। আবার এক বারে এক কাঁচ্চা খাইয়াও অনেকে বেশ পরিপাক করে। এই জন্যে, প্রথমেই এক বারে অনেক খানি না খাইয়া ক্রমে ক্রমে, সৈয়ে সৈয়ে খাওয়া ভাল। কেন না, পরিপাক করিতে না পারিলে, গুণ না

হইয়া অগুণই বেশী হয়। যাদের পেটের ব্যামো আছে, কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ তাদের প্রায়ই সয় না। আবার কারো কারো পেটের ব্যামো কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাইয়াই সারিয়া যায়। যাই হোক্‌, কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ প্রথমে অল্প করিয়া খাইতে অভ্যাস করাই ভাল। ছেলেদের প্রথম প্রথম ২। ১ ফোটা করিয়া দিবে। তার পর ২। ১ ফোটা করিয়া ক্রমে বাড়াইয়া দিবে। জোআন রোগীরা ১০ ফোটা থেকে আরম্ভ করিয়া এ বেলা এক কাঁচ্চা, ও বেলা এক কাঁচ্চা খাইতে পারে। বিশ্রী আঁশ্‌টে গন্ধ বলিয়া রোগীরা সহজে কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাইতে চায় না। খুব গরম দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে, বড় একটা আঁশ্‌টে গন্ধ জানিতে পারা যায় না। কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাইবার আগে একটু দারুচিনি চিবাইলে ওর গন্ধ জানা যায় না। আহারের ঠিক্‌ পরেই কড্‌লিবর্‌ অইল্‌ খাওয়া ভাল। তা হইলে আহারের সঙ্গেই ও পরিপাক হইয়া যায়। পেটের অসুখ করিতে পারে না। কেউ কেউ, রাত্রে শুইবার ঠিক্‌ আগে ভিন্ন অন্য সময় কড্‌-লিবর্‌ অইল্‌ খাইয়া সহ্য করিতে পারে না।

নির্ভাজ খাটি নারিকেল-তেল আমাদের দেশি কড্‌লিবর্‌ অইল্‌। নারিকেল-তেলের গুণ আমি অনেক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিছি। এ কথা এর পর বলিব।

ব্রংকাইটিসের কথা সারা হইল। এখন নিয়ুমোনিয়ার কথা বলি।

২। **নিয়ুমোনিয়া**——নিয়ুমোনিয়া ভারি শক্ত রোগ। ফুস্কোর নলি গুলির প্রদাহকে যেমন ব্রংকাই-

টিস্ বলে, ফুস্কোর নিজের প্রদাহকে তেম্‌নি নিয়ুমোনিয়া বা নিয়ুমোনাইটিস্ বলে। ডাক্তারেরা নিয়ুমোনিয়া নামই ভাল বাসেন। নিয়ুমোনাইটিস্ প্রায় বলেন না। এর আর একটী নাম আছে। সে নামটা পল্‌মোনোইটিস্। নিয়ুমোনিয়া, নিয়ুমোনাইটিস্ আর পল্‌মোনাইটিস্, এ রোগের এই তিনটি নাম। এর মধ্যে নিয়ুমোনিয়া নামটাই চলিত। ব্রংকাইটিস্‌কে ভাল বাঙ্গালায় যেমন বায়ুনলিভুজপ্রদাহ বলে, নিয়ুমোনিয়াকে তেম্‌নি ফুস্ফুস-প্রদাহ বলা যায়। ফুস্কোর ভাল কথা ফুস্ফুস। প্রদাহ বলিলে কি বুঝায় ১৯৯—২০০র পাতে তা বলিছি। বায়ুনলিভুজপ্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্ বলা সোজা। তেম্‌নি ফুস্ফুসপ্রদাহের চেয়ে নিয়ুমোনিয়া বলা সোজা।

ব্রংকাইটিস্ যেমন তিন রকম—(১) নূতন ব্রংকাইটিস্, (২) পুরাণ ব্রংকাইটিস্, আর (৩) প্লাষ্টিক্ ব্রংকাইটিস্, নিয়ুমোনিয়াও তেম্‌নি তিন রকম—(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া, (২) পুরাণ নিয়ুমোনিয়া, আর (৩) ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া। এই তিন রকম নিয়ুমোনিয়ার কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

(১) নূতন নিয়ুমোনিয়া—কারণ। সাধারণের বিশ্বাস, হিম বাত ভোগ করিলে নিয়ুমোনিয়া হয়। ফল, কিন্তু তা নয়। শরীর সুস্থ আর খুব সবল থাকিতে হিম বাঁত ভোগে নিয়ুমোনিয়া হয় না। তবে যারা দুর্ব্বল আর রোগা, তাদের পক্ষে হিম বাত ভোগ বা বৃষ্টিতে ভেজা সোজা নয়। ও রকম অত্যাচার তাদের কখনও সয় না। নিশ্চয় নিয়ুমোনিয়া

হয়। ছোট ছেলেদের, আর ৬০ বছরের উপর যাদের বয়স হইয়াছে, তাদের নিয়ুমোনিয়া যত হয়, জোআন বয়সে তত হয় না। এ ছাড়া, ছোট ছেলে আর বুড়োদের নিয়ুমোনিয়ায় ভয় বেশী। ছোট ছেলে আর বুড়োরাই এ রোগে বেশী মরে। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের এ রোগ বেশী হয়। পুরুষদের বাহিরেই বেশী যাতায়াত বা কাজকর্ম্ম করিতে হয়, সেই জন্যে তাদের হিম বাত ভোগও বেশী করিতে হয়, আর সেই জন্যেই তাদের এ রোগ বেশী হয়। কখন কখন বসন্ত আর ওলাউঠার মত নিয়ুমোনিয়ারও মরক হয়। মরককে ইংরিজিতে এপিডেমিক্ বলে। ১০। ২০ খান গাঁ লইয়া যদি কোন একটা রোগের বাড়াবাড়ি দেখা যায়, তবে সেই রকম বাড়াবাড়িকে সেই রোগের মরক বা এপিডেমিক্ বলে— যেমন ম্যালেরিয়া-জ্বর, বসন্ত আর ওলাউঠার মরক। খুব গরম কিম্বা খুব ঠাণ্ডা বাতাস ফুস্ফোর মধ্যে গেলেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। হাম-জ্বর, শুদু জ্বর, বসন্ত (এলো-বসন্ত), নূতন (তরুণ) বাত—নিয়ুমোনিয়া এই সব রোগের ও আর আর অনেক তরুণ রোগের প্রায়ই উপসর্গ হইয়া থাকে। কোন কারণে রক্তের দোষ ঘটিলেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের রোগ অর্থাৎ হার্ট-ডিজীজ্ হইলে (হৃৎপিণ্ড কাকে বলে, ৮৭—৮৮র পাতে তা বলিছি) নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) হইলে নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। আর ফুস্ফোর কোন কোন পুরাণ রোগেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। সব রোগের, বিশেষ জ্বরের সন্নিপাত অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। যার এক বার

নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে, তার ধাত্ (ধাতু) এমন খারাপ হইয়া যায় যে, সামান্য অত্যাচারেও তার আবার নিয়ুমোনিয়া হয়। ফুস্কোয় কোন রকম ঘা ঘো লাগিলে, বুকে, পিঠে বা পাঁজরে, খুব জোরে গুতো লাগিলে, কিম্বা খাইবার সময় বায়ুনলির ভিতর দৈবাৎ খাবার জিনিষ গেলে নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। বায়ুনলির ভিতর অন্য কোন জিনিষ গেলেও নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। এই সব নলি দিয়া ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যায় বলিয়া এদের বায়ুনলি বলে। বাতাসের ভাল কথা বায়ু।

লক্ষণ—নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে কখন কখন মাথা-ধরা আর খিদে কম ছাড়া বিশেষ কোন অসুখ হয় না। কিন্তু সচরাচর এ রোগ হইবার আগে, কোন খানে কিছু নাই, হঠাৎ ভারি কম্প হয়। এই কম্পই এ রোগের পূর্ব্ব-লক্ষণ। কেন না, কম্প-জ্বর (সবিরাম-জ্বর অর্থাৎ ইণ্টর্ম্মি-টেণ্ট ফীবর্), আর পায়ীমিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম স্পষ্ট কম্প প্রায় দেখা যায় না। পায়ীমিয়া এক রকম ভয়ানক রোগ। খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে এই রোগ হয়। এ সব কথা পরে বলিব। ছোট ছেলেদের কম্প না হইয়া তার বদলে তড়্কা হইতে পারে। অন্য অন্য রোগেও ছেলেদের ঠিক্ এই রকম ঘটে, অর্থাৎ কম্প না হইয়া তার বদলে তড়্কা হয়। ছেলেদের কম্প-জ্বরের কথা বলিবার সময় এ কথা বলিছি। নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে যে কম্প হয়, সে কম্প কেবল সেই এক বারই হয়, আর হয় না। কিন্তু আর যে সব রোগে কম্প

হইয়া থাকে, সে কম্প অনেক বার হয়। এই জন্যে, এক বার ভারি রকম কম্প হইয়া বন্ধ হইলেই ঠিক্ করিবে যে, এ কম্প আর কোনও রোগের নয়, নিয়ুমোনিয়ার। নিয়ু-মোনিয়ার এ একটী বেশ চিহ্ন। ছেলেদের ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের পর যে নিয়ুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে নিয়ু-মোনিয়াতে এ রকম কম্প প্রায়ই হয় না। নিয়ুমোনিয়াতে গায়ের তাত খুব শীঘ্র বাড়ে। এ দিকে কম্প হইতেছে, ও দিকে গায়ের তাত বাড়িতেছে। বগলে তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিলে পারা ১০৩র দাগে বা তারও উপরে উঠে। কখন কখন ১০৫র দাগও ছাড়াইয়া উঠে। সচরাচর ১০৪র দাগ ছাড়াইয়া উঠে না। যত দিন ব্যামো থাকে, গায়ের এই রকম তাত বরাবরি সমান থাকে। কেবল সকাল বেলা আর সন্ধ্যা বেলা উভয় মধ্যে একটু ইতর-বিশেষ হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোন রোগে গায়ের তাত এ রকম দেখা যায় না। এই জন্যে, এটাও নিয়ুমোনিয়ার একটী বেশ চিহ্ন। রোগের শেষ দশায় গায়ের এই তাত কখন কখন সহজ গায়ের চেয়েও কম হইয়া যায়। নিয়ু-মোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে সকাল বেলা গায়ের তাত বেশী থাকে না। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গায়ের তাত সকাল বেলাও কমে না—এ এক রকম জানাই আছে। এ রোগে বেশী ঘাম হয় না। রোগের প্রায় সূত্রপাতেই পাঁজরে ব্যথা হয়। পাঁজরে ব্যথাকে আমাদের বৈদ্যরা পার্শ্ববেদনা বলেন। কাশিলে এই ব্যথা বেশ জানিতে পারা যায়। কোন কোন রোগীর এ রকম পার্শ্ববেদনা হয় না। সামান্য একটু পুরি-

সির জন্যেই এ রকম পার্শ্ববেদনা হয়। যে জায়গায় প্লুরিসি হয়, সচরাচর ঠিক্ সেই জায়গাতেই রোগী ঐ রকম ব্যথা টের পায়। বুকের মধ্যের খোল আর ফুস্ফো যে একটা সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দ্দার প্রদাহকে প্লুরিসি বলে। এর পরই প্লুরিসির কথা বলিব। কম্প হওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই এ রোগের আর আর সব লক্ষণ প্রকাশ পায়। মুখ রাঙা হয়, প্রায়ই একটা গাল বেশী রাঙা হয়। স্পষ্ট রাঙা নয়, ছেয়ে ছেয়ে রাঙা। রোগী গৌরবর্ণ হইলে তার মুখের এ রকম রং বেশ মালুম হয়। রোগী ভারি কাহিল হইয়া পড়ে, আর খিদে এক বারে যায়। নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ে, আর ভাসা ভাসা হয়। প্রতি মিনিটে নিশ্বাস ৪০ বার, ৫০ বার, ৬০ বার, এমন কি ৭০ বারও পড়ে। প্রতি মিনিটে নিশ্বাস কত বার পড়ে, ঘড়ি ধরিয়া গুণিতে হয়। সহজ মানুষের নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ১৮ বার পড়ে। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে। নাড়ীর বেগের সঙ্গে আর নিশ্বাসের সঙ্গে একটী সম্বন্ধ আছে। নিয়ুমোনিয়া রোগে সেই সম্বন্ধ খুব তফাত হইয়া যায়। সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে, আর নিশ্বাস ১৮ বার পড়ে। নিয়ুমোনিয়ায় দেখ তার কত তফাত হয়! প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ থেকে ১২০ বার পড়ে, আর নিশ্বাস এমন কি ৭০ বারও পড়ে। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়াতে নিশ্বাস কত ঘন পড়ে। জ্বরের রোগীর নিশ্বাস যদি এত ঘন পড়ে, আর সেই সঙ্গে তার নাড়ীর সে রকম বেগ না থাকে, তবে তার বুক আগে পরীক্ষা করিয়া

দেখিবে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, তার নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে জানিতে পারিবে। নিশ্বাস যে কেবল ঘন-ঘন পড়ে, আর ভাসা-ভাসা হয়, তা নয়; নিশ্বাস লইতে কষ্টও হয়, ব্যথাও লাগে। রোগীর হাঁপ বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। ফি নিশ্বাসে নাকের পাতা দুটী ফোলে। ছেলেদেরই এইটী বেশী দেখা যায়। রোগী কষ্ট করিয়া নিশ্বাস লইতেছে, ঠাউরে দেখিলেই বেশ বুঝা যায়। এই রকম কষ্ট করিয়া নিশ্বাস লওয়া, এই রোগের আর একটী চিহ্ন। সহজ মানুষের কথার মত কথা স্পষ্ট থাকে না—জড়াইয়া যায়। রুক্ষ শুক্‌নো কুকুরে-কাশি আসিয়া উপস্থিত হয়। কুকুরে-কাশি কাকে বলে, সকলেই জানেন। কুকুরে-কাশি খ্যাক্ —খ্যাক্, তার পর আবার অনেকক্ষণ বাদে—খ্যাক্। এই রকম করিয়া অনেকক্ষণ অন্তর এক এক বার খ্যাক্ করিয়া কাশাকে কুকুরে-কাশি বলে। নিয়ুমোনিয়াতে ঠিক্ এই রকম কাশি হয়। এই রকম কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট হয়। পাকা ফোড়ার উপর ঘা দিলে যেমন লাগে, এই রকম কাশিতে বুকের মধ্যে তেম্‌নি লাগে। এই রকম কাশির সঙ্গে তার পরই গয়ের উঠিতে আরম্ভ হয়। নিয়ুমোনিয়া রোগীর গয়ের যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর কখনও ভুল হয় না। এই গয়ের এত চট্‌চটে আর আঁটা যে, রোগী যেখানে গয়ের ফেলে, সেখান থেকে তা উঠান ভার। কোন পাত্রে (যেমন বাটি, শরা বা খুরি) যদি গয়ের ফেলে, তবে সে পাত্র উপুড় করিলেও গয়ের তা থেকে গড়াইয়া পড়ে না। জিউলির আঁটার মত তাতে

লাগিয়া থাকে। নিয়ুমোনিয়া রোগীর গয়েরের রংও চমৎকার। সে রং যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর ভুল হয় না। গয়েরের সঙ্গে রক্ত মিশন থাকে বলিয়া ওর রং ও রকম হয়। ইটের গুঁড়ো বা মর্চের যে রকম রং, এ গয়েরেরও সেই রকম রং। গয়েরে রক্তের ভাগ যত বেশী হয়, ওর রংও তত রাঙা বা রক্তের মত হয়। সচরাচর নিয়ুমোনিয়া রোগীর গয়ের পাটকিলে বা মর্চ্যের রং হইয়া থাকে। লোহার উপর যে মর্চা পড়ে, এখানেও সেই মর্চের কথা বলিতেছি। নাড়ীর বেগ বাড়ে। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ থেকে ১২০ পর্য্যন্ত পড়ে। নাড়ীর বেগ এর চেয়ে বেশী হইলে, রোগ শক্ত হইয়াছে জানিবে। কিন্তু ছেলেদের বেলায় তা মনে করিবে না। হাত দেখিবার সময় আঙুল দিয়া চাপিলে নাড়ী নরম বোধ হয়—নাড়ী সহজেই চাপা যায়—আর সেই চাপ টুকুতেই নাড়ীর গতি লঙ্ক হয়। নাড়ীর বল কমিলে নাড়ীর এই রকম অবস্থা হয়। রোগের প্রথমে নাড়ী পুষ্টি আর নরম থাকে। তার পর নাড়ী সরু আর দুর্ব্বল হয়। রোগীর গা যেমন খস্খসে শুক্নো, তেম্নি গরম। বুক, পিঠ, পাঁজর আরও গরম। জিব অপরিষ্কার আর ছাতা-পড়া। কোষ্ঠবদ্ধ হয়, আর প্রস্রাব খুব কম, রাঙা আর ঘোলা হয়। সহজ মানুষের প্রস্রাবে লবণ থাকে। নিয়ুমোনিয়া রোগীর প্রস্রাবে লবণ এত কমিয়া যায় যে, থাকে না বলিলেই হয়। মুখে, বিশেষ উপরকার ঠোঁটে, এক রকম ব্রণ বাহির হয়। এই ব্রণকে এক রকম জ্বর ঠুঁটো বলা যায়। এই জ্বর-ঠুঁটো

নিয়ুমোনিয়ার একটী চিহ্ন। তিন দিনের দিন, কি চারি দিনের দিন এই জ্বর-ঠুঁটো বাহির হয়। এই চিহ্নটী যে সর্ব্বদা উপস্থিত থাকে, তা নয়। তবে প্রায়ই উপস্থিত থাকে। এ রোগে মাথা-ধরা প্রায়ই থাকে। রোগী মাঝে মাঝে, বিশেষ রাত্রে, দুই একটা ভুল'ও বকে। কখন কখন খুবই প্রলাপ বকে। ফুস্ফোর আগায় (উপর দিকে, কণ্ঠার দিকে) এ রোগ হইলে রোগী বেশী ভুল বকে। নিয়ুমো-নিয়ার রোগী বেশী ভুল বকিলে তার ফুস্ফোর আগার প্রদাহ হইয়াছে ঠিক্ করিবে। মাতালদের নিয়ুমোনিয়া হইলে তারা নিয়ত ভুল বকে, আর কেবল তেড়ে ফুঁড়ে উঠিতে চায়।

দু দিনের পর আর এগার দিনের আগে, কিন্তু সচরাচর সাত দিনের দিন রোগের বৃদ্ধি হঠাৎ থামিয়া যায়, আর রোগীর অবস্থা ক্রমে ভাল হইতে আরম্ভ হয়। রোগের সূত্রপাতও (আরম্ভ) যেমন স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, রোগের শেষও তেমনি স্পষ্ট জানা যায়। রোগের শেষ দুই রকমে হইতে পারে। অর্থাৎ ঐ সাত দিনের দিন রোগীর মৃত্যুও হইতে পারে, আবার চাই কিঁ সে আরোগ্যও হইতে পারে। সচরাচর নিয়ুমোনিয়ায় যদি বিশেষ কোন উপসর্গ না ঘটে, তবে রোগী আরোগ্য হওয়াই সম্ভব।

বাঁ ফুস্ফোর চেয়ে ডাইন্ ফুস্ফোয় এ রোগ বেশী হয়। আবার ফুস্ফোর উপর দিক্ চেয়ে নীচের দিকে এ ব্যামো বেশী হয়। যদি ১২ জন নিয়ুমোনিয়া-রোগী পরীক্ষা করিয়া দেখ, তবে কেবল ৪ জনের বাঁ ফুস্ফোয়, আর ৮ জনের ডাইন্

ফুস্কোয় এই ব্যামো জানিতে পারিবে। এতেই বলিতেছি, যত লোকের ডাইন্ ফুস্কোয় এই ব্যামো হয়, তার অর্দ্ধেক লোকের বাঁ ফুস্কোয় এই রোগ হয়। কখন কখন এক বারে দুটো ফুস্কোরই প্রদাহ হয়। এ রকম হইলে ডাক্তরে বলেন, রোগীর "ডবল্ নিয়ুমোনিয়া" হইয়াছে। ডবল্ নিয়ুমোনিয়া হইলে যে, রোগীর আরও বিপদ্, তা সহজেই বুঝা যাইতেছে। কেন না, একটা ফুস্কোয় এ ব্যামো হইলে, রোগী তারই যাতনায় অস্থির হয়। দুটো ফুস্কোর ব্যামো এক বারে হইলে তার কষ্টের আর বিপদের সীমা থাকে না। যার ফুস্কোয় গুটি আছে, তার ফুস্কোর উপর দিকে এই ব্যামো হয়। এ রকম ঘটিলেও বাঁ ফুস্কোর চেয়ে ডাইন ফুস্কোরই প্রদাহ বেশী হয়। যারা দুর্ব্বল আর রোগা, তাদেরই ফুস্কোর উপর দিকে এই ব্যামো (নিয়ুমোনিয়া) হয়। যাদের ফুস্কোয় গুটি আছে, বা যাদের ফুস্কো আর কোন রকমে খারাপ হইয়াছে, তাদেরও ফুস্কোর উপর দিকে এই ব্যামো হয়। যদি বল ফুস্কোয় আবার গুটি থাকা কি রকম? ফুস্কোর আগায় (উপর দিকে) সব প্রথমে এক রকম গুটি জন্মে। তার পর, এই গুটি থেকে ক্ষয়কাশ-রোগ হয়। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে কঞ্জম্শন্ বলে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুস্কোর নলি গুলির প্রদাহ হয়, অর্থাৎ তাদের ভিতরে রক্ত জমে, ফোলে, আর ব্যথা হয়। নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্কোর কিসের প্রদাহ হয়? ফুস্কোর

বায়ুকোষ গুলির আর ফুস্কোর নিজের প্রদাহ হয়। এই আগেই বলিছি যে, ফুস্কোর মধ্যে হাজার হাজার নলি আছে। সেই সব নলিকে বায়ুনলি বলে। কেন না, সেই সব নলি দিয়া ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যায়। তেমনি ফুস্কোর মধ্যে আবার লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষও আছে। ঐ হাজার হাজার নলি ক্রমে ছোট হইতে হইতে শেষে তাদের আকার নলির মত আর থাকে না। যখন তাদের আকার এই রকম করিয়া বদলাইয়া যায়, তখন তাদের এক একটা থেকে এমন শত শত বায়ুকোষ তয়ের হয়। বোলতার চাকে যেমন সব গর্ত্ত আছে দেখিয়াছ, এক একটা বায়ুকোষও তেমনি এক একটা গর্ত্ত বৈ আর কিছুই নয়। এই সব গর্ত্ত এত ছোট যে নজর হয় না। এই সব গর্ত্ত খোলা নয়। খুব সরু এক রকম পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই সব ঢাকা গর্ত্তের মধ্যে বাতাস পোরা থাকে। বাতাসকে ভাল কথায় বায়ু বলে। আর যার মধ্যে কোন জিনিষ পোরা থাকে, তাকে সেই জিনিসের কোষ বলে। যেমন, তলোয়ারের খাপকে ভাল কথায় তলোয়ারের কোষ বলে। এই জন্যে ঐ সব ঢাকা গর্ত্তকে ভাল কথায় বায়ুকোষ বলে। এক একটা নলি থেকে এই রকম অনেক বায়ুকোষ তয়ের হইয়াছে। এই সব বায়ুকোষের সঙ্গে সেই নলির এমনি যোগ আছে যে, নলির মধ্যে বাতাস গেলে বায়ুকোষ গুলিরও মধ্যে বাতাস যায়। এই রকম করিয়া এক এক নিশ্বাসে হাজার হাজার নলি দিয়া লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষে বাতাস যায়। ফল কথা, এই সব নলি আর বায়ুকোষ দিয়াই ফুস্কো তয়ের

হইয়াছে। ব্রংকাইটিসে এই সব নলির প্রদাহ হয় আর নিয়ুমোনিয়াতে বায়ুকোষ গুলির আর ফুস্কোর নিজের প্রদাহ হয়।

নিয়ুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা। প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা, আর তৃতীয় অবস্থা। এই তিনটী অবস্থার কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

প্রথম অবস্থায়—ফুস্কোর শিরগুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়। ফুস্কোর রং খুব রাঙা হয়। সহজ ফুস্কোর চেয়ে ভারি হয় আর শক্ত হয়। স্পঞ্জের মত তেমন নরম-নরম থাকে না। ছুরি দিয়া কাটিলে ফুস্কো থেকে এক রকম ফেণা ফেণা রক্ত বাহির হয়। কিন্তু তখনও বায়ুকোষ গুলিতে বাতাস পোরা থাকে। কেন না, আঙুল দিয়া টিপিলে সহজ বেলার মত পুট্-পুট্ শব্দ টের পাওয়া যায়। এ অবস্থায় ফুস্কোর ভাব ঠিক্ যেন পিলের মত হয়।

দ্বিতীয় অবস্থায়—ফুস্কো এক বারে নিরেট হইয়া যায়। স্পঞ্জের মত তেমন ফোঁপড়া ফোঁপড়া আর নরম থাকে না। জলে ফেলিয়া দিলে ডুবিয়া যায়। বায়ুকোষ গুলিতে যখন বাতাস পোরা থাকে, তখন ফুস্কো আঙুল দিয়া টিপিলে কেমন এক রকম বেশ পুট্-পুট্ শব্দ টের পাওয়া যায়। দ্বিতীয় অবস্থায় সে রকম শব্দ আর টের পাওয়া যায় না। কাটিলে তেমন ফেণা-ফেণা রক্ত আর বাহির হয় না। আঙুল দিয়া একটু চাপিলেই অমনি তার মধ্যে আঙুল বসিয়া যায়। আর একটু চাপ পাইলেই অমনি ছিঁড়িয়া যায়। ছুরি দিয়া কাটিলে, বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে, কাটা বা ছেঁড়া জায়গায়

দানা-দানা দেখা যায়। ছেলেদের ফুস্কোয় এ রকম দানা-দানা বেশ স্পষ্ট দেখা যায় না। এ অবস্থায় বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আটা আটা এক রকম জিনিষ পোরা থাকে। প্রথম অবস্থায় ফুস্কোর শির গুলিতে এত রক্ত জমে যে, দুই চারি দিন এই রকম জমিয়া থাকিলে, শিরের পর্দ্দা ফুঁড়িয়া রক্তের শাদা আর রাঙা বিন্দু বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আসিয়া জমা হয়। রক্তের এই সব রাঙা আর শাদা বিন্দু এত ছোট যে, নজর হয় না। খুব ছোট জিনিষ বড় দেখায়, এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাইক্রস্কোপ্ বলে। ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ-যন্ত্র বলে। সেই যন্ত্র দিয়া দেখিলে রক্তের ঐ সব রাঙা আর শাদা বিন্দু বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। বেঙের জিব টানিয়া বাহির করিয়া, টান-টান করিয়া বিছাইয়া ঐ যন্ত্র দিয়া দেখিলে শিরের মধ্যে রক্ত নিয়ত দৌড়িতেছে, নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, বেশ স্পষ্ট দেখা যায়। রক্তের সঙ্গে রাঙা আর শাদা বিন্দুও সব বেগে দৌড়িতেছে বেশ দেখিতে পাওয়া যায়। গুড় হবার আগে খুব সরু ফুটে রস খানিকক্ষণ ফুটে। এই রকম ফুটাকে শরিষা-ফুট বলে। রাঙা আর শাদা বিন্দু লইয়া যে রক্ত শিরের মধ্যে নিয়ত দৌড়িতেছে—বেগে ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, তা দেখিলে এই শরিষা-ফুটের কথা মনে পড়ে। রস যখন শরিষা-ফুটে ফুটে, তখন শরিষা ফুট গুলি যেমন বেগে ঘুরিয়া বেড়ায়, শিরের মধ্যে রক্তের সঙ্গে রাঙা আর শাদা বিন্দু সবও ঠিক্ তেমনি বেগে আর ঠিক্ সেই ভাবে ঘুরিয়া বেড়ায়। শাদা বিন্দুর চেয়ে রাঙা বিন্দু ঢের বেশী। এই

জন্যে, রক্তের রং রাঙা দেখায়। ফল কিন্তু রক্ত নিজে রাঙা নয়। এই সব রাঙা বিন্দুরই জন্যে রক্ত রাঙা দেখায়। কোন রোগে রক্তের এই রাঙা বিন্দু কমিয়া গেলে রক্তের রং তেমন থাকে না। কাজেই রোগীর গায়ের রং, ঠোঁটের রং, চোকের কোল সব ফ্যাকাশে হইয়া যায়। রোগী গৌর-বর্ণ হইলে এই ফ্যাকাশে রং বেশ জানিতে পারা যায়। পিলে-জ্বরে রোগীর বর্ণ যে অত ফ্যাকাশে হইয়া যায়, তার কারণই এই। এর পর এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। তার পর বলি। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুল্কোর বায়ুকোষ গুলির মধ্যে আর বাতাস যায় না। আর এ অবস্থায় ফুল্কোর ভাব ঠিক্ রাঙা মেটের মত হয়। মেটের ভাল কথা যকৃত। যকৃত অর্থাৎ মেটেকে ইংরিজিতে লিবর্ বলে।

তৃতীয় অবস্থা—এ অবস্থায় ফুল্কোর ভাব ঠিক্ ছেয়ে বা হল্‌দে মেটের মত হয়। ফুল্কো খুব নরম হইয়া যায়। খুব সহজেই ছেঁড়া যায়। ফুল্‌কোর উপর ছুরি দিয়া চাঁচিলে অল্প ছেয়ে বা হল্‌দে রঙের পূযের মত এক রকম জল বাহির হয়। আর ফুল্‌কো চাপিলে অনেক খানি ঘোলা রস বাহির হয়। ফল কথা, এ অবস্থায় ফুল্‌কো পাকে। এ অবস্থায় গয়ের পাতলা যেন জলের মত হয়। গয়েরের রং কাল হয়; অল্প সবুজ সবুজ হয়। ফুল্‌কোর কোন জায়গা আঙুল দিয়া টিপিলে বসিয়া যায়, আর সেই জায়গা পাতলা পূযের মত এক রকম রসে শীঘ্রই পূরিয়া যায়।

কখন কখন নিয়ুমোনিয়া থেকে ফুল্কোয় ফোড়া হয়।

কিন্তু ক্বচিৎ এ রকম ঘটে। ফোড়া বড়ও হইতে পারে, ছোটও হইতে পারে। অনেক গুলি ছোট ছোট ফোড়া একত্র মিলিয়া একটী বড় ফোড়া হয়।

নিয়ুমোনিয়া হইয়া কখন কখন ফুল্‌কো পচিয়া যায়। ভাগ্যক্রমে এ রকম দুর্ঘটনা খুবই কম। যারা দুর্ব্বল আর রোগা, তাদেরই নিয়ুমোনিয়া থেকে এই রকম দুর্ঘটনা হইতে পারে।

নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ এক রকম মোটামুটি বলিলাম। এ রোগের লক্ষণ গুলি এত স্পষ্ট যে, বুক পরীক্ষা না করিয়াও রোগ ঠিক্ করিতে পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল তিনটী লক্ষণ ধর। এই তিনটী লক্ষণেই নিয়ুমোনিয়া ঠিক্ করিতে পারা যায়। সে তিনটী লক্ষণ এই ঃ—

(১) কম্প—রোগের সূত্রপাতে ভারি রকম কম্প এক বার হইয়াই বন্ধ হয়। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম ঘটে না। তবেই শুদ্ধু এই রকম কম্প হওয়াই নিয়ুমোনিয়ার একটী বেশ চিহ্ন।

(২) নাড়ীর বেগ আর নিশ্বাস—নাড়ীর তত বেগ নয়, অথচ নিশ্বাস ভারি ঘন ঘন পড়িতেছে। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ কি ১২০ বার পড়িতেছে। কিন্তু ফি মিনিটে নিশ্বাস ৪০, ৫০, ৬০ কি ৭০ বার পড়িতেছে। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম ঘটে না।

(৩) পাটকিলে রঙের ভারি আটাল গয়ের—নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে রোগী এ রকম গয়ের তোলে না। [illegible] খুব বেশী রক্ত জমিলে গয়ের পাটকিলে রঙের না

হইয়া এক বারে রক্ত-মাখা বা রক্তে ডুবন হইতে পারে। নিয়ুমোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে গয়ের এত আটা হয় না। এ কথা এর আগে বলিছি।

তার পর বুক পরীক্ষা করিয়া আরও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। এর আগেই বলিছি যে, নিয়ুমোনিয়ার তিনটি অবস্থা। প্রথম অবস্থা, দ্বিতীয় অবস্থা, আর তৃতীয় অবস্থা। বুক পরীক্ষার-যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ) দিয়া বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিলে, এই তিনটা অবস্থায় তিন রকম ফল পাবে। প্রথম অবস্থায় এক রকম। দ্বিতীয় অবস্থায় আর এক রকম। তৃতীয় অবস্থায় দ্বিতীয় অবস্থার মত। এই তিন রকম অবস্থার কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

প্রথম অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়?—এর আগেই বলিছি যে, বাঁ ফুস্কোর চেয়ে ডাইন্ ফুস্কোয় এ রোগ বেশী হয়। আবার ফুস্কোর উপর-দিক্ চেয়ে নীচের দিকে এ ব্যামো বেশী হয়। এই জন্যে, রোগীর ডাইন্ পিঠের নীচের দিক্ আগে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে দাঁড় করাইয়া বা বসাইয়া বুক পরীক্ষা করিবে না। শুদু নিয়ুমোনিয়ার রোগী বলিয়া কেন? দুর্ব্বল রোগীদের বিছানায় শোওয়াইয়া বুক পরীক্ষা করিবে। ব্রংকাইটিস্ রোগে পিঠে ষ্টিথস্কোপ দিয়া শুনিলে, বুকের মধ্যেকার শব্দ যেমন স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায় (২০২র পাত দেখ), নিয়ুমোনিয়া রোগেও পিঠে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে বুকের মধ্যেকার শব্দ তেমনি স্পষ্ট শুনা যায়। এই জন্যে, রোগীকে বিছানায় উপুড়

হইয়া শুইতে বলিবে। তার পর, তার ডাইন্ পিঠের দিকে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া খুব মন দিয়া শুনিবে। এই রকম মন দিয়া শুনিলে কি শুনিতে পাইবে? বুড়ো আঙুল আর তার কাছের আঙুল দিয়া এক গোছা চুল কাণের কাছে আস্তে আস্তে ঘষিলে যে এক্ রকম খুব মিহি চিচ্চিড়-চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, বুকের মধ্যে থেকেও ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইবে। কাণের কাছে ঐ রকম করিয়া চুল ঘষিবার জন্যে, কারো কাছে এক গোছা চুল চাহিবার দরকার নাই। তোমারই মাথার চুল এক গোছা কাণের কাছে ঐ রকম ঘষিলে ও শব্দ কি রকম বেশ বুঝিতে পারিবে। তোমার মাথার চুল যদি তেমন বড় বড় না হয়, তবে কাণের কাছের চুল কাণের কাছে ঐ রকম করিয়া ঘষিবে। মাথা আটা হইলে, সে চুল ও রকম করিয়া ঘষিয়া তেমন শব্দ পাওয়া যায় না।

নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় কেন?—এই রোগের প্রথম অবস্থায় বায়ুকোষ আর খুব চিকণ বায়ুনলি গুলির মধ্যে খুব আটাল এক রকম জিনিশ জমে। এ রকম আটাল জিনিশ কোথা থেকে আসে? বায়ুকোষ আর খুব চিকণ বায়ুনলি গুলির প্রদাহ হইলে তাদের ভিতরে ঐ রকম আটাল জিনিশ সৃষ্টি হয়। রোগী যখন নিশ্বাস ফেলে, তখন ফুস্ফোর মধ্যেকার বাতাস সব বাহির হইয়া আসে। আর যখন নিশ্বাস লয়, তখন বাহিরের বাতাস ফুস্ফোর মধ্যে যায়। ফুস্ফোর মধ্যেকার বাতাস বাহির হইয়া আসিলে বায়ুকোষ আর বায়ুকোষের

লাগাও খুব মিহি বায়ুনলি গুলি চুপ্সে যায়; অর্থাৎ তাদের ভিতরকার খোল গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। সহজ বেলায়ও ঠিক্ এই রকম হয়। তার পর বাহিরের বাতাস ফুস্ফোর মধ্যে গেলে, বায়ুকোষ আর বায়ুকোষ গুলির লাগাও খুব মিহি বায়ুনলি গুলি তেমন চুপ্সান, আর তাদের খোল গায়ে গায়ে তেমন লাগিয়া থাকে না। সে সব বাতাসে পূরে যায়। যত বার নিশ্বাস লও, তত বারই ওদের মধ্যে ঐ রকম করিয়া বাতাস যায়। আর যত বার নিশ্বাস ফেল, তত বারই ওরা ঐ রকম করিয়া চুপ্সে যায়, আর ওদের খোল গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। যখন মন্দ মন্দ বাতাস বয়, তখন ঝাউ গাছ থেকে এক রকম বেশ মিষ্টি, নরম শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সহজ বেলায় নিশ্বাস লইলে ঐ সব বায়ুকোষ আর খুব মিহি বায়ুনলির মধ্যে যখন বাতাস সেঁদোয়, তখন ঐ রকম মিষ্টি, নরম, শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ঐ সব বায়ু-কোষ আর মিহি বায়ুনলি গুলির ভিতরে খুব আটাল এক রকম জিনিশ জমে। নিশ্বাস ফেলিলে ওদের মধ্যেকার বাতাস বাহির হইয়া আসে, ওরা চুপ্সে যায়, আর ওদের ভিতরকার খোল সেই চট্‌চটে আটায় এক বারে গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। নিশ্বাস লইলে সহজ বেলার মত ওদের মধ্যে বাতাস নিঃশব্দে সেঁদুতে পারে না। আটায় ওদের যে যোড় লাগিয়া থাকে, বাতাসে সেই যোড় চিচ্চিড় করিয়া ছাড়িয়া যায়। রোগী যত বার নিশ্বাস ফেলে, তত বার ওদের ঐ রকম যোড় লাগিয়া যায়। আর যত বার নিশ্বাস লয়, তত

বার ঐ রকম করিয়া ওদের যোড় ছাড়িয়া যায় আর চিচ্চিড় শব্দ হয়। নিয়ুমোনিয়া রোগের প্রথম অবস্থায় রোগীর পিঠে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে যে মিহি চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তার কারণ এই বৈ আর কিছুই নয়। নিয়ু-মোনিয়া ছাড়া আর কোনও রোগে এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। এই রকম শব্দ শুনিলে একবারে তোমার দুটী বিষয় জানা হবে। এক, রোগীর নিয়ুমোনিয়া হই-য়াছে। আর, নিয়ুমোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা। তবেই দেখ, পিঠে এক বার ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিয়াই রোগও ঠিক্ করিলে, রোগের অবস্থাও ঠিক্ করিলে।

ডাইন্ পিঠ পরীক্ষা করা হইলে, বাঁ পিঠ আবার ঐ রকম করিয়া পরীক্ষা করিবে। কেন না, দুই ফুল্কোতেই এ রোগ হইতে পারে। দুই ফুল্কোর প্রদাহকে ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। ডাইন্ পিঠ পরীক্ষা করিয়া যদি নিয়ুমোনিয়ার কোনও চিহ্ন না পাও, তবে বাঁ পিঠ পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। নৈলে বাঁ ফুল্কোর প্রদাহ হইয়াছে কি না, কেমন করিয়া জানিবে। পিঠের নীচের দিক্ ত পরীক্ষা করিয়া দেখিবেই। তা ছাড়া, পিঠের উপর দিকও পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই। রোগা আর দুর্ব্বল রোগীদের পিঠের উপর দিক্ বিশেষ করিয়া পরীক্ষা করিবে। কেন না, তাদেরই ফুল্‌কোর আগায় এই রোগ বেশী হয়। যদি বল ফুল্‌কোর আবার গোড়া আগা কি রকম? যে জিনিশের দু মুড়ো সমান তার গোড়া আগা নাই। কিন্তু ফুল্‌কো ত সে রকম নয়। দুটা ফুল্‌কো

দেখিতে যেন ছোট দু খানি রথ। রথের যেমন গোড়া আছে, ফুল্‌কোরও তেমনি গোড়া আছে। রথের যেমন চূড়া বা আগা আছে, ফুল্‌কোরও তেমনি চূড়া বা আগা আছে। ফুল্‌কোর গোড়া পিঠের নীচের দিকে থাকে। আর ফুল্‌কোর আগা পিঠের উপর দিকে থাকে।

সহজ মানুষের পিঠে, পাঁজরে, বা বুকে বাঁ হাতের দুটী আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর ডাইন হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া একটু জোরে ঘা দিলে বেশ এক রকম ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। বুকের মধ্যে ফুল্‌কো আছে। সেই ফুল্‌কো বাতাস পোরা। কাজেই বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঐ রকম করিয়া ঘা দিলে ফাঁপা আওয়াজ বৈ আর কি শুনা যাবে ? যে জিনিশের মধ্যে খোল, আর সেই খোল বাতাস পোরা, সে জিনিশের গায়ে, ঘা দিলেই ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। আর সেই খোল কোন জিনিশে পোরা থাকিলে, তার গায়ে ঘা দিলে নিরেট শব্দ পাওয়া যায়। "ফাঁপা শব্দ" আর "নিরেট শব্দ"। এই দু রকম শব্দ কাকে বলে, বেশ করিয়া বুঝিয়া রাখ। বুক পরীক্ষায় এই দু রকম শব্দ খুব কাজে লাগে। অমুক জিনিশের গায়ে ঘা দিয়া ফাঁপা শব্দ পাইলাম বলিলে কি বুঝায় ? সে জিনিশটার মধ্যে খোল, আর তার ভিতর খালি, এই বুঝায়। আমরা যাকে খালি বলি, তার মধ্যে আর কোনও জিনিশ থাকে না বটে; কিন্তু তার মধ্যে বাতাস পোরা থাকে। খালি কলসী বলিলে তার মধ্যে জল নাই এই বুঝায়। কিন্তু তার মধ্যে বাতাস নাই, তা বুঝায় না।

কেন না, খালি জিনিশ কখনও বাতাস ছাড়া থাকে না। এই জন্যে একবারে জানিয়া রাখ যে, যে জিনিশের গায়ে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়, সেই জিনিশের ভিতর বাতাস পোরা। যদি বল বুকের মধ্যে ফুল্‌কো আছে, তবে বুকে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায় কেন ? ফুল্‌কো যদি নিরেট হইত; তবে বুকের শব্দও নিরেট হইত। কিন্তু ফুল্‌কো ত নিরেট নয়। ও যে ফোঁপড়া, আর ওর মধ্যে বাতাস পোরা। সহজ মানুষের বুকে, পিঠে, বা পাঁজরে ঘা দিলে যে রকম পরিষ্কার ফাঁপা শব্দ বাহির হয়, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় রোগীর পিঠে আর পাঁজরে (ডাইন ফুল্‌কোর প্রদাহ হইয়া থাকে ত ডাইন পিঠে আর পাঁজরে, আর যদি বাঁ ফুল্‌কোর প্রদাহ হইয়া থাকে ত বাঁ পিঠে আর পাঁজরে) ঐ রকম করিয়া আঙুলের ঘা দিলে সে রকম পরিষ্কার ফাঁপা শব্দ বাহির হয় না। এ রোগের প্রথম অবস্থায় যাও বা ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়, দ্বিতীয় অবস্থায় তা মোটেই পাওয়া যায় না।

দ্বিতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায় ?—(১) প্রথম ধর, যে দিকের ফুল্‌কোর প্রদাহ হইয়াছে, সেই দিকের পিঠে আর পাঁজরে ঐ রকম করিয়া আঙুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ মোটেই পাওয়া যায় না। নিরেট জিনিশের উপর ঘা দিলে যেমন নিরেট শব্দ পাওয়া যায়, এও প্রায় ঠিক সেই রকম নিরেট শব্দ। নিরেট শব্দ হবে না কেন ? ফুল্‌কোর যে খানিতে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামে-

সে খানির বায়ুকোষ আর বায়ুকোষের লাগাও খুব মিহি বায়ুনলি গুলি যে সেই খুব আটাল জিনিশে এক বারে বুজিয়া গিয়াছে। তার মধ্যে বাতাস যাইবার ত আর যো নাই। কাজেই নিরেট শব্দ বৈ আর কি শব্দ পাবে? ব্যামো বাড়িলে ক্রমে সব ফুস্কো খানাই নিরেট হইয়া যায়। তখন সে দিকের পিঠ আর পাঁজরের যেখানে ঘা দিবে, সেই খানেই নিরেট শব্দ পাবে।

.. তার পর, (২) ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে কি শুনিতে পাইবে? প্রথম অবস্থায় যে মিহি চিড়্চিড় শব্দ শুনিতে পাইয়াছিলে, সে শব্দ আর শুনিতে পাইবে না। সহজ বেলায় ফি নিশ্বাসে যে এক রকম মিষ্টি, নরম শোঁ-শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, সে রকম শব্দও শুনিতে পাইবে না। তবে কি রকম শব্দ শুনিতে পাইবে? বায়ুকোষ গুলির মধ্যে বাতাস সেঁদোবার সময়েই ও রকম মিষ্টি, নরম শোঁ-শোঁ শব্দ শুনা যায়। এখন সে সব বায়ুকোষে ত আর বাতাস যাইবার যো নাই। সে সব যে সেই আটাল জিনিশ দিয়া বুজন। কাজেই সে রকম মিষ্টি, নরম শোঁ-শোঁ শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না। তার বদলে আর এক রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। সে আবার কি রকম শব্দ? মিষ্টি নরম শোঁ-শোঁ শব্দের চেয়ে কড়া শব্দ। বায়ুনলি গুলির ভিতরে বাতাস সেঁদোবার সময় যে শব্দ হয়, এ সেই শব্দ। নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফুঁ দিলে যে এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, এও ঠিক্ সেই রকম শব্দ।

তার পর, (৩) ষ্টিথস্কোপের উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিবে। খুব আস্তে আস্তে গুণিলে হইবে না। গলার আওয়াজ স্পষ্ট বাহির হওয়া চাই। সে এই রকম করিয়া গুণিলে তার আওয়াজ তোমার কাণে গিয়া যেন কন্‌-কন্‌ করিয়া বাজিবে। নলের ভিতর দিয়া কথা কহিলে যে রকম আওয়াজ বাহির হয়, এও ঠিক্ সেই রকম। আওয়াজ যেমন কন্‌কনে হয়, কথাও তেমনি জড়ান আর অস্পষ্ট হয়। সহজ মানুষের স্বর ও রকম কন্‌কনেও হয় না, জড়ান বা অস্পষ্টও বলে না। রোগীর পিঠে, পাঁজরে কাণ দিয়া দিয়া শুনিলেও হইতে পারে।

তার পর, (৪) রোগীর পিঠে বা পাঁজরে তোমার হাত রাখিয়া তাকে ঐ রকম করিয়া এক—দুই—তিন গুণিতে বলিবে। বুকের মধ্যে থেকে তার স্বর যেন কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার হাতে আসিয়া বাজিবে। তুমি এ স্পষ্ট জানিতে পারিবে।

নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় তবে এই চারিটি চিহ্ন পাবে। আবার এই চারিটী চিহ্ন পাইলে নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থা ঠিক্ করিবে। এই চিহ্ন গুলির কথা যা যা বলিছি, সে সব বেশ তলিয়ে বুঝা চাই। আর বেশ মনে করিয়া রাখাও চাই। নৈলে রোগ বা রোগের অবস্থা সহজে ঠিক্ করিতে পারিবে না।

তৃতীয় অবস্থায় বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়?—ফুস্ফোর নিরেট ভাব যত দিন থাকে, নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার ঐ চারি রকম চিহ্ন তত দিন পাওয়া যায়।

কাজেই, তৃতীয় অবস্থায়ও দ্বিতীয় অবস্থার চিহ্ন গুলি সব বজায় থাকে। যদি বল, তবে তৃতীয় অবস্থা কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে? তা ঠিক্ করা শক্ত নয়। দ্বিতীয় অবস্থার চিহ্ন গুলি যদি বরাবরি সমান থাকে, আর রোগীর অবস্থা ক্রমে খারাপ হয়, তবে দ্বিতীয় অবস্থা গিয়া তৃতীয় অবস্থা হইয়াছে ঠিক্ করিবে। রোগ না বাড়িলে রোগীর অবস্থা খারাপ হয় না। আর রোগ বাড়িয়া গেলে দ্বিতীয় অবস্থা থেকে তৃতীয় অবস্থা হবে বৈ কি? রোগ তার চেয়েও বাড়িলে ফুস্কো পচিয়া যাওয়ার সব চিহ্ন পাওয়া যায়। নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর রোগী যে গয়ের তোলে, তা পচা আর খারাপ ঘায়ের রস মিশনর মত।

নিয়ুমোনিয়ার রোগী দেখিতেছ। রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে? যে রোগীর গতিক ভাল, তার রোগের লক্ষণ গুলি ক্রমে কমিয়া আসে। আর গয়ে-য়ের আটা কমিয়া যায়। অনেক খানি করিয়া গয়ের তোলে। আর গয়ের পূযের মত কিম্বা শ্লেষ্মা আর পূয মিশনর মত হয়। আর দশ পোনর দিনেই রোগী চাঙ্গা হইয়া উঠে। আর যে রোগীর গতিক ভাল নয়, তিন দিনের দিন কি চারি দিনের, দিন তার রোগের বৃদ্ধি হয়। নিশ্বাস আরও ঘন-ঘন পড়ে। গয়েরের রং আরও পাটকিলে হয়। গয়েরে রক্তের দাগ (রেখা) থাকে। নাড়ীর যেমন বেগ বাড়ে, তেমনি দুর্ব্বল হয়। জিব শুক্নো আর কটাশে হয়। গায়েয় তাত এমনি বাড়ে যে, ধান দিলে খৈ হয়। রোগী দুর্ব্বলের এক-শেষ হয়। শেষে সান্নিপাত বিকারের

সব লক্ষণই আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগী ভুল বকিতে থাকে, আর অচৈতন্য হইয়া যায়। শেষ অবস্থায় গয়ের উঠা বন্ধ হয়। হাঁপ ভারি বাড়ে। নাড়ী সূতর মত হয়, আর যেন কাঁপিতে থাকে—এম্‌নি অস্থির হয়। মুখ খানি এক বারে ফ্যাকাশে হইয়া যায়। ঠোঁট দুটী নীলবর্ণ হয়। রোগী ঘামে যেন এক বারে নেয়ে উঠে। এ ঘাম সহজ মানুষের ঘামের মত নয়। এ ঘাম ঠাণ্ডা আর আটা। মৃত্যুর ঠিক্ আগেই এই রকম ঘাম হয়। এই জন্যে এ রকম ঘামকে লোকে কাল্-ঘাম বলে। রোগীর গলা ঘড়-ঘড় করিতে থাকে। তার খানিক পরেই মরিয়া যায়। হয় ক্রমে অবসন্ন হইয়া মরে, নয় হাঁপাইয়া মরে (ফুস্কোর ভিতর বাতাস না যাইতে পারায়), নয় অচৈতন্য হইয়া মরে। এর আগেই বলিছি যে, ফুস্কো পচিয়া গেলে নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হয়, গয়ের পচা আর-খারাপ ঘায়ের রস-মিশনর মত হয়।

রোগী জ্বর ভোগ করিতেছে, এর মধ্যে যদি তার নিয়ু-মোনিয়া হয়, তবে নিশ্বাস খুব ঘন-ঘন পড়া, নাড়ীর বেগ বাড়া, আর গায়ের তাত বাড়া ছাড়া নিয়ুমোনিয়ার আর কোনও লক্ষণ দেখা যায় না। কাশি আর বুকে ব্যথা মোটেই না থাকিতে পারে। রোগীর গয়েরও না উঠিতে পারে। এমন সকল জায়গায় রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া সব ঠিক্ করিবে।

অনেক রোগ ক্রমে সারে। নিয়ুমোনিয়াও কখন কখন ক্রমে ভাল হয়। কিন্তু সচরাচর সে রকম ঘটে না। নিয়ু-

মোনিয়া রোগের স্বভাবই এই যে, ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয়। ভাল হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি। মন্দ হইবার লক্ষণও এর আগে বলিছি।

রোগীর আত্মীয় স্বজন তোমাকে জিজ্ঞাসা করিল "মহাশয় রোগীটি বাঁচিবে ত" ? তুমি কি উত্তর দিবে ? বেশ বুঝিয়া আর বিবেচনা করিয়া উত্তর দেওয়া চাই। নৈলে ঠাকবে। চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায়। দশ দিনে যে রোগ সারিবে বলিয়াছ, বিশ দিনেও যদি তা না সারে, তবে তোমার অপযশের সীমা নাই। তুমি যে রোগ বুঝিতে না পারিয়া ও কথা বলিয়াছিলে, তা সকলেই বলবে। তোমাকেও তাই স্বীকার করিতে হইবে। স্বীকার না করিয়া করিবে কি ? পেয়াদায় স্বীকার করাইবে। যে রোগী মরিবে, কোনও ভয় নাই বলিয়া যদি তার আত্মীয় স্বজনকে আশ্বাস দেও, তবে এতেও লোকে তোমার বেশী বৈ কম অপযশ করিবে না। আবার বাঁচিবে না বলিয়া যে রোগীর আশা ভরসা ছাড়িয়া দিয়া আসিয়াছ, যে উপায়েই হোক্ তার জীবন রক্ষা হইলে, লোকে তোমায় শুদ্ধ অপযশ করিয়া ক্ষান্ত থাকে না; যো পাইলে গালও দেয়। এবারে তুমি গাল খাইবারই কাজ করিয়াছ। গৃহস্থ তোমার কথার উপর নির্ভর করিয়া থাকিলেই ত রোগী মারা পড়িত! তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত নাই। আমি যে রোগীকে জবাব দিয়া আসিয়াছি, সে রোগী আবার বাঁচিবে ? কখনই না। শুনিছি, আর এক জন ডাক্তার আনিয়া তার চিকিৎসা করিতেছেন। তা তিনি নূতন অষুদ আর কি দিবেন ?

আমি তার হদ্দ মুদ্দ করিয়াছি। দেখা যাক্, তোমাদের নূতন ডাক্তর কি রকম হাত দেখান। তার পর, মনে মনে—'এ রোগীটি যদি বাঁচে, তবে এখানে আমার ব্যবসা করাই ভার হবে। তোমার মনের ইচ্ছা রোগীটি না বাঁচে। তবেই দেখ, আগে যে রোগীর তুমি নিয়ত কল্যাণ কামনা করিতেছিলে, এখন আবার সেই রোগীরই নিয়ত মৃত্যু কামনা করিতে লাগিলে! এর চেয়ে পাপ আর কি হইতে পারে? সেই নূতন ডাক্তরেরই হাতে রোগীটি বাঁচিল। পাড়ার লোক, গাঁয়ের লোক, সকলেই এতে সুখী হইল। কেবল তোমারই মনে ভারি কষ্ট হইল। লোক-লজ্জায় বাহিরে যা কিছু আহ্লাদ প্রকাশ করিতে লাগিলে। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ—তোমার এ পাপের প্রায়শ্চিত্ত আছে কি না? কখনই না। কেমন করিয়া থাকিবে? তুমি যে চিকিৎসক! রোগ থেকে লোকের জীবন রক্ষা করাই যে তোমার কাজ। যার এমন মহৎ কাজ, তার মন কি এ রকম নীচ হওয়া উচিত? রোগ সারিবার লক্ষণ, আর রোগ না সারিবার লক্ষণ গুলি যদি শিখিয়া রাখ, আর যদি বেশ ঠাউরে সে গুলি মনে করিয়া রাখ, আর যদি খুব বিবেচনা করিয়া কথার উত্তর দেও, তবে তোমাকে কখনই এ পাপের ভাগী হইতে হয় না। লোকে বলে যত ক্ষণ শ্বাস, তত ক্ষণ আশ। আমাদের শাস্ত্রেও বলে "তাবৎ চিকিৎসা কর্ত্তব্যা, যাবৎ কণ্ঠাগত প্রাণ"। যত ক্ষণ কণ্ঠাতে প্রাণ থাকিবে, তত ক্ষণ পর্য্যন্ত চিকিৎসা করা উচিত। তবে তুমি অত তাড়াতাড়ি করিয়া রোগীকে জবাব দিবে কেন? তাতে তোমার

বাহাদুরি কি? বাহাদুরির মধ্যে, সে যত দিন বাঁচিয়া থাকে, তোমাকে তাহার কেবল মৃত্যু কামনা করিতে হয়। এতে তোমার ঐহিক পারত্রিক দুই-ই নষ্ট। এই জন্যে বলি যে, কথায় কথায় তোমার ভুল স্বীকার করিবে। ভুল কার না হয়? ভুল সকলেরই হয়। যিনি ভুল স্বীকার করেন, আর পরে সে রকম ভুল না হইতে পারে, তার উপায় করেন, তিনিই যথার্থ পণ্ডিত। তুমি যদি কোন রোগ বুঝিয়া উঠিতে না পার, তবে তা না লুকাইয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে তা তখনই স্পষ্ট করিয়া বলিবে। তাতে তোমার মান কমিবে না। মান আরও বাড়িবে। তুমি যে ভারি সরল, লোকের কাছে তার পরিচয় দেওয়া হইবে। তোমার উপর গৃহস্থের বিশ্বাস বেশী হইবে। তোমার হাতে রোগী দিয়া তাঁরা নিশ্চিন্ত হইতে পারিবেন। তাঁরা নিশ্চয় জানেন, রোগ একটু শক্ত হইলে, আর তুমি তা না বুঝিতে পারিলে, তাদের কাছে তখনই তা স্পষ্ট করিয়া বলিবে। তোমার চেয়ে যিনি বেশী বুঝেন, তিনি তোমার রোগীর চিকিৎসা করিতে আসিলে, ক্ষুণ্ণ না হইয়া তোমার তাতে আরও খুসী হওয়া উচিত। কেন না, তুমি তাঁর কাছে কত শিখিতে পারিবে। শিখিবার একটী ভারি অবকাশ পাইবে। যে রোগ তুমি বুঝিতে পার নাই বলিয়া গৃহস্থকে আর এক জন ডাক্তর ডাকিতে হইয়াছে, সে রোগ বা সে রকম রোগ আর কারো বাড়িতে হইলে, তোমায় ছাড়া গৃহস্থকে আর কারও ডাকিতে হবে না। এই রকম করিয়া শিখিলে, শেষে তুমি সব রোগেরই চিকিৎসায় এত পটু হবে, যে

তোমার রোগীর জন্যে আর কখনও অন্য চিকিৎসক আনিতে হবে না।

সব রোগেরই দু রকম লক্ষণ। এক রকম লক্ষণকে রোগ সারিবার লক্ষণ বলে। আর এক রকম লক্ষণকে রোগ না সারিবার লক্ষণ বলা যায়। রোগ সারিবার লক্ষণকে ভাল কথায় অনুকূল লক্ষণ বলে। রোগ না সারিবার লক্ষণকে ভাল কথায় প্রতিকূল লক্ষণ বলে।

নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ—

ব্যামোর গোড়াতেই খুব শ্লেষ্মা উঠে। কাণের কাছে এক গোছা চুল রগ্‌ড়ানর শব্দের মত মিহি চিচ্চিড় শব্দের বদলে চিকণ বুড়্‌বুড়ির শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। চিকণ বুড়বুড়ির শব্দ কাকে বলে ১৬৩র পাতে আর ২০৩—২০৪র পাতে তা বলিছি। তার পর শ্লেষ্মা আর পূয মিশনর মত গয়ের খুব উঠিতে থাকে। এই সময় পিঠে আর পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। আর ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে ফুস্ফোর বায়ুকোষগুলির ভিতরে বাতাস যাওয়ার নরম শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। নাক দিয়ে রক্ত পড়ে। সহজ শরীরের মত সকল গায়ে সমান ঘাম হয়। এই ঘাম সহজ ঘামের মত গরম। পেট নাবে। হাতে, পায়ে, বা গায়ের আর কোন জায়গায় ব্যথা হয়, ফোলে, আর রাঙা হয়। কোন পাত্রে প্রস্রাব করিয়া রাখিলে তাতে তলানি পড়ে। নিশ্বাস তত ঘন ঘন পড়ে না—এই লক্ষণটীই সব চেয়ে সুলক্ষণ। নিয়ুমোনিয়ার উপরে আর কোনও উপসর্গ ঘটে না। [illegible]ার প্রদাহ অনেক দূর লইয়া হয় না।

নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ—জ্বর ভারি বাড়ে আর রোগী ভুল বকিতে থাকে। সন্নিপাত-বিকারের সব লক্ষণ আসিয়া উপস্থিত হয়। হয় মোটেই গয়ের উঠে না, নয় কাল রঙের কিম্বা কাল রক্তের সঙ্গে মিশন গয়ের উঠে। বুকের, পিঠের বা পাঁজরের ব্যথা হঠাৎ চলিয়া যায়। তার পরেই রোগীর মুখের চেহারা বদ্‌লাইয়া যায়। নাড়ীর গতি খারাপ হয়। নাড়ী খুজিয়া পাওয়া যায় না। নিশ্বাস আরও খুব ঘন ঘন পড়ে। নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে রোগীর শরীর যদি ভগ্ন থাকে, তবে তার জীবন রক্ষা হওয়া ভার। একটী ফুস্কোর সব খানির, কিম্বা দুট ফুস্কোরই প্রদাহ হওয়া বড় দোষের। দুয়েতেই রোগীর ভারি বিপদ্। খুব ছোট ছেলের, খুব দুর্ব্বল বা বুড়োদের নিয়ুমোনিয়া হইলে তাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। পুরুষদের চেয়ে মেয়েদের নিয়ুমোনিয়ায় বিপদ্ বেশী। পোআতিদের (গর্ভবতী) নিয়ুমোনিয়ায় আরও ভয়।

যে সব লক্ষণ দেখিয়া নিয়ুমোনিয়া রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ বুঝা যায়, ২৯২ আর ২৯৩র পাতে তা এক বার বলিয়াছি। তবে নিয়ুমোনিয়া-রোগীর রোগ সারিবার লক্ষণ, আর তার রোগ না সারিবার লক্ষণ আবার এখানে এ রকম বেদ-বিধানে বলিবার দরকার কি? নিয়ুমোনিয়া যে শক্ত রোগ, যে রকম সতর্ক আর সাবধান হইয়া এ রোগের চিকিৎসা করিতে হয়, রোগ বুঝিবার একটু গোলমাল হইলে রোগীর যে বিপদ্ ঘটিতে পারে, তাতে দু বার ছেড়ে লক্ষণ গুলি উল্টে পাল্টে দশ বার বলিলে ভাল হয়।

নিয়ুমোনিয়া সচরাচর কোন কোন রোগের উপসর্গ দেখা যায়—(১) যে সব জ্বরে গায়ের তাত দিন রাত সমান থাকে, সেই সব জ্বরের শেষ অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। (২) বিসর্প রোগের শেষ অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। বিসর্প রোগকে ইংরিজিতে ইরিসিপেলস্ বলে। ইংরিজির চেয়ে এ রোগের বাঙ্গালা নামটী সোজা। বিসর্প (ইরিসিপেলস্) এক রকম ছোঁয়াচে রোগ। এতে শরীরের জায়গায় জায়গায় রাঙা হয়, আর তার সঙ্গে গায়ের তাত হয়। সেই সব রাঙা জায়গার তাত আরও বেশী হয়। এর পর, এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। (৩) পায়ীমিয়া রোগে নিয়ুমোনিয়া হয়। খারাপ ঘায়ের রস রক্তের সঙ্গে মিশিলে এই রোগ হয়। এ রোগেরও কথা এর পর বলিব। এই সব রোগে নিয়ুমোনিয়া হয় বটে, কিন্তু প্রায়ই তার দিকে চিকিৎসকের মন যায় না। বুক, পিঠ, পাঁজরের বেশী তাত, ভারি ঘন ঘন নিশ্বাস (হাঁপ), আর রোগের হঠাৎ বৃদ্ধি—এই গুলি দেখিলেই নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিবে। বুক পরীক্ষা করিলে আসল রোগে যে সব চিহ্ন জানিতে পারা যায়, এখানেও সেই সব চিহ্ন টের পাওয়া যায়। (৪) ক্ষয়কাশের শেষ অবস্থায় নিয়ুমোনিয়া হয়। (৫) ব্রংকাইটিস্ রোগে নিয়ুমোনিয়া প্রায়ই হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া বলে। (৬) সব রোগের চেয়ে প্লুরিসি রোগেই নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। এই নিয়ুমোনিয়াকে প্লুরো-নিয়ুমোনিয়া বলে। প্লুরিসি রোগের কথা এর পরই বলিব।

ঘড়ি ধরিয়া নিয়ুমোনিয়া রোগীর নাড়ী আর নিশ্বাস

গোণা ভারি আবশ্যক। এতে রোগও চেনা যায়, রোগ বাড়িতেছে কি কমিতেছে তাও জানা যায়। এই জন্যে সব চিকিৎসকেরই ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী আর নিশ্বাস গুণিতে অভ্যাস করা ভাল। ঘড়ি ধরিয়া কেমন করিয়া নাড়ী দেখিতে হয়, আর কেমন করিয়াই বা নিশ্বাস গুণিতে হয়, এখানে সে সব বেশ করিয়া লিখিয়া দিলাম।

সহজ মানুষের নাড়ী প্রতি মিনিটে ৭২ বার পড়ে। আর সহজ মানুষে প্রতি মিনিটে ১৮ বার নিশ্বাস ফেলে। অর্থাৎ চারি বার নাড়ী পড়িলে তবে এক বার নিশ্বাস পড়ে। এটা আগে জানিয়া রাখা উচিত। তার পর নাড়ী পরীক্ষা কর। রোগীর কাছে জুত বরাত করিয়া বসিয়া বাঁ হাতে ঘড়ি ধর, আর ডাইন্ হাত দিয়া তার নাড়ী দেখ। সচরা-চর ঘড়িতে ঘণ্টার কাঁটা আর মিনিটের কাঁটা, এই দুটী কাঁটা থাকে। ভাল ঘড়িতে তা ছাড়া আর একটী ছোট কাঁটা থাকে। এই ছোট কাঁটাটীকে সেকেণ্ডের কাঁটা বলে। সেকেণ্ডের কাঁটা থাকিলে ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখার সুবিধা হয়। মিনিটের কাঁটা ঘড়ির সব কটা (১২টা) ঘর ঘুরিয়া আসিলে যেমন এক ঘণ্টা হয়, সেকেণ্ডের কাঁটা (সব ছোট কাঁটা) তেমনি সব কটা (১২টা) ঘর ঘুরিয়া আসিলে এক মিনিট হয়। ৬০ মিনিটে যেমন এক ঘণ্টা, ৬০ সেকেণ্ড তেমনি এক মিনিট। মনে কর, তোমার ঘড়িতে সেকেণ্ডের কাঁটা আছে। ঘণ্টার কাঁটা আর মিনি-টের কাঁটার যেমন বড় বড় ঘর আছে, সেকেণ্ডের কাঁটারও তেমনি ছোট ছোট ঘর আছে। ঘণ্টার কাঁটা আর মিনি-

টের কাঁটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যেমন ৫টী করিয়া ফুট্ ফুট্ দাগ আছে, সেকেণ্ডের কাঁটারও ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় তেম্‌নি ৫টী করিয়া ফুট্ ফুট্ দাগ আছে। এই ১২টী ঘরের যে কোন ঘরের প্রথম দাগে (প্রথম ফুট্‌টিতে) সেকেণ্ডের কাঁটা যেই আসিবে, সেই এক দুই তিন করিয়া নাড়ী গুণিতে আরম্ভ করিবে। বড় বড় করিয়া গুণিবার দরকার নাই। আস্তে আস্তে এমন করিয়া গুণিবে যে, তোমার রোগী বা তোমার কাছের লোক তা না শুনিতে পায়। শুনিলে দোষ নাই। শুনাইবারও দরকার নাই। যে ঘরের যে ফুট্ বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা আসিলে নাড়ী গুণিতে আরম্ভ করিছিলে, সেই ঘরের সেই ফুট্ বা দাগে কাঁটা ফের ঘুরিয়া আসিলে তবে গোণা বন্ধ করিবে। এই সময় টুকুর মধ্যে নাড়ী গুণে যত হবে, এক এক মিনিটে নাড়ী তত বার পড়িতেছে ঠিক্ করিবে। কেম না, মিনিটের কাঁটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মাথায় যে ৫টী করিয়া ফুট্ বা দাগ আছে, সেই এক একটী ফুট্ বা দাগকে এক এক মিনিট্ বলে। তেম্‌নি সেকেণ্ডের কাঁটার ১২টী ঘরের ফি ঘরের মধ্যের যে পাঁচটী করিয়া ফুট্ বা দাগ আছে, সেই এক একটা ফুট্ বা দাগকে এক এক সেকেণ্ড বলে। এক ঘণ্টার ৬০ ভাগের এক ভাগকে যেমন এক মিনিট বলে, তেম্‌নি এক মিনিটের ৬০ ভাগের এক ভাগকে এক সেকেণ্ড বলে। মিনিটের কাঁটা সব ঘর এক বার ঘুরিয়া আসিলে যেমন এক ঘণ্টা হয়, সেকেণ্ডের কাঁটা সব ঘর এক বার ঘুরিয়া আসিলে তেম্‌নি এক মিনিট হয়। নাড়ীর দিকে

মন, আর ঘড়ির সেকেণ্ডের কাঁটার উপর নজর ঠিক্ রাখা চাই। নৈলে, তোমার ঠিক্ গোণা হবে না। তুমি কেবল নাড়ীই গুণিবে। সেকেণ্ডের কাঁটা কত গুলি ফুট্ ফুট্ দাগ ছাড়াইল, তা তোমাকে গুণিতে হবে না।

ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী গোণা যেমন সোজা, ঘড়ি ধরিয়া নিশ্বাস গোণাও তেমনি সহজ। প্রথমে রোগীকে চিত হইয়া শুইতে বলিবে। তার পর, তার উপর-পেটে (বুকের কড়ার নীচে) তোমার ডাইন্ হাত খানি দিয়া রাখিবে। আর বাঁ হাতে ঘড়ি ধরিবে। নিশ্বাস লইলে উপর-পেট উচ হয়। আর নিশ্বাস ফেলিলে উপর-পেট নীচ হয়। কাজেই, সে যত বার নিশ্বাস লইবে, তত বার তোমার ডাইন্ হাত খানি উচ হইয়া উঠিবে। আর, যত বার নিশ্বাস ফেলিবে, তত বার ঐ হাত পেটের সঙ্গে সঙ্গে নীচ হইয়া যাইবে। নিশ্বাস লওয়ার আর নিশ্বাস ফেলা, এ দুই-ই গুণিবার দরকার নাই। শুদ্ধু নিশ্বাস লওয়া গুণিলেই হয়। কেন না, নিশ্বাস লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্বাস ফেলিতে হয়। এই জন্যে, তার প্রতি নিশ্বাসে তোমার ডাইন্ হাত যেমন উচ হইয়া উঠিবে, কেবল তাই দেখিবে আর গুণিবে। তার পর কোন একটী ঘরের প্রথম ফুট্ বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা যে আসিবে, সেই নিশ্বাস গুণিতে আরম্ভ করিবে। যে ঘরের যে ফুট্, বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা আসিলে গুণিতে আরম্ভ করিছিলে, সেই ঘরের সেই ফুট, বা দাগে সেকেণ্ডের কাঁটা ফের ঘুরিয়া আসিলে তোমার গোণা বন্ধ করিবে। এই সময় টুকুর মধ্যে তোমার ডাইন্ হাত যত বার উচ

হইয়া উঠিবে, এক এক মিনিটে রোগী তত বার নিশ্বাস লই-তেছে ঠিক্ করিবে। পেটে হাত না দিয়াও নিশ্বাস গোণা যায়। নিশ্বাস লইবার সময় বুক আর উপর-পেট দুই-ই উচ হয়। এই জন্যে, বুক বা উপর-পেটের উপর শুদ্ধ নজর রাখিয়াও নিশ্বাস গুণিতে পারা যায়। তবে উপর-পেটে হাত দিয়া গুণিলে গোণা বেশ ঠিক্ হয়। প্রতি মিনিটে নাড়ী কত বার পড়িতেছে, আর রোগী কত বার নিশ্বাস লই-তেছে, আলাদা এক খানি কাগজে সে সব বেশ স্পষ্ট করিয়া লিখিয়া রাখিবে। যত বার রোগী দেখিবে, সেই কাগজ খানিতে সে সব তত বার লিখিয়া রাখিবে। গায়ের তাত প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি আর নিশ্বাসের সংখ্যা, এই তিনই তাতে লিখিয়া রাখা চাই। রোজ রোজ যদি এই গুলি সব বেশ করিয়া লিখিয়া রাখ, তবে তোমার রোগীর রোগ বাড়ি-তেছে কি কমিতেছে, এ জংচাই করিবার জন্যে আর কাহা-কেও ডাকিতে হইবে না। তুমিই বুক-ঠুকে গৃহস্থকে তোমার আশা ভরসার কথা বলিতে পারিবে। কাগজ খানিতে যে রকম করিয়া লিখিবে, নীচে তা দেখাইয়া দিলাম।

তারিখ	সময়	গায়ের তাত	প্রতি মিনিটে নাড়ীর গতি	প্রতি মিনিটে নিশ্বাস
১৫ই চৈত্র	বেলা ৮টা	১০২·৪	১২০	৫০

গায়ের তাত ১০২·৪ বলিলে বা লিখিলে কি বুঝায়, ১৬৫—১৬৬র পাতে নীচের দিকে ছোট অক্ষরে তা বেশ করিয়া লিখিয়া দিয়াছি।

তোমার ঘড়িতে যদি সেকেণ্ডের কাঁটা না থাকে, তবে

কি তোমার ঘড়ি ধরিয়া নাড়ী দেখা আর নিশ্বাস গোণা হবে না? হবে। মিনিটের কাঁটার এক একটী ঘরের মাথায় যে পাঁচটী করিয়া ফুট্‌ বা দাগ আছে, তারই একটী ফুট্‌ বা দাগে মিনিটের কাঁটা যেই আসিবে, সেই রোগীর নাড়ী কি নিশ্বাস গুণিতে আরম্ভ করিবে। তার পর, সে ফুট্‌ বা দাগ ছাড়াইয়া আর একটী ফুট্‌ বা দাগে কাঁটা যেই আসিবে, সেই অমনি গোণা বন্ধ করিবে। একটী ফুট্‌ বা দাগ থেকে আর একটী ফুট্‌ বা দাগে মিনিটের কাঁটা আসিতে যত টুকু সময় লাগে, সেই সময় টুকুকে এক মিনিট বলে। এই জন্যে, এই সময় টুকুর মধ্যে নাড়ী বা নিশ্বাস গুণে যত হবে, কি মিনিটে নাড়ী বা নিশ্বাস তত বার পড়িতেছে ঠিক্ করিবে।

চিকিৎসা—এখন নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলি। নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে আমি কার্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শচর্ খাইতে দিই। য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (বোলাটাইল্ লিনিমেণ্ট) তার পিঠে, পাঁজরে মালিশ করিতে বলি। পিঠে, পাঁজরে তার্পিণ তেলের সেক দিতে বলি। আর রোজ সকালে ১০ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিই। এই কার্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শচর্ ১৭২র পাতে লেখা আছে। য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট ১২২র পাতে লেখা আছে। পিঠে, পাঁজরে কেমন করিয়া তার্পিণ তেলের সেক দিতে হয় ১৭১—১৭২র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। নিয়ুমোনিয়া রোগে রোগী শীঘ্রই ভারি কাবু আর কাহিল হইয়া পড়ে। এই জন্যে, গোড়া থেকেই তাকে মাংসের কাথ

আর ব্রাণ্ডি দিতে বলি। এক এক বারে মাংসের ক্বাথ দু ঔস (এক ছটাক) আর ১র নম্বর ব্রাণ্ডি দু ড্রাম্ (আধ কাঁচ্চা) করিয়া দিতে বলি। দু ঘণ্টা অন্তর এই নিয়মে মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি খাইতে দিলে রোগী বেশ চাঙ্গা থাকে। নিয়ুমোনিয়া রোগে ব্রাণ্ডির বড় দরকার। যে রোগের গোড়াতেই রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে, সে রোগ থেকে তাকে বাঁচাইতে হইলে তার আগে বল রক্ষা করা চাই। এ না বুঝিয়া যিনি নিয়ুমোনিয়া রোগীর চিকিৎসা করিবেন, তিনি ঠকিবেন। বিশেষ, নিয়ুমোনিয়া-রোগীর বল রক্ষা করিতে না পারিলে তার ব্যামো শীঘ্র শীঘ্র বাড়িয়া যায়। প্রথম অবস্থা থেকে দ্বিতীয় অবস্থা হয়। আবার দ্বিতীয় অবস্থা থেকে তৃতীয় অবস্থা হয়। এই হইলে তোমার আশা ভরসা ফুরাইল।

আমার বেশ মনে আছে, একটী নিয়ুমোনিয়া রোগীকে আমি রোজ ১২ ঔন্স করিয়া ব্রাণ্ডি খাওয়াইতাম। তার প্রথম স্বল্পবিরাম জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্) হয়। তার পর তার ডবল্ নিয়ুমোনিয়া হয়। দুই ফুল্‌কোরই যদি এক বারে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হয়, তবে তাকে ডবল্ নিয়ু-মোনিয়া বলে। এ কথা এর আগেই বলিছি। এখানে নিয়ুমোনিয়া তার স্বল্পবিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফিবরের) উপসর্গ ধরিতে হইবে। রোগের প্রথমে তার ভাল চিকিৎসা হয় নাই। হইলে তার অবস্থা এত খারাপ হইয়া উঠিত না। সান্নিপাতিক বিকারে রোগীর অবস্থা যত দূর খারাপ হইতে হয়, তা তার হইছিল। সে বাঁচিবে এমন কথা কেউ বলে

নাই। রোজ ১২ ঔন্স করিয়া ব্রাণ্ডি খাইতেছে। শুদু ব্রাণ্ডির বিষেতেই ও মারা যাবে। রোগের কথা এখন ছাড়িয়া দেও। রোগের ভারি বৃদ্ধির সময় যাঁরা এই কথা বলিতেন, রোগী ভাল হইলে, ব্রাণ্ডিতেই ওর জীবন রক্ষা করিয়াছে বলিয়া তাঁরাই আবার লোকের কাছে পরিচয় দিয়া বেড়াইতে লাগিলেন।

আমি এ পর্য্যন্ত যত নিয়ুমোনিয়া-রোগী দেখিছি, শুদু এই রকম চিকিৎসাতেই তারা সব ভাল হইয়াছে। ঐ কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চর্। ঐ য়্যামোনিয়া লিনি-মেণ্ট (বলেটাইল্ লিনিমেণ্ট)। ঐ তার্পিণ তেলের সেক। আর ঐ কুইনাইন্। সব নিয়ুমোনিয়া-রোগীকে ঐ এক অসু-দহ দিইছিলাম। কেবল দুটা কি তিনটা রোগীর বেলায় আর এক রকম অসুদ দিতে হইছিল। এ দুটা রোগীর কথা বলিবার আগে, কুইনাইন্ নিয়ুমোনিয়ার কেমন অসুদ, তা এক বার ভাল করিয়া বলিব।

কুইনাইন্ পিলের যেমন অসুদ, নিয়ুমোনিয়ারও তেম্‌নি অসুদ। পিলেতে চুলের মত যে সব খুব সরু সরু শির আছে, জ্বর (বিশেষ কম্পজ্বর) হইলে সেই সব শির রক্তে পরিপূর্ণ হয়, আর সেই জন্যে পিলের আকারও বড় হয়। কুইনাইন্ খাওয়াইলে সেই সব শিরের খোল কমিয়া যায়। কাজেই তাদের ভিতরে আর তেমন বেশী রক্ত থাকিতে পারে না। এই জন্যে, পিলের আকারও ছোট হইয়া যায়। নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্ দিলেও ঠিক্ ঐ রকম কাজ হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অব-

স্থায় ফুস্কোর শির গুলি রক্তে পরিপূর্ণ হয়। কুইনাইন্ খাওয়াইলে ফুস্কোর খুব সরু শির গুলির খোল কমিয়া যায়। এই জন্যে, তাদের ভিতরে তেমন বেশী রক্ত থাকিতে পারে না। সে সব শির থেকে রক্ত চলিয়া গেলে, ফুস্কোর আকার কাজেই ছোট হইয়া যায়। তবেই দেখ, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুইনাইন্ দিলে কি উপকারই হয়। নিয়ু-মোনিয়ার প্রথম অবস্থা জানিবার সঙ্কেত বা চিহ্ন কি, এর আগেই তা বলিছি। দুর্ব্বল রোগীদেরই নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় কুইনাইনে বেশী কাজ করে।

প্রথমে দু ঘণ্টা অন্তর ৫ গ্রেন্ করিয়া কুইনাইন্ দিবে। তার পর, রোগীর অবস্থা অনেক ভাল হইলে রোজ তিন বার করিয়া কুইনাইন্ দিবে। কুইনাইন্ দেওয়ার পর ২৪ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা ফিরিয়া যায়।

এখন নিয়ুমোনিয়ার অনেক রকম নূতন চিকিৎসা হইয়াছে। তার মধ্যে য়্যাকোনাইট্ আর অর্গট্ দিয়া যে চিকিৎসা, তাতেই সব চেয়ে ভাল ফল পাওয়া যায়। আগে য়্যাকোনাইটের কথা বলি। তার পর অর্গটের কথা বলিব।

(১) য়্যাকোনাইট্ নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুদ——

এখানে আমার একটি রোগীর পরিচয় দিই। বছর দেড়েক হইল, মেডিকেল কলেজের একটি ছাত্রের নিয়ু-মোনিয়া হইছিল। তাঁর বয়স ২২ বছর। শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট আর খুব সবল। চিকিৎসক তাঁর রোগ ঠাওরাতে পারেন নাই। কাজেই তাঁর চিকিৎসায় কোন ফলই হয় নাই। রোগীর সঙ্গে আমার বিশেষ জানা শুনা ছিল। এই

জন্যে, তিনি খবর দিয়া আমাকে লইয়া গেলেন। তাঁর যে নিয়মোনিয়া হইয়াছে, তাঁর কাছে গিয়া বসিতেই তা জানিতে পারিলাম। নিয়মোনিয়া-রোগী যে রকম ঘন ঘন আর কষ্ট করিয়া নিশ্বাস ফেলে, আর কোনও রোগে রোগীর নিশ্বাস সে রকম দেখা যায় না। নিয়মোনিয়ার লক্ষণের সঙ্গে এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। তার পর, তাপমান-যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিয়া তাঁর গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০৪র দাগে উঠিল। ঘাড় ধরিয়া নাড়া গুণিলাম, নাড়ী প্রতি মিনিটে, ১২০ বার পড়িতেছে। তার পর তাঁর নিশ্বাস গুণিলাম নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬০ বার পড়িতেছে। নিশ্বাস এত ঘন, কিন্তু নাড়ীর বেগ তত নয়—শুদ্ধ এতেই, রোগীর নিয়মোনিয়া হইয়াছে বলিয়া সন্দেহ করিতে পার। এর আগেই এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। তার পর গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। নিয়মোনিয়া-রোগীর গয়ের যে রকম আটা, চট্‌চটে আর পাটকিলে বা মরচের রং হইয়া থাকে, তাঁর গয়েরও ঠিক্ সেই রকম দেখিলাম। এই সব দেখিয়া তাঁর নিয়মোনিয়া হইয়াছে, ঠিক্ করিলাম। শেষে রোগীর ডাইন্ পিঠের নীচের দিকে ষ্টিথস্কোপ দিয়া শুনিলাম। কাণের কাছে এক গোছা চুল দুটী আঙুল দিয়া আস্তে আস্তে রগ্‌ড়াইলে যে রকম মিহি চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ঠিক্ সেই রকম শব্দ স্পষ্ট শুনিতে পাইলাম। নিয়মোনিয়ার কোন্ অবস্থায় এ রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়? নিয়মোনিয়ার প্রথম অবস্থায়। তার পর বাঁ পিঠের নীচের দিকে ষ্টিথস্কোপ দিয়া শুনিলাম। সহজ মানুষের

নিশ্বাস লওয়ার শব্দ শুনিতে পাইলাম। সহজ মানুষের নিশ্বাস লওয়ার শব্দ কি রকম? সহজ মানুষ নিশ্বাস লইলে তার বুকের মধ্যে নরম নরম এক রকম বেশ মিষ্টি শোঁ—শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এ কথা এর আগেই বলিছি। এই সব পরীক্ষা করিয়া কি স্থির করিলাম? রোগীর ডাইন্ ফুস্কোর গোড়ার দিকে প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন) হইয়াছে—তাঁর ডাইন্ দিকে নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিলাম।

এই সব পরীক্ষা করা হইলে অসুদের ব্যবস্থা করিলাম। অসুদ আর কি? সেই কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চর্, সেই য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট, সেই তার্পিণ তেলের সেক, সেই মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি ব্যবস্থা করিলাম। রোগী দু দিন এই নিয়মে অসুদ বিসুদ খাইল। কিন্তু তাঁর রোগের বিশেষ প্রতিকার হইল না। রোগী মেডিকেল কলেজে পড়েন। এক বছর পরে ডাক্তর হবেন। তাঁর ডাক্তরের ভাবনা কি? নিত্য নূতন নূতন ডাক্তর আসিয়া তাঁকে দেখিয়া যাইতে লাগিলেন। তাঁদের মুখে আবার নূতন নূতন কথাও শুনিতে লাগিলাম। কেউ বলিয়া গেলেন রোগীর ফুস্কোয় পচান ধরিয়াছে, আর রক্ষা নাই। দুই এক দিনের মধ্যেই মারা যাবে। কেউ বলিয়া গেলেন, আজ্ রাত্রেইবা কি হয়? কেউ বা বলিলেন দেরি না করিয়া এখনই রোগীর পিঠে বড় এক খান বেলেস্তরা বসাইয়া দেওয়া আবশ্যক। ভাগ্য ক্রমে এই সব ডাক্তরের সঙ্গে আমার এক বারও দেখা হয় নাই। তাঁরা যা যা বলিয়া যাইতেন,

রোগীর আত্মীয় স্বজন আমাকে তা খুলিয়া বলিতেন। নিয়ু-মোনিয়ার রোগীকে আমি যে সব অসুদ দিয়া থাকি, এখানে সে সব অসুদ দিয়া তেমন উপকার পাইলাম না। ডাক্তর-দের নানা রকম কথায় রোগীরও মনে ভয় হইয়াছে—রোগীর আত্মীয় স্বজনেরও মনে ভয় হইয়াছে। এ অবস্থায় আর কোন অসুদের ব্যবস্থা করিয়া তড়িঘড়ি চটক না দেখাইতে পারিলে চলিতেছে না। এই ভাবিয়া নূতন একটী অসুদের ব্যবস্থা করিলাম। সে অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম।

টিংচর য়্যাকোনাইট্	...	...	৬ ফোটা
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	...	...	৩ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ অসুদ আধ ঘণ্টা অন্তর উপ্‌রো-উপ্‌রি চারি বার, তার পর ২ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম।

সকাল বেলা এই রকম অসুদের ব্যবস্থা করিয়া দিয়া আসিলাম। তার পর সন্ধ্যার আগে গিয়া দেখিলাম যেন সে রোগীই নয়। গায়ের তাত সে রকম নাই। নাড়ীর বেগ সে রকম নাই। নিশ্বাসও সে রকম ঘন ঘন নাই। সকাল বেলা গায়ের তাত ১০৪ ছিল (পারা ১০৪র দাগে উঠিছিল)। প্রতি মিনিটে নাড়ী ১২০ বার, আর নিশ্বাস ৮০ বার পড়িতেছিল। সন্ধ্যার আগে গায়ের তাত পরীক্ষা করিলাম। পারা ১০২র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি ধরিয়া দেখিলাম, প্রতি মিনিটে নাড়ী ১০০ বার, আর

নিশ্বাস ৪০ বার পড়িতেছে। রোগীর গা আর সে রকম শুক্‌নো খস্‌খসে নাই। বেশ ঘাম-ঘাম আর নরম হইয়াছে। গয়েরের রং সে রকম নাই, অনেক পরিষ্কার হইয়াছে। আর গয়ের তত আটা আটাও নাই। য়্যাকোনাইটের কি আশ্চর্য্য শক্তি! ১২ ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর অবস্থা এত ভাল হইল! য়্যাকোনাইট্ খাইয়া রোগীর ঘাম হইতেছিল। এ ঘাম তার আরোগ্যের ঘাম। ডাক্তার মহাশয়েরা—যাঁরা তাঁকে অনুগ্রহ করিয়া দেখিতে আসিতেন—তা না বুঝিয়া বা বুঝিতে না পারিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলিয়া গেলেন, "এ সোজা ঘাম নয়—এ কাল্ ঘাম। এই ঘামেতেই রোগীর দফা নিকেশ। তাঁরা এই কথা বলিয়া চলিয়া গেলেই আমি গিয়া উপস্থিত হইলাম। রোগীর অবস্থা যত দূর খারাপ হইবার তা হইয়াছে। এঁর জীবন রক্ষার আর কোনও উপায় নাই। আজিই রোগী মারা যাবে—বাসার সকলেই ভাবিয়াছিলেন আমিও গিয়া এই সব কথা বলিব। কিন্তু আমি পরীক্ষা করিয়া যখন বলিলাম যে, এঁর জীবনের আর কোনও আশঙ্কা নাই—দুই চারি দিনের মধ্যেই আরোগ্য হইবেন, তখন তাঁরা সব যেন একবারে গাছ থেকে পড়িলেন। আমি রোগীর এই রকম ভাল অবস্থা দেখিয়া আর দেরি না করিয়া তখনই তাঁকে দশ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিলাম। আর দু বারে দশ গ্রেন করিয়া বিশ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিতে বলিলাম। আগের মত মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি দিতে বলিলাম। য়্যাকোনাইট্ মিক্শ্চর ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর দিতে বলিলাম। এই সব ব্যবস্থা

করিয়া আর রোগীকে খুব ভরসা দিয়া চলিয়া আসিলাম। তার পর দিন সকাল বেলা গিয়া দেখিলাম, রোগী বেশ স্ফূর্ত্তির সঙ্গে কথা বার্ত্তা কহিতেছেন। গায়ের তাত পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, পারা ১০০র দাগের উপর উঠিল না। ঘড়ি ধরিয়া গুণিলাম প্রতি মিনিটে নাড়ী ৮০ বার আর নিশ্বাস ৩২ বার পড়িতেছে। গয়ের প্রায় শাদা হইয়াছে, আর ওর আটাও ঢের কমিয়া গিয়াছে। কালি তিন বারে যেমন ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিইছিলে, আজিও তেমনি তিন বারে ৩০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিবে। য়্যাকোনাইট্ মিক্শ্চর আজি কেবল তিন বার খাওয়াবে। মাংসের ক্বাথ আর ব্রাণ্ডি যেমন চলিতেছে, তেমনি চলিবে। এই সব বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। তার পর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগী বালিশ ঠেশ দিয়া বসিয়া আছে। পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, গায়ের তাত, নাড়ীর বেগ, আর নিশ্বাস প্রায় স্বাভাবিক হইয়াছে। অস্বুদ আর পথ্যের ব্যবস্থা ঠিক্ সেই রকম রাখিতে বলিয়া বিদায় হইলাম। আর দু তিন দিনেই রোগী সচ্ছন্দ হইল। গায়ে হিম বাত লাগাইবে না। সর্ব্বদা ফ্ল্যানেলের পিরাণ বা জামা গায়ে দিয়া রাখিবে। এক মাসের মধ্যে স্নান করিবে না। ৮। ১০ দিন পর্য্যন্ত রোজ তিন বারে ৫ গ্রেন করিয়া ১৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ থাইবে। কোন পরিশ্রমের কাজ করিবে না। আর কোনও রকম অত্যাচার করিবে না—এই সব উপদেশ দিয়া আমি শেষ বিদায় লইলাম।

সবল রোগীর পক্ষে য়্যাকোনাইট যেমন ব্যবস্থা, দুর্ব্বল

রোগীর পক্ষে তেমন নয়। এ কথাটা খুব যেন মনে থাকে।

(২) অর্গট্ অব্ রাইও নিয়ুমোনিয়ার বড় অসুখ—আমার এক জন উড়ে চাকর ছিল। তার নাম বীরু। বয়স ২৫ বছরের কম নয়। প্রায় বছর খানেক হইল সে আমার সঙ্গে কোন স্থানান্তরে গিয়ছিল। সেখানে যাইতে পথেই সন্ধ্যা হয়। সন্ধ্যার পর একটা বাগানের ভিতর দিয়া যাইবার সময় সে ভারি ভয় পায়। এ কথা তখন সে আমাকে কিছুই বলে নাই। যে রাতে সেখানে পৌঁছিলাম, তার পর দিন তার জ্বর হয়। জ্বর বড় বেশী হয় নাই। ১০। ১৫ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাইয়াই বেশ সুস্থ হয়। তার পরেই তাকে কষ্ট করিয়া আমার সঙ্গে কলিকাতায় আসিতে হয়। সহজ শরীরে সে যে রকম কাজ কর্ম্ম ও স্নানাহার করিত, কলিকাতায় পৌঁছিয়াও সে ঠিক্ সেই রকম কাজ কর্ম্ম ও স্নানাহার করিতে লাগিল। রোজ বৈকালে তার জ্বরভাব হইত, তবুও কলের ঠাণ্ডা জলে স্নান করা কামাই দিত না। দুই তিন দিন এই রকম অত্যাচার করিতেই ভারি জ্বরে পড়িল। এক দিন সকালে খুব কম্প দিয়া জ্বর আসিল। এক দিনের জ্বরেই বীরু এক বারে নেতিয়ে পড়িল। জ্বরের ধমকে এক বারে কাঠ কাটিতে লাগিল। খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতে লাগিল, আর আটা আটা লাল্‌চে গয়ের তুলিতে লাগিল। এই রকম গয়ের উঠা দেখিয়া তার খুড় ভয় পাইয়া আমাকে খবর দিল। তারা দুই খুড় ভাইপোতেই আমার বাড়ীতে কাজ করিত। এরই মধ্যে বীরুর যে এমন ব্যামো হইয়াছে,

আমি তা জানিতাম না। তার খুড়র মুখে শুনিয়া তখন সব জানিতে পারিলাম। অমন কম্প দিয়া জ্বর আসা, আর ও রকম গয়ের উঠার কথা শুনিয়া নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিয়া তাকে দেখিতে গেলাম। প্রথমে ঘড়ি ধরিয়া হাত দেখিলাম, নাড়ী প্রতি মিনিটে ১৩০ বার পড়িতেছে। তারপর তার নিশ্বাস গুণিলাম, নিশ্বাস প্রতি মিনিটে ৬৫ বার পড়িতেছে। তার পর তার গয়ের পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। গয়ের যেন এক বারে জিউলির আটা, আর তার রং ঠিক্ যেন ইটের গুঁড় কিম্বা মর্চের মত। এই সব লক্ষণ দেখিয়া তার নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে কি না, ঠিক করিবার জন্যে তার বুক পরীক্ষা করিয়া দেখিবার কোনও দরকার ছিল না। তবে একটা ফুস্কোর প্রদাহ হইয়াছে, কি দুটরই হইয়াছে, আর নিয়ুমোনিয়ার কোন অবস্থা, শুদ্ধ তাই জানিবার জন্যে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া তার দুই পিঠের নীচের দিক্ পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। কানের কাছে এক গোছা চুল দুই আঙ্গুল দিয়া আস্তে আস্তে রগ্ড়াইলে যে মিহি চিচ্চিড় শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, তার দুই পিঠেই ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনিতে পাইলাম। এতে কি ঠিক্ করিলাম। তার দুই ফুস্কোরই গোড়ার দিকে প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) হইয়াছে, আর নিয়ুমোনিয়ার এই প্রথম অবস্থা। দুই ফুস্কোর প্রদাহকে ডাক্তরেরা ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি। প্রদাহ অর্থাৎ ইনফ্ল্যামেশন্ কাকে বলে, ২০০র পাতে তা বলিছি।

নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে সচরাচর যে সব অষুদ দিয়া

থাকি, একেও সেই সব অসুদ দিলাম। সেই কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্শ্চর খাইতে দিলাম। সেই লিনিমেণ্ট বুকে, পিঠে, পাঁজরে মালিশ করিতে দিলাম। বুকে, পিঠে, পাঁজরে তার্পিণের সেই রকম করিয়া সেক দিতে বলিলাম। কুইনাইন্ খাওয়াইবারও সেই রকম ব্যবস্থা করিলাম। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে মাংসের কাথ আর একের নম্বর ব্র্যাণ্ডি নিয়ম মত দিতে বলিলাম। পৌষ মাসের শীত, খুব গরমে রাখা ভারি দরকার। এই জন্যে ঘরের মধ্যে যেখানে বাতাস না লাগিতে পারে, সেই খানে রাখিয়া তার সেবা শুশ্রূষা করিতে বলিয়া দিলাম। ফল কথা, তার চিকিৎসার কোনও ত্রুটি হইল না। কিন্তু তার রোগ ক্রমে না কমিয়া দিন দিন বরং বৃদ্ধিই হইতে লাগিল। রোগী যার পর নাই কাহিল হইয়া পড়িল। যেমন হাঁপ, তেমনি কাশি। হাঁপানির সঙ্গে আবার গোংড়ানি। নিয়ত চোক্ বুজিয়া কেবল গোংড়াইতে লাগিল। বিড়্ বিড়্ করিয়া প্রলাপ বকিতে লাগিল। আর মাঝে মাঝে বিছানার কাপড় টানিতে লাগিল। গয়ের যা উঠিতে লাগিল, তা এক বারে রক্ত মাখা। এ রকম গয়ের দেখিয়া কি বুঝিলাম? ফুস্ফোয় যত দূর রক্ত জমিতে হয় তা জমিয়াছে, এই বুঝিলাম। এ চিকিৎসায় রোগীকে কখনই বাঁচাইতে পারা যাবে না, এই মনে করিয়া আর একটী অসুদের ব্যবস্থা করিলাম। সে অসুদটী নীচে লিখিয়া

লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গট্ ... ৩ ড্রাম্
টিংচর ডিজিটেলিস্ ... ... ১ ড্রাম
সিনেমন্ ওয়াটর্ (দারুচিনির জল) ... ৩ ঔন্স পূরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ অষুদ দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে বলিলাম। গয়েরের রং যত ক্ষণ না শাদা হবে, তত ক্ষণ এই নিয়মে অষুদ খাওয়াইবে। গয়েরের রং শাদা হইলে পর রোজ দু বারের বেশী অষুদ খাওয়াইবার দরকার নাই।

অর্গটের কি আশ্চর্য্য শক্তি! চারি পাঁচ দাগ অষুদ খাইতেই তেমন যে রক্ত-মাখা গয়ের, তাও প্রায় শাদা হইয়া গেল। গয়েরে রক্ত থাকিল না বলিলেই হয়। শুদ্ধ গয়েরের রং ফিরিল এমন নয়। সেই সঙ্গে সঙ্গে হাঁপ, কাশি, গোংড়ানি, ভুল-বকা, বিছানার কাপড় টানা—এ সবও ক্রমে ক্রমে ভাল হইল। তার পর দিন সকালে উঠিয়া দেখিলাম যেন সে রোগীই নয়। গয়ের এক বারে পরিষ্কার হইয়া গিয়াছে। তাতে রক্তের লেশও নাই। হাঁপ নাই বলিলেও হয়। আর সহজ বেলার মত চাহিয়া রহিয়াছে। বলিতে গেলে অর্গট্ খাইয়া ২৪ ঘণ্টায় মধ্যে তেমন মরা রোগী জীয়ন্ত হইল। এতেই বলিতেছি, নিয়ু-মোনিয়ার যেমন অষুদ অর্গট্, তেমন অষুদ আর নাই। ফল কথা, অর্গটে নিয়ুমোনিয়া যত শীঘ্র সারে, আর কোনও অষুদে তত শীঘ্র সারে না। এ পর্য্যন্ত যত গুলি নিয়ু-মোনিয়া-রোগীকে অর্গট্ দেওয়া হইয়াছে, তার একটা

মারা পড়ে নাই। রোগও পুরাণ হয় নাই। আর ফুস্কো-তেও কোন রকম দোষ থাকিয়া যায় নাই। এর আগেই বলিছি যে, নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় বায়ুকোষ আর তার লাগাও খুব সরু বায়ুনলিগুলির ভিতরে খুব আটাল এক রকম জিনিশ জমে। অর্গট্ খাওয়াতে আরম্ভ করার পর সে জিনিশ আর সৃষ্টি হইতে পারে না। অর্গট্ খাও-য়াইবার আগে যা জমিয়াছে, তা পর্য্যন্ত ক্রমে ক্রমে শুষিয়া যায়। রোগের সূত্রপাতে অর্গট্ দিতে পারিলে অনেক জায়গায় নিয়ুমোনিয়া ভাল করিয়া সৃষ্টিই হইতে পারে না। এ অসুদ রোগীকে খাওয়াইলেও যে ফল, চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও সেই ফল। রোগী অসুদ খাইতে পারিলে তার চামড়ার নীচে অসুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার কোনও দরকার নাই। অর্গট্ নিয়ুমোনিয়ার যেমন অসুদ, ফুস্কো থেকে রক্ত উঠারও তেম্‌নি অসুদ। ফুস্কো থেকে রক্ত উঠাকে ডাক্তরেরা হিমপ্‌টিসিস্ (কাশিয়া রক্ত তোলা) বলেন। আর পেট থেকে রক্ত উঠাকে তাঁরা হিমিটিমিসিস্ (রক্ত বমি) বলেন। এ দুই রোগেই মুখ দিয়া রক্ত উঠে। এর পর এ সব কথা বেশ করিয়া বলিব। অর্গট্ ছাড়া বীরুকে রোজ দু বেলা ১০ গ্রেন্ করিয়া ২০ গ্রেন্ কুইনাইন্ দিতাম। আর মাংসের কাথের সঙ্গে এক এক বারে ২ ড্রাম্ করিয়া এক্কের নম্বর ব্রাণ্ডি খাইত। এ ছাড়া তাকে আর কোনও অসুদ দেওয়া যায় নাই। মালিশ পর্য্যন্তও করিতে হয় নাই। নিয়ুমোনিয়ার এমন সহজ চিকিৎসা আর নাই। শুধু সহজ নয়, এত ফলও আর কোনও চিকিৎসায় পাওয়া

যায় না। য়্যাকোনাইট্ও ইহার কম অসুদ নয়। তবে রোগী বড় কাহিল হইয়া পড়িলে, তাকে য়্যাকোনাইট্ দেওয়া যায় না। দুর্ব্বল রোগীকে য়্যাকোনাইট্ খাওয়াইলে উপকারের চেয়ে অপকারই বেশী হয়। তবেই য়্যাকোনাইট্ কেবল খুব সবল রোগীরই অসুদ জানিয়া রাখ। এ কথা এর আগেই বলিছি। নিয়ুমোনিয়া রোগে রোগী শীগ্‌গিরই ভারি কাহিল আর কাবু হইয়া পড়ে। এ ছাড়া, রোগের সূত্রপাতেই রোগীর চিকিৎসা করা আমাদের দেশের চিকিৎসকদের ভাগ্যে প্রায়ই ঘটে না। কাজেই, সব জায়গায় না হোক্, প্রায়ই য়্যাকোনাইট্ দিবার সময় উৎরে গেলে তবে চিকিৎসককে নিয়ুমোনিয়ার রোগী গিয়া দেখিতে হয়। এই জন্যেই বলিতেছি যে, সব দিক্ ধরিতে গেলে অর্গটের চেয়ে নিয়ুমোনিয়ার ভাল অসুদ আর নাই।

ডিজিটেলিস্ নিয়ুমোনিয়ার আর একটী ভাল অসুদ, এই জন্যে বীরুকে অর্গটের সঙ্গে টিংচর ডিজিটেলিস্ দিইছিলাম।

য়্যাসিটেট্ অব্ লেড্ও নিয়ুমোনিয়ার কম অসুদ নয়। য়্যাসিটেট্ অব্ লেড্‌কে শুগার্ অব্ লেড্ও বলে। দুর্ব্বল রোগীদের পক্ষে এ অসুদটী খুব ভাল। ছেলেদের নিয়ুমোনিয়ার এ বড় চমৎকার অসুদ। এক বছরের ছেলেকে আধ গ্রেন্ শুগার্ অব্ লেড্ দুই তিন ঘণ্টা অন্তর দেওয়া যাইতে পারে। শুগার্ অব্ লেড্ রোগীর অনেক যন্ত্রণা নিবারণ করে। যদি বল তবে বীরু চাকরকে শুগার্ অব্ লেড্ দেও নাই কেন? অর্গট্ আর ডিজিটেলিসের সঙ্গে

শুগার্ অব্ লেড্ দিতে ত তার আরও বেশী উপকার হইত। তাকে শুগার্ অব্ লেড্ দিই নাই তার কারণ আছে। সে আগে কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া খাইয়াছিল। যে রোগীকে কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া দেওয়া যায়, তাকে শুগার্ অব্ লেড্ দেওয়া যায় না। দিলে তার শূল-বেদনা আসিয়া উপস্থিত হয়। কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া আর শুগার্ অব্ লেড্ একত্র মিলে কার্ব্বনেট্ অব্ লেড্ হয়। এই কার্ব্বনেট্ অব্ লেড্ শূল বেদনা জন্মিয়া দেয়। এই জন্যে বাঁরু চাকরকে শুগার্ অব্ লেড্ দিই নাই। তার ব্যামোর গোড়ায় যদি অর্গট্ দিতাম, তবে অর্গট্ আর ডিজিটেলিসের সঙ্গে শুগার্ অব্ লেডও দিতাম। অর্গট্ আর ডিজিটেলিসের সঙ্গে শুগার্ অব্ লেড্ এক এক বারে দেড় গ্রেন্ করিয়া দেওয়া যায়। কোন রোগের যদি দু তিনটী ভাল অসুদ জানা থাকে, তবে তা একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুদু একটা অসুদে তেমন উপকার হয় না। এই মনে কর, পিলে-জ্বরের কুইনাইন্ যেমন অসুদ, সল্‌ফেট্ অব্ আয়র্ণও (হীরেকশ) তেমনি অসুদ। এই জন্যে শুদু কুইনাইনের চেয়ে, কুইনাইন্ আর সল্‌ফেট্ আয়র্ণ (হীরেকশ) একত্র দিলে পিলে জ্বরে বেশী উপকার হয়। গ্যালিক্-য়্যাসিড্, সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্, দুই-ই পেটের ব্যামোর অসুদ। দুই অসুদ এক সঙ্গে দিলে যেমন উপকার হয়, শুদু গ্যালিক্ য়্যাসিড্ কি সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ দিলে তেমন উপকার হয় না। আফিংও পেটের ব্যামোর খুব ভাল অসুদ। এই জন্যে, গ্যালিক্ য়্যাসিড্ আর সল্‌ফিয়ুরিক্

য়্যাসিডের সঙ্গে টিংচর ওপিয়াই (আফিঙের আরোক) দিলে আরও বেশী উপকার হয়। তাতেই বলিতেছি, কোন রোগের ব্যবস্থা করিবার সময়, সে রোগের যত গুলি ভাল অসুদ আছে, আগে মনে করিবে। তার পর যে কয়টী অসুদ এক সঙ্গে দিলে অসুদের গুণেরও তফাত হয় না, রংও খারাপ হয় না, সেই কয়টী অসুদ একত্র দিবে। এ সব ভাল করিয়া জানিতে হইলে, অসুদের বিষয় (মেটিরিয়া মেডিকা) ভাল করিয়া পড়িতে হয়। পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে মেটিরিয়া মেডিকা এক খানি শীঘ্রই লিখিব।

যদি বল দুটা তিনটী অসুদ একত্র দিবার আবার বাধা কি? এক এক প্রেস্‌কৃপ্‌শনে (ব্যবস্থাপত্রে) পাঁচ সাতটা অসুদও ত একত্র দেওয়া যায়। তা যায় সত্য। কিন্তু মনে করিলেই যে সে অসুদ দুট পাঁচটা এক সঙ্গে দিতে পার না। এমন অনেক অসুদ আছে, একত্র মিশাইলে তাদের গুণের ব্যত্যয় (তফাত) হয়। আবার কখনও কখনও রংও খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে বলিছি, যে রোগীকে কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়া দেওয়া যায়, তাকে শুগার অব্ লেড্ দেওয়া যায় না। দিলে তার শূল বেদনা ধরে। কার্ব্বনেট্ অব্ য়্যামোনিয়ার সঙ্গে যদি শুগার্ অব্ লেড্ ব্যবস্থা কর, তবে তোমার রোগীকে অসুদ খাওয়ান হবে না, শূলরোগ তয়ের করিয়া তার পেটের মধ্যে দেওয়া হবে। তার পর, অসুদের রং খারাপ হওয়ার দৃষ্টান্ত দিই। সল্‌ফেট অব্ আয়র্ণ (হীরেকশ) কি টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিসের সঙ্গে যদি টিংচর বা ডিককশন্ সিংকোনা দেও, তবে অসুদ

ত হবে না, লিখিবার বেশ কালি তয়ের হবে। শুদু সল্‌ফেট অব্ আয়র্ণ টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ বলিয়া নয়, লোওয়া থেকে যত অসুদ তয়ের হয়, গাছড়া কষা অসুদের সঙ্গে মিশিলেই ঐ রকম কালি তয়ের হয়। এতেই বলিতেছি, যে সে অসুদ মনে করিলেই একত্র দেওয়া যায় না।

নিয়ুমোনিয়ার তিনটী অবস্থা পৃথক্ পৃথক্ সত্য। কিন্তু ধরিতে গেলে চিকিৎসার ব্যবস্থা সে রকম পৃথক্ পৃথক্ নয়। কেন না রোগী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে নিয়ুমোনিয়া রোগে যত বিপদ্, এত আর কোন রোগেই নয়। এই জন্যে যে উপায়ে হোক্ তার বল রক্ষা করিবে। বল রক্ষা করিবার উপায় আর কি? নিয়ম করিয়া বলকারক আহার দিলে রোগী বেশ চাঙ্গা থাকে আর বল বৃদ্ধি হয়। বলকারী আহারের মধ্যে দুধ আর মাংসের কাথ রোগীর পক্ষে যে সব চেয়ে ভাল তা এর আগে অনেক বার বলিছি। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে কার্ব্বণেট অব্ য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চরের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডি ত দেওয়া চাই-ই। তা ছাড়া, কখন কখন (অর্থাৎ রোগী বেশ দুর্ব্বল হইয়া পড়িলে) দুধের সঙ্গেই হোক্, জলের সঙ্গেই হোক্, আর মাংসের কাথের সঙ্গেই হোক্ দু ঘণ্টা অন্তর এক কাঁচ্চা (৪ ড্রাম্) করিয়া একের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবার দরকার হয়। এ কথা এর আগেই বলিছি। দ্বিতীয় অবস্থায় কেহ কেহ বেলেস্তরা বসাইয়া থাকেন। কিন্তু বেলেস্তরায় উপকারের চেয়ে অপকার বেশী। য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট মালিশ করিলে আর তার্পিণের সেক দিলে যখন সেই কাজ হয়, তখন বেলেস্তরা

দিয়া রোগীকে মিছামিছি কষ্ট দিবার কিছু দরকার নাই। বেলস্তরায় শুধু কষ্ট নয়, বিপদও আছে। রোগী তাতে আরও কাহিল আর কাবু হইয়া পড়ে। কুইনাইন্ নিয়ু-মোনিয়ার সকল অবস্থাতেই দেওয়া যায়। আমি ত বলি কুইনাইন্ ম্যালেরিয়া-জ্বরের যেমন অসুদ, নিয়ুমোনিয়ারও তেমনি অসুদ।

নিয়ুমোনিয়ার তৃতীয় অবস্থায় য়্যামোনিয়া, ব্রাণ্ডি প্রভৃতি ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদের যত দরকার, এত আর কোনও অবস্থায় নয়। কেন, তা কি আর বলিতে হবে? তৃতীয় অবস্থায় রোগীকে যে বাঁচাইয়া রাখাই কঠিন। কাজেই ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ তাকে মুহুর্মুহু দেওয়া চাই। এ অবস্থায় ডাইলিয়ুট ফস্ফরিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে কুইনাইন, টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ আর ক্লোরেট অব্ পটাশ দিলে খুব উপকার হয়। এ সব অসুদ একত্র কেমন করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কুইনাইন্	... ...	৩৬ গ্রেন্
টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্	...	২ ড্রাম্
ডাইলিয়ুট ফস্ফরিক্ য়্যাসিড্	...	২ ড্রাম্
ক্লোরেট অব্ পটাশ ...	...	২ ড্রাম্
ইন্ফিয়ুশন্ কোয়াশিয়া	...	১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩। ৪ বার খাওয়াইবে।

রোগীর নিশ্বাসে ভারি দুর্গন্ধ হইলে, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অসুদটী খাইতে দিবে।

লাইকর সোডী ক্লোরেটি (ক্লরিনেটেড্ সোডার জল) ১½ দেড় ড্রাম
কর্পূরের জল (ক্যাম্ফর্ ওয়াটর) ... ৮ ঔন্স পূরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ ৩ বার খাওয়াইবে। এ অসুদে দুটী উপকার করে। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ শুধ্‌রে দেয়, আর রোগের ঝাগ ফিরাইয়া দেয়।

এই সব অসুদের সঙ্গে রোগীকে কড্‌লিবর্ অইল্ দিলেও খুব উপকার হয়।

ফুটন্ত গরম জলে ক্রুয়েসোট, কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্, কিম্বা তার্পিণ ঢালিয়া দিয়া সেই ভাব নিশ্বাসের সঙ্গে লইলে খুব উপকার হয়। নিশ্বাসের দুর্গন্ধ কমিয়া যায়। দু তিন ঘণ্টা অন্তর এই রকম করিয়া ভাব লইবে। এক এক বারে ১৫ মিনিট্ ধরিয়া ভাব লইবে।

এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার সকল অবস্থাতেই কুইনাইন্ দেওয়া যায়। শুদ্ধ দেওয়া যায় বলিয়া নয়, দিলে বিশেষ উপকার হয়। কুইনাইন বেশী করিয়া খাওয়াইলে নিশ্বাসের দুর্গন্ধও কমে। রোজ ৩। ৪ বার করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে, আর এক এক বারে ১০। ১৫ গ্রেন করিয়া কুইনাইন দিবে। রোগীকে চাঙ্গা রাখিবার জন্যে, সে যত পরিপাক করিতে পারিবে, তাকে তত মাংসের ক্বাথ, দুধ আর এঁকের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবে।

নিয়ুমোনিয়া-রোগীর চিকিৎসায় আর একটী কথা বিশেষ করিয়া মনে রাখা চাই। সে কথাটী এখনও পর্য্যন্ত

বলি নাই। রোগীকে যত দূর পারিবে, স্থির রাখিবে। এ রোগে রোগী যত স্থির থাকিবে, তার পক্ষে ততই ভাল। বারে বারে উঠ্ বোস্ করা, কি বিছানায় এ পাশ ও পাশ করা এ রোগে যেমন নিষেধ, এমন আর কোনও রোগেই নয়। অনেক রোগী শুইয়া অসুদ খাইতে চায় না। যত বার অসুদ খাবে, তত বার উঠিয়া বসিবে। এতে যে কত দোষ, তা গৃহস্থেরা ত জানেনই না, অনেক চিকিৎসকেও তা জানেন না। সামান্য জ্বর জাড়িতে এ রকম করিলে বিশেষ হানি নাই। কিন্তু নিয়ুমোনিয়া রোগে এটা ভারি নিষেধ। শুদ্ধ নিয়ুমোনিয়া বলিয়া কেন, ফুস্ফো কি হৃৎপিণ্ডের যে কোন ভারি রোগে রোগীর স্থির থাকা ভারি দরকার। হৃৎ-পিণ্ডকে ইংরিজিতে হার্ট বলে। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। অসুদ খাইবার জন্যে উঠিয়া বসা দূরে থাক, প্রস্রাব বাহ্যে করিবার জন্যেও উঠিয়া বসিবে না। শরা ধরিলে বিছানায় শুইয়া রোগী সহজেই প্রস্রাব করিতে পারে। কিন্তু শরায় তেমন সহজে বাহ্যে করিতে পারে না। এই জন্যে, তার বিছানায় অইল্ ক্লথ্ পাতিয়া দিবে। তার বাহ্যের পীড়া হইলে অইল্ ক্লথের উপর ছেঁড়া ন্যাক্ড়া বা কোষ্ঠা (পাট) বিছাইয়া দিবে। সে শুইয়া এই ছেঁড়া ন্যাক্ড়া বা কোষ্ঠার উপর সহজেই বাহ্যে করিতে পারে। বাহ্যে করিবার সময়ও সে শরায় প্রস্রাব করিতে পারে। তার পর সেই ন্যাক্ড়া বা কোষ্ঠা সুদ্ধ ময়লা উঠাইয়া লইয়া ভিজে ন্যাক্ড়া দিয়া অইল্ ক্লথ্ মুচিয়া ফেলিলেই সব বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। এমন সব রোগীর বিছানা পরিষ্কার

রাখিবার জন্যে অইল্ ক্লথের ভারি দরকার। উপরে অইল্ ক্লথ্ পাতা থাকিলে কোন রকমে বিছানা ভিজিয়া যাইবার জো থাকে না। অইল্ ক্লথ্ ফুঁড়িয়া তার নীচে জল যাইতে পারে না। এই জন্যে, অইল্ ক্লথের উপর কোন রকম নোংরা হইলে, জল দিয়া কি ভিজে ন্যাকড়া দিয়া তা বেশ পরিষ্কার করিতে পারা যায়। তাতে বিছানার কাপড় চোপড় ভিজিবার কোন ভয় থাকে না। যেমন মোম-জমা, অইল্ ক্লথও তেমনি এক রকম তেল-জমা। অইল্ ক্লথ্ অনেক রকম। তার মধ্যে কাল রঙের অইল্ ক্লথই সব চেয়ে ভাল; কাল রঙের অইল্ ক্লথ্ বেশী টেকে। আর আর যে সব রঙের অইল্ ক্লথ্ আছে, তাদের উপরকার ছাল জায়গায় জায়গায় শীঘ্র উঠিয়া যায়। অইল্ ক্লথের ছাল উঠিয়া গেলে সে আর কোন কাজে লাগে না। তার উপর জল দিয়া আর পরিষ্কার করা যায় না। জল দিয়া পরিষ্কার করিতে গেলেই নীচেকার বিছানার কাপড় চোপড় সব ভিজিয়া যায়। অইল্ ক্লথ্ যেমন দরকারি, তার দাম কিন্তু তেমন বেশী নয়। এক গজ অইল্ ক্লথের দাম বড় জোর পাঁচ সিকা (১।০)। অইল্ ক্লথের বহরও খুব। এই জন্যে আধ গজ কিনিলেও চলে। অইল্ ক্লথ্ দিয়া রোগীর সব বিছানা ঢাকিয়া দিবার দরকার নাই। তাতে অনেক খানি অইল্ ক্লথের দরকার। গরিবেরা অত খানি অইল্ ক্লথের দাম পাবে কোথায়? রোগীর কেবল কোমর আর পাছা অইল্ ক্লথের উপর থাকে, এমনি জুত বরাবর করিয়া বিছানার তত টুকু অইল্ ক্লথ্ দিয়া ঢাকিয়া দিবে। অইল্ ক্লথ্ কলিকাতার বড় বাজারে কিনিতে

পাওয়া যায়। আজ্ কাল্ ছোট খাট শহর জায়গাতেও পাওয়া যায়। ছোট ছেলে পিলে বারে বারে প্রস্রাব করে। এই জন্যে তাদের বিছানা পরিষ্কার আর শুক্‌নো রাখা বড় শক্ত। দুর্গন্ধ নোংরা, আর ভিজে বিছানায় শুইয়াই আমাদের দেশের বার আনা ছেলের ব্যামো হয়। এই জন্যে, ছেলেদের বিছানা পরিষ্কার আর শুক্‌নো রাখিবার জন্যেও অইল্ ক্লথের ভারি দরকার।

নিয়ুমোনিয়ার রোগীকে স্থির রাখা যেমন দরকার, তার ঘর দিন রাত সমান গরম রাখাও তেমনি দরকার। তাপমানযন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দু রকম। রোগীর গায়ের তাত পরীক্ষা করিবার জন্যে যে তাপমানযন্ত্র, তার কথা এর আগেই বলিছি। বাহিরের তাত পরীক্ষা করিবার জন্যে আর এক রকম তাপমানযন্ত্র আছে। এ তাপমানযন্ত্র ঘরের দেওয়ালে টাঙ্গাইয়া রাখে। এই জন্যে চেপ্টা এক খান কাঠের মাঝখানে এই তাপমানযন্ত্র লাগান থাকে। প্রায় সকল ভদ্র সাহেবেরই ঘরে এই তাপমানযন্ত্র আছে। আজ্ কাল্ অনেক ভদ্র বাঙ্গালীও (বিশেষ বড় মানুষেরা) ঘরের দেওয়ালে এই তাপমানযন্ত্র টাঙ্গাইয়া রাখেন দেখিছি। ঘরে এ তাপমানযন্ত্র একটা থাকিলে, দিন রাত রোগীর ঘর সমান গরম রাখা শক্ত নয়। কেন না, ঘর একটু বেশী গরম হইলেও তাপমানযন্ত্রে তা জানা যায়। ঘর একটু ঠাণ্ডা হইলেও তাপযন্ত্রে তা জানা যায়। ঘর গরম হইলে পারা উপরে উঠে। আর ঘর ঠাণ্ডা হইলে পারা নীচে নামিয়া যায়। তবেই, পারা এক জায়গায় থাকিলে জানিতে পারিলে, ঘর থানি

ঠিক্ এক সমান গরম আছে। যাদের ঘরে ও তাপমানযন্ত্র নাই, তাদের উপায় কি হবে? তাদের ঘর দিন রাত সমান গরম রাখিবার কি আর কোনও উপায় নাই? উপায় আছে, বেশ উপায়ই আছে। এখানে আমাদের নিজের শরীরকেই তাপমানযন্ত্র করিতে হইবে। বাইরে থেকে ঘরের মধ্যে গেলে যদি খুব গরম বোধ হয়, আর সে গরমে তোমার কষ্ট হয়, তবে সে রকম গরম ঘর রোগীর পক্ষে ভাল নয় ঠিক্ করিবে। আর ঘরের মধ্যে গেলে যদি বেশ ঠাণ্ডা বোধ হয়, তবে সে রকম ঠাণ্ডা ঘরও রোগীর পক্ষে ভাল নয় জানিবে। এই দুয়ের মাঝা-মাঝি যে ঘর, সেই ঘরই নিয়ু-মোনিয়া রোগীর পক্ষে ভাল। ঘরের মধ্যে গেলে যেন একটুও ঠাণ্ডা বোধ না হয়, বরং একটু গরম বোধ হয়, সে ভাল। গ্রীষ্মকালে ঘর গরম রাখিবার জন্যে যত্ন করিতে হয় না। এম্‌নিই গ্রীষ্মতে লোকে এক বারে যেন হাঁপাইতে থাকে। শীতকালে, বিশেষ রাত্রে, ঘর গরম রাখিবার জন্যে একটু যত্ন করিতে হয়। ঘরের এক কোণে কড়া, হাঁড়ি, কি মালশায় করিয়া আগুণ রাখিলে ঘর বেশ গরম থাকে। ঘরের মধ্যে কাঠ কুঠা জ্বালাইয়া আগুণ তয়ের করা হবে না। তা করিলে ঘরের মধ্যে ধোঁওয়া হবে। ঘরের মধ্যে ধোঁওয়া হওয়া ভাল নয়। ধোঁওয়াতে কাশ রোগ বাড়ে। গুলের আগুণই হোক্, টিকের আগুণই হোক্, কাঠের আগুণই হোক্, আর ঘুঁটের আগুণই হোক্, বাইরে বেশ করিয়া ধরাইয়া তবে ঘরে লইয়া যাইবে। যদি বল গুলের আগুণে ত ধোঁওয়া হয় না, তবে ও বাইরে ধরাইবার দরকার

কি ? গুলের আগুনে ধোঁওয়া হয় না বটে, কিন্তু গুল ধরাইবার সময় যে একটা ভাব আর মিষ্টি মিষ্টি গন্ধ বাহির হয়, তাতে সহজ মানুষেরই যেন হাঁপ লাগে।

দুওর কি জানালার ঠিক সরাসরি রোগীর বিছানা করিবে না। ও রকম জায়গায় রোগীকে শোওয়াইলে, বাইরের বাতাস তার গায়ে একবারে সরাসর আসিয়া লাগে। অমন জায়গায় শুইয়া গায়ে বাতাস লাগাইলে সহজ মানুষেরও অসুখ হয়—শর্দ্দি হয়, কাশি হয়, জ্বর হয়। এই জন্যে, রোগীকে এমন জায়গায় শোওয়াইবে যে, তার গায়ে বাইরের বাতাস ও রকম করিয়া আসিয়া লাগিতে না পারে, অথচ ঘরের মধ্যে বাতাস খেলিবার জো থাকে। এমন উপায়ই বা কি ? আর এমন জায়গাই বা কোথায় ? এমন উপায়ও আছে—এমন জায়গাও আছে। ঘরের যদি কেবল একটা দুওর আর একটা জানালা থাকে, তবে সেই দুওর আর জানালা খুলিয়া দিয়া ঘরের অন্য দিকে রোগীর বিছানা করিয়া দিবে। এতে রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে না, অথচ ঘরের মধ্যে বাতাস খেলিবে। ঘরে যদি বেশী দুওর জানালা থাকে, তবে যে দিকে রোগী শুইবে, সেই দিকের দুওর জানালা বন্ধ করিয়া অন্য দিকের দুওর জানালা খুলিয়া দিবে। এতেও রোগীর গায়ে বাইরের বাতাস লাগিবে না, অথচ ঘরের মধ্যে বাতাস খেলিবে। দিনমানে ঘরে বাতাস খেলার যেমন দরকার, রাত্রেও তেমনি বা তার চেয়েও বেশী দরকার। যদি বল রাত্রে ঘরের মধ্যে বাতাস খেলার বেশী দরকার কেন ? দরকার কেন, তা বলিতেছি।

আমাদের নিশ্বাসে বাতাস খারাপ হয়। এই জন্যে, অনেক লোক এক খানি ঘরে অনেক ক্ষণ থাকিলে, সে ঘরের বাতাস খুব খারাপ হইয়া যায়। দিনে লোক কাজ কর্ম্মে ব্যস্ত থাকে, ঘুরিয়া বেড়ায়, এক জায়গায় স্থির হইয়া থাকে না। কিন্তু রাত্রে অনেকে এক ঘরে একত্র শোয়। যাদের পরিবার অনেক, ঘর কম, তাদের এক ঘরে অনেককে একত্র শুইতেই হয়। কাজেই, রাত্রে তাদের সকলের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘর খানির বাতাস ভারি খারাপ হইয়া যায়। এই খারাপ বাতাসে অনেক রকম ব্যামো হয়। কাশ-রোগ ত আগে হয়। বাইরের ভাল বাতাস ঘরে গিয়া ঘরের ঐ রকম খারাপ বাতাস বাহির করিয়া দিতে পারিলে, ঘরের মধ্যে কার বাতাস ও রকম খারাপ হইতে পারে না। তবেই দেখ, দিনের চেয়ে রাত্রে ঘরে বাতাস খেলার আরও বেশী দরকার কি না।

নিয়ুমোনিয়-রোগী যে কষ্টে নিশ্বাস লয়, তাতে কি নিশ্বাসে খুব কম বাতাসই তার ফুস্ফোর মধ্যে যায়। এর উপর যদি আবার সে বাতাস টুকু খারাপ হয়, তবে আর তার বাঁচনই নাই। আমরা কি নিশ্বাসে ফুস্ফোর মধ্যে ভাল বাতাস লই, আর তাতেই বাঁচিয়া থাকি। পাঁচ মিনিট যদি বাতাস না পাই, ত হাঁপাইয়া মরি। কি নিশ্বাসে ভাল বাতাস ফুস্ফোর মধ্যে গিয়া আমাদের রক্ত পরিষ্কার করিয়া দেয়। যত দিন পর্য্যন্ত আমাদের রক্ত এই রকম করিয়া পরিষ্কার হইতে থাকে, তত দিন আমাদের জীবনও থাকে। এই রকম করিয়া রক্ত পরিষ্কার হইবার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলেই মৃত্যু

হয়। যদি বল, তবে কি মৃত্যু শুদ্ধ এই রকমেই হয়। তা নয়। মৃত্যু দু রকমে হয়। (১) যে কারণেই হোক, ফুস্ফোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। ফুস্ফোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলে রক্ত পরিষ্কার হইতে পারে না। পরিষ্কার হইতে না পারিলে রক্ত বিষ হয়। সেই বিষেই—সেই বিষ-রক্তেই জীবন নষ্ট করে। আমাদের শরীরে পরিষ্কার অপরিষ্কার দু রকম রক্তই থাকিবার জায়গা আছে। পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার হইতেছে। আবার অপরিষ্কার রক্ত তখনই পরিষ্কার হইতেছে। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে আর এক বার করিয়া অপরিষ্কার হইতেছে, আর এক বার করিয়া পরিষ্কার হইতেছে। এই যে মুহুর্মুহু অপরিষ্কার হওয়া আর পরিষ্কার হওয়া, এর কোনও ব্যাঘাত ঘটিলেই আর কি সর্ব্বনাশ! ব্যাঘাত আর কি? ফুস্ফোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলেই অপরিষ্কার রক্ত আর পরিষ্কার হইতে পারে না। আমরা নিশ্বাস লই আর ফেলি। নিশ্বাস লওয়ার পরই নিশ্বাস ফেলিতে হয়—একটুও দেরি হয় না। বলিতে গেলে নিশ্বাস লওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নিশ্বাস ফেলিতে হয়। নিশ্বাস লইয়া নিশ্বাস ফেলিতে ইচ্ছা করিয়াও দেরি করিতে পার না। তা করিতে গেলেই হাঁপ লাগে। নিশ্বাস লওয়ার পর নিশ্বাস ফেলিতে একটুও দেরি হয় না। কিন্তু নিশ্বাস ফেলার পর আবার নিশ্বাস লইতে একটু দেরি হয়। এ তুমি নিজে নিজেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। এই যে একটু দেরি হয়, এরই মধ্যে রক্ত অপরিষ্কার হইয়া যায়।

আবার যে নিশ্বাস লও, সেই রক্ত পরিষ্কার হয়। এই রকম করিয়া যত বার নিশ্বাস ফেলিতেছ, তত বার রক্ত অপরিষ্কার হইতেছে। আর যত বার নিশ্বাস লইতেছ, তত বার রক্ত পরিষ্কার হইতেছে। অপরিষ্কার রক্ত কাল, আর পরিষ্কার রক্ত রাঙা। আমাদের শরীরে দু রকম শির আছে। এক রকম শিরের মধ্যে অপরিষ্কার বা কাল রক্ত থাকে। আর এক রকম শিরের মধ্যে পরিষ্কার বা রাঙা রক্ত থাকে। কাল রক্তের শিরকে ইংরিজিতে বেইন্ বলে; ভাল বাঙ্গালায় শিরা বলে; রাঙা রক্তের শিরকে ইংরিজিতে আর্টারি বলে; ভাল বাঙ্গালায় ধমনী বলে। ধমনীকে নাড়ীও বলে। হাত ধরিয়া যে নাড়ী দেখ, তা এই রাঙা রক্তের শির বৈ আর কিছুই নয়। হাতের নাড়ী যেমন দুব্ দুব্ করে, রাঙা রক্তের সব শিরই সেই রকম দুব্ দুব্ করে। রগে হাত দিলে যে দুব্ দুবুনি টের পাও, সেও সেই রাঙা রক্তের শিরের দুব্ দুবুনি। মাথা ধরিলে রগের এই দুব্-দুবুনি এত বেশী হয়, যে ঠাহরে দেখিলে দেখা যায়। কাল রক্তের শিরের এ রকম কোনও দুব্-দুবুনি নাই। তার উপর হাত দিলে কিছুই জানিতে পারা যায় না। রাঙা রক্তের শির কাটিয়া গেলে ফিন্‌কি দিয়া রক্ত পড়ে। কাল রক্তের শির কাটিয়া গেলে রক্ত গড়াইয়া পড়ে। রাঙা রক্তের শিরের যে দুব্-দুবুনি বলিলাম, সে দুব্-দুবুনি কি জন্যে হয়? তার মধ্যে রক্ত চলা ফেরা করে বলিয়াই হয়। ৮৮র পাতে বলিছি, পিচ্‌কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে, রক্ত যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, হৃৎপিণ্ডের মধ্যে এমনি কল বল

আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে, যে ঠিক্ সেই রকম পিচ্‌কিরির মত সব শিরের মধ্যে চালাইয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের বলে শিরের মধ্যে এই রকম করিয়া যে রক্ত চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে দমকে চলে। রক্ত এই রকম বেগে আর দমকে দমকে চলে বলিয়াই রাঙা রক্তের শিরের ও রকম ডুব্-ডুবুনি টের পাওয়া যায়। কাল রক্তের শিরের মধ্যেও ত ঐ রকম করিয়া রক্ত চলে। তবে কেন তার ডুব্-ডুবুনি টের পাওয়া যায় না ? রাঙা রক্তের শির আর রবারের নল সমান। রবারের নলের উপর আঙুল দিয়া চাপিলে চেপ্টা হইয়া যায়। আঙুল তুলিয়া লইলে আবার যে গোল নল, সেই গোল নলই হয়। রবারের নল পোরা থাকিলেও যেমন গোল, খালি হইলেও তেমনি গোল। রাঙা রক্তের শিরও ঠিক্ সেই রবারের নল। উপর থেকে চাপ পাইলে যেমন নুইয়া যায়, ভিতর থেকে চাড় পাইলে তেমনি ঠেলিয়া উঠে। যে চাপ পাইয়া নুইয়া যায়, সে চাপ গেলে আর সে রকম নুইয়া থাকে না, যেমন ছিল তেমনি হয়। যে চাড় পাইয়া ঠেলিয়া উঠে, সে চাড় গেলে আর সে রকম ঠেলিয়া থাকে না, যেমন ছিল তেমনি হয়। যে জিনিশ টানিলে বাড়ে, আর ছাড়িয়া দিলে ছোট হইয়া যায়, কেবল সেই জিনিশেরই নলের এই গুণ আছে। সে জিনিশ আর কি ? রবার। তবে রবারেরই নলের এই গুণ আছে। রাঙা রক্তের শিরেরও ঠিক্ এই গুণ আছে। এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া বেগে আর দমকে দমকে রক্ত চলিবার সময় তার ও রকম ডুব্-ডুবুনি

টের পাওয়া যায়। কাল রক্তের শিরের এ রকম কোনও গুণ নাই। এই জন্যে, তার ভিতর দিয়া রক্ত চলিবার সময় তার ও রকম ডুব্‌ডুবুনি টের পাওয়া যায় না। কাল রক্তের শির আর রাঙা রক্তের শির, এই দু রকম শিরের ইতর বিশেষ মনে করিয়া রাখা বড় দরকার।

তার পর বলি। বাতাসে দুটী জিনিশ আছে। এই দুটী জিনিশ বাতাসে মিশন থাকে। ফল কথা, এই দুটী জিনিশ দিয়াই বাতাস তয়ের হইয়াছে। সে দুটী জিনিশ কি কি? অক্সিজেন্‌ আর নাইট্রোজেন্‌। অক্সিজেনও এক রকম বাতাস; নাইট্রোজেনও এক রকম বাতাস। ডাক্তরেরা অক্সিজেন্‌ কি নাইট্রোজেনকে বাতাস বলেন না। তাঁরা গ্যাস্‌ বলেন। গ্যাস্‌ না বলিয়া সোজা সুজি বাতাস বলাই ভাল। গ্যাস্‌ কথাও আজ্‌ কাল্‌ চলিত হইয়াছে। কলিকাতার মুটে মজুরেও গ্যাসের আলো বলে। বাতাসে প্রায় পাঁচ ভাগের এক ভাগ অক্সিজেন্‌, আর পাঁচ ভাগের চারি ভাগ নাইট্রোজেন্‌ আছে। অক্সিজেন্‌ আর নাইট্রোজেন্‌ ছাড়া বাতাসে আর একটী জিনিশ আছে। সে জিনিশটী কি? কার্ব্বণিক্‌ য়্যাসিড্‌। অক্সিজেন্‌ আর নাইট্রোজেন্‌ যেমন গ্যাস্‌, কার্ব্বণিক্‌ য়্যাসিড্‌ও তেমনি এক রকম গ্যাস্‌। বাতাসে কার্ব্বণিক্‌ য়্যাসিড খুবই কম আছে। পঁচিশ ভাগ বাতাসে এক ভাগের বেশী নাই অক্সিজেন্‌ আমাদের যেমন উপকারী, কার্ব্বণিক্‌ য়্যাসিড্‌ তেমনি অপকারী। আমরা কি নিশ্বাসে ফুস্ফোর মধ্যে যে বাতাস লই, সেই বাতাসের অক্সিজেনেই আমাদের বাঁচাইয়া

রাখে। বাতাসে অক্সিজেন্ ঠিক্ থাকিলে, ফি নিশ্বাসে রক্ত বেশ পরিষ্কার হয়, আর শরীরও বেশ সুস্থ থাকে। কিন্তু কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ যত বেশী থাকে, ফি নিশ্বাসে রক্ত তত অপরিষ্কার হয়, আর শরীরও তত অসুস্থ হয়। মোটা কথায়, বাতাসের অক্সিজেন্ আমাদের প্রাণ, আর কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আমাদের বিষ। এই জন্যেই, অক্সিজেনকে আমরা প্রাণ-বায়ু বলি। আমরা ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে এই প্রাণ-বায়ু ফুস্ফোর মধ্যে লই, আর তাতেই বাঁচিয়া থাকি। আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বার কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি। এতে আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে বাতাস কতই খারাপ হয়! ক্রমে বাতাসের অক্সিজেন্ খুবই কমিয়া যায়, আর কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ খুবই বাড়ে। শেষে সে বাতাস এক বারে বিষ হইয়া দাঁড়ায়। এই জন্যে বাইরের ভাল বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে দেওয়া এত দরকার। ছোট এক খানি ঘরে দশ বার জন লোক শুইয়া আছে। ঘরে সুম্‌কো-সুম্‌কি দুওর জানালা নাই। কাজেই, বাইরের বাতাস ঘরের মধ্যে ভাল করিয়া খেলিতে পারে না। এক এক জনে ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে ফুস্ফোর মধ্যে অক্সিজেন্ লইতেছে। আর যত বার নিশ্বাস ফেলিতেছে, তত বার কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে। এতে ঘরের মধ্যের বাতাস টুকুকে বিষ করিয়া তুলিতে দশ বার জন লোকের কত ক্ষণ লাগে?

শুদু যে আমাদের নিশ্বাস ফেলাতেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়, তা নয়। যে রকম আগুনই কেন হোক্ না,

জ্বলিবার সময় তা থেকে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। এই জন্যে, আমরা নিশ্বাস ফেলিলে যেমন কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়, আগুন জ্বলিলেও তেমনি কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। ফি নিশ্বাসে বাতাসের সঙ্গে ফুস্ফোর মধ্যে আমরা অক্সিজেন্ লই। কাজেই, ফি নিশ্বাসে আমরা বাতাসের অক্সিজেন্ কমাইয়া ফেলি। আগুন জ্বলিলেও ঠিক্ সেই রকম ঘটে। বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না। কাজেই, আলো জ্বলিবার সময় বাতাসের অক্সিজেন্ ক্রমে কমিয়া যায়। তা ছাড়া, আলো জ্বলিবার সময় নিয়ত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। এই জন্যে, আমাদের নিশ্বাসে নিশ্বাসে ঘরের মধ্যের বাতাস যেমন খারাপ হয়, আগুণ জ্বলিলেও বাতাস তেমনি খারাপ হয়।

বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে যে আলো জ্বলে না, তা তুমি মনে করিলেই পরীক্ষা করিয়া দেখিতে পার। হাঁড়ি, মাল্‌শা কি শরা দিয়া যদি একটী জ্বলন্ত প্রদীপ ঢাকা দেও, তবে তখনই সে প্রদীপটী নিবিয়া যায়। কিন্তু সেই হাঁড়ি, মাল্‌শা, কি শরার গায়ে গুটি কতক ছাঁদা কি বিঁধ করিয়া যদি ঢাকা দেও, তবে প্রদীপ নিবে না। যার ভিতর আলো থাকে, তার মধ্যে বাতাস যাইবার পথ না থাকিলে আলো কখনও জ্বলে না—নিবিয়া যায়। এই জন্যে, লাল্‌ঠনের গলায় আর মাথায় ছোট ছোট সব ছিদ্র রাখে। কাদা কি ময়দা দিয়া যদি সেই ছিদ্র গুলি বুজাইয়া দেও, তবে তার ভিতরকার আলো ক্রমে নিস্তেজ হইয়া খানিক পরেই নিবিয়া যায়। শুদ্ধ বাতাসেরই অভাবে কি আলো এই রকম করিয়া

নিবিয়া যায় ? না। শুদ্ধু তা নয়। আলো নিবিয়া যাইবার আর একটী কারণ হয়। সে কারণটী কি ? কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্। কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ কোথা থেকে আসে ? জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। যে বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না, সে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইল। আবার যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে ছোঁওয়া ছুঁয়ি হইলে আলো নিবিয়া যায়, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হইতে লাগিল। লাল্ঠনের গলায় আর মাথায় যে চারি পাঁচ সারি ছাঁদা থাকে, তার উপরকার ছাঁদা গুলি দিয়া লাল্ঠনের মধ্যে বাতাস যায়। এতে, যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আলো নিবাইয়া দেয়, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হইয়া যায়। আর যে অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না, বাতাসের সঙ্গে সেই অক্সিজেন্ লাল্ঠনের ভিতর যায়। আর এতেই, লাল্ঠনের ভিতর আলো জ্বলিবার কোনও ব্যাঘাত হয় না।

বাতাসে অক্সিজেন্ও আছে, নাইট্রোজেনও আছে। তবে কেমন করিয়া জানিলে যে বাতাসের অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না ? তা জানা শক্ত নয়। জ্বলন্ত শলিতা নিবাইয়া আগুণ থাকিতে থাকিতে সেই শলিতা অক্সিজেনের শিশির মধ্যে দিবা মাত্র তখনই খুব তেজে জ্বলিয়া উঠে। নাইট্রোজেনের শিশির মধ্যে দিলে শলিতার আগুন নিবিয়া যায়।

ছোট এক খানি ঘরে দুওর জানালা বন্ধ করিয়া দশ বার জন শুইয়া আছে। ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে। তেল শলিতা

সব ঠিক্ আছে। কিন্তু আলো ক্রমে কম হইয়া আসিতে লাগিল। শেষে নিবিয়া যাইবার মত হইল। তেল শলিতা সব ঠিক্ থাকিতে প্রদীপ নিবিয়া যাইবার মত হইল কেন? নিবিয়া যাইবার মত হইবেই ত। ফি নিশ্বাসে দশ বার জনে বাতাসের সঙ্গে ফুস্ফোর মধ্যে কত অক্সিজেন্ লইতেছে। আর ফি বারে নিশ্বাস ফেলিয়া তারা কত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে! এ দিকে প্রদীপ জ্বালাতেও ঠিক্ সেই ফল হইতেছে! এ কথা এর আগেই বলিছি। তবেই দেখ, ঘরের মধ্যের বাতাসে অক্সিজেন্ও কমিয়া গেল, আবার বাড়্তির ভাগ অত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড জমা হইল। এতে প্রদীপ নিবিয়া যাইবার মত হবে না ত আর কিসে হবে? যে অক্সিজেন্ নৈলে আলো জ্বলে না, সে অক্সিজেন্ কমিয়া গেল। আবার যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আলো নিবাইয়া দেয়, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড ঘরে জমা হইতে লাগিল। এতে তেল শলিতা সব ঠিক্ থাকিতেও প্রদীপ নিবিবার মত হবে বৈ আর কি? ঘরের মধ্যে যদি এত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ জমিত যে প্রদীপ নিবিয়া যাইত, তবে ঘরের মধ্যে এক জন লোকও স্থির হইয়া থাকিতে পারিত না। হাঁপাইয়া মরিলাম বলিয়া সকলকে ছুটিয়া বাইরের বাতাসে আসিতে হইত। তবেই দেখ, আমাদের জীবন আর আলো দুই-ই সমান। অক্সিজেন্ নৈলে জীবন রক্ষা হয় না। তেমনি অক্সিজেন্ নৈলে আলোও জ্বলে না। আবার, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে জীবন নষ্ট করে। তেমনি, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আলোও নিবাইয়া দেয়। বাতাসে

কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ খুব কম আছে। পঁচিশ ভাগ বাতাসে কেবল এক ভাগ কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে। যেখানকার বাতাসে এর চেয়ে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, সেখানে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি না। শীঘ্রই একটা না একটা শক্ত রোগ হয়। যেখানকার বাতাসে খুব বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, সেখানে আলো লইয়া গেলে যেমন নিবিয়া যায়, জীবনের আলোও তেমনি নিবিয়া যায়। এই জন্যে বাতাসের ভাল মন্দর আলো একটী বেশ পরীক্ষা। মনে কর, অনেক দিনের একটা এঁধো কুও আছে। সেই কুওটী ঝালাইবার দরকার হইল। কুওর মধ্যের বাতাসের অবস্থা তুমি জান না। সে বাতাসে কত বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, তা তোমার জানা নাই। না জানিয়া শুনিয়া যদি তার মধ্যে কুমর নামাইয়া দেও ত, চাই কি, সে হাঁপাইয়া মরিতে পারে। এই জন্যে মোটা মোটা পাঁচ ছয়টী শলিতা ধরাইয়া একটী প্রদীপ দড়ির ছিকেতে ঝুলাইয়া আগে কুওর মধ্যে নামাইয়া দিবে। কুওর ভিতর খানিক দূর গিয়াই যদি প্রদীপটী নিবিয়া যায়, তবে সে কুওর মধ্যে কারুই নামিতে দিও না। তার মধ্যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ এত বেশী আছে, যে তার মধ্যে যে নামিবে, সেই মরিবে। এ রকম দুর্ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটিয়া থাকে। ঝুড়ি খানেক গুঁড় চূণ বেশ করিয়া ছড়াইয়া ছড়াইয়া কুওর মধ্যে ঢালিয়া দিবে। তার পর খানিক বাদে চূণের সেই ঝুড়িটা ছিকে করিয়া কুওর মধ্যে তলা পর্য্যন্ত এক বার করিয়া নামাও আর এক বার উঠাও। বিশ-পঁচিশ বার এই রকম কর। ঝুড়িটা

ছোট না হইয়া একটু ফেরাল হইলে ভাল হয়। কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডের সঙ্গে আর চূণের সঙ্গে বড় সম্বন্ধ। চূণে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ খাইয়া ফেলে। চূণ ঢালিয়া দেওয়ার পর যা কিছু কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ অবশিষ্ট থাকে, খালি ঝুড়ি ঐ রকম করিয়া বার কত তুলিলে আর নামাইলে তাও কুও থেকে উঠাইয়া ফেলা যায়। এই সব করার পর সেই রকম জ্বলন্ত একটী প্রদীপ কুওর মধ্যে নামাইয়া দেও। এবারে প্রদীপ নিবিবে না। প্রদীপ না নিবিলেই জানিলে কুওর মধ্যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আর সে রকম নাই। তার মধ্যে এখন যে সে নির্ব্বিঘ্নে নামিতে পার।

আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বার কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি। নিশ্বাসও আমরা ফি মিনিটে আঠার বার ফেলি। শুদ্ধ আমরা নৈ, জীব জন্তু মাত্রেই এই রকম করিয়া কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করে। পৃথিবীতে মানুষ আর জীব জন্তু কতই আছে! ফি মিনিটে এরা কতই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে। যেখানকার বাতাসে একটু বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আছে, সেখানে আমরা সুস্থ থাকিতে পারি না। খুব বেশী থাকিলে তখনই হাঁপাইয়া মরি। তবে যে এই কোটি কোটি মানুষ আর জীব জন্তু মিনিটে মিনিটে এত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করিতেছে, সে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আমাদের অপকার করে না কেন? সে কার্ব্বণিক য়্যাসিড কি থাকিতে পায়, তাই অপকার করিবে? থাকিলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচিতাম না। শরীর থেকে বিষ বাহির করিয়া আমরাই আবার সেই বিষে মরিতাম।

এত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তবে কোথায় যায়? গাছে খাইয়া ফেলে। আমরা যেমন নিশ্বাস লই আর নিশ্বাস ফেলি, গাছ-পালাও তেম্‌নি নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে। আমাদের নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র ফুস্ফো। গাছ-পালার নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যন্ত্র পাতা। এক একটী পাতার দুই পিঠেই এমন হাজার হাজার ছিদ্র আছে। উপরকার চেয়ে নীচেকার পিঠে ছিদ্র বেশী আর বড় বড়। এই সব ছিদ্র এত ছোট, যে নজর হয় না। এই সব ছিদ্র দিয়া গাছ-পালা নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে। আমরা বারে বারে নিশ্বাস নিশ্বাস ফেলিয়া যে বিষ অর্থাৎ যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি, গাছ-পালা যত বার নিশ্বাস লয়, তত বারই সেই বিষ অর্থাৎ সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ পাতার দুই পিঠের সেই সব ছিদ্র দিয়া আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়। আমাদের পক্ষে যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বিষ, যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডে আমাদের জীবন নষ্ট করে, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তাদের আহার, সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিডেই তাদের জীবন রক্ষা করে। অক্‌সিজেন্ যেমন আমাদের জীবন, কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ তেম্‌নি তাদের জীবন। যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ নৈলে গাছ-পালা বাঁচে না, আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বারই সেই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি। আবার যে অক্‌সিজেন্ নৈলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না, গাছ-পালা যত বার নিশ্বাস ফেলে তত বারই সেই অক্‌সিজেন্ সৃষ্টি করে। তবেই দেখ, গাছ-পালার সঙ্গে আমাদের কেমন একটী আশ্চর্য্য সম্বন্ধ। এ

সম্বন্ধ না থাকিলে আমরাও বাঁচিতাম না, জীব জন্তুও বাঁচিত না, গাছ-পালাও বাঁচিত না। দিনের বেলায় গাছ-পালা যত বার নিশ্বাস লয়, পাতার দুই পিঠের ছিদ্র দিয়া তত বারই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়। আর যত বার নিশ্বাস ফেলে, পাতার সেই সব ছিদ্র দিয়া তত বারই অক্সিজেন্ ছাড়ে। রাত্রে বড় একটা অক্সিজেন্ ছাড়ে না। বরং এক আধটু কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ ছাড়ে। এই জন্যে, রাত্রে গাছতলায় শুইয়া থাকা বড় দোষ; আর, ঘর দুওরের খুব কাছে গাছ-পালা থাকা ভাল নয়।

এর আগেই বলিছি, আগুণ জ্বলিবার সময় কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। এতেও কম কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয় না। দিনে দেখ, কত কোটি-কোটি লোক রাঁধে। তা থেকে কতই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়। রাত্রেও রাঁধে, তা ছাড়া ঘরে-ঘরে প্রদীপও জ্বলে। এই জন্যে, দিনের চেয়েও রাত্রে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বেশী সৃষ্টি হয়। এত যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয়, এ কোথায় যায়? এ কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ও গাছ-পালায় খাইয়া ফেলে। খাইয়া ফেলেই বল, আর নিশ্বাস লইবার সময় পাতার দুই পিঠের সেই সব ছিদ্র দিয়া আপনাদের শরীরের মধ্যে লয়ই বল। আকা (উনন) জ্বলিলে, প্রদীপ জ্বলিলে, তবে ত ঘরের মধ্যের বাতাস খারাপ হয়? খারাপ হয়ই ত। এই জন্যে, রান্না-ঘরে ধোঁওয়া-ঘর তয়ের করে। সেই ধোঁওয়া-ঘরের ঠিক্ নীচে আকা কাটে। সেই আকায় রাঁধিলে যত ধোঁওয়া— যত কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্, সব সেই ধোঁওয়া-ঘর দিয়া বাহির

হইয়া যায়। প্রদীপের জন্যেও এই রকম ধোঁওয়া-ঘর থাকিলে ভাল হয়। জ্বলন্ত প্রদীপ থেকে কম কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি হয় না। প্রদীপের শিশ থেকেও কম ঝুল-কালি পড়ে না। আমরা বেশ দেখিতে পাই, প্রদীপের শিশ থেকে স্পষ্ট ঝুল-কালি উঠে। প্রদীপের শিশের উপর কোন জিনিশ ধরিলে, একটু খানির মধ্যেই সে জিনিশটী যেন এক বারে ভুষ-মাখা হইয়া যায়। সে ঝুল-কালি কোথায় যায়? কতক ঘরেই থাকিয়া যায়—ঘরের দেওয়ালে, কার্ণিশে, কড়ি বরগায়, আড়ায়, চালে লাগিয়া থাকে—কতক নিশ্বাসের সঙ্গে আমাদের নাকের মধ্যে যায়। ঘরে যে ঝুল পড়ে, সে কোথা থেকে পড়ে? প্রদীপের শিশ থেকে যে ঝুল-কালি উঠে, সেই ঝুল-কালি থেকেই ঘরে ঝুল হয়। ঝুল জিনিশটে কি? মাকসার জালে প্রদীপের শিশের ঝুল-কালি পড়িলে ঝুল তয়ের হয়। রান্নাঘরে এই রকম ঝুল খুব বেশী পড়ে। তা পড়িবেই ত। প্রদীপের ছোট একটী শিশ থেকে কতই বা ঝুল-কালি পড়িবে। কিন্তু জ্বলন্ত আকা থেকে এক বারে রাশি রাশি ঝুল-কালি উঠে। হাঁড়ির পাছার ভূষই তার প্রমাণ। যদি বল নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে যে ঝুল-কালি যায়, তা কেমন করিয়া জানা যাবে? তা জানা শক্ত নয়। যে ঘরে প্রদীপ জ্বলিতেছে, সে ঘর খানি যদি খুব ছোট হয়, আর দুওর জানালা সব বন্ধ থাকে, তবে সে ঘরে খানিক ক্ষণ থাকিয়া খুব ফর্শা ন্যাকড়া দিয়া যদি দুই নাকের ভিতর মুচিয়া ফেল, তবে সেই ন্যাকড়ায় ভুষ-মোছার মত দাগ

পড়িবে। ঘরে খুব বাতাস খেলিতে পারিলে বাতাসের সঙ্গে ঝুল-কালি অনেক বাহির হইয়া যায়। এই জন্যে, নাকের মধ্যে তেমন কালি পড়িতে পারে না। ধোঁওয়া-ঘরের নীচে প্রদীপ জ্বলিলে সব ঝুল কালি বাহির হইয়া যায়। ঘরেও ঝুল্ পড়িতে পায় না, নাকের মধ্যেও কালি পড়িতে পারে না। কোটা ঘরের চেয়ে খড়ো ঘরে তবু অনেক রক্ষা। ধোঁওয়া-ঘর না থাকিলে কোটা ঘরের উপর দিয়া ঝুল-কালি বা ধোঁওয়া বাহির হইতে পারে না। কিন্তু খড়ো ঘরের মুরুলির ফাঁক দিয়া তা বাহির হইয়া যাইতে পারে। এই জন্যেই, আমাদের পাড়াগাঁয়ে গরিব লোকেরা বাঁচে। তাদের এক খানি বৈ ঘর নয়। সেই ঘরেই রাঁধে, সেই ঘরেই প্রদীপ জ্বলে, আর সেই ঘরেই শুইয়া থাকে।

প্রদীপের শিশের ঝুল-কালি নিশ্বাসের সঙ্গে নাকের মধ্যে যাওয়ার একটা গল্প করি। আর বৎসর মাঘ মাসে স্থানান্তরে কোন এক ভদ্র লোকের বাড়ীতে গিইছিলাম। রাত্রে যে ঘরে শুইছিলাম, বাড়ীর এক জন চাকর সেই ঘরে কিরোসীনের প্রদীপ একটা জ্বালিয়া দুওর জানালা সব বন্ধ করিয়া গিইছিল। তার পর দিন সকালে বাড়ী আসিলাম। পথে আসিতে আসিতে নাক শুড়্ শুড়্ করিতে লাগিল। আঙ্গুলে কাপড় দিয়া নাকের ভিতর মুচিয়া ফেলিলাম। মুচিয়া দেখি কাপড়ের সেই জায়গাটা এক বারে ভুষ-মাখা। যত বার মুচি, তত বারই ঐ রকম ভুষ বাহির হয়। তার পর গলা টানিয়া গয়ের ফেলিলাম। এক বারে যেন ঝুল-কালির মত গয়ের উঠিল। যত বার

গয়ের ভুলি, তত বারই ঐ রকম কাল গয়ের উঠে। বাড়িতে আসিয়া ভিজে ন্যাকড়া দিয়া নাকের ভিতর পরিষ্কার করিয়া ফেলিলাম। তার পর দু তিন দিন পর্য্যন্ত কাল গয়ের উঠিছিল। ঘরের দুওর জানালা খোলা থাকিলে আমার নাকের ভিতরকার আর গয়েরের অত দুর্দ্দশা হইত না। আমাদের সাবেক প্রদীপের শিশ থেকে অত ঝুল কালি উঠে না। কিরোসীনের প্রদীপের শিশ থেকে রাশি রাশি ঝুল-কালি উঠে। দেশি তেলের প্রদীপ থেকে পাঁচ বছরে ঘরে যে ঝুল কালি না পড়ে, কিরোসীনের প্রদীপ থেকে এক মাসে তার চেয়ে বেশী ঝুল-কালি পড়ে। তবু লোকে কিরোসীনের যে কেন এত আদর করে, তা বলিতে পারি না। শুদু দুর্গন্ধেরই জন্যে কিরোসীন্ ব্যবহার করা উচিত নয়। যে তেলের প্রদীপ জ্বলিলে দুর্গন্ধে ঘরে তিষ্ঠন যায় না, ঝুল-কালিতে দু দিনেই ঘর ডুবিয়া যায়, ঘরের কাপড়-চোপড় জিনিশ পত্র সব তেল-কালিতে ডুবিয়া যায়, নাকের ভিতর, টাক্রার ভিতর, বায়ুনলী আর ফুস্কোর মধ্যে পর্য্যন্ত ঝুল-কালি পড়ে, সে তেল নৈলে আজ্ কাল্ আমাদেয় প্রদীপ জ্বালা হয় না। প্রদীপে কিরোসীনের তেল ব্যবহার আরম্ভ হইয়া অবধি, বোধ করি, কাশ-রোগের অনেক বৃদ্ধি হইয়াছে। কিরোসীনের প্রদীপ বলিয়া বাজারে যে এক রকম টিনের দোয়াত বিক্রি হয়, সেই দোয়াতে কিরোসীন্ তেল আর শলিতা দিয়া জ্বালিলে কিরোসীনের ঐ সব দোষ টের পাওয়া যায়। ইংরিজিতে যাকে কিরোসীন্-ল্যাম্প বলে, সেই ল্যাম্পে কিরোসীন্ জ্বালাইলে তা থেকে ঝুল-কালি

মোটেই উঠে না, কিরোসীনের দুর্গন্ধও টের পাওয়া যায় না, আর আলোও খুব ধব্‌ধবে পরিষ্কার হয়। কিরোসীন্ তেলের যা কিছু গুণ, কিরোসীন্ ল্যাম্প ব্যবহার করিলেই তা জানা যায়। কিরোসীনের কি গুণ? কিরোসীন্ তেলের আলো খুব ফর্শা, ঠিক্ যেন গ্যাসের আলো। একটা কিরোসীন্ ল্যাম্প জ্বালিলে যে আলো হয়, পঁচিশটে প্রদীপে সে আলো হয় না। টিনের দোয়াতে কিরোসীন্ জ্বালাইলে সে রকম আলো হওয়া দূরে থাক্, তার কাছাকাছিও হয় না। যে জন্যে কিরোসীন জ্বালা, তাই যদি না হইল, তবে মিছামিছি ঘর নোংরা আর কাশ রোগ সৃষ্টি করিবার দরকার কি? এই জন্যে বলিতেছি, সাজ-পাট সুদ্ধ কিরোসীন্ ল্যাম্প যাঁরা ব্যবহার না করিতে পারিবেন, তাঁরা যেন আমাদের সাবেক প্রদীপই ব্যবহার করেন। কিরোসীন্ ল্যাম্প ব্যবহার করায় বিপদ্ নাই, এমন নয়। কখন্ কখন বন্দুকের মত আওয়াজ হইয়া কিরোসীন্ ল্যাম্প ফাটিয়া যায়। ফাটিয়া গায়ে লাগিলে বড় বিপদ্। জায়গা বিশেষে লাগিলে মৃত্যুও হইতে পারে। তার পর বলি—তবেই দেখ ঘরের মধ্যের বাতাসে যা থাকে, নিশ্বাসের সঙ্গে নাক দিয়া ফুস্কোর মধ্যে যায়। এক আধ দিনেই যে এক বারে শক্ত ব্যামো জন্মিয়া যায়, তা নয়। তবে বেশী দিন হইলে ফুস্কোর একটা না একটা ব্যামো হয়-ই। ফল কথা, খারাপ বাতাস নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে নিয়ত লইয়া কেহই অনেক দিন ভাল থাকিতে পারেন না। একটা শক্ত রকম কাশ-রোগ তার হয়ই হয়। যারা বড় বড় আড়তে রোজ রোজ রাশি

রাশি সরিষা মসিনার (তিষি) ওজন দেয়, নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে ধূল গিয়া তাদের মধ্যে অনেকের অনেক রকম কাশ-রোগ জন্মিয়া যায়। কারো ব্রংকাইটিস্ হয়, কারো নিয়মোনিয়া হয়, কারো বা ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) হয়। ওজন দিবার সময় কাপড় দিয়া নাক মুখ জুত বরাত করিয়া ঢাকিতে পারিলে, ফুস্কোর মধ্যে ধূল যাওয়া অনেক নিবারণ হয়। শুদু ধূল বলিয়া কেন, পরিষ্কার বাতাস ছাড়া নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে আর যা যাবে, তাতেই ফুস্কোর ব্যামো হইবার কথা।

তার পর বলি। এর আগেই বলিছি যে, ফুস্কোর মধ্যে হাজার-হাজার নলি আছে, আর এই হাজার-হাজার নলি থেকে এমন লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ তয়ের হইয়াছে। এই লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু এমন কোটি-কোটি শির যেন জাল দিয়া ছাকিয়া রহিয়াছে। নিশ্বাস ফেলিয়া আবার নিশ্বাস লইতে যে একটু দেরি হয় বলিছি, সেই সময় টুকুর মধ্যে পরিষ্কার রক্ত অপরিষ্কার হইয়া চুলের মত সরু সেই কোটি-কোটি শিরে আসিয়া জমে। এ দিকে যে নিশ্বাস লও, সেই লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষ অমনি বাতাসে পূরিয়া যায়। রক্তে যে রাঙা আর শাদা বিন্দু আছে বলিছি, সেই সব রাঙা বিন্দুর এক একটীর মধ্যে খুব রাঙা রঙের একটী জিনিশ আছে। রাঙা রঙের সেই জিনিশটীতে লোআ (লৌহ) আছে। এই জন্যে, লৌহ-ঘটিত অসুদ আমাদের এত কাজে লাগে। এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। রাঙা রঙের সেই জিনিশটীর সঙ্গে আর অক্সিজেনের

সঙ্গে এম্‌নি সম্বন্ধ যে, বাতাসের সঙ্গে ছোঁয়া ছুঁয়ি হইলে অম্‌নি অক্‌সিজেন্ টানিয়া লয়। এই জন্যে, নিশ্বাস লইলে লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষ যে বাতাসে পূরিয়া যায়, বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত যে সব সরু সরু শির জালের মত ছাকিয়া আছে, সেই সব শিরের ভিতরকার রক্তের রাঙা বিন্দু অমনি সেই বাতাসের অক্‌সিজেন্ টানিয়া লয়। যে টানিয়া লয়, সেই অম্‌নি রক্তের রং রাঙা টক্‌টকে হয়। আগেকার মত অপরিষ্কার আর কাল থাকে না। যত বার নিশ্বাস লও, তত বারই রক্তের রাঙা বিন্দু এই রকম করিয়া বাতাসের অক্‌সিজেন টানিয়া লয়। অক্‌সিজেন্ টানিয়া লইয়া কি করে? শরীরের সব জায়গায় দিয়া দিয়া বেড়ায়। ফুস্ফোর বায়ু-কোষের গায়ের শিরের রক্ত কেমন করিয়া সব জায়গায় যায়? এই সব চুলের মত সরু সরু শিরের রক্ত ফুস্ফোর খুব বড় একটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের (হার্টের) বাঁ কুটু-রিতে যায়। তার পর, হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে খুব বড় একটা ধমনি দিয়া সেই রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। ধমনি কাকে বলে, শির কাকে বলে, আর ধমনি আর শিরের তফাত কি, এর আগেই সে সব বেশ করিয়া বলিছি। এখন ধমনি আর শির এ দুয়ে যেন গোলমাল করিও না। শরী-রের মধ্যে যত ধমনি আর শির আছে, সব চেয়ে এই ধমনীটী বড়। হৃৎপিণ্ড থেকে উঠিয়াছে বলিয়া এই ধমনীকে হৃৎ-পিণ্ডের ধমনী বলে। ভাল বাঙ্গালায় হৃদ্ধমনি বলে। ডাক্তরেরা এয়র্টা বলেন। হৃৎপিণ্ডের ধমনী, হৃদ্ধমনী আর এয়র্টা, এর মধ্যে যে নামটী তোমার সোজা বলিয়া বোধ

হবে. সেই নামটি মনে করিয়া রাখ। গাছের গুঁড়ি আর হৃৎপিণ্ডের এই ধমনী সমান। গাছের গুঁড়ি থেকে যেমন ডাল পালা বাহির হয়, হৃৎপিণ্ডের ধমনী থেকে তেম্‌নি সব ডাল-পালা বাহির হইয়াছে। শরীরের মধ্যে যেখানে যে ধমনী দেখিবে, সে এই বড় বা গুঁড়ি ধমনীর ডাল। গাছের গুঁড়ি থেকেই কিছু সরু সরু ডাল বাহির হয় না। প্রথমে মোটা ডাল বাহির হয়। তার পর সেই মোটা ডাল থেকে সরু ডাল বাহির হয়। আবার সেই সরু ডাল থেকে তার চেয়েও সরু ডাল বাহির হয়। এই রকম করিয়া শেষে সরু একটী কাটীর মত ডাল বাহির হয়। হৃৎপিণ্ডের এই গুঁড়ি ধমনী থেকেও ঠিক্ সেই রকম করিয়া ডাল বাহির হইয়াছে। চুলের মত যে সব সরু ধমনী, সেই সব ধমনী এই গুঁড়ি-ধমনীর শেষ ডাল পালা। হৃৎপিণ্ডের এই গুঁড়ি-ধমনীর ডাল-পালা এই রকম করিয়া শরীরের সব জারগায় ছড়াইয়া আছে। তবেই দেখ, হৃৎপিণ্ডের এই গুঁড়ি-ধমনী দিয়া গিয়া রক্তের সেই সব রাঙা বিন্দু শরীরের সব জায়গায় অক্‌সিজেন্ দিয়া দিয়া বেড়াইতে পারে কি না। শরীরের সব জায়গা-তেই অক্‌সিজেনের দরকার। শরীরের মাংস, মাথার ঘিলু, আর পিঠের শিরদাঁড়ার ভিতরকার মগজ, এই তিনটী জিনিশে অক্‌সিজেনের যেমন দরকার, এমন আর কিছুতেই নয়। এ সব কথা এর পর আর এক বার ভাল করিয়া বলিব। শরীরের সব জায়গায় এই রকম করিয়া অক্‌সিজেন্ দিয়া দিয়া বেড়াইতে রাঙা বিন্দু গুলির অক্‌সিজেন্ প্রায় ফুরাইয়া যায়। অক্‌সিজেনের বদলে সেই সব জায়গা থেকে

কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ রক্তে আসে। নিশ্বাস ফেলিয়া যে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ সৃষ্টি করি বলিছি, সে এই কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্। এই জন্যে, রক্তের তেমন টক্‌টকে রাঙা রং থাকে না। এই অপরিষ্কার রক্ত শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে যায়। তার পর, হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরি থেকে বড় একটা শির দিয়া ফুস্ফোর সেই লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু সরু শিরে গিয়া উপস্থিত হয়। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর মুহুর্মুহু অপরিষ্কার হইতেছে আর পরিষ্কার হইতেছে। হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের সেই গুঁড়ি-ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায়, শরীরের সেই সব জায়গা থেকে ছোট ছোট শির দিয়া খুব বড় দুটা শিরে, এই দুটী বড় শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে, তার পর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরি থেকে একটা ধমনী দিয়া ফুস্ফোর সেই সব বায়ুকোষের গায়ে চুলের মত সরু সরু শিরে, শেষে সেই সব সরু সরু শির থেকে ফুস্ফোর মোটা চারিটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরিতে—এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়ায়। ডাক্তরেরা একেই সর্কুলেশন্ অব্ ব্লড্ বলেন। সর্কুলেশন্ অব্ ব্লড্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা রক্তসঞ্চালন। হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে শরীরের সব জায়গায় পরিষ্কার রক্ত যাইবার জন্যে যেমন একটী গুঁড়ি-ধমনী আছে বলিছি; শরীরের সেই সব জায়গা থেকে হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে অপরিষ্কার রক্ত আসিবার তেমনি দুটী গুঁড়ি-শির আছে।

একটী উপরকার গুঁড়ি শির, আর একটী নীচেকার গুঁড়ি-শির। উপরকার গুঁড়ি-শিরের সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন কুটুরির উপরের সঙ্গে যোগ আছে। আর নীচেকার গুঁড়ি-শিরের সঙ্গে আর হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির নীচের সঙ্গে যোগ আছে। উপরকার গুঁড়ি-শির দিয়া শরীরের উপরকার অর্দ্ধেকের অপরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে আসে। আর নীচেকার গুঁড়ি শির দিয়া শরীরেব নীচেকার অর্দ্ধেকের অপরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরিতে যায়। নীচেকার গুঁড়ি-শিরের চেয়ে উপরকার গুঁড়ি-শির ঢের ছোট। উপরকার গুঁড়ি-শির ৫। ৬ আঙুলের বেশী নয়। নীচেকার গুঁড়ি-শিব নাইয়ের সন্নাসন্নি জায়গা থেকে এক বারে বরাবরি লম্বা হইয়া হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির তলা পর্য্যন্ত উঠিয়াছে। আর উপরকার গুঁড়ি-শির কণ্ঠার প্রায় নীচে থেকে হৃৎপিণ্ডের ডাইন্ কুটুরির উপর পর্য্যন্ত নামিয়াছে। উপরকার গুঁড়ি-শিরটা দুটী মোটা শির দিয়া তয়ের হইয়াছে। নীচেকার গুঁড়ি-শিরও তেম্নি দুটী মোটা শির দিয়া তয়ের হইয়াছে। একটী গাছের যদি কেবল দুটী মোটা ডাল থাকে, আর সেই দুটী ডাল নীচের দিকে আছে আর গুঁড়িটী উপর দিকে আছে ভাবিয়া লও, আর সেই ডাল দুটী দিয়া অর্থাৎ ডাল দুটী একত্র মিলিয়া গুঁড়ি তয়ের হইয়াছে ভাব, তবে নীচেকার গুঁড়ি-শির মোটা দুটী শির দিয়া কেমন করিয়া তয়ের হইয়াছে বেশ বুঝিতে পারিবে। উপরকার গুঁড়ি-শিরের বেলায়ও ঠিক্ সেই রকম ভাবিবে। তবে তফাত এই, যে এবারে তোমাকে গাছটী

উল্‌টাইয়া লইতে হইবে না। কেন না, যে দুটী মোটা শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি শির তয়ের হইয়াছে, সে দুটী মোটা শির উপরদিকে আছে। নীচেকার যে দুটী মোটা শির দিয়া নীচেকার গুঁড়ি-শির তয়ের হইয়াছে, নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরে ছোট বড় যত শির আছে. সব শিরের রক্ত সেই দুটী মোটা শিরে যায়, আবার সেই দুটী মোটা শির থেকে নীচে-কার গুঁড়ি-শিরে যায়। তেম্‌নি উপরকার যে দুটী মোটা শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি-শির তয়ের হইয়াছে. উপরকার অর্দ্ধেক শরীরে ছোট বড় যত শির আছে, সব শিরের রক্ত সেই দুটী মোটা শিরে যায়, আবার সেই দুটী মোটা শির থেকে উপরকার গুঁড়ি শিরে যায়। উপরকার গুঁড়ি-শিরকে ডাক্তরেরা সুপিরিয়র্ বীনা কেবা বলেন। ভাল বাঙ্গালায় উর্দ্ধ-মহাশিরা বলা যায়। নীচেকার গুঁড়ি-শিরকে তাঁরা ইন্‌ফিরিয়ার বীনা কেবা বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অধো-মহাশিরা বলা যায়।

এর আগে হৃৎপিণ্ডের কেবল ডাইন্ আর বাঁ কুটুরির কথা বলিছি। ফল কিন্তু তা নয়। হৃৎপিণ্ডের চারিটী কুটুরি আছে। হৃৎপিণ্ড জিনিশটী কি আগে বলি, তার পর হৃৎপিণ্ডের চারিটী কুটুরির কথা বলিব। হৃৎপিণ্ডকে ইংরিজিতে হার্ট বলে, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। হৃৎপিণ্ড মাংসের একটী থলী বৈ আর কিছুই নয়। এই থলীর উপর-দিক্ মোটা, আর নীচের দিক্ সরু। মোটা দিক্‌কে হৃৎপিণ্ডের গোড়া বলে, আর সরু দিক্‌কে হৃৎ-পিণ্ডের আগা বলে। রোগা কাহিল মানুষের বাঁ মাইয়ের

নীচে হাত দিলে যে ধুক্-ধুক্ করা জানিতে পারা যায়. হৃৎ-পিণ্ডের আগা এক বার করিয়া উঠে আর পড়ে বলিয়া ও জায়গায় ও রকম-ধুক্-ধুক্ টের পাও। হৃৎপিণ্ডের আগা ঐ জায়গায় পাঁজরে এক বার করিয়া আসিয়া লাগে আর সরিয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আগা পাঁজরে ও রকম করিয়া আসিয়া লাগে আর সরিয়া যায় কেন? ৮৭—৮৮র পাতে বলিছি, পিচ্‌কিরি করিয়া চালাইয়া দিলে. রক্ত যেমন সব শিরের মধ্যে চলিয়া যায়, এই যন্ত্রের (হৃৎপিণ্ডের) মধ্যে এমনি কল বল আছে, আর এর নিজেরই এমনি শক্তি আছে, যে ঠিক্ সেই রকম পিচ্‌কিরির মত সব শিরের মধ্যে রক্ত চালাইয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের এই শক্তি কি রকম, এখন তাই বলিব। মনে কর, চামড়ার একটা থলি আছে। সেই থলির এক মুড়োয় একটা কি দুটো ফুটো আছে। এই ফুটো দিয়া থলিতে জল পূর। জল পুরিয়া যে মুড়োয় ফুটো আছে, সেই মুড়ো উপরদিক্ করিয়া থলিটী হাতে করিয়া লও। কাইত বা উপুড় না করিয়া সেই ফুটো দিয়া যদি থলির জল বাহির করিয়া দিতে চাও, তবে কি করিবে? এক হাত দিয়াই হোক্, আর দু হাত দিয়াই হোক্, থলিটা ধরিয়া জোরে চাপন দিলেই উপরকার ফুটো দিয়া জল বাহির হইয়া যাবে। পিচ্‌কিরির জল যেমন জোরে বাহির হইয়া যায়, থলির জলও তেমনি জোরে বাহির হইয়া যাবে। উপরকার ফুটো দিয়া জল বাহির করিয়া দিবার জন্যে জল-পোরা থলিটে তোমাকে হাত দিয়া চাপিতে হইল। হৃৎপিণ্ডের উপরকার ফুটো দিয়া হৃৎপিণ্ডের ভিতর-

কার রক্ত বাহির করিয়া দিবার জন্যে হৃৎপিণ্ডকে ও রকম করিয়া কারুই চাপিয়া ধরিতে হয় না। হৃৎপিণ্ড নিজেই জড়-শড় হইয়া চাপ দিয়া ভিতরকার রক্ত উপরকার ফুটো দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ডের এই রকম জড় শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়াকে ডাক্তরেরা হৃৎপিণ্ডের কণ্ট্রাক্শন্ বলেন। কণ্ট্রাক্শন্ ইংরিজি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা সংকোচন। সংকোচনকে সোজা বাঙ্গালায় জড়-শড় হওয়া বলে। হৃৎপিণ্ড জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর এই রকম করিয়া চাপ দেয় বলিয়াই হৃৎপিণ্ডের আগা বাঁ মাইয়ের নীচে পাঁজরে ঐ রকম করিয়া বারে বারে আসিয়া লাগে। হৃৎপিণ্ড জড়শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর যখন এই রকম করিয়া চাপ দেয়, তখনই হৃৎপিণ্ডের আগা বাঁ মাইয়ের নীচে পাঁজরে আসিয়া লাগে, আর তখনই নাড়ীর ডুব্-ডুবুনি টের পাওয়া যায়। তবেই দেখ, এই তিনটী ঘটনা ঠিক্ এক সময়েই হয়। হৃৎপিণ্ড যে জড়শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর এই রকম করিয়া চাপ দেয়, তা কিছু তুমি দেখিতে পাও না। তবে হাত ধরিয়া নাড়ী দেখিয়া তা বেশ ঠিক্-করিতে পার। রোগা, কাহিল মানুষের বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিয়াও তা ঠিক্ করিতে পার। এর আগেই বলিছি, হৃৎপিণ্ডের বলে শিরের মধ্যে যে রক্ত চলে, সে রক্ত বেগে চলে আর দমকে দমকে চলে। রক্ত এই রকম বেগে আর দমকে দমকে চলে বলিয়াই রাঙা রক্তের শিরের (ধমনীর) ও রকম ডুব্ ডুবুনি টের পাওয়া যায়। হৃৎপিণ্ডের আবার বল কি ?

জড়শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়াকেই হৃৎপিণ্ডের বল বলে। এই জন্যে নাড়ী দেখিয়া হৃৎপিণ্ডের ও রকম জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়া ঠিক্ করিতে পার।

এখন হৃৎপিণ্ডের ভিতরকার কুটুরির কথা বলি। হৃৎপিণ্ডের ভিতরে চারিটা কুটুরি আছে। উপরে দুটী, নীচে দুটী। উপরকার দুটী কুটুরির মাঝের দেওয়ালে কোন ফুটো, ফাটা, পথ বা দুওর নাই। কাজেই, এক কুটুরি থেকে আর এক কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না। ছেলে যত দিন পেটে থাকে, তার হৃৎপিণ্ডের মাঝের ঐ দেওয়ালে একটী গোল ফুটো থাকে। এই ফুটো দিয়া উপরকার ডাইন্ কুটুরির রক্ত বাঁ কুটুরিতে যায়। ছেলে যে ভূমিষ্ঠ হয়, সেই ও ফুটো দিয়া রক্ত যাতায়াত বন্ধ হইয়া যায়। ফুটোটীও আপনিই বুজিয়া যায়। ফুটোর কেবল দাগটী থাকে। নীচেকার দুই কুটুরির মাঝের দেয়ালেও কোন ফুটো, ফাটা, পথ বা দুওর নাই। কাজেই, এক কুটুরি থেকে আর এক কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিতে পারে না। উপরকার দুটী কুটুরির চেয়ে নীচেকার দুটী কুটুরি বড়। উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে রক্ত আসিবার একটা পথ আছে। এই পথ একটী ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো ঢাকিবার বা বন্ধ করিবার একটী কপাট আছে। উপরকার ডাইন্ কুটুরির মেজে আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরির ছাদ যে এক, তা কি আর বলিতে হবে? উপরকার বাঁ কুটুরি থেকে নীচেকার

বাঁ কুটুরিতে রক্ত আসিবারও তেম্‌নি একটা পথ আছে। এ পথও একটী ফুটো বৈ আর কিছুই নয়। এই ফুটো ঢাকিবার বা বন্ধ করিবারও একটী কপাট আছে। উপরকার বাঁ কুটুরির মেজে আর নীচেকার বাঁ কুটুরির ছাদ এক। উপরকার ডাইন কুটুরি থেকে উপরকার বাঁ কুটুরিতে রক্ত যাতায়াত করিবার যেমন কোনও পথ নাই, নীচেকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার বাঁ কুটুরিতেও রক্ত যাতায়াত করিবার তেম্‌নি কোনও পথ নাই! অর্থাৎ নীচেকার দুই কুটুরির মাঝের দেয়ালেও কোন ফুটো ফাটা, পথ বা দুওর নাই। এর আগেই বলিছি, হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের সেই গুঁড়ি-ধমনী আর তার ডাল-পালা দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। আবার এই মাত্র বলিলাম, হৃৎপিণ্ডের ভিতর চারিটী কুটুরি আছে। উপরকার ডাইন্ কুটুরি, নীচেকার ডাইন্ কুটুরি; উপরকার বাঁ কুটুরি, আর নীচেকার বাঁ কুটুরি। তবে হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের কোন্ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি ধমনী আর তার ডাল-পালা দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়? হৃৎপিণ্ডের নীচেকার বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী আর তার ডাল-পালা দিয়া পরিষ্কার রক্ত শরীরের সব জায়গায় যায়। হৃৎপিণ্ডের নীচেকার বাঁ কুটুরির কোন্ দিকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী লাগান আছে? উপর দিকে। এই জায়গায় একটী ফুটো আছে। এই ফুটোয় হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী ঠিক্ যেন একটী নলের মত লাগান আছে। এই ফুটো, পথ, বা দুওর ঢাকিবার একটী কপাট

আছে। এর আগে বলিছি, ফুস্কোর লক্ষ লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু কোটি কোটি শির থেকে ফুস্কোর মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাঁ কুটুরিতে যায়। হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের কোন্ কুটুরিতে যায়? উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়। ফুস্কোর অমন কয়টা মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের উপরকার কুটুরিতে যায়? চারিটী শির দিয়া। এই চারিটী শিরের দুটী হৃৎপিণ্ডের বাঁ দিকের উপরকার কুটুরির ডাইন্ দিকে, আর দুটী তার বাঁ দিকে লাগান আছে। ফুল্‌কোর লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু কোটি-কোটি শির থেকে ফুস্কোর ঐ চারিটি মোটা শির দিয়া পরিষ্কার রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়; তার পর, উপরকার বাঁ কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে ফুটো, পথ বা দুওর আছে বলিছি, সেই ফুটো দিয়া নীচেকার বাঁ কুটুরিতে যায়; শেষে নীচেকার বাঁ কুটুরি থেকে হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী দিয়া শরীরের সব জায়গায় যায়। এর আগে বলিছি, নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার রক্ত নীচেকার গুঁড়ি-ধমনী দিয়া, আর উপরকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার রক্ত উপরকার গুঁড়ি-শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়; তার পর, উপরকার ডাইন্ কুটুরির তলায় বা মেজেতে যে ফুটো, পথ বা দুওর আছে বলিছি, সেই ফুটো দিয়া নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়; শেষে নীচেকার ডাইন্ কুটুরি থেকে ফুস্কোর একটা ধমনী দিয়া সেই অপরিষ্কার রক্ত ফুস্কোর সেই লক্ষ-

লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু-সরু শিরে গিয়া উপস্থিত হয়। হৃৎপিণ্ডের নীচেকার ডাইন্ কুটুরির কোন্ দিকে ফুস্কোর ঐ ধমনী লাগান আছে? উপর দিকে। এই জায়গায় হৃৎপিণ্ডের গায়ে একটী ফুটো আছে। এই ফুটোয় ফুস্কোর ঐ ধমনী নলের মত লাগান আছে। এই ফুটো, পথ বা দুওর ঢাকিবার একটী কপাট আছে।

কিসের বলে আর কেমন করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইছে আর অপরিষ্কার রক্ত কেমন করিয়া পরিষ্কার হইতেছে, এক রকম মোটামুটি বলিলাম। আর এক বার ভাল করিয়া বলি। নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত ছোট বড় অনেক শির দিয়া নীচেকার দুটী মোটা শিরে যায়। তার পর নীচেকার এই দুটী মোটা শির থেকে নীচেকার গুঁড়ি-শির (অধোমহাশিরা—ইন্-ফিরিয়র্ বীনা কেবা) দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। আর উপরকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরি-ষ্কার কাল রক্ত ছোট বড় অনেক শির দিয়া উপরকার দুটী মোটা শিরে যায়। তার পর উপরকার এই দুই মোটা শির থেকে উপরকার গুঁড়ি-শির (উর্দ্ধমহাশিরা—সুপিরি-য়র বীনা কেবা) দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটু-রিতে যায়। নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত, আর উপরকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত এই রকম করিয়া ঠিক্ এক সময়েই হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে গিয়া পড়ে। এই অপরিষ্কার কাল রক্ত

হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। তার পর, নীচেকার ডাইন্ কুটুরি থেকে ফুস্কোর বড় ধমনী দিয়া ফুস্কোর লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের গায়ে জালের মত বিছান চুলের মত সরু-সরু শিরে যায়। এই লক্ষ-লক্ষ বায়ুকোষের ভিতরকার বাতাসের অক্সিজেন্ লইয়া সেই অপরিষ্কার কাল রক্ত পরিষ্কার আর লাল টক্‌টকে হয়। তার পর, এই পরিষ্কার আর লাল টক্‌টকে রক্ত চুলের মত সেই সব শির থেকে ফুস্কোর চারিটী মোটা শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার বাঁ কুটুরিতে যায়। তার পর, উপরকার বাঁ কুটুরি থেকে এই পরিষ্কার লাল রক্ত নীচেকার বাঁ কুটুরিতে যায়। শেষে নীচেকার বাঁ কুটুরি থেকে এই পরিষ্কার লাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী (হৃদ্ধমনী—এয়র্টা) আর তার ডাল-প্যালা দিয়া শরীরের সব জায়গায় যায়। এই রকম করিয়া শরীরের মধ্যে রক্ত নিয়ত ঘুরিয়া বেড়াইতেছে, আর মুহুর্মুহু অপরিষ্কার হইতেছে আর পরিষ্কার হইতেছে।

তার পর বলি। এর আগেই বলিছি, মৃত্যু দু রকমে হয়। (১) যে কারণেই হোক্, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলেই মৃত্যু হয়। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে কেন মৃত্যু হয়, এত ক্ষণ তাই বলিতেছিলাম। আর তাই বলিতে গিয়াই এত কথা বলিলাম। ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে যেমন করিয়া মৃত্যু হয়, ফুস্কোর মধ্যে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ গেলেও তেম্‌নি করিয়া মৃত্যু হয়। তবেই ফুস্কোর মধ্যে বাতাস না যাওয়ারও সেই ফল। অনেক দিনের এঁধো কুওর মধ্যে নামিলে কেন মৃত্যু হয়,

এর আগেই তা বলিছি। (২) ৮৭—৮৮র পাতে বলিছি, হৃৎপিণ্ডের কাজ (অর্থাৎ জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দেওয়া) যতক্ষণ থাকে, ততক্ষণ শরীরের মধ্যে রক্ত চলা ফেরা করে, আর ততক্ষণ জীবন থাকে। ওর কাজ বন্ধ হইলেই, রক্তের চলা ফেরা বন্ধ হয়, আর জীবনও যায়। তবেই যে কারণে হৃৎপিণ্ডের এই কাজ হঠাৎ বন্ধ হয়, সেই কারণেই হঠাৎ মৃত্যু হয়। এমন অনেক বিষ আছে, যা খাইবা মাত্র হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হয়। কাজেই মৃত্যুও তখনই হয়। হঠাৎ মূর্চ্ছা হইয়া যে মৃত্যু হয়, তাও হৃৎপিণ্ডের কাজ বন্ধ হইয়া হয়। মনে কর, খুব কাহিল রোগী, যাকে ধরিয়া পাশ ফিরাইয়া দিতে হয়, তাকে যদি হঠাৎ উঠাইয়া বসাও বা দাঁড় করাও, তবে মূর্চ্ছা হইয়া তখনই তার মৃত্যু হইতে পারে। এর পর, এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। এখন মনে করিয়া রাখ যে, (১) ফুস্ফোর মধ্যে বাতাস যাওয়া বন্ধ হইলে, কি ফুস্ফোর মধ্যে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ গেলে মৃত্যু হয়। আর (২) যে কারণেই হোক্, হৃৎপিণ্ডের কাজ হঠাৎ বন্ধ হইলে মৃত্যুও হঠাৎ হয়।

যদি বল নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিতে বলিতে এত কথা বলিবার দরকার কি? এত ফাল্‌তো কথা বলিয়া মিছামিছি পুঁথি বাড়াইবার দরকার কি? দরকার একটু আধটু নয়। খুবই দরকার। কি নিশ্বাসে আমাদের ফুস্ফোর মধ্যে যে ব্যাপার ঘটিতেছে, আর যে ব্যাপার ঘটনার একটু এ দিক্ ও দিক্ হইলে আমাদের জীবন সংশয় হয়, ও রকম

করিয়া তা বুঝাইয়া না বলিলে—পরিষ্কার বাতাস আমাদের কত দরকার; পরিষ্কার বাতাসের কেনই বা এত দরকার; ফুস্কো আমাদের কত বড় দরকারী যন্ত্র; এই যন্ত্রের কল বল সব ঠিক্ থাকা কত দরকার; ব্যামোতে এই যন্ত্রের কল বল বিগ্‌ড়ে গেলে আমাদের কত বিপদ্ ঘটিতে পারে; ফুস্কোর কোন ব্যামো হইলে তা শীঘ্র ভাল করা কত দরকার; নিয়ু-মোনিয়াকে ডাক্তারেরা কেন এত ভয় করেন; কেনই বা তাঁরা নিয়ুমোনিয়াকে এত শক্ত রোগ বলেন; আর নিয়ু-মোনিয়া রোগ বুঝিতে না পারিলে, কি নিয়ুমোনিয়ার ঠিক্ চিকিৎসা করিতে না পারিলে রোগী কেন অত শীঘ্র মারা পড়ে—ও রকম করিয়া বুঝাইয়া না বলিলে, এ সব তুমি কখনই তলিয়ে বুঝিতে পারিতে না। ফুস্কো আমাদের কি রকম দরকারী যন্ত্র, ফুস্কোর কোন শক্ত ব্যামো হইলে আমাদের কি রকম সতর্ক আর সাবধান হওয়া উচিত, তা বুঝাইয়া বলিবার জন্যে বেশী কথা বলিবার দরকার নাই; তোমাকে তা এক কথায় বলিয়া দিতেছি। দশ দিন আহার না পাইলেও আমরা বাঁচিয়া থাকি। এক দিন জল না পাইলেও বাঁচিয়া থাকি। কিন্তু ফুস্কোর মধ্যে বাতাস না গেলে আমরা এক মুহূর্ত্তও বাঁচি না।

তার পর বলি। সহজ মানুষ যে ঘরে থাকে, সে ঘরের চেয়ে রোগীর ঘরে দিন রাতি বাহিরের পরিষ্কার বাতাস খেলার আরও বেশী দরকার। রোগীর ঘরে আরও বেশী পরিষ্কার বাতাসের দরকার কেন? সহজ মানুষের চেয়ে রোগীর গা থেকে আর ফুস্কো থেকে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্

বাহির হয়। এর আগেই বলিছি, আমরা যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বারই নিশ্বাসের সঙ্গে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। ফল কথা, নিশ্বাস ফেলিলে নাক দিয়া যে একটা বাতাস বাহির হয়, সে বাতাসটা কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বৈ আর কিছুই নয়। আমাদের গায়ের চামড়ায় এমন লক্ষ-লক্ষ ছিদ্র আছে। সেই লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়াও কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। সহজ বেলার চেয়ে ব্যামো হইলে নাক দিয়া আর চামড়ার সেই লক্ষ লক্ষ ছিদ্র দিয়া বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বাহির হয়। এই জন্যে, সহজ মানুষের ঘরের চেয়ে রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাতাসের বেশী দরকার। এ কথাটা যেন কখনও ভুলও না। আর এই জন্যেই, রোগীর ঘরে লোক জন যত কম থাকে, ততই ভাল। কেন, তা কি আবার বলিতে হইবে? ঘরে লোক বেশী থাকিলে কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ বেশী সৃষ্টি হয়। যে ঘরে রোগী থাকে, সে ঘরে কেমন একটা ভারি দুর্গন্ধ হয়। এ রকম দুর্গন্ধ কেন হয়? রোগীর গা থেকে বেশী কার্ব্বণিক্ য়্যাসিড্ ত বাহির হয়ই। তা ছাড়া, তার গা থেকে একটা দুর্গন্ধ বাহির হয়। এই দুর্গন্ধে ঘরের বাতাস খুব খারাপ হয়। এই জন্যে, রোগীর ঘরে পরিষ্কার বাতাস খেলার আরও বেশী দরকার। রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ বাহির হয়, তা দূর করিবার একটী উপায় আছে। উপায়টীও খুব সহজ। কয়লার একটী গুণ আছে। সকলে তা জানেন না। জানিলে কয়লা এত দিন খুব আদরের জিনিশ হইয়া পড়িত। সে গুণটী কি? কয়লা দুর্গন্ধ খাইয়া ফেলে। রোগীর ঘরের

কড়িতে কি আড়ায় ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইয়া রাখিলে রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তা ঐ কয়লায় খাইয়া ফেলে। কাজেই, রোগীর ঘরের বাতাস আর খারাপ হইতে পারে না। হাঁস্পাতালে যেখানে অনেক রোগী থাকে, সেখানে ও রকম করিয়া কয়লা টাঙাইয়া না রাখিলে রোগী-দের গায়ের গন্ধে হাঁস্পাতালে কেহ তিষ্ঠুতে পারিত না। মেডিকেল্ কলেজের হাঁস্পাতালে গিয়া যদি এক বার দেখ, তবে রোগীদের ঘরে ঘরে কয়লার-ঝুড়ির কেমন সব রচনা ঝুলিতেছে দেখিতে পাইবে। কয়লার এ গুণটীও ভুলিও না, রোগীর ঘরের আড়ায় কি কড়িতে ঝুড়ি করিয়া কয়লা টাঙাইতেও ভুলিও না। তিন চারি দিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা খুব খোলা জায়গায় বাতাসে বেশ করিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। বাতাসে এ রকম করিয়া ছড়াইয়া দিলে কয়লার ভিতরকার সব খারাপ গন্ধ বাহির হইয়া যায়। তার পর সেই কয়লা আবার নূতন কয়লার মত ব্যবহার করিতে পার। কয়লার ভিতরে খারাপ গন্ধ কোথা থেকে আসিল? রোগীর গা থেকে যে দুর্গন্ধ উঠে, তাই কয়লার ভিতরে গিয়া জমা হয়। তাতেই বলিছি যে কয়লা দুর্গন্ধ খাইয়া ফেলে। পোনর দিন অন্তর ঝুড়ির কয়লা বদলাইয়া ফেলিবে। পুরাণ কয়লা ফেলিয়া দিয়া ঝুড়িতে নূতন কয়লা পুরিয়া রাখিবে। মনে কর ত দু বেলা কয়লা বদলাইতে পার। কেন না কয়লা কিনিতেও হয় না, কয়লা তয়ের করিবার জন্যে কিছু খরচ করিতেও হয় না। দু বেলা ভাত তরকারি-রাঁধিবার জন্যে আকায় (উননে) রোজ রোজ যে কয়লা

তয়ের হয়, সেই কয়লা নষ্ট না করিয়া রাখিলে তোমার কয়-লার অভাব কখনই হয় না। রাঁধা বাড়ার পর আকার (উনুনের) আগুন যদি না নিবাও, তবে কয়লা না হইয়া সব ছাই হইয়া যায়। এই জন্যে, দু বেলাই জলের আছড়া দিয়া আকার আগুণ নিবাইয়া রাখিবে। এই রকম করিয়া রোজ রোজ যে কয়লা তয়ের হবে, একটা ঢাকা জায়গায় গাদা করিয়া রাখিয়া দিবে। বৃষ্টিতে ভিজিতে দেওয়া হবে না।

দো-তলা কি তে-তলায় শুক্‌নো খট্‌খটে ঘরে খাটের উপর খুব পুরু আর পরিষ্কার বিছানায় নিয়ুমোনিয়া-রোগীকে শোওয়াইবে বলিলে কাঙাল গরিবদের উপায় কি হবে? বড় মানুষরা তোমার সব রকম নিয়মই পালন করিতে পারে। টাকায় বই হয়। কিন্তু যারা পরিবারদের ভাত কাপড় যোগাইতে পারে না, তাদেরই মুস্কিল। ভিজে সোঁতা মাটীতে শুইলে সহজ মানুষেরও ব্যামো হয়। কাজেই, হাজার গরিব হইলেও রোগীকে তেমন জায়গায় শুইতে দেওয়া উচিত নয়। এই জন্যে ভিজে সোঁতা মাটিতে নিয়ু-মোনিয়া-রোগীকে কখনও শুইতে দিবে না। শুদু নিয়ু-মোনিয়া-রোগী বলিয়া কেন? কোনও রোগীকেই ভিজে সোঁতা মাটিতে শুইতে দেওয়া উচিত নয়। রোগীর কথা ছাড়িয়া দেও। সহজ মানুষেরও পক্ষে তা ব্যবস্থা নয়। যাদের আর ঘর নাই, খাট তক্তপোষ কিনিবার উপায় নাই, ভিজে সোঁতা মাটিতে না শুইলে যাদের চলে না, তাদের উপায় তবে কি হবে? উপায় আছে। সহজ উপায়ই

আছে। গুঁড় চূণ ঘরের মেজেতে পুরু করিয়া ছড়াইয়া দিয়া তার উপর শুক্‌নো বিচিলি কি পল পাতিলে ভিজে সোঁতা মেজের দোষ অনেক কাটিয়া যায়। সেই শুক্‌নো বিচিলি কি পলের উপর বিছানা করিয়া রোগীকে শোওয়াইলে তার কোনও অনিষ্ট হয় হয় না। ভিজে সোঁতা মেজের রস চূণ ফুঁড়িয়া উঠিয়া রোগীর বিছানা কি গা নরম করিতে পারে না। চূণের এ গুণটী কখনও ভুলিও না। এ রকম যুক্তি না করিলে কাঙাল গরিবের আর উপায় নাই। আমাদের দেশের পোনর আনা লোক নিঃস্ব। যে ঘরের মেজে অত ভিজে সোঁতা, তার দেওয়ালও ভিজে সোঁতা। দেয়ালের গোড়ায় যদি রোগীর বিছানা করিতে হয়, তবে শুক্‌নো বিচিলির ঝাঁপ তয়ের করিয়া দেয়ালের গায়ে হেলান দিয়া রাখিয়া তবে তার বিছানা করিবে।

আর একটী কথা বলিলেই নূতন নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলা সারা হয়। এর আগেই বলিছি, নিয়ুমোনিয়া-রোগীর ঘর দিন রাত্রি সমান গরম রাখা বড় দরকার। নৈলে ব্যামো শীঘ্র সারে না। ব্রংকাইটিস রোগেও রোগীকে ঠিক্ সেই নিয়মে রাখিতে হয়। রোগীর ঘর ত দিন রাত্তি সমান গরম রাখা চাই-ই। তা ছাড়া, খুব গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে নিয়ত দিতে পারিলে রোগী খুব আরাম বোধ করে। বাতাসের সঙ্গে গরম জলের ভাব ফুস্‌ফোর মধ্যে গেলে কাশি কমে, হাঁপ কমে, কাশিতে কি নিশ্বাস লইতে বুকের ভিতরকার ব্যথা কমে, শ্লেষ্মা সরল হয়, সহজেই গয়ের তুলিতে পারে। বুকে, পিঠে, পাঁজরে তার্পিণের সেক দিলে যে

উপকার হয়, খুব গরম জলের ভাব বাতাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে গেলে তার চেয়ে কম উপকার হয় না। গরম জলের ভাবের এ গুণটী কখনও ভুলিও না। গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে কেমন করিয়া দিবে ? ঘর খানি যদি ছোট হয়, তবে ৫। ৬ হাঁড়ি ফুটন্ত গরম জল ঘরের মধ্যে আনিয়া হাঁড়ির মুখের শরা খুলিয়া দিলে গরম জলের ভাবে ঘর খানি এক বারে পুরিয়া যাবে। ঘর যদি বড় হয়, তবে রোগীর বিছানায় মশারি খাটাইয়া তার ভিতর ঐ রকম করিয়া গরম জলের ভাব দিবে। মশারির ভিতর ফুটন্ত গরম জলের ৪। ৫টী হাঁড়ি লইয়া গেলে বড় গরম হয়, আর সে গরমে রোগীর কষ্ট হয়। এই জন্যে মশারির চারি কোণে চারিটি হাঁড়ি এমনি জুত বরাত করিয়া বসাইবে যে, হাঁড়ির কেবল মুখটা মশারির ভিতর থাকে, আর সব বাহিরে থাকে। হাঁড়ির গলা পেঁচিয়া মশারি বাঁধিয়া কোনও দিকে ফাঁক না থাকে এমন করিয়া মশারি ঝুলাইয়া দিলে মশারির মধ্যে গরম জলের ভাব যাবে, অথচ তার ভিতর তেমন গরম হবে না। ব্রংকাইটিস্ই হোক্, নিয়ুমোনিয়াই্ হোক্, প্লুরিসিই হোক্, আর কোন কাশ-রোগই হোক্, ফুটন্ত গরম জলের ভাব বাতাসের সঙ্গে রোগীর ফুস্কোর মধ্যে গেলে তার অনেক কষ্ট নিবারণ হয়। যেমন কাশি, তেম্নি হাঁপ, গয়ের তুলিতে তেম্নি কষ্ট, আবার কাশিবার সময় বুকের ভিতর তেম্নি ব্যথা। এ সব অসুখ দূর করিবার যেমন অসুদ ফুটন্ত গরম জলের ভাব, এমন আর কিছুই নয়। ফুটন্ত গরম জলের ভাব খানিক ক্ষণ পর্য্যন্ত ঐ রকম করিয়া ফুস্কোর

মধ্যে লইলে কাশি কমে, হাঁপ কমে, শ্লেষ্মা সরল হয়, গয়ের তুলিতে তত কষ্ট হয় না, গয়ের সহজে উঠে, আর কাশিবার সময় বুকের ভিতরকার ব্যথাও কমে। নিয়ুমোনিয়া, ব্রংকাইটিস্, প্লুরিসি ও আর সব কাশ-রোগে রোগীর ঘর দিন রাত্রি সমান গরম রাখা, আর ২৪ ঘণ্টার মধ্যে ৫। ৬ বার করিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব ঘরের মধ্যে বা মশারির ভিতর ঐ রকম করিয়া দেওয়া, এই সব রোগের প্রধান চিকিৎসা—এ কথা যেন কখনও ভুলিও না। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের যে কত গুণ, তা বলা যায় না। এর পর, এ সব ভাল করিয়া বলিব।

(২) পুরাণ নিয়ুমোনিয়া——নূতন নিয়ুমোনিয়া ক্রমে পুরাণ পড়িয়া যাইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই নিয়ু-মোনিয়ার পুরাণ ভাব হইতে পারে। নূতন নিয়ুমোনিয়া থেকে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া খুব কম হয়। ব্রংকো-নিয়ু-মোনিয়া থেকেই পুরাণ নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। ব্রংকাই-টিস্ থেকে যে নিয়ুমোনিয়া হয়, সেই নিয়ুমোনিয়াকে ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া বলে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার কথা এর পরই বলিব। প্লুরিসি থেকেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হইতে পারে। কখন কখন এ রকম ঘটে যে, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুস্কো ক্রমে চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়। (২০৫—২০৬র পাত দেখ)। ফুস্কোর এ রকম অবস্থা থেকেও পুরাণ নিয়ু-মোনিয়া হয়। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) থেকেও পুরাণ নিয়ু-মোনিয়া হয়। ধূল, বালি, চুণ, তুলর আঁশ, লোওয়া কি

আর কোন ধাতুর গুঁড়, কয়লার গুঁড় ফুল্কোর নলির মধ্যে গেলেও পুরাণ নিয়ুমোনিয়া ক্রমে ঘটে। খনিতে যারা কাজ করে, কামার, যারা জাঁতার কাজ করে. যে সব মিস্ত্রি পাতরের কাজ করে, এদেরই পুরাণ নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। ফল কথা, কোন রকম খারাপ গুঁড় কি ধুল নিশ্বাসের সঙ্গে যাদের ফুল্কোর মধ্যে যায়, তাদেরই পুরাণ নিয়ুমোনিয়া বেশী হয়। ক্ষয়কাশের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

তার পর ব্যামো হইয়া যে ফুল্কোটী খারাপ হইয়া যায়, তার আকার প্রকার কেমন হয় তা বলি। কোন কোন রোগীর বিশেষ যাদের ফুল্কোর মধ্যে ধুল বালি গিয়া পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে, তাদের ফুল্কোর রং প্রায় কাল হইয়া যায়।

ব্যাম্মোর গোড়ায় ফুল্কোর ভিতর খুব রক্ত জমে। তার পর ফুল্কোয় তেমন রক্ত জমিয়া থাকে না। ফুল্‌কোর রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়। শেষে ফুল্‌কোর আকার প্রকার এমনি বদ্‌লাইয়া যায় যে, সে রকম ফুল্‌কো যে এক বার দেখিয়াছে, তার আর ভুল হয় না। ফুল্কো কুঁকড়ে-শুঁকড়ে জড়-শড় হইয়া যায়। আর তেমন যে নরম ফুল্‌কো এক বারে এমনি শক্ত হইয়া যায় যে, হাত দিয়া ছেঁড়া যায় না, আর কাটিলে কর্‌কর্‌ শব্দ হয়। কাটা জায়গা তেলা, শুক্‌নো আর মারবেলের মত ছিট্‌ ফোটা। আর কাটা জায়গায় শুক্‌নো নাড়ীর মত দড়ি-দড়ি সব কি দেখা যায়। এ সব কি? শির আর বায়ুনলি বুজিয়া গিয়া আর মোটা হইয়া ও রকম দড়ি-দড়ি হইয়া থাকে। ফুল্‌কোর অনেক

খানি এই রকম করিয়া খারাপ হইতে পারে। আবার একটু খানিও খারাপ হইতে পারে। কেবল একটা ফুস্কোরই এ রকম দুর্দ্দশা হয়। দুট ফুস্কোর হয় না। পুরাণ নিয়ু-মোনিয়ার এই একটী বিশেষ চিহ্ন। ফুস্কোর এ রকম দুর্দ্দশা হয় কেন? পুরাণ নিয়ুমোনিয়াতে বায়ুকোষ গুলির গা খুব পুরু হয়, কাজেই তাদের খোল কমিয়া যায়। ফল কথা, ফুস্কোর যে খানিতে ব্যামো হয়, সে খানির ফোঁপড়া ভাব (স্পঞ্জের মত) কমিয়া যায়, আর নিরেট ভাবই বেশী হয়। স্পঞ্জের মত নরম আর ফোঁপড়া বলিয়াই ফুস্কোর ভিতর বাতাস সহজেই যায়, আর ফি নিশ্বাসে অমন ফাঁপিয়া উঠে। কাজেই ফুল্‌কো সে রকম ফোঁপড়া আর নরম না থাকিলে আর বায়ুকোষ গুলির খোল কমিয়া গেলে, বাতাস সহজেও যাইতে পারে না, আবার ফি নিশ্বাসে যতটুকু বাতাস যাই-বার কথা, তাও যায় না। কাজেই, ফুল্‌কো কুঁক্‌ড়ে-শুঁক্‌ড়ে জড়শড় হইয়া যাইবে বৈ আর কি? এ দিকে ফুল্‌কো কুঁক্‌ড়ে-শুঁক্‌ড়ে জড়-শড় হয়, ও দিকে বায়ু-নলি গুলির খোল বড় হয় আর বুকের বাঁ পাঁজরের সেই জায়গায় বসিয়া যায়। বুকের বাঁ পাঁজরের সে জায়গাটা অমন করিয়া বসিয়া যায় কেন? আগে ফি নিশ্বাসে ফুল্‌কো একবারে এমন ফাঁপিয়া উঠিত যে বুকের খোল একবারে পুরিয়া যাইত। এখন ফুল্‌কোর ভিতর সে রকম বাতাসও যায় না, ফুল্‌কো ফাঁপিয়াও উঠে না, ফি নিশ্বাসে বুকের খোলও পুরিয়া উঠে না। উপরে বাতাসের চাপ, নীচে বাতাস নাই, কাজেই বুকের কি পাঁজরের সেই জায়গা বসিয়া যায়। গায়ের এক

[illegible] জমিয়া পচে বলিয়া বায়ুনলি গুলির খোল আরও [illegible]। আর সেই সব বায়ুনলির চারি দিকে ফুল্‌কো [illegible] খারাপ হইয়া যায়। এ ব্যামো এক দিক্‌কার ফুস্কোর সব খানিতে হইতে পারে, ফুল্‌কোর কেবল গোড়ার দিকেই হইতে পারে, ফুল্‌কোর কেবল আগাতেও হইতে পারে, কিম্বা ফুল্‌কোর কেবল মাঝখানেও হইতে পারে। বুকের খোলা আর ফুল্‌কো যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দ্দাটী সচরাচর পুরু হয়, আর গায়ে-গায়ে লাগিয়া যায়। এই পর্দ্দাটীকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলেন। এই পর্দ্দা খুব পুরু হইলে ফুল্‌কোকে এক বারে চাপিয়া কষিয়া ধরে। তাতেই ফুল্‌কো ক্রমে চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়। ফুল্‌কোর বায়ুকোষ গুলি সেই কষুণিতে এক রকম বুজিয়া যায়। [illegible] থেকে এই রকম করিয়া পুরাণ নিয়মোনিয়া হয়। ফুল্‌কোর যে টুকুতে এই ব্যামো হয়, সে টুকু ছাড়া আর সব খানির বায়ুকোষের খোল বড় হয়। খোল বড় হয় কেন? বায়ুকোষগুলির ভিতরে বেশী বাতাস যায় বলিয়া তাদের খোল বড় হয়। বায়ুকোষ গুলিতে বেশী বাতাস যায় কেনো? ফুল্‌কোর যে খানিতে ব্যামো হয়, সে খানির বায়ু-কোষ গুলির খোল কমিয়া যায় বলিয়া তাতে যত টুকু বাতাস যাইবার কথা, তা যাইতে পারে না! কাজেই, ফুল্‌কোর যে খানি ভাল থাকে, সেই খানির বায়ুকোষ গুলির মধ্যে বেশী বাতাস যায়। এই জন্যে, যত টুকু বাতাস যাওয়ার কথা, তার চেয়ে বেশী বাতাস নিয়ত যায় বলিয়া বায়ুকোষ গুলির খোল বড় হইয়া যায়। বায়ুকোষ গুলির এই রকম

করিয়া খোল বড় হইয়া যাওয়াকে ডাক্তরেরা এম্পীসিমা বলেন। এর পর এ রোগের কথা ভাল করিয়া বলিব। বায়ুকোষ গুলির ভিতরে এত বাতাস যাইতে পারে, যে তাতেই বায়ুকোষ ফাটিয়া যাইতে পারে। ফাটিয়া গেলে তার ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া পড়ে। বায়ুকোষ গুলি যে সুত বা আঁশ দিয়া সব গায়ে গায়ে গাঁথা, সেই সুত বা আঁশের ভিতর আসিয়া বাতাস জমা হয়। এ ছাড়া, যে সব রোগে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া হয় বলিছি, সে সব রোগেরও চিহ্ন পাওয়া যায়।

লক্ষণ——সচরাচর যে নিয়ুমোনিয়া হইয়া থাকে, সে নিয়ুমোনিয়া সারিতে গৌণ হইলে, তার যে সব লক্ষণ হয়, প্রথমে পুরাণ নিয়ুমোনিয়ারও সেই সব লক্ষণ বৈ আর কিছু জানিতে পারা যায় না। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুল্‌কো নিরেট হইয়া গেলে পিঠে আর পাঁজরে ঘা দিলে যেমন নিরেট শব্দ বাহির হয়, এখানেও সেই রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়। কিন্তু যত দিন পাঁজরের এক দিক বসিয়া না যায়, আর বায়ুনলিগুলির খোল বড় না হয়, তত দিন পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার কোনও নিশ্চিত চিহ্ন পাওয়া যায় না। জ্বর বড় একটা মালুম হয় না। রাত্রে প্রায়ই খুব ঘাম হয়। এই ঘামাতেই রোগীকে ভারি দুর্ব্বল আর কাহিল করিয়া ফেলে। উঠিতে, বসিতে, কি কোন কাজ কর্ম্ম করিতে হাঁপ লাগা ছাড়া অনেক দিন পর্য্যন্ত আর কোনও রকম অসুখের পরিচয় পাওয়া যায় না। এ ছাড়া, কাশিও একটু হয়, গয়েরও একটু একটু উঠে। যে দিকের ফুল্‌কোর ব্যামো,

সেই দিকের পিঠে পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। এই রকম নিরেট শব্দ বরাবরি থাকিয়া যায়। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় সে দিকের বুক কি পাঁজর এত কম নড়ে যে, তা বড় একটা মালুম হয় না। সহজ বেলায় নিশ্বাস লইলে আর নিশ্বাস ফেলিলে বুক আর পাঁজর কেমন ফুলিয়া উঠে আর কমিয়া যায় তা সকলেই দেখিয়াছেন। নিশ্বাস লইলে ফুল্‌কো বাতাসে পুরিয়া যায়, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও ফুলিয়া উঠে। নিশ্বাস ফেলিলে বাতাস বাহির হইয়া আসে বলিয়া ফুল্‌কো যেন চুপ্‌সে যায়; সেই সঙ্গে সঙ্গে বুকও কমিয়া যায়। যত বার নিশ্বাস লওয়া যায় আর নিশ্বাস ফেলা যায়, তত বারই এই রকম করিয়া বুকের ছাতি ফোলে আর কমিয়া যায়। পুরাণ প্লুরিসি রোগে বুকের ভিতর জল জমিলে বুক কি পাঁজর যত বসিয়া যায়, হৃৎপিণ্ড আর পেটের ভিতরকার সব যন্ত্র আপন আপন জায়গা থেকে যত দূর সরিয়া যায়, পুরাণ নিয়ুমোনিয়ায় তত নয়। কিন্তু পুরাণ নিয়ুমোনিয়াতে কণ্ঠার খোল সচরাচর বেশী হয়, আর পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গা বসিয়া যায়। বায়ুকোষ ছিঁড়িয়া তার বাহিরে বাতাস আসিলে কণ্ঠার ও রকম খোল বুজিয়া যায়, পাঁজরের হাড়ের মাঝের জায়গাও পুরিয়া যায়। বায়ুনলিগুলির খোল বড় হইলে লক্ষণেরও একটু তফাত হয়। গয়ের বেশী উঠে। অল্প সবুজ কি অল্প নীল রঙের গয়ের উঠে। গয়ের যদি খুব বেশী উঠে, ত তার রং অল্প জরদা মালুম হয়। এই গয়ের প্রায়ই দুর্গন্ধ। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠে। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠাকে ডাক্ত-

রেরা হিম্পাটিসিস্ বলেন। কাশির সঙ্গে রক্ত-উঠা পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার একটী সাধারণ লক্ষণ। ফুল্কোর ভিতর দিয়া রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত হয়। ফুল্কোর ভিতর দিয়া রক্ত চলাচলের ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের কি দোষ হয়? হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরির খোল বড় হয়। খোল বড় হইবেই ত। এর আগেই বলিছি যে নীচেকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত নীচেকার দুটী মোটা শির দিয়া নীচেকার গুঁড়ি-শিরে যায়, তার পর সেই গুঁড়ি শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। আর উপরকার অর্দ্ধেক শরীরের অপরিষ্কার কাল রক্ত উপরকার দুটী মোটা শির দিয়া উপরকার গুঁড়ি শিরে যায়, তার পর সেই গুঁড়ি শির দিয়া হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। সব শরীরের এই অপরিষ্কার কাল রক্ত হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি থেকে নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে যায়। শেষে নীচেকার ডাইন্ কুটুরি থেকে ফুল্কোর বড় ধমনী দিয়া ফুল্কোর ভিতরে যায়। তবেই দেখ, ফুল্কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরি আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরি রক্তে পুরিয়া থাকিবার কথা কি না। রক্তে নিয়ত এ রকম পুরিয়া থাকিলে, মাংসের থলির খোল বাড়িয়া যাবে আশ্চর্য্য কি? ফুলকোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার কোনও ব্যাঘাত ঘটিলে, হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে আর নীচেকার ডাইন্ কুটুরিতে রক্তে জমে। আবার হৃৎপিণ্ডের উপরকার ডাইন্ কুটুরিতে আর নীচেকার ডাইন্

কুঠুরিতে রক্ত যাইবার জো থাকে না বলিয়া উপরকার দুটা মোটা শিরে আর উপরকার গুঁড়ি-শিরে, আর নীচেকার দুটা মোটা শিরে আর নীচেকার গুঁড়ি-শিরে রক্ত জমে। ফল কথা, শরীরের মধ্যে ছোট বড যত শির আছে, সব শিরে ঐ রকম করিয়া রক্ত জমে। অপরিষ্কার কাল রক্ত যার ভিতরে থাকে, এখানে তাকেই শির বলিতেছি। এ কথাটা যেন মনে থাকে। এই রকম করিয়া রক্ত জমে বলিয়া সব শির মোটা আর উচু হইয়া উঠে। শরীরের যে জায়গায় শির দেখা যাইবার কথা নয়, সেখানেও দেখা যায়। এই জন্যে, রোগীর শরীর কখন কখন যেন নীল-বর্ণ হয়। আর এই জন্যে, তার সব শরীরে শোথ হয়। শোথ আর উদরীর কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। ফুস্কোর ভিতরে রক্ত যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটে বলিয়া হৃৎপিণ্ডের গুঁড়ি-ধমনী (এয়র্টা) আর তার ডাল-পালা দিয়া শরীরের সব জায়গায় তেমন জোরে রক্ত যাইতে পারে না। এই জন্যে, নাড়ী সরু আর খুব দুর্ব্বল মালুম হয়। যে বায়ুনলিগুলির খোল বড় হইয়াছে, সে সব যদি বুকের কি পাঁজরের ঠিক্ নীচে থাকে, তবে বুকে কি পাঁজরে ঘা দিলে খুব ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। সহজ বেলায় তেমন ফাঁপা শব্দ বাহির হয় না। সেই সব নলির মধ্যে যদি শ্লেষ্মা থাকে, তবে ষ্টিথস্কোপ্ দিয়া শুনিলে বড় বুড়্‌বুড়ির শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। আর নলিগুলির ভিতর যদি শুক্নো হয়, তবে নলের ভিতর ফুঁ দিলে যেমন শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। রোগীকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে তার আওয়াজ তোমার

কাণে আসিয়া কন্ কন্ করিয়া বাজে। ২৮৯—২৯০র পাতে এ রকম পরীক্ষার কথা বেশ করিয়া বলিছি। বায়ুনলিগুলির যে খোল বড় হইয়াছে, তার আর একটী খুব ভাল চিহ্ন আছে। এই চিহ্নটীই সব চেয়ে ভাল। সে চিহ্নটা কি? রোগী থাকিয়া থাকিয়া এক এক বারে অনেক খানি করিয়া দুর্গন্ধ গয়ের তুলিলেই জানা গেল, যে তার বায়ুনলিগুলির খোল বড় হইয়াছে। বায়ুনলির খোল বড় না হইলে, অত গয়ের কোথায় জমিয়া থাকিবে? আর জমিয়া না থাকিলে গয়ের দুর্গন্ধও হয় না, এক এক বারে অত খানি করিয়াও উঠে না।

পুরাণ নিয়মোনিয়া রোগে মৃত্যু হইবার আগে কি কি লক্ষণ দেখা দেয়? রক্ত উঠে, উদরী হয়, পেট নাবে, পেটের ব্যামো হয়, সব শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, কিম্বা ভাল ফুস্কোটিতেও ব্যামো হয়।

চিকিৎসা——এখন পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলি। পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসা আর কোন কোন রকম ক্ষয়কাশের (থাইসিস্) চিকিৎসা প্রায় সমান। পুরাণ নিয়ুমোনিয়ার প্রথম অবস্থায় ফুল্‌কোর নিরেট ভাব ঘুচাইবার চেষ্টা করিবে। ফল কথা, এ রোগের সূত্র-পাতে এইটীই প্রধান চিকিৎসা। ফুল্‌কোর নিরেট ভাব ঘুচাইবার উপায় কি? পিঠে, পাঁজরে, বুকে টিংচর আয়োডীন্ লাগাইলে খুব উপকার হয়। ফুল্‌কোর নিরেট ভাব শীঘ্রই ঘুচিয়া যায়। ডিস্পেন্সেরিতে সচরাচর যে টিংচর আয়োডীন্ তয়ের থাকে, তার চেয়ে তেজাল হইলে বেশী ফল

পাওয়া যায়। লিবরে (যকৃতে) রক্ত জমিলে ডাইন্ দিকে লিবরের জায়গায় যে টিংচর আয়োডীন্ লাগাইতে বলিছি, এখানেও সেই টিংচর আয়োডীন্ লাগাইবে। সে টিংচর আয়োডীন্ কেমন করিয়া তয়ের করিতে হয়, ১০৬র পাতে তা লিখিয়া দিইছি। জায়গা বদ্লাইলে (স্থান পরিবর্ত্তন করিলে) রোগীর খুব উপকার হয়। ফল কথা, স্থান পরি-বর্ত্তনে পুরাণ নিয়ুমোনিয়া-রোগীর যেমন উপকার হয়, এমন আর কিছুতেই নয়। তবে সামান্য গৃহস্থ কিম্বা কাঙাল গরিবের পক্ষে স্থান-পরিবর্ত্তন ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন না, স্থান-পরিবর্ত্তন কেবল বড়-মানুষদেরই ঘটিতে পারে। যে, পরিবারের ভাত কাপড় যোগাইতে পারে না, তাকে বলিলে, তুমি মুঙ্গের গিয়া দু তিন মাস বাস না করিলে তোমার এ ব্যামো সারিবে না! তাকে এ রকম ব্যবস্থা দেওয়ারও যে ফল, তোমার ব্যামো সারিবার কোনও উপায় নাই বলারও সেই ফল। গায়ে বল হয়, এমন আহার রোগীকে দেওয়া চাই-ই। তা নৈলে তার জীবন রক্ষা হওয়া ভার। গায়ে বল হয়, এমন আহার কি? দুধ আর মাংসের ক্বাথ। মাংসের ক্বাথের কথা ১২৭—১৩১র পাতে বেশ করিয়া বলিছি। মাংসের ক্বাথের সঙ্গে ব্রাণ্ডি দিলে আরও উপকার হয়। এক এক বারে দু ঔন্স (এক ছটাক) ক্বাথ আর দু ড্রাম্ (আধ কাঁচ্চা) ব্রাণ্ডি (১র নম্বর) দিবে। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া দু ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার, তিন ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার। এর আগেই বলিছি যে কড্-লিবর্ অইল্ আর হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ সব রকম,

বিশেষ পুরাণ কাশ-রোগেরও খুব ভাল অসুদ। এই জন্যে, পুরাণ নিয়ুমোনিয়া-রোগে কড্‌লিবর্ অইল্ আর হাইপো-ফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ ব্যবস্থা করিবে। এই দু রকম অসুদ কখন্ কি রকম করিয়া খাইতে হয়, ২৫০—২৫২ আর ২৬৭—২৬৮র পাতে সে সব বেশ করিয়া লিখিয়া দিইছি। কাশি নিবারণের জন্যে কম্পাউণ্ড টিংচর্ অব্ ক্যাম্ফর্ দিবে। কম্পাউণ্ড টিংচর অব্ ক্যাম্ফর্ কিসের সঙ্গে কি রকম করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

টিংচর ক্যাম্ফর কো	...	৩ ড্রাম্।
ডিল ওয়াটর (য়্যাকুই য়্যানিথাই)		৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যখন দেখিবে যে রোগী বেশী কাশিতেছে, তখনই এক দাগ অসুদ খাওয়াইয়া দিবে। তার যাতে অগ্নি বৃদ্ধি হয় তা করিবে। যে অসুদে অগ্নিবৃদ্ধি হয়, সে অসুদটা নীচে লিখিয়া দিলাম।

স্যালিসীন্	...	...	... ৫ গ্রেন্
সোডি বাইকার্ব্ব (বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা)			৫ গ্রেন্
পল্‌ব ইপেকাক্ (ইপেকাকুয়ানা পাউডর) ⅙ গ্রেন্ (এক গ্রেনের ৬ ভাগের এক ভাগ)			
পেপ্‌সিন	...	...	... ৩ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম ১২টী পুরিয়া তয়ের করিয়া রোগীকে রোজ ৩টী করিয়া পুরিয়া খাইতে দিবে। এ অসুদটীতে যে কেবল অগ্নি বৃদ্ধি হয় তা নয়, রাত্রে রোগীর যে ঘাম হয়,

সে ঘামও কমিয়া যায়। পুরাণ নিয়ুমোনিয়া আর ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) রোগে রাত্রে রোগীর যে ঘাম হয়, সেই ঘামেতেই রোগীর শরীর এক বারে ক্ষয় পাওয়াইয়া দেয়। যে অস্থদে সেই ঘাম কমে, তার চেয়ে ভাল অস্থদ আর কি হইতে পারে? স্যালিসীন্ এ রকম ঘামের যেমন অস্থদ, হাইপো-ফস্ফাইট্ অব্ লাইমও তেম্‌নি অস্থদ। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) রোগের কথা যখন বলিব, তখনই এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। রোগ পাকিয়া দাঁড়াইলে অনেক রকম উপসর্গ আসিয়া উপস্থিত হয়। কাশির সঙ্গে রক্ত উঠিতে আরম্ভ হইলে রোগীকে বিছানা থেকে মোটে উঠিতে দিবে না। ১৫ গ্রেন্ করিয়া গ্যালিক্ য়্যাসিড্ তিন চারি ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। পেটের ব্যামো হইলে—পেট নামিতে আরম্ভ হইলে শুগার্ অব্ লেড্ আর আফিং দিবে। শুগার্ অব্ লেড্ আর আফিং এ রকম পেটের ব্যামোর যেমন ধারক অস্থদ, তেমন আর কিছুই না। শুগার্ অব্ লেড্ আর আফিং একত্র কি রকম করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

শুগার্ অব্ লেড্ (য়্যাসিটেট্ অব্ লেড্) ...	৩ গ্রেন্
আফিং	½ (আধ) গ্রেন্
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেন্‌শন্	যতটুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া একটী বড়ি তয়ের কর।

এই রকম ১২টী বড়ি তয়ের করিয়া একটা কৌটোয় করিয়া রাখ। প্রতিবার বাহ্যের পর একটী করিয়া বড়ি খাইতে দিবে। রোগীর গয়েরও বেশী উঠিতে দিবে না। কেন না,

বেশী গয়ের উঠিলে রোগী ভারি দুর্ব্বল আর কাবু হইয়া পড়ে। বেশী গয়ের উঠিতে না পায়, তার উপায় কি? কেট্‌লি কিম্বা হাঁড়ি করিয়া জল ফুটাইয়া, সেই ফুটন্ত গরম জলে তার্পিণ কিম্বা ক্রিয়েসোট্‌ ঢালিয়া দিবে। ঢালিয়া দিযাই সেই ভাব নাক দিয়া টানিয়া লইবে। যত ক্ষণ ভাব উঠিবে, ততক্ষণ ঐ রকম করিয়া নিশ্বাসের সঙ্গে ফুস্কোর মধ্যে ঐ ভাব লইবে। দিন রাতের মধ্যে তিন চারি বার এই রকম করিয়া ভাব লইবে। এ ছাড়া, রোগীকে পোর্ট-ওয়াইন, লৌহ-ঘটিত অসুদ আর কুইনাইন্ দিবে। লৌহ-ঘটিত অসুদ আর কুইনাইন্ একত্র কি রকম করিয়া দিতে হয়, এখানে তা লিখিয়া দিলাম।

কুইনাইন	... ...	২৪ গ্রেন্
টিনচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস	...	২ ড্রাম
টিংচর ডিজিটেলিস ...	...	১ ড্রাম
ক্লোরেট্ অব পটাশ ...	...	১ ড্রাম
ইন্‌ফিয়ুসন্ কোয়াসিয়া	...	১২ ঔন্স পূরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। রোজ তিন দাগ করিয়া অসুদ খাইবে। সকালে এক দাগ, দুপরে এক দাগ, আর সন্ধ্যার আগে এক দাগ। রোগীর শোথ কি উদরি থাকিলেও এ অসুদে খুব উপকার হয়।

(৩) ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া——এর আগেই বলিছি যে, ব্রংকাইটিস্ থেকে যে নিয়ুমোনিয়া হয়, তাকে ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া বলে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ছেলে-বয়সের

রোগ। এ রোগ কেবল ছোট ছেলেদেরই হয়। বেশী বয়সে এ রোগ হয় না, এমন নয়। হয়, তবে খুব কমই হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হইতেই চায়। তবে ক্বচিৎ কখনও এ নিয়মের ব্যতিক্রম ঘটে। ছোট ছেলেদের হাম কিম্বা হূপিংকফ হইলে এই ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ হয়। হূপিংকফ ছেলেদের এক রকম কাশি। এ কাশি দমকে দমকে হয়। কাশি উপস্থিত হইলে কাশিতে কাশিতে ছেলের চোক মুখ এক বারে রাঙা হইয়া যায়। তার পর একটা হূপ্ শব্দ হইয়া কাশি থামিয়া যায়। হূপিংকফ্ ছোঁয়াচে রোগ। এর পর এ রোগের কথা বলিব। ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুস্কোর খানিক চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া গেলে, তা থেকেও ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া প্রায়ই হয়। ব্রংকাইটিস্ রোগে ফুস্কোর খানিক কেমন করিয়া চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায়, ২০৫—২০৭র পাতে সে সব বেশ করিয়া বলিছি। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা রোগ থেকেও ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হয়। ইন্‌ফ্লুয়েঞ্জা এক রকম শর্দ্দি-রোগ। এ রোগ যখন হয়, এক বারে হাজার হাজার লোকের হয়। এ রোগেরও কথা এর পর বলিব। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া এই রকম করিয়া সৃষ্টি হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্কোর অনেক খানিতে যেমন এক বারে প্রদাহ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে তেমন হয় না। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্কোর জায়গায় জায়গায় খানিক খানিক লইয়া প্রদাহ হয়। তবেই দেখ, নূতন নিয়ুমোনিয়া আর ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া, এই দুই রকম নিয়ুমোনিয়ার

এতেও খুব তফাত। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে এখানে এক খামচা, ওখানে এক খামচা, ফুস্কোর জায়গায় জায়গায় এই রকম করিয়া প্রদাহ হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্কোর একবারে অনেক খানির প্রদাহ হয়। এই দু রকম নিয়ু-মোনিয়ার এ তফাতটী মনে করিয়া রাখা বড় দরকার। যদি বল এ তফাতটী কেমন করিয়া জানা যাবে? বাইরের লক্ষণে ত এ তফাতের কোনও পরিচয় পাওয়া যাবে না। তা জানা শক্ত নয়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) বুকে পিঠে পাঁজরে দিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলে কিছুই ছাপা থাকে না। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্কোর জায়গায় জায়-গায় নিয়ুমোনিয়ার পরিচয় পাওয়া যায়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে ফুস্কোর এখানে একটু, ওখানে একটু প্রদাহ হইয়াছে— এ রকম পরিচয় পাওয়া যায় না। ফুস্কোর এক জায়গায় এক বারে অনেক খানির প্রদাহ হইয়াছে, তাই জানিতে পারা যায়। বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) দিয়া বুক পিঠ পাঁজর পরীক্ষা করিয়া দেখিলে নিয়ুমোনিয়ার কি রকম পরিচয় পাওয়া যায়, ২৮৩—২৯০র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি।

লক্ষণ——প্রথমে ব্রংকাইটিস্ হয়। তার পর রোগা দুর্ব্বল ছেলেদের (বিশেষ যে সব ছেলে আহারের ত্রুটিতে কাহিল হইয়াছে, তাদের) এই ব্রংকাইটিস্ ক্রমে বাড়িয়া শেষে নিয়ুমোনিয়াতে গিয়া দাঁড়ায়। ব্রংকাইটিস্ থেকে নিয়ুমোনিয়া হওয়া কিছু শক্ত নয়। বায়ুনলির প্রদাহ বায়ু-কোষে গিয়া উপস্থিত হইলেই আর কি, নিয়ুমোনিয়া হইল।

নূতন নিয়ুমোনিয়ায় যেমন কম্প হয়, এ নিয়ুমোনিয়ায় তেমন কম্প হয় না। কেবল হাঁপ বাড়ে, নিশ্বাস খুব ঘন ঘন পড়ে, ছেলে অস্থির হয়, আর কাশি আসিলেও ব্যথার ভয়ে কাশিতে চায় না। ব্যথা কোথায়? ২৭৪র পাতে বলিছি, পাকা ফোড়ার উপর ঘা দিলে যেমন লাগে, নিয়ুমোনিয়া-রোগী কাশিলে বুকের মধ্যে ফুস্কোয় তেম্‌নি লাগে। লাগিবার ত কথাই বটে। গায়ের কোন জায়গায় প্রদাহ হইলে —ফুলিলে, রাঙা হইলে, ব্যথা হইলে—সেখানে কোন রকম চাপ লাগা দূরে থাক্‌, হাত পর্য্যন্ত সয় না। ফুস্কোর প্রদাহ হইলে সে রকম ত আরও হবে। কাশিবার সময় ফুস্কোর উপর যে বুকের চাপ লাগে, তা কি আর বলিতে হবে? এ ছাড়া গায়ের তাত বাড়ে। সহজ বা সামান্য ব্রংকাইটিসে ছেলেদেরও গায়ের তাত ১০২ ডিগ্রী বা অংশের উপর প্রায়ই উঠে না। অর্থাৎ বগলে তাপমান-যন্ত্র দিলে পারা ১০২র দাগ ছাড়াইয়া প্রায় উঠে না। কিন্তু ব্রংকাইটিস্‌ থেকে নিয়ুমোনিয়া যে হয়, সেই গায়ের তাত ১০৩, ১০৪, কিম্বা ১০৫ ডিগ্রী বা অংশ হয়। নাড়ীরও বেগ বেশী হয়। ফুস্কোর জায়গায় জায়গায় প্রদাহ (নিরেট ভাব) হয় বলিয়া, বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্‌) দিয়া নিয়ুমোনিয়ার পরিচয় প্রথমে বেশ স্পষ্ট পাওয়া যায় না। সচরাচর দুট ফুস্কোতেই প্রদাহ হয়। প্রথমে ফুস্কোর গোড়ার পিছন দিকে প্রদাহ হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া হইবার আগে ফুস্কোর খানিক চেপ্টা, শক্ত আর জমাট হইয়া যায় বলিয়া, বুকে পিঠে পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে

আর এক রকম শব্দ বাহির হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়, অর্থাৎ ফুস্কোর নিরেট ভাব হইলে, বুকে পিঠে পাঁজরে আঙুলের ঘা দিলে যে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়, এখানে সে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয় না। তার চেয়ে কম নিরেট শব্দ বাহির হয়—বরং একটু ফাঁপা-গোচের শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু রোগ বাড়িয়া ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া আর নূতন নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ বা চিহ্ন গুলি সমান হইয়া দাঁড়ায়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ফুস্কোর গোড়ার পিছন দিকে চারি পাশে সমান হইয়া আরম্ভ হয়, আর সুমুখের দিকে ক্রমে ক্রমে ছড়াইয়া পড়ে বা সরিয়া যায়। কিন্তু নূতন নিয়ুমোনিয়া এক জায়গায় আরম্ভ হয়, আর সেই থান থেকে যে দিকে সে দিকে ছড়াইয়া পড়ে। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া শীঘ্র বাড়িয়া উঠে না। তবে কখন কখন দুই এক দিনেই এত বাড়িয়া উঠে যে, রোগী তাতেই মারা পড়ে। ২৯৩র পাতে বলিছি, নিয়ুমোনিয়া রোগের স্বভাবই এই যে, ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয়। এ রকম স্বভাব কেবল নূতন নিয়ুমোনিয়ারই জানিয়া রাখ। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার স্বভাব এ রকম নয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ভালও হঠাৎ হয় না, মন্দও হঠাৎ হয় না। ক্রমে ভাল হয়, নয় ক্রমে মন্দ হয়। এই জন্যে যদি আর আর চিহ্নও উপস্থিত না থাকে, তবু এত টুকু তফাত ধরিয়াও কোন্ রকম নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে ঠিক্ করিতে পারা যায়। কেন না, তোমার জানা আছে, নূতন নিয়ুমোনিয়া ভালও হঠাৎ হয়, মন্দও হঠাৎ হয় ; কিন্তু ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া ক্রমে ভাল

হয়, নয় ক্রমে মন্দ হয়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ার প্রথমে গায়ের তাত সকাল বেলা দু ডিগ্রী বা অংশ কিম্বা তারও চেয়ে বেশী কমে। গায়ের তাত কমিবার সময়টা ঠিক্‌ও না থাকিতে পারে। রোগীর প্রায়ই বেশ ঘাম হয়। নূতন নিয়ুমোনিয়াতে রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে পিঠে হাত দিলে হাত যেন পুড়িয়া যায় বোধ হয়, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়াতে সে রকম হয় না, গায়ের তাত হাতে সে রকম বোধ হয় না। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া এক বার হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না; অনেক দিনে একটু একটু করিয়া সারে। ফুস্কোর নিরেট ভাব ঘুচন বড় শক্ত। ফুস্কোর অনেক খানি চেপ্টা, শক্ত, জমাট আর নিরেট হইয়া গেলে রোগী হাঁপাইয়া মরে; কিম্বা অনেক দিন ভুগিয়া ভুগিয়া ক্রমে অবসন্ন হইয়া আর ক্ষয় পাইয়া রোগী মারা পড়ে।

এর আগেই বলিছি, নূতন নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় ফুস্কো ছুরি দিয়া কাটিলে বা ছিঁড়িয়া ফেলিলে কাটা বা ছেঁড়া জায়গায় দানা দানা দেখা যায়। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ায় ফুস্কো কাটিলে সে রকম দানা দানা দেখা যায় না। কাটা জায়গা বেশ এক-সমান আর তেলা দেখায়।

চিকিৎসা——ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিস্ (খুব সরু নলি গুলির প্রদাহ) থেকে হয় বলিয়া, ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়ায় চিকিৎসা প্রথমে ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসার মত। ক্যাপিলারি ব্রংকাইটিসের চিকিৎসা ২০৮—২১১র পাতে লিখিয়া দিইছি। ব্রংকো-নিয়ুমোনিয়া যে দুর্ব্বল আর রোগা ছেলেদেরই বেশী হয়, চিকিৎসার সময় এ কথাটা যেন মনে

থাকে। এ রোগের চিকিৎসায় ভাল আহার আর ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অস্নুদ ভারি দরকার। ভাল আহার আর কি? দুধ আর মাংসের ক্বাথ। মাংসের ক্বাথের সঙ্গে ১র নম্বর ব্রাণ্ডি একটু একটু দিলে আরও ভাল হয়। ১৭১র পাতে যে কার্ব্বণেট্ অব্ য্যামোনিয়া মিক্শ্চর লেখা আছে, যে সব রোগে কাশি হয়, গয়ের তুলিতে রোগীর কষ্ট হয়, সে সব রোগের তার চেয়ে ভাল ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অস্নুদ আর নাই। ১৭১র পাতে কার্ব্বণেট্ অব্ য্যামোনিয়া মিক্শ্চর পূর মাত্রায় লেখা আছে। ছেলের বয়স বুঝিয়া কার্ব্বণেট্ অব্ য্যামোনিয়া মিক্শ্চরের মাত্রা ঠিক্ করিয়া লইবে। বয়স বুঝিয়া অস্নুদের মাত্রা কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়, ২৫৭—২৫৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। এ ছাড়া কড্‌লিবর্ অইল্ আর হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্‌ও দিবে। এর আগেই বলিছি যে, হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ আর কড্‌লিবর্ অইল্, সকল কাশ রোগেরই অতি চমৎকার অস্নুদ। ২৫০—২৫১র পাতে হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাই-মের কথা বলিছি। আর ২৬৭—২৬৮র পাতে কড্‌লিবর্ অইলের কথা বলিছি। কুইনাইন্ জ্বরের যেমন অস্নুদ, কাশ-রোগেরও তেমনি অস্নুদ—এ কথাটা যেন এখানেও মনে থাকে। দরকার হয় ত কুইনাইনের সঙ্গে লৌহ-ঘটিত অস্নুদ দিবে। লৌহ-ঘটিত অস্নুদ এর আগেই লিখিয়া দিইছি। যদি বল লৌহ-ঘটিত অস্নুদ দেওয়া দরকার কি, না, কেমন করিয়া বুঝিব। তা বুঝা শক্ত নয়। রক্ত কমিয়া গেলে, রোগীর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইলে তাকে কুইনাইনের সঙ্গে

লৌহ ঘটিত অসুদ দেওয়া বড় দরকার। নৈলে রক্ত আরও কমিয়া গিয়া রোগীর শোথ, উদরী জন্মিতে পারে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

৩। **প্লুরিসি**——প্লুরিসিও কম শক্ত রোগ নয়। নূতন নিয়ুমোনিয়া সারে ত শীঘ্রই সারে। প্লুরিসি শীঘ্র সারিতে চায় না। বুকের মধ্যের খোল আর ফুস্কো যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সেই পর্দ্দাটীকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলেন। ফুস্কোর নলিগুলির প্রদাহকে যেমন ব্রংকাইটিস্ বলে, বায়ুকোষগুলির প্রদাহকে যেমন নিয়ুমোনাইটিস্ বা নিয়ুমোনিয়া বলে, প্লুরার (ঐ সরু পর্দ্দাটীর) প্রদাহকে তেম্‌নি প্লুরাইটিস্ বা প্লুরিসি বলে। নিয়ুমোনাইটিস্ আর নিয়ুমোনিয়া, এই দুটী নামের মধ্যে নিয়ুমোনিয়া নামটী যেমন চলিত, প্লুরাইটিস্ আর প্লুরিসি, এই দুটী নামের মধ্যে প্লুরিসি তেম্‌নি চলিত। ডাক্তরেরা প্রায় সব রোগেরই এক একটী বাঙ্গালা নাম দিয়াছেন। ব্রংকাইটিসকে বাঙ্গালায় বায়ুনলিভুজপ্রদাহ বলে। নিয়ুমোনিয়াকে ফুস্ফুস-প্রদাহ বলে। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। প্লুরিসিকে বাঙ্গালায় ফুস্ফুসবেষ্টপ্রদাহ বলা যায়। ফুস্কোর ভাল কথা ফুস্ফুস; আর যা দিয়া কোন জিনিশ ঘেরা বা ঢাকা থাকে, ভাল কথায় তাকে তার বেষ্ট বলে। এই জন্যে, প্লুরিসিকে বাঙ্গালায় ফুস্ফুসবেষ্টপ্রদাহ বলা যায়। বায়ুনলিভুজপ্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস্ বলা যেমন সোজা, ফুস্ফুসপ্রদাহের চেয়ে প্লুরিসি বলা তেম্‌নি সোজা। প্লুরিসি প্রায়ই এক দিকে [illegible]

য়, সেই প্লুরিসিই দু দিকে হয়। দু দিকে নিয়ুমোনিয়া হইলে তাকে যেমন ডবল্ নিয়ুমোনিয়া বলে, দু দিকে প্লুরিসি হইলে তাকে তেম্‌নি ডবল্ প্লুরিসি বলে। প্লুরিসির সঙ্গে যদি আর কোনও রোগ আসিয়া উপস্থিত না হয়, তবে শুদু প্লুরিসি রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না।

প্লুরিসি দু রকম। নূতন আর পুরাণ। এই দু রকম প্লুরিসির কথা এখন এক এক করিয়া বলিব।

(১) নূতন প্লুরিসি——কারণ। যাদের ক্ষয়কাশের ধাত (ধাতু), যাদের ফুস্কোয় গুটি আছে, যারা রোগা আর দুর্ব্বল, ফল কথা, যাদের শরীর সুস্থ নয়, হিম বাত ভোগ করিলে, বৃষ্টিতে ভিজিলে কিম্বা ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকিলে তাদেরই প্লুরিসি বেশী হয়। ক্ষয়কাশের (থাই-সিসের) কথা, ফুস্কোয় গুটি হওয়ার কথা এর পরই বলিব। ২৬৯র পাতে বলিছি, শরীর সুস্থ আর খুব সবল থাকিতে হিম বাত ভোগে নিয়ুমোনিয়া হয় না। সুস্থ আর সবল শরীরে হিম বাত ভোগ করিলে তেম্‌নি প্লুরিসিও হয় না। মোটামুটি ধরিতে গেলে, ব্রংকাইটিস্, নিয়ুমোনিয়া, প্লুরিসি, এ তিন রোগের কারণ এক। যার শরীরের যেমন অবস্থা, তার তেম্‌নি রোগ হয়। যার শরীর যত অসুস্থ আর দুর্ব্বল, অত্যাচারে তার তত শক্ত রোগ হয়। হিম বাত ভোগ করিয়া, বৃষ্টিতে ভিজিয়া কারো সামান্য শর্দ্দি হয়, কারো ব্রংকাইটিস্ হয়, কারো প্লুরিসি হয়, কারো বা নিয়ুমোনিয়া হয়। ব্রংকাইটিসের চেয়ে প্লুরিসি শক্ত রোগ। আবার প্লুরিসির চেয়ে নিয়ুমোনিয়া শক্ত রোগ। মনে কর,

তোমরা পাঁচ জন বৃষ্টিতে ভিজিলে। এক জনের কোন অসুখই হইল না। এক জনের সামান্য শর্দ্দি হইল। এক জনের ব্রংকাইটিস্ হইল। এক জনের প্লুরিসি হইল। আর এক জনের নিয়ুমোনিয়া হইল। পাঁচ জনেই এক অত্যাচার করিলে, তবে পাঁচ জনের পাঁচ রকম ফল হইল কেন? তা হইবেই ত। পাঁচ জনেই যদি সমান সুস্থ আর সবল হইতে, তবে পাঁচ জনের এক জনেরও কোন অসুখ হইত না। যার শরীর বেশ সুস্থ আর সবল, সে বৃষ্টিতে ভিজিয়া পার পাইল। যার শরীর তত সবল নয়, তার সামান্য শর্দ্দি দিয়াই গেল। যার শরীর তার চেয়েও অসুস্থ, আর দুর্ব্বল, সে অল্পে পার পাইল না, তার ব্রংকাইটিস্ হইল। আর দু জনের শরীর বেশী অসুস্থ আর দুর্ব্বল বলিয়া তাদের এক জনের প্লুরিসি হইল, আর এক জনের নিয়ুমোনিয়া হইল। তবেই দেখ, হিম বাত ভোগ কিম্বা বৃষ্টিতে ভেজাই যে নিয়ুমোনিয়া কিম্বা প্লুরিসির আসল কারণ, তা নয়। শরীরের অসুস্থ আর দুর্ব্বল অবস্থাই আসল কারণ। হিম বাত ভোগ, কি বৃষ্টিতে ভেজা কেবল উপলক্ষ মাত্র। রোগের নিকট কারণ আর দূর কারণ বলিবার সময় এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। ২৪০ থেকে ২৪৫র পাত আর এক বার ভাল করিয়া পড়। বেড়া যখন শক্ত থাকে, তখন তার মধ্যে ষাঁড়ও যাইতে পারে না। কিন্তু ভাঙা বেড়ায় ছাগলও রক্ষা হয় না। তেমনি, শরীর যখন সুস্থ আর সবল থাকে, তখন গায়ের উপর দিয়া ঝড় বৃষ্টি গেলেও অসুখ হয় না। কিন্তু অসুস্থ শরীরে সামান্য শীত-বাতও সয়

না। জ্বরের রোগী দেখিয়া তার বুক পরীক্ষা করিয়া প্লুরিসি কিম্বা নিয়ুমোনিয়া পরিচয় পাইলেই তাকে জিজ্ঞাসা করি "তোমার শরীর অসুস্থ হইলেও কি তা না মানিয়া হিম জলে দস্তুর মত স্নান করিছিলে ?" হাঁ মহাশয়, সে অত্যাচারটা হইয়াছে বটে—তার কাছে এ ছাড়া আর কোনও উত্তর পাওয়া যায় না। আমি এমন শত শত জায়গায় দেখিছি—রোজ একটু একটু করিয়া ঘুষ্-ঘুষে জ্বর হয়; কিন্তু দস্তুর মত স্নান আহার করিতে ছাড়ে না। দুই চারি দিন এই রকম অত্যাচার করিতেই হঠাৎ এক দিন তার কম্প দিয়া জ্বর আসে আর বুকে পিঠে পাঁজরে ব্যথা হয়। তার পর পরীক্ষা করিয়া তার প্লুরিসি কি নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে জানা যায়। এ রকম অনিয়মে অনেক জায়গায় ব্রংকাইটিস্ হইতেও দেখা যায়। যাদের শরীর নিতান্ত অসুস্থ হইয়া না পড়ে, তাদের প্লুরিসি বা নিয়ুমোনিয়া না হইয়া ব্রংকাই-টিস্ হয়। নূতন জ্বরে স্নান আহারের ধরাধর করে। পুরাণ জ্বরে ভুগিয়া ভুগিয়া শরীর যে ভারি দুর্ব্বল হইয়া পড়ে, রোগীর তা মনে থাকে না। এ রকম দুর্ব্বল শরীরে ক দিন হিম বাত সয় ? ঠাণ্ডা জলে দস্তুর মত স্নান ক দিন সয় ? এই রকম অত্যাচারে তার ব্রংকাইটিস্, নিয়ুমোনিয়া কি প্লুরিসি হয়ই। পুরাণ জ্বরের কথা বলিবার সময় এ সব ভাল করিয়া বলিব। নিয়ুমোনিয়া থেকে প্লুরিসি হইতে পারে। ফুস্কো যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, ফুস্কোর প্রদাহ (ইন্-ফ্ল্যামেশন্) সে পর্দ্দাতে যাইতে কতক্ষণ ? ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) থেকেও প্লুরিসি হয়। ক্ষয়কাশ-রোগে ফুস্কোর

আগায় যে ব্যাপার ঘটে—গুটি হয়, গুটি পাকে, ঘা হয়, খাইয়া খোল হইয়া যায়—তাতে ফুস্কোর সে অবস্থা থেকে প্লুরিসি হবে আশ্চর্য্য কি ? মেয়েদের মাইতে এক রকম আব হয়। সেই আব ফুটিয়া ঘা হয়। সে ঘা ভারি খারাপ ঘা। সে ঘা সারে না। সে ঘাকে ডাক্তরেরা ক্যান্সর বলেন। সেই ঘা বুকের ভিতর দিয়া নীচে নামিয়া গিয়া ফুস্কোর পর্দ্দাতে (প্লুরাতে) হইলে প্লুরিসি হয়। অনেক রকম নূতন জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত দোষে প্লুরিসি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) প্লুরিসি একটা উপসর্গ। হাম-জ্বরে প্রায়ই প্লুরিসি হয়। কিড্‌নির (মূত্রগ্রন্থির, বৃক্কের) এক রকম রোগ আছে, সে রোগেও প্লুরিসি হয়। ডাক্তরেরা কিড্‌নির সে রোগকে ব্রাইট্‌স্‌ ডিজীজ্‌ বলেন। ব্রাইট্‌ এক জন ডাক্তরের নাম। তিনি এই রোগের কথা প্রথম বলেন বলিয়া, তাঁরই নামে এ রোগের পরিচয়। অনেক অসুদেরও এই রকম নাম আছে। যেমন ডোবার্স পাউডর—জেম্‌সেস্‌ পাউডর। ঘা যো লাগিয়াও প্লুরিসি হয়। কোন রকম আঘাত লাগিয়া পাঁজরের হাড় ভাঙিয়া গেলে, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় ভাঙা হাড়ের উব্‌ড়ো-খাব্‌ড়ো (উচ-নীচ, অসমান) মুড়োর ঘেঁষে ঘেঁষে প্লুরার প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌) অর্থাৎ প্লুরিসি হয়। এর আগেই বলিছি যে, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো, দুই-ই একটা সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। সেই পর্দ্দাকেই প্লুরা বলে, আর সেই পর্দ্দারই প্রদাহকে (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্‌কে)

প্লুরিসি বলে। বুকের খোলের ভিতর-পিঠও যখন প্লুরা দিয়া ঢাকা, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাঁজরের ভাঙা হাড়ের ভাঙা জায়গার ঘেঁষে ঘেঁষে প্লুরার যে প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হবে, তা বুঝাই যাইতেছে। নিকটে যদি কোন খানে ফোড়া থাকে, আর সেই ফোড়া গলিয়া বুকের খোলের মধ্যে পূয যায়, তবে তাতেও প্লুরিসি হয়। বুকের খোলের মধ্যে বাতাস গেলেও প্লুরিসি হয়। বুকের খোলের মধ্যে কেমন করিয়া বাতাস যায়, এর পরই তা বলিব। কেউ কেউ বলেন, বড় বড় সভায় নিয়ত যাঁরা বক্তৃতা করেন, তাঁদেরর প্লুরিসি হইতে পারে। সূতিক-জ্বরে প্লুরিসি হইতে পারে। প্রসবের পর পোআতি-দের যে এক রকম শক্ত জ্বর হইয়া থাক, সেই জ্বরকে সূতিক-জ্বর বলে। ডাক্তরেরা সে জ্বরকে পিয়র্পিরাল্ ফীবর্ বলেন। এ জ্বরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। নূতন বাত-রোগে প্লুরিসি হইতে পারে। প্লুরিসি সকল বয়সেই হইতে পারে। শীত কালেই প্লুরিসি বেশী হয়।

প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার দশা কি রকম হয়? সহজ মানুষের প্লুরা কি রকম আগে বলি, তার পর প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার কি দশা হয় বলিব। এর আগেই বলিছি, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো সরু একটী পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলে। এই প্লুরা সহজ বেলায় কি রকম, এখন তাই বলি। সহজ মানুষের প্লুরা খুব পাতলা, চক্‌চকে, তেলা আর নরম একটী পর্দ্দা। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর

ফুস্কো, দুই-ই এই পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই পর্দ্দার গা থেকে জলের মত এক রকম রস নিয়ত বাহির হয়। এই রস নিয়ত বাহির হয় বলিয়া পর্দ্দার গা সর্ব্বদাই বেশ ভিজে, নরম, আর তেলা থাকে। ফল কথা, পর্দ্দাটীকে ভিজে নরম, আর তেলা রাখিবার জন্যেই এর গা থেকে ও রকম রস নিয়ত বাহির হয়। তাতেই, পর্দ্দাটী ভিজে, নরম, আর তেলা রাখিবার জন্যে যত টুকু দরকার, কেবল তত টুকু রসই এর গা দিয়া বাহির হয়; তার বেশী হয় না। পাঁজরের হাড় দিয়া বুকের খোল তয়ের হইয়াছে। এই খোলের বাহির-পিঠ মাংস আব চামড়া দিয়া ঢাকা; ভিতর-পিঠ মাংস আর ঐ পর্দ্দা (প্লুরা) দিয়া ঢাকা। ফুস্কোও ঐ পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো এই দুয়ে নিয়ত ঘষা-ঘষি হয়। এই দুয়ে কেমন করিয়া নিয়ত ঘষা-ঘষি হয়, দৃষ্টান্ত দিয়া তা বুঝাইয়া দিই। নিশ্বাস লইলে বুকের ছাতি ফোলে, আর নিশ্বাস ফেলিলে বুকের ছাতি কমিয়া যায়। গায়ে জামা থাকিলে, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় বুক, পিঠ, পাঁজরের সঙ্গে আর জামার কাপড়ের সঙ্গে যেমন ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি হয়; বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো, এই দুয়েও তেমনি ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি হয়। মনে কর, বুকের খোলা যেন জামা, আর ফুস্কো যেন বুকের ছাতি। সহজ মানুষের প্লুরা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো ঢাকা ঐ পর্দ্দা) ভিজে, নরম, পাতলা চক্‌চকে, আর তেলা বলিয়া, নিশ্বাস

লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুস্কো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি সহজ বেলায় এমনি নিঃশব্দে হয় যে, তা মোটে মালুমই হয় না। এই পর্দ্দা (প্লুরা) এত পাতলা আর স্বচ্ছ যে, ফুস্কো কোন পর্দ্দা দিয়া ঢাকা আছে কি না, তা মোটেই মালুম হয় না। তোমার গায়ের কোন জায়গা সেই পর্দ্দা দিয়া ঢাকিয়া দিলে, কেউ মালুম করিতে পারে না, কোন্ জায়গা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, আর কোন্ জায়গা পর্দ্দা দিয়া ঢাকা নয়। যার ভিতর দিয়া সব দেখা যায়, ভাল কথায় তাকে স্বচ্ছ বলে। যেমন কাচ। প্রদাহ হইলে প্লুরার অবস্থা কি রকম হয়, এখন তাই বলিব। প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন) হইলে প্লুরা (ঐ পর্দ্দা) খুব রাঙা হয়, তার গায়ে রাঙা রাঙা শির দেখা দেয়, সে রকম তেলা চক্‌চকে আর স্বচ্ছ থাকে না; সহজ বেলার চেয়ে পুরু হয়, নরম হয়, আর যেন ঘোলা হইয়া যায়। কেবল প্লুরাই (ফুস্ফুসবেষ্ট) যে এ রকম হয়, তা নয়। শরীরের মধ্যে প্লুরার মত যত পর্দ্দা আছে, প্রদাহ হইলে সব ঐ রকম হয়। শরীরের মধ্যে প্লুরার মত পর্দ্দা আর কোথায় আছে? আর কোথায় আছে, তা বলি। আমাদের শরীরে চারিটী খোল আছে। মাথার একটী খোল। বুকের একটী খোল। পেটের একটী খোল। আর তলপেটের একটী খোল। মাথার খোলের মধ্যে মগজ থাকে। মগজকে ডাক্তরেরা ব্রেইণ বলেন; ভাল কথায় মস্তিষ্ক বলে। বুকের খোলের মধ্যে ফুস্কো, হৃৎপিণ্ড (হার্ট), আর বড় বড় শির (বেইন্) আর ধমনী (আর্টারি)

থাকে। পেটের খোলের মধ্যে নাড়ি ভুঁড়ি, মেটে, পিলে, মূত্রগ্রন্থি (কিড্‌নি), আর পাকস্থলী থাকে। তল-পেটের খোলের মধ্যে মুতের থলি, মলের নাড়ি, আর জরায়ু থাকে। নাড়ি-ভুঁড়িকে ডাক্তরেরা ইণ্টেস্টিন্‌স বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র বলে। মেটেকে ডাক্তরেরা লিবর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় যকৃত বলে। পাকস্থলীকে ডাক্তরেরা ষ্টমাক বলেন। মুতের থলিকে ডাক্তরেরা ব্ল্যাডর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রাশয় বলে। এই যন্ত্রে মূত জমিয়া থাকে। মলের নাড়ীকে ডাক্তরেরা রেক্টম্‌ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মলাশয় বা মলভাণ্ড বলে। এই নাড়ীতে মল জমিয়া থাকে। জরায়ুকে ডাক্তরেরা য়ুট্রস্‌ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় জরায়ু বলে। জরায়ু কেবল স্ত্রীলোকদেরই থাকে। গর্ভ হইলে এই জরায়ুর মধ্যে ছেলে থাকে। জরায়ুকেও গর্ভও বলে। এই চারিটী খোলেরই ভিতর ঠিক্‌ এক রকম পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা সিরস্‌ মেম্ব্রেন্‌ বলেন। পর্দ্দা সেই এক; কিন্তু জায়গা বিশেষে পর্দ্দার নাম আলাদা। মাথার খোলের ভিতর আর মগজ যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা য়্যারাক্‌নয়িড্‌ বলেন। মাথার খুলির ভিতর-পিঠ—এক বারে হাড়ের গা—খুব মোটা একটী পর্দ্দা দিয়া ঢাকা। এই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা ডিয়ুরা-মেটর্‌ বলেন। এই ডিয়ুরা-মেটরের আবার ঠিক্‌ গয়েই য়্যারাক্‌-নয়িড্‌ লাগান। বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্‌কো যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা প্লুরা বলেন। প্লুরার কথা এই মাত্র বলিছি। হৃৎপিণ্ড (হার্ট) যে পর্দ্দা

দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিকার্ডিয়ম্ বলেন। পেরিকার্ডিয়ম্ ঠিক্ একটী থলি। এই থলির মধ্যে হৃৎপিণ্ড থাকে। ফুল্কো (ফুস্ফুস্) বেড়িয়া থাকে বলিয়া প্লুরাকে ফুস্ফুসবেষ্ট বলা যায়। হৃৎপিণ্ড বেড়িয়া থাকে বলিয়া পেরিকার্ডিয়ম্কে হৃৎপিণ্ডবেষ্ট কিম্বা সোজা-সুজি হৃদ্বেষ্ট বলে। পেটের আর তল-পেটের খোলের ভিতর আর তার মধ্যেকার সব যন্ত্র যে পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিটোনিয়ম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পেরিটোনিয়ম্কে অন্ত্র-বেষ্ট বলে। যদি বল, আরও ত অনেক যন্ত্র বেড়িয়া থাকে, তবে শুধু নাড়ি-ভুঁড়িরই নাম দিলে কেন। পেটের আর তল-পেটের খোলের মধ্যে নাড়ি-ভুঁড়িই (অন্ত্র) বেশী। এই জন্যেই অন্ত্রবেষ্ট বলা যায়। য়্যারাক্নয়িড্, প্লুরা, পেরিকার্ডিয়ম্, পেরিটোনিয়ম্—এ সবই এক জিনিশ—সেই সিরস্ মেম্ব্রেন্। কেবল নাম আলাদা আলাদা। আলাদা আলাদা এ কয়টী নাম মনে করিয়া রাখা চাই। ইংরিজি বাঙ্গালা দু রকম নাম মনে করিয়া রাখ ত আরও ভাল। এই সব ভিন্ন ভিন্ন জায়গার পর্দ্দার ব্যামোর কথা বলিবার সময় এ সব নাম বড় কাজে লাগিবে। এর আগেই বলিছি, সহজ বেলায় প্লুরার গা থেকে জলের মত এক রকম রস বাহির হইয়া প্লুরাকে সর্ব্বদা ভিজে রাখে। এই রসকে ডাক্তরেরা সিরম্ বলেন। প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার গা থেকে এই রস বেশী বাহির হয়। এই রসের সঙ্গে আর এক রকম রসও বাহির হয়। সে রসকে ডাক্তরেরা লিম্ফ্ বলেন। সিরম্ আর লিম্ফ্ এই দুটী কথা মনে

করিয়া রাখা চাই। নৈলে দুয়ে গোলমাল হইয়া যাইতে পারে। রক্তে যে জল আছে, সেই জলকে ডাক্তরেরা সিরম্ বলেন। এর আগেই বলিছি, রাঙা রক্তের শির আর কাল রক্তের শির, শরীরে এই দু রকম শির আছে। রাঙা রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা আর্টরি বলেন; ভাল বাঙ্গালায় ধমনী বলে। আর কাল রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা বেইন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় শিরা বলে। এই দু রকম শির ছাড়া আর এক রকম শির আছে। সে শিরও শরীরের সব জায়গায় আছে। সে সব শিরে রক্ত থাকে না, জলের মত এক রকম রস থাকে। সে সব শিরকে ডাক্তরেরা লিম্ফ্যাটিক্স্ বলেন। ধমনী (আর্টরি) আর শিরা (বেইন্) দিয়া শরীরের রক্ত চলা ফেরা করে। লিম্ফ্যাটিক্স্ দিয়া শরীরের রস চলা ফেরা করে। ধমনীকে সোজা বাঙ্গালায় রাঙা রক্তের শির বলা যায়। শিরাকে কাল রক্তের শির বলা যায়। লিম্ফ্যাটিক্ শিরকে তেম্‌নি রসের শির বলা যাইতে পারে। তার পর বলি। প্লুরার গা থেকে সিরমের (রক্তের জল) চেয়ে যদি লিম্ফ্ (রস) বেশী বাহির হয়, তবে প্লুরার গায়ে এক পুরু লিম্ফ্ লাগিয়া যায়, আর ফুস্ফো ঢাকা প্লুরা ও বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরা, এই দুয়ে সেই জায়গায় শীঘ্রই যোড় লাগিয়া যায়। লিম্ফের চেয়ে সিরম্ খুব বেশী বাহির হইলে, লিম্ফ থকা থকা হইয়া তাতে (বুকের খোলের ভিতর জমা সেই সিরমে) ভাসিতে থাকে; কিম্বা ফুস্ফো-ঢাকা প্লুরা বা বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরার গায়ে লাগিয়া থাকে; কিম্বা এক দিক্ থেকে আর এক দিকে

সূতর মত থেঁই থেঁই হইয়া সেই লিম্ফ্ ছড়াইয়া থাকে। কখন কখন ঘন আটা-আটা হল্‌দে রঙের অনেক খানি লিম্ফ্ বাহির হয়। আবার, লিম্ফ্ ঘোলাও হইতে পারে, পূযের মতও হইতে পারে। যারা খুব রোগা আর দুর্ব্বল, প্লুরিসি হইলে তাদেরই বুকের খোলের মধ্যে পূযের মত ও রকম লিম্ফ্ জমা হয়। বুকের খোলের মধ্যে বেশী জল, পূয, কি লিম্ফ্ জমিলে, তার ভরে ফুল্কো ক্রমে জড়-শড় আর চেপ্টে এক বারে পিঠের দাঁড়ার দিকে অর্থাৎ পিছন দিকে যায়। আর নিরেট হইয়া যায়। কখন কখন ফুল্কো বরাবরি এই ভাবেই থাকিয়া যায়। চারি দিকের বাঁধন ছাঁদনে ফুল্কো যেখানকার সেইখানেই থাকে। যদি বল, ও সব বাঁধন ছাঁদন আবার কোথা থেকে আসে ? প্লুরার গা থেকে যে লিম্ফ্ বাহির হয় বলিছি, সেই লিম্ফ্ থেকেই ও সব বাঁধন ছাঁদন তয়ের হয়। ও রকম বাঁধন ছাদন তয়ের করিবার শক্তি লিম্ফের খুবই আছে। এর আগেই বলিছি, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ প্লুরা দিয়া ঢাকা, ফুল্কোও প্লুরা দিয়া ঢাকা। কাজেই, ও রকম বাঁধন ছাঁদন ফুল্কো থেকে বুকের খোলের ভিতর-পিঠে, আবার বুকের খোলের ভিতর-পিঠ থেকে ফুল্কোর গায়ে গিয়া, ফুল্কোকে একবারে অষ্টে পৃষ্ঠে বাঁধিয়া ফেলে। এই রকম করিয়া ফুল্কো এক বারে অকেযো হইয়া যায়। সে ফুল্কোয় আর কোনও কাজ হয় না। ফুল্কোর মধ্যে বাতাস যাইতে না পারিলেই তার কাজ ফুরাইল। আবার কখন কখন লিম্ফ্ থেকে মোটা একটা পর্দ্দা তয়ের হইয়া ফুল্‌কোর উপরটা ঢাকিয়া ফেলে, আর

ফুল্‌কো চাপিয়া ধরে। এতেও ফুল্‌কো অকেযো হইয়া যায়। এই পর্দ্দা কখন কখন এমন কি, হাড়ের মত শক্ত হইয়া যায়। ফুল্‌কোর পেচন দিকেই এই পর্দ্দা ভাল রকম দেখা যায়।

লক্ষণ——প্লুরিসি হইবার আগে অল্প শীত বোধ হয়; কারো বা সামান্য রকম একটু কম্পও হয়। তার পরই জ্বর ফোটে, আর ডাইন্ পাঁজরেই হোক্, আর বাঁ পাঁজরেই হোক্ ব্যথা হয়। ব্যথা হইবার আগে বুকের মধ্যে যেন ভারি ভারি বোধ হয়। ব্যথাটা সচরাচর মাইয়ের নীচে কিম্বা মাইয়ের সন্নাসন্নি কোন জায়গায় হয়। বৈদ্যরা এই ব্যথাকে পার্শ্ব বেদনা বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি। পাঁজর থেকে এই ব্যথা বুকের মাঝখানে, কণ্ঠায়, আর বগলে মালুম হয়। আবার কখন কখন এক দিকের সমস্ত পাঁজ-রেই ব্যথা হয়। এ ব্যথা সোজা নয়। ব্যথায় রোগী এক বারে অস্থির হইয়া পড়ে। ব্যথার জন্যে রোগী না নিশ্বাস লইতে পারে, না কাশিতে পারে, না সে দিকে শুতে পারে। ব্যথার জায়গায় হাত খানির চাপটী পর্য্যন্ত সয় না; আর যেন ছুরি দিয়া খোঁচাইতে থাকে—কি জিওল মাছে হানিতে থাকে। ব্যথার জায়গায় এমনি শেটে ধরিয়া থাকে যে, বোধ হয় যেন সে জায়গায় ছুঁচ দিয়া টাঁকা আছে। ব্যথার জায়গায় যেন ছুঁই দিয়া টাঁকা আছে বোধ হওয়া প্লুরিসির একটী বেশ চিহ্ন। আর কোনও রোগে রোগী এ রকম ব্যথার কথা বলে না। রোগের সূত্রপাত থেকেই ব্যথা (পার্শ্ব-বেদনা) খুব বেশী হয়। কাশিতে প্রাণ যেন এক

দ্বারে বাহির হইয়া যায় ; কাশির নামে রোগী ডরায়। কিন্তু তার পর, হাঁপ যেমন বাড়ে, ও ব্যথাটা তেমনি কমে। জলের ভরে ফুল্‌কো চেপ্টে যায় বলিয়া রোগী নিশ্বাস লইতে পারে না। বারে বারে কাশি হয় ; কিন্তু প্রথমে কাশিলে যত ব্যথা লাগিত, যত কষ্ট হইত, এখন তত হয় না। নিয়ুমোনিয়াতে যেমন রুক্ষ, শুক্‌নো, কুকুরে-কাশি হয় বলিছি, (২৭৪র পাত দেখ) প্লুরিসিতেও সেই রকম শুক্‌নো কুকুরে-কাশি হয়। প্লুরিসির সঙ্গে যদি ব্রংকাইটিস্, নিয়ু-মোনিয়া, কি থাইসিস্ (ক্ষয়কাশ) না থাকে, তবেই শুক্‌নো কাশি হয়, কাশির সঙ্গে গয়ের উঠে না ; নৈলে গয়ের উঠে। ব্রংকাইটিস্ থাকে ত, ব্রংকাইটিস্-রোগীর-গয়েরের মত গয়ের উঠে। নিয়ুমোনিয়া থাকে ত, নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গয়েরের মত গয়ের উঠে। থাইসিস্ থাকে ত, থাইসিস্ রোগীর-গয়ে-রের মত গয়ের উঠে। থাইসিসের কথা এর পর বলিব ; এ রকম কাশিতে রোগীর ভারি কষ্ট হয়। ব্যথার জন্যে ত রোগী কাশিতে পারেই না ; সহজ নিশ্বাসও ভাসা-ভাসা হয় আর খুব ঘন ঘন পড়ে। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নিশ্বাস লওয়ার ভাব আর প্লুরিসি-রোগীর নিশ্বাস লওয়ার ভাব এক রকম নয়। ঠাউরে দেখিলেই এ দুয়ের তফাত বেশ বুঝা যায়। ব্যথার জন্যে প্লুরিসি-রোগী ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস লইতে চায় না। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলি-বার সময় দুই পাঁজর বেশী নড়ে বলিয়া, সে এম্‌নি জুত বরাত করিয়া নিশ্বাস লয় আর নিশ্বাস ফেলে যে, যে পাঁজরে ব্যথা, সে পাঁজর নড়ে কি না, বড় একটা মালুম হয় না। যে

দিকে ব্যথা, সেই দিকে সে হেলিয়া থাকে; আর নিশ্বাস লই-বার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পেট আর অন্য দিকের পাঁজর বেশী নড়ে। বুকের ভিতরে রোগী প্রায়ই এক রকম ঘষার শব্দ টের পায়। দুটো খস্‌-খসে পর্দা একত্র ঘষিলে যে রকম শব্দ হয়, এও ঠিক্‌ সেই রকম শব্দ। প্লুরিসির এ চিহ্নটাও খুব ভাল। নিয়ুমোনিয়া-রোগী মোটে নিশ্বাস লইতেই পারে না। কেমন করিয়া পারিবে? নিশ্বাস লইবার আর নিশ্বাস ফেলিবার যে যন্ত্র, সেই যন্ত্রেরই পীড়া। নিশ্বাস লওয়ায় আর নিশ্বাস ফেলায় প্লুরিসি-রোগীর যে কল কৌশল, এখানে তা খাটে না। এখানে এক দিকে একটু হেলিয়া, পেট আর ভাল দিকের পাঁজর (যে দিকের পাঁজরে ব্যথা নয়) বেশী নাড়াইয়া নিশ্বাস ফেলিবার যো কি? ব্যথার জন্যে এক জন (প্লুরিসি-রোগী) ইচ্ছা করিয়া নিশ্বাস লইতেছে না, আর এক জন (নিয়ুমোনিয়া-রোগী) মোটে নিশ্বাস লইতেই পারিতেছে না। ভাবিয়া দেখিলে, এ বুঝা বড় শক্ত নয়। এ ছাড়া, প্লুরিসি-রোগে নিশ্বাস লইবার সময় ব্যথার জায়গায় যেন খ্যাঁচ্‌ করিয়া লাগে। এই জন্যে, রোগী যেন অর্দ্ধেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত হয়, এম্‌নি বোধ হয়। নিয়ুমোনিয়াতে এ রকম কিছুই হয় না। নিশ্বাস লইবার সময় পাঁজরের এক জায়গায় সে রকম খ্যাঁচ্‌ করিয়াও ধরে না, রোগী অর্দ্ধেক খানি নিশ্বাস লইয়াই ক্ষান্ত হইল বলিয়াও বোধ হয় না। তার পর বলি। প্লুরিসি-রোগীর গা গরম আর খস্‌-খসে শুক্‌নো। তার গাল দুটী রাঙা হয়, আর মুখ খানিতে তার কষ্ট যেন লেখা থাকে।

এ ছাড়া, সে ভারি অস্থির হয়। গায়ের তাত ১০৩ ডিগ্রী (অংশ) পর্য্যন্ত হইতে পারে। নিয়ুমোনিয়াতে গায়ের তাত যত বেশী হয়, প্লুরিসিতে কখনও তত হয় না। এ ছাড়া, প্লুরিসিতে গায়ের তাত যত শীঘ্র কমিয়া যায়, নিয়ু-মোনিয়াতে তত শীঘ্র কমে না। প্লুরিসিতে গায়ের তাত শীঘ্রই ৯৯·৫ ডিগ্রী (অংশ) হয়; তার পরই সহজ হয়। সহজ গায়ের তাত কত? ৯৮·৪ ডিগ্রী (অংশ)। ৯৯·৫ আর ৯৮·৪ লিখিলে কি বুঝায়? ১৬৫—১৬৬র পাতের নীচের দিকে ছোট অক্ষরে তা লিখিয়া দিইছি। সহজ গায়ের তাতের কথা ১২—১৩র পাতে বলিছি। প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যিনি এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। নাড়ী যেমন শক্ত, তেমনি সরু হয়। হাত দেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাড়ী যেন সেতার কি বেয়ালার টান-টান তারের মত বোধ হয়। জিবে এক রকম শাদা ছাতা পড়ে। প্রস্রাব কম হয়, আব খুব রাঙা হয়।

কখন কখন ভারি রকম প্লুরিসি হইলেও প্লুরিসির লক্ষণ গুলি তত স্পষ্ট জানা যায় না। ব্যথাটা ছড়ানে গোচ হয়, আর সে ব্যথায় রোগী তত কাতর হয় না। যে পাঁজরে ব্যথা, সেই পাঁজরের দুই দুই হাড়ের মাঝ-খানে আঙুল দিয়া চাপিলেই রোগী ব্যথা বলে। আবার কোন কোন জায়গায় ব্যথা মোটেই থাকে না। অনেক জায়-গায়, এমন কি ১০০ মধ্যে ৮০ জায়গায়, প্লুরার প্রদাহ, (ইনফ্ল্যামেশন্) থাকিতেও রোগীর তেমন ব্যথা, জ্বর,

ভারি রকম প্লুরিসিরও লক্ষণ কখন কখন স্পষ্ট জানা যায় না।
কাশি, আর হাঁপ তিন দিনের দিন কি চারি দিনের দিন কমিয়া যায়।

প্লুরার প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) থেকে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, জলের ভয়ে ফুস্কো এক বারে চেপ্টা হইয়া গিয়াছে, তবু রোগীর বল কমিয়া যাওয়া আর নিশ্বাস ঘন-ঘন পড়া ছাড়া আর কোনও লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। এমন ঘটনাও কখন কখন হয়। প্লুরিসির লক্ষণ এক রকম মোটামুটি বলিলাম।

২৮২র পাতের প্রথমে বলিছি, নিয়ুমোনিয়ার লক্ষণ গুলি এত স্পষ্ট যে, বুক পরীক্ষা না করিয়াও রোগ ঠিক্ করিতে পারা যায়। বিস্তর নয়, কেবল তিনটী লক্ষণ। সেই তিনটী লক্ষণেই নিয়ুমোনিয়া ঠিক্ করিতে পারা যায়। এখন দেখ, বুক পরীক্ষা না করিয়া প্লুরিসি ঠিক্ করিতে পার কি না। শুদ্ধ লক্ষণ ধরিয়া প্লুরিসি ঠিক্ করিতে পারা যায় কি না? যায়। দুটী লক্ষণ আছে—কেবল সেই দুটী লক্ষণ ধরিয়া প্লুরিসি ঠিক্ করিতে পারা যায়। সে দুটী লক্ষণ কি কি? (১) জ্বরের সঙ্গে পাঁজরে ব্যথা (পার্শ্ববেদনা) আর (২) সেতারের তারের মত নাড়ী। পাঁজরে ব্যথা বলিলেই যে প্লুরিসির ব্যথা বুঝায়, তা মনে করিও না। রোগীকে বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিয়া ব্যথার পরিচয় লইতে হয়। প্লুরিসি-রোগীকে জিজ্ঞাসা করিলে সে এই রকম করিয়া তার ব্যথার পরিচয় দেয়:—

(১) কাল বেলা ৮টার সময় আমার একটু শীত হইয়া জ্বর হয়। খানিক পরেই বুকের মধ্যে যেন কেমন ভারি

ভারি বোধ হইতে লাগিল। তার পর, ঘণ্টা দুই তিনের মধ্যেই ডাইন্ পাঁজরে একটা ব্যথা হইল (ব্যথা ডাইন্ পাঁজরেও ব্যথা হয়; বাঁ পাঁজরেও হয়, কখন কখন এক বারে দুই পাঁজরেই ব্যথা হয়)। ব্যথাটা পাঁজরের ঠিক্ মাঝ-খানেই (মাইয়ের সমাসন্নি জায়গায়) মালুম হইতে লাগিল। ব্যথা ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। জোরে নিশ্বাস লইবার যো কি ? নিশ্বাস লইবার সময় ব্যথার জায়গায় যেন খ্যাঁচ্ খ্যাঁচ্ করিয়া লাগিতে লাগিল। বোধ হইতে লাগিল, ব্যথার জায়গাটা যেন কেউ ছুঁই দিয়া টাঁকিয়া রাখিয়াছে। মাঝে মাঝে দুই এক বার খুক্ খুক্ করিয়া কাশিতেও লাগি-লাম। কাশিতে কি পারি ? ব্যথায় যেন প্রাণ এক বারে বাহির হইয়া যায়। ব্যথার জন্যে না নিশ্বাস লইতে পারি, না কাশিতে পারি, না সে পাশে শুইতে পারি। ব্যথার জায়গায় হাত খানির চাপটী পর্য্যন্ত সয় না। আর নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের মধ্যে যেন কেমন একটা খ্যাঁশ্ খ্যাঁশ্ শব্দ (দুটো খস্‌খসে কাপড় একত্র ঘষিলে যে রকম শব্দ হয়, সেই রকম শব্দ) মালুম করিতে লাগিলাম। আজও ব্যথা সেই রকম ; বরং বেশী।—প্লুরিসি ছাড়া আর কোনও রোগে রোগীর কাছে এ রকম পরিচয় পাবে না।

তার পর তার

(২) নাড়ী দেখিয়া আরও নিশ্চয় করিয়া বলিতে পার। এর আগেই বলিছি, প্লুরিসি-রোগীর নাড়ী যিনি এক বার পরীক্ষা করিয়া দেখিয়াছেন, তাঁর আর কখনও ভুল হয় না।

নাড়ী যেমন শক্ত, যেমন টন্‌কো, তেম্‌নি সরু। হাত দেখিবার সময় আঙুলের নীচে নাড়ী সেতার কি বেয়ালার টান টান তারের মত বোধ হয়। প্লুরিসি ছাড়া আর কোনও রোগে রোগীর নাড়ী এ রকম হয় না।

তার পর, রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া সন্দ (সন্দেহ) মিটাইবে।

প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়?——ব্যথার জায়গায় বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (স্টিথস্কোপ্‌) বসাইয়া তার উপর কান দিয়া যদি খুব মন দিয়া শুন, তবে বেশ এক রকম শব্দ শুনিতে পাবে। রোগী যখন নিশ্বাস লয়, তখনও সে শব্দ শুনা যায়—যখন নিশ্বাস ফেলে, তখনও সে শব্দ শুনা যায়। সে কি রকম শব্দ? ঘষার শব্দ। দুটো খস্‌খসে পর্দ্দায় খুব আস্তে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম শব্দ হয়, ঠিক্ সেই রকম শব্দ। এর আগেই বলিছি যে, সহজ মানুষের প্লুরা (বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্কো-ঢাকা ঐ পর্দ্দা) ভিজে আর তেলা বলিয়া, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্‌কো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘষা-ঘষি সহজ বেলায় এমনি নিঃশব্দে হয় যে, তা মোটে মালুমই হয় না। কিন্তু প্লুরার যে টুকুতে প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্‌) হয়, সে টুকু তেমন ভিজে আর তেলা থাকে না, শুক্‌নো খস্‌খসে হইয়া যায়। এই জন্যে, নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময়, বুকের খোলের ভিতর-পিঠ আর ফুল্‌কো এই দুয়ের ঠেকা-ঠেকি, ঘষা ঘষি আর সব জায়গার

সেই রকম নিঃশব্দে হয়; কিন্তু প্রদাহ হইয়া প্লুরার যে খানি বা যে টুকু শুক্‌নো আর খস্‌-খসে হইয়াছে, সে খানি বা সে টুকুতে ঘষার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। পাওয়া যাবেই ত। খস্‌খসে জিনিশে কখনও নিঃশব্দে ঘষা-ঘষি হইতে পারে না। এ বুঝাইবার জন্যে বেশী কিছু বলিবার দরকার নাই। সব জিনিশ থেকে এক রকম শব্দ বাহির হয় না। যে যেমন জিনিশ, ঘষা-ঘষি হইলে তা থেকে তেম্‌নি শব্দ বাহির হয়। কাঠে কাঠে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম শব্দ হয়, পাতরে পাতরে ঘষা-ঘষি হইলে সে রকম শব্দ হয় না। ভিন্ন জিনিশ দূরে থাক্‌, পুরু কাগজে পুরু কাগজে ঘষা-ঘষি হইলে যে রকম শব্দ হয়, পাতলা কাগজে পাতলা কাগজে ঘষা-ঘষি হইলে সে রকম শব্দ হয় না। এর আগেই বলিছি যে, প্লুরা খুব পাতলা একটী পর্দ্দা। এই জন্যে, ছোট ছোট ছু ফর্দ্দ খুব পাতলা কাগজ বুড়ো আঙুল আর তার কাছের আঙুল, এই দুটী আঙুলের মধ্যে রাখিয়া কানের ছাঁদার ঠিক্ কাছে খুব আস্তে আস্তে, অথচ একটু চাপিয়া ঘষা-ঘষি করিলে যে রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিয়াও প্রায় ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনা যায়। কুইনাইনের শিশির গায়ে গোলাপি রঙের যে এক রকম খুব পাতলা কাগজ জড়ান থাকে, সেই রকম কাগজেই সব চেয়ে ভাল পরীক্ষা হয়। কুইনাইনের শিশি দু রকম কাগজ দিয়া মোড়া থাকে। বাইরের কাগজ শাদা আর পুরু। এই কাগজের উপর ইংরিজি লেখা আর ছাপা মারা থাকে। তার নীচে গোলাপি রঙের খুব পাতলা কাগজ থাকে।

গোলাপি রঙের এই পাতলা কাগজেরই কথা বলিতেছি। প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় বুক-পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টেথ-স্কোপ্) বসাইয়া তার উপর কান রাখিয়া খুব মন দিয়া শুনিলে, রোগী যত বার নিশ্বাস লইবে আর যত বার নিশ্বাস ফেলিবে, তত বারই এই রকম ঘষার শব্দ শুনিতে পাবে। ঐ জায়গায় হাত দিয়া রাখিলেও কখন কখন ঐ রকম ঘষার শব্দ বেশ স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। কিন্তু ও শব্দ বেশী দিন শুনিতে পাওয়া যায় না। শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। শব্দ আর শুনিতে পাওয়া যায় না কেন? কেন তা বলি। এক এক করিয়া ধর। (১) প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) সারিয়া গেলে—ভাল হইয়া গেলে, প্লুরা সে রকম শুক্নো আর খস্‌খসে থাকে না; সহজ বেলার মত ভিজে আর তেলা হয়। কাজেই, ঘষা-ঘষির শব্দ আর পাওয়া যায় না। (২) ফুস্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরা প্রদাহের (ইন্‌ফ্ল্যামেশনের) জায়গায় একত্র যোড় লাগিয়া যাইতে পারে। যোড় লাগিয়া গেলে আর ঘষা-ঘষির শব্দ হইতে পারে না। (৩) প্রদাহ (ইন্‌ফ্ল্যামেশন্) হইলে প্লুরার গা থেকে বেশী জল (সিরম্) বাহির হইয়া বুকের খোলের ভিতর জমা হইলে, ফুস্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরায় একত্র ঠেকা-ঠেকি আর ঘষা-ঘষি হইতে পারে না। কাজেই ঘষা-ঘষির শব্দও শুনিতে পাওয়া যায় না। তবেই দেখ, প্লুরিসি-রোগীর বুক-পরীক্ষা করিয়া শব্দ একবার শুনিতে পাইয়া যদি আর শুনিতে না পাও, তবে একবারে তিনটী বিষয় তোমার

মনে পড়িবে। অর্থাৎ হয় প্রদাহ সারিয়া গিয়াছে—ভাল হইয়া গিয়াছে ; নয় ছুটো পর্দ্দায় (ফুস্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরায়) যোড় লাগিয়া গিয়াছে ; নয় বুকের খোলের ভিতর বেশী জল (সিরম্) জমা হইয়াছে। বুকের খোলের ভিতর বেশী জল জমিলে, ফুস্কো আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ, এ ছুয়ে ঠেকা-ঠেকি হইতে পারে না। তাদের মধ্যে জল থাকে। কাজেই, ফুস্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরা, এই ছুই পর্দ্দায় ঘষা-ঘষিও হইতে পারে না।

প্লুরিসির সঙ্গে কেবল ছুটী রোগের গোলমাল হইতে পারে। সে ছুটী রোগ কি কি ? (১) প্লুরোডাইনিয়া আর (২) নিয়ুমোনিয়া। (১) বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের ব্যথাকে ডাক্তরেরা প্লুরোডাইনিয়া বলেন। বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের বাতকেও ডাক্তরেরা প্লুরোডাইনিয়া বলেন। প্লুরোডাইনিয়ার কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। কাশিয়া কাশিয়া বুকে, পিঠে, পাজরে যে ব্যথা হয়, সে ব্যথা বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসের ব্যথা। হাড়েরও ব্যথা নয়, বুকের ভিতর কার কোন জায়গারও ব্যথা নয়। মাংসের এই যে ব্যথা, একেও ডাক্তরেরা প্লুরোডাইনিয়া বলেন। প্লুরিসির ব্যথার সঙ্গে প্লুরোডাইনিয়ার ব্যথার গোলমাল প্রায়ই হয়। এ রকম গোলমাল হইলে রোগীর লঘু পাপে গুরু দণ্ড হইবার আটক নাই। এই জন্যে, প্লুরিসি আর প্লুরোডাইনিয়ার তফাত কি, বেশ করিয়া জানিয়া রাখা ভারি দরকার। তফাত একটু আধটু নয়। আকাশ পাতাল তফাত। প্লুরো-

ডাইনিয়ায় জ্বর জাড়ি কিছুই নাই। আর রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে সে রকম ঘষার শব্দ টব্দ কিছুই পাওয়া যায় না। এ ছাড়া, যাতে বুক, পিঠ, পাঁজরের মাংসে চাড় পায়, তাতেই ব্যথা লাগে। হাত তুলিতে, ডাইনে বাঁয়ে হঠাৎ ফিরিতে ঘুরিতে, কিম্বা হঠাৎ জোরে নিশ্বাস লইতে কি নিশ্বাস ফেলিতে মাংসে ব্যথা লাগে। আস্তে আস্তে আঙুলের ঘা দিলেও মাংসে ব্যথা লাগে। চাপ দিয়া চাপ তুলিয়া লইবা মাত্র ব্যথা বাড়ে।

তার পর বলি।

(২) নিয়ুমোনিয়ার সঙ্গে প্লুরিসি রোগের গোলমাল হইয়া যাওয়া যত সম্ভব, এত আর কোনও রোগেরই সঙ্গে নয়। এই জন্যে, নিয়ুমোনিয়া আর প্লুরিসি, এই দুটী রোগের তফাত জানিয়া রাখাও বড় দরকার। প্লুরিসির চেয়ে নিয়ুমোনিয়াতে জ্বর বেশী হয়, গায়ের তাত বেশী তীব্র হয়—নিয়ুমোনিয়া-রোগীর গায়ে, বিশেষ বুকে, পিঠে, পাঁজরে হাত দিলে বোধ হয় যেন হাত পুড়িয়া যায়। প্লুরিসি-রোগীর গায়ে হাত দিলে, হাতে তেমন গরম মালুম হয় না। প্লুরিসির চেয়ে নিয়ুমোনিয়ায় রোগীর মুখ বেশী লাল হয়। এ ছাড়া, প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় এমনি সেঁটে ধরিয়া থাকে যে, বোধ হয় যেন সে জায়গাটা ছুঁই দিয়া টাঁকা আছে। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর বুকে, পিঠে, পাঁজরে যে ব্যথা হইয়া থাকে, সে ব্যথার স্বভাব এ রকম নয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর কাশি, প্লুরিসি-রোগীর কাশির মত নয়। নিয়ুমোনিয়ায় সচরাচর মর্চ্যে বা পাটকিলে রঙের গয়ের উঠে।

বুক পরীক্ষার যন্ত্র (ষ্টিথস্কোপ্) দিয়া পরীক্ষা করিলে নিয়ু-মোনিয়ার প্রথম অবস্থায় চুল-ঘষার চিড়্চিড়্ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। কানের কাছে পাতলা কাগজে পাতলা কাগজে ঘষা-ঘষি করিলে যে রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, প্লুরিসি-রোগীর বুক পরীক্ষা করিলে সেই রকম শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই দু রকম শব্দের একটার সঙ্গে আর একটার গোলমাল হওয়া সম্ভব নয়। এ ছাড়া, প্লুরিসি রোগীর নাড়ী, আঙুলের নীচে সেতার কি বেয়ালার তারের মত বোধ হয়। নিয়ুমোনিয়া-রোগীর নাড়ী সে রকম নয়। নিয়ুমোনিয়া রোগীর নাড়ী নরম, আর আঙুল দিয়া চাপিলেই তার গতি বন্ধ হয়। এ সব কথা এর আগেই বলিছি। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট-শব্দ বাহির হয়। প্লুরিসি রোগে বুকের খোলের মধ্যে কিম্বা প্লুরার থলীর মধ্যে জল জমিলেও বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। দুই রোগেই বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দ পাইলে। এখন কেমন করিয়া বুঝিবে যে, রোগীর নিয়ুমোনিয়া হইয়াছে—কি প্লুরিসি হইয়াছে। তা বুঝা শক্ত নয়। প্লুরিসি রোগে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিবার কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব।

প্লুরিসি-রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে?—রোগ যদি নূতন হয়, কোনও উপসর্গ না থাকে, আর চিকিৎসা তৎপর হয়, তবেই মঙ্গল। এক দিকেই প্লুরিসির চেয়ে দু দিকেরই প্লুরিসিতে যে রোগীর বিপদ

বেশী, তা বলা বাড়া। রোগী যদি বেশ সবল থাকে, আর জ্বর-জাড়ি না থাকে, তবে ব্যামো পুরাণ হইলেও বেশী ভয়ের বিষয় নয়। বুকের খোলের মধ্যে (প্লুরার থলির ভিতর) খুব শীঘ্র শীঘ্র যদি বেশী জল জমে, তবে রোগীর জীবন রক্ষা হওয়া ভার।' দুই দিকেই জল জমিলে আরও বিপদ্। প্লুরিসির সঙ্গে আরও কোনও যন্ত্রের ব্যামো (যেমন ক্ষয়কাশ) কিম্বা উদরী থাকিলে, রোগীর নিস্তার নাই।

চিকিৎসা——এখন প্লুরিসি রোগীর চিকিৎসার কথা বলি। নিয়ুমোনিয়ার চিকিৎসার কথা বলিবার সময় রোগীকে যে রকম স্থির রাখিতে বলিছি, প্লুরিসি-রোগীকেও সেই রকম স্থির রাখিবে। ব্যথার জায়গায় দুই প্লুরায় (ফুস্কো-ঢাকা প্লুরা আর বুকের খোলের ভিতর-পিঠ ঢাকা প্লুরার) অকারণ বেশী ঘষা-ঘষি না হইতে পারে, এই জন্যে রোগীকে কথা কহিতে কিম্বা দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বারণ করিবে। সরু ফ্ল্যানেলের ব্যাণ্ডেজ রোগীর বুকে জড়াইয়া দিলে বেশ উপকার হয়। কেন না, ফ্ল্যানেল দিয়া এ রকম জড়ান থাকিলে নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় পাঁজরের হাড় কম নড়ে। কাজেই, দুই প্লুরায় ঘষা-ঘষিও কম হয়। আবার ঘষা-ঘষি কম হইলে ব্যামোও বাড়িয়া যাইতে পারে না। প্লুরিসি-রোগী ব্যথাতেই কাতর। এই জন্যে, অষুধ দিয়া তার ব্যথা আগে দূর করিবে। প্লুরিসি-রোগীর ব্যথা দূর করিবার জন্যে আমি যে অষুধ দিয়া

লাইকর য়্যামোনিয়ী য়্যাসিটেটিস্	...	৩ ড্রাম্
নাইট্রিক্ ঈথর ...	... ...	৩ ড্রাম্
টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্—আফিঙের আরক)		১ ড্রাম্
ডিল ওয়াটর (য়্যাকুই য়্যানিথাই)		৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ দু তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। এটা প্লুরিসির বড় চমৎকার অসুদ। এক দিনেই রোগীর ব্যথা অনেক নরম পড়ে। এর সঙ্গে সঙ্গে ব্যথার জায়গায় তার্পিণের সেক দিলে আরও উপকার হয়—আরও শীঘ্র ব্যথা নরম পড়ে। ১৭১—১৭২র পাতে যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে হয় বলিছি, প্লুরিসি-রোগীকে সে রকম করিয়া সেক দিবে না। তিন চারি পুরু ফ্ল্যানেল খুব গরম জলে ডুবাইয়া নিংড়াও। তার পর, তার উপর, ৮০। ৯০ কি ১০০ ফোটা আন্দাজ তার্পিণ তাড়াতাড়ি ছড়াইয়া দেও। তার পর, যে দিকে তার্পিণ ছড়াইয়া দিলে, সেই দিক্‌টে দিয়া তার ব্যথার জায়গা আর তার চারি ধার ঢাকিয়া দেও। তার পর, শুক্নো তোয়ালেই হোক্, আর শুক্নো কাপড়ই হোক্, তিন চারি তো করিয়া সেই ফ্ল্যানেলের উপর দিয়া, এক খানি উড়ুনি লম্বালম্বি তিন ভাজ করিয়া সে সব বেশ এঁটে জড়াইয়া দেও। ফ্ল্যানেল ঢাকিবার কাপড় আর জড়াইয়া বাঁধিবার উড়ুনি আগেই সব প্রস্তুত করিয়া রাখা চাই। নৈলে কাপড় চোপড় আনিতে নিতে, ভাঁজ করিতে আপ্ করিতে ফ্ল্যানেল ঠাণ্ডা হইয়া যাবে। ফ্ল্যানেলের উপর দিয়া এক বারে তাব

উঠিতেছে—তারই উপর তার্পিণ ছড়াইয়া দিবে। ছড়াইয়া দিয়াই সেই দিক্‌টে ব্যথার জায়গায় বসাইয়া দিবে। তার পর, তো-করা তোয়ালে কিম্বা কাঁপড় দিয়া ফ্ল্যানেলটা তাড়াতাড়ি ঢাকিয়া দিয়া, শেষে উড়ুনি দিয়া সব জড়াইয়া আঁটিয়া বাঁধিয়া দিবে। এই রকম করিয়া ঢাকা দিয়া আর জড়াইয়া বাঁধিয়া রাখিলে ফ্ল্যানেলের, গরম দশ-বার ঘণ্টা সমান থাকে। চাই কি, এক সেকেই রোগীর ব্যথা প্রায় সারিয়া যায়। তবে এ রকম সেক অনেক রোগী সৈতে পারে না। এ রকম সেকে ভারি জ্বালা করে। ভারি গরম লাগে আর তার পর জ্বালা ধরে বলিয়া অনেকে হাঁউ-মাউ করিয়া খানিক পরেই সে সব খুলিয়া ফেলিয়া দেয়। প্লুরিসি যে শক্ত রোগ, পুরাণ পড়িয়া গেলে প্লুরিসি থেকে রোগীর যে সব বিপদ ঘটিতে পারে আর ঘটিয়া থাকে, তাতে ২। ৪ ঘণ্টা অমন একটু জ্বালা সহ্য করিয়া থাকিলে যদি এমন খল রোগ থেকে অব্যাহতি পাওয়া যায়, তবে তার চেয়ে সুবিধা আর কি হইতে পারে? ব্যথা যদি খুব বেশী হয়, আর রোগী বেশ সবল থাকে, তবে ব্যথার জায়গায় গোটা পাঁচ ছয় জোঁক লাগাইলে ব্যথা তখনই কমিয়া যায়। ফল কথা, এতে যত শীঘ্র ব্যথা কমে, আর কিছুতেই তত নয়। আগে তার্পিণের সেক দিয়ে দেখিবে। তাতে যদি ব্যথা না কমে, তবেই জোঁক লাগাইবে। নৈলে মিছে-মিছি রক্ত বাহির করিয়া রোগীকে আরও দুর্ব্বল করিয়া ফেলিবার দরকার নাই।

ব্যথা যদি বড়ই বেশী হয়, তবে ব্যথার জায়গায় বড় এক খান বেলেস্তরা বসাইয়া দিবে। বেলেস্তরা বেশী ক্ষণ রাখিবার

দরকার নাই। আধ ঘণ্টা খানেক রাখিলেই কাজ হয়। তার পর, বেলস্তরা উঠাইয়া ফেলিয়া সেই জায়গায় মসিনার খৈলের খুব গরম একটা পুলটিশ্ দিবে। এতেই ব্যথা তখনই নরম পড়িবে। বুকের খোলের মধ্যে বেশী জল জমিলে শুদ্ধ এ রকম চিকিৎসায় রোগীকে আরাম করা যায় না। এই জন্যে, জ্বর যে কমিয়া যাবে, সেই অমনি য়্যাস্পিরেটর দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলিবে। য়্যাস্পিরেটর দিয়া বুকের ভিতরকার জল বাহির করা খুব সোজা. আর এতে রোগীর কোনও বিপদ্ নাই। য়্যাস্পিরেটর জিনিশটে কি? য়্যাস্পিরেটর একটী যন্ত্র। এই যন্ত্রটির কথা আর এই যন্ত্র দিয়া বুকের ভিতরকার জল কেমন করিয়া বাহির করিতে হয়, এর পর বলিব। জল জমিতেই অমনি বাহির করা হবে না। কিন্তু জ্বর কমিলেও আর দেরি করা হবে না। জল যতবার জমিবে, য়্যাস্পিরেটর দিয়া তত বারই তা বাহির করিয়া ফেলিবে। এর সঙ্গে সঙ্গে রোগী যাতে দিন দিন সবল হয় তা করিলে, শেষে জল আর জমে না। কাজেই, প্লুরিসি আর পুরাণ পড়িয়া যাইতে পারে না। তবে প্লুরিসি যদি পুরাণ পড়িতে না দিলে, আর রোগীকে মারে কে? যে কারণেই হোক্, য়্যাস্পিরেটর দিয়া বুকের ভিতরকার জল বাহির করা না ঘটিলে, অসুদ খাওয়াইয়া জল শুকাইবার চেষ্টা করিবে। নীচে সে অসুদটা লিখিয়া দিলাম।

পিল্ হাইড্রার্জ্জ (ব্লুপিল)	...	৩৬ গ্রেন্
পলব্ ডিজিটেলিস্ ...	...	৬ গ্রেন্
পলব্ স্কিলি ...	...	১৮ গ্রেন্

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া এতে ২৪টী বড়ি তৈয়ের কর।

রোজ তিন বেলা তিনটে বড়ি দিবে। এই সঙ্গে রোগীকে আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ খাইতে দিলে আরও উপকার হয়। বুকের ভিতরকার জল আরও শীঘ্র শুষে যায়। ২। ৩ গ্রেন আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্ জলের সঙ্গে সকালে বিকালে খাইতে বলিবে। নূতন প্লুরিসিকে যদি পুরাণ হইতে না দিলে, তবে প্লুরিসির চূড়ান্ত চিকিৎসা করিলে।

এখানেও আমাদের সেই কুইনাইন্ ছাড়া আর উপায় নাই। তাপমান-যন্ত্র দিয়া বারে বারে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে; গায়ের তাত যে একটু কমিবে, সেই কুইনাইন্ দিবে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) যে রকম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইতে হয় বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম করিয়া কুইনাইন্ খাওয়াইবে। ১৪৫র পাতে এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। ১৪৫র পাতের কথা আবার ৬০—৬২র পাতে বরাত দেওয়া আছে। এই জন্যে, ১৪৫র পাতও পড়িবে, ৬০—৬২র পাতও পড়িবে। প্লুরিসি-রোগীর জ্বর সত্ত্ব আরাম করা চাই। নৈলে রোগীর বড় বিপদ্। প্লুরিসি-রোগীর জ্বর রয়ে বসে ভাল করিলে চলিবে না। এ রোগ পুরাণ পড়িয়া গেলে, রোগীকে শেষে বাঁচানই কঠিন হইয়া পড়ে। কুইনাইন্ দিয়া জ্বর আসা বন্ধ কর, আর যাতে বল হয়, এমন আহার দিয়া রোগীকে সবল রাখ। তার্পিণের ঐ রকম সেঁক দিয়া আর আফিং-ঘটিত ঐ আরক অম্বুধ (মিক্শ্চর) খাওয়াইয়া ব্যথা দূর কর। এই করিলেই তোমার প্লুরিসির চিকিৎসা করা হইল। যাতে

বল হয় এমন আহার আর কি ? দুধ আর মাংসের কাথ। দরকার হইলে মাংসের কাথের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডি দিবে। যদি বল ব্রাণ্ডি দিবার আবার দরকার কি ? অন্ন-দের সঙ্গেই হোক্, আর মাংসের ক্যাথের সঙ্গেই হোক, ব্রাণ্ডি দিবার দরকার কি, এর আগে তো অনেক বারই বলিছি। রোগী দুর্ব্বল হইলেই তাকে ব্রাণ্ডি দেওয়া চাই ; নৈলে, রোগ ক্রমেই বাড়িয়া যাবে। যে রোগই কেন হোক্ না, রোগীর বল রাখিয়া চিকিৎসা না করিলে চিকিৎসক অপ্র-তিভ হইবেন বৈ, কখনও যশ পাইবেন না।

প্লুরিসি বেশ সারিয়া গেলেও রোগাকে খুব তলি তর্পগে থাকিতে বলা চাই। নৈলে সামান্য অত্যাচারেই রোগটা আবার হইতে পারে। প্লুরিসি এক বার সারিয়া আবার হইলে রোগীর বিপদের সীমা নাই। কোন রকমে গায়ে হিম বাত লাগাইবে না। যার যেমন অবস্থা, সে সেই রকম কাপড় চোপড় দিয়া সব গা বেশ করিয়া ঢাকিয়া রাখিবে। এক মাসের মধ্যে স্নান করিবে না। শীত কালে হয় ত শীত থাকিতে স্নান করিবে না। তার পর, তিন চারি দিন অন্তর ঘরের মধ্যে দুওর দিয়া অল্প গরম জলে স্নান করিবে। তার পর, ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে রোজ নাওয়া অভ্যাস করিবে। বেশ তাত ফুটিলে তবে হিম জলে নাইতে আরম্ভ করিবে— তাও ক্রমে অভ্যাস করিবে। প্রথমে কাঁচায় পাকায় মিশা-ইয়া স্নান করিবে। তার পর, গরম জলের ভাগ ক্রমে কমাইয়া দিবে। এই রকম করিয়া হিম জলে নাওয়া অভ্যাস করিবে। শরীর খুব সবল না হইলে নম্বর নিত্য স্নান করিবে

না। আমরা যে নিয়মে আর যে রকম করিয়া স্নান করি, তাতে শরীর খুব সুস্থ আর খুব সবল না থাকিলে, সে রকম স্নান কখনও সয় না। শর্দ্দি, কাশি, জ্বর, বাত, পেটের-ব্যামো—এর মধ্যে একটা না একটা হয়ই। আমাদের দেশে ম্যালেরিয়া-জ্বর ছাড়া কথা নাই। যে ব্যামোই কেন হোক্ না, তার সঙ্গে জ্বর থাকিলে সে জ্বর ম্যালেরিয়া-জ্বরের স্বভাব পায়। এই জন্যে বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরে স্নান যে ভারি কুপথ্য, তা যেন খুব মনে থাকে। ১৩১—১৩৪র পাতে এ সব বেশ করিয়া বলিছি।

হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ আর কড্লিবর্ অইল্ যে কাশ রোগের মহৌষধ, এর আগে তা অনেক বার বলিছি। ব্রংকাইটিস্ই হোক্, নিয়ুমোনিয়াই হোক্, আর প্লুরিসিই হোক্, ব্যামো সারিয়া গেলে এ দুটী অষুদ রোগীকে দেওয়া চাই-ই—চাই। এ দুটী অষুদেই শরীর পুষ্টি হয়, আর পরে কোন খারাপ কাশ-রোগ জন্মাতে দেয় না। হাইপো-ফস্ফাইট্ অব্ লাইমের কথা ২৫০—২৫২র পাতে বলিছি। কড্লিবর্ অইলের কথা ২৬৭—২৬৮র পাতে বলিছি।

(২) পুরাণ প্লুরিসি—এখন পুরাণ প্লুরিসির কথা বলি।

লক্ষণ—পুরাণ প্লুরিসি সচরাচর নূতন প্লুরিসি থেকেই হয়। নূতন প্লুরিসি শীঘ্র না সারিলেই আর কি পুরাণ হইয়া পড়ে। প্লুরার গা থেকে যে জল বাহির হয়, সে জল না শুষিয়া থাকিয়া যায়। এ ছাড়া, সচরাচর সে জল বাড়ে, আর যদি রোগী জ্বরে নিয়ত ভোগে, পরে সে জল পূযের মত হইয়া যায়। বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে,

রোগীর বাহ্য লক্ষণে তা কেমন করিয়া জানা যায় ? রোগী ভারি কাহিল হইয়া পড়ে—দিন দিন তার শরীর যেন ক্ষয় পাইয়া যায় ; একটু শ্রম করিলেই হাঁপ লাগে, আর ভাল দিকে অর্থাৎ যে দিকে ব্যামো নয়, সে দিকে শুতে পারে না। এ সব লক্ষণ ত বজায় থাকেই। এর মধ্যে ব্যথা আর হাঁপ মাঝে মাঝে খুবই বাড়ে।

নূতন প্লুরিসিতে বুকের ভিতর জল জমিলে যে যে উপায় করিতে হয় বলিছি, এখানেও সেই সব উপায় করিবে। তবে পুরাণ প্লুরিসিতে রোগীর বল রক্ষা করিবার চেষ্টা আগে চাই। এই জন্যে তাকে দুধ, মাংসের ক্বাথ, আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি অবাধে দিবে। হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্ আর কড্‌লিবর্ অইল ত দিবেই। তা ছাড়া, লৌহ (আয়র্ণ)-ঘটিত অসুদও তাকে দেওয়া চাই। যাতে লৌহ (লোওয়া—আয়র্ণ) আছে, তাকেই লৌহ-ঘটিত অসুদ বলে। যেমন সল্‌ফেট্ অব্ আয়র্ণ, হীরেকশ, কার্ব্বণেট্ অব্ আয়র্ণ, টিংচর ফেরিমিয়্যুরিয়েটিস্—এই কয়টাই লৌহ-ঘটিত অসুদ। রোগীর যদি সঙ্গতি থাকে, তবে তাকে জায়গা বদলাইতে বলিবে।

প্লুরিসি খুব ভারি রকম হইলে প্লুরার গা থেকে অনেক জল বাহির হইয়া বুকের খোলের মধ্যে জমা হয়। এই জলের পরিমাণের কিছু ঠিক্ নাই। দু চারি ঔন্সও হইতে পারে, আর পাঁচ সাত পাইণ্টও হইতে পারে। এক ঔন্স আধ ছটাক, আর এক পাইণ্ট তিন পোওয়া। এই জল বুকের খোলের মধ্যে জমা হইয়া ফুস্কো একবারে চাপিয়া

ধরে ; সে ফুস্কোর কাজ একবারে বন্ধ করিয়া দেয়।—সে ফুস্কোর ভিতর আর বাতাস যাইতে পারে না। হৃৎপিণ্ড (হার্ট) যেখানে আছে, জলের ভরে সেখান থেকে সরিয়া যায়। শুদ্ধু হৃৎপিণ্ড নয়, অন্য অন্য যন্ত্রও সরিয়া যায়। এ ছাড়া, যে দিকে জল জমে, জলের ভরে সে দিকের পাঁজর যেন একটু ঠেলে বেরোয়।

বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে বুক পরীক্ষা করিয়া তা জানা যায় কি না ? যায়। বুক পরীক্ষা করিয়া কি জানিতে পারা যায়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। বুকের খোলকে প্লুরার থলিও বলে। কেন না, বুকের খোলও প্লুরা দিয়া ঢাকা, আবার ফুস্কোও প্লুরা দিয়া ঢাকা। এই জন্যে, বুকের খোলের ভিতর জল জমিয়াছে বলিলে যা বুঝায়, প্লুরার খোল বা থলির মধ্যে জল জমিয়াছে বলিলেও তাই বুঝায়।

বুকের খোলের মধ্যে বা প্লুরার থলিতে জল জমিলে বুক পরীক্ষা করিয়া তার কি কি চিহ্ন জানিতে পারা যায় ? বুক পরীক্ষা করিয়া পাঁচটী চিহ্ন পাওয়া যায়। (১) পিঠে, পাঁজরে, বা বুকে, বাঁ হাতের দুটী আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া তার উপর ডাইন হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া একটু জোরে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। (২) বুক পরীক্ষার যন্ত্রের (ষ্টিথস্কোপের) উপর কাণ রাখিয়া বেশ মন দিয়ে শুনিলে, ফুস্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার বেশ মিষ্টি, নরম, শোঁ শোঁ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায় না। (৩) নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফু দিলে যে এক রকম

কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, মিষ্টি শোঁ-শোঁ শব্দের বদলে ঠিক্ সেই রকম শব্দ শুনা যায়। (৪) বুক-পরীক্ষার যন্ত্রের (ষ্টিথস্কোপের) উপর কাণ রাখিয়া রোগীকে কথা কহাইলে, এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, তার আওয়াজ তোমার কাণে আসিয়া যেন কন্ কন্ করিয়া লাগিবে। (৫) রোগীর পিঠে, পাঁজরে, বা বুকে তোমার হাত রাখিয়া তাকে এক—দুই—তিন্ গুণিতে বলিলে, তার বুকের ভিতর থেকে কোনও রকম আওয়াজ তোমার হাতে আসিয়া লাগিবে না। এই পাচটি ছাড়া আর একটী চিহ্ন আছে। (৬) বুকের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে, জলের ভরে হৃৎপিণ্ড আপনার জায়গা থেকে সরিয়া যায়। জলের ভরে ডায়াফ্রামও নামিয়া পড়ে। ডায়াফ্রাম্ ডাক্তরি কথা। বুকের খোল আর পেটের খোল, এই দুই খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পর্দ্দা আছে। সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা ডায়াফ্রাম্ বলেন। পাঁঠা ঝুড়িবার সময় তার সুমুকের পা দু খানিতে দড়ি বাঁধিয়া কেমন করিয়া টাঙাইয়া রাখে, যোড়া হইলে ছুরি দিয়া পেট চিরিয়া কেমন করিয়া নাড়ি-ভুড়ি বাহির করিয়া ফেলে, নাড়ি-ভুড়ি বাহির করিয়া ফেলিয়া কেমন করিয়া মেটে (লিবর্—যকৃত) বাহির করিয়া লয়, আমাদের ছেলে বুড়ো মেয়েতেও জানে। এই মেটে বাহির করিয়া লইবার সময় উপরদিকে মাংসের একটা পর্দ্দাতে হাত ঠেকে। মেটে বাহির করিয়া লইয়া একটু হেঁট হইয়া উকি দিয়া দেখিলে মাংসের ঐ পর্দ্দাটা বেশ দেখা যায়। মাংসের এই পর্দ্দা দিয়া বুকের খোলের মেজে আর পেটের খোলের ছাদ তয়ের হইয়াছে। এই

পর্দ্দা (আড়াল) না থাকিলে বুকের খোল আর পেটের খোল এক হইয়া যাইত। এর আগেই বলিছি, ডায়াফ্রাম্ ডাক্তরি কথা। এর ভাল বাঙ্গালা কথা উদররোব্যবধান-পেশী। কিন্তু ডায়াফ্রামের চেয়ে এ ঢের শক্ত কথা। এই জন্যে, একে ডায়াফ্রাম্ বলাই ভাল।

বুকের খোলের মধ্যে যে পরিমাণে জল জমে, বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া নিরেট শব্দও সেই পরিমাণে পাওয়া যায়। প্রথমে এই নিরেট শব্দ বুকের খোলের সব নীচে আর পেছন দিকে টের পাওয়া যায়। তার পর, বুকের খোলের ভিতরকার জল যেমন বাড়িতে থাকে, সেই সঙ্গে সঙ্গে নিরেট শব্দও সুমুখে আর পাশেও পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ঐ জল যত বাড়ে, নিরেট শব্দও তত উচুতে পাওয়া যায়। শেষে বুকের খোল একবারে জলে পুরিয়া গেলে, সে দিকের যেখানে ঘা দিবে, সেইখান থেকেই নিরেট শব্দ বাহির হবে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে ঘ দিলে যে রকম নিরেট শব্দ বাহির হয়, বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে তার চেয়েও নিরেট শব্দ বাহির হয়। যে পর্য্যন্ত জল থাকে, সেই পর্য্যন্ত নিরেট শব্দ পাওয়া যায়। তার উপর ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায়ও এই রকম নিরেট আর ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়। নিরেট ফুস্কো খানির উপর নিরেট শব্দ হয়। ভাল ফুস্কো খানির উপর ফাঁপা শব্দ হয়। এর মধ্যে বেশ একটা তফাত আছে। নিয়ুমোনিয়ার ফাঁপা আর নিরেট শব্দ যে জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাটা যদি কালি দিয়া দাগ

দেও, তবে কালির সে দাগটী তের্চা দেখিবে। আর প্লুরি-সিতে—বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে—ফাঁপা আর নিরেট শব্দ যে জায়গায় যোগ হইয়াছে, সে জায়গাটা যদি কালি দিয়া দাগ দেও, তবে কালির সে দাগটী সোজা হবে —ও রকম হ্যাঁকাতে বা তের্চা কখনই হবে না। যে পাত্রেই কেন জল রাখ না, জলের উপরটা কখনই উচ-নীচ হয় না, —সর্ব্বদাই সমান থাকে। এই জন্যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে, সে জলও যে এক জায়গায় উচ, এক জায়গায় নীচ হইবে না, তা বেশই বুঝা যাইতেছে। কাজেই, নিরেট শব্দ ধরিয়া যদি জলের ঊর্দ্ধ সীমা স্থির কর, আর সেই সীমা কালি দিয়া চিহ্ন কর, তবে তোমার কালির সে দাগটী চারি দিক বেড়িয়া ঠিক্ সোজা চলিয়া যাইবে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ আর বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ, এই দু রকম নিরেট শব্দের মধ্যে এই তফাতটী মনে করিয়া রাখা ভারি দরকার। এই তফাতটী মনে থাকিলে রোগ ঠিক্ করিতে তোমার ভুল হইবে না। নিয়ু-মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝায়? নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় বুকে, পিঠে, পাঁজরে আঙ্গু-লের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে সংক্ষেপে নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থার নিরেট শব্দ বলি-তেছি। বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট শব্দ বলিলে কি বুঝায়? বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে বুকে, পিঠে, পাঁজরে আঙ্গুলের ঘা দিলে যে নিরেট শব্দ বাহির হয়, সেই শব্দকে সংক্ষেপে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার নিরেট

শব্দ বলিতেছি। এ ছাড়া, রোগী উঠিয়া বসিলে কি শুইলে বুকের ভিতরকার জল সরিয়া সরিয়া বেড়ায়। বুকে, পিঠে, পাঁজরে ঘা দিয়া তা বেশ জানিতে পারা যায়। যেখান থেকে জল সরিয়া যায়, সেখানে ফুস্কো জাগিয়া উঠিলে আগেকার মত নিরেট শব্দ পাওয়া যায় না—ফুস্কোর ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়। কিন্তু জল সরিয়া গেলেও, চারিদিকের বাঁধন ছাঁদনে ফুস্কো যদি জাগিয়া উঠিতে না পারে, তবে এ চিহ্নটী আর খাটে না। বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে কেবল কণ্ঠার নীচেই ঘা দিয়া ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়। এই ফাঁপা শব্দ সহজ বেলার ফাঁপা শব্দের চেয়ে ঢের বেশী। পেট খুব ফাঁপিলে, পেটে আঙ্গুলের ঘা দিয়া যে রকম ফাঁপা শব্দ বাহির হয়, এও প্রায় সেই রকম শব্দ। নলের মুখে একটু তফাত থেকে ফুঁ দিলে যে এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে, বুকে, পিঠে, পাঁজরে ষ্টিথস্কোপ, (বুক পরীক্ষার যন্ত্র,) দিয়া শুনিলে ঠিক্ সেই রকম শব্দ পাওয়া যায়। বায়ুনলিগুলির ভিতরে বাতাস সেঁদোবার সময় যে শব্দ হয়, এ সেই শব্দ। জলের চাপে ফুস্কো চেপ্টা আর নিরেট হইয়া যায়। ফুস্কোর খুব মিহি নলি আর বায়ুকোষগুলির ভিতর বাতাস যাইবার আর যো থাকে না। কাজেই বড় নলি-গুলির ভিতর যে বাতাস যাতায়াত করে, কেবল তারই এক রকম কর্কশ শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়। এই রকম কর্কশ শব্দ চেপ্টা নিরেট ফুস্কো আর জলের ভিতর দিয়া কাণে আসে। নিয়ুমোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় এই রকম কর্কশ

শব্দ নিরেট ফুস্কোর ভিতর দিয়া কাণে আসে। নিয়মোনিয়ার দ্বিতীয় অবস্থায় রোগীর গলার আওয়াজ যেমন জড়ান অস্পষ্ট আর কন্‌কনে হয়, বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলেও গলার আওয়াজ সেই রকম জড়ান অস্পষ্ট আর কনকনে ত হয়ই, তা ছাড়া আবার একটু কাঁপানে-কাঁপানেও হয়। মোটা কথায়, গলার আওয়াজ ছাগল-ডাকার মত মালুম হয়। বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে রোগীর আওয়াজ ছাগল-ডাকার মত মালুম হয় বলিলে কি বুঝায়? বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে রোগীর বুকে, পিঠে, পাঁজরে ষ্টিথস্কোপ্‌ দিয়া তাকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, তার গলার আওয়াজ তোমার কাণে ঠিক্ যেন ছাগল-ডাকার মত মালুম হয়, এই বুঝায়। ছাগল-ডাকার মত এই শব্দ পাকরোর হাড়ের (স্ক্যাপিউলার— পৃষ্ঠফলকাস্থির) কোণের দিকে খুব স্পষ্ট শুনিতে পাওয়া যায়। নিয়মোনিয়া-রোগীর পিঠে বা পাঁজরে তোমার হাত রাখিয়া তাকে এক—দুই—তিন গুণিতে বলিলে, বুকের মধ্যে থেকে তার স্বর যেন কাঁপিতে কাঁপিতে তোমার হাতে আসিয়া বাজে। বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে রোগীর বুকে, পিঠে, পাঁজরে হাত দিয়া তার ও রকম স্বর বা আওয়াজ কিছুই টের পাওয়া যায় না। এই জন্যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমার এ একটী বেশ চিহ্ন। মেয়েদের বেলায় এ চিহ্নটী খাটে না। কেন না, মেয়েদের বুকে, পিঠে, পাঁজরে হাত দিলে তাদের স্বর বা আওয়াজ হাতে আসিয়া ওরকম বাজে না। বুকের খোল জলে একবারে

পরিপূর্ণ হইলে, কোন শব্দই শুনিতে পাওয়া যায় না।

জলের ভরে হৃৎপিণ্ড (হার্ট) আপনার জায়গা থেকে সরিয়া গেলে, তা সহজেই ঠিক্ করিতে পারা যায়। সহজ বেলায় বাঁ মাইয়ের নীচে হাত দিলে হৃৎপিণ্ডের ডুব্ ডুব্নি টের পাওয়া যায়। আর কোন জায়গায় এই ডুব্ডুব্নি জানিতে পারিলে হৃৎপিণ্ড সরিয়া গিয়াছে ঠিক্ করিবে। বাঁ বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে, হৃৎপিণ্ডের ডুব্-ডুব্নি একবারে বুকের মাঝখানের হাড়ের ডাইনে টের পাওয়া যায়। ডাইন বুকের খোলে বেশী জল জমে ত জলের ভরে ডায়াফ্রাম্ আর লিবর্ (যকৃত—মেটে) আরও নীচে নামিয়া যায়। বাঁ বুকের খোলে বেশী জল জমিলে, জলের ভরে পেট আরও নীচে নামিয়া যায়। পেটকে ডাক্তারেরা ষ্টমাক্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পাকস্থলী বলে। ছেলেদের বুকের খোলের মধ্যে জল জমিলে তাদের হৃৎ-পিণ্ড (হার্ট) কি অন্য যন্ত্র তত সরিয়া যায় না। কেননা, তাদের পাঁজর জলের ভরে সহজেই নুইয়া যায়।

বুকের খোলের মধ্যে কত জল জমিয়াছে, রোগীর হাঁপ দেখিয়া তা আন্দাজ করা যায়। বেশী জল জমিলে, আর জলের ভরে ফুস্কো খুব চেপ্টে গেলে, রোগীর হাঁপ খুবই বেশী হয়। রোগী ভাল দিকে অর্থাৎ যে দিকে জল জমে নাই, সেই দিকে আর শুইতে পারে না। কেন না, ভাল দিকে কাইত হইয়া শুইলে সমস্ত জলের ভারটা ভাল ফুস্কোর উপর গিয়া পড়ে। কাজেই সেই জলের ভরে ভাল ফুস্কো-

টিরও মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত হয়। যে দিকের বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে দিকের ফুল্কো জলের ভরে একবারে চেপ্টা আর নিরেট হইয়া থাকে। সে দিকের ফুল্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাতের ত সীমা নাই। এর উপর ভাল ফুল্কোটির মধ্যে বাতাস যাওয়ার কোন ব্যাঘাত ঘটিলে কি আর রক্ষা আছে?—রোগী হাঁপাইয়া মরে। মনে কর, বাঁ বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে—জলে বাঁ বুকের খোল প্রায় পরিপূর্ণ হইয়াছে। রোগী ডাইন পাশে শুইতে চেষ্টা করিল। বাঁ বুকের ভিতরকার সমস্ত জলের ভরটা ডাইন ফুল্কোর উপর পড়িল। কেমন করিয়া পড়িল, তা কি আর বলিতে হবে? এত জলের ভরে ডাইন্ ফুল্কোর মধ্যে বাতাস যাওয়ার ব্যাঘাত ঘটিবে আশ্চর্য্য কি? কাজেই ডাইন্ দিকে, শুইতে চেষ্টা করিলে, তার হাঁপ ধরে আর সে অমনি তখনই ধড় মড় করিয়া উঠিয়া পড়ে। এই জন্যে, যে দিকে জল জমিয়াছে, ব্যথার ভয়ে সে দিকে শুইতে তার আর বাধা থাকে না। ডাইন্ বুক আর বাঁ বুকের বেড় যদি মাপিয়া দেখ, তবে যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিয়াছে, মাপে সেই বুক বড় হইবে। কিন্তু মাপিবার সময় এটি যেন মনে থাকে, যে সহজ বেলায় অনেকের ডাইন্ বুক বাঁ বুকের চেয়ে একটু বড়। বেশ ঠাউরে দেখিলে, যে বুকের মধ্যে জল জমিয়াছে, সে বুকটী চকে একটু বড় লাগে। নিশ্বাস লইবার সময় কিম্বা নিশ্বাস ফেলিবার সময় সে দিকের পাঁজর নড়া মালুম হয় না। আর পাঁজরের দুই দুইখানি হাড়ের মাঝখানের খোল কি,

একবারে পূরিয়া যায়—একটুও মালুমও হয় না। বুকের খোলের মধ্যে খুব বেশী জল জমিলে ঐ সব জায়গা, এমন ঠেলিয়া বাহির হয়। কণ্ঠার নীচেটা খুব ভরা ভরা বা পূরন্ত হয়। আর সেই দিকের কাঁধটী একটু নামিয়া পড়ে। কেন বলা যায় না, বাঁ বুকেরই খোলের মধ্যে প্রায়ই জল জমে।

দিন কতক পরে বুকের খোলের মধ্যে জলজমার লক্ষণগুলি ক্রমে কমিতে আরম্ভ হয়। আর রোগীর যদি ভাগ্য ভাল হয়, তবে বুকের ভিতরকার জলও শুষিতে আরম্ভ হয়। ফুস্কো যদি চারিদিকের বাঁধনছাঁদনে আবদ্ধ থাকে, তবে জল শুষিয়া যাইবার সঙ্গে সঙ্গে ফুস্কো ফাঁপিয়া উঠিতে পারে না। কাজেই, সে দিকের পাঁজর ভিতর দিকে বসিয়া যায়। আর ভাল দিকের বুকের চেয়ে বড় না থাকিয়া বরং তার চেয়ে ছোট হইয়া যায়।

চরমস্থলে কোন কোন রোগীর পাঁজরের হাড় সব গায়ে গায়ে লাগিয়া যায়। তাদের মাঝে জায়গা একটুও থাকে না। পাঁজরের হাড়গুলি সহজ বেলার চেয়েও বাঁকা বা তের্চা হয় আর যেন মোচড়ান মত হইয়া যায়। সে দিকের কাঁধ নীচে নামিয়া পড়ে; আর সহজ কাঁধের মত ভাল নাড়া-চাড়া যায় না। পাকৃরোর হাড়ের কোণা উচ হইয়া উঠে, আর পিঠের শিরদাঁড়ার কাছে যায়। (পাকৃরোর হাড়কে ডাক্তারেরা স্ক্যাপিওলা বলেন)। আর পিঠের শির দাঁড়া বাঁকিয়াযায়। যে বুকটা খারাপ হইয়া গিয়াছে, সেই দিকেই হৃৎপিণ্ডকে (হার্টকে) কেউ যেন টানিয়া আনে, আর ভাল ফুস্কোটি অন্য দিকে বুকের মধ্যে প'ড়ে বিস্তৃত হয়।

আর এক রকম প্লুরিসি আছে, তাতে ব্যথাও হয না, কাশিও হয় না, হাঁপও হয় না। অথচ প্লুরার গা থেকে জল বাহির হইয়া ক্রমে একদিকের বুকের খোল সব পুরিয়া যায়। বুকের খোলের ভিতর জল জমিলে যে সব লক্ষণ দেখিয়া তা জানিতে পারা যায়, এখানেও সেই সব লক্ষণ দেখা দেয়। এই রকম প্লুরিসিকে ডাক্তরেরা লেটেণ্ট প্লুরিসি বলেন। ভাল বাঙ্গালায় প্রচ্ছন্ন প্লুরিসি বলা যায়। প্রচ্ছন্ন শব্দের অর্থ লুকান।

হাইড্রোথোরাক্স—প্লুরার প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) না হইয়াও প্লুরার থলির মধ্যে বুকের খোলের মধ্যে জল জমিতে পারে। শরীরের আর আর সব যন্ত্র ভাল থাকিতে এ রকম ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। উদরী আর সব শরীরে জল হইয়া রোগী মরণাপন্ন হইলে প্রায়ই এ রকম ঘটে। হৃৎপিণ্ডের রোগ (হার্ট-ডিজীজ্), বৃক্ক বা মূত্রগ্রন্থির রোগ (কিড্‌নী ডিজীজ্—ব্রাইটস্ ডিজীজ্) হইলে এ ব্যামো প্রায়ই হয়। শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও কখন কখন এ রোগ হয়। শরীরের রক্ত খুব কমিয়া গেলে ডাক্তরেরা তাকে য়্যানীমিয়া বলেন। য়্যানীমিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় রক্তাল্পতা বলে। প্লুরার থলির মধ্যে এই রকম জল জমাকে ডাক্তরেরা হাইড্রোথোরাক্স বলেন। হাইড্রোথোরাক্সের বাঙ্গালা বুকের ভিতর জল। হাইড্রোথোরাক্স ঠিক করা শক্ত নয়। প্লুরার প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্) হইয়া প্লুরার থলিতে (বুকের খোলের মধ্যে) জল জমিলে যে সব চিহ্ন পাওয়া যায়, হাইড্রোথোরাক্সে সচরাচর দু দিকেই—দু বুকেই সে সব

চিহ্ন পাওয়া যায়। কিন্তু ব্যথা, কিম্বা প্লুরিসির আর কোনও লক্ষণ জানিতে পারা যায় না। হাইড্রোথোরাক্স অর্থাৎ বুকের ভিতর জল-জমার প্রধান লক্ষণই জানিবে হাঁপ। আর কোনও লক্ষণ উপস্থিত থাক না থাক, হাঁপটা সর্ব্বদাই থাকে।

চিকিৎসা—এর আগেই বলিছি যে, য়্যাস্পিরেটর্ দিয়া জল বাহির করিয়া ফেলাই হাইড্রোথোরাক্সের (বুকের ভিতর জল-জমার) চিকিৎসা। কিন্তু আর আর রোগে রোগীর যখন চরম দশা উপস্থিত, তখন বুকের ভিতর থেকে জল বাহির করিবার চেষ্টা করাই বৃথা।

এম্পাইমা——প্লুরার প্রদাহ থেকে পূঁয হইলে অর্থাৎ প্লুরা পাকিলে প্লুরার থলিতে (বুকের খোলের মধ্যে) জলের বদলে পূঁয জমা হয়। একেই ডাক্তরেরা এম্পাইমা বলেন। বাঙ্গালায় বুকের খোলের মধ্যে পূঁয বলে। মেয়েদের চেয়ে পুরুষদের এই ব্যামো (বুকের খোলের মধ্যে পূঁয-জমা হওয়া) বেশী হয়। এম্পাইমা আবার দু রকম। আসল আর নকল। আসল এম্পাইমাতে প্লুরার গা থেকে পূঁয বাহির হয়। নকল এম্পাইমাতে মেটে (লিবর্) কিম্বা ফুস্কোর ফোড়া ফাটিয়া বুকের খোলের মধ্যে পূঁয জমা হয়। পাঁজরের হাড়ের মাঝে মাঝে যে জায়গা আছে তারই একটা জায়গায় পূঁয ঠেলিয়া আসে। বোধ হয়, সেখানে যেন একটা আব হইয়াছে। আঙুল দিয়া টিপিলে সেটা তল্তল্ করে। বাঁ পাঁজরে যদি এই রকম করিয়া পূঁযে ঠেল ধরে, তবে হৃৎপিণ্ডের ঢুব্ঢুব্নির সঙ্গে সঙ্গে ঐ আবেও ঢুব্ঢুব্নি

টের পাওয়া যায়। পূঁযের আবের এই ডুব্‌ডুব্‌নি য়্যানিয়ুরিজমের ডুব্‌ডুব্‌নি বলিয়া ভুল হইতে পারে। কিন্তু ঠাউরে দেখিলে এ রকম ভুল হয় না। কেন না, নিশ্বাস লওয়ার আর নিশ্বাস ফেলার সঙ্গে সঙ্গে পূঁযের ঐ আব বাড়ে আর কমে। রোগী যতবার নিশ্বাস লয়, ওটা ততবার বড় হয়। আর যতবার নিশ্বাস ফেলে, ওটা ততবার কমিয়া যায়। এ ছাড়া, য়্যানিয়ুরিজমে যে রকম ডুব্‌ডুব্‌নি আর জাঁতা তাওয়ার শব্দ শুনিতে পাওয়া যায়, ওতে সে রকম পাওয়া যায় না। য়্যানিয়ুরিজম্ জিনিশটে কি? ধমনীর (রাঙা রক্তের শিরের) এক রকম আব। যে কারণেই হউক, ধমনীর পর্দ্দার কোন জায়গা কম-জোর হইলে রক্তের বেগে আর ভরে সে জায়গাটা ক্রমে বাড়িতে বাড়িতে একটী থলির মত হইয়া যায়। এই যে থলি, একেই ডাক্তরেরা য়্যানিয়ুরিজম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ধমন্যর্ব্বুদ (ধমনীর অর্ব্বুদ অর্থাৎ আব) বলে। যাই হোক্, পূঁয বাহির করা যদি যুক্তি হয়, তবে অস্ত্র করিবার আগে খুব সরু ছুঁই-ওয়ালা য়্যাস্পিরেটর্ সেই পূঁযের আবের মধ্যে চালাইয়া দিয়া, সেটী যথার্থ পূঁযের আব কি না ঠিক্ করিবে। সেটী পূযের আব ঠিক্ হইলে ধারাল বিষ্ট্রি দিয়া বেশ পরিসর করিয়া অস্ত্র করিবে। পকেট-কেসে যে এক রকম লম্বা বাঁকা, সরু অস্ত্র আছে, সেই অস্ত্রকে ডাক্তরেরা বিষ্ট্রি বলেন। যেখানে একটু গভীর করিয়া অস্ত্র করার দরকার, সেই খানেই বিষ্ট্রি ব্যবহার করিতে হয়। অস্ত্র এমন পরিসর করিয়া করিবে যে, অস্ত্রের মুখ যেন সহজে বুজিয়া না যায়। তার পর রবারের নলই হোক্, আর

ক্যাথিটরের মত রূপর নলই হোক্, অস্ত্রের মুখ (ঘা'র মুখ) দিয়া বুকের খোলের মধ্যে চালাইয়া দিবে। (প্রস্রাব করাইবার শলাকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটার্ বলেন)। বুকের ভিতরকার সব পূঁয সেই নল দিয়া বাহির হইয়া আসিবে। নিশ্বাস লইলে বা কাশিলে নল দিয়া বেশী পূঁয পড়ে। নল দিয়া পূঁয-পড়া কমিয়া আসিলে, রোগীকে সেই দিকে কাইত হইতে বলিবে। রোগী যদি ভারি কাহিল আর দুর্ব্বল হয়, তবে সব পূঁয একবারে বাহির না করিয়া দুই তিন বারে বাহির করিবে। সব পূঁয একবারে বাহির করিয়া দিলে রোগী নির্জ্জীব হইয়া পড়িতে পারে—চাই কি, সে ধাক্কা সামলাইতে না পারিয়া মারাও পড়িতে পারে। সব পূঁয বাহির হইয়া আসিলে কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ লোশন্ কিম্বা কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ দিয়া বুকের খোল রোজ দুই তিনবার করিয়া ধুইয়া ফেলিবে। বুকের খোল কেমন করিয়া ধুইয়া ফেলিবে ? যে নল দিয়া পূঁয বাহির করিয়াছ, পিচ্‌কিরি করিয়া ঐ আরোক (কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ লোশন্ বা কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্) সেই নলের ভিতর দিয়া চালাইয়া দিবে। তার পর আবার সেই নল দিয়াই পিচ্‌কিরির জল (আরোক) বাহির করিয়া ফেলিবে। এক এক বারে অনেক খানি আরোক দিয়া বুকের খোল ধুইয়া ফেলা চাই, নৈলে নল দিয়া সে ধোওয়ানি-জল সহজে বাহির করিয়া ফেলা যাবে না। রোজ এই রকম করিয়া বুকের খোল ধুইয়া ফেলিলে পূঁযের দুর্গন্ধ শীঘ্রই যায়। কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্-লোশন্ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।—

কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্	...	...	১ ড্রাম্
পরিষ্কার জল	...	...	২০ ঔন্স (আড়াই পোয়া)

একত্র মিশাইয়া একটা বোতলে রাখ।

পিচ্‌কিরি করিবার আগে পাথরের বাটিতে আরোক ঢালিয়া লইবে। ঢালিবার আগে বোতলটা নাড়িয়া লইবে। শীতকালে কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড্ জমিয়া থাকে। এই জন্যে, তাত্ দিয়া গলাইয়া তবে মাপের গ্লাশে (মেজর গ্লাশে) ঢালিতে হয়। আগুনের তাত্ দিলেও হয়, রৌদ্রে খানিক-ক্ষণ রাখিলেও হয়। আবার জমা কার্ব্বলিক্ য়্যাসিডে একটু জল দিলে সব গলিয়া যায়।

কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড জিনিশটী কি ? কণ্ডি একজন ডাক্তরের নাম। তাঁর একটি আরোক আছে। সেই আরোক তাঁরই নামে চলিত। অনেক অসুদের এ রকম নাম আছে, যেমন ডোবর্স পাউডার—গ্রেগোরিস্ পাউডার—জেম্‌সেস্ পাউ-ডার—ডনোবান্স সলিয়ুশন্।—কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ পর্ম্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ্ থেকে তয়ের হয়। এক ঔন্স ডিষ্টিল্‌ড্ ওয়াটরে বা বৃষ্টির জলে ৮ গ্রেন্ পর্ম্ম্যাঙ্গেনেট্ অব্ পটাশ্ গুলিলে কণ্ডিস্ ফ্লুয়িড্ তয়ের হয়। কণ্ডিস্ ফ্লুয়িডকে কণ্ডিস্ সলিয়ুশন্ও বলে। এই যে কণ্ডিস্ ফ্লুইড্ এরই এক ড্রাম্ ১০ ঔন্স জলের সঙ্গে মিশাইলে চমৎকার লাল রঙ্গের একটি আরোক তয়ের হয়। এই লাল আরোক দিয়া বুকের খোল ধুইয়া ফেলিবে।

বুকের খোলের ভিতর পূঁয জমিলে রোগীকে সবল

রাখিবার জন্যে যত রকম উপায় করিতে পার, তা করিবে। দুধ, মাংসের ক্কাথ, ব্রাণ্ডি, লৌহঘটিত ঔষধ (আয়র্ণ), হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইম্, কড্লিবর্ অইল্, এ সবই দিবে। রোগীকে লৌহঘটিত ঔষধ দেওয়া ভারি দরকার। লৌহঘটিত ঔষধ খুব বেশী মাত্রায় দেওয়া চাই। নইলে তেমন ফল পাওয়া যায় না। লৌহঘটিত ঔষধ বলিলে কি বুঝায়, এর আগে তা অনেক বার বলিছি। বেশী মাত্রায় লৌহ-ঘটিত ঔষধ দেওয়া যেমন দরকার, জায়গা বদ্লানও তেমনি দরকার। তবে জায়গা বদলানর (স্থান পরিবর্ত্তনের) ব্যবস্থা গরীব রোগীদের পক্ষে সোজা নয়।

কখন কখন বুকের খোল-ঢাকা প্লুরায় ঘা হয়। সেই ঘা পাঁজরের মাংস পর্য্যন্ত আসে, কিম্বা সেই ঘায়ে পাঁজরের হাড়ের কোন জায়গা খাইয়া যায়, আর বুকের ভিতর থেকে বাইরে পর্য্যন্ত একটী ছাঁদা বা ফুটো অর্থাৎ নালি ঘা হয়। এই ছাঁদা বা ফুটো দিয়া নিয়ত পূঁষ পড়িতে থাকে। কাশি-লেই পূঁষ দমকে-দমকে বেশী পড়ে। পুরাণ প্লুরিসিতে বহু দিন পর্য্যন্ত এই রকম করিয়া পূঁষ পড়ে। আবার ফুস্ফো ঢাকা প্লুরাও ছাঁদা হইয়া যাইতে পারে। আর সেই ছাঁদা বায়ুনলির সঙ্গে যোগ হইয়া যাইতে পারে। বায়ুনলি দিয়া পূঁষ বাহির হইয়া গেলেও যদি ছাঁদা থাকিয়া যায়, তবে ঐ ছাঁদাটীকে বায়ুনলির নালি-ঘা বলা যায়। ডাক্তরেরা এই নালি-ঘাকে ব্রংকিয়েল্ ফিস্চুলা বলেন। এই রকম করিয়া যে পূঁষ উঠে, সচরাচর তা বড়ই দুর্গন্ধি।

পুরাণ প্লুরিসিতে বুকের খোলে পূঁষ হইলে, রোগী

প্রায়ই ক্ষয়কাশে কিম্বা ক্ষয়-জ্বরে মরে। ক্ষয়কাশকে ডাক্তরেরা থাইসিস্ বলেন। ক্ষয়-জ্বরকে তাঁরা হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলেন। থাইসিস্ আর হেক্‌টিক্ ফীবরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

ছেলেদের প্লুরিসি হইলে বুকের গড়ন খারাপ হইয়া যায়। কিন্তু তাতে তাদের নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোন ব্যাঘাত ঘটে না। বেশী বয়সে প্লুরিসি হইলে একটু হাঁপ থাকিয়া যায়। আর বারে বারে প্লুরিসি হইয়া যাদের প্লুরিসির ধাত (ধাতু) হইয়াছে, সামান্য কারণেই তাহাদের প্লুরিসি হয়।

য়্যাস্পিরেটর্ দিয়া বুকের খোলের ভিতর থেকে জল বাহির করিবার কথা বলিবার সময়, বুকের খোলে পূঁয জমা হওয়ার (এম্পাইমার) কথা আর তার চিকিৎসা আর এক বার ভাল করিয়া বলিব।

৪। পেট-নাবা—পেট-নাবার ভাল কথা অতিসার। ডাক্তরেরা পেট-নাবাকে ডায়ারীয়া বলেন। জ্বরে পেট নাবিলে আমাদের বৈদ্যরা সে পেট-নাবাকে জ্বরাতিসার বলেন। জ্বরাতিসারকে বৈদ্যরা বড়ই ডরান। পূর্ব্বে স্বল্প-বিরাম জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) যে ১৮ রকম উপসর্গের নাম করিছি, পেট-নাবা তার মধ্যে একটী। এই জন্যে, সেখানে পেট-নাবাকে জ্বরাতিসার বলিতে হবে। এর আগে অনেক বার বলিছি যে, ঐ সব রোগ জ্বরের উপসর্গও হইতে পারে, আসল রোগও হইতে পারে। উপসর্গ হইলেও তাদের যে চিকিৎসা, আসল হইলেও সেই চিকিৎসা। আসল হইলে, কেবল সেই রোগটীরই চিকিৎসা করিলে

রোগী ভাল হয়। উপসর্গ হইলে দুয়েরই চিকিৎসা সমান চাই। আসল রোগেরও চিকিৎসার যেমন দরকার, উপসর্গেরও চিকিৎসার তেমনি দরকার। দু দিকই একবারে থ্যাকান চাই। নৈলে রোগীকে শীঘ্র ভাল করিতে পারিবে না।

অমুকের পেট নাবিতেছে বলিলে কি বুঝায়? সে বারে বারে পাতলা বাহ্যে যাইতেছে, এই বুঝায়। বাহ্যে আধ-পাতলাও হইতে পারে, খুব পাতলাও হইতে পারে। বাহ্যে যত বেশী পাতলা হয়, রোগী তত শীঘ্র কাবু হইয়া পড়ে। এই জন্যে, পেট-নাবার কথা শুনিলে রোগীর কি রকম বাহ্যে হইতেছে, আগে জিজ্ঞাসা করিবে। পেট-নাবাকে ভেদও বলে। ভেদ হইতেছে বলিলেও যা বুঝায়, পেট-নাবিতেছে বলিলেও তাই বুঝায়। পেটের ব্যামো হইয়াছে বলিলে পেট-নাবাও বুঝায়, আমাশাও বুঝায়, রক্ত-আমাশাও বুঝায়। পেট-নাবা, ভেদ, অতিসার, আর ডায়ারীয়া এ চারিই এক। এ চারিটী কথাই মনে করিয়া রাখা চাই। কেন না, কখন বা পেট-নাবা বলিব, কখন বা ভেদ বলিব, কখন বা অতিসার বলিব, কখন বা ডায়ারীয়া বলিব। ডায়ারীয়া ডাক্তরি কথা। কিন্তু যাঁরা লেখা পড়া জানেন, তাঁদেরও মধ্যে এ কথাটা আজ্ কাল খুব চলিত হইয়াছে।

পেট নাবা, ভেদ অর্থাৎ ডায়ারীয়া—পাঁচ রকম।

(১) অপাকের পেট-নাবা। (২) পিত্ত-ভেদ। (৩) আমাশা। (৪) জলবৎ ভেদ। (৫) শঙ্কার ভেদ। এখন এই পাঁচ রকম ডায়ারীয়ার কথা এক এক করিয়া বলিব।

(১) অপাকের পেট-নাবা—শরৎকাল আর গ্রীষ্মকালের শেষে এই রকম পেট-নাবা খুবই সাধারণ। ধরিতে গেলে, খুব গ্রীষ্মেরই দরুণ এ রকম পেটের ব্যামো হয়। কিন্তু আবার বেশী ফল ফুলরি, বিশেষ শসা, তরমুজ, খাইলে এ রকম পেটের ব্যামো হয়।

এর চিকিৎসা খুব সহজ। পূর এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল্ খাওয়াইয়া দুষ্ট অজীর্ণ জিনিশ সব বাহির করিয়া দিবে। যদি পেটকামড়ান বেশী রকম থাকে, তবে ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই) দিবে।

(২) পিত্ত ভেদ—এতে কেবল পিত্ত রেচে যায়, অর্থাৎ কেবল পিত্ত বাহ্যে হয়। পিত্তের সঙ্গে মল থাকে না, তা নয়; তবে পিত্তের ভাগই বেশী। বৈদ্যরা একে পিত্তাতিসার বলেন। ডাক্তরেরা বিলিয়স্ ডায়ারীয়া বলেন। আমাদের দেশে যে সব সাহেব বাস করেন, তাঁহাদেরই পিত্ত ভেদ খুব বেশী হইয়া থাকে। আমাদের দেশের মত গরম দেশে যে পরিমাণ মাংস খাইলে শরীর স্বচ্ছন্দ থাকে, তার চেয়ে বেশী মাংস খাইলে পিত্ত ভেদ হয়। গরম দেশে বেশী মাংস খাইলে পিত্ত বৃদ্ধি হয়। এই পিত্ত অন্ত্রের মধ্যে আসিলে, আর কি, পিত্ত-ভেদ হয়।

চিকিৎসা——পিত্ত-ভেদ হঠাৎ বন্ধ না করিয়া দুই এক দিন হইতে দিলে, লিবরের (যকৃতের—মেটের) মধ্যে পিত্ত-জমা সারিয়া যায়। পিত্ত-ভেদের সঙ্গে পেটে যদি ব্যথা থাকে, তবে ১০ ফোটা লডেনমের সঙ্গে ১৫ গ্রেন্ কি ২০ গ্রেন্ বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডা দিবে। তার পর, রোগীর

পথ্যের ধরাধর করিবে। মাছ মাংসের বদলে তাকে তর-কারি দিয়া ভাত খাইতে বলিবে। এ ছাড়া, পাকা ফলও খাইতে বলিবে। মদ ছুঁইতেও দিবে না।

(৩) আমাশা—আমাশাকে বৈদ্যরা আমাতিসার বলেন। ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ ডায়ারিয়া বলেন। আমাশাকে আম-ভেদও বলা যায়। আমাশা হইলে রোগী বারে বারে বাহ্যে যায়। বাহ্যে বেশী হয় না—কেবল আম নির্গত হয়। বাহ্যের বেগ হইলে থাকা যায় না—তখনই বাহ্যে যাইতে হয়। আবার বাহ্যে বসিয়া বাহ্যে হয় না; কেবল একটু আম নির্গত হয়। বাহ্যে গিয়া অনেকক্ষণ বসিয়া থাকিতে হয়। বারে বারে বেগ দিতে হয়। বেগ দিলেই আম নির্গত হয়। বাহ্যে বসিবার আগেও যে অসুখ, বাহ্যের পরও সেই অসুখ;—বরং বেশী বৈ কম নয়। আমাশার লক্ষণই এই। আমাশা বড় খল রোগ। আমাশার রোগীর কষ্টের সীমা নাই। কখন কখন সর্দ্দি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই, কখন কখন তার পরই আমাশা হয়। খুব সামান্য শীত বাত ভোগ করিলেও অনে-কের আমাশা হয়। যে কারণেই হোক্, বেশী অপাক হই-লেই, পেট নাবে। অনেকবার পেট নাবিলে, শেষে এই আমাশা দেখা দেয়। খুব কড়া জোলাপ লইলেও জোলাপ খোলার পর এই রকম আমাশা হয়। রক্ত-আমাশা হইবার আগে এই রকম আমাশা হইয়া থাকে। আমাশা বড়ই ধারণ রোগ। আমার কখনও আমাশা হয় নাই—আমাশা কাকে বলে আমি জানি না—এ কথা বোধ করি কেউ বলিতে পারেন না। আজ রাত্রে খাইয়া বা খারাপ জিনিশ

খাইয়া তোমার অপাক হইল। রাত্রে ভাল ঘুম হইল না। ভোরে ২।৩ বার খুব পেট নামিল। তার পর বারে বারে বাহ্যে যাইতে লাগিলে—ফি বারেই আম নির্গত হইতে লাগিল। এই রকম করিয়াই আর কি আমাশা জন্মিল।

পেটের মধ্যে যে নাড়ি ভুঁড়ি আছে, ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টেস্‌টিন্স বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্র বলে। অন্ত্র দু রকম। ছোট আর বড়। ছোট অন্ত্রকে ডাক্তরেরা স্মল্‌ ইণ্টেস্‌টিন্‌ বলেন। বড় অন্ত্রকে লার্জ্‌ ইণ্টেস্‌টিন্‌ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় বড় অন্ত্রকে বৃহদন্ত্র (বৃহৎ অন্ত্র) বলে। ছোট অন্ত্রকে ক্ষুদ্রান্ত্র (ক্ষুদ্র অন্ত্র) বলে। যা আহার কর, প্রথমে পেটে যায়। পেটে আধ-হজম হইতে তিন ঘণ্টা লাগে। পেটকে ডাক্তরেরা ষ্টমাক্‌ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় পাক-স্থলীও বলে, জঠরও বলে। তার পর ছোট অন্ত্রের মধ্যে যায়। ছোট অন্ত্রের মধ্যে প্রায় সব হজম হইয়া যায়। শেষে অবশিষ্ট যা কিছু থাকে, বড় অন্ত্রের মধ্যে যায়। বড় অন্ত্রের মধ্যে যা কিছু হজম হইবার, হইয়া গেলে, শেষ যা থাকে, তাকেই মল বলে। বড় অন্ত্রের সব নীচে দিকে মল জমিয়া থাকে। তার পর সময় মত বাহির হইয়া যায়। যদি খুব বেশী করিয়া খাও, কিম্বা সহজে পরিপাক হয় না এমন কোন জিনিশ খাও, তবে ছোট অন্ত্রে দস্তুর মত হজম হইতে না পারিয়া, ছোট অন্ত্র ও বড় অন্ত্র এ দুয়েরই পীড়া উপস্থিত করে। যদি বল অন্ত্রের আবার পীড়া কি? পেটের ব্যামো-তেই অন্ত্রের পীড়ার পরিচয়। ছোট অন্ত্র, বড় অন্ত্র দুইই মাংসের নল। এই নলের উপর-পিঠ, ভিতর-পিঠ, খুব সরু

পর্দ্দা দিয়া মোড়া। ছোট অন্ত্র বড় অন্ত্রের চেয়ে ঢের লম্বা। আবার বড় অন্ত্র ছোট অন্ত্রের চেয়ে ঢের মোটা। মাপিলে ছোট অন্ত্র ১৩ হাতেরও বেশী লম্বা। বড় অন্ত্র ৪ হাতের বেশী নয়। নলের বাহির-পিঠ ভিতর-পিঠ যে খুব সরু পর্দ্দা দিয়া মোড়া বলিলাম, সে পর্দ্দা আবার এক রকম নয়। বাহির পিঠ এক রকম পর্দ্দা দিয়া মোড়া, আর ভিতর-পিঠ আর এক রকম পর্দ্দা দিয়া মোড়া। বুকের খোল আর ফুস্কো যে রকম পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্রের বাহির-পিঠও সেই রকম পর্দ্দা দিয়া মোড়া। প্লুরিসির কথা বলিবার সময় বুকের খোল আর ফুস্কো ঢাকা পর্দ্দার কথা বলিছি। প্লুরার (বুকের খোল আর ফুস্কো-ঢাকা পর্দ্দার) আকার প্রকার যে রকম, ছোট আর বড় অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দার আকার প্রকারও ঠিক্ সেই রকম। কিন্তু ভিতর-পিঠ যে পর্দ্দা দিয়া মোড়া, সে আর এক রকম পর্দ্দা। সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ বলেন। এই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ পর্দ্দাটী বড় কাজের। হজম বল, পরিপাক বল, সবই এর গুণে হয়। এই পর্দ্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই আর কি পেটের ব্যামো হয়। পেট-নাবা বল, আমাশা বল, রক্ত আমাশা বল, সব এই পর্দ্দারই ব্যামো থেকে হয়। খুব বেশী খাইয়াই হোক্, সহজে যা পরিপাক হয় না তা খাইয়াই হোক্, আর যে কোন কারণেই হোক্, এই পর্দ্দার কোন রকম উদ্দীপনা হইলেই পেটের ব্যামো হয়। পেটের ব্যামো বলিলে পেট-নাবাও বুঝায়, আমাশাও বুঝায়, রক্ত-আমাশাও বুঝায়—এ কথা এর আগেই বলিছি। উদ্দীপনাকে ডাক্ত-

রেরা ইরিটেশন্ বলেন। অনেকে বলিবেন উদ্দীপনার অর্থ যেমন বুঝিলাম, ইরিটেশনেরও অর্থ তেমনি বুঝিলাম। সে কথা মিথ্যা নয়। উদ্দীপনার সোজা কথা খুঁজিয়া পাইলাম না বলিয়াই উদ্দীপনা কথা ব্যবহার করিলাম। উদ্দীপনার সোজা কথা নাই, এমন নয়। তবে অন্ত্রের উদ্দীপনা বলিলে বলিলে যা বুঝায়, সে সোজা কথায় তাই বুঝায় কি না বলিতে পারি না। ভাবিয়া লইলে তা বুঝাইতেও পারে। উদ্দীপনার সোজা কথা উস্কে দেওয়া, রাগাইয়া দেওয়া। মনে কর, তোমার গায়ের কোনও জায়গায় আলপিন, ছুঁই কি কাঁটা দিয়া বার কতক আঁচড় দিলে. আঁচড়ের জায়গায় অল্প জ্বালা জ্বালা কেমন এক রকম অসুখ বোধ করিতে লাগিলে। খানিক পরে সেই জায়গাটা একটু যেন রাঙা হইয়া উঠিল। রাঙা হইয়া উঠিল কেন? আঁচড়ের ঘা পাইয়া সে জায়গার চুলের মত সরু শির গুলি যেন রাগিয়া উঠিল, আর তাদের ভিতর রক্ত বেগে আসিতে লাগিল। খানিক পরে, চুলের মত সেই সব সরু শিরের খোল একটু বড় হইল। আগের চেয়ে তাদের ভিতর বেশী রক্ত আসিতে লাগিল। আবার তাদের ভিতরকার রক্তের গতির তেজ আগের চেয়ে ঢের কম হইল। এতেই আঁচড়ের জায়গাটা লাল হইয়া উঠে। শেষে তাদের ভিতর রক্ত চলাচল বন্ধ হইয়া যায়—রক্ত সব জমা হয়। এই সব ঘটনা ডাক্তারেরা ইরিটেশনের (উদ্দীপনার) ফল বলেন। এই রকম করিয়া রক্ত জমিয়া থাকিলে আবার তা থেকে প্রদাহ হয়। প্রদাহকে ডাক্তারেরা ইনফ্ল্যামেশন্ বলেন। এ কথা এর আগে

অনেক বার বলিছি। তবেই দেখ, সব প্রথম উদ্দীপনা (ইরিটেশন্), আর সব শেষ প্রদাহ (ইনফ্ল্যামেশন্)। তার পর বলি। গায়ের কোন জায়গায় আলপিন, ছুঁই, বা কাঁটার আঁচড় দিলে সে জায়গায় যেমন উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হয় বলিলাম, খুব বেশী খাইলে, কিম্বা হজম করা শক্ত এমন কোন জিনিশ খাইলে, অন্ত্রের ভিতর পিঠ-ঢাকা পর্দ্দার (মিউকস্ মেম্ব্রেনের) তেমনি উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হয়। ঐ পর্দ্দার অল্প স্বল্প উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইলে, দু চারি বার পেট নাবিয়া গেলেই তা ক্ষান্ত হয়। হজম না হইয়া অন্ত্রের মধ্যে যা জমিয়া ছিল, তা বাহির হইয়া গেলেই উদ্দীপনা আপনিই সারিয়া যায়। উদ্দীপনা বেশী রকম হইলে, হজম না হইয়া অন্ত্রের মধ্যে যা জমিয়া থাকে, তাহা বাহির হইয়া গেলেও সে উদ্দীপনা থামে না। এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর-পিঠ ঢাকা পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মিউকস্ মেম্ব্রেন্ বলেন। মিউকস্ মেম্ব্রেন্‌কে ভাল বাঙ্গালায় শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি বলে। শ্লেষ্মাকে ডাক্তরেরা মিউকস্ বলেন। ঝিল্লিকে তাঁরা মেম্ব্রেন্ বলেন। ঐ রকম পাতলা পর্দ্দাকে ভাল বাঙ্গালায় ঝিল্লি বলা যায়। মোটা-মুটি ধরিলে আমাদের শরীরে দু রকম সরু পর্দ্দা (ঝিল্লি) আছে। এক রকমের নাম সিরস্ মেম্ব্রেন্। আর এক রকমের নাম মিউকস্ মেম্ব্রেন্। প্লুরার কথা বলিবার সময় সিরস্ মেম্ব্রেনের কথা বলিছি। সিরস্ মেম্ব্রেন্ কোন্ কোন্ জায়গায় আছে, আর তার দরকারই বা কি, প্লুরার কথা বলিবার সময় সে সব কথাও বলিছি। যে সব যন্ত্র শরীরের ভিতরে থাকে অথচ

তাদের মুখ বাইরে, সে সব যন্ত্রের ভিতর-পিঠ মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ দিয়া মোড়া। সে সব যন্ত্র কি কি ? সে একটা আধটি নয়,—অনেক যন্ত্র। তাদের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। সে সব যন্ত্রের মধ্যে অন্ত্রই প্রধান। শরীরের মধ্যে আহার যাইবার দুওর, আর শরীর থেকে আহারের অসার ভাগ বাহির হইয়া যাইবার দুওর, এই দুটী দুওর দুমুড়োয় ; আর এর মাঝখানে গলার নলি, পেট (পাকস্থলী) ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্র। প্রথমে আহার মুখে লও, তার পর চিবাও, শেষে গিলিয়া ফেল। গিলিলে চিবন আহার গলার নলি দিয়া পেটে গিয়া পড়ে। গলার নলিকে ডাক্তরেরা ইসফেগস্ বলেন। পেট (পাকস্থলী) থেকে ঐ আধহজম আহার ছোট অন্ত্রে যায়। ছোট অন্ত্রে প্রায় সব হজম হইয়া যায়। যা কিছু হজম হইতে বাকী থাকে, তা বড় অন্ত্রে যায়। শেষে আহারের অসার ভাগ (মল) বড় অন্ত্র থেকে গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। তবেই দেখ, মুখ থেকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সমস্তটা একটা পথ। পেটের (পাকস্থলীর) দুটো মুখ। (পেট—পাকস্থলী ঠিক্ যেন ছোট একটা ভিস্তি) গলার নলীর সঙ্গে আর উপরকার মুখের সঙ্গে যোগ। ছোট অন্ত্রের সঙ্গে আর নীচেকার মুখের সঙ্গে যোগ। আবার বড় অন্ত্রের সঙ্গে আর ছোট অন্ত্রের সঙ্গে যোগ। তাতেই বলিতেছি, ঠোঁট থেকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত সব একট্যানা। ঠোঁট যে মিউকস্ মেম্ব্রেন্ (শ্লৈষ্মিক ঝিল্লি) দিয়া ঢাকা, মুখের ভিতর, গলার নলির ভিতর, পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর, ছোট অন্ত্রের ভিতর, আর বড় অন্ত্রের ভিতরও সেই মিয়ুকস্

মেম্ব্রেন্ দিয়া ঢাকা। নাকের ভিতর, গলার চুঙির ভিতর, ফুস্ফোর নলিগুলির ভিতরও সেই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ দিয়া ঢাকা। যে জায়গারই কেন মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্ হোক্ না, কোন কারণে তার উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইলে, তার গা থেকে এক রকম জিনিশ বাহির হয়। সে জিনিশকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় তাকে শ্লেষ্মা বলে। আমাদের শ্লেষ্মা, আর ডাক্তরদের মিয়ুকস্, দুইই এক, এ কথাটা যেন মনে থাকে। জায়গা-বিশেষে আবার সেই এক শ্লেষ্মারই আলাদা আলাদা নাম। যেমন, নাক দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে কফ বলে। মুখ দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে লাল (লালা) বলে। বাহ্যে করিবার সময় অন্ত্র দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে আম বলে। এই জন্যে যে পেটের-ব্যামোতে বাহ্যের সঙ্গে বারে বারে আম নির্গত হয়, তাকে আমাশা বলে। সেই আমের সঙ্গে যদি রক্ত থাকে, তবে সে পেটের-ব্যামোকে রক্ত-আমাশা বলে। রক্ত-আমাশার কথা এর পরই বলিব।

চিকিৎসা—এই মাত্র বলিছি যে, আমাশা হইলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়াছে ঠিক্ করিবে। উদ্দীপনার কারণ যদি ঠিক্ করিতে পার, আর সেই কারণ দূর করিতে পার, তবেই আমাশার রোগী ভাল করিতে পারিবে। খুব বেশী খাইয়া কিম্বা খারাপ জিনিশ খাইয়া যদি পেটের-ব্যামো হইয়া থাকে, তবে খুব পেট-নাবিয়া গিয়াছে কি না, অর্থাৎ দুষ্ট মল ঢের বাহির হইয়া গিয়াছে কি না, আগে জানিবে। যদি বল, দুষ্ট মল

তা কেমন করিয়া জানিব ? তা জানা শক্ত নয়। অপাক অজীর্ণ, অবচার খাদ্যেকেই দুষ্ট মল বলে। দুষ্ট মল বেশী বাহির না হইয়া যদি আমাশা দেখা দেয়, তবে সেই দুষ্ট মল বাহির করিয়া দিবার জন্যে ক্যাষ্টর্ অইলের একটা জোলাপ দিবে। জোলাপ বেশ খুলিলে, তবে আমাশার চিকিৎসা করিবে। অনেক জায়গায় জোলাপ খোলার পর আমাশা আপনিই ভাল হইয়া যায়। আর কোনও অসুদ বিসুদ দিতে হয় না। দুষ্ট মল সব রেচে গেলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা আপনিই সারিয়া যায়। ক্যাষ্টর্ অইল্ একবারে আধ ছটাক (এক ঔন্স) খাইতে হয়। খুব গরম (মুখে যা সয়) দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে ক্যাষ্টর্ অইল্ খাইতে কোন কষ্ট হয় না। ওর গন্ধও বড় একটা জানিতে পারা যায় না। ওর আটা ভাবও ঢের কমিয়া যায়।

মনে কর, আপনিই পেট-ন্যাবিয়া দুষ্ট মল সব রেচে গিয়াছে : কিম্বা ক্যাষ্টর্ অইলের জোলাপ দিয়া তার দুষ্ট মল রেচিয়া দেওয়া হইয়াছে ; কিন্তু তার আমাশা সারে নাই। এখন কি করিবে ? এখন তাকে কি অসুদ দিবে ? অসুদ দিয়া আর তদ্বির করিয়া তার আমাশা যদি শীঘ্র সারিয়া না দেও, তবে তার রক্ত-আমাশা হবে। শুদু আমাশার চেয়ে রক্ত-আমাশা ঢের শক্ত রোগ। শুদু আমাশার বাড়াবাড়ি না হইলে আর রক্ত-আমাশা হয় না।

এর আগেই বলিছি, যে কারণেই হোক্ অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) না ঘটিলে শুদু আমাশা বা রক্ত-আমাশা হয় না। এই উদ্দীপনা

দূর করিতে না পারিলে, হাজার অস্যুদ দেও, আমাশা কিছু-তেই ভাল হয় না। এখন দেখ, এই উদ্দীপনার কোনও অস্যুদ আছে কি না? আছে—ভাল অস্যুদই আছে। দুষ্ট মল সব রেচে গেলে, রোগীকে ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিবে। বিস্মথ্ সব রকম পেটের-ব্যামোরই খুব ভাল অস্যুদ। বিস্মথ্ শুদ্ধ ধারক নয়; অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিউকস্ মেম্ব্রেনের) উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) শান্তি করে। বিস্মথ্ ছাড়া রোগীকে আর একটা অস্যুদ দেওয়া চাই। সে অস্যুদটা কি? স্যালিসীন্। সিংকোনার ছাল থেকে যেমন কুইনাইন্ তয়ের হয়, উইলো বলিয়া এক রকম গাছ আছে, তার ছাল থেকে তেমনি স্যালিসীন্ তয়ের হয়। কুইনাইনের অনেক গুণ স্যালিসীনে আছে। এই জন্যে, জায়গা বিশেষে কুইনাইনের বদলে স্যালিসীন্ ব্যব-হার হয়। যদি কোন কারণে শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) অবস্থা খারাপ হয়, তবে রোগীকে স্যালিসীন্ খাওয়াইলে তা শুধ্রে যায়। স্যালিসীনের এই একটা বিশেষ গুণ। বিশেষ গুণই বল, আর বিশেষ ক্ষমতাই বল, স্যালি-সীন্ ছাড়া আর কোন অস্যুদের এ গুণ আছে কি না বলিতে পারি না। যদি বল, শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) আবার খারাপ অবস্থা কি রকম? শরীরের মধ্যে যে সব যন্ত্র আছে, যে কোন কারণে হোক্, তাদের সহজ অবস্থার তফাত হইলে, তাদের খারাপ অবস্থা বলিতে পারা যায়। পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না—পেটনাবাই হোক্, শুদ্ধ আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক্,

অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্‌ব্রেনের) সহজ অবস্থার তফাত না হইলে আর এ সব রোগের সৃষ্টিই হইতে পারে না। পেটের ব্যামো হইয়াছে বলিলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেমব্রেনের) সহজ অবস্থার তফাত হইয়াছে আগে বুঝায়। না বুঝাইবে কেন ? অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিরই গুণে পরিপাক হয়। সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থার তফাত না হইলে আর পরিপাকের ব্যাঘাত ঘটিতে পারে না। এ দিকে আবার পরিপাকের ব্যাঘাত না ঘটিলে কোনও রকম পেটের ব্যামোই জন্মিতে পারে না। এই জন্যে, সব রকম পেটের-ব্যামোতেই অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির অবস্থা আগে খারাপ হইয়াছে ঠিক্ করিবে। কাজেই, সে শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা যত দিন না হয়, পেটের-ব্যামো একবারে নির্দ্দোষ হইয়া সারে না। তাতেই বলিতেছি, পেটের-ব্যামো যাতে সারে, সে অসুদ ত দেওয়া চাই-ই ; অন্ত্রের শ্লেষ্ম-ঝিল্লির যাতে আবার সহজ অবস্থা হয়, তারও উপায় করা চাই। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন্, অমন উপায় আর নাই। স্যালিসীন্ শ্লেষ্মা ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে। যদি বল, শ্লেষ্মা-ঝিল্লির আবার বল কি ? বল সকল যন্ত্রেরই আছে। বল না থাকিলে কোনও যন্ত্রেরই কাজ হইতে পারে না। সহজ বেলায় যে যন্ত্রের কাজ হয়, সেই যন্ত্রের সেই বল থাকার জন্যেই সে কাজ হয়। ব্যামো হইলে সে বলের তফাত হয়। কাজেই সহজ বেলার মত সে যন্ত্রের কাজ হয় না। সহজ বেলায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল যখন ঠিক্ থাকে, তখন নিয়ম মত বেশ পরিপাক হয়। কিন্তু ব্যামো হইয়া

সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল কমিয়া গেলে, তেমন পরিপাক আর হয় না। আবার অসুদ বিসুদ দিয়া সহজ বেলার মত পরিপাক শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল করিয়া দিলে, তবে সহজ বেলার মত পরিপাক হয়। তার পর বলি। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন্, তেমন উপায় আর নাই। শুদ্ধ আমশা ভাল করিবার জন্যে বিস্মথ আর স্যালিসীন্ ছাড়া আর কোনও অসুদ দিবার দরকার প্রায়ই হয় না। কিন্তু রোগী যদি পথ্যের খুব ধরাধর না করে, তবে তোমার বিস্মথেও কিছু করিতে পারিবে না—স্যালিসীনেও কিছু করিতে পারিবে না। আহারের দোষেই আমাশা হইয়াছে, পথ্যের ব্যবস্থা করিবার সময় এটা যেন মনে থাকে। যে কদিন আমাশা নির্দ্দোষ হইয়া না সারিবে, সে কদিন রোগী খুব সাবধানে লঘু আহার করিবে। লঘু আহার কি? ভাত, দাল, মাচ, তরকারি লঘু আহার নয়। যে আহার খুব সহজে পরিপাক হয়, অথচ গায়ে বল হয়, তাহাকে লঘু আহার বলে। আর সেই আহারই রোগীর উপযুক্ত আহার। রোগীর আহার বলিলেই লঘু আহার বুঝায়। লঘু আহার আর কি? সাগু, য়্যারারুট, যবের মণ্ড (বার্লি), মাংসের ক্বাথ, এই চারি রকম লঘু আহারই চলিত। রোজ সকালে আর বৈকালে দশ গ্রেন্ করিয়া স্যালিসীন খাইলে, আর ৩। ৪ ঘণ্টা অন্তর ১৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ খাইলে, আর আহারের এ রকম ধরাধর করিলে, তিন চারি দিনের মধ্যেই আমাশা সারিয়া যায়। বিস্মথ্ আর স্যালিসীনে যদি আমাশার শূলনি [illegible] বারে বারে বাহে যাওয়ার ইচ্ছা না কমে,

কি একেবারে না যায়, তবে টিংচর্ ওপিয়াই (লডেনম্) আর মিয়ুসিলেজ (গঁদভিজের জল) গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। রোজ রাত্রে শুইবার সময় একবার করিয়া এই অমুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেই হয়। এ ছাড়া, যখন বেশী শূলনি হবে, তখনও পিচ্‌কিরি দিবে। পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণের জন্যে, পূর্ব্বে যে ঔষধ লিখিয়া দিইচি, এখানেও সেই অমুদ সেই রকম করিয়া তৈয়ার করিয়া, আর সেই রকম কাচের পিচ্‌কিরি করিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে।

পেটের ব্যামো হইলে—তা যে রকম পেটের-ব্যামোই কেন হোক্ না—আহারের যেমন ধরাধর করা চাই, স্নানেরও তেমনি ধরাধর করা চাই। নৈলে ব্যামো বাড়ে বৈ, কমে না। আমাদের দেশের পোনর আনা উনিশ গণ্ডা লোকের বিশ্বাস, স্নান না করিলে পেটের-ব্যামো সারে না। পেটের-ব্যামো হইলে বলে পেট গরম হইয়াছে। পেট গরম হইয়াছে ভাবিয়া পেট ঠাণ্ডা করিবার জন্যে হিম জলে স্নান করে; চিনির শর্ব্বত, মিছরির শর্ব্বত খায়; তপ্ত ভাত ঠাণ্ডা জলে ধুইয়া সেই ভাত সাঁজো দৈ বা ঘোল দিয়া খায়। আমাদের দেশের লোকের পেটের ব্যামোর চিকিৎসাই এই। চিকিৎসার ফলও মন্দ নয়। এ চিকিৎসায় ব্যামো বাড়ে বৈ কমে না। এতে ব্যামো বাড়িবে না ত আর কিসে বাড়িবে? অপাক না হইলে পেটের-ব্যামো হয় না, কিন্তু আমরা ভাবি পেট গরম হইয়া পেটের-ব্যামো হয়। লঘু আহার না করিলে পেটের-ব্যামো সারে না। কিন্তু আমাদের ব্যবস্থায়

দৈ দিয়া, ঘোল দিয়া ভাত না খাইলে পেটের-ব্যামো সারে না। আমাদের অনেক ব্যবস্থাই এই রকম। সর্দ্দি হইলে কফ ঝরিয়া পড়িবে বলিয়া ঠাণ্ডা জলে স্নান করি। এতে কম লাভ হয় না। সামান্য সর্দ্দির বদলে শক্তরোগ (কাশ) হয়। স্নানের ব্যবস্থায় পেটের-ব্যামোও ঠিক্ ঐ রকম হয়। সামান্য রকম পেট-নাবা থাকে ত বেশী পেট নাবে। শুধু আমাশা থাকে ত রক্ত-আমাশা হয়। আমাদের বৈদ্যরা বলেন, অসুস্থ শরীরে স্নান করিলে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়। এর আগেই বলিছি যে, সেই এক শ্লেষ্মা-ঝিল্লি (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন্) থেকে শ্লেষ্মার সৃষ্টি হয়। কিন্তু জায়গাবিশেষে শ্লেষ্মার আলাদা আলাদা নাম। যেমন মুখ দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে লাল (লালা) বলে। নাক দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে কফ্ বলে। মলের সঙ্গে অন্ত্র দিয়া যে শ্লেষ্মা পড়ে, তাকে আম বলে। কাজেই, যাতে শ্লেষ্মা বৃদ্ধি হয়, তাতেই আমাশা বাড়ে। শুধু আমাশা বলিয়া নয়, তাতে পেটের-ব্যামো মাত্রেই বাড়ে। এই জন্যে শর্দ্দি, কাশি হইলে যেমন হিম বাত ভোগ, হিম জলে স্নান নিষেধ, পেটের-ব্যামোতেও ওসব তেমনি নিষেধ। শর্দ্দি, কাশি হইলে গরম কাপড়, গরম জামা গায়ে দিয়া যেমন গরমে থাকিতে হয়, পেটের-ব্যামো হইলে গরম কাপড় চোপড় দিয়া পেটটা তেমনি গরমে রাখিলে ভাল হয়। হিম বাত ভোগ করিলে, যে কেবল কফই হয়, তা নয়; অনেক জায়গায় পেট নাবে, আমাশাও হয়। তবেই জানিয়া রাখ, কফ যেমন নাকের ভিতরকার শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সর্দ্দির ফল, পেট-নাবা কিংবা

আমাশা তেমনি অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সর্দ্দির ফল—পেটের-ব্যামোর ব্যবস্থা করিবার সময় এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। তা হইলে হিম বাত ভোগ আর স্নান যে খুব নিষেধ, তা বলিয়া দিতে কখনও ভুল হবে না।

(৪) জলবৎ ভেদ—জলবৎ ভেদকে ডাক্তারেরা সিরস্ ডায়ারীয়া বলেন ; ওয়াটিরি ডায়ারীয়াও বলেন। উদরী-রোগে কখন কখন আপনা হতেই জলবৎ ভেদ হয়। এ রকম জলবৎ ভেদে অপকারের চেয়ে উপকার বেশী। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) ভিতর দিয়া রক্ত থেকে জল এই রকম করিয়া বাহির হইয়া গেলে, উদরীর জল ক্রমে সব গায়ে শুষে যায়। কাজেই, জলবৎ ভেদ হইয়া উদরী রোগই সারিয়া যায়। এই জন্যে, উদরী রোগীর জলবৎ ভেদ হইলে, অসুদ দিয়া তা বন্ধ করিবে না। বরং সে ভেদ হঠাৎ যাতে বন্ধ না হয়, তা করিবে। মাঝে মাঝে খানিক খানিক গরম জল (বেশ গরম) চুমুক দিয়া খাইলে ভেদ হঠাৎ বন্ধ হয় না। কিন্তু জলবৎ ভেদ খুব বেশী হইলে, অসুদ দিয়া তা বন্ধ করা চাই। নৈলে অত ভেদ হইলে যে রোগী একবারে কাবু হইয়া পড়িবে। কোন কোন জোলাপে এই রকম জলবৎ ভেদ হয়। কম্পাউণ্ড জোলাপ পাউডর, ইলেটিরিয়ম্ জয়পাল—এই সব জোলাপে জলবৎ ভেদ হয়। জলবৎ ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও অনেক আছে। এ সব এর পর ভাল করিয়া বলিব। যে সব রোগে ভারি ঘাম হয়, (যেমন ক্ষয়কাশ-রোগে), সেই সব রোগে ঘামের বদলে এই রকম জলবৎ ভেদ হয়। ওলাউঠা রোগে যে ভয়ানক

জলবৎ ভেদ হয়, তা আমাদের দেশের লোকের কারুই জানিতে বাকী নাই।

চিকিৎসা—তার পর চিকিৎসার কথা এখন বলি। জলবৎ ভেদ যদি খুব বেশী হয়, তবে তা বন্ধ করিবার উপায় কি? উপায় আছে—বেশ সহজ উপায়ই আছে। নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সেই অসুদটী নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে খুব শীঘ্রই ভেদ বন্ধ হইয়া যায়।

গ্যালিক্ য়্যাসিড্	... ...	১ ড্রাম্
ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্	...	১ ড্রাম্
টিংচর ওপিয়াই (লডেনম)	...	১ ড্রাম্
য়্যাকুই য়্যানিথাই (ডিল ওয়াটর)	...	৬ ঔন্স

পুরাইয়া একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। যতবার বাহ্যে যাবে, ততবার এক দাগ করিয়া অসুদ খাবে। অসুদ ঢালিবার আগে শিশিটা বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। ফি বারে অসুদ নাড়িয়া খাইতে হবে। কেন না, জলে গ্যালিক্ য়্যাসিড্ গোলে না। স্নান আহারের যে রকম ব্যবস্থা এর আগে বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম ব্যবস্থা করিবে।

(৫) শঙ্কার ভেদ—শঙ্কার ভেদকে ডাক্তরেরা সিম্প্যাথেটিক্ ডায়ারীয়া বলেন। গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকদের প্রথমে বমি হয়। এই বমি সকাল বেলাই বেশী হয়। এই জন্যে এই বমিকে ডাক্তরেরা মর্ণিং সিক্‌নেস্ বলেন। ছেপ্-উঠা, গা ঝ্যাকার-ন্যাকার করা, আর ঝ্যাকার হওয়া গর্ভের প্রথম লক্ষণ। কোন কোন পোয়াতির ঝ্যাকার না হইয়া তার

বদলে পেট নাবে। দাঁত উঠিবার সময় শিশুদের প্রায়ই পেট নাবে। ভয়, রাগ, শোক কি দুঃখ হইলেও কখন কখন পেট নাবে। অনেক জায়গায় দেখা যায়, ভয় হইবামাত্র পেট নাবে। অনেকেই জানেন, পরীক্ষা দিতে গিয়া অনেক ছাত্র পেটের-ব্যামো করিয়া বাড়ী ফিরিয়া আসেন। এ রকম পেটের-ব্যামো যে শুদ্ধ ভয়েতেই হয়, তা বলা বাহুল্য। যাদের স্বভাবই ঋজু, যারা অল্পতেই ভয় পায়, তাদেরই এই রকম পেটের-ব্যামো হয়। এই কয় রকম পেটের-ব্যামোকে শঙ্কার পেটের-ব্যামো বলে। আফিং-ঘটিত যে সে একটা অসুদ দিলেই এ রকম পেটের-ব্যামো সারিয়া যায়। আফিং ঘটিত অসুদের মধ্যে পল্‌ব্‌ ক্রিটি কো কম্‌ ওপিও অর্থাৎ কম্পাউণ্ড্‌ চক্‌ পাউডর্‌ উইথ্‌ ওপিয়ম্‌ সব চেয়ে ভাল। এই ঔষধ ১৫ গ্রেন্‌ একবার কি দুবার খাইলেই পেটের-ব্যামো সারিয়া যায়।

পেট নাবার কারণ এক নয় বলিয়া, চিকিৎসাও এক হইতে পারে না। এই জন্যে, গোড়া থেকে রোগের পরিচয় লইয়াই হোক্‌, আর রোগীর মল পরীক্ষা করিয়াই হোক, রোগের আসল কারণ ঠিক্‌ করিয়া তবে পেট নাবায় অসুদ দিবে।

পেট নাবার যে ভাগ বিলি বলিলাম, অনেক ডাক্তর তা পছন্দ করেন না। পছন্দ করুন আর না করুন, ভাগ বিলি গুলি জানিয়া রাখা মন্দ নয়।

কারণ—এখন পেট-নাবার কারণ বলি। পেট-নাবার অনেক কারণ। খুব বেশী করিয়া খাওয়া কিংবা খুব খারাপ

জিনিশ খাওয়া, পেট-নাবার এই দুটাই সব চেয়ে সাধারণ কারণ। কাঁচা ফল ফুলুরি খাইলে পেট নাবে। খুব বেশী করিয়া পাকা ফল খাইলেও পেট নাবে। সহজে যা হজম হয় না, তা খাইলে পেট নাবে। পচা জিনিশ খাইলে পেট নাবে। এই জন্যে, ওলাউঠার সময় টাট্‌কা জিনিশ খাওয়া এত দরকার। অনেক পক্ষী পাকালির মাংস খাইলে পেট নাবে। উপস করিয়া শরীর অবসন্ন হইলে তার পর পেট নাবিতে পারে। ময়লা জল খাইলে পেট নাবে। পচা জীব জন্তু কিংবা পচা গাছ গাছালির ভাব নাকে গেলে পেট নাবিতে পারে। এই জন্যে, ওলাউঠার সময় বাড়ী, ঘর, দুওর পরিষ্কার রাখা এত দরকার। খুব ভয়, রাগ, শোক, কি দুঃখ হইলে পেট নাবিতে পারে। এ কথা এইমাত্র বলিছি। হিম বাত ভোগ করিলেও পেট নাবিতে পারে। হিম বাত ভোগ বলিলে কি বুঝায়? শিশির ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে সোঁতা মাটীতে শোওয়া,—এ সবই বুঝায়। ঘাম বন্ধ হইলে পেট নাবে। গর্ভ হইলে পেট নাবিতে পারে। দাঁত উঠিবার সময় ছেলেদের প্রায়ই পেট নাবে। বাতে বেশী বাহে হয়, এমন জোলাপ বারে বারে লইলে শেষে আপ্‌নিই পেট নাবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে পেট নাবে। পেটে কৃমি থাকিলে পেট নাবে। গাউট্ কিংবা রিয়ুম্যাটিজ্‌ম্ শরীরের বাইরে থেকে ভিতরে গেলে পেট নাবে। (গাউট্ আর রিয়ুম্যাটিজ্‌ম্ শরীরের বাইরে থেকে ভিতরে কেমন করিয়া যায়, সে সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব)। খুব রৌদ্র ভোগ করিলেও পেট নাবে। বৈশাখ জ্যৈষ্ঠ মাসে

আমাদের দেশে ওলাউঠা আর পেটের ব্যামোর যে বাড়া-বাড়ি হইয়া থাকে, এ দেশের লোকের তা জানিতে কারুই বাকী নাই। শরতের (ভাদ্র আশ্বিনের) রৌদ্রেও পেট নাবে। এ ছাড়া, অনেক রোগেও পেট নাবে। ক্ষয়কাশ (থাইসিস্) রোগে পেট নাবে। টাইফয়িড্ ফীবরে পেট নাবে। লিবরে রক্ত জমিলে পেট নাবে। কিন্তু কোন বাড়িতে, কি কোন পাড়ায় যদি অনেকের পেট নাবে, তবে হয় সেখানকার হাওয়া খারাপ হইয়াছে; নয় সেখানে যে জল ব্যবহার করে, সে জল খারাপ হইয়াছে, নয় খারাপ জিনিশ খাইয়া সেখানকার লোকের পেটের-ব্যামো হইয়াছে ঠিক্ করিবে। ওলাউঠা হইবার আগে প্রায়ই পেটের-ব্যামো হয়—পেট নাবে।

লক্ষণ—এখন ডায়ারীয়ার লক্ষণ বলি। বারে বারে পাতলা বাহ্যে হওয়া ছাড়া, সচরাচর এক আধটু গা ন্যাকার-ন্যাকার থাকে। জিব অপরিষ্কার কিংবা ছাত-পড়া হয়; মুখে দুর্গন্ধ হয়। পেট ফাঁপে। বারে বারে বাহ্যে যাইতে ইচ্ছা করে। পেট কামড়ায়, অম্ল ঢেকুর উঠে। সহজ বাহ্যের মত বাহ্যে হয় না। হয়, মল খুব পাতলা হয়, নয় জলবৎ আর আম (মিয়ুকস্) মিশন হয়; কিংবা ফেণা-ফেণা জলের মত হয়। গ্রীষ্মকালে তাত ফুটিলে যে ওলাউঠা হয়, তাতে পিত্তই বেশী নাবে, পেটের ব্যথা খুব বেশী হয়, পায়ের গোছে খাল্ ধরে; রোগীর গা শীত শীত করে, আর সে ভারি অবসন্ন হইয়া পড়ে।

রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে?—শুদু পেট-নাবায় সচরাচর কোন ভয়ই নাই। তবে খুব ছোট

ছেলেদের পেট নাবা বড় সোজা নয়। খুব প্রাচীন, আর যাদের শরীর দুর্ব্বল আর ভগ্ন হইয়া গিয়াছে, তাদেরও পেট-নাবা সহজ নয়। আর যে ব্যামোতে শরীর অবসন্ন করে, সে ব্যামোতে যদি পেট-নাবা উপসর্গ হয়, তবে তাতে বিপদ কম নয়।

এর আগেই বলিছি, পেট-নাবাকে ডাক্তরেরা ডায়ারীয়া বলেন। রক্ত-আমাশাকে তাঁরা ডিসেণ্টরি বলেন। ডায়ারীয়া আর ডিসেণ্টরিতে তফাত কি, এখন তাই বলিব।

ডায়ারিয়া আর ডিসেণ্টরির প্রভেদ— —ডায়ারীয়াতে বাহ্যের সঙ্গে রক্ত পড়ে না। ডিসেণ্টরিতে মলের সঙ্গে আম আর রক্ত পড়ে। এ ছাড়া, ডিসেণ্টরিতে শূলনি, কোঁতানি, বারে বারে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা, আর রোগীর কষ্ট ঢের বেশী।

রোগীর পেট নাবিতেছে——সে পেট-নাবা ওলাউঠার পেট-নাবা কি ডায়ারিয়ার পেট-নাবা, তা কেমন করিয়া জানিবে? তা জানা শক্ত নয়। ওলাউঠার পেট-নাবায় দু একবার ভেদ হইতেই রোগী একবারে নেতিয়ে পড়ে। ডায়ারিয়ায় রোগীর অবস্থা সে রকম হয় না। তবে ওলাউঠা প্রথমে প্রায়ই সামান্য ডায়ারিয়ার আকারেই আরম্ভ হয়।

অনেক দিনের মল বদ্ধ থাকিলে, বারে বারে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা আর শূলনি কোঁতানি নিয়ত হয়; আর বারে বারে অল্প অল্প পাতলা বাহ্যে হয়। ডায়ারিয়া মনে করিয়া চিকিৎসক যদি ধারক অসুদ দেন, তবেই রোগীর দফা এক রকম নিশ্চিন্ত। এ রকম রোগীকে পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইতে হয়। খুব শক্ত গুট্‌লে মল আট্‌কে থাকিলে

জোলাপে সে গুট্‌লে বাহির হয় না। আবার কখন কখন শুদ্ধ পিচ্‌কিরি দিয়াও তা বাহির করিতে পারা যায় না। কাজেই, হয় হাত দিয়া, নয় কোন যন্ত্র দিয়া সেই গুট্‌লে বাহির করিতে হয়। যে যন্ত্র দিয়া গুট্‌লে মল বাহির করে, ডাক্তরেরা সে যন্ত্রকে স্কুপ্‌ বলেন। স্কুপ্‌ এক রকম চাম্‌চে বলিলেই হয়। কোষ্ঠবদ্ধের কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব। তাতেই বলিতেছি, অনেক দিনের মল বদ্ধ থাকিলে—এই রকম শক্ত বড় গুট্‌লে আট্‌কে গেলে বারে বারে যে পাতলা বাহ্যে হয়, বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয়, আর শূলনি কোঁতানি নানা রকম কষ্ট হয়, ডায়ারিয়া বলিয়া তাতে যেন ধারক দিও না। দিলে কি সর্ব্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। সব চিকিৎসকেরই যত্ন করিয়া এটী মনে রাখা উচিত।

আংটির মত গোল যে একখানি মাংস গুহ্যদ্বার বেড়িয়া আছে, সহজ বেলায় ঐ দুওর তার বলে সর্ব্বদাই খুব কসে আঁটা থাকে। রোগী ইচ্ছা না করিলে তার ভিতর দিয়া মল নির্গত হইতে পারে না। খুব বাহ্যে-পীড়া হইলেও সেই মাংসের বলে বাহ্যের বেগ সংবরণ করিতে পারা যায়। ঘুমাইয়া থাকিলেও সেই মাংসের বলে মল নির্গত হইতে পারে না। কিন্তু সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে, মল যেমন জমে, তেমনি বাহির হইয়া পড়ে। কাজেই, একবারের জায়গায় পাঁচবার বাহ্যে হয়। এই রকম বারে বারে বাহ্যে হওয়াকে ডায়ারিয়া মনে করিয়া ধারক অস্থুদ দিলে তাতে কোন ফলই হয় না। সেই মাংসের বল কমিয়া গেলে যে বলিলে, সে

মাংসের বল কখন্ কমে ? পক্ষাঘাত হইলে তার বল কমিয়া যায়। যে কারণেই হোক্, শরীরের বল খুব কমিয়া গেলে, ঐ মাংসেরও বল কমিয়া যায়। পক্ষাঘাতের কথা বলিবার সময় এ সব বেশ করিয়া বলিব। সেই মাংসের বল কমার দরুণ যদি বারে বারে বাহ্যে হয়, তবে রোগীকে শুইয়া থাকিতে বলিবে। লৌহ ঘটিত অসুদ খাইতে দিবে। ঠাণ্ডা জল দিয়া সব গা মুচাইয়া দিবে, কিংবা ঠাণ্ডা জলে স্নান করাইয়া দিবে। আর ভাল পুষ্টিকর আহার দিবে। এতেই তার রোগ সারিয়া যাবে।

চিকিৎসা——এখন ডায়ারীয়ার চিকিৎসার কথা বলি। পেট-নাবার কারণটী আগে খুঁজিয়া বাহির করিবে। নৈলে, চিকিৎসা করিয়া যশ পাইবে না। মল বন্ধের দরুণ বারে বারে চিড়িক্ চিড়িক্ করিয়া পাতলা বাহ্যে হইতেছে, ডায়ারিয়া হইয়াছে ভাবিয়া তুমি রোগীকে ধারক অসুদ দিলে ! এতে রোগীও যেমন সুস্থ হয়, তুমিও তেমনি যশ পাও। সহজে পরিপাক হয় না, কি মোটেই পরিপাক হয় না, এমন কোন জিনিশ খাইয়া যদি পেটের ব্যামো হইয়া থাকে, তবে জোলাপ দিয়া সেই দুষ্ট জিনিশ সব বাহির করিয়া দিবে। কোন্ জোলাপ দিবে ? এখানে ক্যাষ্টর্ অইল্ জোলাপই সব চেয়ে ভাল। যদি পেটের কামড় কি আর কোন রকম ব্যথা থাকে, তবে ক্যাষ্টর্ অইলের সঙ্গে ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই) দিয়া খাওয়াইয়া দিবে। ছটাক খানেক বেশ গরম দুধের সঙ্গে আধ ছটাক ক্যাষ্টর্ অইল্ আর ১০। ১৫ ফোটা লডেনম্ মিশাইয়া খাইলে, ক্যাষ্টর

অইল্ খাওয়ার যে একটা কষ্ট, তা মোটে জানিতে পারা যায় না। গরম দুধের সঙ্গে মিশাইলে ক্যাষ্টর্ অইলের আটা কমিয়া যায় আর দুধের ভাবে ওর দুর্গন্ধও অনেক লুকোয়। পেট নাবার এ রকম কোন কারণ যদি না থাকে, তবে ১৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ আর ২৫ গ্রেন্ পল্ব্ ক্রিটী কো কম্ ওপিও একত্র মিশাইয়া প্রতি দাস্তের পর খাইতে বলিবে। অনেক জায়গায় একটী পুরিয়ার বেশী দরকার হয় না। কখন কখন ২।৩টা পুরিয়াও দিতে হয়। শুদ্ধ আমাশা হইলে পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও পথ্যের সেই রকম ধরাধর করিবে। পথ্যের ধরাধর না করিলে পেটের ব্যামো সারে না—এ কথাটা রোগীরও যেমন মনে রাখা চাই, চিকিৎসকেরও তেমনি মনে রাখা চাই। অনেক জায়গায় গরম জলের পিচ্‌কিরি করিয়া মল-দ্বারের ভিতর ধুয়াইয়া দিয়া তার পরই লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই) পিচ্‌-কিরি করিয়া দিলে পেট ধরিয়া যায়—পেটের ব্যামো সারিয়া যায়। কত খানি লডেনম্ কি রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, পূর্ব্বে তা লিখিয়া দিইছি। আফিঙের আরোক পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও যেমন উপকার হয়, আফিঙের বড়ি গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিলেও তেমনি উপকার হয়। আফি-ঙের বড়ি এই রকম করিয়া তয়ের করে।—

আফিং	...	...	২ গ্রেন্
সাবান	...	...	১০ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটি বড়ি তৈয়ের করে।

এই রকম হিসাব করিয়া যে কয়টা ইচ্ছা, সে কয়টা বড়ি

তয়ের করিতে পার। আঙুল দিয়া এই বড়ি গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিতে হয়। আঙুলে যতদূর নাগাইল পাওয়া যায়, বড়ি তত দূর তুলিয়া দিবে। মল-দুওরের মধ্যে দিবার জন্যে আফিঙের এই বড়িকে ডাক্তরেরা সপজিটরি বলেন। মল-দুওরের ভিতর যে গরম জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম, তার সঙ্গে ১০।১৫ গ্রেন্ ট্যানিক্ য়্যাসিড্ মিশাইয়া দিলে আরও বেশী উপকার হয়—পেটের-ব্যামো আরও শীঘ্র সারে। কখন কখন অন্ত্রের (আঁতের) মধ্যে মল পচিয়া পেট নাবে। এ রকম পেট-নাবার যেমন অসুদ টাট্‌কা কয়লার গুঁড়া, তেমন অসুদ আর নাই।

টাট্‌কা কয়লার গুঁড়ো	...	...	১ ঔন্স
মাত গুড়	... ...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

চা-চামচের এক চামচ করিয়া এই অসুদ রোজ ৩।৪ বার খইতে দিবে। এ অসুদে দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠাও সারে। কয়লা টাট্‌কা তয়ের করিয়া লইবে। সাহেবদের দোকানে কয়লার এক রকম বিস্কুট্ তয়ের হয়। কয়লার বিস্কুট্ বড় দরকারি। তাতে অনেক ব্যামো ভাল হয়।

ছেলেদের পেট-নাবা—ছেলেদের পেট-নাবার যেমন অসুদ বিস্মথ্, তেমন অসুদ আর আছে কি না বলিতে পারি না। আমি ত বলি নাই। ৪।৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইলে শিশুর যে রকম ডায়ারিয়াই (পেট-নাবাই) কেন হোক্ না, সত্ত ভাল হয়। পেট-নাবাও সারে—পেট-নাবার সঙ্গে যদি বমি থাকে, তবে তাও ভাল হয়; আবার শিশু

চাঙ্গা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, বিস্ময়ের কত গুণ। এক অস্থুদে পেট নাবা সারিল; বমি ভাল হইল; আবার শিশুও চাঙ্গা হইল। আর কি চাও?

বছর তিনেক হইল একটী মেয়ের জ্বর আর পেটের-ব্যামোর চিকিৎসা করিতে গিয়াছিলাম। মেয়েটীর বয়স দু বছরের বেশী নয়। মেয়ের বাপ বড় মানুষ। শিশুর চিকিৎসায় টাকা খরচ করিতে কম করেন নাই। সহরের (কলিকাতার) ভাল মন্দ অনেক ডাক্তার তার চিকিৎসা করিছিলেন। কিন্তু তার পেটের-ব্যামোর কেউ কিছুই করিতে পারেন নাই। পেটের-ব্যামো একটু পুরাণ পড়িলে ডাক্তরি চিকিৎসায় তা সারে না— ছেলে বুড়ো মেয়ের এই বিশ্বাস। ডাক্তরেরা নিজেই এ কথা বাড়ী বাড়ী বলিয়া বেড়ান। এই জন্যে, শিশুর মা বাপ বৈদ্যকে দিয়াও দেখাইতে ত্রুটি করেন নাই। কিন্তু ডাক্তরদের চেয়ে বৈদ্য বেশী যশ লইতে পারেন নাই। মেয়ের বাপের সঙ্গে আমার জানা শুনা ছিল। এই জন্যে, শেষে তিনি আমাকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। আপনাদের ডাক্তরি মতে ছোট ছেলের এ রকম পেট নাবার যদি কোন ভাল অস্থুদ বিস্থুদ থাকে ত দিয়া মেয়েটীকে ভাল করিয়া দিন। আমি ডাক্তরি চিকিৎসার আর কিছু বাকী রাখি নাই। এই টুকু মেয়ে, আপনাদের পেটের বোধ করি বার আনা অস্থুদ খাইয়াছে। এই বলিয়া প্রেস্ক্রিপ্‌শনের তাড়াটা তিনি আমার হাতে দিলেন। আমি দেখিলাম দেড় শ প্রেস্ক্রিপ্‌শনের কম নয়। এত প্রেস্ক্রিপ্‌শনে পেটের-ব্যামোর যে কোনও অস্থুদ বাদ গিয়াছে,

তা বোধ হয় না। এই বলিয়া তাঁকে বলিলাম, আগে ছেলে কেমন বাহ্যে করে দেখি তার পর প্রেস্কৃপ্‌শন্ দেখিব। তবে আপনাকে একটু অপেক্ষা করিতে হবে। বেলা এখনও আট্টা হয় নাই। প্রায় রোজই আট্টা বাজিয়া গেলে তার ঘুম ভাঙে। আবার যে ঘুম ভাঙে, সেই তাড়াতাড়ি গিয়া বাহ্যে বসে। বাহ্যে বসিতে ভর সয় না। অমনি একবারে পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে যায়। এই বলিয়া তিনি বাড়ীর মধ্যে গেলেন। খানিক পরে বাড়ীর মধ্যে থেকে আসিয়া বলিলেন মহাশয়, আজ্ সকালেই মেয়ের ঘুম ভাঙিয়াছে। এখনও কিন্তু বাহ্যে যায় নাই। বোধ করি রোজ যে সময় বাহ্যে যায়, সে সময় এখনও হয় নাই। যাই হোক্, এখন আপনি বাড়ীর মধ্যে গিয়া একটু বসিলে আপনার সুমুখেই সে এখনই বাহ্যে যাবে। এই কথা শুনিয়া আমি তাঁদের বাড়ীর মধ্যে গিয়া বসিলাম। খানিক পরেই শিশু বাহ্যে গেল। একবারে যেন পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে গেল। যেখানে বাহ্যে করিল, সেখান থেকে এমন ৫। ৭ হাত তফাতে গড়াইয়া গেল। বাহ্যের আকার প্রকার দেখিয়া রাত্রে ছেলেকে কি আহার দেওয়া হইছিল, তার বাপকে জিজ্ঞাসা করিলাম। তার বাপ বলিলেন, মহাশয়, ভাল কথা জিজ্ঞাসা করিয়াছেন। ছেলেকে যদি এক গুণ আহার দেওয়া যায়, ত তার দশ গুণ বাহ্যে হয়। কাল রাত্রে বড় জোর তাকে দু ঝিনুক দুধ দেওয়া হইছিল। কিন্তু কত খানি বাহ্যে গেল, আপনি ত তা বসিয়াই দেখিলেন। এত বাহ্যে কোথা থেকে আসে? এত বাহ্যে কোথা থেকে আসে, আপনাকে তা পরে বুঝা-

ইয়া দিব। এখন আমাকে সেই প্রেস্কৃপ্‌শনের তাড়াটা দিন্। প্রেস্কৃপ্‌শনের তাড়া খুলিতে প্রথমেই বিস্মথের প্রেস্কৃপ্‌শন্ খানি দেখিতে পাইলাম। দেড় শ প্রেস্কৃপ্‌শনের মধ্যে আমার কেবল এই খানারই দরকার। এক শ উনপঞ্চাশ খানি প্রেস্কৃপ্‌শন্ সিন্দুকে তুলিয়া রাখুন। যাঁরা চিকিৎসার হদ্দ মুদ্দ করিলাম বলিয়া গিয়াছেন, তাঁদেরই অসুদে দেখুন মেয়েটাকে ভাল করিয়া দিই। এই বলিয়া এক খানি প্রেস্কৃপ্‌শন্ করিলাম। কি কি অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

বিস্মথ্ ... ... ১ ড্রাম্

এতে ১২ মোড়া অসুদ তয়ের কর।

এক এক মোড়ায় ৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ থাকিবে। দু ঘণ্টা অন্তর এক এক মোড়া অসুদ খাওয়াইতে বলিলাম। পেটের ব্যামো বেশ সারিয়া না গেলে আর অসুদ খাওয়ান বন্ধ করিবে না। এই অসুদেই পেটের ব্যামো সারিবে। আর কোনও অসুদের দরকার হবে না। তবে পথ্যের খুব ধরাধর না করিলে ঘণ্টায় অমন পাঁচ মোড়া বিস্মথ্ খাওয়াইলেও কোনও ফল হবে না। অগ্নি যে একবারে নাই, আর যা খায়, পেটের মধ্যে ফুটিয়া তা দশ গুণ হয়, আগে যাঁরা চিকিৎসা করিয়া গিয়াছেন, তাঁদের সেটা মোটে খেয়ালই হয় নাই। আমার এই কথা শুনিয়া মেয়ের বাপ বলিলেন, শিশু যা খায় পেটে গিয়া দশগুণ হয়, এ কথা আমি মাথায় রাখি। এর প্রতীকার না করিলে শুদু ধারক অসুদ খাওয়াইয়া কি হবে? আর সেই জন্যেই ত অসুদ দিয়াও কেউ

কিছু করিতে পারেন নাই। দুধ একবারে বারণ করিয়া দিলাম। মাংসের কাথ লোওয়াপোড়া করিয়া দিতে বলিলাম। খুব লাল ডগ্‌ডগে করিয়া লোওয়া পোড়াইয়া মাংসের কাথে ডুবাইয়া দিবে। এই যে মাংসের কাথ, একেই লোওয়া পোড়া মাংসের কাথ বলে। এই মাংসের কাথ পেটে গিয়া অমন কবিয়া ফুটিয়া এক ছটাকের জায়গায় দশ ছটাক হয় না। তার পর, যে ছেলের পেটের-ব্যামো সারিবে না বলিয়া এত ডাক্তর, বৈদ্য জবাব দিইছিলেন, শুদ্ধ বিস্মথ্ আর দাগ-করা এই কাথ খাইয়া তিন দিনের মধ্যে সেই ছেলের তেমন পেটের-ব্যামো সারিয়া গেল। বিস্মথ্ দিয়া যদি পেটের-ব্যামো সদ্য ভাল করিতে চাও, তবে বেশী করিয়া বিস্মথ্ দিতে ডরিও না। আগেকার ডাক্তর মহাশয়েরা বিস্মথ্ দিয়াও যে মেয়েটার পেটে-ব্যামো ভাল করিতে পারেন নাই, তার কারণ কি? কারণ আর কিছুই না। তাঁরা বিস্মথ্ এক এক বারে খুবই কম দিইছিলেন। কোথায় দু বছরের শিশুকে এক এক বারে ৫ গ্রেন্ করিয়া বিস্মথ্ দিবেন, তা না দিয়া তাঁরা এক এক বারে সিকি গ্রেন, আধ গ্রেনের বেশী দেন নাই। এতে পেটের ব্যামো ভাল না হইলে অসুদের দোষ, না চিকিৎসকের দোষ? জোয়ান রোগীর পেট নাবিলে ১৫ গ্রেন বিস্মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ পল্‌ব ক্রিটি কো কম্ ওপিও একত্র মিশাইয়া দেওয়া আমার এক বারে নিয়ম। দরকার হইলে ২০। ২৫। ৩০ গ্রেন্ গ্রেন্ বিস্মথও দিই। প্রথমে কম বিস্মথ্ দিয়া দেখিবে; যদি তাতে বিশেষ ফল না পাও, তবে বেশী করিয়া দিবে।

ছেলেদের ডায়ারীয়ার (পেট নাবার) আর একটী ভাল অসুদ আছে। সে অসুদটীর কথা এখনও বলি নাই। সে অসুদটী কি ? একের নম্বর ব্রাণ্ডি। ব্রাণ্ডিতে পেট-নাবাও সারে, আবার শিশু চাঙ্গা হইয়াও উঠে। ব্রাণ্ডির এ বড় গুণ। সব চিকিৎসকেরই এটা মনে করিয়া রাখা উচিত। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে ৪। ৫ ফোটা ব্রাণ্ডি দিতে পার। ঠাণ্ডা জলের সঙ্গেও দিতে পার—ডিল্ ওয়াটরের সঙ্গেও দিতে পার। পেট-নাবার সঙ্গে বমি বা আঁক থাকিলেও ব্রাণ্ডিতে তা সারে।

জ্বর-অতিসার—— এর আগেই বলিছি যে, জ্বরের সঙ্গে অতিসার (পেট-নাবা) থাকিলে, বৈদ্যরা তাকে জ্বর-অতিসার বলেন। জ্বর-অতিসারকে বৈদ্যরা বড়ই ভয় করেন। গৃহস্থেরাও জ্বর-অতিসারের নামে ভয় পান। তা ভয় পাইবার কথাই বটে। কেন না; এক জ্বরের তাড়নাতেই রোগী কাবু হইয়া পড়ে। তার উপর বারে বারে পেট নাবিলে কি রোগী জীয়ন্ত থাকে ? কাজেই, জ্বর-অতিসারকে খুবই ভয় করিতে হয়। সবিরাম জ্বরেও (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরেও) পেট নাবে। স্বল্পবিরাম-জ্বরেও (রিমিটেণ্ট ফীবরেও) পেট নাবে। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ত্যাগ হইলে—জ্বর ছাড়িয়া গেলে পেট-নাবাও বন্ধ হইয়া যায়। আবার জ্বর আসিলে পেট নাবিতে আরম্ভ হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) জ্বর যখন কম থাকে, পেট নাবাও তখন কম থাকে। তারপর জ্বরের প্রকোপ হইলে আবার পেট নাবিতে আরম্ভ হয়। জ্বর-অতিসারের লক্ষণই এই। জ্বরও যেমন বাড়ে,

পেট-নাবাও তেমনি বাড়ে। তবেই দেখ, জ্বর আসা বন্ধ হইলে পেট-নাবা আপনিই ভাল হইয়া যায়। কখন কখন জ্বর ভাল হইয়া গেলেও পেটের দোষ থাকিয়া যায়। এই জন্যে, জ্বর বন্ধ করার অসুদ আর ধারক অসুদ এক সঙ্গে দেওয়াই উচিত। ধারক অসুদ অনেক রকম। পূর্ব্বে যে কুইনাইন্ মিক্শ্চর্ লেখা আছে, সবিরাম জ্বরে (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরে) জ্বর ত্যাগ হইলে—জ্বর ছাড়িলে, আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) জ্বর কমিলে, সেই মিক্শ্চর্ সেই নিয়মে অর্থাৎ তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে। তাতেই জ্বরও বন্ধ হবে, পেটও ধরিয়া যাবে।

মনে কর, গিয়া দেখিলে রোগীর জ্বর আসিয়াছে আর বারে বারে তার পেট নাবিতেছে। এখন কি করিবে? তার জ্বর ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিবে, না জ্বরের অসুদের (ফীবর্ মিক্শ্চরের) সঙ্গে ধারক অসুদ দিবে? দেরি না করিয়া জ্বরের অসুদেরই সঙ্গে ধারক অসুদ দেওয়া ভাল। কেন না, জ্বর ছাড়া পর্য্যন্ত অপেক্ষা করিলে চাই কি, পেট নেবে নেবে রোগী একবারে নেতিয়ে পড়িতে পারে। এ অবস্থায় জ্বর ছাড়িবার সময় নাড়ী ছাড়িয়া যাইবারই বা আটক কি? আর এ রকম দুর্ঘটনা অনেক জায়গায় ঘটে। এই জন্যে, পূর্ব্বে যে ফীবর্ মিক্শ্চর্ লিখিয়া দিইছি, প্রথম অসুদটী অর্থাৎ ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্ বাদ দিয়া সেই ফীবর্ মিক্শ্চর নিয়ম মত খাওয়াইবে। তা ছাড়া, ১৫ গ্রেন্ বিস্মথ্ আর ১৫ গ্রেন্ পল্ব্ ক্রিটি কো কম্ ওপিও কি দাস্তের পর দিবে। ফীবর্ মিক্শ্চরে জ্বরের

কষ্ট কমিবে, আর ধারক অসুদে পেট-নাবা বন্ধ হবে। যদি বল, ফীবর্ মিক্শ্চর্ থেকে ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্ বাদ দিবার দরকার কি। দরকার একটু আধটু নয়। ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিডে যে পেট নরম করে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ত বাহ্যে হয়। কাজেই, যে রোগীর আপনিই পেট নাবিতেছে, তাকে ডাইলিয়ুট্ হাইড্রোক্লোরিক্ য়্যাসিড্ কেমন করিয়া দেওয়া যায় ?

গ্রহণী (গিরিণি)——পেটের-ব্যামো পুরণ হইলে ত পেট-নাবাই হোক, শুদ্ধ আমাশাই হোক, আর রক্ত-আমাশাই হোক, তাকে বৈদ্যরা গ্রহণী বলেন। সচরাচর লোকে তাকে গিরিণি বলে। পেটের-ব্যামো পুরণ হইলে প্রায়ই নির্দ্দোষ হইয় সারে না। অনেক যত্ন, অনেক তদ্বির, অনেক চেষ্টা করিলে তবে ব্যামো অমনি যাপ্য হইয়া থাকে। অত্যাচার করিলে আবার যে ব্যামো সেই। নূতন পেটের-ব্যামোর চেয়ে পুরণ পেটের ব্যামোতে লোক বেশী মরে। এই জন্যে, পেটের-ব্যামো নূতন থাকিতে থাকিতে, বিশেষ তদ্বির করিয়া তা ভাল করা এত দরকার ; আর এই জন্যেই পেটের-ব্যামো পুরণ হইতে দেওয়া এত দোষ। গ্রহণী (গিরিণি) রোগের কি ভাল অসুদ নাই ? ভাল অসুদ আছে। খুব ভাল অসুদই আছে। ভাল অসুদ আর কি ? তুতে। অসুদটী যেমন ভাল আবার তেমনি সুলভ। এক পয়সার তুতেয় এক শ জনের গ্রহণী (গিরিণি) ভাল হয়। এর চেয়ে সুবিধা আর কি হইতে পারে ? তুতের সঙ্গে আরও দু একটা অসুদ যোগ করিয়া দিতে হয়। পূর্ব্বে বলিছি, কোন রোগের

যদি দু তিনটী ভাল অস্থদ জানা থাকে, তবে তা একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুদ্ধু একটা অস্থদে তেমন উপকার হয় না। গ্রহণী (গিরিণি) রোগীকে তুতের সঙ্গে আমি যে যে অস্থদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। তুতেকে ডাক্তরেরা সল্‌ফেট্‌ অব্‌ কপর্‌ বলেন।

তুতে	৩ গ্রেন্‌
ডোবর্স পাউডর (পল্‌ব্‌ ইপেকা কো)	১ ড্রাম্‌
পল্‌ব্‌ য়্যাকেশিয়া (বাবলার আটার গুঁড়)	১ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর। রোজ তিন বেলা ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে।

এর আগেই বলিছি যে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্‌ মেম্ব্রেনের) দোষ না ঘটিলে পেটের-ব্যামো হয় না। সেই দোষ শুধ্‌রে দিতে না পারিলে পেটের-ব্যামো নির্দ্দোষ হইয়া সারে না। আবার গ্ল্যালিসীন্‌, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির দোষ শুধ্‌রে দিবার খুব একটী ভাল অস্থদ, তাও এর আগে বলিছি। এই জন্যে, গ্রহণী (গিরিণি) রোগীকে রোজ সকালে দশ গ্রেন্‌ করিয়া গ্ল্যালিসীন্‌ দিবে। এ ছাড়া, রোজ সকালে এক বার করিয়া ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিলে আরও উপকার হয়—অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল আরও শীঘ্র হয়। আধ সের জলের বেশী পিচ্‌কিরি করিবার দরকার নাই। পিচ্‌কিরির জল যত ঠাণ্ডা আর পরিষ্কার হইবে, ততই ভাল। গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা জল পিচ্‌-কিরি করিয়া দেওয়া খুব সহজ। তাতে রোগীর কোন কষ্টই নাই। জলই হোক্‌, আর জোলাপের অস্থদই হোক্‌, অন্ত্রের

মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার জন্যে ডাক্তরেরা রবারের নল লাগান পিতলের এক রকম পিচ্‌কিরি সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। সে পিচ্‌কিরির আবার একটী করিয়া বাক্স আছে। পিচ্‌কিরির এই বাক্স ডিস্পেন্সরিতে বিক্রি হয়। ডাক্তরেরা এই বাক্সকে ইনীমা বাক্স অর্থাৎ পিচ্‌কিরির বাক্স বলেন। এর দামও কিছু বেশী নয়। বাজারে এ বাক্স তিন টাকা চৌদ্দ সিকায়, কিনিতে মিলে। তবে সাহেবদের দোকানে দাম কিছু বেশী লয়। এ পিচ্‌কিরি কিনিবার যাঁদের সুবিধা না হইবে, তাঁরা বাজার থেকে দস্তার পিচ্‌কিরি কিনিয়া লইবেন। দস্তার পিচ্‌কিরি ছোট লইলে চলিবে না। আধ সের জল ধরে, এমন হওয়া চাই। তার পর হাঁটু দুটী মুড়িয়া রোগীকে বাঁ কাইতে শুইতে বলিবে। তার পর ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিবে। পিচ্‌কিরির আগায় নারিকেল তেল বা সুইট্ অইল্ (অলিব অইল্) মাখাইয়া তবে গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে। বাক্সয় করা পিচ্‌কিরি (ইনীমা বক্স) যদি ব্যবহার কর, তবে রবারের নলের আগায় লাগান হাড়ের নলটীতে তেল মাখাইবে। পিচ্‌কিরির জলটা পেটে খানিকক্ষণ থাকিলে ভাল হয়। এই জন্যে, পিচ্‌কিরি দিবার সময় কিম্বা পিচ্‌কিরি দেওয়া হইলে পর রোগীকে বেগ দিতে বারণ করিবে। বেগ আসিলেও তা সম্বরণ করিতে বলিবে। নইলে পিচ্‌কিরির জল সব বাহির হইয়া আসিবে। অনেক জায়গায় ন্যাকড়ার পুঁটুলি দিয়া গুহ্যদ্বার টিপিয়া রাখিতে হয়। ছেলেদের বেলাই এই রকম করার বেশী দরকার হয়। আমি বোধ করি সব জায়গাতেই এই রকম

করা ভাল। তা হইলে পিচ্‌কিরির জল যতক্ষণ ইচ্ছা, তত-ক্ষণ রাখিতে পার। তার পর যখন দেখিবে যে, রোগী পিচ্‌কিরির জল আর রাখিতে পারে না, তখন তোমার ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলি সরাইয়া লইবে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা বলিবার সময়, এ সব আর এক বার ভাল করিয়া বলিব।

তুতে যে কেবল জোয়ান আর বুড়োদেরই গ্রহণী (গিরিণি) রোগের অস্তুদ, তা নয়। ছোট ছোট ছেলেদেরও পুরণ পেটের ব্যামো এতে যেমন সারে, এমন আর কোনও অস্তু-দেই নয়। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে ১ গ্রেনের ১২ ভাগের ১ ভাগ ($\frac{1}{12}$ গ্রেন্) তুতে দেওয়া যায়। এখানে তুতের সঙ্গে ডোবর্স পাউডর না দিয়া, শুদ্ধ পল্‌ব য়্যাকেসিয়া দিবে। পল্‌ব্ য়্যাকেশিয়া এক এক বারে আধ গ্রেন্ করিয়া দিবে। জোয়ান আর বুড়োদের অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির দোষ শুধ্‌রে দিবার জন্যে স্যালিসীন্ যেমন দরকার, ছেলেদের বেলায়ও তেমনি দরকার। এক বছরের ছেলেকে রোজ সকালে আর সন্ধ্যায় আধ গ্রেন্ ($\frac{1}{2}$) করিয়া স্যালিসীন্ দিবে। এ ছাড়া রোজ সকালে কাচের ছোট একটী পিচ-কিরি করিয়া গুহ্যদ্বার দিয়া তার অন্ত্রের মধ্যে ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। পিচ্‌কিরি করিলে ছেলের কোনও কষ্ট হয় না। পেটের ব্যামো পুরণ হইলে অন্ত্রের বল ক্রমে খুবই কমিয়া আসে—অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রে-নের) আঁইট থাকে না, ঢিলা হইয়া পড়ে। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি এই রকম ঢিলা হইয়া পড়িলে, বাহ্যে করিবার সময় হারিশ বাহির হয়। বাহ্যে করিবার সময় অমুকের হারিশ

বাহির হয় বলিলে কি বুঝায়? অনেক দিনের পেটের-ব্যামোতে তার অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল কমিয়া গিয়াছে—সহজ বেলার মত তাতে আঁইট নাই। এই জন্যে, বাহ্যে করিবার সময়—বেগ দিক্ আর নাই দিক—সেই ঢিলা শ্লেষ্মা-ঝিল্লি নামিয়া পড়ে। একেই লোকে "হারিশ-বেরণ বলে"। রোজ নিয়ম করিয়া খুব ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি লইতে পারিলে শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল শীঘ্রই হয়। বল হইলেই আঁইট্ হয়। আঁইট্ হইলে বাহ্যে করিবার সময় শ্লেষ্মা-ঝিল্লি আর নামিয়া আসে না। কাজেই, আর হারিশ বাহির হয় না। তবেই দেখ, ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরিতে কত উপকার। এই জলে যদি কোন ক'ষো (কষায়) অসুদ মিশাইয়া দেওয়া যায়, তবে আরও উপকার হয়। ক'ষো অসুদ কাকে বলে? যে জিনিশ গায়ে লাগিলে চামড়া কষিয়া ধরে, জিবে দিলে ক'ষো লাগে, আর জিব যেন কষিয়া ধরে, তাকেই ক'ষো বলে। হর্ত্তুকি (হরিতকি), বাবলার ছাল, বকুলের ছাল, পেয়ারার ছাল, ট্যানিক্ য়্যাসিড্, ফট্‌কিরি—এ সব ক'ষো। ট্যানিক্ য়্যাসিড্ ভারি কষা। গাছড়া কষা অসুদ মাত্রেই ট্যানিক্ য়্যাসিড্ আছে। যে সব গাছড়ায় ট্যানিক্ য়্যাসিড্ নাই, সে সব গাছড়া কষা নয়। এই জন্যে, কোন গাছড়ায় ট্যানিক্ য়্যাসিড্ আছে, কি না, মুখে দিয়া চাকিয়া তা বলিতে পারা যায়। এ একটী বেশ সংকেত। ট্যানিক্ য়্যাসিডই হোক্, আর ফট্‌কিরির গুঁড়োই হোক্, ঠাণ্ডা জলে দিয়া সেই জলের পিচ্‌কিরি করিবে। কতখানি জলে কতটুকু ট্যানিক্ য়্যাসিড, আর কত টুকুই বা ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিতে

হয়, তার কিছু এমন বিশেষ নিয়ম ধরা নাই। জল যদি খুব কষা করিতে চাও, তবে ফট্‌কিরি আর ট্যানিক্ য়্যাসিড্ দুই-ই জলে দিতে পার। আবার কষা গাছড়া অস্থুদের পাচন (ডিকক্‌শন্) তয়ের করিয়া তার সঙ্গে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া দিলে তাও খুব কষা হয়। তিন পোওয়া জলে চারি ড্রাম্ (এক কাঁচ্চা) ফট্‌কিরির গুঁড়ো কিম্বা ট্যানিক্ য়্যাসিড্ দিবে। আর গাছড়া অস্থুদের তিন পোওয়া পাচনে চারি ড্রাম্ ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিবে। পিচ্‌কিরি করিয়া এই কষা জল বা পাচন গুহ্যদ্বার দিয়া অন্ত্রের মধ্যে রোজ সকালে একবার করিয়া দিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি আর তেমন ঢিলা থাকে না—বেশ আঁইট্ হয়। এতে পেটের-ব্যামোরও যেমন উপকার হয়, অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লিরও তেমনি বল আর আঁইট্ হয়। পুরণ পেটের-ব্যামোর পক্ষে এই রকম কষ-জলের পিচ্‌কিরি ভারি অস্থুদ।

পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না, পুরণ হইলে সারিতে চায় না। এ কথাটা চিকিৎসকদের জানিয়া রাখা যেমন দরকার, রোগীদেরও জানিয়া রাখা তেমনি দরকার। পুরণ পেটের-ব্যামো অনেক কষ্টে—অনেক যত্নে সারে জানা থাকিলে রোগীও সাবধান হয়, চিকিৎসকও সাবধান হন। পেটের-ব্যামো যাতে পুরণ না হইতে পায়, রোগীও তার চেষ্টা পায়—চিকিৎসকও তার চেষ্টা পান।

তার পর বলি। আঁতুড়-ঘরে পোআতিদের যে পেটের-ব্যামো হয়, ভাল বাঙ্গালায় সে পেটের-ব্যামোকে সূতিকাতি-সার বলে। ডাক্তরেরা পিয়র্পিরাল ডায়ারীয়া বলেন। যে

রোগই কেন হোক্ না, পুরণ হইলে শীঘ্র সারিতে চায় না। এ কথাটা আঁতুড়ে পোয়াতির পক্ষে যেমন খাটে, এমন আর কারই নয়। আঁতুড় ঘরে পোয়াতিদের যে সব পেটের-ব্যামো হয়, পুরণ পড়িলে তাদের সূতিক -পীড়া বলে। সূতিকা পীড়া মাত্রেই খুব শক্ত। সূতিকা-পীড়ায় আমাদের দেশে বছর বছর যে কত পোয়াতি মারা যায়, তা বলা যায় না। সূতিকা-পীড়ার নাম শুনিলেই লোকে ভয় পায়। প্রসবের পর পেটের-ব্যামো হইলে, আর সেই পেটের ব্যামো পুরণ পড়িলে, শেষে পোয়াতিকে বাঁচানই কঠিন হইয়া পড়ে।

অনেক দিন হইল একটী মেয়ের চিকিৎসা করিছিলাম। প্রসবের পর, দিন পাঁচ ছয় গৌণে তার পেটের ব্যামো হয়। সামান্য পেটের-ব্যামো বলিয়া তেমন অসুদ বিসুদও খায় নাই, খাওয়া দাওয়ারও তেমন ধরাধর করে নাই। শেষে পেটের ব্যামোটী বেশ পাকিয়া দাঁড়াইল। তখন চিকিৎসার ধুমধাম পড়িয়া গেল। অসুদ খাইতে আর ডাক্তর দেখাইতে সে আর বাকী রাখে নাই। কিন্তু কিছুতেই কিছু হইল না। দিনমানে বরং একটু ভাল থাকে, রাতে ১০।১২ বার বাহ্যে যায়। রাত্রে বারে বারে বাহ্যে যাওয়ার দুটী দোষ। বারে বারে বাহ্যে যাওয়ার যে অসুবিধা, আর শরীর তাতে যে রকম দুর্ব্বল হয়, তা ত হয়ই; তা ছাড়া ঘুমের বড়ই ব্যাঘাত হয়। কাজেই সে, দিন দিন ভারি কাবু আর কাহিল হইতে লাগিল। শেষে তার চিকিৎসার জন্যে আমাকে ডাকিল। গ্রহণী (গিরিণি) রোগে আমি সেই এক রকম অসুদই দিয়া থাকি। এখানেও সেই অসুদ দিলাম। অসুদ আর কি?

রোজ সকালে সন্ধ্যে ৫ গ্রেন্ করিয়া ১০ গ্রেন্ স্যালিসীন্। আর ভূতে-ঘটিত সেই পুরিয়া তিন বেলা তিনটে। এ ছাড়া রোজ রাত্রে শুইবার সময় লডেনমের (আফিঙের আরোকের) পিচ্‌কিরি। আফিঙের আরোক (লডেনম্) কিসের সঙ্গে কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, পূর্ব্বে তা লেখা আছে। এই নিয়মে চিকিৎসা করিলে তিন হপ্তার মধ্যেই মেম সাহেবের তেমন যে পেটের ব্যামো, তাও নির্দ্দোষ সারিয়া গেল।

এর আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না, পুবণ হইলে তাকে গ্রহণী (গিরিণি) বলে। আবার গ্রহণীর (গিরিণির) যেমন অসুদ ভূতে-ঘটিত ঐ পুরিয়া, স্যালিসীন্, আর লডেনমের (আফিঙের আরোকের) ঐ পিচ্‌কিরি, তেমন অসুদ আর নাই।

তার পর আর এক রকম পেটের-ব্যামোর কথা বলি। যাদের অম্বলের (অম্লের) ব্যামো আছে, তাদেরই সে রকম পেটের ব্যামো হইয়া থাকে। অম্বলের ব্যামোকো বৈদ্যেরা অম্লপিত্ত বলেন। ডাক্তরেরা য়্যাসিডিটি বলেন। অম্বলের ব্যামোই বল, অম্লপিত্তই বল, আর য়্যাসিডিটিই বল, অর্থ এক। যাদের অম্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের দম্‌কা ভেদ হয়। আমাদের দেশে মেয়েদেরই অম্বলের ব্যামো বেশী হয়, দম্‌কা ভেদও তাদেরই বেশী হয়। যদি বল মেয়েদের অম্বলের ব্যামো বেশী হওয়ার কারণ কি? কারণ তোমাকে এক কথায় বলিয়া দিতেছি। পুরুষদের চেয়ে মেয়েরা খাওয়া দাওয়ার বেশী অনিয়ম করিয়া থাকে।

মেয়েরা ভাল মন্দ খাদ্য সামগ্রীর বিচার করে না। খাদ্য দ্রব্যের দোষ গুণও ধরে না। হাব্‌জা গোব্‌জা যা জুঠাইতে পারে, তাই পেট পুরিয়া খায়। এতে আমাদের দেশের মেয়েদের অম্বলের ব্যামো বেশী হবে আশ্চর্য্য কি? অপাক, অজীর্ণ থেকেই অম্বলের ব্যামো হয়। কোন খানে কিছু নাই, হঠাৎ ভেদ হওয়াকে দম্‌কা ভেদ বলে। দমকা ভেদ একবার হইয়াই বন্ধ হইতে পারে। আবার চাই কি, দু বারও হইতে পারে, তিন বারও হইতে পারে, বেশী বারও হইতে পারে। ওলাউঠার সময় এ রকম ভেদ হইলে রোগীরও মনে ভয় হয়, তার বাড়ীর লোকেরও মনে হয়। এ রকম দম্‌কা ভেদের কি কোন অসুদ আছে? আছে? ভাল অসুদই আছে। পল্‌ব্‌ ক্রিটি কো কম্‌ ওপিও আর বিস্মথ্‌ এ রকম দম্‌কা ভেদের যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর নাই। শুদু দম্‌কা ভেদ কেন, সব রকম পেট-নামারই এ অতি চমৎকার অসুদ। এ কথা এর আগেই বলিছি।

পল্‌ব ক্রিটি কো কম্‌ ওপিও	...	১৫ গ্রেন্‌
বিস্মথ্‌ ...	...	১৫ গ্রেন্‌

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিয়া রাখিতে পার। যত বার দমকা ভেদ হইবে, তত বার এক একটী পুরিয়া খাইবে। অনেক জায়গায় একটী পুরিয়ার বেশী খাইতে হয় না। কখন কখন তিন চারিটী পুরিয়ারও দরকার হয়। যাই হোক্‌, যতক্ষণ ভেদ বন্ধ না হবে, ততক্ষণ ঐ পুরিয়া খাইবে। দরকার হইলে

অস্থদের মাত্রাও বাড়াইয়া দিতে পার। অর্থাৎ ১৫ গ্রেনের বদলে দুই অস্থদই ২০ গ্রেন্ করিয়া খাওয়াইতে পার। যাদের অম্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে দম্‌কা ভেদ হয়, আর এই অস্থদ খাওয়া যাদের এক রকম অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদের অস্থদের মাত্রা বাড়াইবার কখন কখন দরকার হয়। ১৫ গ্রেনের পুরিয়া দু বার খাওয়াইয়াও যদি তেমন ফল না পাও, তবে দুই অস্থদই ২০ গ্রেন্ করিয়া দিবে। ২০ গ্রেনের একটা পুরিয়াতেই বেশ উপকার হয়। দরকার হইলে ১৫ গ্রেনের দুটো পুরিয়া এক বারে খাওয়াইয়া দিতে পার। দম্‌কা ভেদ একটু বাড়াবাড়ি রকম হইলে আমি প্রায়ই দুটো পুরিয়া এক বারে খাইতে দিয়া থাকি।

দম্‌কা ভেদ বন্ধ করিবার ত বেশ অস্থদই জানা থাকিল। কিন্তু দম্‌কা ভেদ আর না হয়, তার উপায় কি ? তারও উপায় আছে। বেশ উপায়ই আছে আগে ঠিক্ কর, দম্‌কা ভেদ কেন হয়। তার পর তার উপায় সহজেই করিতে পারিবে। অপাক, অজীর্ণ থেকে অম্বল (অম্ল) হয়। তার পর সেই অম্বলেই পেট-নাবায়—সেই অম্বল থেকেই দম্‌কা ভেদ হয়। এর আগেই বলিছি, যে কারণেই হোক্ অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা হইলেই পেটের-ব্যামো হয়। এখানে অম্বলই সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনার কারণ জানিবে। কাজেই যে অস্থদে অপাক, অজীর্ণ সারে, সেই অস্থদে দম্‌কা ভেদও বারণ হয়। সে অস্থদটা নীচে লিখিয়া দিলাম।

স্যালিসীন্	...	...	৫ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা		...	৫ গ্রেন্
পল্‌ব্ ইপেকা (ইপেকা পাউডর)		...	১/৬ গ্রেন্
	(১ গ্রেনের ৬ ভাগের এক ভাগ)		
পেপ্‌সিন্	...	...	৩ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। এই পুরিয়া রোজ তিন বেলা তিনটে খাইতে দিবে। এই নিয়মে কিছু দিন এই পুরিয়া খাইলে আর খাওয়া দাওয়ার (পথ্যের) ধরাধর করিলে, অপাক অজীর্ণ গেলে, অগ্নি হইলে আর কি অম্বল থাকিতে পারে, না হইতে পারে? কাজেই, দম্‌কা ভেদও আর হইতে পারে না। দম্‌কা ভেদের কারণ দূর হইলে আর দম্‌কা ভেদ কোথা থেকে হবে? পেটে আর আঁতড়িতে (অন্ত্রে) অম্বল (অম্ল) জন্মিয়াই না দম্‌কা ভেদ হয়। স্যালিসীনের ঐ পুরিয়া অম্বলের (অম্লের) ব্যামোর যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর আছে কি না জানি না। স্যালিসীনে পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) বল বৃদ্ধি করে। বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডায় অম্বল (অম্ল) নষ্ট করে। সোডা দু রকম। বাইকার্ব্বণেট্ আর কার্ব্বণেট্। বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডার চেয়ে কার্ব্বণেট্ অব্ সোডা বেশী ক্ষার। এই জন্যে, পেটের আর আঁতের (অন্ত্রের) অম্বল (অম্ল) নষ্ট করিবার জন্যে বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা খাইতে দেওয়াই ভাল। কার্ব্বণেট্

অব্ সোডা বেশী ক্ষার বলিয়া, অনেক দিন খাইলে পেটের শ্লেষ্মা ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেনের) অবস্থা কিছু খারাপ হইতে পারে। অত অল্প মাত্রায় ইপেকা যকৃতের দোষ শুধ্‌রে দেয়। কমই হোক্, আর বেশীই হোক্, যকৃতের (লিবরের) দোষ না হইলে অপাক, অজীর্ণ, অম্বলের (অম্লের) ব্যামো এ সব হইতে পারে না। পেপ্‌সিনে অগ্নি বৃদ্ধি হয়, পরিপাক করিবার শক্তি বাড়ে। হজমের ভাল কথা পরিপাক।

আমরা যা খাই তা দু জায়গায় পরিপাক (হজম) হয়। পেটে পাকস্থলীতে আর আঁতড়িতে (অন্ত্রে)। পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর পিঠ যে একটী সরু পর্দ্দা দিয়া ঢাকা, ডাক্তরেরা তাকে মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন বলেন। ভাল বাঙ্গালায় শ্লেষ্মা-ঝিল্লি বলে। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির কথা এর আগেই বলিছি। কিছু খাইলে বা খাইবার সময় হইলে পেটের (পাকস্থলীর) এই শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গা দিয়া এক রকম রস বাহির হয়। এই রসকে ভাল বাঙ্গালায় পাচকরস বলে। পাচকের অর্থ যে পাক করে। এই রসে আহার পাক করে বলিয়া একে পাচক রস বলে। ডাক্তরেরা গ্যাষ্ট্রিক্ জুস বলেন। পাচক-রসই বল, আর গ্যাষ্ট্রিক্ জুস্‌ই বল, অর্থ এক। পাচক-রসে একটী জিনিশ আছে; সেই জিনিশের বলেই আহার পরিপাক হয়। সেই জিনিশটীকে ডাক্তরেরা পেপ্‌সীন্ বলেন। পাচক-রসে (গ্যাষ্ট্রিক্ জুসে) সেই জিনিশটী (পেপ্‌সীন্) যত দিন ঠিক থাকে, তত দিন পরিপাকের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া গেলে পাচক-রসে

পেপ্‌সীন্ যেমন থাকা উচিত, তা নাই, ঠিক্ করিবে। এ অবস্থায় রোগীকে পেপ্‌সীন্ খাইতে দিলে তার পরিপাক করিবার শক্তি বাড়ে। এই জন্যেই বলিতেছি যে, স্যালিসিনের ঐ পুরিয়া অপাক, অজীর্ণ, আর অম্বলের (অম্লের) ব্যামোর যেমন অসুদ, তেমন আর নাই।

অম্বল (অম্ল) থেকে যে কেবল দম্‌কা ভেদ হয় তা নয়। অম্বল (অম্ল) থেকে শূল-ব্যথাও হয়। এই শূলকে বৈদ্যরা অম্ল শূল বলেন। অম্ল-শূল খুব সাধারণ রোগ। যাদের অম্বলের ব্যামো আছে, মাঝে মাঝে তাদের পেটে যে এক রকম ব্যথা ধরে, সেই ব্যথাকেই অম্ল-শূল বলে। শূল-ব্যথায় রোগীর ক্লেশের সীমা থাকে না। ব্যথার যন্ত্রণায় রোগী অনেক জায়গায় আত্মহত্যা করে। অমুকের শূল-ব্যথা ছিল, সে যন্ত্রণা আর সহ্য করিতে না পারিয়া গলায় দড়ি দিয়া মরিয়াছে—পাড়াগাঁয়ে এ রকম ঘটনা সাধারণ। শূল-ব্যথা একবার হইলে আর সারে না—আমাদের দেশের ছেলে বুড়ো মেয়ের এই বিশ্বাস। এ রকম বিশ্বাস, নিভ্রান্ত ভুলও নয়। কেন না, বহুদিনে যে রোগের সৃষ্টি হয়, সহজে সে রোগ সারিতে চায় না। যাই হোক্, রোগী যদি খুব সাবধান হয়, আর খাওয়া দাওয়ার খুব ধরাধর করে, তবে যে শূল-ব্যথা সারে না বলিতেছি, তাও ভাল হয়। শূল-ব্যথার যে যাতনা, সে যাতনা দূর করিবার কি কোন অসুদ আছে? আছে। খুব ভাল অসুদই আছে। শূল-ব্যথায় আমি যে অসুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

মিয়ুরিয়েট্‌ অব্‌ মর্ফিয়া ...	...	১ গ্রেন্‌
স্পিরিট্‌ ক্লোরোফর্ম্ম ...	...	২ ড্রাম্‌
টিংচর জিঞ্জার (আদার আরক)	...	৬ ড্রাম্‌
য়্যাকুই য়্যানিথাই (ডিল্‌ ওয়াটর)		৬ ঔন্স পূরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও, যতক্ষণ ব্যথা না সারিবে, ২ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইবে। অনেক জায়গায় এক দাগের বেশী খাইতে হয় না। ব্যথার সূত্র হইতেই যদি অসুদ খায়, তবে একবার অসুদ খাইলেই আগুনে যেন জল পড়ে এমনি হয়। কখন কখন দু দাগ অসুদ না খাইলে ব্যথাটী নিঃশেষ হইয়া সারে না—তিন দাগ অসুদ প্রায়ই খাইতে হয় না। ফল কথা, শূল-ব্যথার এমন অসুদ আর নাই। যার শূল-ব্যথা আছে, এ অসুদটী তার শিওরে করিয়া রাখা উচিত। কোন খানে যাইতে হইলে, অসুদটী তার সঙ্গে করিয়া লয়ে যাওয়া উচিত। যে রোগই কেন হোক্‌ না, বারে বারে হইলে তার হাত এড়ান ভার। এই জন্যেই বলিতেছি, শূল-ব্যথা মোটে ধরিতেই দিবে না। ব্যথার যে সূত্র হবে, সেই এক দাগ অসুদ খাবে। পেটটা অল্প ব্যথা ব্যথা করিতেছে, বোধ করি আজ যেন ব্যথাটা ধরিবে, আর খানিকক্ষণ দেখি, তার পর অসুদ খাইব। শূল-ব্যথার হাত যিনি এড়াইতে চান্‌, রোগকে তাঁর এ রকম আস্কারা দিলে চলিবে না। ব্যথা একবারে জোর ক'রে ধরিলে, অসুদ খাইয়া তত শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না। এই জন্যেই বারে বারে বলিতেছি যে, ব্যথা মোটেই

ধরিতে দিবে না; অম্বল (অম্ল) রোগে পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, এখানেও খাওয়া দাওয়ার সেই রকম ধরাধর করিবে। আর শূল ব্যথার এই অসুদটী সর্ব্বদা কাছে রাখিবে, তাহা হইলে তুমি শূল-ব্যথার হাত এড়াইলে। অম্বলের (অম্লের) ব্যামোতে স্যালিসীনের যে পুরিয়া দিতে বলিছি, এখানেও রোগীকে সেই পুরিয়া দিবে।

প্রথমে ভাগে মাথা ধরার—মাথার কামড়ের যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, খতিয়ে দেখ ত শূল-ব্যথারও ঠিক্ সেই অসুদটী লিখিয়া দিলাম। তফাত এই, মাথা কামড়ানর অসুদে টিংচর্ জিঞ্জর্ নাই, শূল ব্যথার অসুদে টিংচর্ জিঞ্জর্ আছে। অম্বল (অম্ল) শূলের টিংচর্ জিঞ্জর্ একটি ভাল অসুদ। এই জন্যে, অম্বল-শূলের অসুদ ব্যবস্থা করিবার সময় মর্ফিয়ার সঙ্গে টিংচর্ জিঞ্জর্ দিতে যেন কখনও ভুলিও না।

এই মর্ফিয়া-মিক্‌শ্চর্ যে কত রকম যন্ত্রণার অসুদ তা বলিতে পারি না। শূল-ব্যথার যে ব্রহ্মাস্ত্র, তা ত এইমাত্র বলিলাম। মাথার কামড় আর শূলনিরও যে ব্রহ্মাস্ত্র, তা পূর্ব্বে বলিছি। আর আর যন্ত্রণার কথা দূরে থাক, ফোড়া, পাচড়া, ঘায়েরও যন্ত্রণা এতে সারে। অনেক দিন হইল একটী ভদ্র লোকের ছেলের জ্বর হইছিল। ছেলেটীর বয়স ১৪। ১৫ বছরের কম নয়। জ্বরের আর আর যাতনা ত তার ছিলই, বেশীর ভাগ সে দুই পায়ের কামড়ে একবারে অস্থির হইয়া পড়িল। দুই পায়ের ডিম যেন কুকুরে চিবাইতে লাগিল। ছেলের বাপ, জ্বর-চিকিৎসার প্রথম ভাগ

পড়িছিলেন। জ্বরের সময় মাথার কামড় আর শূলনির যে অসুদ মর্ফিয়া, তা তিনি বেশই জানিতেন। কিন্তু মর্ফিয়া যে আবার পায়ের কামড়েরও তেম্‌নি ভাল অসুদ, তা তিনি জানিতেন না। বইতেও তা কিছু খুলিয়া লেখা নাই। এই জন্যে, ছেলের পায়ের কামড়ের কোন প্রতিকার করিতে পারেন নাই। কিছু দিন পরে আমার সঙ্গে তাঁর দেখা হয়। জ্বরের সময় কখন কখন রোগী পায়ের কামড়ে যে একবারে ভারি অস্থির হইয়া পড়ে, জ্বর-চিকিৎসার প্রথম ভাগে তার চিকিৎসার কথা কিছু লেখা নাই। পায়ের কামড়ের একটা অসুদ তাতে লেখা থাকিলে ভাল হইত। তাঁর এই কথায় আমার চৈতন্য হইল। সেই এক মর্ফিয়া মিক্‌শ্চরই, যে সব রকম কামড় আর শূলনির অতি চমৎকার অসুদ, ভুল ক্রমে সেটী লিখিয়া দেওয়া হয় নাই। দ্বিতীয় ভাগে আপনি এ ভুলটী শুধ্‌রে দিবেন এই বলিয়া তিনি বিদায় হইলেন। তাতেই বলিতেছি, মাথার কামড় আর শূলনিই হোক্ চকের কামড় আর শূলনিই হোক্, হাতের কামড় আর শূলনিই হোক্, পায়ের ডিমের কামড় আর শূলনিই হোক্, পায়ের গাঁইটের কামড় আর শূলনিই হোক্—সেই মর্ফিয়া মিক্‌শ্চরই এ সব রকম কামড় আর শূলনির এক মাত্র অসুদ জানিবে। এ কথাটা যেন কখনও ভুলিও না।

পথ্য——অপাকই হোক্, অজীর্ণই হোক্, অম্বলের ব্যামোই হোক্, পেট-নাবাই হোক্, শুদু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক্, রোগী যদি খাওয়া দাওয়ার খুব ধরাধর না করে, তবে কোন অসুদেই তার কিছু করিতে

পারে না। স্যালিসীনের পুরিয়া রোজ তিনবার করিয়া খায়, কিন্তু পান্ত ভাত, বাসি ডাইল, বাসি তরকারি খাইতে ছাড়ে না। এতে তার গলা-জ্বালা, বুক-জ্বালা, অম্বল ঢেকুর উঠা, পেট ফাঁপা, দমকা-ভেদ সারিতে পারে কি না, একবার ভাবিয়া দেখিলেই বুঝিতে পারিবে। যে সব অত্যাচার সুস্থ শরীরেও সয় না, সে সব অত্যাচারে কি কখনও ব্যামো সারে? কখনই না। পাঁচ গ্রেন্ সোডায় যে অম্বল (অম্ল) নষ্ট করে, পান্ত ভাত খাইলে তার শত গুণ (অম্ল) সৃষ্টি হয়। কাজেই তার ব্যামো ভাল করা অসুদের সাধ্য নয়। এর আগেই বলিছি, রোগী যদি পথ্যের খুব ধরাধর না করে, তবে তোমার বিস্মথেও কিছু করিতে পারে না—স্যালিসীনেও কিছু করিতে পারে না। আহারের দোষেই পেটের-ব্যামো হয়—তা যে রকম পেটের-ব্যামোই কেন হোক্ না। এই জন্যে, অসুদের ব্যবস্থা করিয়া রোগীকে বলিয়া দিবে যে, পেটের-ব্যামো যদি ভাল করিতে চাও, তবে শুদু অসুদের উপর নির্ভর করিয়া থাকিও না। খাওয়া দাওয়ার যত দূর ধরাধর করিতে পার, করিবে। নৈলে খরচ পত্র করিয়া অসুদ খাওয়া তোমার বৃথা হবে। শুদু আমাশার চিকিৎসার কথা বলিবার সময় পথ্যের যে ব্যবস্থা করিছি, এখানেও ঠিক্ সেই ব্যবস্থা করিবে। লঘু আহার থেকে ক্রমে সৈয়ে সৈয়ে তবে অন্ন পথ্য দিবে। পরিপাক করিবার শক্তি সহজ হইলে তবে নিয়ম মত দু বেলা ভাত খাইতে দিবে। কত খাইলাম, বা কত বার খাইলাম, এর হিসাব না রাখিয়া, যা খাই তা হজম হয় কি না, তারই হিসাব রাখা দরকার। যদি

বল, হজম হয় কি না, তা কেমন করিয়া বুঝিব। তা বুঝা শক্ত নয়। ছেলে মানুষেও তা বুঝিতে পারে,—যার একটু জ্ঞান হইয়াছে, সেই বুঝিতে পারে। যা খাও, তা ভাল হজম না হইলে পেট ভার হয়, পেট ভাট্ ভুট্ করে, পেট ফাঁপে, পেট কামড়ায়, খ'য়ে ঢেকুর উঠে, অম্বল (টক) ঢেকুর উঠে, খিদে হয় না, খাইতে ইচ্ছা হয় না, বাহ্যে সহজ হয় না—বাহ্যে পরিষ্কার হয় না। হয় পেটের-ব্যামোর মত বাহ্যে হয়, নয় মল একেবারে আঁটিয়া যায়। মলে ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর সহজ মানুষের মল যেমন হল্‌দে, তেমন হল্‌দে হয় না—মলের রং হয় সাদা হয়, নয় মেটে হয়, নয় কাল হয়। এ ছাড়া, যা খাও, তা ভাল হজম না হইলে শরীরের বল ক্রমে কমিয়া যায়—শরীরের রক্তও কমিয়া যায়—আর গায়ের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়। তা হবেই ত। শরীরের শক্তি বল, রক্ত বল, বর্ণ বল, সব আহারের গুণেই হয়। পরিপাক না হইলে আহারের কোনও গুণই হইতে পারে না। পরিপাক হইলে শাক ভাতেও গায়ে বল হয়। পরিপাক না হইলে ক্ষীর, ছানা, ননিতেও গায়ে বল হয় না। যা খাও, বেশ পরিপাক হইলে, তবে তা থেকে রক্ত হয়। চামড়া, চর্ব্বি, মাস (মাংস) হাড়—শরীরে যা যা আছে, সকলেরই মূল রক্ত। আবার এ দিকে সেই রক্তের মূল আহার। আহার করিলেই যে তা থেকে রক্ত হয়, গায়ে বল হয়, তা নয়। আহার পরিপাক হইলে, তবে তা থেকে রক্ত হয়, গায়ে বল হয়। এই জন্যে, এখানে অপাক, অজীর্ণ, আর পেটের-ব্যামোর কথা এত করিয়া

বলিলাম। পথ্যের ধরাধর করিতেও সেই জন্যে এত করিয়া বলিলাম। বলিতে গেলে, পোনর আনা রোগ অপাক, অজীর্ণ থেকেই হয়। এর পর এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। অপাক অজীর্ণ, অম্বলের ব্যামো, পেটের-ব্যামো এ সব রোগে রোগীর পক্ষে এক রকম পথ্য কখনই ব্যবস্থা হইতে পারে না। কেন না, এক জনের পক্ষে যা সুপথ্য আর এক জনের পক্ষে তা কুপথ্য হইতে পারে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। কারু কারু রুটি সয় না লুচি বেশ সহ্য হয়। আবার কারু কারু লুচি মোটেই সহ্য হয় না। রুটি খাইলে ভাল থাকে। সাগু খাইলে কারু কারু পেট ভার হয়, য়্যারারুট্ খাইলে থাকে ভাল। আবার কারু কারু সাগু য়্যারারুট্ দুয়েতেই পেট গরম হয়; যবের মণ্ড খাইলে তারা থাকে ভাল। এই জন্যেই বলিতেছি, যার যে আহার বেশ পরিপাক হয়, বেশ সহ্য হয়, সেই আহারই তার ঠিক্ পথ্য। বৈদ্য কি ডাক্তর আগে থাকিতে তা বলিয়া দিতে পারেন না। রোগীকে তা পরীক্ষা করিয়া ঠিক্ করিয়া লইতে হয়। লঘু বলিয়া চিকিৎসক যে আহার ব্যবস্থা করিবেন, রোগীর তা ভাল পরিপাক না হইলে, তাঁর পক্ষে সে আহার লঘু না বলিয়া গুরুই বলিতে হইবে! এই জন্যে, পথ্যের বেলা চিকিৎসক আর রোগী দু জনেরই বিশেষ বিবেচনার দরকার। ফল কথা, পরিপাক লইয়াই কথা। রোগী যা সহজে পরিপাক করিতে পারে, তার পক্ষে তাই সুপথ্য আর লঘু আহার।

দ্বিতীয় ভাগ সারা।

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

তৃতীয় ভাগ।

ইহাতে রক্ত-আমাশা, রক্ত ভেদ, বমি, হিকি, ক্রমি, পেট ফাঁপা, প্রস্রাব-বন্ধ, বাহ্যে-বন্ধ, পক্ষাঘাত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা, ঠোঁটে আর জিবে ঘা, উর্ব্বাণ, বাক্-রোধ, কানে পুঁয হওয়া, কানে কম শুনা, কর্ণমূল ফোলা——স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) বাকী এই সব রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। কথায় কথায় দৃষ্টান্ত আর প্রেস্কৃপশন্ দেওয়া হইয়াছে। নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাজে প্রাক্টিস্ অব্ মেডিসিনের চেয়ে কম হবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ ষ্ট্রীট্,
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত।
১৩১৩। জ্যৈষ্ঠ।
মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ⁄১০

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

তৃতীয় ভাগ।

ইহাতে রক্ত-আমাশা, রক্ত-ভেদ, বমি, হিক্কি, ক্রুমি, পেট-ফাঁপা, প্রস্রাব-বন্ধ, বাহ্যে-বন্ধ, পক্ষাঘাত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা, ঠোঁটে আর জিবে ঘা, উর্দ্ধ্বাণ, বাক্-রোধ, কানে পূয হওয়া, কানে কম শুনা, কর্ণমূল ফোলা——স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) বাকী এই সব রকম উপসর্গের কথা খুব সরল ভাষায় লেখা হইয়াছে। কথায় কথায় দৃষ্টান্ত আর প্রেস্ক্রপ্শন্ দেওয়া হইয়াছে। নামে জ্বর-চিকিৎসা, কাযে প্রাক্‌টিস্ অব্ মেডিসিনের চেয়ে কম হবে না।

গৃহস্থ আর পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের জন্যে।

ডাক্তর যদুনাথ মুখোপাধ্যায় প্রণীত।

পঞ্চম সংস্করণ।

কলিকাতা, ৩০ নং কর্ণওয়ালিস্ স্ট্রীট্,
সংস্কৃত যন্ত্রের পুস্তকালয় হইতে প্রকাশিত
১৩১৩। জ্যৈষ্ঠ।

মূল্য ১৲ টাকা, ডাক মাশুল ৴১০

সূচীপত্র

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা ।

পৃষ্ঠা।

পৃষ্ঠা

পৃষ্ঠা

সরল

জ্বর-চিকিৎসা।

তৃতীয় ভাগ।

অম্বল-শূলের আর একটী ভাল অসুদ আছে। এ অসুদে আমি অনেক রোগী ভাল করিছি। কোষ্ঠবদ্ধ থাকিলে, এ অসুদে খুব উপকার হয়। আবার খুব কম খরচে এ অসুদটী তয়ের হয়। তাতেই বলি, কাঙাল গরিবদের অম্বল-শূলের এর চেয়ে ভাল অসুদ আর নাই। অসুদটী নীচে লিখিয়া দিলাম—

ম্যাগ্নীশিয়া	...	...	১০ গ্রেন্
রুবার্ব (রেওঁচিনি)	...	...	৫ গ্রেন্
শুঁটের গুঁড়ো (জিঞ্জর পাউডার)		...	৫ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোজ তিন বেলা তিনটা পুরিয়া খাইতে দিবে। যত দিন রোগটী নির্দ্দোষ হইয়া না সারিবে, তত দিন নিয়ম করিয়া এই পুরিয়া খাইবে। অম্বল-শূলই

হোক্, আর অম্বলের ব্যামোই হোক্, পথ্যের ব্যবস্থা দুয়েতেই সমান। ৪৮২—৪৮৫র পাতে পথ্যের কথা বলিছি।

৪৩র পাতে যে মর্ফিয়া-মিক্শ্চর্ লেখা আছে, বলিতে গেলে, তাতে না সারে এমন যন্ত্রণাই নাই। ৪৮১—৪৮২র পাতে এর কথা বেশ করিয়া বলিছি। সব কথা বেশ করিয়া খুলিয়া না বলিলে, যদি বুঝিতে না পার, এই জন্যে এখানে আর একটী যন্ত্রণার কথা লিখিয়া দিলাম। এ যন্ত্রণাও সেই মর্ফিয়া মিক্শ্চরে ভাল হয়। বাধকের ব্যথা বলিয়া মেয়েদের একটী রোগ আছে। ঋতুর সময়ে এই ব্যথা উপস্থিত হয়। যাদের এ ব্যথা আছে, ব্যথা থাকিতে তাদের সন্তান হয় না। এই জন্যেই, একে বাধকের ব্যথা বলে। বাধক—কিসের বাধক? সন্তান হওয়ার বাধক। যাদের বাধকের ব্যথা আছে, ঋতুর সময় তারা বড়ই কষ্ট পায়। কোমর, তলপেট আর দুই কুচ্‌কির উপর—এই সব জায়গায় যেন জিওল মাছে হানিতে থাকে। যাতনায় রোগিণী যেন কাটা কৈতরের মত ছট্‌ফট্ করিতে থাকে। এমন যে যাতনা, এও মর্ফিয়া-মিক্শ্চরে সারে। যাতনা যতক্ষণ থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক দাগ করিয়া অসুদ খাওয়াইবে। এই অসুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগিণীকে যদি গরম জলের টপে কোমর পর্য্যন্ত ডুবাইয়া বসাইতে পার, তবে দেখিতে দেখিতে ও সব যাতনা দূর হয়। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

সম্প্রতি এক জন কম্পাউণ্ডার আমাকে জিজ্ঞাসা করিয়াছিলেন, মহাশয় আপনার সরল জ্বর-চিকিৎসায় ৪৩র

পাতে যে মর্ফিয়া মিক্‌শ্চর্ লেখা আছে, সে কোন্ মর্ফিয়া ? য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া, না মিউরিয়েট অব্ মর্ফিয়া ? দু রকম মর্ফিয়ার কোন্ রকম, বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলে ভাল হইত। দুয়েতেই সমান ফল পাওয়া যায় বলিয়া, আমি বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিই নাই। দু রকম মর্ফিয়ার গুণের তফাত থাকিলে বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিতাম। যাই হোক্, আমি মিয়ুরিয়েট অব মর্ফিয়াই ব্যবহার করিয়া থাকি। আমার এই উত্তরেই তিনি সন্তুষ্ট হইলেন।

৫। রক্ত-আমাশা——রক্ত-আমাশা বড় খল রোগ। একটু পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চায় না। এ ছাড়া, রক্ত-আমাশায় যে কত ক্লেশ, কত কষ্ট, কত যাতনা, রক্ত-আমাশা যার একবার হইয়াছে, কেবল সেই তা জানে। রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা ডিসেণ্টরি বলেন। অনেকে ভুল করিয়া ডায়ারিয়াকে ডিসেণ্টরি বলেন। শুদু আমাশাকেও অনেকে ডিসেণ্টরি বলিয়া থাকেন। ফল কিন্তু তা নয়। আম আর রক্ত বাহ্যে যাওয়াকে ডিসেণ্টরি বলে। ডিসেণ্টরিতে আম আর রক্ত দুই-ই থাকা চাই। এর আগেই (২৫৪র পাতে) বলিছি যে, সবিরাম জ্বরের (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরে) আর স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই সেই এক সম্বন্ধ। ম্যালেরিয়া-জ্বর যেমন এক বারে হাজার হাজার লোকের হয়, রক্ত-আমাশাও তেমনি এক বারে হাজার হাজার লোকের হইতে পারে, আর হইয়াও থাকে।

রক্ত-আমাশা সামান্য রকম পেটের-ব্যামোর ভাবেই আরম্ভ হইতে পারে, কিম্বা গোড়া থেকেই এক বারে রক্ত-আমাশা দেখা দিতে পারে। প্রথমে রোগীর পেট কাম্‌ড়ে পাত্‌লা বাহ্যে হয়। বাহ্যেতে পিত্তির ভাগ বেশী দেখা যায়। আর বাহ্যের পর মল-দুওর যেন ছেঁচাতে বা জ্বালা করিতে থাকে। তার পর, বারে বারে বাহ্যে যাইতে হয়। বাহ্যে বসিয়া রোগী পেটের কামড়ে অস্থির হয়। পেটের কামড় যত বাড়ে, বেগও তত বেশী দিতে হয়। এই খল রোগ যে রকম করিয়াই কেন আরম্ভ হোক্ না, বাহ্যে শীঘ্রই খুব কম হইয়া যায়। বাহ্যেতে মল প্রায়ই থাকে না; কেবল আম আর রক্ত। রক্ত-আমাশার রোগীর বাহ্যের গন্ধ যার নাকে এক বার গিয়াছে, সে গন্ধ তার আর কখনও ভুল হয় না। পুরাণ রক্ত-আমাশায় বাহ্যের দুর্গন্ধ আরও বেশী। কার সাধ্য সে দুর্গন্ধে তিষ্ঠুতে পারে? রক্ত-আমাশা সব রোগীরই যে এক রকম হয়, তা নয়। সামান্য রকম পেট নাবায় যে কষ্ট হয়, কারো কারো তার চেয়ে বেশী হয় না। আবার কারো কারো ভয়ানক রকম রক্ত-আমাশা হয়, আর তাতেই তারা মারা পড়ে। সোজা-সুজি রক্ত-আমাশায় পেটের কামড় আর বাহ্যে বসিয়া বেগ দেওয়া ছাড়া আর কোনও বিশেষ লক্ষণ দেখা যায় না। আহারের পর পেটের কামড় বাড়ে। যাই হোক্, ভাল রকম চিকিৎসা হইলে ব্যামো শীঘ্রই সারিয়া যায়।

রক্ত-আমাশা দু রকম। নূতন আর পুরাণ। এখন এই দু রকম রক্ত-আমাশার কথা এক এক করিয়া বলিব।

(১) নূতন রক্ত-আমাশা —লক্ষণ। নূতন রক্ত-আমাশা হইবার আগে কারো কারো বেশ শীত বোধ হয়, তার পর জ্বর হয় আর নাড়ীর বেগ বাড়ে। রক্ত-আমাশা হইবার আগে, যাদের এই রকম শীত বোধ হইয়া জ্বর হয় আর নাড়ীর বেগ বাড়ে, তাদের বাহ্যেতে আম আর রক্ত শীঘ্রই দেখা দেয়; আর গোড়া থেকেই তাদের বাহ্যেতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়। বারে বারে বাহ্যে যাইতে হয়। বাহ্যের বেগ উপস্থিত হইলে স্থির থাকিবার যো কি? তখনই বাহ্যে যাইতে হয়। শেষে বেগ আর শূলনি এত বাড়ে যে, রোগী বাহ্যে বসিয়া আর উঠিতে চায় না। এদিকে আবার বেগ যত বেশী হয়, বাহ্যে করিবার ইচ্ছাও তত বেশী হয়। বাহ্যে পাতলা হয়, আর তাতে আম আর রক্ত ছাড়া কিছুই থাকে না। আম আর রক্তের সঙ্গে খুব শক্ত আর ছোট ছোট গুট্‌লে মলও মিশনো থাকে। অল্প-স্বল্প বাহ্যে যা হয়, তাতে রোগীর আরাম না হইয়া বরং যন্ত্রণাই বাড়ে। বাহ্যের রং যেমন কাল, তার দুর্গন্ধও তেমনি বেশী। বাহ্যের সঙ্গে রক্ত আর পূয মিশনো থাকে। রক্ত আর পূয কোথা থেকে আসে? রক্ত-আমাশায় যে আঁতের (অন্ত্রের—ইণ্টেষ্টিনের) মধ্যে ঘা হয়। সেই ঘা থেকে রক্ত আর পূয আসে। অন্ত্রের মধ্যে ঘা হওয়ার কথা এখনই বলিব। বারে বারে বাহ্যে যাইবার ইচ্ছা যেমন হয়, বারে বারে প্রস্রাব করিবার ইচ্ছাও তেমনি হয়। প্রস্রাব খুব লাল হয়, আর প্রস্রাব করিতে জ্বালা করে। কখন কখন অতি কষ্টে ফোটায় ফোটায় প্রস্রাব হয়।

রক্ত-আমাশার রোগীর গতিক ভাল কি মন্দ, কি দেখিয়া বুঝিবে ?——যে রোগীর গতিক ভাল নয়, তার পেটে ব্যথা হয়, পেটে হাতের চাপ সয় না। তার পরই পেটের ফাঁপ হয়। নাড়ীর যেমন বেগ বাড়ে, তেমনি তুর্ব্বল হয়। জিব শুক্‌নো, রাঙা আর চক্-চকে যেন বার্ণিশ-করা হয়। জিবের গোড়ায়, গালের ভিতর আর ঠোঁটে ঘা ফুটে। কখন কখন জিবের মাঝখানটা এক বারে কাল হইয়া যায়। আর সে ঠিক্ যেন কাঁচা মাংস বাহ্যে যায়। তার পরই, বাহ্যে খুব বেশী বেশী হয় আর জলের মত পাতলা হয়। বাহ্যের রং কটাশে-কটাশে হয়। তুর্গন্ধ এত হয় যে, তার ত্রিসীমানায় কেউ থাকিতে পারে না। দিন রাত্রি রোগী চোকের পাতা বুজে না। তবে কখনও একটু আধটু তন্দ্রার মত হয়—আবার তখনই যেন কেউ ঘুম ভাঙ্গাইয়া দেয়। ক্রমে পেটের ব্যথাটা যায়। (মরিবার ঠিক্ আগেই এইটী ঘটে।) পেটের উপর চাপ দিলে আর ব্যথা বলে না। তার পরই রোগী ভুল বকিতে আরম্ভ করে। রোগীর গা থেকে যেন মরার গায়ের গন্ধ বাহির হয়। হিক্কি উঠিতে থাকে। তার পরই রোগী অবসন্ন হইয়া মারা যায়।

রোগীর গতিক যদি ভাল হয়, তবে এই মাত্র যে সব তুর্লক্ষণের কথা বলিলাম, তার একটীও দেখা দেয় না। তার বাহ্যের অবস্থা ভাল হয়। তার বাহ্যেতে সহজ বাহ্যের গন্ধ ফিরিয়া আসে। পেটের ব্যথা কমিয়া যায়—পেট তেমন ভার-ভারও থাকে না। রোগীর অবসাদও ঘুচিয়া

যায়। রোগী আগের চেয়ে চাঙ্গা হয়। নাড়ীর বেগ কমিয়া যায়। জ্বর যায়। পেটের-কামড়, শূলনি আর বেগ ক্রমে যায়।

রক্ত-আমাশা যে রকমেরই কেন হউক না, তার সঙ্গে জ্বর আর শরীরের গ্লানি থাকিতেই চায়। তবে খুব সামান্য রকম রক্ত-আমাশায় জ্বরও খুব সামান্য রকম হয়। অবসাদও হয় না, খিদেও যায় না, জিবও কোন রকম খারাপ হয় না। কিন্তু সচরাচর যে রক্ত-আমাশা হইয়া থাকে, তাতে রোগী অস্থির হয় আর ঘুমুতে পারে না। তার মুখ দেখিলে বোধ হয়, যেন সে বড় কষ্ট পাইতেছে। এ ছাড়া, তার দুই উরতে খাল ধরে। খাল ধরার জন্যে তাকে বড়ই যন্ত্রণা পাইতে হয়। জিব অপরিষ্কার হয় আর কাঁটা-কাঁটা হয়। নাড়ীর বেগ বাড়ে। নাড়ী শক্ত আর সরু হয়। গা খস্‌-খসে শুক্‌নো আর গরম হয়। পিপাসা খুব হয়। আহারে মোটেই রুচি থাকে না। মাঝে মাঝে হাঁপ হয়, আর শরীর বড় অবসন্ন হয়। রক্ত-আমাশা যদি সারে, তবে ব্যামো ভাল হইবার লক্ষণ গুলি ক্রমে আসিয়া উপস্থিত হয়। সকলের আগে, বারে বারে বাহ্যে যাওয়া আর পেটের ব্যথা কমে। এ ব্যামো এত আস্তে সারে যে, ব্যামোটী নির্দ্দোষ না সারিলে আর ভরসা বা বিশ্বাস হয় না—ব্যামো পাণ্টাইবারও ভয় যায় না। রক্ত-আমাশার রোগী নির্দ্দোষ হইয়া সারিতে দেরি হইয়াই থাকে।

কারণ—এর আগেই বলিছি যে, এক এক রোগের দুই দুই কারণ। দূর কারণ আর নিকট কারণ। সব

রোগেরই যে এই দুই কারণ সব জায়গায় বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায়, তা নয়। তবে মন লাগাইয়া খুঁজিলে, চারি ভাগের তিন ভাগেরও বেশী রোগের দূর কারণ আর নিকট কারণ স্পষ্ট জানিতে পার। ২৪০—২৪২র পাত এক বার ভাল করিয়া পড়। এখন রক্ত-আমাশার দূর-কারণ আর নিকট-কারণের কথা বলি। দূর-কারণ—খুব গরমের সময় রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, খুব গরম কাল—খুব গ্রীষ্মের সময়, এ রোগের একটী দূর-কারণ। যারা খাবার জিনিষের ভাল মন্দ বিচার করে না—যা পায়, যা যোটে, তাই খায়, তাদেরই রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, কদাহার রোগের একটী দূর কারণ। কদাহার কাকে বলে? কু আহারকে ভাল বাঙ্গালায় কদাহার বলে। যা খাইলে শরীর সুস্থ না হইয়া বরং অসুস্থ হয়, তাকেই কদাহার (কু আহার) বলে। লোণা-মাছ (যেমন লোণা ইলীশ), লোণা মাংস, কাঁচা ফল-ফুলরি (যেমন কেষ্টো কুল, কাঁচা পেঁয়ারা) এ সবই কদাহার। যারা খুব বেশী শ্রম করে, তেমন বিশ্রাম করিতে পায় না; যাদের আহারাদি ভাল জোটে না; যারা রৌদ্রে পোড়ে, বৃষ্টিতে ভেজে, শিশির ভোগ করে; তাদেরই রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, এ সব অনিয়মও রক্ত-আমাশার দূর কারণ জানিবে। যারা খাওয়া দাওয়ার ও আর আর সকল কাজেই নিয়ত অত্যাচার করে, তাদেরও রক্ত-আমাশা বেশী হয়। এই জন্যে, অত্যাচার রক্ত-আমাশার একটী দূর কারণ। অত্যাচার বলিলে যে কেবল্ একটি কাজেরই

অত্যাচার বুঝায়, তা নয়। অত্যাচার সকল কাজেই হয়। পাঁচ কোষ কাঁটাল খাইলে, তাকে অত্যাচার বলে না। তুমি বড় একটা কাঁটালের একবারে আধ খানা খাইয়া ফেলিলে—তাকেই অত্যাচার বলে। স্নান করিবার সময় রোজ একটু করিয়া সাঁতার দিলে, তাকে অত্যাচার বলে না। তুমি ভোরে জলে নামিলে, আর বেলা দুপর পর্য্যন্ত সাঁতার কাটিলে আর ডুব ফুঁড়িলে—তাকেই অত্যাচার বলে। যার মোটেই খিদে হয় না, যা খায় ভাল পরিপাক করিতে পারে না, ডাক্তরের ব্যবস্থা লইয়া সে যদি রোজ ভাত খাইবার আগে চা-চামচের এক চামচ (এক ড্রাম) একের নম্বর ব্রাণ্ডি নিয়ম করিয়া খায়, তাকে অত্যাচার বলে না। তুমি দিনের মধ্যে আধ বোতল ব্রাণ্ডি পার করিলে—তাকেই অত্যাচার বলে।

তার পর রক্ত-আমাশার নিকট কারণ বলি—ম্যালেরিয়া রক্ত-আমাশার একটী নিকট কারণ। সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর) আর স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) যেমন ম্যালেরিয়ার ফল, রক্ত-আমাশাও ম্যালেরিয়ার তেমনি একটী ফল। ২৫৪র পাতে এ কথা বলিছি। সবিরাম-জ্বর আর স্বল্পবিরাম জ্বরের যেমন কারণ ম্যালেরিয়া, রক্ত-আমাশারও তেমনি কারণ ম্যালেরিয়া। অর্থাৎ ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই সেই এক সম্বন্ধ। এ কথাও ৪৮৯র পাতে বলিছি। নোংরা ঘোলা বা অপরিষ্কার জল খাওয়া রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। গায়ে কোন রকম বেশী ঠাণ্ডা লাগান এ রোগের আর

একটী নিকট কারণ। বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে কাপড়ে থাকা শিশিরে শোআ, শীতের সময় আদুল গায়ে থাকা ; এই রকম অত্যাচারেই গায়ে বেশী ঠাণ্ডা লাগান হয়। বাইরে শুইয়া রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। শীত কালের ত কথাই নাই—গ্রীষ্মকালেও গ্রীষ্মের জন্যে বাইরে শুইয়া রাত্রের নরম হাওয়া গায়ে লাগান বড় দোষ। দিনের বেলায় তেমন গরমের পর, রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা আরও দোষ। উপ্‌রো উপ্‌রি এ রকম অত্যাচার করিয়া রক্ত-আমাশার হাত কখনই এড়ান যায় না। আমাদের এই ম্যালেরিয়ার দেশে রাত্রে এ রকম অত্যাচার করা, আর শরীরের মধ্যে ম্যালেরিয়াকে জায়গা দেওয়া, সমান—এ কথাটা যেন মনে থাকে। ম্যালেরিয়া যে রক্ত-আমাশার নিকট-কারণ, তা এই মাত্র বলিছি। মলবদ্ধ রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। যে জোলাপে ভারি ভেদ হয়, সে জোলাপে রক্ত-আমাশা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। এই জন্যে, সে রকম জোলাপ লওয়াও রক্ত-আমাশার আর একটী নিকট কারণ। এই জন্যে, জোলাপ বেশ বুঝিয়া স্থুঝিয়া লইতে হয়। কোন্ কোন্ জোলাপ লইলে খুব বেশী জলবৎ ভেদ হয়, এর পর তা বলিব। যে সব জায়-গায় ম্যালেরিয়া-জ্বরের খুব বাড়াবাড়ি সে সব জায়গায় রোগা কাহিল আর দুর্ব্বল লোকদেরই রক্ত-আমাশা বেশী হয়। সামান্য একটু অত্যাচারেই তাদের রক্ত-আমাশা হয়। এ ছাড়া, সে সব জায়গায় সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর) কিম্বা স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের)

সঙ্গে রক্ত-আমাশা প্রায়ই থাকে। কিম্বা সেই এক রোগীরই একবার বা রক্ত-আমাশা, একবার বা সবিরাম-জ্বর বা স্বল্পবিরাম-জ্বর হয়।

উপসর্গ——আসল রোগের সঙ্গে আর কোনও রোগ যোগ দিলে, সেই রোগকে আসল রোগের উপসর্গ বলে। রক্ত-আমাশা রোগে অনেক উপসর্গ ঘটে। রক্ত-আমাশার সঙ্গে, রক্ত-আমাশা হইবার আগে, কিম্বা রক্ত-আমাশা হই-বার পরে কম্প-জ্বর বা স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) হইতে পারে। রক্ত-আমাশায় আর একটী উপসর্গ ঘটে। সে উপসর্গটীকে ডাক্তরেরা স্কর্বি বলেন। স্কর্বি এক রকম রোগ। অনেক দিন শাক সব্জি আর টাট্‌কা রসাল ফল, মূল না খাইলে এই রোগ হয়। এ রোগে দাঁতের গোড়া ফোলে, দাঁতের গোড়া আল্‌গা হইয়া যায়, দাঁতের গোড়ার আঁইট্ থাকে না, দাঁতের গোড়া দিয়া রক্ত পড়ে, আর রোগী দুর্ব্বলের একশেষ হয়। এ ছাড়া রোগীর সকল গায়ে বেগুণে রঙের সব ফোটা-ফোটা দাগ ফোটে। রক্ত-আমাশায় লিবর (যকৃত, মেটে) বাড়িতে পারে, লিবরের ইন্‌ফ্ল্যামেশন্ (প্রদাহ) হইতে পারে, কিম্বা লিবরের ফোড়া হইতে পারে। আমাদের এই গরম দেশে রক্ত-আমাশা রোগে যকৃতের (লিবরের) এই সব দোষ খুবই ঘটে। এই জন্যে, সব রক্ত-আমাশা রোগীরই যকৃত (লিবর) পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত রক্ত-আমাশা যত দিন প্রবল থাকিবে, রোজ খুব সাবধানে যকৃত পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। এমন কি, রক্ত-আমাশা

সারিয়া গেলেও যকৃত পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত। যকৃত বাড়িলে, যকৃতের প্রদাহ হইলে, আর যকৃতে ফোড়া হইলে, কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, আর কেমন করিয়াই বা তা ঠিক করিতে হয়, এর পর সে সব বেশ করিয়া বলিব। রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতে (লিবরে) ফোড়া হওয়ার কোন সম্বন্ধ আছে কি না, আজও তা ঠিক্ হয় নাই। বড় বড় ডাক্তরেরা বলেন, রক্ত-আমাশা আর যকৃতে ফোড়া, দুয়েরই কারণ এক; কিন্তু পরস্পর কোন সম্বন্ধ নাই। যাই হোক্, আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশা আর যকৃতের ব্যামো যে খুব সাধারণ, আর এই দুই ব্যামোই যে ঢের জায়গায় এক সঙ্গেই ঘটে, তা যেন সকলেরই মনে থাকে। একে রক্ত-আমাশা নিজেই খুব শক্ত ব্যামো, তার উপর যকৃতের ব্যামো যোগ দিলে রোগীর বিপদ যে খুবই বাড়ে, তা বুঝাই যাইতেছে। ভিজে সোঁতা মাটিতে বাস, হিম-বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা —এই সব অত্যাচারে যাদের শরীর একবারে ভগ্ন আর দুর্ব্বল হইয়া গিয়াছে, রক্ত-আমাশা হইলে তাদের জীবন রক্ষা হওয়া ভার। সচরাচর রক্ত-আমাশা যে রকম হইয়া থাকে, এদের রক্ত-আমাশা সে রকম নয়। এদের রক্ত-আমাশা ভারি বাড়াবাড়ি রকমেরই দেখা যায়। এ রকম রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা ম্যালিগ্ন্যাণ্ট ডিসেণ্টরি বলেন। ভাল বাঙ্গালায় মারাত্মক রক্ত-আমাশাও বলে, সাংঘাতিক রক্ত-আমাশাও বলে। এমন অনেক জায়গা আছে, যেখানে কেবল অপরিষ্কার জল খাইয়া, আর রাত্রে হিম বাত ভোগ

করিয়া লোকের রক্ত-আমাশা হয়। সে সব জায়গায় আর বেশী অত্যাচার করিবার দরকার হয় না। যদি বল, সে সব জায়গা আবার কি রকম ? আমাদের এই বাঙ্গালা দেশের প্রায় সকল জায়গাই সেই রকম। মোটা কথায়, সেই এক অত্যাচারেই কারও বা ম্যালেরিয়া-জ্বর হয়, কারও বা রক্ত-আমাশা হয়। সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবর), স্বল্প-বিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) আর রক্ত-আমাশা—ম্যালেরিয়ার সঙ্গে এই তিনটী রোগেরই এক সম্বন্ধ। এ কথা এর আগেই বলিছি।

রক্ত-আমাশা রোগের শেষে কি ঘটে ?——(১) রক্ত-আমাশা রোগে অন্ত্রে যে ঘা হয়, সেই ঘা বাড়িয়া অন্ত্র ফুটো বা ছাঁদা হইয়া যাইতে পারে। অন্ত্র ফুটো বা ছাঁদা হইয়া গেলে, অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দার সাংঘাতিক প্রদাহ ঘটে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা এই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিটোনিয়ম্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট বলে। ৩৯৮র পাতে এ সব কথা বেশ করিয়া বলিছি। অন্ত্র-ঢাকা পর্দ্দার প্রদাহকে ডাক্তরেরা পেরিটোনাইটিস্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট-প্রদাহ বলে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। (২) অন্ত্র ফাটিয়া যাইতে পারে, আর তার ভিতর থেকে মল বাহির হইয়া পেটের মধ্যে কোন খানে জমা হইতে পারে। পেটের মধ্যে এই রকম করিয়া মল জমা হইয়া বাহিরে ফোড়ার মত ঠেল ধরিতে পারে। একেই ডাক্তরেরা ফীক্যাল্ য়্যাব্‌সেস্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় ফীক্যাল্ য়্যাবসেস্‌কে

মলস্ফোট বলা যাইতে পারে। মলস্ফোটের সোজা বাঙ্গালা মলের ফোড়া। (৩) রক্ত-আমাশা থেকে পায়ী-মিয়া হইতে পারে। আবার পায়ীমিয়া থেকে শরীরের জায়গায় জায়গায় বড় বড় ফোড়া বাহির হইতে পারে। খারাপ ঘায়ের রস, রক্তের সঙ্গে মিশিলে যে রোগ হয়, সেই রোগকে ডাক্তরেরা পায়ীমিয়া বলেন। পায়ীমিয়া বড় খারাপ রোগ। এ রোগের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। (৪) অন্ত্রের ঘা শুকাইয়া একবারে ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ উপস্থিত হইতে পারে; এ রকম কোষ্ঠবদ্ধ বড় সোজা নয়। রোগীকে এর জন্যে নাকালের এক শেষ হইতে হয়। যদি বল, অন্ত্রের ঘা শুকাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয় কেন? কোষ্ঠবদ্ধ কেন হয়, আর কেমন করিয়া হয়, তা বলি। সকলেই জানেন, ঘা শুকাইবার সময়, তার কাছের চামড়া টানিয়া ধরে। চারিদিকের চামড়া এই রকম টানিয়া ধরা, পোড়া-ঘায়ে যেমন স্পষ্ট দেখিতে পাওয়া যায়, তেমন আর কোন ঘায়েই নয়। গালের কি চুয়ালের চামড়া পুড়িয়া গেলে, সেই ঘা শুকাইবার সময় সে দিকের মুখের কেমন বাঁকা তেড়া ভাব হয়, তা অনে-কেই দেখিয়াছেন। অন্ত্রের ঘা শুকাইবার সময়ও তার কাছের সব জায়গায় সেই রকম টান ধরে। সেই টানে গুটাইয়া জড়-সড় হইয়া অন্ত্রের সেই জায়গার খোল কমিয়া যায়। অন্ত্রের এ রকম দুর্দ্দশা হইলে মল যে, সহজে বাহির হইতে পারে না, তা বুঝাই যাইতেছে। কাযেই, এ অবস্থায় ভয়ানক কোষ্ঠবদ্ধ ত হবেই। (৫) রক্ত-

আমাশার খুব বাড়াবাড়ি হইলে রোগী একবারে অবসন্ন হইয়া মরিয়া যাইতে পারে। (৬) অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি (মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ) পচিয়া যাইতে পারে। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি পচিয়া গেলে, রোগী দেখিতে দেখিতে একবারে অবসন্ন হইয়া পড়ে; আর তার পরই মারা যায়। (৭) রোগীর ভয়ানক রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর সেই ধাক্কাতেই সে মারা যাইতে পারে। (৮) রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর ভয়ানক বমি উপস্থিত হইতে পারে; সে বমির আর বিরাম নাই; সে বমি থামানও যায় না। (৯) রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর জিবে ও মুখের ভিতর আর আর জায়গায় শাদা-শাদা এক রকম ঘা ফোটে। এই রকম ঘাকে ডাক্তরেরা য়্যাফ্থি বলেন। য়্যাফ্থির কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। (১০) রক্ত-আমাশা থেকে যকৃতে ফোড়া হইতে পারে। যকৃতের ফোড়াকে ডাক্তরেরা য়্যাব্সেস্ অব্ দি লিবর্ বলেন। (১১) রক্ত-আমাশা থেকে উদরী হইতে পারে। উদরীকে ডাক্তরেরা য়্যাসাইটিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে ড্রপ্সি বলে। (১২) রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর সন্নিপাত ঘটিতে পারে। সন্নিপাতকে ডাক্তরেরা কল্যাপ্স বলেন। সন্নিপাত-অবস্থা কাকে বলে, তা অনেক বার বলিছি। যে রোগেই কেন ঘটুক না, রোগী একবারে নিতান্ত নেতিয়ে পড়িলে, চোক মুখ বসিয়া গেলে, নাড়ী দমিয়া গেলে, নাকে কথা উঠিলে, রোগীর সে অবস্থাকে সন্নিপাত-অবস্থা বলে।

রক্ত-আমাশা থেকে রোগীর এই (১২) বার রকম

অবস্থা ঘটিতে পারে। শেষে যা ঘটে, ভাল কথায় তাকে পরিণাম বলে। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের এই বারটী পরিণাম বলিতে পার। সব জায়গায় এক রকম পরিণাম দেখিতে পাইবে না। আবার এক জায়গায় বার রকম পরিণামও দেখিতে পাওয়া যায় না। চেষ্টা করিয়া দেখিলে, জায়গায় জায়গায় রকম রকম পরিণাম দেখিতে পাইবে। রোগের গোড়া থেকেই ভাল চিকিৎসা হইলে, এ রকম পরিণাম ঘটিতেই পারে না—এখানে এ কথাটা বলিয়া রাখা ভাল।

নিদান——রক্ত-আমাশা রোগের নিদান কি—নিদান কাকে বলে? আসল কারণকে ভাল কথায় নিদান বলে। অমুক রোগের নিদান কি, বলিলে কি বুঝায়? সেই রোগের আসল কারণ কি, তাই বুঝায়। নিদানই বল, আর আসল কারণই বল, অর্থ এক। রক্ত-আমাশা রোগের আসল কারণ কি? আসল কারণ কি, এখন তাই বলিব। রক্ত-আমাশা রোগে অন্ত্রে ঘা হয়। অন্ত্র দু রকম, ছোট আর বড়। রক্ত-আমাশা রোগে ছোট অন্ত্রে, না বড় অন্ত্রে ঘা হয়? সচরাচর কেবল বড় অন্ত্রেই ঘা হয়। কিন্তু মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশায় ছোট অন্ত্রেও ঘা হয়। মারাত্মক বা সাংঘাতিক রক্ত-আমাশা কাকে বলে, এর আগেই তা বলিছি। ফল কথা, রক্ত-আমাশায় বড় অন্ত্রেই ঘা হওয়া নিয়ম—এ কথাটা যেন মনে থাকে। বড় অন্ত্রের কোন্ জায়গায় কি রকম করিয়া ঘা হয়, আর সে সব ঘাই বা কি রকম, এখন তাই বলিব। ৪৪১র

পাতে বলিছি, অন্ত্রের ভিতর-পিঠ যে একটী খুব সরু পর্দ্দা দিয়া মোড়া, সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ বলেন। এই মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ পর্দ্দাটী বড় কাজের। হজম বল, পরিপাক বল, সবই এরই গুণে হয়। এই পর্দ্দার কোন ব্যত্যয় ঘটিলেই আর কি, পেটের-ব্যামো হয়। পেট-নাবা বল, আমাশা বল, রক্ত-আমাশা বল, সব এই পর্দ্দারই ব্যামো থেকে হয়। মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণকে ভাল বাঙ্গালায় শ্লেষ্মা-ঝিল্লি বলে। মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণের চেয়ে শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ঢের সোজা কথা। এই জন্যে, বারে বারে মিয়ুকস্ মেম্ব্রেণ না বলিয়া তার বদলে এখন থেকে শ্লেষ্মা-ঝিল্লি বলিব। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গায়ে বিঁধ বিঁধ এমন লক্ষ লক্ষ দাগ আছে। বিঁধ বিঁধ এ সব দাগ কি? অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ভিতর খুব সরু সরু যে সব চুঙি বা নলি বসান আছে, সেই সব চুঙি বা নলির মুখ। এই সব চুঙি বা নলি কোন আলাদা জিনিশ দিয়ে তয়েব হয় নাই; সেই শ্লেষ্মা-ঝিল্লি দিয়াই তয়ের হইয়াছে। যেখানে যেখানে বিঁধ, সেই খানে সেই খানে শ্লেষ্মা-ঝিল্লি খুব সরু চুঙি বা নলির মত হইয়া নীচের দিকে নামিয়া গিয়াছে। এই সব চুঙি বা নলির নীচের দিকে মুখ নাই; নীচের দিকে বন্ধ। এই সব চুঙি বা নলি এত ছোট যে, খালি চোকে তা নজর হয় না। ছোট জিনিশ বড় দেখায়, এমন এক রকম যন্ত্র আছে। সেই যন্ত্রকে ইংরিজিতে মাইক্রস্ কোপ্ বলে; ভাল বাঙ্গালায় অণুবীক্ষণ যন্ত্র বলে। অণুবীক্ষণ-যন্ত্র দিয়া দেখিলে, সে সব চুঙি বা নলি

আর তাদের মুখ দেখিতে পাওয়া যায়। ছোট অন্ত্রের চেয়ে বড় অন্ত্রের চুঙি বা নলি গুলি অনেক বড়। গুহ্য-দ্বারের কাছের চুঙি বা নলি গুলি আরও বড়। ফল কথা, উপর থেকে গুহ্যদ্বারের দিকে চুঙি বা নলি গুলি ক্রমেই বড় হইয়া আসিয়াছে। বড় অন্ত্রের সব নীচের ভাগকে ডাক্তরেরা রেক্টম্ বলেন। ভাল বাঙ্গালায় রেক্টম্‌কে মলাশয় বা মলভাণ্ড বলে; সোজা বাঙ্গালায় মলের নাড়ী বলে। মলের নাড়ীর ঐ সব চুঙি বা নলি এত বড় যে, তাদের মুখ অর্থাৎ বিঁধ-বিঁধ দাগ গুলি খালি চোকেই দেখা যায়। ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গায়ে বসান এই লক্ষ লক্ষ চুঙি বা নলির কথা যে বলিলাম, এদের এক একটী কতটুকু করিয়া লম্বা? সব গুলি সমান লম্বা নয়। যে গুলি সব চেয়ে খাটো, সে গুলি এক ইঞ্চের ৩৬০ ভাগের এক ভাগের বেশী লম্বা নয়। আবার যে গুলি সব চেয়ে লম্বা, সে গুলি এক ইঞ্চের ১২০ ভাগের এক ভাগের চেয়ে খাটো নয়। এক ইঞ্চ্ কত টুকু? আঠার ইঞ্চে এক হাত। আবার ২৪ আঙুলে এক হাত। এখন হিসাব করিয়া দেখ, ক আঙুলে এক ইঞ্চ? $১\frac{১}{৩}$ আঙুলে এক ইঞ্চ। একের নীচে ৩ দিলে তিন ভাগের এক ভাগ বুঝায়। এই সব চুঙি বা নলির কাজ কি? তাদের ভিতর থেকে এক রকম রস বাহির হয়। সে রস নিয়তই বাহির হইতেছে। সেই রসে অন্ত্রের সমস্ত শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গা সর্ব্বদা বেশ ভিজে আর নরম থাকে। তবেই দেখ, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির গা সর্ব্বদা বেশ ভিজে আর

নরম রাখাই তাদের কাজ। এ ছাড়া, অন্ত্রের মধ্যে আহার পরিপাক হইবার সময়ও তারা ঢের কাজে লাগে।

তার পর বলি। রক্ত-আমাশা রোগে প্রথমে বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি একটু ফোলে আর বিবর্ণ হয়। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির রং কি রকম হয়? রাঙা হয়, বেগুণে রং হয়, কটাসে হয়, কিম্বা ছেয়ে রং হয়। শ্লেষ্মা-ঝিল্লির জায়গায় জায়গায় খুবই রাঙা হয়। আবার কখন কখন শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সব জায়গায়ই ঐ রকম রাঙা হয়। কখন কখন শ্লেষ্মা-ঝিল্লির রং একবারে কাল হইয়া যায়—বোধ হয় যেন পচিয়া গিয়াছে। কখন কখন শ্লেষ্মা-ঝিল্লি সহজ বেলার চেয়ে এত নরম হইয়া যায় যে, একটু চাপ বা জোর লাগিলেই ছিঁড়িয়া যায়। আর অন্ত্রটা নিজেই জড় সড় হইয়া যায়। রোগ বাড়িয়া গেলে, গোল গোল ছোট ঘা গুলি একত্র মিশে এক এক খানা খুব বড় বড় ঘা হয়। মেসেণ্টরির গ্ল্যাণ্ডগুলি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে, আর নরম হইয়া যায়। মেসেণ্টরিই বা কাকে বলে? গ্ল্যাণ্ডই বা কাকে বলে? ছোট অন্ত্র আর বড় অন্ত্র, পেটের ভিতর পিঠের দাঁড়ার দিকে মাংসের গায়ে যে একটা পর্দ্দা দিয়া লাগান আছে, সে পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা মেসেণ্টরি বলেন। পেটের ভিতর পিঠের দাঁড়ার দিকে মাংসের গা আর অন্ত্রের গা, এই দুয়ের মাঝখানে থাকে বলিয়া ভাল কথায় ঐ পর্দ্দাকে মধ্যান্ত্র বলা যাইতে পারে। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দা আর এই পর্দ্দা এক জিনিষ। অন্ত্রের বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দা এক পুরু, আর এ পর্দ্দা দু-পুরু। অন্ত্রের

বাহির-পিঠ-ঢাকা পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা পেরিটোনীয়ম্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রবেষ্ট বলে। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। অনেকে জানেন, পাঁটা ঝুড়ে নাড়ি ভুঁড়ি বাহির করিয়া ফেলিবার সময় শুদু পেট চিরিয়া দিলেই কাজ সিদ্ধি হয় না। নাড়ি গুলি ধরিয়া জোরে টানিলে তবে পেটের ভিতরকার মাংসের গা থেকে ছিঁড়ে আসে। ছেঁড়ে কি? যে মেসেণ্টরির কথা বলিতেছি, মাংসের গা থেকে সেই মেসেণ্টরি ছিঁড়ে আসে। নাড়ি ভুঁড়ি সব বেশ স্পষ্ট দেখা যায়, এমন করিয়া যদি পাঁটার পেট চিরিয়া ফেল, আর নাড়ি গুলি বেশ জুত বরাত করিয়া টানিয়া তুলিয়া ধর, তবে নাড়ি ভুঁড়ির গা থেকে পেটের ভিতরকার মাংসের গায়ে লাগান ঐ পর্দ্দাটী বেশ দেখিতে পাইবে। ঐ পর্দ্দাটী নাড়ি ভুঁড়ি গুলিকে পেটের ভিতর-কার মাংসের সঙ্গে আট্‌কাইয়া রাখে। পর্দ্দাটী আবার দু-পুরু বা দু ভাঁজ। এ কথা এই মাত্র বলিছি। এই পর্দ্দার দুটী ভাঁজের মধ্যে শ খানেক, কি শ দেড়েক বিচি বিচি কি এক রকম জিনিষ আছে। এই বিচি গুলির আকার আবার সব সমান নয়। যে গুলি খুব ছোট, সে গুলি কলাইয়ের চেয়ে বড় নয়। যে গুলি খুব বড়, সে গুলি ছোট বাদামের চেয়ে ছোট নয়। বিচি বিচি এ গুলি কি? সোজা বাঙ্গালায় এ বিচি গুলিকে আমরা গুল্লি বলিয়া থাকি। শরীরের সব জায়গাতেই গুল্লি আছে। গাল, গলা, কানের গোড়া, বগল, কুচ্‌কি ও আর আর সব জোড়ের জায়গায় গুল্লি বেশী থাকে, আর বেশ

স্পষ্ট টের পাওয়া যায়। এই সব গুল্লিকে ডাক্তরেরা গ্ল্যাণ্ডস্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় গ্রন্থি বলে। ৩৯৯র পাতে রসের যে সব শিরের কথা বলিছি, সেই সব শির এই সব গুল্লির ভিতর দিয়া যাতায়াত করে। এই জন্যেই, এই সব গুল্লিকে রসের গুল্লি বলা যাইতে পারে। রসের গুল্লিকে ডাক্তরেরা লিম্ফ্যাটিক্ গ্ল্যাণ্ডস্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় লসীকা-গ্রন্থি বলে।

গাল, গলা, বগল, কুচ্কি কি আর কোন জায়গার গুল্লি ফুলিলে, তাতে ব্যথা হইলে, আমরা বলিয়া থাকি গুল্লি আউরেছে; ডাক্তরেরা বলেন, গ্ল্যাণ্ডের ইন্ফ্ল্যামেশন্ হইয়াছে; ভাল বাঙ্গালায় বলি গ্রন্থির প্রদাহ হইয়াছে। এই জন্যে রক্ত-আমাশা রোগে মেসেণ্টরির গ্ল্যাণ্ড গুলি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে আর নরম হইয়া যায়, না বলিয়া, তার বদলে মধ্যান্ত্রের (ঐ পর্দ্দার) গুল্লি প্রায়ই রাঙা হয়, ফোলে আর নরম হইয়া যায়, বলিতে পার।

রোগের গোড়ায় অন্ত্রের মধ্যে আম, রক্ত, আর এক রকম পাতলা রস থাকে। এই পাতলা রস আর কিছুই নয়; একে লিম্ফ্ বলে। লিম্ফের কথা ৩৯৮র পাতে বলিছি। রোগ বাড়িয়া গেলে অন্ত্রের মধ্যে পূষ আর রক্ত মিশন থাকে। যে রোগী অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়াছে, তার অন্ত্রের ঘা গুলি এক বারে জড় সড়, আর সেই সব ঘায়ের চারিদিক প্রায় হাড়ের মত শক্ত দেখা যায়। যে সব ঘা শুকাইয়া গিয়াছে, তাদের জায়গায় শক্ত জাম্ড়ো দেখিতে পাওয়া যায়। বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঐ সব

চুঙি বা নলি বড় হয়। আর ঐ সব চুঙি বা নলি বেড়িয়া, বা তাদের ভিতর ঘা হয়। ঘা গুলি আগে গোল থাকে, আর তাদের কিনারা গোল বা চেপ্টা। তার পর, ঘা গুলির মাঝখান খোল হইয়া যায়। শেষে ঘা গুলি আর গোল থাকে না, শীঘ্রই তেড়া বাঁকা হইয়া যায়। ঘা গুলি অন্ত্রের লম্বালম্বি ভাবে হয় না, অন্ত্র বেড়িয়া হয়। সব ঘাই যে অন্ত্র বেড়িয়া হয়, তা নয়, তবে প্রায় বটে। আবার অন্ত্রের সব খানি বেড়িয়াই যে ঘা হইয়া থাকে, বা হইতে চায়, তা নয়। ঘা গুলির আকার প্রকার এক রকম নয়। কতক গুলি বড়, কতক গুলি মাঝারি রকম, কতক গুলি ছোট। কতক গুলি গোল, কতক গুলি লম্বা, কতক গুলি বাঁকা তেড়া। কতক গুলি বেশী গভীর, কতক গুলি কম গভীর। অনেক জায়গায় শ্লেষ্মা-ঝিল্লি পচিয়া খসিয়াও গিয়া ঐ রকম সব ঘা হয়। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি এই রকম করিয়া পচিয়া খসিয়া গেলে, তার নীচেকার পর্দ্দা গুলি এত পুরু হয় যে, অনেক দিন রোগ ভোগ করিয়া যাদের শরীর এক বারে অস্থি চর্ম্ম সার হইয়া গিয়াছে, তাদের পেটে হাত দিয়া সে অন্ত্র সহজেই মালুম করিতে পারা যায়। রক্ত-আমাশা যাদের ভাল হয়, তাদের অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির এই সব ঘায়ের কিনারা যা ধার আগে বেশ গোল হয়, আর দেখিতে সহজ ঘায়ের মত হয়। তার পর, সেই কিনারা থেকে নূতন মাস গজাইয়া ক্রমে ঘা পুরিয়া উঠে। রক্ত-আমাশা রোগ পুরাণ পড়িয়া গেলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা গুলি

এমন কি শুকাইয়া গেলেও, রোগী আম রক্ত বাহ্যে যাইতে থাকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা গুলির সব রকম অবস্থাই দেখা যায়। কতক গুলি ঘা বা শুকাইয়া গিয়াছে, কতক গুলি ঘা বা দগ্‌দগে। অন্ত্রের পর্দ্দা গুলি পাতলা হইয়া যাইতে পারে। কিন্তু সচরাচর তাদের পুরুই দেখা যায়। কোন কোন জায়গায় আবার একটী পর্দ্দা তয়ের হইয়া অন্ত্রের ভিতর খানিকটে ঢাকিয়া ফেলিতে পারে। এ পর্দ্দাতেও ঘা হইতে পারে। আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো প্রায়ই হইয়া থাকে। এ কথা এর আগেই বলিছি। ঠাণ্ডা দেশে রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো সচরাচর ঘটে না।

রক্ত-আমাশা-রোগে রোগী কত দিন ভোগে?——দু পাঁচ দিনও ভুগিতে পারে, দু পাঁচ মাসও ভুগিতে পারে, আবার দু পাঁচ বছরও ভুগিতে পারে। আবার চাই কি, তারও বেশী ভুগিতে পারে।

রক্ত-আমাশায় কত রোগী মরে? নূতন রক্ত-আমাশায় যদি খুব বেশী মরে, তবে ৮ জনের মধ্যে এক জন মরে; আর যদি খুব কম মরে, তবে ৫০ জনের মধ্যে ১ জন মরে। আবার এর মাঝামাঝিও হইতে পারে। পুরাণ রক্ত-আমাশায় যদি খুব বেশী মরে, তবে ৪ জনের মধ্যে এক জন মরে; আর যদি খুব কম মরে, তবে ৬ জনের মধ্যে এক জন মরে। তবেই দেখ, নূতন রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী কত বেশী মরে! নূতন রক্ত-আমা-

করিয়া বলিছি। দুর্ব্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর (হেক্‌টিক্ ফীবর্) হওয়ার কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, বারে বারে আম-রক্ত বাহ্যে গিয়া, আর পেটের কামড়, শূলনি, আর কোঁতানিতে রোগী খুব কাবু আর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। আর বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা বাড়িয়া তা থেকে ভারি রকম উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়াছে। এই যে স্বল্পবিরাম-জ্বর, একেই তুমি হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলিতে পার। স্বল্পবিরাম-জ্বরে দিন রাতের মধ্যে জ্বরের কেবল এক বার প্রকোপ হয়। কিন্তু হেক্‌টিক্ ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাচর জ্বরের দু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হেক্‌টিক্ ফীবরে গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলো আর পায়ের তেলোর তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলো আর পায়ের তেলো এত গরম হয় যে, তাতে হাত দিলে বোধ হয় যেন হাত পুড়িয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের সময় রোগীর গাল দুটী লাল হয়। রোগীর শরীর দেখিতে দেখিতে ক্ষয় পাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর আর হেক্‌টিক্ ফীবরের তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ। হেক্‌টিক্ ফীবরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। হেক্‌টিক্ ফীবরের বাঙ্গালা কি? ভাল বাঙ্গালায় হেক্‌টিক্ ফীবরকে ক্ষয়-জ্বর বলিতে পার। যে জ্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই জ্বরকে ক্ষয়-জ্বর বলে। এই জন্যে, হেক্‌টিক্ ফীবরের যে অর্থ, ক্ষয়-জ্বর বলিলে তা বেশ বুঝায়।

রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ—— খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, বমি, হিক্কি, হাত পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাণ্ডা ঘাম, খুব রাঙা আর শুক্‌নো জিব। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; বাহ্যেতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের দাগের মত বেগুণে রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ ফোটে; রোগী অসাড়ে বাহ্যে যায়; হাত ধরিয়া দেখিলে পাঁচ সাত বার অন্তর একবার নাড়ী পড়া টের পাওয়া যায় না। রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবর্) কিম্বা স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্)।

চিকিৎসা—— রক্ত-আমার চিকিৎসায় ডাক্তরদের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায় না। সেই এক রক্ত-আমাশা রোগীর চিকিৎসায় যদি দশ জন ডাক্তর ডাক, তবে সেই এক রোগের দশ রকম ব্যবস্থা পাবে। এই জন্যে, অনেক জায়গায় রক্ত-আমাশা রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশা অনেক জায়গায় নির্দ্দোষ হইয়া সারে না—পুরাণ পড়িয়া যায়। নূতন রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত আমাশায় ভয় কত বেশী, এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের স্বভাবটী যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁকে দিয়া এ রোগের চিকিৎসা যেমন হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা বড়ই খল রোগ। দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে। যখন বলিছি যে, রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, তখন এ রোগের স্বভাবের

করিয়া বলিছি। দুর্ব্বল শরীরে কোন জায়গার উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর (হেক্‌টিক্ ফীবর্) হওয়ার কথা দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিতেছি। মনে কর, বারে বারে আম-রক্ত বাহে গিয়া, আর পেটের কামড়, শূলনি, আর কোঁতানিতে রোগী খুব কাবু আর কাহিল হইয়া পড়িয়াছে। আর বড় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা বাড়িয়া তা থেকে ভারি রকম উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়াছে, আর সেই উদ্দীপনা থেকে স্বল্পবিরাম-জ্বর হইয়াছে। এই যে স্বল্পবিরাম-জ্বর, একেই তুমি হেক্‌টিক্ ফীবর্ বলিতে পার। স্বল্পবিরাম-জ্বরে দিন রাতের মধ্যে জ্বরের কেবল এক বার প্রকোপ হয়। কিন্তু হেক্‌টিক্ ফীবরে দিন রাতের মধ্যে সচরাচর জ্বরের দু বার প্রকোপ হয়। এ ছাড়া, হেক্‌টিক্ ফীবরে গায়ের তাতের চেয়ে হাতের তেলো আর পায়ের তেলোর তাত খুব বেশী হয়। রোগীর হাতের তেলো আর পায়ের তেলো এত গরম হয় যে, তাতে হাত দিলে বোধ হয় যেন হাত পুড়িয়া গেল। জ্বরের প্রকোপের সময় রোগীর গাল দুটী লাল হয়। রোগীর শরীর দেখিতে দেখিতে ক্ষয় পাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর আর হেক্‌টিক্ ফীবরের তফাত এই, মোটামুটি জানিয়া রাখ। হেক্‌টিক্ ফীবরের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। হেক্‌টিক্ ফীবরের বাঙ্গালা কি ? ভাল বাঙ্গালায় হেক্‌টিক্ ফীবরকে ক্ষয়-জ্বর বলিতে পার। যে জ্বরে শরীর ক্ষয় পাইয়া যায়, সেই জ্বরকে ক্ষয়-জ্বর বলে। এই জন্যে, হেক্‌টিক্ ফীবরের যে অর্থ, ক্ষয়-জ্বর বলিলে তা বেশ বুঝায়।

রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ না সারিবার লক্ষণ—খুব ভারি রকম বেগ আর পেটের কামড়, বমি, হিকি, হাত পা ঠাণ্ডা, গায়ের জায়গায় জায়গায় ঠাণ্ডা ঘাম, খুব রাঙা আর শুক্‌নো জিব। রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়ে; বাহ্যেতে ভয়ানক দুর্গন্ধ হয়; রোগীর গায়ে মশার কামড়ের দাগের মত বেগুণে রঙের বিন্দু বিন্দু দাগ ফোটে; রোগী অসাড়ে বাহ্যে যায়; হাত ধরিয়া দেখিলে পাঁচ সাত বার অন্তর একবার নাড়ী পড়া টের পাওয়া যায় না। রক্ত-আমাশার সঙ্গে যকৃতের ব্যামো আর সবিরাম-জ্বর (ইণ্টর্ম্মি-টেণ্ট ফীবর্) কিম্বা স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর্)।

চিকিৎসা—রক্ত-আমার চিকিৎসায় ডাক্তরদের মধ্যে বেশ মিল দেখা যায় না। সেই এক রক্ত-আমাশা রোগীর চিকিৎসায় যদি দশ জন ডাক্তর ডাক, তবে সেই এক রোগের দশ রকম ব্যবস্থা পাবে। এই জন্যে, অনেক জায়গায় রক্ত-আমাশা রোগের ভাল রকম চিকিৎসাই হয় না। আর এই জন্যেই, নূতন রক্ত-আমাশা অনেক জায়গায় নির্দ্দোষ হইয়া সারে না—পুরাণ পড়িয়া যায়। নূতন রক্ত-আমাশার চেয়ে পুরাণ রক্ত আমাশায় ভয় কত বেশী, এর আগেই তা বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগের স্বভাবটী যিনি তলিয়ে বেশ বুঝিয়াছেন, তাঁকে দিয়া এ রোগের চিকিৎসা যেমন হয়, তেমন আর কারও দিয়া হয় না। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা বড়ই খল রোগ। দেখিতে দেখিতে প্রমাদ ঘটে। যখন বলিছি যে, রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, তখন এ রোগের স্বভাবের

কি আর বেশী পরিচয় দিতে হবে? মোটামুটি জানিয়া রাখ, এই দুরন্ত খল রোগে একটুতেই তিলে তাল হইতে পারে। এই জন্যেই বলিতেছি, গোড়ায় রক্ত-আমাশা রোগীর চিকিৎসা হওয়াই কাজ, আর গোড়ায় চিকিৎসা হইলেই রোগীর কল্যাণ। যে রক্ত-আমাশা রোগের বাড়া-বাড়ি হইলে চিকিৎসক মাথা মুড় খুঁড়িয়াও রোগ শান্তি করিতে পারেন না, গোড়ায় ভাল চিকিৎসা হইলে সেই রক্ত-আমাশা রোগ থেকে রোগী সদ্য ভাল হইয়া উঠিতে পারে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসা যিনি গোড়া থেকে করিতে পান, তাঁরই জিত। যদি বল, সব রোগেরই বেলায় ত এ কথা বলিতে পারা যায়? তা পারা যায় বটে; কিন্তু পুরাণ পড়িয়া গেলে রক্ত-আমাশা ভাল করা যত শক্ত, আর তাতে যত ভয়, এমন আর কোন রোগের বেলায় নয়। মনে কর; রক্ত-আমাশা হইতেই তোমাকে ডাকিল। এখন তুমি রোগীর কি রকম চিকিৎসা করিবে? বড় অন্ত্রের মধ্যে সঞ্চিত মল বা গুট্‌লে থাকিয়া রোগ বাড়াইয়া দিতে পারে,—এ রকম করিয়া রোগ বাড়াইয়া দিয়াও থাকে। এই জন্যে, ৪০।৫০ ফোঁটা লডেনমের সঙ্গে পূর এক মাত্রা ক্যাষ্টর অইল্ খাওয়াইয়া দিবে। লডেনম্‌কে ডাক্তরেরা টিংচর ওপিয়াই বলেন। ক্যাষ্টর অইলের পূর মাত্রা কত খানি? আধ ছটাকের কম নয়। একটু আধটু বেশী হইলেও হানি নাই। লডেনমের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল দিলে ভারি উপকার হয়। জোলাপ খোলার পর অন্ত্রের যে একটু উদ্দীপনা (ইরিটেশন্) হইয়া থাকে,

লডেনমে তা হইতে দেয় না। কাজেই, এ রকম যুক্তি না করিয়া রক্ত-আমাশা রোগীকে জোলাপ দিলে তার ব্যামো বাড়ে বই, কমে না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও অনেকের ওয়াকার আসে। এই জন্যে, অনেকেই ক্যাষ্টর অইল খাইতে চায় না। আবার অনেকে খাইয়াও বমি করিয়া ফেলে। স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্মের সঙ্গে মিশাইয়া খাইলে ক্যাষ্টর অইলের তেমন যে বিট্‌কেল তার (আস্বাদন), তাও জানিতে পারা যায় না। যাঁরা ক্যাষ্টর অইল খাইতে বড়ই নারাজ, এ মুষ্টিযোগটী তাঁদের মনে করিয়া রাখিলে ভাল হয়। এই রকম যুক্তি করিয়া লডেনমের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ উপ্‌রো-উপ্‌রি দু তিন দিন দিলে, চাই কি, তাতেই রক্ত-আমাশা বেশ সারিয়া যাইতে পারে। রোগীকে আর কোন অস্থুদ বিস্থুদ দিবার দরকার হয় না। জোলাপ দিবার সময়ই সকাল বেলা। শুদু জোলাপ দিয়াই নিশ্চিন্ত হইলে চলিবে না। জোলাপ দেওয়া যেমন দরকার, রোগীর পথ্যের ধরাধর করাও তেমনি দরকার। পথ্যের ধরাধর করাই পেটের-ব্যামোর আসল চিকিৎসা। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। এ কথাটা চিকিৎসকও যেন কখনও না ভুলেন, রোগীও যেন কখনও না ভুলে। ভুলিলে চিকিৎসকও যশ পাইবেন না, রোগীও রোগের হাত এড়াইতে পারিবে না। চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোনও জিনিষ রোগীকে খাইতে দিবে না। কিন্তু এটা যেন মনে থাকে, যে আহার দিবে, তাতে যেন রোগীর গায়ে বল হয়। এমন আহার কি? মাংসের

ক্বাথ, চূণের জল-মিশনো এক-বল্কা দুধ, আর য়্যারোরুট্। তিন ভাগ দুধের সঙ্গে এক ভাগ চূণের জল মিশাইয়া লইবে। রোগী যদি খুব দুর্ব্বল হইয়া থাকে, তবে তাকে একটু একটু পোর্ট খাইতে দিবে। নূতন পোর্টের চেয়ে পুরাণ পোর্ট ভাল। পুরাণ পোর্টে বেশী উপকার হয়। বাজারে অনেক রকম পোর্ট বিক্রি হয়। যে সাহেব যে পোর্ট তয়ের করিয়াছেন, সে পোর্ট সেই সাহেবেরই নামে চলিত। রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট, পেজ্ সাহেবের পোর্ট, আর হোয়াইট্ সাহেবের পোর্ট—এই তিন রকম পোর্টেরই আদর বেশী। ডাক্তরদের মধ্যে কেউ রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন; কেউ পেজ্ সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন; কেউ বা হোয়াইট্ সাহেবের পোর্ট ভাল বলেন। রবর্টসন্ সাহেবের পোর্ট আদি বলিয়া আমি প্রায়ই আর কোনও পোর্ট ব্যবহার করি না। রবর্টসন্ সাহেবের আসল পুরাণ পোর্ট যদি লও, তবে দু টাকা আড়াই টাকার কমে এক বোতল পাবে না। শস্তা খুঁজিতে গেলেই খারাপ জিনিষ পাবে। জোআন রোগীকে এক এক বারে ৪ ড্রাম করিয়া পোর্ট দিতে পার। রোগীর অবস্থা বুঝিয়া পোর্ট তিন বারও দিতে পার, চারি বারও দিতে পার, ছয় বারও দিতে পার। বেশী দুর্ব্বল রোগীকে বেশী বার পোর্ট দেওয়া চাই। পোর্ট জলেরও সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার, খুব পাতলা ব্রথেরও সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার। কিন্তু দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিতে পার না। পোর্টের সঙ্গে মিশাইলে দুধ ছিঁড়িয়া যায়—দুধ নষ্ট হইয়া যায়। সে

দুধ খাইলে রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ বাড়ে বৈ কমে না। এমনি শুদ্ধ দুধই রক্ত-আমাশা রোগীর পেটে সয় না। তাতেই চূণের-জলের সঙ্গে মিশাইয়া এক-বল্কা দুধ দিতে বলিছি। চূণের জলের সঙ্গে মিশাইলে দুধ ছানা হইতে পারে না—কাজেই পেটে গিয়া অগুণও করিতে পারে না। রক্ত-আমাশা রোগীর শূলনি, বেগ দেওয়া আর প্রস্রাবের কষ্ট নিবারণের জন্যে মাঝে মাঝে লডেনমের পিচ্‌কিরি দিবে। কত খানি লডেনম্‌ কি রকম করিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে হয়, ৯৪র পাতে তা বিশেষ করিয়া বলিছি। রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের কামড় নিবারণের যেমন অস্যুদ তার্পিণের সেক, তেমন অস্যুদ আর নাই। ৪১৪—৪১৫র পাতে প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে বলিছি, এখানেও ঠিক্ সেই রকম করিয়া সেক দিবে। তার্পিণের এ রকম সেকে বড়ই উপকার হয়। দেখিতে দেখিতে পেটের কামড় নরম পড়ে। রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় রোগীর পেটে তার্পিণের এ রকম সেক দিতে কখনও ভুলিবে না।

আমাদের দেশের মত গরম দেশে রক্ত-আমাশা রোগের চিকিৎসা যদি গোড়াতে হইল, তবেই মঙ্গল, নৈলে প্রমাদ। ফল কথা, রক্ত-আমাশা রোগের গোড়ায় চিকিৎসাই চিকিৎসা। রোগ বাড়িয়া গেলে অস্যুদ দিয়া তা থামান মস্কিল। এই খল রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসককে বিস্তর বুদ্ধি কৌশল খাটাইতে হয়। চিকিৎসার জুত বয়াত যিনি বেশ জানেন, দরকার হইলে যিনি বুদ্ধি কৌশল বেশ খাটা-

হইতে পারেন, তাঁর হাতের রোগী প্রায়ই বেজায় হয় না। রোগ শক্ত রকম হইলে ত তার কথাই নাই। সোজা রোগেও রোগীকে যত দূর পার, স্থির রাখিবে। রোগী যে ঘরে থাকিবে, সে ঘরে যেন বেশ বাতাস খেলিতে পায়। রক্ত-আমাশা রোগীর ঘাম হওয়া বড় দরকার। কি করিলে তার বেশ ঘাম হয়? গরম জলের টপে খানিক ক্ষণ বসাইয়া তার পর শুক্‌নো খস্‌খসে তোয়ালে কি কাপড় দিয়া তার সব গা খুব জোরে মুছাইয়া দিবে। তার পর, যে সে একটা গরম কাপড় দিয়া তার সব গা ঢাকিয়া রাখিবে। তার পর নীচের লিখিত পুরিয়া অসুদ তাকে খাইতে দিবে। এতে সমস্ত দিন রাতিই তার একটু একটু করিয়া ঘাম হইতে থাকিবে। এ রকম ঘামে রক্ত-আমাশার বড়ই উপকার করে।

ইপেকা পাউডর	...	...	৫ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট্ অব সোডা	...	...	১০ গ্রেন্
য়্যাকেসিয়া পাউডর	...	...	১০ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোজ তিন বেলা ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে। নূতন রক্ত-আমাশায় এই অসুদটী আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি। ইপেকাকুয়ানার মত নূতন রক্ত-আমাশার ভাল অসুদ আর নাই। ইপেকাকুয়ানা খাইয়া বমি করিলে, অসুদের তেমন ফল পাওয়া যায় না। এই জন্যে, ইপেকাকুয়ানা খাইয়া যাতে বমি

না হয়, তার ফিকির করিবে। এমন ফিকির কি? ইপেকাকুয়ানা খাইবার ঘণ্টা খানেক আগেও কোন রকম জলীয় দ্রব্য খাবে না, অসুদ খাওয়ার পরও ঘণ্টা খানেক কোন রকম জলীয় দ্রব্য খাবে না। অসুদের সঙ্গে যে জল টুকু খাওয়া দরকার, কেবল সেই জল টুকুই খাবে—তার বেশী খাবে না। গালে জল লইয়া পুরিয়া গিলিয়া খাবে। অসুদ খাওয়ার আগে আর পরে যদি কোন রকম জলীয় দ্রব্য না খাও, আর অসুদ খাইয়া চুপ করিয়া শুইয়া থাক, তবে বমি হওয়ার ভয় থাকিবে না। ইপেকাকুয়ানা খাইয়া যদি বমি না হয়, গা ন্যাকার ন্যাকার করে, আর বিন্দু বিন্দু ঘাম হয়, তবে বড়ই উপকার হয়। ইপেকা-কুয়ানা খাইয়া অল্প গা-ন্যাকার ন্যাকার করিবে, কিন্তু বমি হবে না—এই হইলেই তোমার রক্ত-আমাশা রোগীকে ইপেকাকুয়ানা খাওয়ানর যে ফল, তা হইল। বারে বারে ইপেকাকুয়ানা না বলিয়া, এখন থেকে সোজা-সুজি ইপেকা বলিব। ইপেকা খাইয়া যদি বড়ই গা-ন্যাকার ন্যাকার করে, তবে বরফের টুক্‌রো খাইতে দিবে। পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়া যায় না। সেখানে রোগীর এ অবস্থা ঘটিলে কি করিবে? ৫ গ্রেন্ ইপেকা খাইয়া রোগী যদি চুপ করিয়া শুইয়া থাকে, আর কোন রকম জলীয় দ্রব্য না খায়, তবে তার গা-ন্যাকার ন্যাকার থামাইবার জন্যে বরফ খুঁজিবার দরকারই হয় না। একটু আধটু গা-ন্যাকার ন্যাকার বা হয়, তা আপনিই সারিয়া যায়। তাতেই বলি-তেছি, বরফের অভাবে পাড়াগাঁয়ে রক্ত-আমাশা-রোগীর

চিকিৎসার কোন ব্যাঘাতই ঘটে না। তবে এমন অনেক রোগী আছে, যাদের ইপেকা মোটেই সয় না। এক গ্রেন্ ইপেকা খাইলেও তাদের বমি হয়। তাদের উপায় কি করিবে? ইপেকা বৈ ত তোমার আর অস্থুদ নাই! ইপেকা ছাড়া নূতন রক্ত-আমাশায় যদি আর কোনও অস্থুদ না থাকিত, তবে ডাক্তরেরা সত্য সত্যই সে সব রোগীর কোনও উপায় করিতে পারিতেন না। নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় যেখানে দেখিবে যে, ইপেকা খাইয়া রোগী কোন ক্রমেই তা পেটে রাখিতে পারে না, কেবল সেই খানেই ধারক অস্থুদ দিবে। নৈলে, নূতন রক্ত-আমাশায় ধারক দিবার কোনও দরকার নাই—দেওয়া উচিতও নয়।

সম্প্রতি আমি একটী সাহেবের নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। ইপেকা যার পেটে না সয়, তার নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা কি রকম করিয়া করিতে হয়, এই সাহেবটীর চিকিৎসার বৃত্তান্ত পড়িলে বেশ বুঝিতে পারিবে। সাহেবটীর বয়স ৩২।৩৩ বছরের বেশী নয়। শরীর খুব সবল আর হৃষ্ট পুষ্ট। বছর চারি পাঁচ আগে তাঁর একবার রক্ত-আমাশা হইছিল। যাঁরা আসল বিলিতি সাহেব, পয়সা খরচ করিতে পারেন, ব্যামো স্যামো হইলে তাঁরা সাহেব ডাক্তরদেরই দিয়া চিকিৎসা করাইয়া থাকেন। পয়সা-ওয়ালা আসল বিলিতি সাহেবদের নিয়মই এই। কিন্তু কলিকাতায় পয়সা-ওয়ালা বাঙালি বাবুদের ব্যবহার এর ঠিক্ উল্টো! সাহেব ডাক্তর আনিতে পারিলে আর দেশি ডাক্তর চান না! এ সব

দুঃখের কথায় আর এখন কাজ নাই। তার পর বলি। সাহেবের ব্যামো হইয়াছে, মেম সাহেব এক জন সাহেব ডাক্তরকে ডাকিয়া পাঠাইলেন। ডাক্তর সাহেব আসিয়া নূতন রক্ত-আমাশা হইয়াছে শুনিয়াই একবারে এক ড্রাম্ ইপেকাকুয়ানা খাওয়াইবার ব্যবস্থা করিয়া দিলেন। ডাক্তর সাহেব চলিয়া গেলেন। স্কট্ টম্‌সনের ডিস্পেন্সরি থেকে অসুদ আসিল। রোগীকে এক পুরিয়া অসুদ খাওয়ান হইল। পাঁচ মিনিট্ না যাইতেই বমি হইয়া অসুদ উঠিয়া পড়িল। এই যে বমি আরম্ভ হইল, এ বমি ডাক্তর সাহেব তিন চারি দিনেও বন্ধ করিতে পারিলেন না। শেষে আর এক জন সাহেব ডাক্তরের সঙ্গে যুক্তি করিয়া অনেক চেষ্টায়, অনেক কষ্টে, বমি বন্ধ করিলেন। নিয়ত বমি করিয়া রোগী এত দুর্ব্বল আর কাবু হইয়া পড়িলেন যে, তাঁকে চাঙ্গা করিতে ডাক্তর সাহেবের ১৫। ১৬ দিন লাগিল। এই বমির কথা রোগীর বরাবরি মনে ছিল। এ বারে ফিরে রক্ত-আমাশা হইতেই মেম সাহেবকে তাঁর ভয়ের কথা বলিলেন, আর সাহেব ডাক্তর আনিতে একবারে নিষেধ করিয়া দিলেন। বাঙালি ডাক্তরদের মধ্যে আমিই নিকটে ছিলাম। এই জন্যে, তাঁরা আমাকেই ডাকিয়া পাঠাইলেন। আমি উপস্থিত হইতেই সাহেব মেম দুজনেই আমাকে জিজ্ঞাসা করিলেন, "ইপেকাকুয়ানা না দিয়া আপনি নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিতে পারেন কি না?" পারি না, এমন নয়। তবে নূতন রক্ত-আমাশার অসুদই ইপেকাকুয়ানা। কিন্তু যেখানে রোগী

ইপেকা খাইয়া কোন ক্রমেই তা পেটে রাখিতে পারে না, সেখানে অন্য অসুদ ব্যবস্থা না করিলে যে তার জীবন রক্ষা হওয়াই ভার। আমার এই কথায় তাঁরা বড়ই তুষ্ট হইলেন; আর আমাকে খুব আদর করিয়া বসাইলেন। তার পর আমি তাঁর নাড়ী, জিব, গায়ের তাত আর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। কাশ রোগের চিকিৎসায় রোগীর বুক পরীক্ষা না করিলে রোগের যেমন কিছুই বুঝিতে পারা যায় না, রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষা না করিলে রক্ত-আমাশা রোগের তেমনি কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রক্ত-আমাশা রোগীর অন্ত্রের কি দশা ঘটিয়াছে, খুব সাবধানে আর তন্ন তন্ন করিয়া মল পরীক্ষা না করিলে, তা কিছুই বুঝিতে পারা যায় না। রক্ত-আমাশা রোগীর মল কেমন করিয়া পরীক্ষা করিতে হয়, এর পরই তা বলিব। এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগীর মলের গন্ধ যাঁর নাকে একবার গিয়াছে, তাঁর আর কখনও ভুল হয় না। তার পর, সব পরীক্ষা করা হইলে যে সব অসুদ ব্যবস্থা করিছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) বিস্মথ্ ... ... ১৫ গ্রেন্
পল্‌ব্ ক্রীটি কো কম্ ওপিও ... ১৫ গ্রেন্

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, ততগুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। প্রতিবার বাহ্যের পর এই পুরিয়া এক একটী করিয়া খাইতে বলিলাম।

(২) স্যালিসীন ... ... ১ ড্রাম্

এতে ছয়টী পুরিয়া তয়ের কর।

রোজ সকালে একটী করিয়া পুরিয়া খাইতে বলিলাম।

অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই স্যালিসীন শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করে। এ কথা এর আগেই (৪৪৮র পাতে) বলিছি। এই জন্যে, রক্ত-আমাশা রোগীকে স্যালিসীন দিতে কখনও ভুলিও না।

(৩) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) ... ৪ ড্রাম

মিউসিলেজ্ (গঁদ-ভিজের জল) ... ৪ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের আটটা দাগ কাটিয়া দাও। পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে এই আরক এক এক দাগ গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম। রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়; কাজেই, বারে বারে বাহ্যে যাইতে হয় বলিয়া নিদ্রার খুবই ব্যাঘাত ঘটে। এই জন্যে, রাত্রি আট্‌টার সময় একবার, আর দিনের বেলায় যখন দরকার হবে, তখন একবার ঐ আরক পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম। যদি বল, ও আরক পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার আবার দরকার কি? আর সে দরকার বুঝিবই বা কেমন করিয়া? পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে যখন ঐ আরক পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিছি, তখন ওর দরকার বুঝাইয়া বলিবার জন্যে কি আর বেশী বলিতে হইবে?

এই সব অসুদ ব্যবস্থা করিয়া, তার পর পথ্যের ব্যবস্থা করিলাম। রক্ত-আমাশা রোগীর পথ্যের কথা এর আগেই বলিছি। চিবাইয়া খাইতে হয়, এমন কোনও আহার রক্ত-আমাশা রোগীকে দিবে না—পথ্যের এ নিয়মটী পালন না করিলে রক্ত আমাশা রোগের চিকিৎসায় চিকিৎসক কখনও যশ পাইবেন না।

এই সব অসুদ খাইয়া, আর পথ্যের ধরাধর করিয়া সাহেব দু দিনেই চাঙ্গা হইয়া হইয়া উঠিলেন। পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, বারে বারে বাহ্যে যাওয়া—রক্ত-আমাশার এ সব লক্ষণই সারিয়া গেল। দু তিন দিন অসুদ খাইয়া রক্ত-আমাশা সারে, সাহেবের এ বিশ্বাসই ছিল না। এই জন্যে, সাহেব যেমন খুসী হইলেন, তেমনি আশ্চর্য্যও হইলেন। সাহেব জিজ্ঞাসা করিলেন, চিবাইয়া খাইবার মত আহার কবে পাইব? যত দিন সহজ বাহ্যে না হবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার পাইবেন না। স্যালিসীনের পুরিয়া আপনাকে আরও আট দশ দিন খাইতে হইবে। এই বলিয়া বিদায় হইলাম।

তবেই, যদি ধর ত নূতন রক্ত-আমাশার চিকিৎসা খুবই সহজ। এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার কথা বলি।

(২) পুরাণ রক্ত-আমাশা——পুরাণ রক্ত-আমাশার চেয়ে দুঃসাধ্য খল রোগ আর নাই—এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে আর সারিতে চায় না। রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে দুর্দ্দশা ঘটে, তা যদি একবার ভাবিয়া দেখ, তবে পুরাণ রক্ত আমাশা কেন

সারিতে চায় না, বেশ বুঝিতে পারিবে। প্রথম ধর, ঘা হইয়া বড় অন্ত্রের খোল কমিয়া যায়। তার পর ধর, রোগী যা আহার করে, তা যদি একবারে বেশ পরিপাক হইয়া না যায়, তবে সেই অজীর্ণ জিনিষ ঘায়ের উপর দিয়া নিয়ত গিয়া ঘা গুলিকে শুকাইতে দেয় না। কাজেই, ঘা না শুকাইতে পাইলে, রক্ত-আমাশা রোগই বা কেমন করিয়া সারিবে? তাতেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগ নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে, চিবাইয়া খাইবার মত আহার রোগীকে কখনও দিবে না। মল সহজ হওয়াই রক্ত-আমাশা রোগীর রোগ নির্দ্দোষ হইয়া সারার চিহ্ন। রক্ত-আমাশা রোগীর পথ্যের ব্যবস্থার বেলায় চিকিৎসকের বিবেচনার খুব দরকার। য়্যারারুট্, চূণের জল-মিশনো এক-বল্কা দুধ আর মাংসের ক্বাথ, রক্ত-আমাশা রোগীর পথ্য জানিবে। অসুদ বিসুদ খাইয়া, পথ্যের ধরাধর করিয়া, রক্ত-আমাশা অনেক ভাল হইল। চিবাইয়া খাইবার মত আহার অনেক দিন পাই নাই, আজ্ আমাকে দুটি ভাত দিন্ বলিয়া রোগী চিকিৎসকের নিকট আব্দার করিতে লাগিল। চিকিৎসক তার আব্দারে ভুলিয়া মাছের ঝোল ভাত খাইতে হুকুম দিলেন। রোগী আনন্দে মাছের ঝোল দিয়া ভাত খাইল। ভাত খাইল, মাছের ঝোল খাইল, মাছ খাইল, মাছের ঝোলের দু পাঁচ খান তরকারিও খাইল। বেলা ১০টার সময় এই রকম করিয়া আহারাদি করিল। দিনমানে সুপথ্য কুপথ্যের ফলাফল বড় একটা জানিতে পারিল না। সন্ধ্যার পর পেটের কামড়ে রোগী অস্থির হইল। পেটের

কামড়, বারে বারে আম-রক্ত বাহ্যে, আর বাহ্যে ব'সে কোঁতানি—এই সব দেখিয়া বাড়ীর দুই এক জন সেই রাত্রেই চিকিৎসকের কাছে ছুটিলেন। আমি এ রাত্রে যাইতে পারিব না, যাইবার দরকারও নাই। আপনারা রোগীর মল ফেলিয়া দিবেন না। আমি কাল্ সকালে গিয়া তার আজ্ রাত্রের সব মল পরীক্ষা করিয়া দেখিব। এই বলিয়া চিকিৎসক তাদের বিদায় করিয়া দিলেন। তার পর দিন বেলা ৬টা না বাজিতেই, রোগীর বাড়ীতে চিকিৎসক গিয়া উপস্থিত হইলেন। গিয়া দেখিলেন, বাড়ীর চাকরদের পর্য্যন্ত মুখ ভার। অন্য দিন চিকিৎসকের আদর অপেক্ষার সীমা থাকে না; আজ্ আদরও নাই, সম্ভাষণও নাই! অন্য দিন তাঁকে আসিতে দেখিয়া বাড়ীর কর্ত্তা পর্য্যন্ত উঠিয়া দাঁড়াইতেন, আজ্ চাকরটাও তাঁর অভ্যর্থনা করিল না! চিকিৎসক অপ্রতিভ ভাবে জিজ্ঞাসা করিলেন, রোগী আজ্ কেমন আছে? "দেখুন, দেখিলে সব জানিতে পারিবেন"—চারি দিক্ থেকে সকলেই এই কথা বলিয়া উঠিলেন। আগে মল পরীক্ষা করিয়া দেখি, তার পর রোগীকে দেখিব। এই বলিয়া তিনি মল পরীক্ষা করিতে গেলেন। মল পরীক্ষার পর খানিক ক্ষণ অবাক্ হইয়া থাকিয়া বাড়ীর কর্ত্তাকে কাছে ডাকিলেন। চিবাইয়া খাইবার জিনিষ রক্ত-আমাশা রোগীকে খাইতে দিলে কেমন তা পরিপাক হয়, কর্ত্তাকে তা হাতে হাতে দেখাইয়া দিলেন। আলু, পটোল, বেগুণ, ভাত, রোগী যা যা খাইয়াছিল প্রায় সব জিনিষই নামিয়া আসিয়াছে,

দেখিয়া কর্ত্তা একবারে অবাক্ হইয়া থাকিলেন। চিকিৎসক তখন সময় পাইয়া বলিলেন, এই জন্যেই রোগীর পথ্য লইয়া আমি আপনাদের সঙ্গে রোজ ঝগড়া ও মারামারি করিয়া থাকি। বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য, বা প্রতিজ্ঞার একটু ত্রুটি হইলে চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই একটু ত্রুটিতেই তার মান সম্ভ্রম সবই যায়! রোগীর মল যত দিন না সহজ হবে, তত দিন তাকে চিবাইয়া খাইবার মত জিনিষ কোন মতেই দিবে না—আপনাদের উপরোধ অনুরোধে কাল্ যদি এ প্রতিজ্ঞা ভঙ্গ না করিতাম, তবে আমাকে আজ্ আপনাদের নিকট এ রকম অপদস্থ আর অপ্রতিভ হইতে হইত না। এখন জানিলাম, চিকিৎসকের যশ, মান খাটো হইতে বিস্তর ক্ষণ লাগে না। রোগীর আবদার শুনিয়া, কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া, রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথ্যের ফলাফলের জন্যে চিকিৎসককে তারা অপ্রতিভ করিতে ছাড়ে না—এ কথাটা সব চিকিৎসকেরই যেন মনে থাকে।

তার পর বলি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ক্ষয় পাইয়া যায়—পাতলা হইয়া যায়। পুরাণ রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির এ রকম দুর্দ্দশা সচরাচরই ঘটে। আবার অনেক জায়গায় অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘা গুলি আধ-সারা ভাবেই থাকিয়া যায়। এ রকম আধ-সারা ঘা অনেক জায়গায় শেষে বেশ সারিয়া যায়। সারিয়া গেলে রোগীর ব্যামোও নির্দ্দোষ সারিয়া যায়। কিন্তু এ রকম ঘটা বড় ভাগ্যের কথা। যাদের ভাগ্যে এ রকম না ঘটে,

তাদের শরীর ক্রমে ক্ষয় পাইয়া যায়। তাদের গা শুক্‌নো খস্‌খসে, আর আঁইস্‌-ওঠা-ওঠার মত হয়। তারা এক দিন বা ভাল থাকে, এক দিন বা তাদের ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়। জিব খুব রাঙা, আর চক্‌চকে যেন বার্ণিশ-করার মত হয়। তাদের মল পাতলা, পূঁয্‌ আর রক্ত-মিশন আর তাতে ভয়ানক দুর্গন্ধ। মলের দুর্গন্ধে তার ত্রিসীমানায় কেউ তিষ্ঠিতে পারে না। আবার এ দিকে, পেটের কামড় আর গুহ্যদ্বারের শূলনিতে রোগী এত কাতর আর অবসন্ন হইয়া পড়ে যে, সে নিজের যন্ত্রণা শান্তির জন্যে নিয়ত মৃত্যু কামনা করে।

তার পর এখন পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——পুরাণ রক্ত-আমাশায় অনেকে অনেক রকম ধারক অসুদ দিয়া থাকেন। ধারক অসুদের মধ্যে ধাতু-ঘটিত ধারকই পুরাণ রক্ত-আমাশার পক্ষে ভাল। আবার ধাতু-ঘটিত অসুদের মধ্যে তুতে পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অসুদ, তেমন আর কোনটীই নয়। যে সব অসুদে ধাতু আছে, সে সব অসুদকে ধাতু-ঘটিত অসুদ বলে। তুতেতে তামা আছে বলিয়া, তুতেকে ধাতু-ঘটিত অসুদ বলিতেছি। পুরাণ রক্ত-আমাশায় আমি যে যে অসুদ সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) তুতে (সল্‌ফেট্‌ অব্‌ কপর্‌) ... ¼ গ্রেন্‌
ডোবার্স পাউডর (পল্‌ব ইপেকা কো) ... ৫ গ্রেন্‌
পল্‌ব ঘ্যাকেশিয়া (বাবলার আটার গুঁড়ো) ৫ গ্রেন্‌

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর

এই রকম হিসাব করিয়া যত গুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। রোগীকে রোজ তিন বেলা তিনটী পুরিয়া খাইতে দিবে। রোগটী যত দিন নির্দ্দোষ হইয়া না সারিবে, তত দিন এই অসুদ নিয়ম করিয়া খাইতে বলিবে। এই পুরিয়া অসুদে আমি অনেক পুরাণ রক্ত-আমাশা ভাল করিছি। ফল কথা, পুরাণ রক্ত-আমাশার এর চেয়ে ভাল অসুদ আমি আর জানি না।

(২) স্যালিসীন ... ... ১ ড্রাম্

এতে ১২টী পুরিয়া তয়ের কর।

রোগীকে রোজ সকালে একটী, আর সন্ধ্যার আগে একটী, এই পুরিয়া খাইতে দিবে। এর আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না—পেট-নাবাই হোক্, শুদু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক্, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিউকস্ মেম্ব্রেণের) সহজ অবস্থার তফাৎ না হইলে, এ সব রোগের সৃষ্টিই হইতে পারে না। আবার, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সহজ অবস্থা করিবার যেমন উপায় স্যালিসীন, তেমন উপায় আর নাই। এই জন্যে, পেটের-ব্যামোতে রোগীকে স্যালিসীন্ দিতে কখনও ভুলিও না। ৪৪৭র থেকে ৪৪৮র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়।

(৩) পেটের কামড়, শূলনি, বেগ দেওয়া, আর বারে বারে বাহ্যে যাওয়া নিবারণ করিবার জন্যে রোজ রাত্রি ৮টার সময় রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে লডেনমের (আফিঙের আরকের) পিচ্‌কিরি দিবে। লডেনমের পিচ্‌কিরি

কেমন করিয়া দিতে হয়, ৯৪ আর ৫২৩র পাতে তা বেশ করিয়া লিখিয়া দিইছি। রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হয়; এই জন্যে, কেবল রাত্রেই লডেনমের পিচ্‌কিরি দিতে বলিলাম। কিন্তু দিনের বেলায়ও যদি ব্যামোর বাড়াবাড়ি দেখ, তবে লডেনমের পিচ্‌কিরি দিতে ভুলিও না।

(৪) রোজ সকালে ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি করিয়া রোগীর অন্ত্র ধুইয়া দিবে। ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি করিয়া রোগীর অন্ত্র ধুইয়া দিলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বাড়ে। এ ছাড়া, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির অপরিষ্কার পচা ঘা গুলি পিচ্‌কিরির জলে বেশ পরিষ্কার হইয়া যায়। কাজেই, ঘা গুলি শীঘ্র শুকাইয়াও যায়। ঘা শুকাইয়া গেলে, রক্ত-আমাশাও নির্দ্দোষ সারিয়া যায়। তবেই দেখ, শুদ্ধু এক ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরিতেই কত উপকার! তাতেই বলিতেছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসায় ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিতে কখনও ভুলিও না। কত খানি ঠাণ্ডা জল কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি দিতে হয়, ৪৬৯ থেকে ৪৭০র পাতে তা বলিছি।

৪৬৭র পাতে বলিছি, পেটের-ব্যামো পুরাণ হইলে তা পেট নাবাই হোক্, শুদ্ধু আমাশাই হোক্, আর রক্ত-আমাশাই হোক্, তাকে বৈদ্যরা গ্রহণী বলে। সচরাচর লোকে তাকে গিরিণি বলে। ৪৬৭ থেকে ৪৭৪র পাতে গিরিণি রোগের কথা বলিছি। এই জন্যে, পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা পড়িবার সময় সেই পাত গুলি আর এক বার ভাল করিয়া পড়িবে।

অনেক জায়গায় পুরাণ রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যথার্থই ভয় পাইতে হয়। মলের সঙ্গে আম, রক্ত, আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘায়ের পচানি এত বাহির হয় যে, তা ঠাউরে দেখিলে রোগী বাঁচিবে বলিয়া আর আশা থাকে না। ঘায়ের এই পচানিকে ডাক্তরেরা স্লফ্ বলেন। যে রক্ত-আমাশায় মলের সঙ্গে এই রকম পচানি (স্লফ্) বাহির হয়, সে রক্ত-আমাশাকে ডাক্তরেরা স্লফিং ডিসেণ্টরি বলেন। স্লফিং ডিসেণ্টরিকে সোজা বাঙ্গালায় পচা রক্ত-আমাশা বলিতে পার।

পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখিলে যে ভয় হয় বলিলাম, ভাবিয়া দেখ ত, সে রকম ভয় হইবারই কথা বটে। কেন না, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘায়ের ও রকম পচানি রোজ রোজ অত বাহির হইতে থাকিলে, ঘায়ের জায়গায় অন্ত্র ফুটো হইয়া যাইতে কত দিন লাগে। অন্ত্র কত টুকুই বা পুরু ? ঘা গভীর হইয়া তা ফুটে যাইতেই বা কতক্ষণ লাগে ? অন্ত্র ফুটো বা ছাঁদা হইয়া গেলে, রোগীর যে বিপদ ঘটে, ৪৯৯র পাতে তা বলিছি। তাতেই পচা রক্ত-আমাশাকে চিকিৎসকেরা এত ভয় করিয়া থাকেন। আর তাতেই বলিতেছি, পচা রক্ত-আমাশায় রোগীর মল ভাল করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। পচা রক্ত-আমাশায় শুদু ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি না করিয়া, তার বদলে বাবলার ছালের পাচনের সঙ্গে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া, সেই পাচনের পিচ্‌কিরি দিবে। সচরাচর রাত্রেই ব্যামোর বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে। এই জন্যে, রোজ রাত্রি ৮টার

সময় ফট্‌কিরির গুঁড়ো-মিশনো বাবলার ছালের এই পাচন রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। কত টুকু পাচনে কত টুকু ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিতে হয়, ৪৭২র পাতে তা বলিছি। বাবলার ছালের তিন পোআ পাচনে (ডিককৃশনে) ৪ ড্রাম্ (এক কাঁচ্চা) ফট্‌কিরির গুঁড়ো দিবে। ১২২—১২৩র পাতে নিমের ছালের পাচন যেমন করিয়া তয়ের করিতে হয় বলিছি, বাবলার ছালের পাচনও ঠিক্ তেনি করিয়া তয়ের করিবে।

৫১৭র পাতে বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগীর পেটের কামড় নিবারণের যেমন অসুদ তার্পিণের সেক, তেমন অসুদ আর নাই। পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসারও বেলায় যেন এ কথাটা মনে থাকে। প্লুরিসি-রোগীর ব্যথার জায়গায় যে রকম করিয়া তার্পিণের সেক দিতে বলিছি, এখানেও সেই রকম করিয়া সেক দিবে। ৪১৪—৪১৫র পাত দেখ।

নূতন রক্ত-আমাশায় পথ্যের যে রকম ধরাধর করিতে বলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশায়ও পথ্যের ঠিক্ সেই রকম ধরাধর কয়া চাই। নৈলে চিকিৎসক কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিবেন না।

তার পর এখন রক্ত-আমাশা রোগীর মল পরীক্ষার কথা বলি।

মল-পরীক্ষা——এর আগেই বলিছি, রক্ত-আমাশা রোগে রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখা যেমন দরকার, তেমন আর কোন রোগেই নয়। রক্ত-আমাশার চিকিৎসা

করিতেছ, কিন্তু রোগীর মল পরীক্ষা করিয়া দেখ না। এতে তোমাকে অন্ধকারে হাতড়াইতে হইবে বৈ আর কি ? অন্ত্রের ভিতর ঘায়ের অবস্থা কি রকম হইতেছে, রোগীকে যে অসুদ দিতেছ, তাতে তার উপকার হইতেছে কি না—এ সব যদি ঠিক্ করিয়া জানিতে চাও, তবে রোজ তার মল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোজ সকালে তার আগের দিন রাতের সব মল পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। রোগী যদি ফি বারে আলাদা আলাদা জায়গায়, বা আলাদা আলাদা পাত্রে বাহ্যে করে, তবে তার মল পরীক্ষা করার বড়ই অসুবিধা ঘটে —এমন কি, ভাল রকম পরীক্ষা হয় না বলিলেই হয়। এই জন্যে, জায়গায় জায়গায় বাহ্যে না গিয়া, ছোট একটা গামলায় বাহ্যে যাবে। গামলার দু পাশে ইট দিয়া বসিবার বেশ জুত বরাত করিয়া লইবে। গামলায় কেবল বাহ্যেই যাবে। তাতে প্রস্রাবও করিবে না, জল-শৌচের জলও ফেলিবে না। রোজ সকালে গিয়া সেই গামলাটী বাইরের আলোতে আনিতে বলিবে। তার পর ঐ গামলায় জল ঢালিতে বলিবে। খানিক পরে আর একটা গামলায় ঐ জল এমন জুত বরাত করিয়া ঢালিতে বলিবে যে, গামলার তলানি যেন ঘুলাইয়া না উঠে। উপ্রো-উপ্রি তিন চারি বার এই রকম করিয়া জল ঢালা উপ্রো করিলে, জলের সঙ্গে গামলার মল সব আলাদা পাত্রে গিয়া পড়িবে। শেষে গামলার তলায় আম, রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্রো, আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ঘায়ের পচানি (স্লফ্) বেশ স্পষ্ট দেখিতে পাইবে। এই গুলি যদি আরও ভাল করিয়া

দেখিতে চাও, তবে একটা সমান জায়গায় কলার পাত উল্টো করিয়া পাতিয়া, তাতে ঐ গুলি ঢালিয়া দিবে। তার পর, একটা কাটি দিয়া ঐ গুলি এক এক করিয়া বিছাইয়া দেখিবে। চীনের শাদা বাসনেই এ রকম পরীক্ষা সব চেয়ে ভাল হয়। চীনের বাসন যাঁরা মিলাইতে না পারিবেন, তাঁরা কলার পাতের উল্টো পিঠে পরীক্ষা করিয়া দেখিবেন। এই রকম পরীক্ষায় গামলার তলায় আম, রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্‌রো, আর ঘায়ের পচানি (স্লফ্) যত বেশী দেখিতে পাবে, অন্ত্রের ভিতরকার অবস্থা তত খারাপ ঠিক্ করিবে। আবার, অসুদ বিসুদ খাইয়া আর পথ্যের ধরাধর করিয়া, রোগীর রোগ যেমন কমিতে থাকিবে, পরীক্ষায় গামলার তলায় ও সব জিনিষও তেমনি কম দেখিতে পাবে। তবেই দেখ, এই রকম করিয়া শুদু মল পরীক্ষা করিয়াই রক্ত-আমাশা রোগীর রোগের অবস্থা বেশ ঠিক্ করিতে পার। কেমন আছ, বা রোগী কেমন আছে বলিয়া, তোমার রোগীকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না, তার আত্মীয় স্বজনকেও জিজ্ঞাসা করিবার দরকার হয় না। রোগীর মল যত দিন না সহজ হবে, রোজ সকালে গিয়া তার মল এই রকম করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিবে।

মল পরীক্ষা করিলে রক্ত-আমাশা রোগীর যে কেবল রোগেরই অবস্থা ঠিক্ জানিতে পারা যায়, তা নয়; রোগী কুপথ্য করিলেও মল পরীক্ষায় তা ধরা পড়ে। এখানে আমার একটা রোগীর কথা বলি। ১২। ১৩ বছর হইল,

আমি একটী সাহেবের পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। অস্নুদ বিস্নুদ খাইয়া, আর পথ্যের ধরাধর করিয়া তার ব্যামো অনেক সারিয়া যায়। তার পর হঠাৎ এক দিন আর ব্যামো বাড়ে। ব্যামো এমন সারিয়া হঠাৎ কেন আবার বাড়িল? সাহেব অবশ্যই তুমি কোন কুপথ্য করিয়াছ। আমার এই কথা শুনিয়া সাহেব বলিলেন, আমি কোনও কুপথ্য করি নাই। বারে বারেই তিনি এই কথা বলিতে লাগিলেন। শেষে মল পরীক্ষায় সব প্রকাশ হইয়া পড়িল। মল পরীক্ষায় দেখা গেল, গামলার তলায় আমের সঙ্গে কতকগুলি আস্ত চাইল রহিয়াছে। ঘরের ভিতর গিয়া সাহেবকে জিজ্ঞাসা করিলাম, কাল্ তুমি কাঁচা চাইল খাইয়াছিলে? সাহেব বলিলেন, না, আমি চাইল খাই নাই। তবে তোমার মলের সঙ্গে চাইল কোথা থেকে আসিল? এই কথায় সাহেব নিরুত্তর হইয়া খানিক পরে বলিলেন, হাঁ, কাল্ গোটা কতক চাইল খাইয়াছিলাম বটে। মল পরীক্ষায় যে কুপথ্য পর্য্যন্ত ধরা পড়ে, সাহেব তা জানিতেন না। এই জন্যেই, প্রথমে মিছে কথা বলিয়াছিলেন। সাহেবের ব্যামো হঠাৎ বাড়ার কারণ এই রকম ঠিক্ ঠাক্ ধরিয়া দিলাম বলিয়া, তিনি আমাকে আর অপ্রতিভ করিতে পারিলেন না। কোন রোগের চিকিৎসা করিতেছ, রোগী তোমার সব নিয়মই পালন করিতেছে, অস্নুদ বিস্নুদও বেশ নিয়ম করিয়া খাইতেছে। ব্যামো অনেক ভাল হইয়া হঠাৎ এক দিন বাড়িল। রোগীর আত্মীয় স্বজন তোমার

কাছে দৌড়িয়া আসিল। ব্যামো এ রকম হঠাৎ বাড়ার কারণ যদি তুমি তাঁদের বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না পার, তবে তুমি দাঁড়াইয়া অপ্রতিভ হবে। সে রোগী তোমার হাতে ভাল হইবে না বলিয়া তাদের বিশ্বাস জন্মিবে। এ রকম বিশ্বাসের ফল কি? ফল সোজা নয়। এ রকম বিশ্বাসে পশার যাইবার কথা! তাতেই বলিতেছি, রোগের কেবল অসুদটী শিখিয়া রাখিলেই চলিবে না। কি অত্যাচার করিলে কোন্ রোগ বাড়ে, চিকিৎসকের সেটীও বেশ করিয়া জানিয়া রাখা চাই।

এর আগেই বলিছি, পুরাণ রক্ত-আমাশার যেমন অসুদ তুতে, তেমন অসুদ আর নাই। কিন্তু কোন কোন জায়গায় তুতে-ঘটিত অসুদ খাইয়া রোগী তা কিছুতেই পেটে রাখিতে পারে না। এ রকম রোগী পাইলে কি করিবে? কি অসুদ দিয়া তার 'পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিবে? তুতে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার আর কোন অসুদ যদি সত্য সত্যই না থাকিত, তবে ও রকম রোগী লইয়া যথার্থই মুস্কিলে পড়িতে হইত। পুরাণ রক্ত-আমাশার' আর একটী ভাল অসুদ আছে। যে রোগী তুতে-ঘটিত অসুদ খাইয়া পেটে রাখিতে না পারিবে, তাকে সেই অসুদটী দিবে। সে অসুদটী আর কি? মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়া। এখানে আমার আর একটী রোগীর কথা বলি।

প্রায় দশ বছর হইল, একটী পোআতির পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। পুরাণ রক্ত-আমাশার

রোগীকে আমি এক এক বারে আধ ($\frac{1}{2}$) গ্রেন্ করিয়া তুতে দিয়া থাকি—জায়গা বিশেষে সিকি ($\frac{1}{4}$) গ্রেন্ করিয়াও দিই! কিন্তু এ পোআতিটী এক গ্রেনের বার ভাগের এক ভাগও ($\frac{1}{12}$) তুতে খাইয়া পেটে রাখিতে পারিত না। পুরিয়াতে তুতে আছে, অসুদের তারেই পোআতি তা বুঝিতে পারিত। পুরিয়া খাইলে অসুদের তার (আস্বাদন) বেশী টের পাওয়া যায় বলিয়া, তুতে-ঘটিত অসুদের বড়ি করিয়া খাইতে দিতাম; সে বড়িও পেটে রাখিতে পারিত না। এবারে যে বড়ি দিতেছি, এতে তুতে নাই, এ বড়ি খাইলে কখনও ন্যাকার হবে না। এ রকম করিয়া ফাঁকি দিয়াও দেখিছি, তবু সে বড়ি পেটে রাখিতে পারে নাই। বড়ি খাইয়া দশ মিনিট্ও পেটে রাখিতে পারিত না, তুলিয়া ফেলিত। শেষে তাকে মর্ফিয়া দেওয়াই স্থির করিলাম। মর্ফিয়ার সঙ্গে আর যে যে অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম ঃ—

মিয়ুরিয়েট্ অব মর্ফিয়া	... ...	১ গ্রেন্
স্যালিসীন্	... ...	১৮ গ্রেন্
পেপ্সীন্	... ...	১৮ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা	... ...	১৮ গ্রেন্
একষ্ট্রাক্ট জেন্সন্	...	যত টুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া এতে ছয়টী বড়ি তয়ের কর।

এক একটী বড়িতে কোন্ অসুদ কত করিয়া থাকিবে, হিসাব করিয়া দেখিলেই জানিতে পারিবে। এই বড়ি রোজ সকালে একটী, আর সন্ধ্যার সময় একটী খাইতে

দিতাম। এই বড়ি খাইয়া পোআতির অবস্থা ক্রমেই ভাল হইতে লাগিল। মাস খানেকের মধ্যেই তার ব্যামো নির্দ্দোষ সারিয়া গেল।

পোআতি যখন মর্ফিয়ার বড়ি খাইতে আরম্ভ করে, তখন তার আট মাস গর্ভ। এই বড়ির উপর তার এতই ভক্তি জন্মিছিল যে, প্রসবের পরও এক মাস পর্য্যন্ত সে নিয়ম করিয়া বড়ি খাইয়াছিল। যে পুরাণ রক্ত-আমাশা সারিবে না বলিয়া আমাদের দেশের ভাল ভাল বৈদ্যরাও জবাব দিইছিলেন, মর্ফিয়ার এই বড়িতে আমি সে পুরাণ রক্ত-আমাশাও ভাল করিছি।

বছর তিন চারি হইল, কলিকাতার বটতলায় একটী রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। রোগীর বয়স ৩০। ৩২ বছরের বেশী নয়। ২২। ২৩ বছর বয়স থেকে অপাক অজীর্ণ রোগে বিস্তর কষ্ট পায়। শেষে তার রক্ত-আমাশা হয়। প্রথমে ডাক্তরি চিকিৎসা করায়। ডাক্তরি চিকিৎসায় বিশেষ ফল না পাইয়া বৈদ্যকে দিয়া দেখায়। বৈদ্যের চিকিৎসায়ও তেমন ফল পাইল না। আবার ডাক্তরকে ডাকিল। বারে বারে এই রকম করিয়া চিকিৎসকের হাত বদলাইতে বদলাইতে তার ব্যামোটী বেশ পুরাণ পড়িয়া গেল। রক্ত-আমাশা পুরাণ পড়িয়া গেলে সারিতে চায় না, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। আমাদের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোআনের বিশ্বাস, পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়। এই জন্যে, বৈদ্যকেই দিয়া দেখান সকলের মত হইল। এক এক

করিয়া কলিকাতার বড় বড় বৈদ্য, সকলেই তাকে এক এক বার দেখিলেন। এ রক্ত-আমাশা শিবের অসাধ্য বলিয়া তাঁরা সকলেই জবাব দিয়া গেলেন। রোগীর সঙ্গে আমার বিশেষ পরিচয় ছিল না। কিন্তু তার আত্মীয় স্বজনের সঙ্গে আমার বেশ জানা শুনা ছিল। রোগী যখন অপাক অজীর্ণ রোগে বড় কষ্ট পায়, তখন আমাকে একবার দেখাইয়াছিল। এখন ভাল রকম চিকিৎসা না করাইলে, আর পথ্যের খুব ধরাধর না করিলে, শেষে তোমার এই রোগ থেকেই প্রমাদ ঘটিবে—আমার এই কথা গুলি তার আত্মীয় স্বজনের বরাবরই মনে ছিল। এই জন্যেই বোধ করি, তারা সব শেষে আমাকে ডাকিয়া পাঠাইল।

আমি গিয়া দেখিলাম, রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি নাই। শির-দাঁড়ার হাড়, ঘাড় থেকে গুহ্যদ্বার পর্য্যন্ত, এক এক খানি করিয়া গণিয়া লওয়া যায়। শরীরে মেদ মাংসের লেশ নাই বলিলেও বাড়াইয়া বলা হয় না। হাড় ক-খানি কেবল চামড়া দিয়া ঢাকা। পেটটী যেন একবারে সারিন্দের খোল। ঠোঁট, জিব, আর মাড়ি রাঙা আর চক্‌চকে, যেন বার্ণিশ-করা। ঠোঁট, জিব, আর মাড়ির এ রকম অবস্থা অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ভারি রকম উদ্দীপনার চিহ্ন। উদ্দীপনাকে ডাক্তরেরা ইরিটেশন্ বলেন। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। বেগ দিয়া আর বারে বারে বাহ্যে গিয়া গুহ্যদ্বার ফাঁক আর অসাড়। যখন যা খায়, তখনই তা বর্জ্জনিশ্ নামিয়া পড়ে।

মলের রং এক সময় এক রকম নয়—কখন শাদা, কখন রাঙা, কখন কাল, কখন শবুজে, কখন ছেয়ে, কখন মেটে, কখন পাট্‌কিলে। পেটের কামড়, শূলনি আর আমাশার বেগের জন্যে দিনেও ঘুম নাই, রাত্রেও ঘুম নাই। রোগীর এই বিষম দশা দেখিয়া, আর বিষম দশার কথা শুনিয়া, অসুদ বিসুদে কিছু করিতে পারিব বলিয়া আমার আর বড় একটা ভরসা থাকিল না। শেষে অনেক ভাবিয়া চিন্তিয়া তাকে যে সব অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) মর্ফিয়ার ঐ বড়ি

সকালে আর সন্ধ্যায় দু বেলায় দুটো।

(২) বাইক্লোরাইড্ অব মর্করি	...	১ গ্রেন্
পরিষ্কার জল ...	...	১২½ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া বড় একটা শিশিতে কি শাদা বোতলে রাখ।

এই অসুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক ড্রাম করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

(৩) টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্)	...	৪ ড্রাম
মিউসিলেজ্ (গঁদ-ভিজের জল)	...	৪ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৮টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ৩ ঘণ্টা অন্তর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিলাম। গুহ্যদ্বার ফাঁক আর অসাড় বলিয়া, পিচ্-কিরি দেওয়ার পর ন্যাকড়ার পুঁটুলি দিয়া গুহ্যদ্বার আধ ঘণ্টা খানেক চাপিয়া রাখিতে বলিলাম।

পথ্য——শুদু একটু মাংসের-কাথ ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিতে বলিলাম।

সকালে অসুদ আর পথ্যের এই রকম ব্যবস্থা করিয়া আমি বিদায় হইলাম। তার পর দিন সকালে গিয়া রোগীর হাল জিজ্ঞাসা করিলাম। পেটের কামড়, শূলনি আর বেগের জন্যে যে রোগী দু-মাস চোকের পাতা বোজে নাই, আপনার সেই বড়ি খাইয়া আর পিচ্‌কিরি লইয়া রোগী কাল্‌ দিনেও যেমন ঘুমিয়েছে, রাত্রেও তেমনি ঘুমিয়েছে—যাতনার ভাগ কাল্‌ তার খুবই কম গিয়াছে—এই সব কথা বলিয়া তার আত্মীয় স্বজনেরা আমার আশা ভরসা যে কত বাড়াইয়া দিল, তা বলিতে পারি না। এই রকম নিয়ম করিয়া অসুদ বিসুদ খাইয়া আর পথ্যের ধরাধর করিয়া রোগীর অবস্থা দিন দিন ভাল হইতে লাগিল। যে রোগীকে ধরিয়া বাঁধিয়া দিনান্তে এক ছটাক দুধ খাওয়ান যাইত না—খিদে কাকে বলে, যে রোগী জানিত না—যে রোগী যখন যা খাইত, বর্জ্‌নিশ্‌ তা নামিয়া পড়িত—শুদু একটু মাংসের-কাথে, আমার আর খিদে ভাঙ্গে না বলিয়া, আর কিছু আহার পাইবার জন্যে সেই রোগী জেদ করিতে লাগিল। মাংসের-কাথ ছাড়া চুণের জলের সঙ্গে মিশাইয়া তাকে একটু একটু দুধও দিতে বলিলাম। মাংসের কাথ আর দুধ সে বেশ পরিপাক করিতে লাগিল। যে রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না, ১৫ দিন না যাইতেই, ধরিয়া বসাইয়া দিলে বালিশ ঠেশ দিয়া সে রোগী বসিতে পারিল। দিনদিন তার খিদে এতই বাড়িতে লাগিল যে, মাংসের-

ক্কাথ আর ত্তুধ দিয়া তাকে আর কিছুতেই রাখিতে পারা গেল না। মল সহজ হইলে ভাত দিবার কথা ছিল। ২১ দিন না যাইতেই মল সহজ হইল। এই জন্যে ২২ দিনের দিন জেদ করিয়া এক ছটাক চাইলের ভাত খাইল। এক ছটাক চাইলের ভাত খাইয়া বেশ হজম করিতে পারিল দেখিয়া, রোজ তু তোলা করিয়া চাইল বাড়াইয়া দিতে বলিলাম। ২০ তোলার (এক পোআর) বেশী চাইলের ভাত দেওয়া হবে না। শেষে সে এই বিশ তোলা চাই-লের ভাত এমনি করিয়া খাইত যে, পাতে একটীও থাকিত না। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ, অসুদ আর সুপথ্যের কি শক্তি! যে রোগীকে হঠাৎ দেখিলে জ্যেয়ন্ত বলিয়া বোধ হইত না—যে রোগীর পাশ ফিরিবার শক্তি ছিল না—পেটের কামড়, শূলনি আর বেগের জন্যে যে রোগী তু মাস চোকের পাতা বোজে নাই—যে রোগীর পরিপাক করিবার শক্তি একবারে গিইছিল, যখন যা খাইত, তা বজ্‌নিশ্ নামিয়া পড়িত—বেশী নয়, তু মাসের মধ্যেই সে রোগী ২০ তোলা চাইলের ভাত হজম করিতে পারিল। অসুদ আর সুপথ্যের শক্তির পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে পারে।

এই রোগীটার চিকিৎসার কথা বলিতে (২) র দাগে যে অসুদটী লিখিয়া দিইছি, সে অসুদটী একটু আন্‌কা রকম বলিয়া বোধ হইতে পারে। এই জন্যে, সে অসুদটীর কথা একটু বিশেষ করিয়া লিখিয়া দিলাম। যে পুরাণ পেটের-ব্যামোতে রোগী নানা রঙের বাহ্যে যায়, সে পুরাণ পেটের-

ব্যামোর যেমন অসুদ বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করি, তেমন অসুদ আর নাই। অসুদের বইতে বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করির যে মাত্রা লেখা আছে, তার চেয়ে ঢের কম মাত্রায় না দিলে এ রকম পেটের ব্যামো সারে না। এক গ্রেনের ১০০ ভাগের এক ভাগ (১/১০০) বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করি ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিলে তবে এ রকম পেটের-ব্যামোর বিশেষ উপকার হয়। হিসাব করিয়া দেখিলে জানিতে পারিবে, (২) র দাগের ব্যবস্থায় (প্রেস্ক্রপ্শনে) ঘণ্টায় ঘণ্টায় (১/১০০) গ্রেন্ বাইক্লোরাইড্ অব্ মর্করি খাওয়াইতে বলিছি।

তার পর এখন ছোট ছেলেদের রক্ত-আমাশার চিকিৎসার কথা বলি। ছেলে, বুড়ো, জোআন তিনেরই রক্ত-আমাশার চিকিৎসা এক বলিলেই হয়। তবে কেবল ছোট ছেলেদেরই বেলায় এক আধটু তফাৎ আছে। এই জন্যে, ছোট একটী ছেলের রক্ত-আমাশার কথা নীচে লিখিয়া দিলাম।

৯। ১০ বছর হইল, একটী সাহেবের ছেলের রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিছিলাম। ছেলেটীর বয়স তিন বছরের বেশী নয়। দিন রাতে সে ২৫। ৩০ বার বাহ্যে যাইত। প্রতি বারেই বাহ্যের সঙ্গে আম, রক্ত, আর রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্‌রো বাহির হইত। বারে বারে এই রকম বাহ্যে গিয়া, শিশু একবারে মরার মত হইয়া পড়িল। রক্ত না থাকায় তার শরীর ফ্যাকাশে হইয়া গেল। খিদে একবারে গেল। এমন কি, কথা কহিবার ক্ষমতাও প্রায় গেল। তাকে যা খাইতে দেওয়া

যাইত, সে তাই বমি করিয়া ফেলিত। পেটের কামড়, শূলনি, আর বেগ দেওয়ার জন্যে সে দিন রাতের মধ্যে চোকের পাতা বুজিতে পারিত না। ফল কথা, শিশুর বাঁচিবার আশা খুব কম রহিল। দিন রাত তার জ্বর ভোগ করিত। এক জন সিবিল সার্জ্জন (সাহেব ডাক্তর) প্রায় ১৫ দিন পর্য্যন্ত তার চিকিৎসা করেন। তিনি অনেক অসুদ বিসুদ দিইছিলেন, কিন্তু শিশুর ব্যামোর কিছুই করিয়া উঠিতে পারেন নাই। তাঁর অসুদে ব্যামো দিন দিন না কমিয়া, উত্তর উত্তর বাড়িয়া যাইতে লাগিল। এতে ছেলের বাপ মা বড়ই ভয় পাইয়া আর এক জন চিকিৎসককে ডাকিবার মনস্থ করিলেন। আমি নিকটে ছিলাম বলিয়া তাঁরা আমাকেই ডাকিলেন। আমি গিয়া দেখিলাম, শিশু যেন মরার মত হইয়া বিছানায় শুইয়া আছে; ঠোঁট দুটী একবারে ফ্যাকাশে, হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয় রক্তের লেশ নাই। গা গরম, সব জিবে শাদা শাদা এক রকম ঘা। এই ঘাকে ডাক্তরেরা থ্রশ বলেন। পেট-ফাঁপা, চোক দুটী দেখিয়া বোধ হইল, যেন শিশুর জীবন আর বেশী দিন থাকিবে না। এই সব দেখিয়া তার মল পরীক্ষা করিতে গেলাম। সাহেবেরা চীনের এক রকম গামলায় বাহ্যে যায়। মল পরীক্ষায় সেই গামলার তলায় আম, রক্ত, রাঙা রঙের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির টুক্‌রো, আর ঘায়ের পচানি (স্লফ্) এই গুলি দেখিলাম। শিশুকে যে সব অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) হাইড্রার্জ কম্ ক্রীটা	...	...	৪ গ্রেন্
পল্‌ব্ ক্রীটি কো	...	...	৩৬ গ্রেন্
বাইকার্ব্বণেট্রি অব্ সোড়া	...	...	১২ গ্রেন্
পল্‌ব ইপেকা	...	...	৩ গ্রেন্
পেপ্‌সিন্	...	...	১২ গ্রেন্

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া এতে ২৪টী পুরিয়া তয়ের কর।

দু ঘণ্টা অন্তর একটী করিয়া পুরিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

(২) স্যালিসীন	...	...	২৪ গ্রেন্

এতে ১২টী পুরিয়া তয়ের কর।

রোজ সকালে একটা, সন্ধ্যার আগে একটা এই পুরিয়া খাওয়াইতে বলিলাম।

(৩) শিশুর পেটে রোজ তিন চারি বার করিয়া তার্পিণের সেক দিতে বলিলাম। এক এক বারে আধ ঘণ্টা ধরিয়া সেক দিবার কথা বলিয়া দিলাম।

(৪) অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল বৃদ্ধি করিবার জন্যে, আর পচা ঘা গুলি ধোআইয়া দিবার জন্যে, রোজ সকালে একবার আর সন্ধ্যার আগে একবার ঠাণ্ডা জলের পিচ্‌কিরি দিতে বলিলাম। এক এক বারে আধ পোআ ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিবার কথা বলিয়া দিলাম। জল যত পরিষ্কার আর ঠাণ্ডা হবে, ততই ভাল—এ কথাও বলিয়া দিলাম।

পথ্য——মাংসের কাথ, পুরাণ পোর্ট, আর চুণের জল-মিশনো এক-বল্কা দুধ। শিশুর মল যত দিন না সহজ

হবে, তত দিন চিবাইয়া খাইবার মত আহার তাকে দিতে নিষেধ করিয়া দিলাম।

সোহাগা আর মধু একত্র মিশাইয়া জিবের ঘায়ে লাগাইতে বলিলাম।

এই রকম নিয়ম করিয়া শিশুকে অসুদ বিসুদ খাওয়া-ইলে, আর তার পথ্যের এই রকম ধরাধর করিলে, আট দশ দিনের মধ্যেই তার ব্যামো সারিয়া গেল। যে দিন শিশুকে দেখিয়া আসিলাম, তার পর দিন থেকেই অসুদ আর সুপথ্যের ফল জানিতে পারা গেল। দু দিনের দিন বাহ্যে বারে কমিল; আর মলে রক্তের ভাগ কম দেখা গেল। তিন দিনের দিন শিশুকে আগের চেয়ে যেন একটু চাঙ্গা আর সবল দেখিলাম। চারি দিনের দিন মলে রক্তের ভাগ খুবই কম দেখা গেল, আর ঘায়ের পচানি (সূফ্) মোটেই দেখিতে পাওয়া গেল না। পাঁচ দিনের দিন মলে রক্তের লেশও দেখিতে পাইলাম না। ছয় দিনের দিন শিশুর মোটেই বাহ্যে হইল না। সব রকম পেটের ব্যামো সারিয়া গেলে, প্রথম প্রথম কোষ্ঠবদ্ধ হয়। রক্ত-আমাশা সারিয়া গেলে কোষ্ঠবদ্ধ খুবই হয়। ৫০০র পাতে এ কথা বলিছি।

খুব কম মাত্রায় হাইড্রার্জ কম্ ক্রীটা, ইপেকা আর পেপ্সিন্ ছোট ছেলেদের পেট্-নারার আর রক্ত-আমাশার যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর নাই। তুতে ছাড়া পুরাণ রক্ত-আমাশার আর দুটী ভাল দেশি অসুদ আছে। সে দুটী অসুদ ধাতু-ঘটিত অসুদ নয়; গাছড়া অসুদ। সে দুটী

গাছড়া অসুদ, বেল আর কুর্চ্চি বই আর কিছুই নয়। আগে বেলের কথা বলি, তার পর কুর্চ্চির কথা বলিব। বেল সব রকম পেটের-ব্যামোরই একটী ভাল অসুদ বলিয়া, আমাদের দেশে সকলেই বেলের খুব আদর করিয়া থাকেন। বেল ধারক কি সারক, হঠাৎ তা ঠিক্ করিয়া বলিবার যো নাই। যাদের কোষ্ঠবদ্ধ, বেল খাইলে তাদেরও যেমন উপকার হয়, পেটের-ব্যামোতে যারা ভুগিতেছে, তাদেরও তেমনি উপকার হয়। এমন আশ্চর্য্য গুণ আর কোনও অসুদের আছে কি না, বলিতে পারি না। বেল যে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল. বৃদ্ধি করে, তাতে আর কোনও সন্দেহ নাই। তা না হইলে, বেল পেটের-ব্যামোতে ধারক, আর কোষ্ঠবদ্ধে সারক কখনই হইতে পারিত না। এর আগেই বলিছি, অপাক না হইলে কোন রকম পেটের-ব্যামোই হয় না। যাদের ভাল পরিপাক হয় না, তারা যা খায়, তাতেই তাদের পেটের-ব্যামো বাড়াইয়া দেয়। তারা যদি বেল খায়, তবে সেই বেল তাদের আহারের সঙ্গে মিশিয়া অপাক হইতে দেয় না—সব বেশ পরিপাক করাইয়া দেয়। বর্ষাকালে আমাদের দেশে অনেকের কোষ্ঠবদ্ধ আর পেটের-ব্যামো উল্টে পাল্টে বারে বারে হয়। দু পাঁচ দিন বা কোষ্ঠবদ্ধ হয়, দু পাঁচ দিন বা পেটের-ব্যামো হয়। বেল খাইলে এমন সব রোগীরও বিশেষ উপকার হয়। এমন অনেক দুর্ব্বল আর রোগা লোক আছে, যাদের মাঝে মাঝে শুদু আমাশা হয়। বেল খাইলে তাদের খুব উপকার হয়। এর

আগেই বলিছি, পেটের-ব্যামো যে রকমই কেন হোক্ না, পুরাণ হইলে তাকে গ্রহণী (গিরিণি) বলে। বেল গিরিণি রোগের বড় অস্থুদ। কাঁচা বেলের চেয়ে পাকা বেল ধারক। এই জন্যে, কোষ্ঠবদ্ধে কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাওয়া ভাল। আর পেটের-ব্যামোতে পাকা বেল খাওয়া ভাল। পাকা বেল শুদ্ধু খাইলেও হয়, শর্ব্বৎ করিয়া খাইলেও হয়। কাঁচা বেল পোড়াইয়া খাইলেও হয়, আবার শুঁটো করিয়া তার পাচন করিয়া খাইলেও হয়।

পুরাণ রক্ত-আমাশায় রোগী যদি বারে বাহ্রে বাহ্যে যায়, তার মলে আম আর রক্ত দুই-ই থাকে, আর তার জ্বর না থাকে, তবে বেলে তার ভারি উপকার হয়। জ্বর থাকিতে পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগী যদি বেল খায়, তবে তার পেট ফাঁপে আর অপাক হয়। সব রকম পেটের-ব্যামোরই বেল এত ভাল অস্থুদ যে, বিলিতি অস্থুদেরও বৈতে ডাক্তরেরা বেলের কথা বিশেষ করিয়া লিখিয়াছেন। বেল থেকে ডাক্তরেরা তিন রকম অস্থুদ তয়ের করিয়াছেন।

(১) এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেল।

(২) লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেল।

(৩) বেল পাউডর।

এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেল, আর লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেল সব ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেলের মাত্রা আধ (½) ড্রাম থেকে এক ড্রাম। লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেলের মাত্রা এক ড্রাম থেকে দু ড্রাম।

কলিকাতার লাল দীঘির ধারে স্মিথ্ ষ্ট্যানিষ্ট্রীটের ডিস্পেন্সরিতে বেল পাউডর (গুঁড়ো) বিক্রি হয়। এই বেল পাউডরের সঙ্গে আর কিছু মিশনো আছে বলিয়া, তাঁরা এই বেল-পাউডরের কম্পাউণ্ড বেল-পাউডর নাম দিয়াছেন। এই কম্পাউণ্ড বেল-পাউডর বড় শিশিতে বিক্রি হয়। কত টুকু বেল-পাউডর, কেমন করিয়া খাইতে হয়, শিশির গায়ে কাগজের (লেবেলের) উপর তা লেখা আছে। লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেল শুক্‌নো বেল থেকে তয়ের হয়। এই জন্যে, ওর চেয়ে এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ বেলে উপকার বেশী।

কুর্চ্চি—কুর্চ্চি পুরাণ রক্ত-আমাশার আর একটা ভাল দেশি অসুদ। বেলের চেয়ে কুর্চ্চির আদর বেশী বই কম নয়। কুর্চ্চি করুপী (করবী) ফুলের জাতি। কুর্চ্চির ছাল যেমন ক'ষো, তেমনি তিত। পুরাণ রক্ত-আমাশার রোগীকে কুর্চ্চির ছালের ক্বাথ খাওয়াইতে হয়। ক্বাথকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফিয়ুশন্ বলেন। কুর্চ্চির ছালের ক্বাথ যে রকম করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

কুর্চ্চির ছাল হামাম-দিস্তেতে গুঁড়ো কর। এই গুঁড়ো এক কাঁচ্চা (৪ ড্রাম), এক পোআ (৮ ঔন্স) ফুটন্ত গরম জলে এক ঘণ্টা ভিজাইয়া রাখ। তার পর ছাঁকিয়া লও। যে পাত্রে ভিজাইয়া রাখিবে, সে পাত্রের মুখ ঢাকিয়া রাখা চাই। এই ক্বাথ আধ ছটাক করিয়া রোজ তিন বার খাইতে দিবে। কুর্চ্চির ছালের ক্বাথ শুদু পুরাণ রক্ত-আমাশার অসুদ নয়, জ্বরেরও অসুদ। এই জন্যে, পুরাণ রক্ত-

আমাশার সঙ্গে জ্বর থাকিলে, কুর্চ্চির ছালের ক্বাথে দুয়েরই উপকার হয়। এখানে বেলের চেয়ে কুর্চ্চির ছালের ক্বাথে বেশী ফল পাওয়া যায়। বেল ত জ্বরে দিতেই নাই, এ কথা এর আগেই বলিছি।

কুর্চ্চির বিচিকে ইন্দ্রযব বলে। ইন্দ্রযবের মত তিত জিনিশ আর আছে কি না, বলিতে পারি না। ইন্দ্রযব কৃমির বড় অসুদ।

আমাদের দেশে ছেলে, বুড়ো, জোআনের বিশ্বাস যে, পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে কবিরাজি চিকিৎসা কিছু নয়। কিন্তু আমি তা বলি না; আমার বিশ্বাস তা নয়। আমার বিশ্বাস, পুরাণ-ব্যামোর পক্ষে অনেক ডাক্তর ভাল নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে অনেক কবিরাজ ভাল নয়। ডাক্তর মহাশয় পুরাণ রক্ত-আমাশার চিকিৎসা করিতেছেন। অনেক অসুদ বিসুদ দিলেন—কিন্তু কিছুতেই কিছু করিয়া উঠিতে পারিলেন না। শেষে রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বলিলেন, ডাক্তরি চিকিৎসাটা পুরাণ ব্যামোর পক্ষে কিছু নয়—আপনারা কবিরাজ দেখান। ডাক্তর মহাশয়ের অহঙ্কার আর মূর্খতার পরিচয় এর বাড়া আর কি হইতে পারে? তাঁর নিজের বুদ্ধি বিদ্যার যে রকম দৌড়, সেই রকম চিকিৎসা করিয়া তিনি একটা পুরাণ রোগ ভাল করিতে পারিলেন না! তাঁর কাছে এতেই ডাক্তরি চিকিৎসাটাই পুরাণ ব্যামোর পক্ষে কিছু নয় বলিয়া স্থির হইল! এক ডোবা জল দেখিয়া সমুদ্রে আর

কতই বা বেশী জল আছে ভাবা যেমন পাগ্‌লামী, এ রকম ভাবাও তাঁর তেমনি পাগ্‌লামী। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয় না বলিয়া, এ পুরাণ ব্যামোটা আমি ভাল করিতে পারিলাম না, আর এক জন ভাল ডাক্তর দেখান—এ বলিলে ডাক্তর মহাশয়ের সত্য কথাও বলা হইত, ডাক্তরি চিকিৎসারও গৌরব বজায় রাখা হইত। আমি এক জন সামান্য ডাক্তর—আমি একটা রোগ ভাল করিতে পারিলাম না বলিয়া ডাক্তরি চিকিৎসায় সে রোগ সারে না, বলিব! কি সর্ব্বনেশে কথা! ডাক্তরি শাস্ত্রটা সব যদি কেউ নখ-দর্পণের মত করিতে পারেন, তবু তাঁর এ কথা বলা উচিত নয়। পুরাণ ব্যামোর পক্ষে ডাক্তরি চিকিৎসা কিছু নয়, আর নূতন ব্যামোর পক্ষে কবিরাজি চিকিৎসা কিছু নয়—গোটা কতক জেঁকো ডাক্তর আর জেঁকো কবিরাজে লোকের মনে এ বিশ্বাসটা জন্মাইয়া দিয়াছে।

রক্ত-আমাশার কথা সারা হইল। এখন রক্ত-ভেদের কথা বলি।

৬। *রক্ত-ভেদ*——এর আগেই বলিছি অনেক জায়গায় রোগের চেয়ে রোগের উপসর্গ লইয়া চিকিৎসককে বেশী ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। রক্ত-ভেদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, আর কোন উপসর্গেরই বেলায় তেমন নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) আর আর যত উপসর্গের কথা বলিছি, ও বলিব, সব চেয়ে রক্ত-ভেদেই ভয় বেশী। রক্ত-ভেদকে চিকিৎসকেরা বড়ই

ডরান। ভাবিয়া দেখ ত ডরাইবাব কারণ খুবই আছে। রক্ত ভেদে রোগী যত শীঘ্র মারা যাইতে পারে, এত আর কোন রোগেই নয়। রক্ত-ভেদ খুব বেশী হইলে, চাই কি, রোগী বাহ্যের জায়গাতে বসিয়াই মারা যাইতে পারে। আর আর উপসর্গ নিবারণ করিতে এক আধটু দেরি হইলেও বরং চলে। কিন্তু রক্ত-ভেদের বেলায় দেরি মোটেই সয় না। রক্ত-ভেদের খবর লইয়া বাড়ীর লোক চিকিৎসকের কাছে দৌড়িলেন! চিকিৎসক তাড়াতাড়ি করিয়া গিয়া দেখিলেন, রোগীর শ্বাস হইয়াছে—রোগী খাবি খাইতেছে। তখন চিকিৎসক আর কি করিবেন? এ রোগে অনেক জায়গায় এমনিই ঘটে বটে। চিকিৎসক আসিতে তর সয় না। এই জন্যে, এ রোগে চিকিৎসকের আশা ভরসা এত কম। এই বলিতে বলিতে নিতান্ত বিমর্ষ ভাবে তিনি রোগীর বাড়ী থেকে বিদায় হইলেন। তাতেই বলি, এ রোগের মোটামুটি চিকিৎসা গৃহস্থদেরও জানিয়া রাখা উচিত। রক্ত-ভেদ সব জায়গাতেই যে খুব বেশী হইতে হয়, বা হইয়া থাকে, তা নয়। অনেক জায়গায় রক্ত-ভেদ এত কম হয় যে, তাকে নামে মাত্র রক্ত-ভেদ বলা যায়। যাই হোক্, রক্ত-ভেদের নাম শুনিলে সব জায়গাতেই চিকিৎসকের খুব সাবধান হওয়া উচিত।

কারণ——রক্ত-ভেদের কারণ অনেক। সে সব কারণ জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। কেন না, কি কারণে রক্ত-ভেদ হইয়াছে, যদি বেশ বুঝিতে না পার, তবে তুমি তার

চিকিৎসাও ভাল করিতে পারিবে না। এই জন্যে, এখানে কারণ গুলি এক দুই করিয়া সাজাইয়া বলিলাম।

(১) পেটে কোনও রকম বেশী চোট বা ঘা ঘো লাগিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে।

অমুকের পেটে অমুক লাথি মারিয়াছে। লাথি খাওয়ার পর থেকেই তার রক্ত-ভেদ হয়। ধরা পড়িলে চোরেরা গৃহস্থদের কাছে যে রকম মার খাইয়া থাকে, তাতে তাদের প্রায়ই রক্ত-ভেদ হয়। পেটে বেশী রকম ঘা ঘো লাগিলে অন্ত্রের ভিতরকার শির ছিঁড়িয়া যায়। শির ছিঁড়িয়া গেলে রক্ত-ভেদ হয়।

(২) রক্ত খারাপ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে।

রক্ত খারাপ হইলে যে রক্ত-ভেদ হইতে পারে, আর হইয়া থাকে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের রক্ত-ভেদ একটী উপসর্গ— এ কথাটা মনে থাকিলেই তা বেশ বুঝিতে পারা যাইবে। জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সবিরাম-জ্বরের (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরের) চেয়ে স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) রক্ত বেশী খারাপ হয়। যদি বল, স্বল্পবিরাম-জ্বরে তবে সব জায়গায় কেন রক্ত-ভেদ হয় না। স্বল্পবিরাম-জ্বরে রক্ত খুব বেশী খারাপ না হইলে রক্ত-ভেদ হয় না। আবার অনেক জায়গায় রোগীর ভাগ্যক্রমে স্বল্পবিরাম-জ্বরে রক্ত তত বেশী খারাপ হয় না। এই জন্যেই, স্বল্পবিরাম-জ্বরে সব জায়গায় রক্ত-ভেদ হয় না।

(৩) যে জায়গা থেকে বরাবরি রক্ত পড়িয়া থাকে, যে কারণেই হোক্, সে জায়গা থেকে রক্ত-পড়া বন্ধ হইয়া

গেলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে। ঋতু বন্ধ হইলে মেয়েদের রক্ত-ভেদ হইতে পারে। নাক দিয়া রক্ত-পড়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, কোন কারণে সে রক্ত-পড়া বন্ধ হইলে, তাদের রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অর্শ থেকে যাদের বরাবরি রক্ত পড়ে, কোন কারণে হঠাৎ সে রক্ত-পড়া বন্ধ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে।

(৪) অন্ত্রের খুব বেশী রকম উদ্দীপনা হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে বলিছি। অন্ত্রের উদ্দীপনার কথা নীচে লিখিয়া দিলাম।

খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ লইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। আমার বেশ মনে আছে, অনেক দিন হইল, এক চাষা-বৈদ্য এক নাপিতকে পটোলের শিকড় ছেঁচিয়া খাওয়াইয়াছিল। পটোলের শিকড় ভয়ানক জোলাপ। পটোলের শিকড় খাইয়া তার যে ভেদ হইতে আরম্ভ হইল, সে ভেদ আর থামিল না। শেষে তা থেকে রক্ত-ভেদ আরম্ভ হইল। সেই রক্ত-ভেদেই নাপিতের প্রাণ গেল। খুব বেশী ভেদ হয়, এমন জোলাপ আরও ঢের আছে। সে সব জোলাপের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় লিখিব। ধাতু-ঘটিত বিষ এমন অনেক আছে, যা খাইলে রক্ত-ভেদ হয়। ধাতু-ঘটিত বিষ, যেমন শেঁখো। শোঁখোকে ডাক্তরেরা আর্সেনিক্ বলেন। ধাতু-ঘটিত বিষ আরও ঢের আছে। সে সব বিষের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় বলিব। খুব শক্ত গুট্‌লে মল অন্ত্রের ভিতর আট্‌কে

থাকিলে, রক্ত-ভেদ হইতে পারে। খস্‌খসে ধারাল পাতরি অন্ত্রের ভিতর থাকিলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অন্ত্রের ভিতর পাতরি থাকার কথা এর পর বলিব।

(৫) ছোট অন্ত্রের প্রদাহ থেকে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। ছোট অন্ত্রের প্রদাহকে ডাক্তরেরা এণ্টরাইটিস্ বলেন। অন্ত্রের ঘা থেকে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। কি কি রোগে অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়? রক্ত-আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়, আর টাইফয়িড্ ফীবরে অন্ত্রের ভিতর ঘা হয়। রক্ত আমাশায় অন্ত্রের ভিতর ঘা হওয়ার কথা এর আগেই বলিছি। রক্ত-আমাশা থেকে রক্ত-ভেদ হওয়ার কথা ৫০১র পাতে বলিছি। টাইফয়িড্ ফীবরের কথা এর পর বলিব। অন্ত্রের ভিতর ক্যান্সর্ হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। ক্যান্সর্ এক রকম ঘা। সে ঘা সারে না। এ ঘায়ের কথা এর পর বলিব।

(৬) যকৃতের ভিতর দিয়া রক্ত চলা ফেরার কোন রকম ব্যাঘাত হইলে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত জমা হয়। রক্ত-জমাকে ডাক্তরেরা কঞ্জেস্‌চন্ বলেন। অন্ত্রের ভিতরকার শিরে এই রকম করিয়া রক্ত জমা হইলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডের, কি ফুস্ফোর পুরাণ ব্যামো থেকে অন্ত্রের ভিতরকার শিরে রক্ত-জমা হয়, তা থেকেও রক্ত-ভেদ হইতে পারে। হৃৎপিণ্ডকে ডাক্তরেরা হার্ট বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

যে কারণেই হোক্, অন্ত্রের ভিতরকার কাল রক্তের শিরে বেশী রক্ত জমিলে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লি থেকে চেক্

রক্ত বাহির হয়। এই রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া নামিলেই তাকে রক্ত-ভেদ বলে। যে রোগেই কেন হোক্ না, যকৃতের ভিতর দিয়া রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে অন্ত্রের ভিতরকার কাল রক্তের শিরে রক্ত জমা হয়। শুদ্ধু অন্ত্রেরই কাল রক্তের শিরে যে, রক্ত জমা হয়, তা নয়। পেটের (পাকস্থলীর) ভিতরকার কাল রক্তের শিরেও সেই রকম রক্ত জমা হয়। এই জন্যে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটিলে রক্ত-ভেদও হইতে পারে, রক্ত-বমিও হইতে পারে, আবার চাই কি, দুই-ই হইতে পারে। রক্ত-বমিকে ডাক্তরেরা হিমেটিমেসিস্ বলেন। রক্ত-বমির কথা এর পর বলিব। অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, রক্ত-বমি না হইয়া, পেট থেকে সেই রক্ত অন্ত্রের ভিতর গিয়া নামে, আর সেই রক্ত গুহ্যদ্বার দিয়া বাহির হইয়া যায়। কাজেই এখানে রক্ত-বমি না হইয়া রক্ত-ভেদ হয়। অনেক রোগে যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘটে। অনেক দিন ধরিয়া খুব বেশী মদ খাইলে, যকৃতের এক রকম রোগ হয়। সেই রোগে যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার যেমন ব্যাঘাত ঘটে, তেমন আর কোন রোগেই নয়। সে রোগকে ডাক্তরেরা কিরোসিস্ অব্ দি লিবর্ বলেন। কিরোসিস্ রোগে যকৃত জড়শড়, কাটা কাটা, আর দানা দানা হয়। যকৃতের কিরোসিস্ রোগের কথা এর পর বলিব।

(৭) অন্ত্রের ভিতর অন্ত্র ঢুকিয়া গেলেও রক্ত-ভেদ হইতে পারে। অন্ত্রের ভিতর অন্ত্র এ রকম করিয়া ঢুকিয়া

গেলে ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টস্‌সসেপ্‌শন্ বলেন। ইণ্টস্‌সসেপ্‌শনের কথা এর পর বলিব।

(৮) য়্যানিয়ুরিজ্‌ম্ ফাটিয়া অন্ত্রের ভিতর রক্ত গেলে রক্ত-ভেদ হইতে পারে। রাঙা রক্তের শিরের (ধমনীর) আবকে ডাক্তরেরা য়্যানিয়ুরিজ্‌ম্ বলেন। য়্যানিয়ুরিজমের কথা ৪৩২র পাতে বলিছি।

রক্ত-ভেদে কি রকম রক্ত বাহির হয়?—সে রক্ত রাঙা কি কাল? রক্ত-ভেদের রক্ত প্রায়ই কাল দেখা যায়। এই জন্যে, ডাক্তরেরা রক্ত-ভেদকে মিলীনা বলেন। মিলীনার অর্থ কাল। রক্ত-ভেদ যদি বেশী না হয়, আর সেই রক্ত ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ত যদি বেগে বাহির না হয়, তবে রক্তের রং প্রায়ই খুব কাল, যেন আল্কাত্‌রার মত হয়। আর রক্ত-ভেদ যদি বেশী হয়, আর সেই রক্ত ছোট অন্ত্র থেকে আসে, আর রক্ত যদি বেগে বাহির হয়, তবে সে রক্তের রং তত কাল হয় না।

বড় অন্ত্র থেকে যে রক্ত আসে, সে রক্ত লাল। আবার গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গা থেকে যে রক্ত আসে, সে রক্ত আরও লাল। রক্ত-ভেদ খুব কম হইতে পারে, আবার চাই কি, এত বেশী হইতে পারে যে, রোগী তখনই তাতে মারা যাইতে পারে। এ কথা এর আগেই বলিছি। ছোট অন্ত্র থেকে রক্ত আসিতেছে, কি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গা থেকে রক্ত আসিতেছে, রক্তের আকার প্রকার দেখিয়া তা অনেক জায়গায় ঠিক্ করিতে পার। রক্ত-ভেদের চিকিৎসায় তোমাকে ডাকিলে, রোগীর গুহ্যদ্বার

আর তার কাছাকাছি জায়গা বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কখনও ভুলিও না। ভুলিলে তোমার অপ্রতিভ হইবার কথা। কেন না, অর্শ থেকে যে রক্ত পড়ে, রক্ত-ভেদ বলিয়া তোমার তা ভুল হইতে পারে। মলের নাড়ীর ভিতর এক রকম আব হয়। ডাক্তরেরা সে আবকে পলিপস্ বলেন। মলের নাড়ীর পলিপস্ থেকে রক্ত পড়ে। যদি সাবধান হইয়া না দেখ, তবে এ রক্ত-পড়াও রক্ত-ভেদ বলিয়া তোমার ভুল হইতে পারে। মলের নাড়ীকে ডাক্তরেরা রেক্টম্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মলাশয় বা মল-ভাণ্ড বলে। ৩৯৭র পাতে এ কথা বলিছি। ডাক্তরেরা যে আবকে পলিপস্ বলেন, সে আবকে শিকড়-বাকড়-ওআলা আব বলিতে পার। শিকড় একটাও হইতে পারে, দুটোও হইতে পারে, বেশীও হইতে পারে। এই আব শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতেই বেশী হয়। নাকের ভিতর হয়, জরায়ুর ভিতর হয়, মলের নাড়ীর ভিতর হয়। জরায়ুর কথা ৩৯৭র পাতে বলিছি। পিত্তির দরুণ মলের রং কাল হয়। লৌহ-ঘটিত অসুদ খাইলে মলের রং কাল হয়। তাতেই বলিতেছি, মলের রং কাল দেখিলেই রোগীর রক্ত-ভেদ হইতেছে—এ কথা বলিও না। বেশ ঠাউরে, বেশ বিবেচনা করিয়া, বেশ করিয়া দেখিয়া শুনিয়া তবে রোগের কথা বলিবে। চিকিৎসকের অপযশ কথায় কথায়। এ কথা এর আগেই বলিছি। রক্ত-ভেদের রোগীর বুকের কড়া থেকে তল পেটের নীচে পর্য্যন্ত আর ডাইন কোঁক থেকে বাঁ কোঁক পর্য্যন্ত সব পেট বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া

দেখিবে। এর আগেই বলিছি, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা-ফেরার ব্যাঘাতই রক্ত-ভেদের আসল কারণ। যকৃতের ভিতর রক্ত জমিলে তাতে ব্যথা হয়। শুধু যকৃত বলিয়া কেন, যে যন্ত্রে রক্ত জমে, তাতেই ব্যথা হয়। ডাইন কোঁকে, পাঁজরের উপর, আর তার নীচে কেমন করিয়া আঙুলের ঘা দিয়া যকৃতের ব্যথা ঠিক্ করিতে হয়, ৯১র থেকে ৯২র পাতে, আর ১০৫র পাতে তা বলিছি। যকৃতের ভিতর রক্ত জমিলে যকৃতে ব্যথা হয়, যকৃত বড়ও হয়। এই জন্যে, সহজ শরীরে পাঁজরের ভিতর যকৃত যত টুকু জায়গা লইয়া থাকে, তা ছাড়াইয়া আসে পাশে আসে। আঙুলের ঘা দিয়া তাও বেশ জানিতে পারা যায়। কেন না, আঙুলের ঘা দিলে সহজ বেলায় যেখানে ফাঁপা শব্দ পাওয়া যায়, যকৃত বাড়িলে সেখানে নিরেট শব্দ পাবে। ঘা পাইয়া রোগী সেখানে ব্যথাও বলিবে।

অর্শ থেকে যে রক্ত পড়ে, সে রক্ত রক্ত-ভেদের রক্ত কি না, তা কেমন করিয়া জানিবে? তা জানা শক্ত নয়। অর্শের রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্ত ঢের কাল। আর অর্শের রক্তের চেয়ে রক্ত-ভেদের রক্তের পরিমাণও বেশী। এ ছাড়া, রক্ত-ভেদে অর্শের যে কষ্ট, তার কিছু পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্শের যাতনা কি? অর্শেরি জায়গায় ব্যথা, টাটানি আর শূলনি। অর্শের কথা বলিবার সময় এ সব ভাল করিয়া বলিব।

তার পর এখন রক্ত-ভেদের চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা—রক্ত-ভেদের চিকিৎসায় চিকিৎসকের খুব

বেশী বিবেচনার দরকার। শরীরের যে জায়গা থেকেই কেন রক্ত পড়ুক না, রক্ত যদি খুব বেশী পড়ে, আর অনেকক্ষণ ধরিয়া পড়ে, তবে শেষে তাতেই রোগী মারা যায়। এই জন্যে, রক্ত বেশী পড়িতেছে কি না, সকলের আগে এইটীই বেশ করিয়া ঠিক্ করিবে। গিয়া যদি দেখ যে, অনেকক্ষণ অন্তর, কি বারে বারে একটু একটু করিয়া রক্ত-ভেদ হইতেছে, তবে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা যত শীঘ্র পার, ঘুচাইয়া দিবে। এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে খুব বেশী রক্ত না জমিলে রক্ত-ভেদ হয় না। আবার যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত না ঘটিলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত জমিতে পারে না। এই জন্যে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচানই, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা ঘুচাইবার একমাত্র উপায়। সে উপায় আর কি? জোলাপ দিয়া অন্ত্র একেবারে সাফ করিয়া দেওয়াই সেই উপায়। জোলাপ দিয়া অন্ত্র বেশ সাফ করিয়া দিলে, যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত আপনিই ঘুচিয়া যায়। যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচিয়া গেলে, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমাও আপনি ঘুচিয়া যায়। অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির শিরে রক্ত-জমা ঘুচিয়া গেলে রক্ত-ভেদ আর হয় না। রক্ত-ভেদের ভয়ও আর থাকে না। যকৃতের ভিতর রক্ত চলা ফেরার ব্যাঘাত ঘুচাইবার জন্যে ডাক্তরেরা যত রকম জোলাপ দিয়া থাকেন, সব চেয়ে সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নীশিয়াই ভাল। সল্‌ফেট্ অব্ ম্যাগ্নী-

শিয়াতে বেশী কাজ হয়। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়াকে সল্ট জোলাপ বলে। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়াকে সোজা ইংরিজিতে এপ্‌সম্‌ সল্ট বলে। সচরাচর লোকে শুদ্ধ সল্টই বলে। সল্ট জোলাপ বলিলে সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নী-শিয়াই বুঝায়। সোণামুখীর ক্বাথে গুলিয়া তাতে ডাই-লিয়ুট সল্‌ফিয়ুরিক্‌ য়্যাসিড্‌ দিয়া খাওয়াইলে, সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়ার তেজ বাড়ে। সোণামুখীর ক্বাথকে ডাক্তরেরা ইন্‌ফিয়ুশন্‌ সেনা বলেন। কত টুকু সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নী-শিয়া, কত খানি ক্বাথের সঙ্গে মিশাইয়া লইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

সল্‌ফেট অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া		...	৪ ড্রাম
ডিল ওয়াটর	...	...	২ ঔন্স
ডাইলিউট্‌ সলফিয়ুরিক্‌ য়্যাসিড		...	১০ ফোটা
সোণামুখীর ক্বাথ (ইনফিয়ুসন সেনা)		...	২ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ তয়ের করিলে, এ এক মাত্রা ; অর্থাৎ এক বার খাইবার অসুদ। ৪ ড্রাম্‌ সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া ওজন করিয়া দু ঔন্স ডিল্‌ ওয়াটরে ঢালিয়া দেও। তার পর একটী কাটি দিয়া খানিক ক্ষণ নাড়। খানিক ক্ষণ নাড়িতেই সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া সব বেশ গুলিয়া যাবে। গুলিয়া গেলে তাতে দশ ফোটা ডাইলিয়ুট্‌ সল্‌-ফিয়ুরিক্‌ য়্যাসিড্‌ দেও। শেষে সোণামুখীর ক্বাথের সঙ্গে সব মিশাইয়া লও। এই যে অসুদ তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার অসুদ। এক বার খাইবার মত অসুদকে

ভাল কথায় এক মাত্রা বলে। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়ার জোলাপে পেটের একটু ফাঁপ রাখে। ডিল্‌ ওয়াটর কি পেপারমিণ্ট ওয়াটরের সঙ্গে খাইলে সে দোষ কাটিয়া যায়। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া বড় বিস্বাদ। খাইলে গা ন্যাকার-ন্যাকার করে, অনেক জায়গায় ন্যাকারও হয়। ডাইলিয়ুট্‌ সল্‌-ফিয়ুরিক্‌ য়্যাসিডের সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ওর বিস্বাদ অনেক ঘুচিয়া যায়। সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়ার জোলাপে পেটের একটু কামড়ও হয়। সোণামুখীর ক্বাথের সঙ্গে দিলে সে দোষ কাটিয়া যায়। এ ছাড়া, সোণামুখীর ক্বাথের সঙ্গে মিশাইলে সল্‌ফেট্‌ অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়ার তেজ বাড়ে। কেন না, সোণামুখী নিজেই জোলাপ। সল্টের জোলাপে জলবৎ ভেদ খুব বেশী হয়। এই জন্যে, ওলাউঠার সময় এ জোলাপ দেওয়া নিষেধ। ওলাউঠার সময় সল্টের জোলাপ দিয়া অনেক জায়গায় অনেক চিকিৎ-সক অপ্রতিভ হইয়াছেন। জলবৎ ভেদ হইতে হইতে শেষে জোলাপের বাহ্যে ওলাউঠায় দাঁড়াইয়া যায়।

খুব বাহ্যে হইয়া অন্ত্র পরিষ্কার হইয়া গেলে, রোগীকে নীচেকার অসুদটী রোজ তিনবার করিয়া খাইতে দিবে।

ডাইলিয়ুট্‌ নাইট্রোমিয়ুরিয়্যাটিক্‌ য়্যাসিড্‌			৩ ড্রাম্‌
লাইকর ষ্ট্রীক্‌নীয়ি	...	...	১ ড্রাম্‌
স্পিরিট্‌ ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	৬ ড্রাম্‌
টিংচার জিঞ্জর	...	...	৬ ড্রাম্‌
পরিষ্কার জল	...	...	১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও।

এ অস্থুদটী খাইতে একটু ঝাঁঝ লাগে। এই জন্যে, এক এক দাগ অস্থুদ কাঁচ্চা খানেক জলের সঙ্গে মিশাইয়া খাওয়াইবে। অস্থুদ ফুরাইয়া গেলে, আবার তয়ের করিয়া লইবে। রোগীর শরীর যত দিন না বেশ সবল আর সুস্থ হয়, তত দিন বেশ নিয়ম করিয়া এই অস্থুদটী খাইতে বলিবে।

গিয়া যদি দেখ যে, বারে বারে খুব বেশী বেশী রক্ত-ভেদ হইতেছে, তবে দেরি না করিয়া তখনই রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবে। যত শীঘ্র পার রক্ত বন্ধ করিয়া রোগীর জীবন রক্ষা করিবে। তার পর আসল রোগের চিকিৎসা করিবে। রক্ত-ভেদ শীঘ্র বন্ধ করিবার কোন উপায় আছে কি না? আছে, ভাল উপায়ই আছে। বরফের জল পিচ্‌কিরি করিয়া অন্ত্রের ভিতর দিলে, আর ন্যাকড়ার পোঁটলা করিয়া বরফের টুকুরো পেটের উপর বসাইয়া দিলে রক্ত-ভেদ শীঘ্রই বন্ধ হয়। এ ছাড়া, রক্ত-ভেদ হইবার সময় এক খান বরফ একটু মোটা আর লম্বা করিয়া কাটিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে। সে বরফ খান গলিয়া গেলে, আবার সেই রকম আর এক খান বরফ চালাইয়া দিবে। যতক্ষণ না রক্ত-ভেদ বন্ধ হয়, তত ক্ষণ এই রকম করিবে। ন্যাকড়ার পোঁটলায় বরফ থাকে না, গলিয়া বাহির হইয়া যায়। কাজে কাজেই, তাতে অনেক ক্ষণ ধরিয়া ঠাণ্ডাও লাগাইতে পারা যায় না। লাভের মধ্যে, রোগীর গা, বিছানা, সব ভিজিয়া যায়। এই জন্যে, চামড়ার থলিতে বরফের টুক্‌রো পুরিয়া সেই থলি রোগীর

পেটের উপর বসাইয়া দিবে। কলিকাতায় কি কলি-কাতার মত বড় শহরে সাহেবদের ডিস্পেন্সরিতে চামড়ার থলি কিনিতে পাওয়া যায়। অনেক জায়গায় এমন ঘটে যে, বরফ পাওয়া যায়, কিন্তু চামড়ার থলি মিলাইতে পারা যায় না। সে সব জায়গায় একটু কৌশল খাটান চাই। কল কৌশল এমন বেশী আর কি? কচি কলাপাত আগুণে তাতাইয়া খুব নরম করিয়া লও। তার পর সেই কলা-পাতে বরফের টুক্‌রো বাঁধিয়া রোগীর পেটের উপর সেই কলা-পাতেরই পোঁটলা বসাইয়া দিতে পার। কিম্বা সেই কলা-পাতের পোঁটলা ন্যাকড়ার থলির ভিতর পুরিয়া লইতে পার। উপস্থিত মতে যে রকমে পার, সেই রকমই করিয়া লইবে। বরফের টুক্‌রো গিলিয়া গিলিয়া খাইতেও বলিবে। কষ-জলের পিচ্‌কিরি করিলেও রক্ত বন্ধ হয়। বাবলার ছাল, বকুলের ছাল, আর পেয়ারার ছাল জলে সিদ্ধ করিয়া তাতে ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া গুহ্যদ্বারে পিচ্‌কিরি দিবে। কষ-জল জুড়াইয়া খুব ঠাণ্ডা না হইলে পিচ্‌কিরি দিও না। কেন না, গরম জলের পিচ্‌কিরি করিলে রক্ত-ভেদ বাড়িবে বই কমিবে না। এ কথাটা যেন মনে থাকে। কষ-জল তয়ের করার দেরি যদি না সয়, তবে তিন পোআ ঠাণ্ডা জলে ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা) ট্যানিক্ য়্যাসিড আর ৪ ড্রাম ফট্‌কিরির গুঁড়ো মিশাইয়া সেই জলের পিচ্‌কিরি করিবে। কষ-জলের পিচ্‌কিরির কথা ৪৭১র থেকে ৪৭২র পাতে বলিছি।

তার্পিণ তেল রক্ত-ভেদের বড় অসুদ। অর্গট্ অব্

রাই আর গ্যালিক্ য়্যাসিড্—এ তুটিও এ রোগের খুব ভাল অসুদ। ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্ আর লডেনমের (আফিঙের আরকের) সঙ্গে মিশাইলে গ্যালিক্ য়্যাসিডের ধারক গুণ বাড়ে। রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার জন্যে, এই সব অসুদ কোন্‌টী কার পর, কত টুকু করিয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

গ্যালিক্ য়্যাসিড্	...	...	১½ ড্রাম্
ডাইলিয়ুট্ সল্‌ফিয়ুরিক্ য়্যাসিড্		...	১½ ড্রাম্
লডেনম্ (টিংচর ওপিয়াই)		...	১½ ড্রাম
লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গট্		...	২ ড্রাম্
তার্পিণ তেল	...	...	২ ড্রাম্
মিয়ুসিলেজ (গঁদ-ভিজের জল)		...	৬ ঔন্স পুরাইয়া।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও।

যতক্ষণ রক্ত-ভেদ বন্ধ না হবে, ৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাওয়াইবে। ফি বারেই অসুদের শিশি বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে।

রক্ত-ভেদের যে কয়টী ভাল অসুদ আমি জানি, এখানে সে কয়টীই একত্র মিশাইয়া দিইছি। ৩২০র পাতে বলিছি, কোন রোগের যদি চু তিনটী ভাল অসুদ জানা থাকে, আর সে কয়টী অসুদ একত্র দিবার কোন বাধা না থাকে, তবে তা একত্র দিলে যেমন উপকার হয়, শুদু একটী অসুদে তেমন উপকার হয় না। এই জন্যে, এখানে রক্ত-ভেদের ভাল ভাল অসুদ গুলি সব একত্র দিইছি। এ অসুদে তেমন উপকার হইল না, আর একটী অসুদ দিই—এ রকম করিয়া

কাল কাটান বা দেরি করা, রক্ত-ভেদে চলে না। রক্ত-ভেদ কি ভয়ানক রোগ—রক্ত-ভেদে রোগী কত শীঘ্র মারা যাইতে পারে, এর আগেই তা বলিছি।

পথ্য——চূণের জল-মিশনো এক বল্কা দুধ। দুধ খুব ঠাণ্ডা করিয়া তবে খাবে। গরম দুধ খাইলে রক্ত-ভেদ বাড়ে বই কমে না। এই জন্যে, বরফ দিয়া দুধ ঠাণ্ডা করিয়া দিতে পার ত আরও ভাল হয়। খুব দুর্ব্বল রোগীকে মাংসের কাথ আর ব্রাণ্ডি খাইতে দিবে। ব্রাণ্ডি বলিলেই ১র নম্বর ব্রাণ্ডি বুঝিয়া লইবে। মাংসের কাথের সঙ্গে এক এক বারে দু ড্রাম করিয়া ব্রাণ্ডি দিবে।

গিয়া যদি দেখ, বারে বারে বেশী রক্ত-ভেদ হইয়া রোগী এক বারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, আর নাড়ী এক বারে সুতোর মত হইয়াছে, তবে রক্ত-ভেদ বন্ধ করিবার যে সব ফিকির বলিছি, তা ত করিবেই। তা ছাড়া, তার হৃৎ-পিণ্ডের বল বাড়াইয়া দিবার জন্য ষ্টিমুলেণ্ট (উত্তেজক) অসুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিবে। ষ্টিমুলেণ্ট অসুদ নীচে লিখিয়া দিলাম।

য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ য়্যামোনিয়া	২ ড্রাম্
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম (ক্লোরিক্ ঈথর)	২ ড্রাম্
১র নম্বর ব্রাণ্ডি	১½ ঔন্স
টিংচর ডিজিটেলিস্	½ ড্রাম্
সিরপ্ জিঞ্জর্	৬ ড্রাম
য়্যাকুই এনিথাই (ডিল্ ওয়াটর) ...	৬ ঔন্স পূরাইয়া।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ। শিশির গায়ে ৬টা দাগ কাটিয়া দেও।

যত ক্ষণ নাড়ী বেশ সবল আর রোগী বেশ চাঙ্গা না হবে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক এক দাগ এই অমৃদ খাওয়াইবে। রোগীর গা আর হাত পা যদি ঠাণ্ডা দেখ, তবে সব গায়ে শুঁঠের গুঁড়ো মালিশ করিতে বলিবে, আর আগুনে ন্যাক্‌ড়া তাতাইয়া হাতের তেলোয়, পায়ের তেলোয় সেক দিতে বলিবে। এ ছাড়া, দুই বগলে, হাতের তেলোয় আর পায়ের তেলোয় গরম জল-পোরা বোতল বা শিশি দিয়া রাখিলে রোগীর সন্নিপাত-অবস্থা শীঘ্রই ঘুচিয়া যায়। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

রক্ত-ভেদের রোগীর ঘর যত দূর পার ঠাণ্ডা রাখিবে। ঘরের ভিতরে, বাইরে বা তার কাছে আগুন কি ধোঁআর যদি কোন্ সম্পর্ক না থাকে, আর বাইরের পরিষ্কার ঠাণ্ডা বাতাস ঘরের ভিতর বেশ খেলিতে পায়, তবে সে ঘর সব সময়েই বেশ ঠাণ্ডা থাকে। নিয়ুমোনিয়া আর প্লুরিসির রোগীকে যে রকম স্থির রাখিতে বলিছি, রক্ত-ভেদের রোগীকেও সেই রকম স্থির রাখিবে। ঠাণ্ডা ঘরে খুব স্থির রাখাই রক্ত-ভেদের রোগীর চিকিৎসার প্রধান অঙ্গ— এ কথাটা যেন মনে থাকে।

রক্ত-ভেদ নিবারণ করিবার জন্যে অন্ত্রের ভিতর বরফের জলের পিচ্‌কিরি দিতে বলিছি; গুহ্যদ্বারের মধ্যে বরফের টুক্‌রো চালাইয়া দিতে বলিছি, ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলিতে করিয়া বরফের টুক্‌রো রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দিতে বলিছি, আর বরফের টুক্‌রো গিলিয়া খাইতে বলিছি। সহরে এ সব ব্যবস্থা চলে। পাড়াগাঁয়ে এ রকম ব্যবস্থা করার

চেয়ে কোন ব্যবস্থা না করাই ভাল। পাড়াগাঁয়ে রক্ত-ভেদের রোগীর চিকিৎসায় বরফের ব্যবস্থা করা, আর সহরে নৈলে তার চিকিৎসা হইবে না বলা, ঠাউরে দেখ ত দুই-ই এক কথা। এখন একবার ভাবিয়া দেখ—পাড়া-গাঁয়ে বরফ নৈলে সত্য, সত্যই কি রক্ত-ভেদের চিকিৎসা হয় না? হয় না, এমন নয়; একটু যুক্তি করিলেই হয়। অন্ত্রের ভিতর বরফের জলের পিচ্‌কিরি করিতে বলিছি। বরফের জলের মত ঠাণ্ডা জল কি পাড়াগাঁয়ে মিলাইতে পারা যায় না? যায়। কেমন করিয়া মিলাইতে পারা যায়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

পাঁচ ছটাক নিশেদল আর পাঁচ ছটাক শোরা, আলাদা আলাদা পাত্রে বেশ করিয়া গুঁড়ো করিয়া একটা মাল্‌শায় রাখ। তার পর এক সের জল মাল্‌শায় ঢালিয়া দাও। তিন পোআ কি এক সের জল ধরে, কাঁসার কি পিতলের এমন একটা ফেরোয় জল পুরিয়া সেই ফেরোটা সেই মাল্‌শার জলে বসাইয়া রাখ। খানিক পরেই ফেরোর জল বরফের জলের মত ঠাণ্ডা হবে। রোগীর অন্ত্রের ভিতর সেই ঠাণ্ডা জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, বরফের জল পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়ার যে ফল, তা প্রায় হয়। মাল্‌-শার বদলে ছোট একটা বগুনোয় কি জামবাটীতে নিশেদল, শোরা আর জল রাখিয়া, সেই বগুনো কি জামবাটী যদি রোগীর পেটের উপর বসাইয়া দেও, তবে ন্যাক্‌ড়ার পুঁটু-লিতে করিয়া বরফ বসাইবার ফল পাবে। বগুনো কি জামবাটী ঈষারায় তুলিয়া ধরিবে, তা হইলে পেটের উপর

ওর সব চাপ্‌টা লাগিয়ে না। পেটের উপর ঠাণ্ডা লাগানই না দরকার।

স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গ বলিয়া এখানে রক্ত-ভেদের কথা বলিলাম। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক্ না, আর যে উপসর্গই কেন থাক্ না, কুইনাইন্ দিতে কখনও ভুলিও না, কি ইতস্ততঃ করিও না। ফল কথা, ম্যালেরিয়া-জ্বরে কোনও উপসর্গ মানিবে না। জ্বর ছাড়িলে, কি জ্বর কমিলে, উপসর্গের অসুদ আর কুইনাইন্ একত্র দিবে। রক্ত-ভেদেরও চিকিৎসার বেলায় যেন এ সব কথা মনে থাকে।

৭। বমি——আসল রোগের চেয়ে উপসর্গ লইয়া চিকিৎসককে অনেক জায়গায় বেশী নাকানি চোকানি খাইতে হয়। বমির বেলায় এ কথাটী যেমন খাটে, আর কোন উপসর্গের বেলায় তেমন খাটে কি না বলিতে পারি না। বমি অনেক রোগের লক্ষণ। এই জন্যে, এখানে বমির কথা এত বিশেষ করিয়া বলিলাম। কোন্ রোগে কি রকম বমি হয়, আর বমির ভাব গতিকই বা কি রকম, বেশ জানা না থাকিলে অনেক সময় বমি থামান যায় না। বমি থামাইবার জন্যে কেবল হাত্‌ড়াইয়া বেড়াইতে হয়। কোন একটা উপসর্গ হঠাৎ উপস্থিত হইলে তা থামাইতে না পারা, আর তার জন্যে হাত্‌ড়াইয়া বেড়ান চিকিৎসকের পক্ষে কত কষ্ট আর অপ্রতিভের বিষয়, যিনি ঠেকিয়াছেন, কেবল তিনিই তা জানেন।

বমি দু রকম। আসল বমি আর শঙ্কার বমি।

পেটের (পাকস্থলীর) নিজের উদ্দীপনার জন্যে যে বমি হয়, সে বমিকে আসল বমি বলে। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। শরীরের আর আর যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে যে বমি হয়, সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার বমিকে ডাক্তরেরা সিম্প্যাথেটিক্ বমিটিং বলেন। গর্ভ হইলে স্ত্রীলোকদের যে বমি হয়, সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। এখানে জরায়ুর উদ্দীপনা থেকেই বমি হয়। পেটের (পাকস্থলীর) সঙ্গে আর জরায়ুর সঙ্গে নিকট সম্বন্ধ আছে বলিয়াই এ রকম ঘটে। জরায়ুর কথা ৩৯৭র পাতে বলিছি। কেবল জরায়ুরই সঙ্গে পেটের (পাকস্থলীর) যে এ রকম নিকট সম্বন্ধ আছে, তা নয়। আরও অনেক যন্ত্রের সঙ্গে পেটের এ রকম নিকট সম্বন্ধ আছে। আর আর সব যন্ত্রের চেয়ে মগজ (ব্রেইন), হৃৎপিণ্ড (হার্ট), আর ফুস্কোরই সঙ্গে পেটের সম্বন্ধ বেশী নিকট। দড়ির টানা দিয়া দু পাঁচটী জিনিষ যেমন একত্র বাঁধিয়া রাখা যায়, একটী শিরের ডাল পালা দিয়া এই কয়টী (মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুস্কো আর পেট) তেমনি একত্র বাঁধা আছে। রাঙা রক্তের শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির, আগে কেবল এই তিন রকম শিরের কথা বলিছি। এখন যে শিরের কথা বলিলাম, এ আর এক রকম শির। এ শিরকে ডাক্তরেরা নর্ব্ব বলেন, ভাল বাঙ্গালায় স্নায়ু বলে। আর আর সব শিরের মত স্নায়ুও আমাদের শরীরের সব জায়গায় আছে। আগে যে তিন রকম শিরের কথা বলিছি, সে তিন রকম শিরই

ফাঁপা। তাদের ভিতর দিয়া রক্ত আর রস চলা ফেরা করে। স্নায়ু ফাঁপা নয়, নিরেট। কাজেই, তার ভিতর দিয়া কোনও রকম রসই চলা ফেরা করিতে পারে না। আমরা এই স্নায়ুরই বলে চলা ফেরা করি। আমাদের শরীরের কোন জায়গা ছুঁইলে আমরা যে জানিতে পারি, তাও এই স্নায়ুর বলে জানিতে পারি। মগজ, হৃৎপিণ্ড, ফুক্কো আর পেট যে স্নায়ুর ডাল পালা দিয়া একত্র বাঁধা, সেই স্নায়ুকে ডাক্তরেরা নিয়ুমোগ্যাষ্ট্রিক্ নর্ব্ব বলেন। সুবিধা পাই ত এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। যাদের হাঁপ-কাশের ব্যামো আছে, আহারের একটু অত্যাচারেই তাদের হাঁপ চাগায়। এতে পেটের সঙ্গে আর ফুক্কোর সঙ্গে খুব নিকট সম্বন্ধের যেমন পরিচয় পাওয়া যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়। মগজ, ফুক্কো, যকৃত (লিবর), অন্ত্র (ইণ্টেসটিন্স), মূত্রগ্রন্থি, মূত্রনলী, জরায়ু আর ডিম্বকোষ, এই সব যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে। এখানে যে কয়টী যন্ত্রের নাম করিলাম, মূত্রগ্রন্থি, মূত্রনলী আর ডিম্বকোষ ছাড়া আর সব যন্ত্রের কথা এর আগেই এক রকম মোটামুটি বলিছি। মূত্রগ্রন্থিকে ডাক্তরেরা কিড্নি বলেন। মূত্রগ্রন্থি দুটো। ডাইন কোঁকের ভিতর পিছন দিকে একটা থাকে, আর বাঁ কোঁকের ভিতর পিছন দিকে একটা থাকে। ওলাউঠার রোগীর ভেদ বমি বন্ধ হইয়া প্রস্রাব না হইলে, ডাক্তরেরা তার কোমরে রাইয়ের পলস্তরা (মষ্টার্ড প্লাষ্টর) দিয়া থাকেন। রাইয়ের এই পলস্তরা তাঁরা ঠিক্ মূত্রগ্রন্থিরই উপর বসাইয়া থাকেন।

রক্ত থেকে মুত তয়ের করাই মূত্রগ্রন্থির কাজ। এক একটী মূত্রগ্রন্থি থেকে এই মুত সরু একটী নলী দিয়া মূতের থলিতে গিয়া জমে। মুতের থলির কথা ৩৯৭র পাতে বলিছি। এই নলীকে ডাক্তরেরা ইয়ুরীটর বলেন। ভাল বাঙ্গালায় মূত্রনল্লী বলে। জরায়ু (ইউটরস্) যেমন কেবল স্ত্রীলোকদেরই থাকে, ডিম্বকোষও তেমনি কেবল স্ত্রীলোকদেরই আছে। ডিম্বকোষও ছুটো। জরায়ুর মাথার ছু পাশে সরু সরু ছুট নলী দিয়া ডিম্বকোষ আট্‌-কান থাকে। ডিম্বকোষকে ডাক্তরেরা ওবারি বলেন। স্ত্রীলোকদের মাসে মাসে যে ঋতু হইয়া থাকে, ডিম্বকোষের বলেই সে ঋতু হয়। পুরুষদের অণ্ড, সন্তান উৎপত্তির যেমন প্রধান যন্ত্র, স্ত্রীলোকদের ডিম্বকোষ, সন্তান উৎপত্তির তেমনি প্রধান যন্ত্র। তার পর বলি। এই মাত্র বলিছি, মগজ, ফুস্কো, যকৃত, অন্ত্র, মূত্রগ্রন্থি, মূত্র-নলি, জরায়ু আর ডিম্বকোষ, এই সব যন্ত্রের উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি হইতে পারে। কিন্তু মগজ আর জরায়ু এই ছুটী যন্ত্রেরই উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি বেশীর ভাগ হয়। আর আর যন্ত্রের উদ্দীপনায় শঙ্কার বমি তত হয় না। মগজ আর জরায়ুর বেশী রকম উদ্দীপনা হইলে শঙ্কার বমি হইতেই চায়। আর আর সব যন্ত্রের উদ্দীপনার বেলায় সে রকম নয়। শঙ্কার বমি হইতেও পারে, না হইতেও পারে। মগজ আর জরায়ু, এই ছুটী যন্ত্রেরই উদ্দীপনা থেকে শঙ্কার বমি যে বেশীর ভাগ হইয়া থাকে, এখানে তার একটী পরিচয় দিই। সে পরিচয় আর কি? গর্ভ হইলে বমি

হওয়া, আর মাথায় কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে বমি হওয়া—এই ছুটী ঘটনাই তার পরিচয়। মাথায় কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে মগজ (মাথার ঘিলু, ব্রেইন) কাঁপিয়া উঠে। এই রকম করিয়া মগজ কাঁপিয়া উঠাকে ডাক্তরেরা কংকশন্ অব্ দি ব্রেইন বলেন। মাথায় লাঠি মারিলে মগজ এই রকম করিয়া কাঁপিয়া উঠে। উচু থেকে নীচে জোরে মাথা পড়িলেও মগজ এই রকম করিয়া কাঁপিয়া উঠে। মগজ কাঁপিয়া উঠাই বল, আর নড়িয়া উঠাই বল, ছুই-ই এক।

শঙ্কার বমির কথা এখানে বলিলাম। শঙ্কার ভেদের কথা ৪৫৩র পাতে বলিছি। কিন্তু শঙ্কা কথাটার মানে এখনও বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিই নাই। ধরিতে গেলে, শঙ্কার মানে মোটামুটি এক রকম বলিয়া দেওয়া হইয়াছে। পায়ের আঙুলে ফোড়া, পাচড়া, বা ঘা হইলে, কি কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে কুচ্‌কিতে ব্যথা হয়—কুচ্‌কির গুল্লি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা বলি, পায়ের আঙুলের শঙ্কায় কুচ্‌কিতে ব্যথা হইয়াছে—কুচ্‌কির গুল্লি আউরেছে। হাতের আঙুলে ফোড়া, পাচড়া, বা ঘা হইলে, কি কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে বগলে ব্যথা হয়—বগলের গুল্লি আওরায়। এ রকম হইলে আমরা বলি, হাতের আঙুলের শঙ্কায় বগলে ব্যথা হইয়াছে—বগলের গুল্লি আউরেছে। পাচড়া হইয়া জ্বর হইলে বলি, পাচড়ার শঙ্কায় জ্বর হইয়াছে। ফোড়া হইয়া জ্বর হইলে বলি, ফোড়ার শঙ্কায় জ্বর হইয়াছে। মোটামুটি জানিয়া

রাখ, এক জায়গার অসুখ থেকে আর এক জায়গার যে অসুখ হয়, তাকে শঙ্কার অসুখ বলে।

এখানে শঙ্কার বমির একটী খুব সহজ দৃষ্টান্ত দিই। ডাক্তর, বৈদ্য, হাকিম, সকলেই সেটী বেশ জানেন। কৃমি থাকার দরুণ অন্ত্রের উদ্দীপনা হইলে বমি হয়। কৃমির জন্যে বমি হয়, মেয়েরাও তা জানে। বেশী রকম কোষ্ঠ-বদ্ধ হইলেও অন্ত্রের উদ্দীপনা হয়। সেই উদ্দীপনা থেকে বমি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। অন্ত্রের এমন সব উদ্দীপনা থেকে যখন বমি হয়, তখন অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির প্রদাহ হইলে, কি অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে ঘা হইলে বমি হইবে, আশ্চর্য্য কি? অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লিতে ঘা হইয়া যে বমি হয়, রক্ত-আমাশার কথা বলিবার সময় সে বমির কথা বলিছি। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র কষিয়া ধরিলে বমি হয়। অন্ত্রবৃদ্ধিকে ডাক্তরেরা হার্ণিয়া বলেন। সুবিধা পাই ত অন্ত্র-বৃদ্ধির কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

মূত্র-নলির ভিতর দিয়া পাতরি নামিবার সময় বমি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। পিত্ত-নলির ভিতর দিয়া পাতরি নামিবারও সময় বমি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। রক্ত থেকে মূত তয়ের করা যেমন মূত্র-গ্রন্থির (কিডনির) কাজ, রক্ত থেকে পিত্ত তয়ের করা তেমনি যকৃতের (লিবরের) কাজ। মূত্র-গ্রন্থি থেকে মূত্র-নলি (ইয়ুরীটর) দিয়া মূত্র যেমন মূতের থলিতে গিয়া জমে, যকৃত থেকে পিত্ত-নলি দিয়া পিত্ত তেমনি পিত্তের থলিতে গিয়া জমে। পিত্ত-নলিকে ডাক্তরেরা গল-ডক্ট বলেন; পিত্তের থলিকে

গল-ব্ল্যাডর বলেন। মূত থেকেও পাতরি তয়ের হয়; পিত্ত থেকেও পাতরি তয়ের হয়। মূত থেকে যে পাতরি তয়ের হয়, ডাক্তরেরা তাকে ইয়ুরিনারি ক্যাল্‌কুলস্ বলেন। পিত্ত থেকে যে পাতরি তয়ের হয়, তাঁরা তাঁকে বিলিয়ারি ক্যাল্‌কুলস্ বলেন। মূত্র-নলি দিয়া পাতরি নামিবারও সময় শূল-ব্যথার মত ব্যথা ধরে; পিত্ত-নলি দিয়া পাতরি নামিবারও সময় শূল-ব্যথার মত ব্যথা ধরে। শূল-ব্যথা খুব বেশী রকম ধরিলে যেমন বমি হয়, পাতরি নামিবারও সময় ব্যথার তাড়শে তেমনি বমি হয়।

অনেক রকম নূতন জ্বরে রক্ত খারাপ হয়। সেই রক্ত দোষে বমি হয়। তাতেই ত বলিছি যে, স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) বমি একটী উপসর্গ। যে জ্বর মোটেই ছাড়ে না, বা কমে না, যে জ্বরে গায়ের তাত দিন রাতি সমান থাকে, সেই জ্বরেরই গোড়ায় বমি বেশী হয়। যে জ্বরে গায়ের তাত দিন রাতি সমান থাকে, সে জ্বরকে ডাক্তরেরা কণ্টিনিয়ুড ফীবর বলেন। ভাল বাঙ্গালায় অবিরাম-জ্বর বলে; আর সোজা বাঙ্গালায় এক-তাড়া জ্বর বলিতে পার। হাম-জ্বরের জ্বর এক-তাড়া জ্বর। এলো বসন্তের জ্বর এক-তাড়া জ্বর। হাম কি বসন্ত যে ক দিন না বাহির হয়, সে ক দিন জ্বর এক-তাড়াই থাকে। বসন্ত বাহির হইবার আগে যে জ্বর হয়, সে জ্বরের গোড়ায় বমি হইতেই চায়। হাম-জ্বরে বমি না হইতেও পারে। হাম-জ্বর আর এলো বসন্তের কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব।

এর আগেই বলিছি, নিজ্ পেটের (পাকস্থলীর)

উদ্দীপনা থেকে যে বমি হয়, তাকে আসল বমি বলে। যে কারণেই হোক্, পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির কোন রকম উদ্দীপনা হইলেই বমি হয়। আর আর উদ্দীপনার কথা ছাড়িয়া দেও, খুব বেশী খাইলেও বমি হয়। তাতেই বলি, কত কড়া অসুদই আছে—কত বিষই আছে, যা পেটে পড়িলে পেটের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির (মিয়ুকস্ মেম্ব্রে-ণের) উদ্দীপনা হয়—কোন কোন জায়গায় প্রদাহও হয়। সেই উদ্দীপনা থেকে, আর সেই প্রদাহ থেকে বমি হয়। উদ্দীপনার কথা ৪৪২র পাতে বলিছি। প্রদাহের কথা ২০০র পাতে বলিছি। উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলেই প্রদাহ হয়। উদ্দীপনার বাড়াবাড়িকেই প্রদাহ বলে। কোন কোন বিষ খাইলে যে বমি হয়, তার একটা সহজ দৃষ্টান্ত দিই। শেঁকো বিষ (আর্সেনিক্) খাইলে বমি হয়। শেঁকো বিষ খাইলে বমিও হয়, ভেদও হয়। শেঁকো বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দী-পনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে বমি হয়; আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা থেকে ভেদ হয়। শেঁকো বিষ খাইলে পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির ত উদ্দীপনা হয়ই; অন্ত্রেরও শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা হয়।

গিয়া দেখিলে রোগীর বমি হইতেছে। এখন কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে, আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে। এটা আগে ঠিক্ করা চাই। এ ঠিক্ করিতে না পারিলে, রোগীর বমি থামাইতে পারিবে না, তার আত্মীয়

স্বজনের কাছে নিশ্চয়ই অপ্রতিভ হইবে। আসল বমিতে আর শঙ্কার বমিতে ঢের তফাত। কিসে কিসে তফাত, এখানে এক দুই করিয়া তা লিখিয়া দিলাম। ডাইনে বাঁয়ে দুটী সারি করিয়া লিখিয়া দিলাম। বাঁয়ের সেরে আসল বমির কথা লেখা থাকিল। ডাইনের সেরে শঙ্কার বমির কথা লেখা থাকিল। এক দুয়ের দাগ ধরিয়া ডাইনে বাঁয়ে বেশ ঠাউরে ঠাউরে খতিয়ে দেখিলে, দু রকম বমির তফাত বেশ বুঝিতে পারিবে। কিসে কিসে তফাত, যদি বেশ মনে করিয়া রাখিতে পার, তবে আসল বমি কি শঙ্কার বমি ধরা করিতে কখনই ঠকিবে না— বমি থামাইতে পারিলে না বলিয়া কখনও অপ্রতিভও হইবে না।

আসল বমি।	শঙ্কার বমি
১। বমি হইবার আগে গা ন্যাকার ন্যাকার করে। বমি হইয়া গেলেই গা ন্যাকার ন্যাকার সারিয়া যায়। কোন কোন জায়গায়, বমি হওয়ার পর কেবল খানিক ক্ষণ গা ন্যাকার ন্যাকার থাকে না। তার পর আবার গা ন্যাকার ন্যাকার আরম্ভ হয়। যাই হোক্, আসল বমিতে	১। বমি হইবার আগে মোটেই গা ন্যাকার ন্যাকার করে না। বমি হইয়া পেট খালি হইয়া গেলেও অকি আর ওআক্ উঠিতে থাকে। জলই হোক্, দুধই হোক্ আর যাই হোক্, পেটে পড়িবা মাত্রই তা বমি হইয়া যায়। রোগী নড়িলে চড়িলেও তার বমি হয়।

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
বমি হওয়ার পরই গা ন্যাকার ন্যাকার সারে। আসল বমিতে, বমি হইবার আগে গা ন্যাকার ন্যাকারই থাক্, মাথা-ঘোরাই থাক্, আর মাথা ধরাই থাক্, বমি হওয়ার পরই সে সব অসুখ, হয় একবারেই সারিয়া যায়, নয় খুবই কম হয়।	
২। পেটের উপর আর যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে। আঙুলের উপর আঙুল দিয়া কেমন করিয়া ঘা দিতে হয়, আরকোন যন্ত্রে ব্যথা হইলে তা কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়, ৯১—৯২র পাতে তা বলিছি। পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর অকি উঠে—ওআক উঠে।	২। পেটের উপর কি যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে না। পেটের উপর কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর অকিও উঠে না—ওআকও উঠে না। চাপ দিলে তার কোন অসুখই হয় না।
৩। রোগী যা বমি করে তা যদি পরীক্ষা করিয়া	৩। রোগী যা খাইয়াছিল, শঙ্কার বমিতে তা বজ্‌নিশ,

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
দেখ, তবে আসল বমিতে আধ-হজম আহার, পিত্ত আর দুর্গন্ধ রস দেখিতে পাবে। কখনও টক জল, পূজ বা রক্ত দেখিতে পাবে।	উঠিয়া পড়ে। হজম হওয়ার এক আধটু চিহ্নও পাওয়া যায় না। রোগী গাঁজলা গাঁজলা শ্লেষ্মা বমি করে। শঙ্কার বমিতে পুয কি রক্ত কখনও থাকে না। কখন বা খুব বেশী পিত্তি উঠে, কখন বা কেবল নামে মাত্র পিত্তি উঠে।
৪। আসল বমিতে খিদে বা খাইবার ইচ্ছা মোটেই থাকে না। এমন কি, খাইবার নামে বমি আসে।	৪। শঙ্কার বমিতে খিদে থাকে। এমন কি, বমির পরই খাইবার ইচ্ছা হয়। তবেই দেখ, খাইবার নামে ত বমি আসেই না; বরং তার বিপরীত।
৫। আসল বমিতে জিব অপরিষ্কার হয়। মুখে দুর্গন্ধ হয়। চোকের রং প্রায়ই একটু হল্‌দে হয়। বমির পর তবে মাথা ধরে।	৫। শঙ্কার বমিতে জিব পরিষ্কার থাকে; মুখে দুর্গন্ধ থাকে না। চোক হয় বেশ পরিষ্কার থাকে, নয় অল্প রাঙা হয়। বমির আগে মাথা ধরে।
৬। আসল বমির মাথাধরায় কপাল ব্যথা করে।	৬। শঙ্কার বমিতে মাথাধরা খুবই বেশী হয়। মাথার

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
চব্বিশ ঘণ্টার বেশী মাথা ধরা থাকে না। বমির পর প্রায়ই মাথা ধরা সারিয়া যায়।	খাবরি আর পিছন দিক্ ব্যথা করে। মাথা-ধরা অনেক দিন ধরিয়া নিয়ত থাকিতে পারে। আবার চাই কি, মাথা-ধরা মোটেই না থাকিতে পারে।
৭। আসল বমিতে পেটের কামড় থাকে। দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে। পেট নাবে। মল পাতলা হয়, আর কাদার যেমন রং, তেম্নি রং হয়।	৭। শঙ্কার বমিতে পেটের কামড়ের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে না। পেট ত নাবেই না, তার বিপরীত কোষ্ঠবদ্ধ থাকে। যেখানে কোষ্ঠবদ্ধ না থাকে, সেখানে রোগীর সহজ বাহ্যে হয়। মলের বেশ আঁইট দেখা যায়।
৮। আসল বমিতে রোগীকে অনেক চেষ্টা করিয়া বমি করিতে হয়। বমি করিবার আগে অনেক বার ওআক তুলিতে হয়, মুখ দিয়া ঢের জল উঠে, ছেপ উঠে, লাল পড়ে। বমির	৮। শঙ্কার বমিতে রোগীকে চেষ্টা করিয়া বমি করিতে হয় না। বমি যেন আপনিই হয়। মুখ দিয়ে জলও উঠে না, ছেপও উঠে না। বমির পর রোগী নেতিয়েও পড়ে না।

আসল বমি।	শঙ্কার বমি।
পর রোগী যেন নেতিয়ে পড়ে।	
৯। আসল বমিতে নাড়ীর খুব বেগ হয়, আর নাড়ী দুর্ব্বল হয়।	৯। শঙ্কার বমিতে নাড়ীর বেগও হয় না, নাড়ী দুর্ব্বলও হয় না। হাত ধরিয়া বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলে নাড়ী যেন শক্ত শক্ত মালুম হয়।
১০। আসল বমিতে কেবল উপর-পেটেই রাই-য়ের পলস্তরা (মষ্টার্ড প্লাষ্টর) বা বেলস্তরা দিলে বমি বন্ধ হয়। উপর পেটকে ডাক্তরেরা এপি-গ্যাষ্ট্রীয়ম্ বলেন। উপর-পেটের উর্দ্ধ সীমা বুকের কড়া।	১০। শঙ্কার বমিতে কেবল ঘাড়েই রাইয়ের পলস্তরা বা বেলস্তরা বসা-ইলে বমি বন্ধ হয়
১১। প্রায়ই ভোর ৪টের সময় আসল বমির বাড়া-বাড়ি হয়। যকৃতের (লিব-রের) ব্যামোতে এই নিয়মটী সব চেয়ে বেশী দেখা যায়।	১১। শঙ্কার বমির বাড়া-বাড়ি প্রায়ই বেলা ৭টার সময় দেখা যায়।

আসল বমিতে আর শঙ্কার বমিতে তফাত, এক রকম মোটামুটি তা বলিলাম। এই তফাত গুলি যদি বেশ ঠাউরে ঠাউরে মনে করিয়া রাখ, আর রোগীর কাছে বসিয়া এক এক করিয়া মিলাইয়া লও, তবে রোগীর আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে, সহজেই ঠিক করিতে পারিবে। তার পর এখন বমির চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——এর আগেই বলিছি, রোগীর আসল বমি হইতেছে, কি শঙ্কার বমি হইতেছে, যদি ঠিক্ করিতে না পার, তবে সাত দিক্ হাতড়াইয়াও বমি থামাইতে পারিবে না। পিত্ত-নলীর (গলডক্টের) ভিতর দিয়া পাতরি নামিতেছে বলিয়া রোগীর শূল-ব্যথার মত ব্যথা ধরিয়াছে। আর সেই ব্যথার তাড়শে তার বমি হইতেছে। তুমি তা ঠিক্ করিতে না পারিয়া বমি থামাইবার জন্যে তার উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরা ('মস্টার্ড প্লাষ্টর) বসাইয়া দিলে, বরফ খাইতে দিলে, সোডা য়্যাসিড্ খাওয়াইলে, অস্মুদের পুথিতে বমির যত অস্মুদ লেখা আছে, এক এক করিয়া সব দিলে, কিন্তু বমির কিছুই করিতে পারিলে না। কিছু ত করিতে পারিবেই না; করিতে না পারিবারই কথা বটে। ব্যথার তাড়শে বমি হইতেছে, পেট ঠাণ্ডা করিলে কি সে বমি থামে? এক বারে যদি দু গ্রেন্ আফিং খাওয়াইয়া দাও, তবে ব্যথাও নরম পড়ে, বমিও থামে। আধ ঘণ্টার মধ্যে যদি ব্যথা নরম না পড়ে, তবে ফের দু গ্রেন্ আফিং খাওয়াইয়া দিবে। অনেক জায়গায় পুরো মাত্রায় আফিং এক বার দিলেই কাজ হয়। বড়ি করিয়া আফিং খাওয়াইয়া

দিলে উঠিয়া পড়ে না। বড়ি করিয়া আফিং খাওয়াইয়া দেওয়ারও যে ফল, গুহ্যদ্বারের মধ্যে আফিঙের আরকের (লডেনমের) পিচ্‌কিরি দেওয়ারও সেই ফল। কত খানি লডেনম্‌ কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে হয়, ৯৪র পাতে তা বলিছি। তবেই দেখ, বমির কারণ ঠিক্‌ করিতে পারাই সব। অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে বলিয়া বমি হইতেছে, গা ন্যাকার-ন্যাকার করিতেছে, অকি হইতেছে, কাঠ-বমি হইতেছে। তুমি তা ঠাউরাতে না পারিয়া, বুঝিতে না পারিয়া, বমি থামাইবার জন্যে কতই চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই বমি থামাইতে পারিলে না। তুমি বমি থামাইতে পারিলে না বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা আর এক জন চিকিৎসককে ডাকিলেন। নূতন চিকিৎ-সক আসিয়া রোগীর সব পরিচয় লইলেন, আর তার অবস্থা বেশ ঠাউরে দেখিলেন। বমির কারণ ঠিক্‌ করিয়া তিনি তোমার সব প্রেস্ক্রপ্‌শন্‌ (ব্যবস্থা-পত্র) দেখিতে চাইলেন। তোমার প্রেস্ক্রপ্‌শনে কৃমির অসুদ একটীও লেখা নাই। এতেই তুমি তাঁর কাছে অপ্রতিভ হইলে। রোগীকে তিনি কৃমির অসুদ দিলেন। কৃমি সব নামিয়া পড়িল ; রোগীরও বমি থামিয়া গেল। তাতেই বলিতেছি, বমির কারণ ঠিক্‌ করিতে পারাই সব। শুদ্ধ বমি বলিয়া কেন ? এ কথাটা সব রোগেরই বেলায় সমান খাটে। রোগ চিনিতে না পারিলে, রোগের কারণ ঠিক্‌ করিতে না পারিলে, তার চিকিৎসাই হয় না। সবিরাম-জ্বরে কি স্বল্পবিরাম-জ্বরে যে বমি হয়, জ্বরের সঙ্গে সে বমির বেশ

একটী সম্বন্ধ আছে। সবিরাম-জ্বরে জ্বর আসিলে বমি আরম্ভ হয়। অনেক জায়গায়, জ্বরের সঙ্গে সঙ্গেই বমি আসিয়া উপস্থিত হয়। জ্বর ছাড়িয়া গেলে বমি থামিয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বরে যতক্ষণ জ্বর কম থাকে, ততক্ষণ বমিও কম হয়। জ্বরের প্রকোপ হইলে বমিও সেই সঙ্গে সঙ্গে বাড়ে। এতে স্পষ্টই দেখা যাইতেছে, সবিরাম-জ্বরে জ্বর আসা বন্ধ করিতে পারিলেই বমিও বন্ধ হয়; আর স্বল্পবিরাম-জ্বরে জ্বরের প্রকোপ হইতে না দিলে বমিরও আর বাড়াবাড়ি হয় না। তাতেই বলি, ধরিতে গেলে জ্বরের বমির আসল অস্তুদই কুইনাইন্। এখানে বমির কারণই জ্বর। সে কারণ দূর করিবার তোমার কেবল একটী অস্তুদই আছে। সে অস্তুদ আর কি? কুই-নাইন্। তবে বমির বাড়াবাড়ির সময় রোগীর কষ্ট ঘুচাই-বার জন্যে আর কিছু অস্তুদ বিস্তুদ দেওয়া চাই। কাচের দুটী গ্লাসে এক ছটাক করিয়া চিনি-পানা কি মিছরি-পানা লও। একটা গ্লাসে ৩০ গ্রেন্ বাইকার্ব্বনেট্ অব্ সোডা ঢালিয়া দেও। আর একটী গ্লাসে ২৫ গ্রেন্ টার্টারিক য়্যাসিড্ ঢালিয়া দেও। টার্টারিক য়্যাসিড্ যদি আগে গুঁড়ো করা না থাকে, তবে গুঁড়ো করিয়া লইবে। সোডা আর টার্টারিক য়্যাসিড্ দুই গ্লাসের জলে বেশ গুলিয়া গেলে, বাঁ হাতে করিয়া একটী গ্লাস মুখের কাছে আন, আর ডাইন হাতে করিয়া আর একটী গ্লাসের জল বাঁ হাতের গ্লাসে ঢালিয়া দেও। ঢালিয়া দিবার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বাঁ হাতের গ্লাসের জল ফোঁস করিয়া ফুটিয়া উঠিবে।

ফুটিয়া উঠিতেই রোগীকে তা চুমুক দিয়া খাইয়া ফেলিতে বলিবে। এই যে অসুদ খাওয়াইয়া দিলে, ডাক্তরেরা একে এফর্বেবেসিং ড্রাফ্‌ট্ বলেন। বাইকার্ব্বণেট অব সোডা আর টার্টারিক য়্যাসিড্‌কে সোজাসুজি সোডা-য়্যাসিড্ বলিলেই চলে। আমরাও সোজাসুজি সোডা-য়্যাসিডই বলিয়া থাকি। অমুকের জ্বর হইয়াছে, সে কেবল বমি করিতেছে। বার দুই সোডা-য়্যাসিড্ খাওয়াইয়া দিই, বমি এখনই থামিয়া যাবে। আজ কাল গৃহস্থেরাও নিজে নিজে এ রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকেন। ফলে, সোডা-য়্যাসিড্ কথাটা খুবই চলিত হইয়াছে। সোডা-য়্যাসিড্ খাইলে বমি থামে, তাও অনেকে বেশ জানিতে পারিয়াছেন। এই জন্যে, অনেক জায়গায় সোডা-য়্যাসিড্ খাইবার বা খাওয়াইবার ব্যবস্থা দিতে ডাক্তরের দরকার হয় না। সোডা-য়্যাসিড একবার খাইলেই যে বমি থামিয়া যায়, তা নয়। কোন জায়গায় একবার খাইলেই কাজ হয়। কোন জায়গায় দু বারও খাইতে হয়, কোন জায়গায় আবার তিন চারি বারও খাইতে হয়। যাই হোক্, জ্বরে যে বমি হয়, সোডা-য়্যাসিডে সে বমি যেমন সারে, তেমন আর কোনও অসুদে নয়। সোডা-য়্যাসিডে বমি সারে বলিলে কি বুঝায়? ৩০ গ্রেন্ বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা, আর ২৫ গ্রেন্ টার্টারিক য়্যাসিড, চিনি-পানা কি মিছরি-পানায় ঐ রকম আলাদা আলাদা করিয়া গুলিয়া একত্র মিশাইয়া ফুটিয়া উঠিতেই তা খাওয়াইয়া দিলে বমি সারে—এই বুঝায়। সোডা য়্যাসিড খাইবার জন্য কাচের গ্লাস

ব্যবহার করিতে বলিছি। পাড়াগাঁয়ে সব জায়গায় কাচের গ্লাস পাওয়া যায় না। পাড়াগাঁয়ে কাচের গ্লাসের ব্যবহার খুবই কম, পাড়াগাঁয়ে কাচের গ্লাস অনেকে দেখেনও নাই। কাচের গ্লাস নৈলে যে সোডা-য়্যাসিড খাওয়া হয় না, তা নয়। কাচের গ্লাসের বদলে পাথরের বাটী ব্যবহার করিলেই হইতে পারে।

বরফের টুক্‌রো খাইলেও পেট বেশ ঠাণ্ডা হয়, আর বমি থামিয়া যায়। বরফের টুক্‌রো মুখে রাখিয়া সহজে গিলিবার মত সে গুলি ছোট ছোট হইয়া গেলে, গিলিয়া ফেলিবে। খানিকক্ষণ ধরিয়া বরফের টুক্‌রো এই রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে বমি থামিয়া যায়। বরফের টুক্‌রো পেটে গিয়া গলিলে, পেটের উদ্দীপনা শীঘ্রই দূর হয়। পেটের উদ্দীপনা গেলেই বমি থামিয়া যায়। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে; এর আগে অনেক বার বলিছি। পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়া যায় না। কাজেই বরফের ব্যবস্থা সেখানে চলে না।

বমি থামাইবার আর একটী ভাল অসুদ আছে। এক ফোটা করিয়া বাইনম্ ইপেকা যদি ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দেও. তবে বমি, অকি, ওআক-উঠা, গা ন্যাকার-ন্যাকার শীঘ্রই সারিয়া যায়। এক ফোটা করিয়া বাইনম্ ইপেকা ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। এ ছাড়া, যখন গা ন্যাকার-ন্যাকার করিবে, অকি উঠিবে, ওআক আসিবে, কি বমির চেষ্টা হইবে, তখনই এক ফোটা বাইনম্ ইপেকা খাইতে দিবে। খুব একটু খানি জলের সঙ্গে বাইনম্ ইপেকা খাওয়া চাই।

নৈলে জল বেশী হইলে উঠিয়া পড়িবে। এক এক বারে এক ড্রামের বেশী জল না খাইলে ভাল হয়। কত টুকু জলে ক ফোটা বাইনম্ ইপেকা কি রকম করিয়া খাইতে দিবে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

বাইনম্ ইপেকা	...	...	২৪ ফোটা
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ২৪টী দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ বমি না থামিবে, এক এক দাগ খাইতে বলিবে। ঘণ্টায় ঘণ্টায় ছাড়া আর কখন্ কখন্ খাইতে দিবে, এই মাত্র তা বলিছি।

এ সব অসুদ দিয়া যদি বমি বেশ থামাইতে না পার, তবে রোগীর উপর-পেটে রাইয়ের ছোট এক খানি পলস্তরা (মষ্টার্ড প্লাষ্টর) বসাইয়া দিবে। বুকের কড়া আর নাইয়ের ৪।৫ আঙুল উপর, এই দুটী সীমার মাঝখানের জায়গাকে উপর-পেট বলে। উপর-পেটকে ডাক্তরেরা এপিগ্যাষ্ট্রিয়ম্ বলেন। রাইয়ের পলস্তরা ঠিক্ এই জায়গায় বসাইয়া দিবে। রাই (মষ্টার্ড) বেশ টাট্‌কা হওয়া চাই। অনেক দিনের পুরাণ রাইতে তেমন কাজ হয় না। পুরাণ রাইতে জ্বালাও ধরে না, বমিও থামে না। রাইয়ের বেশ তেজ আছে কি না, কাক্ খুলিয়া রাইয়ের শিশি শুঁকিয়া দেখিলেই তা জানিতে পারা যায়। নাকে যদি খুব ঝাঁজ লাগে, তবে সে রাইয়ের পলস্তরায় উপকার হইবে, ঠিক করিবে। রাইয়ের পলস্তরা যদি খুব তেজাল করিতে চাও,

তবে পলস্তরা তয়ের করিবার সময় তাতে ফোটা কতক য়্যাসিটিক্ য়্যাসিড্ দিবে। পলস্তরায় খুব জ্বালা না ধরিলে কাজ হয় না। একটু জ্বালা ধরিতেই রোগীর কথা শুনিয়া যদি পলস্তরা উঠাইয়া ফেল, তবে তাকে তোমার কেবল কষ্ট দেওয়াই সার হবে। এই জন্যে, রোগী যতই কেন আর্ত্তনাদ করুক না, আধ ঘণ্টা পর্য্যন্ত পলস্তরা খান বসাইয়া রাখা চাই-ই। তার পর, পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর, গরম জলে ন্যাকড়া ভিজাইয়া পলস্তরা বসানর জায়গাটা বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে। রোগীর পেটের উপর রাই যেন একটুও লাগিয়া না থাকে। তার পর অলিব অইলই হোক্, নারিকেল তেলই হোক্, আর ঘিই হোক্, গরম করিয়া সেই জায়গায় বেশ করিয়া লাগাইয়া দিবে। পলস্তরা উঠাইয়া লইলেও খানিক ক্ষণ জ্বালা থাকে। ঘি, কি তেল গরম করিয়া লাগাইয়া দিলে জ্বালাটা শীঘ্রই থামিয়া যায়।

সোডা য়্যাসিড্ খাইলে, বরফের টুক্রো ঐ রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলে, আর এক ফোটা করিয়া বাইনম্ ইপেকা ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাইলে ১০০র মধ্যে ৯০ জায়গায় আসল বমি থামিয়া যায়। বমি থামাইবার জন্যে, সব জায়গাতেই যে এ তিন রকম উপায়ই করা চাই বা করিতে হয়, তা নয়। কোন জায়গায় শুদু সোডা-য়্যাসিডেই বমি সারে। কোন জায়গার শুদু বরফের টুক্রো ঐ রকম করিয়া গিলিয়া গিলিয়া খাইলেই বমি ভাল হয়। কোন জায়গায় কেবল রাইয়ের পলস্তরাতেই

বমি থামিয়া যায়। আবার কোন কোন জায়গায় বমি থামাইবার জন্যে এ কয় রকম উপায়ই করিতে হয়। যেখানে এ কয় রকম উপায় করিয়াও বমি থামাইতে না পারিবে, সেখানে কি করিবে? সেখানে আর একটা উপায় করিবে। সে উপায় আর কি? বেলস্তরা বসান। রাইয়ের পলস্তরা যে জায়গায় বসাইয়াছিলে, বেলস্তরাও ঠিক সেই জায়গায় বসাইয়া দিবে। যকৃতের (লিবরের) সঙ্গে, আর পেটের (পাকস্থলীর) সঙ্গে এমনি সম্বন্ধ যে, একটীর উদ্দীপনা হইলে আর একটীর উদ্দীপনা তার সঙ্গে সঙ্গে হয়। ফল কথা, আসল বমিতে পেটের উদ্দীপনা আর যকৃতের উদ্দীপনা, দুই উদ্দীপনাই এক সঙ্গে থাকে। তাতেই ৫৭৮র পাতে বলিছি, আসল বমিতে পেটের উপর আর যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে। শঙ্কার বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর ঘা দিলে রোগীর ব্যথা লাগে না। আসল বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর ওঁকি উঠে—ওআক উঠে। শঙ্কার বমিতে পেটের উপর, কি যকৃতের উপর চাপ দিলে রোগীর ওঁকিও উঠে না—ওআকও উঠে না। এই জন্যে, আসল বমি থামাইতে পেটেরও উদ্দীপনা দূর করা চাই—যকৃতেরও উদ্দীপনা দূর করা চাই। আর এই জন্যে, রাইয়ের পলস্তরাই হোক্, আর বেলস্তরাই হোক্, উপর-পেটে এমনি জুত বরাত করিয়া বসাইয়া দিবে যে, তার খানিকটে যেন যকৃতের (লিবরের) জায়গার উপরে আসিয়া পড়ে। ডাইন দিকে পাঁজরের উপর পর্য্যন্ত আসিয়া পড়িলেই

যকৃতের জায়গার উপর তোমার রাইয়ের পলস্তরা কি বেলস্তরা বসান হইল। ফল কথা, আসল বমিতে পেটের উদ্দীপনা আর যকৃতের উদ্দীপনা, দুই উদ্দীপনাই এক বারে দূর করা চাই—এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ কথাটা মনে না থাকিলে পদে পদে অপ্রতিভ হবে।

সাহেবদের দেশে আমাদের কাঁচ-পোকার মত দেখিতে সুশ্রী এক রকম মাছি আছে। সে মাছির এমনি তেজ যে, গায়ে বসিলেও ফোস্কা হয়। বেলস্তরা সেই মাছি থেকে তয়ের হয়। বেলস্তরার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। বেলস্তরার আরোকেও ফোস্কা হয়, বেলস্তরার পটিতেও ফোস্কা হয়। বেলস্তরার আরোককে ডাক্তরেরা লাইকর লিটী বলেন। বেলস্তরার পটিকে তাঁরা এম্প্লাষ্ট্রম্ লিটী বলেন। লাইকর লিটীর বদলে লাইকর ক্যান্থারিডিস্ বলিলেও হয়। এম্প্লাষ্ট্রম্ লিটীর বদলে এম্প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থারিডিস্ বলিলেও হয়। যে মাছি থেকে বেলস্তরা তয়ের হয়, লিটা আর ক্যান্থারিডিস্—এ দুইটী সেই মাছির নাম। লাইকর লিটী ছাড়া বেলস্তরার আর একটী আরোক আছে। সে আরোককে ডাক্তরেরা লিনি-মেণ্ট ক্যান্থারিডিস্ বলেন। লাইকর লিটীর চেয়ে লিনি-মেণ্ট ক্যান্থারিডিসের তেজ ঢের বেশী। লাইকর লিটী অনেকবার লাগাইলে তবে ফোস্কা হয়। লিনিমেণ্ট ক্যান্থা-রিডিস্ এক বার লাগাইলেই ফোস্কা হয়। যেখানে তড়ি-ঘড়ি বেলস্তরার ফোস্কা উঠান দরকার, সেখানে লিনিমেণ্ট ক্যান্থারিডিস্ লাগাইবে। তবে লিনিমেণ্ট ক্যান্থারিডিস্

বেশ বুঝিয়া শুজিয়া ব্যবহার করা চাই। ডাক্তরেরা বেলস্তরার পটিই সচরাচর ব্যবহার করিয়া থাকেন। অসুদের দোকানে এম্‌প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থারিডিস্ কিনিতে পাওয়া যায়। এম্‌প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থারিডিস্ থেকে গায়ে বসাইবার বেলস্তরার পটি তয়ের করিয়া লইতে হয়। ডাক্তরেরা প্রেস্ক্রপ্‌শনে (ব্যবস্থা-পত্রে) এম্‌প্লাষ্ট্রম্ লেখেন। এম্-প্লাষ্ট্রম্‌কে সোজা ইংরিজিতে প্লাষ্টর্ বলে। প্লাষ্টরকে আমরা সোজাসুজি পলস্তরা বলিয়া থাকি। সব রকম পলস্তরা কাগজের লম্বা ঠোঙার ভিতর পোরা থাকে। ঠোঙার দু মুখই আঁটা। বেলস্তরার পটি আড়ে দীঘে যত খানি হবে, আগে মাপিয়া লইবে। তার পর, সেই মাপে কাগজ কিম্বা খুব পুরু ন্যাক্‌ড়া কাটিয়া লইবে। তার পর, স্প্যাচুলায় আগায় করিয়া খানিক এম্‌প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থারিডিস্ লইয়া পিল্-টাইলের উপর বেশ করিয়া মাড়িবে। স্প্যাচু-লার বদলে বাঁশের চেয়াড়ি ব্যবহার করিতে পার। আর পিল্-টাইলের বদলে থালা, পাথর কি পিঁড়ি ব্যবহার করিতে পার। স্প্যাচুলা আর পিল্-টাইলের কথা মেটি-রিয়া মেডিকায়, ডিস্পেন্সরির সরঞ্জমের কথা বলিবার সময় বলিব। বার কতক এই রকম করিয়া মাড়িতেই এম্‌প্লাষ্ট্রম্ ক্যান্থারিডিস্ মলমের মত বেশ নরম হইয়া যাবে। নরম হইয়া গেলে সেই স্প্যাচুলায় করিয়া কাগজের উপর কিম্বা খুব পুরু ন্যাক্‌ড়ার উপর বেশ সমান করিয়া লাগা-ইবে। এই তোমার বেলস্তরার পটি তয়ের হইয়া গেল। বেলস্তরার এই পটি উপর-পেটে রাইয়ের পলস্তরার জায়-

গায় ঐ রকম জুত বরাত করিয়া বসাইয়া দিবে। রাইয়ের পলস্তরার খুব জ্বালা ধরিলে, আর চামড়া বেশ লাল হইয়া উঠিলে পর, সেই জায়গায় বেলস্তরার পটি বসাইলে বেল-স্তরার ফোস্কা শীঘ্রই উঠে। পটি এক ঘণ্টার বেশী রাখিবার দরকার নাই। তার পরই পটি উঠাইয়া ফেলিবে। পটি উঠাইয়া সেই জায়গায়, ময়দারই হোক্ আর মসিনার খৈলেরই হোক্, গোটা কতক গরম গরম পুলটিশ লাগাইবে। গরম গরম পুলটিশে বেলস্তরার ফোস্কা খুব শীঘ্র উঠে। ফোস্কা বেশ উঠিলে কাঁচি দিয়া বেশ জুত বরাত করিয়া কাটিয়া ফোস্কার ছালটা সব উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর বেলস্তরার ঘায়ের মাপে খুব পুরু ন্যাকড়া কাটিয়া লইবে। সেই ন্যাকড়ার উপর পুরু করিয়া সিম্পল্ অইণ্ট-মেণ্ট লাগাইবে। সিম্পল্ অইণ্টমেণ্ট এক রকম মলম। ডিস্পেন্সরিতে বা ভাল ইংরিজি অসুদের দোকানে কিনিতে পাওয়া যায়। মলমকে ডাক্তরেরা অইণ্টমেণ্ট বলেন। মলমের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় লিখিব। তার পর, সেই মলমের পটির উপর এক গ্রেন মর্ফিয়া বেশ জুত বরাত করিয়া ছড়াইয়া দিবে। তার পর, যে দিকে মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলে, সেই দিকটে বেলস্তরার ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবে। মলমের পটি সরিয়া পড়িতে না পারে, এই জন্যে ন্যাকড়ার চৌড় ফালি দিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া দিবে। ন্যাকড়ার চৌড় ফালিকে ডাক্তরেরা ব্যাণ্ডেজ বলেন। মর্ফিয়া-দেওয়া মলমের এই পটি বেলস্তরার ঘায়ের উপর বসাইয়া দিবার খানিক পরেই বমি বেশ থামিয়া যায়।

মলমের পটি উঠাইয়া ফেলিবার জন্যে ব্যস্ত হইবার দরকার নাই। পটি এক দিন এক রাতি রাখিয়া উঠাইয়া ফেলিবে। তার পর, বেলস্তরার ঘা শুকাইবার জন্যে শুদু সিম্পল্ অইণ্টমেণ্টের পটি লাগাইতে পার।

রাইয়ের পলস্তরা না বসাইয়া প্রথমেই যদি বেলস্তরার পটি বসাইয়া দেও, তবে সে পটি আট ঘণ্টা না রাখিলে ফোস্কা উঠে না। বমি থামাইতে অত দেরি কি সয়? এই জন্যে, রাইয়ের পলস্তরা উঠাইয়া ফেলিয়া সেই জায়গায় বেলস্তরার পটি বসান বেশ যুক্তি। রাইয়ের পলস্তরার জ্বালা, তার উপর বেলস্তরার জ্বালা! উপরোউপরি দুটো জ্বালা সৈতে হয় বটে। কিন্তু ৮।৯ ঘণ্টা বেলস্তরার পটির জ্বালা আর বমির কষ্ট সওয়ার চেয়ে, খানিক ক্ষণের জন্যে উপ্‌রোউপ্‌রি দুটো জ্বালা সওয়া ঢের ভাল।

বেলস্তরার ঘায়ের উপর ঐ রকম করিয়া মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলেও বমি থামে। আবার উপর-পেটের চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে। চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিবার যন্ত্রকে ডাক্তরেরা হাইপোডার্ম্মিক সিরিঞ্জ বলেন। এই যন্ত্রের কথা, আর চামড়ার নীচে কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, ৭৪—৭৬র পাতে তা বলিছি। ৪৮৯র পাতে বলিছি, মর্ফিয়া দু রকম —য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া আর মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়া। চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিবার জন্যে, মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়ার চেয়ে য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া ভাল। কেন না, মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়ার চেয়ে য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া

গুলিতে কম জল লাগে। ৬ মিনিম্ চোআন জলে ১ গ্রেন্ য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া গোলে। কিন্তু ১ গ্রেন্ মিয়ুরিয়েট্ অব্ মর্ফিয়া গুলিতে ২০ মিনিম্ চোআন জল লাগে। চোআন জলকে ডাক্তরেরা ডিষ্টিল্ড্ ওআটর বলেন; ভাল বাঙ্গালায় পরিশ্রুত জল বলা যায়। সোজাসুজি চোআন জলই বলিব। ৬ মিনিম্ চোআন জলে ১ গ্রেন্ য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া বেশ করিয়া গুলিয়া তার সিকি ভাগ, অর্থাৎ ঠিক্ দেড়-মিনিম্, উপর-পেটের চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। তা হইলে সিকি (¼) গ্রেন্ য়্যাসিটেট্ অব্ মর্ফিয়া চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়া হবে। চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচ্‌কিরি করার প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই বমি থামিয়া যায়। উপর-পেটের চামড়ার নীচে পিচ্‌কিরি করিলেও হয়; বাউঁতে, যেখানে ইংরিজি টিকে পরে, সেই খানকার চামড়ার নীচে, পিচ্‌-কিরি করিলেও হয়।

বেলস্তরার ঘায়ের উপর ঐ রকম করিয়া মর্ফিয়া ছড়াইয়া দিলেও বমি থামে; আবার উপর-পেটের চামড়ার নীচে মর্ফিয়ার পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও বমি থামে। এখন দেখ, এ দুয়ে তফাত কি। তফাত ঢের। এক রোগের দু রকম চিকিৎসা। দু রকম চিকিৎসারই ফল এক। সে দু রকম চিকিৎসার কোন্ রকম চিকিৎসা তুমি ভাল বল? যে চিকিৎসায় রোগীর কষ্ট কম, সেই চিকিৎসাই ভাল। কেন, তা কি আর বলিতে হবে? সোডা-য়্যাসিডে যদি বমি সারে, তবে কি রোগী রাইয়ের পলস্তরার

নাম করিতে দেয় ? অসুদ খাইলে, কি পটি দিলে যদি ফোড়া ভাল হয়, তবে কি রোগী অস্ত্রের নাম করিতে দেয় ? কখনই না। বেঁধে মারে, সয় ভাল—সব রোগীরই কাছে এই কথা। চিকিৎসকদেরও যেন এ কথাটা সর্ব্বদা মনে থাকে। তবে এর মধ্যে একটা কথা আছে। চামড়ার নীচে পিচকিরি করিবার যন্ত্র যাঁরা জুটাইতে না পারিবেন, বমি থামাইবার জন্যে কাজে কাজেই, তাঁদের রোগীকে একটু কষ্ট সওয়াইতেই হবে।

পেটে অম্বল হইলে বমি হয়। চূণের জল, ম্যাগ্নীশিয়া আর বিস্মথ সে বমির এই তিনটী খুব ভাল অসুদ। অম্ব-লের বমি থামাইবার জন্যে সোডা য়্যাসিডে সোডা বেশী করিয়া দিবে ; আর চিনি-পানা কি মিছরি-পানার বদলে শুদ্ধ জল দিবে। কেন না, মিষ্টিতে অম্বল বাড়ে বই কমে না। সোডা য়্যাসিডে এক এক বারে ৩০ গ্রেন বাইকার্ব্ব-ণেট্ অব্ সোডা, আর ২৫ গ্রেন টার্টারিক্ য়্যাসিড্ লাগে। অম্বলের বমি থামাইবার জন্যে ৩০ গ্রেনের বদলে এক এক বারে ৪০ গ্রেন্ করিয়া বাইকার্ব্বণেট্ অব্ সোডা দিবে। চূণের জল দুধের সঙ্গে খাইতে হয়। তিন ভাগ দুধ আর এক ভাগ চূণের জল একত্র মিশাইবে। দুধ এক-বল্কা আর ঠাণ্ডা হওয়া চাই। চা-চামচের তিন চামচ এক-বল্কা দুধের সঙ্গে এক চা-চামচ চূণের জল মিশাইয়া, মাঝে মাঝে তারই এক চা-চামচ করিয়া খাইতে দিবে। পোনর মিনিট অন্তরও দিতে পার, বিশ মিনিট অন্তরও দিতে পার ; আধ ঘণ্টা অন্তরও দিতে পার। চা-চামচের

বদলে ছোট ঝিনুক ব্যবহার করিতে পার। যদি বল, চূণের জল-মিশনো এক-বল্কা দুধ বারে বারে এত টুকু করিয়া দিবার দরকার কি? দরকার একটু আধটু নয়— খুবই দরকার। অসুদই হোক্, আর পথ্যই হোক্, এক এক বারে খুব কম মাত্রায় না দিলে, তাতে বমি বাড়ে বৈ কমে না। পেটে যা পড়িবে, তাতে পেট ভার হওয়া দূরে থাক, পেটে কিছু পড়িল কি না, পেট নিজেও যেন তা না জানিতে পারে। বেশী কথা আর কি বলিব? বমির চিকিৎসায় সব চিকিৎসকেরই যেন এ কথাটা মনে থাকে। বমি থামাইবার জন্যে, ঘণ্টায় ঘণ্টায় এক ফোটা করিয়া ৰাইনম্ ইপেকা যে এক ড্রাম জলের সঙ্গে খাওয়াইতে বলিছি, তার কারণই এই। পেটের যে উদ্দীপনার জন্যে বমি হইতেছে, পেট ভার হইলে, সে উদ্দীপনা যে বাড়িবে, তা বেশই বুঝা যাইতেছে।

চূণের জল কেমন করিয়া তয়ের করে? একটা বড় বোতলে আড়াই পোআ (দশ ছটাক) পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল পূর। তার পর, সেই জলে আধ কাঁচ্চা (দু ড্রাম) গুঁড়ো চূণ ঢালিয়া দেও। তার পর কাক দিয়া বোতলের মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া দু তিন মিনিট ধরিয়া বোতলটা খুব ঝাঁকাও। তার পর বোতলটা একটা নিনড় জায়গায় রাখিয়া দেও। ১২ ঘণ্টার পর বোতলের থিতন জল আর একটা বোতলে এমন জুত বরাত করিয়া ঢালিয়া লইবে যে, নীচেকার চূণ যেন ঘুলাইয়া না উঠে। বোতলের থিতন জল সব যদি একবারে ঢালিয়া লইতে চেষ্টা কর,

তবে নীচেকার চূণ ঘুলাইয়া উঠিবেই উঠিবে। এই জন্যে, বোতলের থিতন জল আর একটা বোতলে ঢালিবার সময় নীচেকার চূণ ঘুলাইয়া উঠিতেছে কি না, সে দিকে যেন খুব নজর থাকে। ঘুলাইয়া উঠিতেছে দেখিলেই, থিতন জল আর ঢালিবে না। চূণের জল যে বোতলে রাখিবে, কাক্ দিয়া সে বোতলটার মুখ বেশ করিয়া আঁটিয়া রাখা চাই। চূণ যদি নির্ভাজ খাটি হয়, আর চূণের বোতলের মুখ কাক্ দিয়া খুব আঁটা থাকে ; তবে সেই চূণ থেকে ঐ রকম করিয়া আরও চারি পাঁচ বার চূণের জল তয়ের করিয়া লইতে পার। চূণের জলের মাত্রা ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা) থেকে ৩ ঔন্স (দেড় ছটাক)। চূণের জল এক-বল্কা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া খাইতে হয়। এক ঔন্স (আধ ছটাক) চূণের জলে প্রায় আধ গ্রেন্ চূণ আছে। বমির যদি বাড়াবাড়ি না দেখ, তবে এক এক বারে ছটাক দেড়েক দুধের সঙ্গে আধ ছটাক (এক ঔন্স) করিয়া চূণের জল খাইতে দিতে পার।

পেটে অম্বল হইলে, ছোট ছেলেদেরই বমি বেশী হইয়া থাকে। দুধ খাইয়া যে সব ছেলে ছানা-ছানা দুধ তোলে, চূণের জল তাদের ভারি অসুদ। তাদের শুদু দুধ না দিয়া চূণের জল-মিশনো এক-বল্কা দুধ খাওয়াইলে, তারা আর দুধ তোলে না। চূণের জলে পেটের অম্বল নষ্ট করে। এই জন্যে, চূণের জল-মিশনো দুধ পেটে গিয়া ছানা বাঁধিতে পারে না। চারি ভাগ দুধের সঙ্গে এক ভাগ চূণের জল মিশাইয়া ছেলেদের খাইতে দিবে।

দাঁত উঠিবার সময়, দাঁত উঠিবার তাড়সে ছেলেদের বমি হইয়া থাকে। বিস্মথ ছেলেদের সে রকম বমির ভারি অস্থুদ। এক গ্রেন থেকে তিন গ্রেন বিস্মথ একটু ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে দিতে পার। দাঁত উঠিবার তাড়সে ছেলেদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমিকে শঙ্কার বমি বলে। শঙ্কার বমি কি—শঙ্কার বমি কাকে বলে, ৫৭০র পাতে বলিছি।

বিস্মথ জোআন রোগীদেরও অম্বলের বমির বেশ অস্থুদ। ১৫ গ্রেন বিস্মথ আর ১৫ গ্রেন ম্যাগ্নীশিয়া এক-বল্কা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া মাঝে মাঝে খাইলে পেটের অম্বলও নষ্ট হয়, পেটের উদ্দীপনাও দূর হয়। অম্বলেই পেটের উদ্দীপনা হয়। আর সেই উদ্দীপনা থেকেই বমি হয়। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, এর আগে অনেক বার বলিছি।

আর্সেনিক (শেঁকো) মাতালদের বমির বড় অস্থুদ। মাতালদের বমি সকাল বেলা খালি পেটেই বেশী হইয়া থাকে। বমি খুব কমই হয়; বমির কেবল চেষ্টাই বেশী দেখা যায়। অকি আর ওআক তুলে তুলে তারা একবারে নেতিয়ে পড়ে। আহার করিবার একটু আগে তারা যদি এক ফোটা করিয়া লাইকর আর্সেনিকেলিস (একটু জলের সঙ্গে) খায়, তবে তাদের সে রকম কষ্টের বমিও শীগ্রই সারিয়া য়ায়। মাতালরা যা বমি করে, তার রং সচরাচর সবুজই দেখা যায়। আর সেই বমিতে তাদের মুখ যেমন তিত হয়; তেমনি টক হইয়া যায়।

ক্রয়েসোট বমির আর একটী খুব ভাল অসুদ। গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, ক্রয়েসোটে সে বমিও ভাল হয়। জাহাজে করিয়া সমুদ্রে যাইবার সময় অনেকের বমি হয়। ক্রয়েসোটে সে বমিও সারে। পেটের ভিতরে ঘা হইলে যে বমি হয়, সে বমিও এতে ভাল হয়। পেটের ভিতর ঘায়ের কথা এর পর বলিব। আহারের পর কারু কারু পেট ব্যথা করে। সে ব্যথায় সে একবারে অস্থির হইয়া পড়ে। ডাক্তরেরা সে ব্যথাকে গ্যাষ্ট্রোডীনিয়া বলেন। গ্যাষ্ট্রোডীনিয়ার সোজা বাঙ্গালা পেট-ব্যথা। ক্রয়েসোট্ এ রকম পেট-ব্যথারও খুব ভাল অসুদ। ক্রয়েসোটের মাত্রা—১ ফোটা থেকে ৫ ফোটা। ম্যাগ্নীশিয়ার সঙ্গে ক্রয়েসোটের বড়ি তয়ের করিয়া খাইতে দিবে। প্রথম প্রথম এক ফোটার বেশী দিবার দরকার নাই। রোজ একবার কি দু বারেরও বেশী দিবার দরকার হয় না। হাত দিয়া ক্রয়েসোটের বড়ি তয়ের করা হবে না। কার্ব্বলিক্ য়্যাসিড গায়ে লাগিলে যেমন জ্বালা করে আর সে জায়গাটা তখনই যেমন শাদা হইয়া যায়, ক্রয়েসোট গায়ে লাগিলেও ঠিক্ তেমনি জ্বালা করে, আর সে জায়গাটা ঠিক্ তেমনি শাদা হইয়া যায়। এই জন্যে গালে জল লইয়া ক্রয়েসোটের বড়ি বেশ জুত বরাত করিয়া গিলিয়া খাইতে বলিবে।

জ্বর জাড়ি থেকে উঠিয়া অনেক রোগীর আহারে রুচি থাকে না, খিদে হয় না, গা ন্যাকার-ন্যাকার করে, কখন ন্যাকারও হয়। কলম্বো এমন সব রোগীর পেটের এ রকম

উদ্দীপনার একটী খুব ভাল অসুদ। কলম্বো গাছড়া অসুদ। সাহেবদের কলম্বো আর আমাদের গুলঞ্চ সমান। দুয়েরই সমান গুণ। এ সব রোগীকে কলম্বোর শিকড়ের ক্বাথ দিলেই বেশী উপকার হয়। কলম্বোর শিকড়ের ক্বাথকে ডাক্তরেরা ইনফিয়ুশন কলম্বো বলেন। ইনফিয়ুশন কলম্বোর মাত্রা—১ ঔন্স থেকে ২ ঔন্স, রোজ ৩ বার করিয়া খাইবে। গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, ইনফিয়ুশন কলম্বো সে বমিরও খুব ভাল অসুদ।

ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিড বমির আর একটী খুব ভাল অসুদ। গুণে ক্রুয়েসোটের প্রায় সমানই বলিলে হয়। নির্ভাঁজ হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিড ভারি ভয়ানক বিষ। এই জন্যে, ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিডও খুব সতর্ক আর সাবধান হইয়া ব্যবহার করিবে। ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিডের মাত্রা ১ ফোটা থেকে ৩ ফোটা, ৬ ফোটা পর্য্যন্তও দেওয়া যায়। কিন্তু হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিডের নামে যখন ডরাইতে হয়, তখন মাত্রা বেশী না দিয়া কম দেওয়াই ভাল। ইনফিয়ুশন কলম্বোর সঙ্গে মিশাইয়া দিলে ডাইলিয়ুট হাইড্রোসিয়্যানিক য়্যাসিডে আরও বেশী উপকার হয়।

গর্ভ হইলে মেয়েদের যে বমি হইয়া থাকে, সে বমির আর একটী খুব ভাল অসুদ আছে। সে অসুদটীর কথা এখনও বলি নাই। সে অসুদ আর কি? কুঁচলের আরক। কুঁচলের আরককে ডাক্তরেরা টিংচর অব নক্স-বমিকা বলেন। আমি অনেক জায়গায় দেখিছি, টিংচর

অব নক্স-বমিকা গর্ভবতী স্ত্রীদের বমির বড় চমৎকার অস্যুদ। টিংচর অব নক্স-বমিকা খুব কম মাত্রায় দিতে হয়। মাঝে মাঝে চা-চামচের এক চামচ ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে কেবল এক ফোটা করিয়া খাইলেই কাজ হয়। আর আর রকম বমি থামাইবার জন্যে বাইনম্ ইপেকা যে নিয়মে খাওয়াইতে বলিছি, টিংচর অব নক্স-বমিকাও ঠিক সেই নিয়মে খাইতে দিবে।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম বমির আর একটী ভাল অস্যুদ। কাঁচ্চা খানেক খুব ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে বিশ (২০) ফোটা করিয়া স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম মাঝে মাঝে খাইতে দিলে, অনেক জায়গায় বমি বেশ থামিয়া যায়। বরফের জলের সঙ্গে দিতে পারিলে আরও বেশী উপকার হয়। ছোট ছেলেদের বমিতে এ অস্যুদটী বেশ খাটে।

১৪৬ থেকে ১৫২র পাতে যে ছেলেটির স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) চিকিৎসার কথা বলিছি, দাঁত উঠিবার সময় সে ছেলেটী আমাকে বড়ই ভোগাইয়াছিল। ছুতোয় নাতায় তার তড়কা হইত। জ্বরের সঙ্গে তার তড়কা যেন একবারে গাঁথা থাকিত। জ্বরের প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই তড়কা আসিয়া উপস্থিত হইত। ১৪৭র পাতেও এ কথা বলিছি। দাঁত উঠিবার সময় যে সব ছেলের পেটের ব্যামো হয়—বারে বারে পাতলা বাহ্যে হয়, তড়কার ভয় তাদের খুবই কম। এ একটা সোজাসুজি হিসাব জানিয়া রাখ। মাড়ি ফুঁড়িয়া দাঁত উঠিবার সময় মাড়ির শ্লেষ্মা ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হয়, সেই উদ্দীপনা যদি

অধো হইয়া যায়, তবেই মঙ্গল। সে উদ্দীপনা অধো হই-হইয়াছে কি না, ছেলের পেটের ব্যামোতেই তার পরিচয় পাওয়া যায়। সে উদ্দীপনা অধো না হইলে, ছেলের পেটের-ব্যামো হয় না। এই জন্যে, দাঁত উঠিবার সময় ছেলেদের পেটের-ব্যামো, না বুঝিয়া সুজিয়া, হঠাৎ বন্ধ করিতে নাই। আর সে উদ্দীপনা অধো না হইয়া যদি ঊর্দ্ধ হয়, তবে বারে বারে পাতলা বাহ্যে না হইয়া তার বদলে বারে বারে ছেলের বমি হয়, ছেলে বারে বারে ওআক তোলে—অকি তোলে। ফল কথা, সে বমিতে শঙ্কার বমির সব পরিচয়ই পাওয়া যায়। এ ছাড়া, ছেলে অস্থির হয়, চোক আধ বুজন্ত ভাবে ঝিমোয়, আর বারে বারে হাই তোলে। মাড়ি ফুঁড়িয়া দাঁত উঠিবার সময় শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যে উদ্দীপনা হইয়া থাকে, ঊর্দ্ধ হইয়া সে উদ্দীপনা মাথার মগজে (ব্রেইনে) গেলে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। মাথার মগজের উদ্দীপনা সামান্য রকম হইলে এই সব লক্ষণ দেখা দিয়াই ক্ষান্ত হয়। কিন্তু মাথার মগজের উদ্দীপনার বাড়াবাড়ি হইলে, শেষে তড়কা আসিয়া উপস্থিত হয়। আমার সে ছেলেটীর দাঁত উঠিবার সময় মাড়ির শ্লেষ্মা-ঝিল্লি ফোঁড়ার দরুণ যে উদ্দীপনা, তা অধো না হইয়া বরাবরি ঊর্দ্ধ হইত। এই জন্যে, মাথার মগজের উদ্দীপনার ওসব লক্ষণেরও পরিচয় পাইতাম। মাথার মগজের উদ্দীপনাই ও সব লক্ষণের কারণ বলিয়া ছেলের মাথায় জল-পটি দিতাম। আয়োডাইড অব্ পোটাসিয়মের সঙ্গে ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম দু ঘণ্টা অন্তর খাওয়াই-

তাম। এই দুটি অস্যুদের কথা ২৭র পাতে বলিছি। মগজের উদ্দীপনা কমাইবার জন্যে, এই দুটী অস্যুদ ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতাম। বমি, অকি, বা ওআক-তোলা থামাইবার জন্যে, ১ ফোটা করিয়া স্পিরিট ক্লোরো-ফর্ম্ম বরফের জলের সঙ্গে বারে বারে খাইতে দিতাম। দাঁত উঠার দরুণ যখন তার মগজের এই রকম উদ্দীপনা হইত, তখনই এই রকম চিকিৎসা করিয়া তাকে ভাল করিতাম। বমির বাড়াবাড়ি থাকিতে তাকে নুন-দেওয়া জল-য়্যারারুট ছাড়া আর কিছুই দিতে দিতাম না। মাইয়ের দুধও খুব কম দিতে বলিতাম। দাঁত উঠার দরুণ মগজের উদ্দীপনা যেবারে এতে নিতান্তই না কমিত, সেবারে ছুরি দিয়া তার মাড়ি চিরিয়া দাঁত বাহির করিয়া দিতাম। দাঁত বাহির করিয়া দিতে পারিলেই তার বালাই সব চলিয়া যাইত। মাড়ির যদি বেশী নীচে দাঁত থাকে, তবে মাড়ি চিরিলে কোনও ফল হয় না, ছেলেকে কেবল কষ্ট দেওয়া হয় মাত্র। কেন না, দু এক দিনে সে চেরার চিহ্নও থাকে না। এই জন্যে, চিরিবার আগে আঙুল দিয়া মাড়ি খুব ঠাউরে দেখিবে। আঙুলের নীচে দাঁত বেশ মালুম হইলে, তবে মাড়ি চিরিবে। যে অস্ত্র দিয়া ডাক্তরেরা মাড়ি চিরিয়া দেন, সে অস্ত্রকে তাঁরা গম্ ল্যান্সেট বলেন।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম ছোট ছেলেদের বমির যেমন অস্যুদ, একের নম্বর ব্রাণ্ডিও তাদের তেমনি অস্যুদ। চা-চামচের আধ চামচ (ছোট ঝিনুকের আধ ঝিনুক) ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে এক ফোটা স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম আর

এক ফোঁটা ব্রাণ্ডি ১৫ মিনিট অন্তর, ২০ মিনিট অন্তর, আধ ঘণ্টা অন্তর, কি এক ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইলে, ছোট ছেলেদের বমি দেখিতে দেখিতে থামিয়া যায়। এতে যে কেবল বমিই থামে, তা নয়; পেট-নাবাও (ডায়ারীয়াও) ভাল হয়; আবার ছেলে চাঙ্গা হইয়াও উঠে। তবেই দেখ, বারে বারে বমি করিয়াই হোক্, আর বারে বারে পাতলা বাহ্যে গিয়াই হোক্, যে ছেলে একবারে নেতিয়ে পড়িয়াছে, স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম আর ব্রাণ্ডি সে ছেলের জীবন।

স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম আর ব্রাণ্ডি জোআন রোগিদেরও বমির কম অসুদ নয়। জোআন রোগিদের পক্ষে স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্মের মাত্রা ২০ ফোটা, ব্রাণ্ডির মাত্রা ১ ড্রাম। ছ মাসের শিশুর পক্ষে দুই অসুদেরই মাত্রা ১ ফোটা।

বমির আরও ঢের অসুদ আছে। সে সব অসুদের কথা বলিতে গেলে এক খান মেটিরিয়া মেডিকাই লিখিয়া ফেলিতে হয়। সে সব অসুদের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

পথ্য—এর আগেই বলিছি, যে রোগীর বমি থামাইতে তোমাকে ডাকিবে, অসুদই হোক্ আর আহারই হোক্, তাকে এক এক বারে এত কম দিবে যে পেটে গিয়া পড়িল কি না, পেটও যেন তা ভাল না জানিতে পারে। বেশী আর কি বলিব। পেট ভার করে বা করিতে পারে, এমন কোন আহারই তাকে দিবে না। চূণের জল-মিশনো এক-হাল্কা দুধ, নুন-দেওয়া জল-য়্যারারুট, খুব পাতলা যবের মণ্ড (বার্লি ওআটর), কি বড় জোর খুব পাতলা জল-সাগু

—এই কয়টীর মধ্যে যেটীতে রোগীর ইচ্ছা, এক এক বারে খুব অল্প করিয়া তাকে সেইটী দিতে পার। খুব দুর্ব্বল রোগীকে ব্রাণ্ডির সঙ্গে মাংসের ক্কাথ একটু একটু দিতে পার। অনেক জায়গায় শুদু দুর্গন্ধ শুঁকেই বমি হয়। যেখানে বমি না হয়, সেখানে নিয়ত কেবল গা ন্যাকার-ন্যাকার করিতে থাকে। সুগন্ধ জিনিষ শুঁকিলে তেমনি অনেক জায়গায় বমি নিবারণ হয়—গা ন্যাকার-ন্যাকার ভাল হয়। বমি থামাইবার সময় এ কথাটা যেন চিকিৎ-সকদের মনে থাকে। অনেকেই জানেন, লেবুর পাতা শুঁকিলে অনেক জায়গায় গা ন্যাকার-ন্যাকার ভাল হইয়া যায়—কাজে কাজেই, বমিও নিবারণ হয়। বমি নিবা-রণের জন্যে আমাদের বৈদ্যরা সার চন্দন মাখান পরিষ্কার ন্যাকড়া শুঁকিতে দেন—শশা কাটিয়া শুঁকিতে দেন। শশার বেশ এক রকম শোঁদা শোঁদা গন্ধ। আতর, গোলাপ, লাবেণ্ডর, ওডিকলোঁ—এ সব সুগন্ধ জিনিষেও গা ন্যাকার-ন্যাকার ভাল হয়—বমি নিবারণ হয়।

বমির কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। এখন হিক্কির কথা বলি।

৮। হিক্কি——হিক্কিকে ডাক্তরেরা হিকপ্ বলেন। রোগের চেয়ে রোগের উপসর্গ লইয়া চিকিৎ-সককে অনেক জায়গায় ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি। লোকে কথায় বলে, বড় শত্রুর হাতে নিস্তার আছে, কিন্তু পুনকে শত্রুর হাতে নিস্তার নাই। হিক্কির বেলায় এ কথাটা খুবই খাটে।

হিক্কিকে আমাদের বৈদ্যরা বড়ই ডরান। এই জন্যে, হিক্কিকে তাঁরা যমের ভগিনী বলেন। হিক্কিকে যমের ভগিনী বলা বেশ মানায়। কেন না, শক্ত রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয়। অনেক তরুণ (নূতন) রোগের শেষে হিক্কি আসিয়া উপস্থিত হয়। তার পর, যমের ভগিনীরই হাতে রোগীর প্রাণ যায়। যে সব যন্ত্রে, বা যে সব যন্ত্রের বলে পরিপাক (হজম) হয়, সে সব যন্ত্রকে ভাল কথায় পাক-যন্ত্র বলে। পাক-যন্ত্র গুলিকে ডাক্তরেরা ডাইজেষ্টিব অর্গ্যান্স বলেন। পেট (পাকস্থলী), অন্ত্র, যকৃত (লিবর)—এ সবই পাক-যন্ত্র। হিক্কি এই সব পাক-যন্ত্রের উদ্দীপনার বা প্রদাহের একটা লক্ষণ। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। প্রদাহ কি—প্রদাহ কাকে বলে, ২০০র পাতে তা বলিছি। পেটের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। অন্ত্রের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। যকৃতের উদ্দীপনা বা প্রদাহ থেকে হিক্কি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মূত্র-গ্রন্থির ব্যামোতে হিক্কি সচরাচরই ঘটে। মূত্র-গ্রন্থিকে ডাক্তরেরা কিড্নি বলেন। মূত্র-গ্রন্থির কথা ৫৭১র পাতে বলিছি। অন্ত্রবৃদ্ধি রোগে অন্ত্র কষিয়া ধরিলে রোগীর, এমন কি, বিষ্ঠা পর্য্যন্ত বমি হয়। এ রকম বমির সঙ্গে হিক্কি হয়। কখন কখন গুল্ম-বায়ু রোগ থেকে হিক্কি হয়। গুল্ম-বায়ুকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া বলেন। ধরিতে গেলে, গুল্ম-বায়ু কেবল মেয়েদেরই হইয়া থাকে, কখন কখন

পুরুষেরও হয়। হিক্কি যে কেবল রোগীরই হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। সহজ মানুষেরও হিক্কি হয়। শিশু আর প্রাচীন, এই দুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। সহজ শরীরে যে হিক্কি হয়, তাকে সহজ হিক্কি বলে। আর রোগে যে হিক্কি হয়, তাকে রোগের হিক্কি বলিতে পার।

সহজ হিক্কি——এই মাত্র বলিছি, শিশু আর প্রাচীন এই দুই বয়সেই হিক্কি বেশী হয়। শিশুদের ছুতোয় নতায় হিক্কি হয়। পেট ভরিয়া খাইলে তাদের হিক্কি হয়; বেশী হাসিলে তাদের হিক্কি হয়। অনেকেই দেখিয়াছেন, খুব কচি ছেলেকে পেট ভরিয়া দুধ খাওয়াইয়া দিলে, খানিক পরেই ঢুকুত্ ঢুকুত্ করিয়া হিক্কি তুলিতে থাকে; আর সেই সঙ্গে সঙ্গে দুধ-তোলার মত এক একটু দুধ তার কল্শা বয়ে পড়িতে থাকে। হিক্কির সঙ্গে সঙ্গে এ রকম দুধ-তোলা দেখিলে, বোধ হয়, দুধ যেন তার পেট থেকে উপ্‌চে পড়িতেছে। ফল কথা, যাতেই হোক্, পেট ভার হইলেই কচি ছেলেদের হিক্কি হয়। যদি অনেকক্ষণ থাকে, তবে হিক্কিতে তাদের বেশই কষ্ট হয়।

চিকিৎসা—ডিল্ ওআটর (য়্যাকোআ য়্যানিথাই) ছোট ছেলেদের হিক্কির খুব ভাল অসুদ। ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক করিয়া ডিল্ ওআটার উপ্‌রো-উপ্‌রি বার দুই তিন খাওয়াইয়া দিলে, হিক্কি শীঘ্রই বন্ধ হইয়া যায়। অনেক জায়গায় ডিল্ ওআটার এক বারের বেশী খাওয়াইতে হয় না। শিশুকে পেট ভরিয়া খাইতে দিবে না। দুধই

হোক্, য়্যারারুটই হোক্, আর সাগুই হোক্, যা খাইতে দিবে, তা যেন বেশ পরিষ্কার, পরিচ্ছন্ন, টাট্‌কা আর পাতলা হয়। ফল কথা, যা খাইতে দিবে, তাতে যেন তার পেট ভার না হইতে পারে।

সহজ হিক্কি অনেক সময় সহজেই থামাইতে পারা যায়। কথা বুঝিতে পারিয়া সেই রকম কাজ করিবার মত যদি রোগীর বয়স হয়, তবে তাকে খুব জোরে এক বার দীর্ঘ নিশ্বাস লইতে বলিয়া, তার পর খানিক ক্ষণ নিশ্বাস বন্ধ রাখিতে বলিবে। অনেক জায়গায় এই রকম এক বার করিতেই সহজ হিক্কি বন্ধ হইয়া যায়। এই রকম এক বার করিয়া যেখানে হিক্কি বন্ধ না হইবে, সেখানে দু তিন বার ঐ রকম করিতে বলিবে। দীর্ঘ নিশ্বাস যত জোরে লইতে পার, লইবে। তার পর, যত ক্ষণ পার নিশ্বাস বন্ধ রাখিবে। সহজ হিক্কি থামাইবার এ একটী খুব ভাল মুষ্টিযোগ।

উপর-পেট বেড়িয়া কোমর-বঁধ খুব কষিয়া বাঁধিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ হয়। কোমর-বঁধের বদলে পুরু রকম শক্ত চৌড়া ন্যাকড়া তিন চারি ফের করিয়া জড়াইলেও হইতে পারে।

নস্যি কি হাঁচুটি নাকে দিয়া উপ্‌রো-উপ্‌রি অনেক বার হাঁচিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ হয়।

হঠাৎ অন্যমনস্ক করিতে পারিলেও সহজ হিক্কি বন্ধ করিতে পারা যায়। মনে একটু ভয় হয়, লজ্জা হয়, ভাবনা হয়, হঠাৎ এমন কোন কথা জিজ্ঞাসা করিলেই

অন্যমনস্ক করিতে পারা যায়। অন্যমনস্ক যেই হয়, সেই-ই হিক্কি বন্ধ হইয়া যায়। আমার বেশ মনে আছে, ছেলে বেলা এক দিন সন্ধ্যাকালে মোল্লাহাটীর নীলকুটীতে গুরু-মহাশয়ের কাছে বসিয়া ডাক বলিতেছি; এমন সময় আমার হিক্কি উঠিতে আরম্ভ হইল। পাঁচ সাত দশ বার হিক্কি উঠিলে পর, গুরুমহাশয় আমাকে হঠাৎ জিজ্ঞাসা করিলেন, তুমি না কি আজ্ এক খান নীল বড়ি চুরি করিয়া আনিয়াছ? তাঁর এই রকম জিজ্ঞাসা-তেই আমার হিক্কি থামিয়া গেল। যিনি অন্যমনস্ক করিবেন, তাঁর একটু কৌশল খাটান চাই—আর গম্ভীর হইয়াও বলা চাই। যার হিক্কি হইতেছে, সে যদি জানিতে পারে যে, ইনি আমাকে উপহাস করিয়া বলিতেছেন, তবে সে অন্যমনস্কও হবে না—তার হিক্কিও বন্ধ হবে না।

অনেক জায়গায় সহজ হিক্কিও সহজে থামাইতে পারা যায় না। সে সব জায়গায় রোগীর পিঠের শির-দাঁড়ায় ওপিয়ম লিনিমেণ্ট নিয়ত মালিশ করিবে, আর সেই সঙ্গে সঙ্গে সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর খাইতে দিবে। ওপিয়ম লিনি-মেণ্টকে য়্যানোডাইন লিনিমেণ্ট বলে। এক এক বারে কত টুকু সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, ৯৬—৯৭র পাতে তা বলিছি। সল্‌ফিয়ুরিক ঈথরের মত হিক্কির ভাল অসুদ আর নাই, এ কথাও ৯৭র পাতে বলিছি। কখন কখন সহজ হিক্কিও দেখিতে দেখিতে গুরুতর হইয়া দাঁড়ায়। এ রকম ঘটিলে রোগীর উপর-

পেটে রাইয়ের পলস্তরা বসাইয়া দিবে। রাইয়ের পলস্তরায় যদি তেমন ফল পাওয়া না যায়, তবে তার উপর বেলস্তরার পটি লাগাইয়া দিবে। রাইয়ের পলস্তরা কি বেলস্তরার পটি বসাইতে হয়, সহজ হিক্কি এমন গুরুতর হইতে খুব কমই দেখা যায়।

অপাক থেকে যে হিক্কি হয়, তার চিকিৎসা একটু আলাদা। রোগী যা আহার করিয়াছে, তা পরিপাক হয় নাই, এ রকম পরিচয় পাইলে আধ পোআ গরম জলের সঙ্গে বিশ (২০) গ্রেন ইপেকাকুয়ানা (ইপেকা পাউডর—ইপেকার গুঁড়ো) খাওয়াইয়া বমি করাইয়া দিবে। কোষ্ঠবদ্ধ থাকে ত গরম জলের সঙ্গে আধ ছটাক খানেক ক্যাষ্টর অইল খাওয়াইয়া দিবে। রোগী যদি জোলাপ লইতে না চায়, তবে তিন পোআ গরম জলে সাবান গুলিয়া, সেই জলে এক ছটাক (দু ঔন্স) ক্যাষ্টর অইল আর আধ ছটাক (এক ঔন্স) তার্পিণ তেল দিয়া তার পিচ্‌কিরি দিবে। কোষ্ঠবদ্ধের কথা বলিবার সময় জোলাপ দেওয়ার কথা আর পিচ্‌কিরি দিবার কথা ভাল করিয়া বলিব। পেট ভার কমিলে আর কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচিয়া গেলে, আধ ছটাক পেপরমিণ্ট ওয়াটরের সঙ্গে বিশ (২০) ফোটা য়্যারোম্যাটিক স্পিরিট অব য়্যামোনিয়া মাঝে মাঝে খাইতে দিলে বিশেষ উপকার হয়। ১৫ গ্রেন করিয়া বিস্মথ মাঝে মাঝে খাইতে দিলেও বেশ ফল পাওয়া যায়।

গুল্মবায়ু (হিষ্টিরিয়া) থেকে যে হিক্কি হয়, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সে অসুদে সে হিক্কি সারে।

টিংচর য়্যাসাফিটিডা (হিঙের আরক)	...	৩ ড্রাম
টিংচর ব্যালীরিয়ান কো	... ...	৩ ড্রাম
সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর ...	... ...	৩ ড্রাম
ডিল ওয়াটর (য়্যাকোআ য়্যানিথাই)		৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। ৩।৪ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ খাইতে বলিবে। গুল্মবায়ুর (হিষ্টিরিয়ার) কথা এর পর বলিব।

আর এক রকম হিক্কি আছে ; ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টর্মিটেণ্ট হিকপ্ বলেন। বাঙ্গালায় তাকে সবিরাম হিক্কি বলা যাইতে পারে। সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরে) যেমন জ্বর ছাড়িয়া আবার জ্বর আসে, সবিরাম হিক্কিতে তেমনি হিক্কি থামিয়া আবার হিক্কি হয়। কুইনাইন আর শেঁকো (আর্সেনিক) সবিরাম-জ্বরের যেমন অসুদ, সবিরাম-হিক্কিরও তেমনি অসুদ। সবিরাম-জ্বরে জ্বর ছাড়িলে কুইনাইন কি শেঁকো খাওয়াইতে হয়, সবিরাম হিক্কিতে হিক্কি থামিলে কুইনাইন কি শেঁকো খাওয়াইতে হয়। একষ্ট্রাক্ট অব জেনশনের সঙ্গে ৫ গ্রেন কুইনাইনের এক একটী বড়ি তয়ের করিবে। যে হিক্কি থামিবে, সেই এই বড়ি একটী খাইতে বলিবে। আবার হিক্কি ফিরে আসিবার ঘণ্টা খানেক আগে আর একটী বড়ি খাইতে দিবে। কুইনাইনের বড়ি এই রকম নিয়ম করিয়া খাইলে সবিরাম হিক্কি শীঘ্রই ভাল হইয়া যায়। শেঁকোর কথা ১০৭—১১৪র পাত।

রোগের হিক্কি—রোগের হিক্কির কথা এখানে আলাদা করিয়া আর কি বলিব? বার (১২) বছরেরও বেশী হইল, স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) একটী রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। তার হিক্‌কি থামাইবার জন্যে যে সব অসুদ দিইছিলাম, নীচে তা লিখিয়া দিলাম। সেই সঙ্গে রোগীর পরিচয়ও কিছু দিলাম। রোগীর বয়স চল্লিশ বছরের কম নয়। শরীর তুর্ব্বল আর কাহিল। জ্বরের আট দিনের দিন হিক্‌কি আরম্ভ হয়। হিক্‌কি আরম্ভ হওয়ার পর পাঁচ দিনের দিন আমি রোগীকে দেখিতে যাই। গিয়া দেখিলাম হিক্‌কির জন্যে রোগী যার নাই কষ্ট পাইতেছে। তার পর, তার সব শরীর বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। যকৃতের (লিবরের) জায়গায় ব্যথা ছাড়া, তার আর কোনও অসুখের পরিচয় পাইলাম না। ডাইন কোঁকে আঙুলের ঘা দিয়া যকৃতের জায়গায় ব্যথা কেমন করিয়া ঠিক্ করিতে হয়, ৯১—৯২র পাতে আর ১০৫ পাতে তা বলিছি। যকৃতের জায়গায় এ রকম ব্যথায় কিসের পরিচয় পাওয়া যায়? যকৃতে রক্ত জমিলে যকৃতের জায়গায় এ রকম ব্যথা হয়। গায়ের তাত প্রায় সহজ। জিব বেশ পরিষ্কার আর সরস। কেবল নাড়ীর বেগ সহজ বেলার চেয়ে ঢের বেশী। নাড়ীর এ রকম বেগের কারণ, কি স্থির করিলাম? এ রকম হিক্কিতে তেমন তুর্ব্বল রোগীর নাড়ী কি কখনও স্থির থাকিতে পারে? কখনই না।

হিক্কি থামাইবার জন্যে—

ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্ক	...	...	২৪ গ্রেন্
এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডনা	...	...	৩ গ্রেন্
এক্‌ষ্ট্রাক্ট জেনশন্	...		যত টুকু দরকার

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টী বড়ি তয়ের করন। যত ক্ষণ হিক্কি না থামিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক একটী বড়ি খাইতে বলিলাম।

যকৃতে রক্ত-জমা ঘুচাইবার জন্যে।

রোগীর যকৃতের জায়গায় বেলস্তরার পটি (এমপ্লাষ্ট্রম লিটি) এমন জুত বরাত করিয়া বসাইতে বলিলাম যে, বেলস্তরার খানিকটে যেন উপর-পেটে আসিয়া পড়ে। উপর-পেটে বেলস্তরার খানিকটে আসিয়া পড়িলে যকৃতের ভিতর রক্ত-জমা ঘুচে যাওয়ার সঙ্গে সঙ্গে পেটের যে কিছু উদ্দীপনা, তাও দূর হইয়া যায়। পেটের উদ্দীপনা গেলে হিক্‌কি শীঘ্রই থামিয়া যায়। এই জন্যে, যকৃতের জায়গায় অমন জুত বরাত করিয়া বেলস্তরার পটি বসাইতে বলিলাম।

ঐ রকম জুত বরাত করিয়া বেলস্তরার পটি বসান হইলে, আর চারিটী বড়ি খাওয়া হইলে পর হিক্‌কি বন্ধ হইল। হিক্‌কিতে রোগী এতই কষ্ট পাইয়াছিল যে, হিক্কি থামিয়া গেলে সে ভয়ে ভয়ে তার পরও আর দুটি বড়ি খাইয়াছিল।

হিক্‌কিতে রোগীর বড়ই কষ্ট হয়। হিক্কির রোগীকে দেখিলেও কষ্ট হয়। খুব শক্ত রোগে হিক্‌কি উপসর্গ ঘটিলে, রোগীকে প্রায়ই বাঁচাইতে পারা যায় না। এ ছাড়া, হিক্‌কি উপসর্গ হইলে সোজা রোগও বাঁকা হইয়া দাঁড়ায়।

তাতেই বলিছি, হিক্কিকে কোন মতেই সোজা মনে করিবে না। কোন রোগের উপসর্গের চিকিৎসা করিতে হইলে, আসল রোগের আর উপসর্গের দুয়েরই চিকিৎসা এক সঙ্গেই করা চাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। বেলাডনা আর ব্যালেরিয়্যানেট অব জিঙ্ক হিক্কির খুব ভাল অসুদ। কোন রোগে হিক্কি উপসর্গ ঘটিলে, এ দুটী অসুদ দিতে কখনও ভুলিও না। এই দুই অসুদে অনেক জায়গায় আমি খুব শক্ত শক্ত হিক্কিও ভাল করিছি। সোজাসুজি হিক্কি শুদু মুষ্টিযোগেই সারে। যেখানে মুষ্টিযোগে হিক্কি না সারিবে, সেখানে বেলাডনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের কথা যেন মনে থাকে। হিক্কির চিকিৎসার সঙ্গে সঙ্গে, রোগীকে সবল রাখিবার জন্যে বিশেষ তদ্বির বিধি মতে করিতে চাও। দুর্ব্বল রোগীকে সবল করিবার যেমন অসুদ দুধ, মাংসের ক্কাথ আর একের নম্বর ব্রাণ্ডি, তেমন অসুদ আর নাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

বছর আষ্টেক হইল, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের একটী রোগীর চিকিৎসা করিছিলাম। গোড়ায় দস্তুর মত ভাল চিকিৎসা না হইলে, স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) শেষে বাত-শ্লেষ্ম বিকারে গিয়া দাঁড়ায়। বাতশ্লেষ্ম-বিকারকে আমাদের ডাক্তরেরা টাইফয়িড্ ফীবর বলেন। এখানে আমরা টাইফয়িড ফীবর তয়ের করি। ১৪০—১৪২র পাতে এ সব কথা বলিছি। তার পর বলি। রোগীর বয়স ৬০ বছরের কম নয়। স্বল্পবিরাম জ্বর খুব শক্ত হইয়া দাঁড়া-

হলে, সচরাচর রোগীর যে অবস্থা হইয়া থাকে, এ রোগীটার সে অবস্থা ত হইছিলই, বাড়তির ভাগ, তার আর একটী ভয়ানক উপসর্গ ঘটিছিল। উপসর্গও আবার যে সে নয়; হিক্‌কি—যমের ভগিনী। হিক্‌কি দু রকম। এক এক বারে এক একটী, আর জোড়ায় জোড়ায়। এক এক বারে এক একটী হিক্‌কির চেয়ে জোড়ায় জোড়ায় হিক্‌কি ঢের শক্ত। এ রোগিটীর জোড়ায় জোড়ায় হিক্‌কি হই-ছিল। এর আসল রোগের চিকিৎসা আর হিক্‌কির চিকিৎসা, দুই চিকিৎসাই এক সঙ্গে করিছিলাম। যকৃতের জায়গায় আর উপর-পেটে বেলস্তরার পটি বসাইয়া বেলা-ডনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের ঐ বড়ি দু ঘণ্টা অন্তর খাইতে দিইছিলাম। এতে হিক্‌কি সন্থ সারিবার কথা। কিন্তু দু দিনেও হিক্‌কি বিশেষ নরম পড়ে নাই; এই জন্যে, তাকে সল্‌ফিয়ুরিক ঈথরও নিয়ম মত খাইতে দিইছিলাম। ঐ বড়ি আর সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর নিয়ম করিয়া খাইয়া তার যে তেমন হিক্‌কি, তাও তিন চারি দিনে ভাল হইয়া গিইছিল। এ রোগীটার এত উপসর্গ ঘটিছিল যে, বলিতে গেলে তাঁর কেবল বজ্রাঘাত বাকী ছিল। কত টুকু সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর, কি নিয়মে খাওয়াইতে হয়, ৯৬—৯৭র পাতে তা মোটামুটি এক রকম বলিছি। সল্‌ফিয়ুরিক ঈথ-রের মত হিক্‌কির ভাল অসুদ আর নাই, এ কথাও ৯৭র পাতে বলিছি।

সল্‌ফিয়ুরিক ঈথরের বিশেষ গুণ এই যে, খাইবা মাত্র হিক্‌কি বন্ধ হয়। হিক্‌কি একবারে বন্ধ হয় না; খানিক

পরে আবার হয়। আবার সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর পেটে যে পড়ে, সেই হিক্‌কি বন্ধ হয়। এই রকম করিয়া বারে বারে সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর খাইতে খাইতে শেষে হিক্‌কি একবারেই বন্ধ হইয়া যায়। তাতেই বলিতেছি, যেখানে শুদু মুষ্টি-যোগে, কি বেলাডনা আর ব্যালিরিয়্যানেট অব জিঙ্কের ঐ বড়িতে হিক্‌কি বন্ধ না হবে, সেখানে ঐ বড়ি আর সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া হিক্‌কি বন্ধ করিবে। হিক্‌কি যত বার হবে, সল্‌ফিয়ুরিক্ ঈথরও তত বার খাওয়াইবে। যতক্ষণ হিক্‌কি একবারে বন্ধ হইয়া না যাবে, ততক্ষণ এই নিয়ম করিয়া সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর খাওয়াইবে। এতে হিক্‌কি বন্ধ করিতে যদি দু তিন দিনও লাগে, তাতেও হানি নাই। কেন না, সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর খাওয়ার পর থেকে, রোগীর হিক্‌কির জন্যে যে কষ্ট, তা থাকে না বলিলেই হয়। সল্‌ফিয়ুরিক ঈথরে হিক্‌কি থাকিতেই দেয় না। কাজেই, হিক্‌কির জন্যে যে কষ্ট, রোগীকে তা ভোগ করিতে হয় না বলিলেই হয়। সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর খাওয়ানর প্রায় সঙ্গে সঙ্গেই হিক্‌কি বন্ধ হয়। আবার ও খাওয়াইতে খাওয়াইতে হিক্‌কি ক্রমে খুব তফাত তফাত হইতে থাকে, শেষে একবারেই বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া, বারে বারে সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর খাইয়া খুব অবসন্ন রোগীও চাঙ্গা হইয়া উঠে। কেন না, সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর একটী খুব ভাল উত্তেজক অস্থুদ। উত্তেজক অস্থুদকে ডাক্তরেরা ষ্টিমুলেণ্ট বলেন। উত্তেজক অস্থুদের কথা ৮৭—৮৯র পাতে বলিছি। তাতেই বলি সল্‌ফিয়ুরিক

ঔথরের মত হিক্কির ভাল অসুদ আর নাই। তার পর এখন হিক্কির গুটি কতক মুষ্টিযোগের কথা বলি।

হিক্কির মুষ্টিযোগ—সহজ হিক্কির মুষ্টিযোগের কথা ত এর আগেই বলিছি। সামান্য হিক্কিরও মুষ্টিযোগ অনেক। হিক্কি থামাইবার জন্যে অনেকে অনেক রকম মুষ্টিযোগের কথা বলিয়া থাকেন। আমি যে কয়টী মুষ্টি-যোগ জানি, এখানে কেবল সেই কয়টীরই কথা বলিলাম।

(১) একটু দোক্তা তামাক আর একটু কর্পূর একত্র মিশাইয়া কল্‌কেতে সাজিয়া টানিলে সামান্য হিক্কি তখনই বন্ধ হয়।

(২) ছুঁচ দিয়া বিঁধিয়া একটা গোল-মরিচ প্রদীপের শিশে পোড়াইয়া তার ধোঁআ নাকে টানিলে সামান্য হিক্কি বন্ধ হয়।

(৩) শুক্‌নো হলুদ ভাঙিয়া কল্‌কেতে সাজিয়া টানিলে শক্ত হিক্কিও তখনই বন্ধ হয়।

(৪) আনারসের পাতার রস আধ ছটাক, একটু চিনির সঙ্গে মিশাইয়া উপ্‌রো উপ্‌রি কয় বার খাইলে সামান্য হিক্কি বন্ধ হয়। কৃমি থেকে যে হিক্কি হয়, এতে সে হিক্কিও বন্ধ হয়।

(৫) কুলের আঁটির শাঁস আর মধু একত্র মিশাইয়া মাঝে মাঝে চাটিয়া খাইলে, সামান্য হিক্কি বন্ধ হয়। চাটিয়া খাইবার অসুদকে বৈদ্যরা অবলেহ বলেন; ডাক্তা-রেরা ইলেক্‌চুয়ারি বলেন।

জুত বরাত করিয়া খাটাইতে পারিলে, এ সব মুষ্টিযোগে

অনেক জায়গায় বেশ ফল পাওয়া যায়। সহজ কি সামান্য হিক্কি মুষ্টিযোগেই সারে।

ক্রিমি——১৯৮—১৯৯র পাতে স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) যে ১৮ রকম উপসর্গের নাম করিছি, ক্রিমি তার মধ্যে ধরি নাই। কিন্তু ক্রিমি কম উপসর্গ নয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরের চিকিৎসায় অনেক জায়গায় ক্রিমি উপসর্গ লইয়া চিকিৎসককে একবারে ব্যতিব্যস্ত হইতে হয়। এ ছাড়া, ক্রিমি উপসর্গ ঘটিলে গা ন্যাকার-ন্যাকার, অকি, কাঠ-বমি, কি হিক্কি প্রায়ই হইয়া থাকে। এই জন্যে, বমি আর হিক্কির পরই ক্রিমির কথা বলিলাম।

অন্ত্রের মধ্যে ৫। ৬ রকম ক্রিমি থাকে। কিন্তু আমাদের দেশে সচরাচর কেবল দু রকম ক্রিমি দেখিতে পাওয়া যায়। (১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা এক রকম ক্রিমি। এ ক্রিমি দেখিতেও কেঁচোর মত। আর (২) সূতর মত সরু ছোট ছোট এক রকম ক্রিমি। মানুষের শরীরে এই দু রকম ক্রিমিই বেশীর ভাগ দেখিতে পাওয়া যায়। কেঁচোর মত ক্রিমিকে ডাক্তরেরা রাউণ্ড ওয়র্ম্ম বলেন। সূতর মত সরু ছোট ছোট ক্রিমিকে তাঁরা স্মল্ থ্রেড্ ওয়র্ম্ম বলেন। এখন এই দু রকম ক্রিমির কথা এক এক করিয়া বলি।

(১) কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা ক্রিমি—এ ক্রিমি ছেলেদের বেশী হইয়া থাকে। শরীরে বল হয়, শরীর বেশ সুস্থ থাকে, এমন আহারের অভাবে যে সব ছেলে পিলে যা পায়, তাই খায়, এ ক্রিমি তাদের যত বেশী হয়, আর আর ছেলে পিলের তত নয়। আকার প্রকারে কেঁচোর

সঙ্গে এ কৃমির ঢের মিল দেখা যায়। কেঁচো যেমন লম্বা আর মোটা, এ কৃমিও তেমনি লম্বা আর মোটা। কেঁচোর শরীর যেমন গোল, এ কৃমিরও শরীর তেমনি গোল। কেঁচোর দু মুখ যেমন সরু আর ছুঁচ্‌লো, এ কৃমিরও দু মুখ তেমনি সরু আর ছুঁচ্‌লো। কেঁচোর মত লম্বা আর মোটা কৃমি—এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে সোজাসুজি কেঁচো-কৃমি বলিব। সব কৃমি সমান লম্বা নয়। যে কৃমি গুলি সব চেয়ে ছোট, সে গুলি ৯ আঙুলের বেশী লম্বা নয়। আবার যে গুলি সব চেয়ে বড়, সে গুলি ১৫। ১৬ আঙুলের কম লম্বা নয়। কেঁচো-কৃমির রং ফিঁকে জর্দ্দা। কৃমি গুলি পেনের কলমের মত মোটা। মেয়ে কৃমি গুলি পুরুষ কৃমির চেয়ে বড়। আবার পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের বেশী। কেঁচো-কৃমি ছোট অন্ত্রেই থাকে। কিন্তু সময় সময় উপর দিকে উঠিয়া যায়, আর একবারে পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর গিয়া উপস্থিত হয়। সেই রকম করিয়া আবার বড় অন্ত্রেরও ভিতর নামিয়া আসে। এই জন্যে, কৃমি মুখ দিয়াও উঠিতে পারে, আবার গুহ্যদ্বার দিয়াও বাহির হইয়া যাইতে পারে। সোজা কথায়, কৃমি বমিও হইতে পারে; কৃমি বাহ্যেরও সঙ্গে বাহির হইতে পারে। কখন কখন অন্ত্রের ভিতর কেবল একটী কৃমি থাকে। কিন্তু সচরাচর এ রকম ঘটে না। দুটী, পাঁচটী, দশটী, বিশটী একত্র থাকেই। কখন কখন একবারে দেড় শ দু শরও বেশী কৃমি একত্রে থাকে। বছর চারি পাঁচ হইল, আমি একটী সাহেবের মেয়ের কৃমির

চিকিৎসা করিছিলাম। মেয়েটীর বয়স ৮। ৯ বছরের বেশী নয়। আমি শুনিছিলাম, অস্থদ খাইয়া এক হপ্তার মধ্যে তার ১৬৬টী কৃমি বাহ্যের সঙ্গে বাহির হইছিল। তার পেটে আর কৃমি ছিল কি না, তখন তা ঠিক্ করিতে পারি নাই। তার পর জানিতে পারিলাম, তার পেটে আরও কৃমি ছিল। মাঝে মাঝে দুটো পাঁচটা করিয়া কৃমি তার বাহ্যের সঙ্গে বাহির হইত। জর্ম্মণি দেশের এক জন ডাক্তর শুণিয়াছিলেন, একটা মেয়ে-কৃমির পেটে ছ কোটি চল্লিশ লক্ষ (৬,৪০,০০০০০) ডিম ছিল।

লক্ষণ——এ কৃমির লক্ষণ সচরাচর বেশ স্পষ্ট জানিতে পারা যায় না। তবে যার পেটে এ কৃমি আছে, বেশ ঠাউরে দেখিলে, জানিতে পারিবে যে, তার পিপাসা হয়; রাত্রে ভাল ঘুম হয় না; ঘুমাইয়া নানা রকম স্বপ্ন দেখে; ঘুমাইয়া দাঁত কিড়মিড় করে, সর্ব্বদা বিমর্ষ থাকে, তার মুখের রং ফ্যাকাশে হইয়া যায়, মুখে দুর্গন্ধ হয়, পেট্‌টা উচু উচু হয়, হাত পা সরু সরু হয়, খিদে বা খাইবার ইচ্ছা এক দিন এক রকম থাকে না; কোন দিন খুব খিদে হয়, কোন দিন খিদে মোটেই থাকে না, কোন দিন আহারে বেশ রুচি হয়, কোন দিন রুচি মোটেই থাকে না, মলের সঙ্গে আম নির্গত হয়; নাক চুল্‌কোয়, নাক খোঁটরায়, বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয়; আর গুহ্যদ্বারের কেমন এক রকম অসুখ অসুখ হয়। এ রকম অসুককে উদ্দীপনা বলিতে পার। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, ৪৪২র পাতে তা বলিছি। অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকাই যে গুহ্য-

দ্বারের এ রকম উদ্দীপনার কারণ, তা কি আর বলিতে হবে? এ ছাড়া, পেট-ব্যথা করা, পেটের কামড়, পেটে কৃমি থাকার আর একটী লক্ষণ। পেটে কৃমি থাকার লক্ষণ যতই কেন জড়ো কর না, মলের সঙ্গে কৃমি বাহির হওয়াই পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ন—এ কথাটা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

চিকিৎসা——এ কৃমির চিকিৎসা খুব সোজা। স্যাণ্টোনীন এ কৃমির ব্রহ্মাস্ত্র। স্যাণ্টোনীন গাছড়া অসুদ। সিংকোনা গাছের ছাল থেকে যেমন কুইনাইন তয়ের হয়, স্যাণ্টোনাইকা গাছের ফুল থেকে তেমনি স্যাণ্টোনীন তয়ের হয়। স্যাণ্টোনীন চক্-চকে শাদা গুঁড়ো; দেখিতে ঠিক্ যেন কাচ গুঁড়োন। স্যাণ্টোনীনের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। স্যাণ্টোনীনের মাত্রা ২ গ্রেন থেকে ৬ গ্রেন। কতটুকু স্যাণ্টোনীন কি রকম করিয়া খাওয়াইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

স্যাণ্টোনীন	...	...	৫ গ্রেন।
ভাল চিনি	...	...	১৫ গ্রেন।

একত্র মিশাইয়া একটী পুরিয়া তয়ের কর।

এই রকম হিসাব করিয়া যতগুলি ইচ্ছা, তত গুলি পুরিয়া তয়ের করিতে পার। সকাল বেলা ১টা পুরিয়া, দুপর বেলা ১টা পুরিয়া, আর রাত্রে শুইবার সময় ১টা পুরিয়া, তিন বারে ৩টা পুরিয়া খাইতে দিবে। তার পর দিন সকালে ছটাক খানেক খুব গরম দুধের সঙ্গে আধ ছটাক (এক ঔন্স) ক্যাষ্টর অইল খাইতে বলিবে।

জোলাপ লওয়ার পর রোগী যত বার বাহ্যে যাবে, তত বার তাকে মল পরীক্ষা করিয়া দেখিতে বলিবে। কত গুলি কৃমি বাহির হইয়া যায়, সে যেন তা ঠিক্ করিয়া রাখে। কেন না, চিকিৎসকের কাছে রোগীর এ সব ঠিক করিয়া বলা চাই। যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে স্যাণ্টোনীনের আর ৩টা পুরিয়া রোগীকে ঐ রকম করিয়া খাইতে দিবে। ক্যাষ্টর অইলের জোলাপও সেই নিয়মে আবার দিবে। এ বারেও বাহ্যের সঙ্গে কত গুলি কৃমি বাহির হয়, রোগীকে তা ঠিক্ করিয়া রাখিতে বলিবে। নিয়ম মত স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া খাইয়া, আর ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইয়া যেবারে, কৃমি বাহির না হবে, সেবারেই ঠিক করিবে, পেটে কৃমি আর নাই। এক দিনে উপ্রো-উপ্রি তিন মাত্রার বেশী স্যাণ্টোনীন কখনও দিবে না। রাত্রে শুইবার সময় শেষ মাত্রা দিবে। আর তার পর দিন সকাল বেলা ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে। যে দিন জোলাপ দিবে, তার চারি দিন পরে স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া আবার দিবে। চারি দিনের আগে আর দিবে না। কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় রোগীকে স্যাণ্টোনীন খাওয়াইবার এ নিয়মটী কখনও ভুলিও না। যত খানি স্যাণ্টোনীন, তার তিন গুণ চিনি মিশাইয়া স্যাণ্টোনীনের পুরিয়া তয়ের করিতে হয়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে। খালি পেটে স্যাণ্টোনীন খাইতে হয়। কৃমির প্রায় সব অসুদই খালি পেটে খাইতে হয়।

স্যাণ্টোনীন নিজে জোলাপ নয়। এই জন্যে, খুব

ছোট ছেলেকেও স্যাণ্টোনীন নির্ব্বিঘ্নে দিতে পারা যায়। চারি বছরের ছোট ছেলেকে এক এক বারে ২ গ্রেন করিয়া স্যাণ্টোনীন্ খাওয়াইতে পার। ডিস্পেন্সরিতে আর অসু্-দের দোকানে বন্-বন্ বলিয়া কৃমির এক রকম অসুদ বিক্রি হয়। এক এক খান বন্-বনে এক্ গ্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ (⅓ গ্রেন) স্যাণ্টোনীন আছে। ৬ মাসের ছেলেকে এক খান বন্-বন্ একবারে খাওয়াইতে পার। ছেলের বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া বন্-বন্ দিবে।

স্যাণ্টোনীন খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। জীয়ন্ত বাহির হয় না কেন? স্যাণ্টোনীন যে কেঁচো-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। সে বিষের তেজে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত থাকিতে পারে না।

স্যাণ্টোনীন বারে বারে খাওয়াইলে রোগী সব জিনিশ হল্‌দে দেখে। চিকিৎসকদের এটা জানিয়া রাখা ভাল। নৈলে, রোগী আপনার ভয় ঘুচাইতে আসিয়া, চিকিৎসক-কেই ভয় দেখাইয়া যাইতে পারে। স্যাণ্টোনীন খাইলে প্রস্রাবেরও রং কেমন এক রকম হল্‌দে হল্‌দে হয়।

তার্পিণ তৈল কেঁচো-কৃমির আর একটী খুব ভাল অসুদ। তার্পিণ তেলও কেঁচো-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। কেন না, তার্পিণ তেল খাইলে কেঁচো-কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। জোআন রোগীদের পক্ষে তার্পিণ তেলের মাত্রা ৪ ড্রাম (এক কাঁচ্চা)। তার্পিণ তেল, আহারের পর ২। ৩ ঘণ্টা বাদে খাইতে হয়, খালি পেটে খাইতে নাই; খালি পেটে খাইলে বমি হইতে পারে—বমি হইয়াও থাকে।

ঠাণ্ডা দুধ তার্পিণ তেলের বেশ অনুপান। এই জন্যে, যখন তার্পিণ তেল খাইতে দিবে, ছটাক খানেক ঠাণ্ডা দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দিবে। তার্পিণ তেল খাওয়ার পর রোগীকে চলা ফেরা করিতে বারণ করিয়া দিবে। তার্পিণ তেল খাইয়া রোগী চুপ করিয়া শুইয়া থাকিলে, তার গা ন্যাকার-ন্যাকারও করে না, বমিও হয় না। কম মাত্রার চেয়ে, তার্পিণ তেল বেশী মাত্রায় খাওয়া ভাল। কম মাত্রায় খাইলে প্রস্রাবের যাতনা হয়—প্রস্রাব করিতে কষ্ট হয়—ফোটা ফোটা করিয়া প্রস্রাব হয়, আর সেই সঙ্গে জ্বালা যন্ত্রণা হয়। কেঁচো-কৃমির চিকিৎসায় রোগীকে তার্পিণ তেল খাওয়াইবার এ নিয়মটা কখনও ভুলিও না।

আল্‌কুশি-ফলের গায়ের শুঁও (লোম) কেঁচো-কৃমির আর একটা ভাল অস্বুদ। এই শুঁও ১০ গ্রেন, একটু মধুর সঙ্গে মিশাইয়া বড়ি তয়ের করিয়া রোগীকে খাইতে দিবে। রোজ রাত্রে শুইবার সময় সে এই বড়ি এক একটা খাইবে। উপ্‌রো-উপ্‌রি তিন দিনের বেশী এ বড়ি খাইবার দরকার নাই। বড়ি খাইতে আরম্ভ করার আগে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইবে, আর বড়ি খাওয়া শেষ হইলে ঐ জোলাপ আর এক বার লইবে। আল্‌কুশি-ফলের শুঁও গায়ে লাগিলে গা কি রকম চুল্‌কোয়, চুল্‌কে চুল্‌কে গায়ের কি রকম দুর্দ্দশা হয়, আমাদের দেশের ছেলে, বুড়ো, জোআনের তা জানিতে বাকী নাই। অন্ত্রের ভিতর কৃমিদেরও ঐ রকম দুর্দ্দশা হয়; ঐ রকম দুর্দ্দশা হইলে অন্ত্রের ভিতর তারা আর থাকিতে পারে না; বাহির হইয়া আসে। এ অস্বুদ খাইবার

আগে জোলাপ লইবার মানে কি? মানে আর কি? জোলাপে অন্ত্র বেশ ছাপ হইয়া গেলে, আল্‌কুশি-ফলের শুঁও কৃমির গায়ে বিঁধিবার বেশ সুবিধা হয়।

সূতর মত সরু ছোট ছোট কৃমি——সচরাচর লোকে একেই কৃমির ছা বলিয়া থাকে। ডাক্তরেরা এ কৃমিকে স্মল্ থ্রেড্ ওয়র্ম্ম বলেন। সূতর মত সরু ছোট ছোট কৃমি এত গুলি কথা বারে বারে না বলিয়া, এখন থেকে ছোট—সূত-কৃমি বলিব। মলের নাড়ী (রেক্টম্) আর গুহ্যদ্বারের কাছে, এই দুই জায়গাতেই এ কৃমি বেশীর ভাগ থাকে। অন্ত্রের ভিতর যত রকম কৃমি থাকে, সব চেয়ে এই কৃমি ছোট। এক একটী কৃমি লম্বায় এক আঙুলের তিন ভাগের এক ভাগের বেশী নয়। পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি গুলি বড়। আবার পুরুষ কৃমির চেয়ে মেয়ে কৃমি ঢের বেশী। ছেলেদেরই এ কৃমি বেশীর ভাগ হয়। এ কৃমির হাত একবারে এড়ান সোজা নয়। এ কৃমি কখনও এক আধটী এক জায়গায় থাকে না। যেখানে থাকে, সেখানে একবারে দলে দলে, রাশি রাশি থাকে।

লক্ষণ—গুহ্যদ্বার ভারি চুল্‌কোয়, আর গুহ্যদ্বারের খুব উদ্দীপনা হয়। উদ্দীপনা কি—উদ্দীপনা কাকে বলে, এর আগে অনেক বার বলিছি। বারে বারে বাহ্যের চেষ্টা হয়। খিদে কোন দিন বা বেশী হয়, কোন দিন বা কম হয়, কোন দিন বা মোটেই হয় না। রোগী নাক খোঁটে। তার মুখে দুর্গন্ধ হয়। আর রাত্রে ভাল ঘুমোয় না। এ কৃমি থেকে গুরুতর ব্যাপার কখনও ঘটে না, বলিলেই হয়।

তবে ক্বচিৎ কখনও ঘটে। গুরুতর ব্যাপার আর কি ? তড়্কা, ঘাড়-কাঁপা, মৃগির মত খেঁচুনি, আর প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতির ভারি রকম উদ্দীপনা। ঘাড়-কাঁপাকে ডাক্তরেরা কোরিয়া বলেন। কোরিয়ার কথা এর পর বলিব। কেঁচো-কৃমি থেকেই গুরুতর ব্যাপার বেশী ঘটে।

এ কৃমি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া ছোট ছোট মেয়েদের যোনির ভিতর যাইতে পারে—গিয়াও থাকে। যোনির ভিতর গেলে যোনির উদ্দীপনা ঘটে। সেই উদ্দীপনা থেকে তাদের ধাতের ব্যামো হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মেয়েদের ধাতের ব্যামোকে ডাক্তরেরা লিয়ুকোরিয়া বলেন। লিয়ুকোরিয়াকে ভাল বাঙ্গালায় শ্বেতপ্রদর বলে।

এই কৃমি গুহ্যদ্বারের কাছাকাছি জায়গায় থাকে বলিয়া জোআন রোগীদেরও প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতির ভারি রকম উদ্দীপনা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। জোআন রোগী-দের প্রস্রাবের দুওর প্রভৃতির এ রকম উদ্দীপনা হইলে, সময় সময় তাদের আপনা হইতেই বীর্য্য নির্গত হয়।

বছর খানেকেরও বেশী হইল, আমার কাছে একটী রোগী আসিয়াছিল। তার বয়স ত্রিশ বছরের বেশী নয়। শরীর বেশ হৃষ্ট পুষ্ট আর খুব সবল। দেখিয়া তার কোনও রোগ আছে, এমন বোধ হইল না। ছোট ছোট কৃমির জ্বালায় আমি কোন খানে এক দণ্ডও স্থির হইয়া বসিয়া থাকিতে পারি না। গুহ্যদ্বার নিয়ত এমনি চুলকোয় যে,

পাঁচ জন লোকের মাঝখানে আমার বসিবার যো নাই। গুহ্যদ্বারে সময় সময় এত কৃমি এসে জমা হয় যে, দুটী আঙুল দিয়া চিম্‌টে আনিলে এক এক বারে এক শ দেড় শ কৃমি বাহির হইয়া আসে। বাহ্যের সঙ্গে এত কৃমি বাহির হয় যে, কৃমির জন্যে মল মোটে দেখাই যায় না। কৃমিতে মল একবারে ছাওয়া থাকে। আপনার রোগের কথা সে এই রকম করিয়া বলিল। এ কৃমির জন্যে, জোআন রোগীদের এ রকম অস্বস্তি বড় সাধারণ নয়। সাধারণ নয় বলিয়াই এখানে এ রোগীটীর কথা বলিলাম। এখন এ কৃমির চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——শুদু ঠাণ্ডা জল পিচকিরি করিয়া দিলেই এ কৃমি মরিয়া যায়। ইনফিয়ুশন কোআশিয়া পিচকিরি করিয়া দিলেও এ কৃমি মরে। ইনফিয়ুশন্ কোআশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, এ কৃমি খুব শীঘ্র মরে। লবণের সঙ্গে মিশাইয়া যবের মণ্ড (বার্লি-ওয়াটর) পিচকিরি করিয়া দিলেও এ কৃমি খুব শীঘ্র মরে। চূণের জলের পিচকিরিতেও এ কৃমি মরে।

ইন্‌ফিয়ুশন্ কোআশিয়া এক এক বারে ৮ ঔন্স পিচ্‌কিরি করিতে পার।

ইন্‌ফিয়ুশন্ কোআশিয়ার সঙ্গে মিশাইয়া যদি টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস পিচ্‌কিরি করিতে চাও, তবে ৮ ঔন্স ইন্‌ফিয়ুশন কোআআশিয়ার সঙ্গে ১ ড্রাম টিংচর ফেরিমিয়ু-রিয়েটিস্ মিশাইয়া পিচ্‌কিরি দিবে।

যবের মণ্ড দেড় পোআ আর লবণ আধ ছটাক একত্র মিশাইয়া তার পিচ্‌কিরি দিবে।

চূণের জল এক এক বারে ৫। ৬ ঔন্স পিচ্‌কিরি করিতে পার।

আধ ছটাক (এক ঔন্স) ঠাণ্ডা জলে ১৫ মিনিম্ সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর দিয়া, সেই জল পিচ্‌কিরি করিয়া দিলেও এ কৃমি শীঘ্র মরিয়া যায়। এক এক মিনিম্ প্রায় দু ফোটা হবে। মিনিম্ আর ফোটার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় বলিব।

জোআন রোগীদের এ কৃমির চিকিৎসায় এক এক বারে তিন পোআ ঠাণ্ডা জলের সঙ্গে এক কাঁচ্চা (৪ ড্রাম) টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস্ মিশাইয়া পিচ্‌কিরি দিবে।

টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস-মিশনো জল গায়ে লাগিলে এ কৃমি সব একবারে দলাশলা হইয়া এক এক জায়গায় আলাদা আলাদা জমাট বাঁধিয়া যায়। শুদু টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিসেই যে এ রকম হয়, তা নয় ; লবণেতেও হয়, ইন্‌ফিয়ুশন্ কোআশিয়াতেও হয় ; চূণের জলেতেও হয়। মেটিরিয়া মেডিকায় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব।

ঐ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিয়া ছোট সূত-কৃমি মারিয়া ফেলা খুবই সহজ বটে। কিন্তু এ কৃমির হাত একবারে এড়ান সোজা নয়। সোজা নয় কেন ? কেন, তা এক কথায় বলিয়া দিতেছি। এ কৃমি যদি কেবল মলের নাড়ীতেই (রেক্টমেই) থাকিত, তবে সহজেই এ কৃমির হাত এড়াইতে পারা যাইত। এ কৃমি মলের নাড়ী-

তেও থাকে, মলের নাড়ীর ঢের উপরেও থাকে। মলের নাড়ীতে যেমন থাকে আর ছা করে। মলের নাড়ীর ঢের উপরেও তেমনি থাকে আর ছা করে। এই জন্যে, অসুদ পিচ্‌কিরি করিয়া দিলে, মলের নাড়ীতে যে সব কৃমি থাকে, কেবল সেই সব কৃমিই মরিয়া যায়। পিচ্‌কিরির জল তার উপরে যায় না বলিয়া, উপরকার কৃমি সব যেমন তেমনিই থাকে ; তাদের কিছুই হয় না। কাজেই, মলের নাড়ীর কৃমি গুলি মরিয়া যায় বলিয়া রোগী দিন কতক একটু ভাল থাকে—একটু স্বস্তি পায়। তার পর, উপরকার কৃমি গুলি মলের নাড়ীতে নামিয়া আসিলে, রোগীর যে অস্বস্তি, আরার সেই অস্বস্তি আসিয়া উপস্থিত হয়। বারে বারে এ রকম হইতে থাকিলে, অসুদ বিসুদে এ কৃমির কিছুই হবে না বলিয়া ছেলের মা বাপ আর চিকিৎসা করাইতে চায় না। রোগী যদি জোয়ান হয়, তবে সে আপনিই সব আশা ভরসা ছাড়িয়া দেয়। তাতেই বলিতেছি, এ কৃমি সব যদি এক বারে মারিয়া ফেলিতে চাও ; তবে রোগীকে উপ্‌রো-উপ্‌রি ৩। ৪ বার জোলাপ দিবে। তার পর, ঐ সব অসুদের যে সে একটা পিচ্‌কিরি করিয়া গুহ্যদ্বারের মধ্যে দিবে। উপ্‌রো-উপ্‌রি ৩। ৪ বার জোলাপ দিবার মানে কি ? জোলাপ দিলে উপরকার কৃমি সব নীচের দিকে নামিয়া পড়ে। কাজেই, পিচকিরির জলের হাত তারা আর এড়াইতে পারে না। দশ পোনর দিনে বা দু এক মাসে এ কৃমির হাত এক বারে এড়াইতে পারা যায় না। এমন কি, যদি ছ মাস ধরিয়া হপ্তায় দু বার করিয়া

পিচকিরি দেও, আর সময় সময় জোলাপ দেও, তবেই এ কৃমির জড় একবারে মারিয়া ফেলিতে পার। কৃমি আর না জন্মিতে পারে, সেই সঙ্গে সঙ্গে সে ফিকিরও করা চাই। সে ফিকিরের কথা—সে উপায়ের কথা এখনই বলিব।

পেটে কৃমি হয় কেন ? পেটে কেমন করিয়াই বা কৃমি যায় ? কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা কোন রকমে পেটের ভিতর গেলেই, আর কি, কৃমি হয়। অপরিষ্কার ময়লা জলেই কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ থাকে। এই জন্যে, অপরিষ্কার ময়লা জল খাইলে পেটে কৃমি হওয়া যত সম্ভব, এত আর কিছুতেই নয়। যারা কাঁচা বা কম সিদ্ধ মাংস খায়, তাদেরও পেটে কৃমি হয়। অনেক জন্তুর মাংসে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা থাকে ; শূওরেরই মাংসে বেশীর ভাগ থাকে। মাংস খুব সিদ্ধ করিলে, কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা একবারে মরিয়া যায়। কাজেই, সে মাংস খাইলে পেটে কৃমি হইবার কোন ভয়ই থাকে না। এই জন্যে, মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়া এত দরকার। শুদু মাংস কেন ? শাক সব্জিও খুব সিদ্ধ করিয়া খাওয়া চাই। কেন না, শাক সব্জিতেও কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছাঁ থাকে। ফল ফুলরিরও সঙ্গে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা পেটে গিয়া থাকে। পাকা ফলের চেয়ে কাঁচা ফল খাওয়া আরও দোষের।

পেটে কৃমি থাকার সাধারণ লক্ষণ, গোটা কতক সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত। কেঁচো-কৃমির কথা

বলিবার সময়, পেটে কোঁচো-কৃমি থাকার যে সব লক্ষণের কথা বলিছি, মোটামুটি ধরিতে গেলে, পেটে কৃমি থাকার সাধারণ লক্ষণই সেই। তবে বাড়তির ভাগ, কোন কোন জায়গায় আরও কিছু কিছু অসুখের পরিচয় পাওয়া যায়। সে সব অসুখ আর কি? মাথা-ধরা, গা মাটি-মাটি করা, আর মুখের একটু ক'ষো ক'ষো ভাব।

শুধু গোটা কতক লক্ষণ দেখিয়াই পেটে কৃমি আছে বলিয়া একবারে ঠিক্ করিতে পার না; ঠিক্ করা উচিতও নয়। বাহ্যের সঙ্গে কৃমি বাহির হওয়াই, পেটে কৃমি থাকার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে।

পেটে কৃমি থাকাকে সোজা জ্ঞান করা হবে না। পেটে কৃমি থাকার দরুণ যদি বেশী উদ্দীপনা ঘটে, তবে ছেলেদের তড়্কা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। জোআন রোগীদের মৃগির মত খেঁচুনি হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মেয়েদের হিষ্টিরিয়া হইতে পারে—হইয়াও থাকে। হিষ্টি-রিয়া এক রকম মূর্চ্ছাগত বাই। হিষ্টিরিয়াকে বৈদ্যরা গুল্মবায়ু বলেন। একথা এর আগেই বলিছি। হিষ্টি-রিয়ার কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। এ ছাড়া, পেটে কৃমি থাকার দরুণ কানের ভিতর নানা রকম শব্দ হইতে পারে; মাথা-ঘোরা হইতে পারে; শরীরের রক্ত একবারে কমিয়া যাইতে পারে এমন কি, কৃমি থেকে উন্মাদ রোগ পর্য্যন্ত জন্মিতে পারে।

কৃমি অন্ত্রেরই ভিতর থাকে। কিন্তু আমরা ঘরাও কথা বার্ত্তায় "অন্ত্র" কথাটা বড় ব্যবহার করি না। "এর পেটে

কৃমি নিশ্চয়ই আছে। কৃমি না থাকিলে, এই সামান্য জ্বরে এত উপসর্গ কখনই ঘটিত না।” ঘরাও কথা বার্ত্তায় আমরা এই রকম করিয়াই বলিয়া থাকি। এই জন্যে, অন্ত্রের ভিতর কৃমি আছে—অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকে—অন্ত্রের ভিতর কৃমি থাকার দরুণ—বারে বারে এ রকম না বলিয়া তার বদলে—পেটে কৃমি আছে, পেটে কৃমি থাকে, পেটে কৃমি থাকার দরুণ—বলিছি।

তার পর বলি।

কৃমির চিকিৎসা দু রকম।

(১) পেটের কৃমি বাহির করিয়া দেওয়া।

(২) কৃমি আর না জন্মিতে পারে, তার উপায় করা।

পেটের কৃমি বাহির করিয়া দিবার উপায় ত এক রকম মোটামুটি বলিলাম। পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে—তার উপায় এখন বলি। পেটে কৃমি হয় কেন? পেটে কেমন করিয়াই বা কৃমি যায়? এর উত্তর যদি তোমার মনে থাকে, তবে পেটে কৃমি আর না জন্মিতে পারে, এমন উপায় তুমি সহজেই করিতে পার।

১। ময়লা কি অপরিষ্কার জল কখনও খাইওনা।

২। খুব সিদ্ধ না করিয়া কখনও কোনও মাংস খাইও না।

৩। কাঁচা ফল ফুলরি খুব কম খাবে।

৪। শাক সব্জি খুব ভাল করিয়া না ধুইয়া আর বেশ সিদ্ধ না করিয়া কখনও খাইও না।

৫। মিষ্টি খুব কম খাবে।

৬। রোজ নিয়ম করিয়া খাবার জিনিষের সঙ্গে একটু একটু লবণ খাবে।

এ ছাড়া, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, নিয়ম করিয়া কিছু দিন সে অসুদটী খাবে। কৃমি নিবারণের এটী বড় চমৎকার অসুদ।

কুইনাইন	... ...	১২ গ্রেন
টিংচর ফেরিমিয়ুরিয়েটিস	...	২ ড্রাম
ডাইলিয়ুট হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড	...	২ ড্রাম
টিংচর কলম্বো	... ...	৬ ড্রাম
ইনফিয়ুশন কোয়াশিয়া	...	১০ ঔন্স ৬ ড্রাম

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ রোজ তিন বার করিয়া খাবে। যত দিন শরীর বেশ সুস্থ আর সবল না হয়, তত দিন এ অসুদটী বেশ নিয়ম করিয়া খাওয়া চাই। চারি দিন অন্তর অসুদ তয়ের করিয়া লইবে।

কৃমি নিবারণের যেমন অসুদ লবণ, সামান্য জিনিষের মধ্যে তেমন অসুদ আর নাই। এ কথাটা সকলেরই যেন মনে থাকে। খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন বেশী করিয়া খাইলে, কৃমি জন্মিতে পারে না, আমাদের দেশের মেয়েরাও তা জানে।

কেঁচো-কৃমি আর ছোট সূত-কৃমি, আমাদের দেশে সচরাচর এই দু রকম কৃমিই দেখিতে পাওয়া যায়। সাহেব-দের দেশে এ দু রকম কৃমি ত আছেই। তা ছাড়া, আর

এক রকম কৃমি আছে। ডাক্তরেরা সে কৃমিকে টেপ-ওয়র্ম্ম বলেন। টেপ্ ইংরিজি কথা। টেপের অর্থ ফিতে। ফিতে যেমন পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা, এ কৃমিও তেমনি পাতলা, চেপ্টা, আর লম্বা। এই জন্যে, এ কৃমিকে ফিতে-কৃমি বলে। কেঁচোর মত দেখিতে বলিয়া যেমন কেঁচো-কৃমি বলা যায়, ফিতের মত দেখিতে বলিয়া এ কৃমিকে তেমনি ফিতে-কৃমি বলিতে পার। কেঁচো-কৃমির চেয়ে ফিতে-কৃমি ঢের লম্বা। যে গুলি খুব খাটো, সে গুলি দশ হাতের বেশী লম্বা নয়। আবার যে গুলি খুব লম্বা, সে গুলি ত্রিশ হাতের কম লম্বা নয়। অন্ত্রে ফিতে-কৃমি একটাও থাকে, একবারে তিন চারিটাও থাকে। ফিতে-কৃমি ছোট অন্ত্রেই থাকে। ফিতে-কৃমির গায়ে বিছের গায়ের মত জোড় আছে। জোড় এত যে, গুণিয়া উঠা ভার। এক আঙুল জায়গার মধ্যে এমন ৮। ১০টা জোড় আছে। জোড়ের ভাল কথা সন্ধি। ছা, ডিম করিবার জন্যে স্ত্রী পুরুষের যে সব যন্ত্রের দরকার, এক একটী যোড়ে সে সব যন্ত্রই আছে। এই জন্যে, ধরিতে গেলে এক একটী জোড়, দুটী আস্ত কৃমির সমান। বাহ্যের সঙ্গে এই সব জোড় খসিয়া খসিয়া বাহির হয়। রোগী যখন চলা ফেরা করে, তখনও জোড় বাহির হয়। এ কৃমির মাথাটাই আসল মূল। মাথাটী সুদ্ধ সব কৃমি যত ক্ষণ না বাহির হইয়া না আসে, ততক্ষণ এ কৃমির হাতে রোগীর নিস্তার নাই। এ কৃমির জোড় যতই কেন বাহিয়া হইয়া যাক্ না, তাতে কোনও ফল নাই। আর আর কৃমি যে সব অসুদে বাহির হইয়া

যায়, সে সব অসুদে মাথা সুদ্ধ এ কৃমি বাহির হয় না। হাজারের মধ্যে যদি ৯৯৯টী জোড় বাহির হইয়া আসে, আর একটী জোড় আর মাথাটি অন্ত্রের ভিতর থাকে, তবে দু পাঁচ দিনেই আবার যে কৃমি, সেই কৃমি হইয়া দাঁড়ায়।

এ কৃমির কেবল একটী ভাল অসুদ আছে। সে অসুদটীর নাম মেল্-ফর্ণ। মেল্-ফর্ণ গাছড়া অসুদ। মেল্-ফর্ণের কেবল মূলই অসুদে লাগে। আদা যেমন মূল, মেল্-ফর্ণেরও মূল ঠিক্ তেমনি। মেল্-ফর্ণের মূল থেকে এক রকম আরোক তয়ের হয়। ডাক্তরেরা সে আরোককে লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব মেল্-ফর্ণ বলেন। কতটুকু লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব মেল্-ফর্ণ কি রকম করিয়া খাওয়াইতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

লিকুইড্ একৃষ্ট্রাক্ট অব মেল্-ফর্ণ	...	১ ড্রাম।
সিরপ জিঞ্জর ...	...	১ ঔন্স।
মিউসিলেজ (গঁদ ভিজের জল)	...	১ ঔন্স।
পরিষ্কার হিম জল ...	...	৩ ঔন্স।

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার মত। খুব ভোরে অসুদ টুকু সব একবারে খাইবে। আগের দিন সকালে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইবে, আর শুদু একটু য়্যারারুট খাইয়া থাকিবে। রাত্রে ফের ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ লইবে। এক দিনে উপরো-উপরি দু বার জোলাপ লইবার কারণ কি? কারণ আর কিছুই না। জোলাপে অন্ত্র খুব ছাপ হইয়া গেলে, কৃমি

মলে তেমন আর ঢাকা থাকিতে পারে না। কাজে কাজেই, যে অসুদ এ কৃমির পক্ষে ভয়ানক বিষ, সে অসুদে কাজের কোন ব্যাঘাতই ঘটিতে পারে না। বড় জোর, দু বার কি তিন বার এই রকম করিয়া এ অসুদ খাইতে হয়। তা হইলেই কার্য্য সিদ্ধি হয়। মাথা সুদ্ধ এ কৃমি বাহির হইয়া আসে। মাথা সুদ্ধ সব কৃমি বাহির হইয়া আসিল কি না, বেশ করিয়া পরীক্ষা করিয়া দেখা চাই।

কৃমি আর না জন্মিতে পারে, এই জন্যে ৬৩৩র পাতে যে অসুদটী লিখিয়া দিইছি, নিয়ম করিয়া কিছু দিন সেই অসুদটী খাইবে। তা খাবার জিনিষের সঙ্গে নুন খুব বেশী করিয়া খাইবে। মাংস খুব সিদ্ধ করিয়া খাবে।

শূওরের মাংসেই এ কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ থাকে। এই জন্যে, যারা শূওরের মাংস কাঁচা খায় বা আধ-সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে এ কৃমি হয়।

বড় জাতের আর এক রকম ফিতে-কৃমি আছে। গো-মাংসেই সে কৃমির ডিম আর অফুটন্ত ছা বেশীর ভাগ থাকে। এই জন্যে, যারা গো-মাংস কাঁচা খায় বা আধ-সিদ্ধ খায়, তাদেরই পেটে সে কৃমি হয়। তাতেই বলি, আহারের দোষে এ দেশেরও লোকের পেটে এ দু রকম কৃমি জন্মিতে পারে। এই জন্যে, এখানে এ দু রকম ফিতে-কৃমির কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। যদিই কখনও তোমার হাতে এমন রোগী পড়ে, সরল জ্বর-চিকিৎসায় ফিতে-কৃমির কথা লেখা নাই বলিয়া, তখন তোমাকে অপ্রতিভ হইতে হবে না।

মেল্-ফর্ণ ফিতে-কৃমির পক্ষে ভারি বিষ। কেন না, মেল্-ফর্ণ খাইলে এ কৃমি জীয়ন্ত বাহির হয় না। মেল্-ফর্ণে আরও অনেক কৃমি মরে। আর মেল্-ফর্ণেই কেবল ফিতে-কৃমির মাথা সুদ্ধ সব খানি বাহির হইয়া আসে। ফল কথা, মেল্-ফর্ণের মত ভাল অসুদ ফিতে কৃমির আর নাই। এ কথাটা যেন মনে থাকে।

ছেলেদেরই স্বল্পবিরাম-জ্বরে কৃমি উপসর্গ বেশী ঘটে। জ্বরে কৃমি উপসর্গ ঘটিলে, আমাদের বৈদ্যরা তাকে কৃমি-বিকার বলেন। কৃমি-বিকারে বমি, ওয়াক, অকি, কাঠ-বমি কি হিক্কি—এ সব ত হয়ই। তা ছাড়া, ভুল-বকা, ছট্-ফট্ করা, চীৎকার করা, চেঁচান, বারে বারে গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া ন্যাকার করিবার চেষ্টা করা, বালিশের উপর নিয়ত মাথা নাড়া, পিচ্ পিচ্ করিয়া বারে বারে একটু একটু পাতলা বাহ্যে যাওয়া, নাক-খোঁটা, প্রস্রাবের দুওরে বারে বারে হাত দেওয়া, মল-দুওর বারে বারে চুল্‌কনো, ছেলে কি মেয়ের বিশেষ চিহ্নের উত্তেজনা, পেটের ফাঁপ—কৃমি-বিকারে অনেক জায়গায় এ সব লক্ষ-ণেরও বেশ স্পষ্ট পরিচয় পাওয়া যায়। বারে বারে গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া ন্যাকার করিবার চেষ্টা করার কথা একটু বিশেষ করিয়া বলি। কৃমি-বিকারে, ছেলেরা বারে বারে এমন ভাবে আর এমনি জুত বরাত করিয়া গলার ভিতর হাত পুরিয়া দেয় যে, তা দেখিয়া বোধ হয়; তাদের গলার ভিতর যেন কিছু আট্‌কে আছে; তাই যেন বাহির করিয়া ফেলিবার জন্যে, কি ন্যাকার করিয়া তুলিয়া

ফেলিবার জন্যে, গলার ভিতর অমন করিয়া হাত পুরিয়া দিতেছে। সত্য সত্যই অনেক জায়গায় তারা ঐ রকম করিয়া গলার ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া কৃমি বাহির করিয়া ফেলে। ঐ রকম করিয়া তারা অনেক জায়গায় কৃমি ন্যাকারও করে। আর কোনও কৃমি নয়, কেঁচো-কৃমি। কৃমি দেখিয়া চিকিৎসকের তখন চৈতন্য হয়। এই জন্যেই কি, কয় দিন ধরিয়া ছেলেটা গলার ভিতর অমন করিয়া বারে বারে হাত পুরিয়া দিতেছিল! তবে কি, কৃমিতেই এ সব উপদ্রব, উপসর্গ আনিয়াছে! কৃমিতে যে এমন ঘটে, তাত জানিতাম না! তবে ত এই জন্যেই, এত অসুদ বিসুদ দিয়াও রোগের উপদ্রব থামাইতে পারি নাই! এতে রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে দাঁড়িয়ে অপ্রতিভ হইবার ত কথাই বটে। যাই হোক্, এখন বাঁচিলাম—এখন বোধ হইতেছে, ছেলেটাকে বাঁচাইতে পারিব। এই রকম ভাবিয়া তখন তিনি কৃমির অসুদের ব্যবস্থা করেন। কেঁচো-কৃমির অসুদ আর কি? স্যাণ্টোনীন। রোগী স্যাণ্টোনীন খাইলে, কেঁচো-কৃমি সব বাহির হইয়া গেল, তার পর আগুনে জল পড়ার মত, রোগের উপদ্রব—উপসর্গ সব একবারে থামিয়া গেল। গলার ভিতর কৃমি কেমন করিয়া আসে? অন্ত্র থেকে পেটের ভিতর আসে—পেটের ভিতর থেকে গলার ভিতর আসে। গলার ভিতর আসিয়া গলার গোড়ায় পুঁটুলি পাকাইয়া থাকে। গলার গোড়ায় অমন করিয়া পুঁটুলি পাকাইয়া থাকে বলিয়াই, কৃমি-বিকারে ছেলেরা অমন করিয়া বারে বারে গলার

ভিতর হাত পুরিয়া দিয়া কৃমি বাহির করিয়া ফেলিবার চেষ্টা করে। তা না পারে ত, ন্যাকার করিয়া তুলিয়া ফেলিবারও চেষ্টা করে। তার পর বলি। কৃমি যে এ সব উপদ্রবের কারণ, তুমি যদি ঠিক্ করিতে না পার, তবে তুমি কখনই সে সব উপদ্রব, উপসর্গ দূর করিতে পারিবে না। রোগীর আত্মীয় স্বজনের কাছে তুমি দাঁড়িয়ে অপ্রভিত হবে। তাতেই বারে বারে বলিছি, আর এখনও বলিতেছি, রোগ ঠিক্ করাই শক্ত। রোগের ঠিক্ কারণ বুঝিতে পারিলে, তা সে যে রোগই কেন হোক্ না, চিকিৎসকের কাছে তা সোজা হইয়া পড়ে।

জ্বরজাড়ি ছাড়া সহজ শরীরেও কৃমির উৎপাত হয়, আর তার জন্যে রোগীকে এক বারে অস্থির হইতে হয়। কেঁচো-কৃমির কথা বলিবার সময় এ কথা বলিছি।

৯। পেট-ফাঁপা।——পেটের ফাঁপ সহজ শরীরেও হয়, রোগেও হয়। যদি আর কোনও উৎপাত না থাকে, তবে সহজ শরীরে পেট-ফাঁপায় কোন চিন্তাও নাই, কোন ভয়ও নাই। খুব সহজ শরীরে খুব সামান্য রকম অপাক হইলেও, পেটের যে এক আধটু ফাঁপ, তা হইয়াই থাকে। তবে সে ফাঁপ কেউ পরীক্ষা করিয়াও দেখিতে যায় না—পরীক্ষা করিয়া দেখিবার দরকারও হয় না। সে পেট-ফাঁপায় কোন কষ্টও হয় না। পেটের (পাকস্থলীর) ভিতর আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস জমাকে পেট-ফাঁপা বলে। বাতাস কেবল নামে মাত্র জমিতে পারে। আবার চাই কি এত বাতাস জমিতে পারে যে,

পেট ফুলিয়া একবারে ঢাক হইতে পারে। পেটের ভিতর আর অন্ত্রের ভিতর বাতাস কেমন করিয়া জমে ? বাতাস কোথা থেকে আসে ? বাইরের বাতাস পেটের ভিতর যাইতে পারে। আবার পেটের (পাকস্থলীর) ভিতরকার আর অন্ত্রের ভিতরকার জিনিষ পচিয়া, তা থেকে খারাপ বাতাস জন্মিতে পারে। এই খারাপ বাতাসকে ডাক্তরেরা গ্যাস্ বলেন। গ্যাস্ কথাটা আজ্ কাল্ বেশ চলিত হইয়াছে। পেটের ভিতরকার আর অন্ত্রের ভিতরকার জিনিষ আর কি ? যা খাওয়া যায়, তাই। যা খাওয়া যায়, তা যদি বেশ পরিপাক হয়—বেশ হজম হয়, তবে কোন উৎপাতই ঘটে না। পরিপাক না হইলে—হজম না হইলে, ভাত, মাচ, ডাইল, তরকারি বাইরে যেমন পচে, পেটের ভিতরও তেমনি পচে। বাইরে যে জিনিষ পচে, তা থেকে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, পেটের ভিতর যে জিনিষ পচে, তা থেকেও সেই রকম দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে। পেটের ভিতরকার জিনিষ পচিলে যে তা থেকে দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, তার প্রমাণ কি ? তা কেমন করিয়া জানা যায় ? তার আর প্রমাণ কি ? তার পরিচয় আর কি ? দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা আর বায়ু সরাই তার প্রমাণ—আর তার পরিচয়। দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠা আর বায়ু সরার সঙ্গে গা ন্যাকার ন্যাকারও করে, পেটের এক আধটু কামড়ও হয়, পেট ডাকে আর বাহ্যের চেষ্টা হয়। যতক্ষণ বায়ু সরল থাকে, তত ক্ষণ ঢেকুরও উঠে, বায়ুও সরে। কাজে কাজেই, একবারে বেশী গ্যাস্ জমিয়া পেট ঢাক হইতে পারে না।

আবার যতক্ষণ শরীরে বেশ বল থাকে, তত ক্ষণ বায়ুও বেশ সরল থাকে। বল খাটো না হইলে আর বায়ু ক্রূর হইতে পারে না। বায়ু বদ্ধই বল, বায়ু ক্রূরই বল, আর বায়ু কুপিতই বল, সবই এক কথা। এ সব কবিরাজি কথা। এ সব কথা আমাদের বৈদ্যরাই বেশী বলিয়া থাকেন। তাঁদের এ সব কথার বেশ মানে আছে।

শরীরের বল খাটো করে কিসে ? রোগে। বাঁকা রকম শক্ত জ্বরে বল যত শীঘ্র খাটো করিয়া ফেলে, এত আর কিছুতেই নয়। সবিরাম-জ্বরও (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরও) বাঁকা আর শক্ত হয় ; স্বল্পবিরাম-জ্বরও (রিমিটেণ্ট ফীবরও) বাঁকা আর শক্ত হয়। স্বল্পবিরাম-জ্বরই বাঁকা আর শক্ত বেশী হয়। স্বল্পবিবাম-জ্বর বাঁকা আর শক্ত হইয়া দাঁড়াইলেই আমরা তাকে বাতশ্লেষ্ম-বিকার বলি। ডাক্তরেরা তাকে টাইফয়িড ফীবর বলেন। ১৪০—১৪১র পাতে এ সব কথা বলিছি। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারেই পেট-ফাঁপার খুব বাড়াবাড়ি দেখিতে পাওয়া যায়। ফল কথা, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে পেট-ফাঁপা থাকিতেহ চায়। গায়ের তাত, ভুল-বকা, পেটের ভিতর বাতাস, আর বুকের ভিতর শ্লেষ্মা, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের এই চারিটী প্রধান অঙ্গ। "পেটের ভিতর বাতাস" এর অর্থ কি ? অর্থ আর কি ? পেট-ফাঁপা। "বুকের ভিতর শ্লেষ্মা" এর অর্থ কি ? অর্থ আর কি ? ফুস্কোর নলির ভিতর শ্লেষ্মা—অর্থাৎ ব্রংকাইটিস। ব্রংকাইটিস রোগের কথা বলিবার সময় এ সব কথা বলিছি।

হজম বল, পরিপাক বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর) শ্লেষ্মা-ঝিল্লির আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বলেই হয়। শ্লেষ্মা-ঝিল্লিকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ মেম্ব্রেন বলেন। ৪৪৩র পাতে এ কথা বলিছি। যাতে শরীরের বল খাটো করে, তাতে শ্লেষ্মা-ঝিল্লিরও, বল খাটো করে। শুদু শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল কেন, শরীরের বল খাটো হইলে সব রকম যন্ত্রেরই বল খাটো হয়। শক্ত রকম স্বল্পবিরাম-জ্বরে (বাতশ্লেষ্ম-বিকারে) অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বল যেমন খাটো হয়, তেমন আর কোনও রোগে না। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে হজম এত কম হয়। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীকে যা খাইতে দেওয়া যায়, তার পেটে থাকিয়া তা এত পচে। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর পেট এত ফাঁপে। আর এই জন্যেই, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর পথ্যের এত ধরাধরা করার দরকার। ছেলেদেরই বাতশ্লেষ্ম-বিকারে এ সব পরিচয় ভাল রকম পাওয়া যায়। বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর বায়ু সরিলে তার দুর্গন্ধে ঘরে তিষ্ঠিতে পারা যায় না। সে দুর্গন্ধ নাকে গেলে বোধ হয়, যেন তার পেটে কত জীব জন্তু পচিয়া আছে। রোগীর অন্ত্রের ভিতরকার এ অবস্থা থাকিতে, তার ব্যামো ভাল করে, কার সাধ্য? রোগীর অন্ত্রের ভিতরকার এ অবস্থা ঘুচাইবার কথা এর পরই বলিব।

যে কারণেই হোক্, শরীরের বল খুব খাটো হইলে, পরিপাক করিবার শক্তিও খুব কমিয়া যায়। শরীরের বল যত কমে, পরিপাক করিবার শক্তিও তত কমে।

শরীরের বল একবারে কমিয়া গেলে, পরিপাক করিবার শক্তিও একবারে কমিয়া যায়। শেষে সন্নিপাত অবস্থায় পরিপাক করিবার শক্তি মোটেই থাকে না। যে অবস্থায় রোগীর গায়ে বল মোটেই থাকে না—রোগী একবারে নেতিয়ে পড়ে, সেই অবস্থাকেই সন্নিপাত বলে। সন্নিপাত-বিকারে রোগীর কি অবস্থা হয়, ১৭৪—১৭৫র পাতে তা বলিছি। এর আগেই বলিছি, পরিপাক না হইলে—হজম না হইলে, ভাত, মাছ, ডাইল, তরকারী বাইরে যেমন পচে, পেটেরও ভিতর তেমনি পচে। বাইরে যে জিনিষ পচে, তা থেকে যেমন দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, পেটের ভিতর যে জিনিষ পচে, তা থেকেও তেমনি দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে। এই জন্যে, সব রোগেরই সন্নিপাত অবস্থায় রোগীর পেটের ফাঁপ প্রায়ই দেখা যায়। এ ছাড়া, সন্নিপাত অবস্থায় রোগীর পেট-ফাঁপা যত সম্ভব, এত আর কোনও অবস্থায় নয়। কেন না, সন্নিপাত অবস্থায় পরিপাক করিবার শক্তি মোটেই থাকে না। কাজে কাজেই, পেটের ভিতর যা থাকে, হজম না হইয়া তা পচে। সেই পচা জিনিষ থেকে নিয়ত দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠিয়া পেটটী একবারে ঢাক করিয়া ফেলে। পেট ঢাক হবেই ত। রোগীর সন্নিপাত অবস্থা। গায়ে বল মোটেই নাই। কাজে কাজেই, বায়ুও সরল নাই। বায়ু সরল থাকিলেই না, ঢেকুর উঠে, বায়ু সরে। এ দিকে পেটের ভিতরকার পচা জিনিষ থেকে নিয়ত দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠিতেছে। ওদিকে রোগীর ঢেকুরও উঠিতেছে না, বায়ু সরিতেছে না। এতে পেট ফাঁপিয়া ঢাক

না হইবে কেন? পেট-ফাঁপা অনেক রোগের শেষ উপসর্গ। অনেক শক্ত রোগের চিকিৎসা করিতে গিয়া দেখিছি, পেট-ফাঁপার পরই শ্বাস হইয়া রোগী মরিয়া যায়। ফল কথা, পেট-ফাঁপা একটী খুব ভয়ানক উপসর্গ। রোগীর অবস্থা যত খারাপ, তার পেট-ফাঁপায় তত ভয়। রোগ যত শক্ত, রোগীর পেট-ফাঁপায় তত ভয়। এ বুঝাইবার জন্যে, বেশী কথা বলিবার দরকার নাই। কেবল একটী দৃষ্টান্ত দিলেই হবে। ওলাউঠার রোগীর পেট-ফাঁপিলে ভয়ে চিকিৎসকেরও ধড়ে প্রাণ থাকে না। যে রোগই কেন হোক্ না, খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে পর যদি রোগীর পেট ফাঁপে, তবে তখনই ঠিক করিবে, রোগীর বলেরও দফা রফা হইয়াছে—বাঁচিবারও আশা ভরসার শেষ হইয়াছে। ছেলেদের বেলায় আর বুড়োদের বেলায় এ কথাটী যেমন খাটে, তেমন আর কারু বেলায় নয়। আঁতুড়ে ছেলের পেট ফাঁপিলে বাড়ীতে কান্না কাটি পড়িয়া যায়—আমাদের দেশে ছেলে বুড়ো জোআনে তা জানে। কচি ছেলের পেট-ফাঁপাই শেষ রোগ—এ কথাটা এক রকম ধরা আছে বলিলেই হয়। কোন রোগের বাড়াবাড়ি হইয়া পেট ফাঁপিলে, কচি ছেলেদের প্রায়ই বাঁচাইতে পারা যায় না। ছেলে যত কচি, তার পেট-ফাঁপায় তত ভয়। এ ছাড়া, কচি ছেলেদের ছুতোয় নতায় পেট ফাঁপে। আবার তারা মরে ছুতোয় নতায়। কচি ছেলেদের কোন রকম শক্ত রোগ হইলে, চিকিৎসা করিয়া তাদের প্রায়ই ভাল করিতে পারা যায় না। এই জন্যে,

কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম ব্যামো স্যামো হইলে বৈদ্য ডাকে না। রোজা আনিয়া ঝাড়ান কাড়ান করায়। আর এই জন্যেই, কচি ছেলে পিলে এত বেশী মরে। তাতেই বলি, কচি ছেলে পিলের শক্ত রকম কোন রোগ যোগ না হইতে পায়, তার উপায় করা ভাল। এ সব কথা ধাত্রী-শিক্ষা বৈতে খুলিয়া লিখিয়াছি। ধাত্রী-শিক্ষা দু ভাগ একত্র বাঁধা। দাম আগে দু টাকা ছিল। সাধারণের সুবিধার জন্যে এখন পাঁচ শিকা করিয়া দিইছি।

পেটের ভিতরকার জিনিষ পচিলে তা থেকে যে দুর্গন্ধ গ্যাস্ উঠে, আর সেই গ্যাসে পেটের যে ফাঁপ করে, তার কথা এক রকম মোটামুটি বলিলাম। এ পেট-ফাঁপাকে অপাকের পেট-ফাঁপা বলে। অপাকের পেট-ফাঁপায় দুর্গন্ধ ঢেকুর উঠে আর বায়ু সরে; পেট ডাকে—পেট ভাট ভুট করে—পেটের ভিতর গুজ্ গাজ্ করে; পেটের এক আধটু কামড় হয়; অল্প গা ন্যাকার ন্যাকার করে; আর বাহ্যের চেষ্টা হয়। এ কথা এর আগেই বলিছি।

বাইরের বাতাস পেটে গেলে, পেটের যে ফাঁপ হয়, তার কথা এখনও বলি নাই। বাইরের বাতাস পেটে কেমন করিয়া যায়। না গিলিয়া ফেলিলে বাইরের বাতাস পেটের ভিতর যাইতে পারে না। এ পেট-ফাঁপায় যে ঢেকুর উঠে, পেটের ভিতরকার বাতাস তাতেই বাহির হইয়া যায়। সে ঢেকুরের স্বাদও নাই—গন্ধও নাই বলিলে হয়।

এর আগেই বলিছি, পেট-ফাঁপা বাতশ্লেষ্ম-বিকারের

একটী প্রধান লক্ষণ। বাতশ্লেষ্ম-বিকারকে ডাক্তরেরা টাইফয়িড্ ফীবর বলেন। ১৪১র পাতে বলিছি, রিমিটেণ্ট ফীবরের অর্থাৎ স্বল্পবিরাম-জ্বরের গোড়ায় ভাল চিকিৎসা না হইলে, ব্যামো ভারি বাড়িয়া গেলে, শেষে রোগীর অবস্থা বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরের রোগীর অবস্থার সঙ্গে অনেক মেলে। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারকে দেশী টাইফয়িড্ ফীবর বলিতে পার। বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরে রোগীর অন্ত্রেরই দুর্দ্দশা বেশী হয়; অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির অবস্থা যত খারাপ হয়, তত আর কোনও যন্ত্রের নয়। এই জন্যে, বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবরকে ডাক্তরেরা এণ্টরিক ফীবর (ইণ্টেষ্টাইন্যাল ফীবর) বলেন। এণ্টরিক ফীবরের ঠিক বাঙ্গালা আন্ত্রিক (অন্ত্র থেকে আন্ত্রিক) জ্বর। বাতশ্লেষ্ম-বিকারেও অন্ত্রের দুর্দ্দশা যে খুবই হয়, পেট-নাবা আর পেট-ফাঁপাই তার প্রমাণ। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারকেও দেশী আন্ত্রিক জ্বর বলিতে পারা যায়। ছেলেদের শক্ত রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর আর বিলিতি টাইফয়িড্ ফীবর, এক বলিলেই হয়। ছেলেদের ও রকম স্বল্পবিরাম-জ্বরকে ডাক্তরেরা ইনফ্যাণ্টাইল রিমিটেণ্ট ফীবর বলেন। ইনফ্যাণ্টাইল রিমিটেণ্ট ফীবরের কথা এর পর বলিব।

পেট ফাঁপার কারণ—ধর ত পেট-ফাঁপার কারণ মোটামুটি এক রকম বলিছি। যে কারণেই হোক্, অন্ত্রের বল খাটো হইলেই পেট ফাঁপে। অন্ত্রের বল খাটো হওয়াও যা, পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও তাই। আবার পরিপাক করিবার শক্তি কমিয়া যাওয়াও

ঘা, অগ্নি মন্দ হওয়াও তাই। যা হজম না হয়, তাতেই পেট ফাঁপায়। এই জন্যে, শরীর যদি সুস্থ রাখিতে চাও, তবে যা খাইলে সহজে পরিপাক হয়, তাই খাবে। বারে বারে জোলাপ লইলে অন্ত্রের বল কমিয়া যায়। কাজে কাজেই, বারে বারে জোলাপ লওয়াও পেট-ফাঁপার আর একটী কারণ। মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাইতে পেট-ফাঁপে। এই জন্যে মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাই পেট-ফাঁপার আর একটী কারণ। মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাইকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া বলেন, বৈদ্যরা গুল্মবায়ু বলেন। বাইয়ের ভাল কথা বায়ু।

পেট-ফাঁপা কেমন করিয়া ঠিক করিবে। পেটের ফাঁপ মেয়েরাও ঠিক করিতে পারে। পেট-ফাঁপা ঠিক করিবার জন্যে, বেশী কিছু জানিবার দরকার নাই। রোগের নামেতেই রোগের পরিচয়। উদরী হইলে— পেটে জল হইলে পেট ডাঁগর হয়, পেট বড় হয়, পেট উচ হয়। পেট খুব ফাঁপিলেও পেট তেমনি ডাগর হয়, তেমনি বড় হয়, তেমনি উচ হয়। তবেই কেমন করিয়া জানিবে, রোগীর উদরী হইয়াছে, কি পেট ফাঁপিয়াছে ? উদরী-রোগীর পেটে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। পেট-ফাঁপায় পেটে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। তাতেই বলিতেছি, পেট-ফাঁপা রোগের নামেতেই রোগের পরিচয়। পেটের ভিতর বাতাস পোরা থাকিলেই, পেটে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির হয়। বাতাস ছাড়া, পেটের ভিতর আর যাই কেন থাক না, পেটে ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ বাহির

হয় না। এ ছাড়া, উদরী-রোগীর পেট দু হাত দিয়া বেশ জুত বরাত করিয়া চাপিলে পেট দল মল করে। তার পর পেটের ফাঁপ দেখিতে দেখিতে হইতে পারে—হইয়াও থাকে ; কিন্তু পেটে জল তত শীঘ্র হয় না, পেটে জল হইতে দেরি লাগে।

তার পর এখন পেট-ফাঁপার চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——সোজা সুজি পেট-ফাঁপায় আমি যে অসুদটী সর্ব্বদা ব্যবহার করিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

বাইকার্ব্বণেট অব সোডা	...	...	৩০ গ্রেন্
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	২ ড্রাম্
একের নম্বর ব্রাণ্ডি	...	...	৬ ড্রাম্
টিংচর কার্ডেমম কো	...	...	৩ ড্রাম্
টিংচর জিঞ্জর	...	...	৬ ড্রাম্
ডিল্ ওয়াটর	...	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৬টা দাগ কাটিয়া দেও। পেটের-ফাঁপ যতক্ষণ না বেশ সারিয়া যাবে, ২।৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাবে। অসুদ খাইবার আগে শিশি বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে।

পেটের যে কোন ব্যামোই কেন হোক্ না, পথ্যের খুব ধরাধর না করিলে শুদ্ধ অসুদে কিছুই হয় না। (৪৮২—৪৮৫র পাতে পেটের-ব্যামোর রোগীর পথ্য—দেখ)। অসুদে হইবার মধ্যে কেবল একটী হয়। অসুদ আর

চিকিৎসক, দুয়েরই উপর রোগীর অভক্তি হয়। অসুদে উপকার হইল না কেন, চিকিৎসক নিজে যদি বেশ তলিয়ে বুঝিতে না পারেন, আর রোগীকে তা বেশ করিয়া বুঝাইয়া দিতে না পারেন, তবে অসুদের উপর তাঁরও অভক্তি হবে। অসুদের উপর চিকিৎসকের অভক্তি হইলেই আর কি, মস্কিল। সে চিকিৎসকের মুক্তিও নাই—গতিও নাই। যদি বল, চিকিৎসকের আবার গতি মুক্তি কি? রোগীর আরোগ্য আর রোগীর কাছে যশ পাওয়াই চিকিৎসকের গতি মুক্তি। অসুদের উপর যে সব চিকিৎসকের ভক্তিও নাই, বিশ্বাসও নাই, সে সব চিকিৎসককে আমি নাস্তিক চিকিৎসক বলি। যাঁরা রোগ বেশ ঠাউরে উঠিতে পারেন না—রোগ বুঝিয়া ঠিক্ ঠাউরে তার মত উপযুক্ত অসুদ দিতে পারেন না—ফল কথা, যাঁরা ঝোপ বুঝে কোপ মারিতে পারেন না, চিকিৎসা করিতে গিয়া তাঁরাই বারে বারে ঠকেন। এই রকম করিয়া বারে বারে ঠকিয়া শেষে তাঁরাই নাস্তিক হইয়া দাঁড়ান। ধর্ম্ম পথে থাকিয়া যদি কেউ বারে বারে শোক, দুঃখ, ও কষ্ট পায়, তবে ঈশ্বরের মহিমার উপর তার সন্দেহ জন্মে। চাই কি, শেষে সে ঈশ্বর না মানিতেও পারে। আপনার শোক, দুঃখ, কষ্টেরও নিদান (আদি কারণ) আসল কারণ না বুঝিতে পারিয়া এ ব্যক্তির নাস্তিক হওয়া আর রোগের উপর অসুদ খাটা-ইতে না পারার নিদান বুঝিতে না পারিয়া চিকিৎসকের নাস্তিক হওয়া দুই-ই সমান।

উপরে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সোজাসুজি পেট-

ফাঁপার সেটী খুব ভাল অসুদ। পেটের কামড়েরও সেটী বেশ অসুদ। ডিল ওয়াটরের বদলে পেপরমিণ্ট ওয়াটর দিলে পেটের কামড় আরও শীঘ্র ভাল হয়। পেটের কামড়ের—পেট কামড়ানির বাড়াবাড়ি হইলে রোগীকে ৪৮০র পাতের মর্ফিয়া মিক্শ্চর খাইতে দিবে। মর্ফিয়া মিক্শ্চর খাওয়াইবার নিয়ম সেই পাতেই লেখা আছে। বলিতে গেলে, এই মর্ফিয়া মিক্শ্চরে না সারে, এমন যন্ত্রণাই নাই। ৫৮১—৫৮২র পাতে এ কথা বলিছি।

পেটের কামড়—পেট কামড়ানি ভারি সাধারণ ব্যামো। ব্যামো খুব সাধারণ বলিয়া রোগী তাতে বড় কম কষ্ট পায় না। অতেই বলিতেছি, পেটের কামড়ের—পেট কামড়ানির অসুদ সকলেরই জানিয়া রাখা উচিত।

অসুদের দোকানে—ডিস্পেন্সরিতে আদার এক রকম আরোক বিক্রি হয়। ডাক্তরেরা সে আরোককে এসেন্স অব জিঞ্জর বলেন। খুব গরম জলের সঙ্গে আদার সেই আরোক খাইলে সোজাসুজি পেট-ফাঁপা ভাল হয়। খুব গরম জলের সঙ্গে একের নম্বর ব্রাণ্ডিও খাইলে সোজাসুজি পেট-ফাঁপা সারে। ব্রাণ্ডির সঙ্গে যে জল খাবে, তা খুব গরম গরম খাওয়া চাই। জল যত গরম হবে, ততই ভাল। তাই বলিয়া বেশী গরম জল খাইয়া যেন মুখ বুক পোড়াইয়া ফেলিও না। আদার আরক (এসেন্স অব জিঞ্জর) এক এক বারে ২০।২৫ ফোটা করিয়া খাবে। একের নম্বর ব্রাণ্ডি এক এক বারে এক ড্রামও খাইতে পার—দু ড্রামও খাইতে পার। গরম জলের মাত্রা এক ছটাকের বেশী নয়।

সোজা-সুজি পেট-ফাঁপার চিকিৎসার কথা বলিলাম।

পেট-ফাঁপার যদি বাড়াবাড়ি হয় আর রোগীর তাতে ভারি কষ্ট হইয়া উঠে, তবে নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, দেরি না করিয়া তাকে সেই অসুদটী খাইতে দিবে।

কার্ব্বণেট্ অব ম্যাগ্নীশিয়া	...	৮০ গ্রেন্।
লিকুইড্ একষ্ট্রাক্ট অব ওপিয়ম্	...	৩০ মিনিম্।
সলফিয়ুরিক ঈথর	... ...	৩ ড্রাম।
পেপরমিণ্ট ওয়াটর	... ...	৬ ঔন্স পুরাইয়া।

একত্র মিশাইয়া একটী শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৪টা দাগ কাটিয়া দেও। যতক্ষণ পেটের ফাঁপ আর যাতনা থাকিবে, ৩ ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ নিয়ম করিয়া খাইতে দিবে। এ ছাড়া আধ ছটাক (এক ঔন্স) ডিলওয়াটরের সঙ্গে ৪ ফোটা করিয়া ক্যাজুপট অইল (ভুর্জ্জপত্রের তেল) ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইতে দিবে। ক্যাজুপট অইল পেট-ফাঁপার ভারি চমৎকার অসুদ। ক্যাজুপট অইলে পেট-ফাঁপা যত শীঘ্র সারে, তত আর কিছুতেই নয়। ক্যাজুপট অইল শুদ্ধ পেট-ফাঁপার অসুদ নয়; আরও অনেক রোগের অসুদ। মেটিরিয়া মেডিকায় সে সব কথা বলিব।

এই দুই অসুদে যদি পেট-ফাঁপা তড়ি ঘড়ি কমিয়া যায় ত ভালই। নৈলে, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে তা পিচকিরি করিয়া দিবে।

৬৫২ ক্যাষ্টর অইল,তার্পিণ,হিঙের আরোক পিচকিরি করিবার কথা।

ক্যাষ্টর অইল	...	...	২ ঔন্স।
তার্পিণ তেল	...	...	১ ঔন্স।
টিংচর য়্যাসাফিটিডা (হিঙের আরোক)			৪ ড্রাম।
সাবানের জল	...	...	৩ পোআ।

একত্র মিশাইয়া রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দেও।

হাতে সয়, পোআ তিনেক আন্দাজ এমন গরম জল একটা মালশায় করিয়া লও। তার পর, সাবান দিয়া হাত ধুইবার আগে জল দিয়া দু হাতে করিয়া সাবান যে রকম ফেণায়, মালশার জলেও বারে বারে সেই রকম করিয়া সাবান ফেণাও, আর সেই জলে হাত ধোও। মালশার জল যত ক্ষণ না ঠিক সাবান-গোলা জলের মত শাদা, ঘন, আটা আটা, আর ফেণা-ফেণা না হবে, ততক্ষণ ঐ রকম করিয়া সাবান গুলিবে। তার পর, ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, আর হিঙের আরক মালশার সাবান-গোলা জলে ঢালিয়া দিবে। শেষে মালশার সব জল খানি পিচ্‌কিরি করিয়া রোগীর গুহ্যদ্বারের ভিতর চালাইয়া দিবে। কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, পিচ্‌কিরির জল তখনই তখনই বাহির হইয়া না আসে, তার জন্যে কি ফিকির বা উপায় করিতে হয়, ৪৬৯—৪৭০র পাতে সে সব বেশ করিয়া বলিছি।

জুত বরাত করিয়া রোগীর অন্ত্রের ভিতর পিচ্‌কিরির জলটা যদি আট ঘণ্টা খানেক রাখিয়া দিতে পার, তবে এক বারকার পিচকিরিতেই রোগীর অর্দ্ধেক পেট-ফাঁপা সারিয়া যায়। পিচকিরির জল যত জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির

হইয়া আসিবে, রোগীর পেটের ফাঁপও তত কমিয়া যাবে। পিচ্‌কিরির জল জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির হইয়া আসে কেন? অন্ত্রের ভিতরকার গ্যাসই বল, আর বাতাসই বল, তেজে বাহির হইয়া আসে বলিয়া পিচ্‌কিরির জলও জোরে আর শব্দ করিয়া বাহির হইয়া আসে। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে পিচকিরিতে তা যত শীঘ্র কমিয়া যায় তত আর কিছুতেই নয়। ফল কথা, পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষা করিবার যেমন উপায় পিচ্‌কিরি, তেমন উপায় আর নাই। কয়বার পিচ্‌কিরি করিলে পেটের ফাঁপ একবারে যাবে, আগে থাকিতে তা কিছু ঠিক করিয়া বলিতে পারা যায় না। এই জন্যে, পেটের-ফাঁপ যে কয় দিন থাকিবে, রোজ দু বার হোক্, তিন বার হোক্, সাবানের জলের সঙ্গে ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ আর হিঙের আরক রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে ঐ রকম করিয়া পিচ্‌কিরি করিবে। অনেক জায়গায় রোজ এক বারের বেশী পিচ্‌কিরি দিতে হয় না। পিচকিরি কয় বার দিতে হবে, রোগীর অবস্থা বুঝিয়া তুমি তা ঠিক করিয়া লইবে। পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি দেখিলে পিচ্‌কিরি দিয়া তখনই পেটের-ফাঁপ কমাইয়া দিবে। পিচ্‌কিরির কলটা বিগড়ে গিয়াছে তার্পিণও নাই—হিঙের আরোকও নাই—সাবান যে টুকু ছিল, কাল তা ফুরাইয়া গিয়াছে—কাল পিচ্‌কিরি দিবার চেষ্টা দেখিব, আজ খাবার অসুদ দিয়া দেখি, পেটের ফাঁপ কমে কি না—এ রকম করিয়া ভাবিয়া যেন রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিও না। ঠিক্ এই রকম

ভাবিয়া আর ঠিক্ এই রকম কাজ করিয়া অনেক মহাশয় অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। পিচকিরি দিবার কোনও উপায় নাই ভাবিয়া, খাবার অসুদের ব্যবস্থা করিয়া ডাক্তর মহাশয় সন্ধ্যার সময় বাড়ী গেলেন। রাত্রি দুপরের আগে থেকেই রোগীর নিশ্বাসটা জোরে জোরে পড়িতে লাগিল। নিশ্বাসের জোর ক্রমেই বাড়িতে লাগিল। বাড়ীর মেয়েরা কাঁদাকাটি আরম্ভ করিল। এত রাত্রে লোক পাঠানর কর্ম্ম নয় ভাবিয়া বাড়ীর কর্ত্তা নিজেই ডাক্তরের কাছে দৌড়িলেন। ডাক্তর খবর পাইয়া এক ছুটেই তাঁর সঙ্গে ছুটিলেন। গিয়া দেখেন রোগীর শ্বাস হইয়াছে। তাই ত! পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে এতদূর হয়, তা ত জানিতাম না। আমি ত সন্ধ্যার সময় দেখিয়া গিইছি, রোগীর আর কোনও উপসর্গ ছিল না। তবে ত শুদু পেট-ফাঁপারই বাড়াবাড়ী হইলে রোগী মরে? আজ আমার জ্ঞান হইল। সন্ধ্যার সময় যখন পেট ফাঁপার বাড়াবাড়ি দেখিছিলাম, তখন শুদু খাবার অসুদের ব্যবস্থা না করিয়া যদি পিচ্‌কিরি দিতাম, তা হইলে বোধ করি আজ রাত্রে রোগীর এ অবস্থা কখনই হইত না, আমাকেও এ বিষম লজ্জায় পড়িতে হইত না—এই রকম ভাবিতে ভাবিতে নিতান্ত অপ্রতিভ ভাবে তিনি রোগীর আত্মীয় স্বজনের দিকে ফ্যাল্ ফ্যাল্ করিয়া চাইতে লাগিলেন। কি অছিলায়—কি বলিয়া রোগীর কাছ থেকে উঠিয়া যাইবেন, কেবল তাই ভাবিতে লাগিলেন। শেষে গলা খাঁকা দিয়া থুতু ফেলিবার অছিলায়

বাইরে উঠিয়া গেলেন। এখন ত পলাইয়া বাঁচি, তার পর কাল্ সকালে যা হয় বলিব, কি শুনিব।

পেটের খুব বেশী ফাঁপ হইলে রোগীর শ্বাস হয় কেন? রোগীর নিশ্বাস ফেলিতে কষ্ট হয় কেন? কেন, তা বলি। বুকের খোল আর পেটের খোল, এই দুই খোলের মাঝখানে মাংসের একটা পর্দ্দা আছে। সেই পর্দ্দাকে ডাক্তরেরা ডায়াফ্রাম্ বলেন। ডায়াফ্রামের কথা ৪২৩র পাতে বলিছি। ফি নিশ্বাসে বাইরের বাতাস ফুস্কোর ভিতর যায়, আর ফুস্কো দুটী ফাঁপিয়া একবারে প্রকাণ্ড হয়। এই প্রকাণ্ড দুটী ফুস্কোর জন্যে বুকের খোল বড় হওয়ার দরকার। এ দিকে বিধাতার আবার এমনি কল যে, বুকের খোল বড় হওয়ার যে দরকার হয়, সেই অমনি ডায়াফ্রাম্ নীচের দিকে নামিয়া পড়ে। ডায়াফ্রাম্ নীচের দিকে নামিয়া গেলে, বুকের খোলের ভিতর ঢের জায়গা হয়। কাজেই, বাতাস-পোরা প্রকাণ্ড দুই ফুস্কোর জন্যে জায়গার অনাটন হয় না। তার পর যে নিশ্বাস ফেলি, সেই অমনি ফুস্কোর ভিতরকার বাতাস বাহির হইয়া যায়; আর ফুস্কো দুটী একবারে ছোট হইয়া যায়। এ রকম ছোট দুটী ফুস্কোর জন্যে বুকের খোলও ছোট হওয়ার দরকার। বুকের খোল ছোট হওয়ার যে দরকার হয়, সেই অমনি ডায়াফ্রাম্ উপর দিকে উঠিয়া যায়। ডায়াফ্রাম্ উপর দিকে উঠিয়া গেলে, বুকের খোলের ভিতরকার জায়গা ঢের কমিয়া যায়। আমরা যত বার নিশ্বাস লই, তত বারই ডায়াফ্রাম্ এই রকম করিয়া নীচের

দিকে নামিয়া পড়ে। আর যত বার নিশ্বাস ফেলি, তত বারই ডায়াফ্রাম্ এই রকম করিয়া উপর দিকে উঠিয়া যায়। রোগীর পেট ফাঁপিয়া ঢাক হইয়াছে। ভিতরে বাতাস জমিয়া পেট (পাকস্থলী) আর অন্ত্র এত ফুলিয়াছে যে, ডায়াফ্রাম্‌কে উপর দিকে ঠেলিয়া তুলিয়াছে। এখন এক বার ভাবিয়া দেখ, রোগীর নিশ্বাস লইবার কেমন সুবিধা! ডায়াফ্রাম্‌ই বা নীচের দিকে কেমন করিয়া নামে ? বুকের খোলই বা কেমন করিয়া ডাগর হয় ? বাতাস-পোরা ফুস্কোরই বা কেমন করিয়া জায়গা হয় ? জায়গার অনাটনে ফুস্কো মোটে গা মেলাতেই পারে না! তার ভিতর বাতাস যাবে কেমন করিয়া ? কাজেই, রোগীর শ্বাস আসিয়া উপস্থিত হয়। ঘন ঘন নিশ্বাস ফেলাকে ভাল কথায় শ্বাস বলে। যে কারণেই হোক্, সহজ বেলার মত পূর নিশ্বাস লইবার কোন রকম ব্যাঘাত ঘটিলেই ঘন ঘন নিশ্বাস লইতে হয়। ফি নিশ্বাসে ফুস্কোর ভিতর বাতাস যত কম যাবে, নিশ্বাসও তত ঘন ঘন পড়িবে। পূর নিশ্বাস লইতে না পারিয়া, সেই ক্ষতি পূরাইবারই জন্যে যেন রোগী অত ঘন ঘন নিশ্বাস লয়। খুব হিসাব করিয়া ঠাউরে দেখিলে, ফলে তাই-ই বটে। তবেই দেখ, খুব শক্ত রোগীর পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে তার শ্বাস হইতেও বিস্তর ক্ষণ লাগে না, মরিতেও বিস্তর ক্ষণ লাগে না।

কচি ছেলেদের পেট-ফাঁপার বাড়া বাড়ি হইয়াছে কি, অমনি শ্বাস হইয়াছে। পেট ফাঁপিলে কচি ছেলে

অনেক জায়গায় দেখিতে দেখিতে মারা যায়। ছেলে যত কচি, তার পেট-ফাঁপার তত ভয়। এ কথা এর আগেই-বলিছি। ছেলেদের পেট-ফাঁপা, পেটের কামড়, পেট-ফাঁপার দরুণ পেট ব্যথা আর হিক্কি—এ সব অস্বস্তির যেমন অসুদ ডিল্-ওয়াটর, তেমন অসুদ আর নাই। ছেলেদের অল্প স্বল্প পেট-ফাঁপা শুদু ডিল্-ওয়াটরেই সারে। ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক করিয়া ডিল্-ওয়াটর মাঝে মাঝে খাওয়াইলে ছেলেদের সোজাসুজি পেট-ফাঁপা শীঘ্রই সারিয়া যায়। তাদের পেট ফাঁপার একটু বাড়াবাড়ি হইলে, নীচে যে অসুদটী লিখিয়া দিলাম, সে অসুদটী আমি সর্ব্বদাই ব্যবহার করিয়া থাকি।

কার্ব্বনেট্ অব্ ম্যাগ্নীশিয়া	...	...	১২ গ্রেন
স্পিরিট্ ক্লোরোফর্ম্ম	...	...	১২ মিনিম্
টিংচর কার্ডেমম্ কো	...	...	১৮ মিনিম্
সিরপ্ জিঞ্জর ...	...	...	৩৬ মিনিম্
ডিল-ওয়াটর ...	...	...	১½ (দেড় ঔন্স)

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গাঁয়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ পেটের ফাঁপ থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাওয়াইবে। এখানে যে মাত্রায় অসুদ লিখিয়া দিলাম, এক বছরের ছেলের পক্ষে সে মাত্রা জানিবে। এক বছরের ছেলের অসুদের মাত্রা জানা থাকিলে, ছেলের বয়স বুঝিয়া অসুদের মাত্রা ঠিক্ করা শক্ত নয়।

এই অস্যুদে যদি পেটের ফাঁপ তড়ি ঘড়ি কমিয়া যায় ত ভালই; নৈলে. ৬৫২র পাতে পিচ্‌কিরির যে অস্যুদ লিখিয়া দিইছি, কাচের পিচ্‌কিরিতে করিয়া সেই অস্যুদ ছেলের গুহ্যদ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিবে। সেখানে পিচ্‌-কিরির অস্যুদ পূর মাত্রায় লিখিয়া দিইছি। বিশ বছরে পূর মাত্রা; এই হিসাব করিয়া ছেলের বয়স বুঝিয়া পিচ্‌-কিরির অস্যুদেরও মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে। সেখানে পিচ্‌কিরি দিবার যে নিয়ম আর যে জুত বরাত লিখিয়া দিইছি, এখানেও পিচ্‌কিরি দিবার সেই নিয়ম আর সেই জুত বরাত জানিবে।

পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়িতে যে ছেলে মর-মর হইয়াছে, পিচ্‌কিরি দিয়া সে ছেলেকেও বাঁচাইতে পারা যায়। সে রকম মর-মর ছেলে অনেক জায়গায় বাঁচানও গিয়াছে। ফল কথা, ছেলেরই বা কি, বুড়োরই বা কি. আর জোআ-নেরই বা কি, পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে, পিচ্‌কিরি দিতে কখনও ভুলিও না; পিচ্‌কিরি দিতে কখনও ইতঃ-স্ততও করিও না। এ ছাড়া, যদি দেখ যে. ছেলে বড় দুর্ব্বল হইয়াছে আর নেতিয়ে পড়িয়াছে, তবে দশ পোনর মিনিট অন্তর ডিল্-ওয়াটরের সঙ্গে তিন চারি ফোটা করিয়া একের নম্বর ব্রাণ্ডি খাওয়াইবে। এক বছরের ছেলেকে এক এক বারে চারি পাঁচ ফোটা করিয়া ব্রাণ্ডি দিতে পার।

য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ য়্যামোনিয়াও ছেলেদেরও পেট-ফাঁপার আর একটা ভাল অস্যুদ। এই জন্যে, খুব

দুর্ব্বল ছেলেদের পেট-ফাঁপায় ব্রাণ্ডির সঙ্গে দু এক ফোটা করিয়া য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব্ য়্যামোনিয়া খাওয়াইলে আরও উপকার হয়। ছেলেদের পেট-ফাঁপার দরুণ পেট-ব্যথা, য়্যারোম্যাটিক্ স্পিরিট্ অব য়্যামোনিয়ায় যেমন শীঘ্র সারে, তেমন আর কিছুতেই নয়।

হিঙও ছেলেদের পেট-ফাঁপার খুব ভাল অসুদ। ১০ ঔন্স জলে ১ ড্রাম টিংচর য়্যাসাফিটিডা (হিঙের আরক) দিয়া চা-চামচের এক চামচ করিয়া সেই অসুদ ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাওয়াইলে ছেলেদের পেট-ফাঁপা খুব শীঘ্র সারিয়া যায়। এ অসুদ ছেলেরা বেশ খায়।

ছেলেরই বা কি, বুড়োরই বা কি, আর জোআনেরই বা কি, পেট-ফাঁপায় কখনও জোলাপ দিও না। জোলাপে পেট-ফাঁপা বাড়ে বই কমে না। পেট-ফাঁপায় জোলা-পের অসুদ খাওয়ান ভাল নয়, জোলাপের অসুদ ঐ রকম করিয়া-পিচ্‌কিরি করিয়া দেওয়া ভাল।

তার পর বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর পেট-ফাঁপার চিকিৎসার কথা বলি। রোগীর পেট-ফাঁপিয়া ঢাক হই-য়াছে, মাঝে মাঝে, তার এমনি দুর্গন্ধ বায়ু সরিতেছে যে, তার কাছে তিষ্ঠন ভার। এ ছাড়া, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর যে অবস্থা ঘটিয়া থাকে, সে অবস্থা ত উপস্থিতই আছে। এখন তার কি রকম চিকিৎসা করিবে? এখন তাকে কি অসুদ দিবে? বাতশ্লেষ্ম-বিকারের এ রকম রোগীকে আমি যে সব অসুদ দিয়া থাকি, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

(১) খাবার অসুদ।

কার্ব্বণেট অব য়্যামোনিয়া	...	১ ড্রাম।
স্পিরিট ক্লোরোফর্ম্ম ...	...	৪ ড্রাম।
একের নম্বর ব্রাণ্ডি ...	...	৩ ঔন্স।
টিংচর কার্ডেমম কো ...	...	৬ ড্রাম।
টিংচর জিঞ্জর ...	...	৬ ড্রাম।
ডিল্ ওয়াটর ...		১২ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। যত ক্ষণ পেটের-ফাঁপ থাকিবে, দু ঘণ্টা অন্তর এক এক দাগ এই অসুদ খাইতে দিবে। এই অসুদের সঙ্গে (১০) দশ ফোটা করিয়া তার্পিণও দু ঘণ্টা অন্তর দিবে। জ্বরের সঙ্গে পেটের-ফাঁপ থাকিলে, তার্পিণে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোনও অসুদে নয়। এ ছাড়া, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের তার্পিণ একটী খুব ভাল অসুদ। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) খুব শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে রোগীর যে অবস্থা হয়, যে অবস্থা দেখিয়া ডাক্তর মহাশয়েরা বলেন রোগীর টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে, তার্পিণ সে অবস্থার যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর দুটী আছে কি না, বলিতে পারি না। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে তার্পিণ দিবার কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। এখানে মোটামুটি জানিয়া রাখ, তার্পিণ বাতশ্লেষ্ম-বিকারের অসুদ নয়, রোগীর জীবন। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে জুত বরাত করিয়া তার্পিণ দিতে পারিলে, খুব খারাপ রোগীও বেজায় হইতে পারে না।

(২) পিচ্‌কিরির অসুদ।

৬৫২র পাতে পিচ্‌কিরির যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, সেই অসুদ রোগীর গুহ্যদ্বারের মধ্যে পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। সেখানে পিচ্‌কিরি দিবার যে নিয়ম আর যে জুত বরাত লিখিয়া দিইছি, এখানেও পিচ্‌কিরি দিবার সেই নিয়ম আর সেই জুত বরাত জানিবে। রোজ সকালে একবার আর সন্ধ্যার আগে এক বার, নিয়ম করিয়া পিচ্‌-কিরি দিবে। যত দিন পেটের দোষ নির্দ্দোষ হইয়া না সারিবে, তত দিন নিয়ম করিয়া পিচ্‌কিরি দেওয়া চাই। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর পেটের দোষই চিকিৎসককে এক বারে হক্‌চকিয়ে দেয়। পেটের দোষ শুধরে দিতে না পারিলে বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগী ভাল করিতে পারা যায় না। পেটের দোষ কাকে বল ? পেটের দোষ কি ? পেটের ফাঁপকে পেটের দোষ বলি। পেট-নাবাকে পেটের দোষ বলি। ছিড়িক্ ছিড়িক্ করিয়া বারে বারে পাতলা দুর্গন্ধ বাহ্যে হওয়াকে পেটের দোষ বলি। খুব দুর্গন্ধ বায়ু সরাকে পেটের দোষ বলি। খুব দুর্গন্ধ গুটলে মল বাহ্যে হওয়াকে পেটের দোষ বলি। রকম বি রকম রং বি-রঙের বাহ্যে হওয়াকে পেটের দোষ বলি। আবার বাহ্যে না হওয়াকেও পেটের দোষ বলি। মোটামুটি ধর ত, বাতশ্লেষ্ম-বিকারে পেটের দোষ এই কয় রকমই সচ-রাচর দেখিতে পাওয়া যায়। আমি দেখিছি, ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, হিঙের আরক, আর সাবানের জলের পিচ্‌-কিরিতে সব রকম পেটের দোষই বেশ সারে। পেটের

ফাঁপ গেলে, আর মলের আকার প্রকার রং আর গন্ধ সহজ মলের মত হইলে, তবে পিচ্‌কিরি দেওয়া বন্ধ করিবে। বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীর সব রকম পেটের দোষই পিচ্‌কিরিতে সারে। তাতেই বলি, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের রোগীকে বাঁচাইবার প্রধান উপায়ই পিচ্‌কিরি। এমন উপায় যেন হেলা করিয়া হারাইও না। ক্যাষ্টর অইল, তার্পিণ, হিঙের আরক, সাবান আর পিচ্‌কিরির বাক্স—এই কয়টা জিনিষ যদি ঘর করিয়া রাখিতে পার, আর সময় মত নিয়ম করিয়া সেই সব জিনিষ ব্যবহার করিতে পার, তবে বাতশ্লেষ্ম বিকারের রোগীর চিকিৎসায় তুমি কখনও অপ্রতিভ হইবে না।

পাড়াগাঁয়ে পিচ্‌কিরির ব্যবহারটা খুবই কম—নাই বলিলেও হয়। গৃহস্থদের কথা দূরে থাক্‌ পিচ্‌কিরির নামে পাড়াগাঁয়ের ডাক্তর কবিরাজরাও ভয় পান। এ রকম ভয়ের কারণ আর কিছুই না। পিচ্‌কিরির ব্যবহার পিচ্‌কিরির দোষ গুণ, তাঁদের জানা নাই বলিয়াই তাঁরা ভয় পান। কুইনাইন্‌ আমাদের দেশে যখন বেশ চলিত হয় নাই, তখন জ্বরের রোগীকে কুইনাইন দিতে চিকিৎসকেরাও ভয় পাইতেন। এখন সেই কুইনাইন দিতে মেয়েরাও ডরায় না! জিনিষের ব্যবহার জানা থাকায় এত গুণ! গায়ের তাত থাকিতে রোগীকে কুইনাইন দিতে এখন বড় বড় ডাক্তরেরাও ভয় পান। ছুটুলে ডাক্তরদের ত কথাই নাই। কিন্তু গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন্‌ দেওয়াই স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) থেকে রোগীকে

বাঁচাইবার এক মাত্র উপায়—গাঁয়ে গাঁয়ে, পাড়ায় পাড়ায়, ঘরে ঘরে যখন সকলেই এ জানিতে পারিবে, তখন গায়ের তাত থাকিতে কুইনাইন দিতে মেয়েরাও ভয় পাবে না। হাঁপ-কাশের রোগীর হাঁপ চাগাইলে এক ঔন্স (আধ ছটাক) ডিল্-ওয়াটরের সঙ্গে ১০ গ্রেন আয়োডাইড অব পটা-সিয়ম্ আধ ড্রাম সল্‌ফিয়ুরিক ঈথর, আর আধ ড্রাম টিংচর বেলাডনা খাওয়াইয়া দিলে, প্রায় তখনই তখনই তার হাঁপ থামিয়া যায়। যিনি এ অসুদের ব্যবহার জানেন— যিনি এ অসুদ ব্যবহার করিয়া দেখিয়াছেন, হাঁপ-কাশের রোগীর হাঁপ চাগাইলে তিনি তাকে এ অসুদ দিতে কখনও ভয় পান না—কখনও ইতস্ততও করেন না। কিন্তু যাঁরা এ অসুদের ব্যবহার জানেন না, টিংচর বেলাডনার মাত্রা দেখিয়াই তাঁদের মাথা ঘুরিয়া যায়। এ রকম প্রেস্ক্রপশন্ (ব্যবস্থা পত্র) তাঁদের হাতে পড়িলেই, তাঁরা অমনি বলিয়া বসেন, প্রেস্ক্রপশন্ লিখিতে ডাক্তর মহাশয় ভুল করি-য়াছেন। কি সর্ব্বনাশ! টিংচর বেলাডনার মাত্রা আধ ড্রাম! আমি ত ভরসা করিয়া রোগীকে এ অসুদ খাওয়া-ইতে বলিতে পারি না!" আমার বেশ মনে আছে, মাস পাঁচ ছয় হইল, আমাদের দেশের এক জন গণ্য মান্য লোকের পৌত্রের কোষ্ঠবদ্ধ হইছিল। শিশুর বয়স তখন ছ মাসের বেশী নয়। ছেলে আজ চারি দিন বাহ্যে যায় নাই। মাঝে মাঝে, থেকে থেকে চম্‌কে উঠিতেছে, আর চীৎকার করিতেছে। ছেলের যে রকম ভাব গতিক দেখিতেছি, বোধ করি, শীঘ্রই তার তড়কা হবে। পিতা-

মহের মুখে পৌত্রের অসুখের এই রকম পরিচয় পাইয়া, আমি ব্রোমাইড অব পোটাসিয়ম্‌ খাওয়াইতে বলিলাম। আর পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইয়া দিতে বলিলাম। পিচ্‌-কিরির নাম করিতেই তিনি যেন একবারে আঁত্‌কে উঠি-লেন। কি সর্ব্বনাশ! অত টুকু ছেলেকে কি পিচ্‌কিরি দেওয়া যায়! পিচ্‌কিরির জল যদি বাহির হইয়া না আসে, তবেই ত বিপদ। পিচ্‌কিরি দিবার সময়, হয় ত, ছেলে কাঁদিয়াই সারা হবে। পিচ্‌কিরি লইতে যে কষ্ট হয়, অতটুকু ছেলে সে কষ্ট সৈতে পারিবে ত? কথায় কথা বাড়ে—অমন তর সজ্ঞান বুড়োর অজ্ঞানের মত কথার উত্তর দেওয়া সোজা নয় ভাবিয়া, তাঁকে বলিলাম, আপ-নার কোনও চিন্তা নাই। আমি পিচ্‌কিরি দিয়া এখনই ছেলের বাহ্যে করাইয়া দিতেছি। এই বলিয়া, ছটাক খানেক গরম জলে বেশ করিয়া সাবান্‌ গুলিলাম। সেই সাবান-গোলা জলে ড্রাম খানেক অলিব অইল (সুইট অইল) ঢালিয়া দিলাম। ঘরে ক্যাষ্টর অইল ছিল না বলিয়া তার বদলে সুইট অইল দিইছিলাম। তার পর, কাচের পিচ্‌কিরিতে করিয়া সেই খানি সব তার গুহ্য-দ্বারের মধ্যে চালাইয়া দিলাম। পিচ্‌কিরির জল তখনই তখনই বাহির হইয়া না আসে, এই জন্যে, ন্যাকড়ার পুঁটুলি দিয়া ছেলের গুহ্যদ্বার খানিক ক্ষণ চাপিয়া রাখিলাম। শিশু যখন খুব বেগ দিতে লাগিল, তখনই তার গুহ্যদ্বার থেকে ন্যাক্‌ড়ার পুঁটুলি সরাইয়া লইলাম। ন্যাকড়ার পুঁটুলি যে সরাইয়া লইলাম, সেই অমনি পিচ্‌কিরির জল

যেন পিচ্‌কিরি দিয়া বাহির হইয়া আসিল। পিচ্‌কিরির জলের সঙ্গে বাতাস আর গুট্‌লে মল বাহির হইয়া আসিল। তার পর সহজ মলও খানিক নির্গত হইল। বাহ্যে হইয়া গেলেই ছেলে চোক মেলিল আর সহজ বেলার মত চাইতে লাগিল। পিচ্‌কিরির এমন প্রত্যক্ষ ফল দেখিয়া, আর পৌত্রকে চোক মেলিতে দেখিয়া, পিতামহের তখন কথা ফুটিল। পিচ্‌কিরি দেওয়া এমন সহজ ব্যাপার—আর পিচ্‌কিরির এমন প্রত্যক্ষ ফল—এ আমার ধারণাই ছিল না। আগে আমি পিচ্‌কিরির নামেতেই ভয় পাইতাম। আজি আমার সে ভয় ঘুচিয়া গেল। তার পর পিতামহের মুখ এই রকম খুসি-খুসি দেখিয়া আমি বিদায় হইলাম। তাতেই বলিতেছি, পিচকিরির ব্যবহার, পিচ্‌কিরির দোষ গুণ, জানা নাই বলিয়াই পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরেরা পিচ্‌কিরিতে এত ভয় করেন।

বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর চিকিৎসা করিতে তোমাকে ডাকিল। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর পেট ফাঁপিয়া ঢাক হইয়াছে। তুমি পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইতে চাহিলে। এমন দুর্ব্বল রোগীকে কি পিচ্‌কিরি দেওয়া যায়? এমন দুর্ব্বল রোগীকে পিচ্‌কিরি দিতে বলিতে আমাদের ভরসা হয় না। খাবার অসুদের সঙ্গে এমন কোনও অসুদ যোগ করিয়া দিন, যাতে রোগীর দু একবার খোলসা দাস্ত হয়। রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা এ রকম অনুরোধ করিলে তুমি কি করিবে? তাঁদের অনুরোধ শুনিবে, না আপনার বিবেচনা মত কাজ করিবে? তাঁদের অনুরোধ শুনিলেই,

অপ্রতিভ হইবে। পিচ্‌কিরি যে দুর্ব্বল রোগীদেরই পক্ষে ব্যবস্থা, তাঁরা তা জানেন না। জানিবেনই বা কেমন করিয়া? পেট-ফাঁপার বাড়াবাড়ি হইলে হঠাৎ রোগীর জীবন রক্ষা করিবার যেমন উপায় পিচ্‌কিরি, তেমন উপায় আর নাই —এও তাঁরা জানেন না। ৫২৭র পাতে বলিছি রোগীর আব্‌দার শুনিয়া কি রোগীর বাড়ীর লোকের অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া রোগীকে কুপথ্য দিলে, সে কুপথ্যের ফলাফলের জন্যে চিকিৎসককে তারা অপ্রতিভ করিতে ছাড়ে না—এ কথাটা সব চিকিৎসকেরই যেন মনে থাকে। তাতেই এখানেও বলিতেছি, রোগীর আত্মীয়-স্বজনের উপ-রোধে পড়িয়া যদি পিচ্‌কিরি না দেও, আর রোগী তোমার হাতে মারা পড়ে, তবে তখন তারা তোমাকে অপ্রতিভ করিতে কখনও ছাড়িবে না। আমি ত পিচ্‌কিরি দিবারই ব্যবস্থা করিছিলাম। আপনারাই ত পিচ্‌কিরি দিতে দিলেন না। রোগী মারা গেলে, তোমার এ সব ওজর আপত্তির কথা তাঁদের কাছে তখন থাই পাবে না। পিচ্‌-কিরি না দিলে রোগী মারা যাবে—এ যদি আপনি ঠিক্ জানিতে পারিয়াছিলেন তবে কেন আপনি জিদ্ করিয়া পিচ্‌কিরি দিলেন না? চিকিৎসার ভাল মন্দ আমরা কি জানি? আমরা ও বিষয়ে মূর্খ বৈ ত না। আমাদের অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া যদি আপনারা কাজ করিলেন, তবে আপনাদের সঙ্গে আমাদের আর তফাত কি থাকিল? এ সব কথা বলিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজন শেষে তোমার গালে চুণ কালি দিতে পারে। তাতেই বলিতেছি, মোটা-

মুটি একবারে জানিয়া রাখ, গৃহস্থের বিদ্যা, বুদ্ধি, ধন, মান, যতই কেন থাক্ না, তাঁর অনুরোধ উপরোধে পড়িয়া তোমার বিবেচনার বিরুদ্ধ কোন কাজ করিবে না। চিকিৎসা করিতে গিয়া তর্ক বিতর্ক করিয়া রোগীর আত্মীয় স্বজনকে বুঝান সোজা নয়—সুখেরও বিষয় নয়। আমি ত বলি, তর্ক বিতর্ক করাই উচিত নয়। তুমি চিকিৎসক; চিকিৎসার বৈ পড়িয়াছ, দশ জায়গায় দশ রকম রোগের চিকিৎসা করিয়াছ, কোন্ রোগে কি করিলে কি ফল হয়, তুমি তা হাতে কলমে করিয়া দেখিয়াছ। রোগীর আত্মীয় স্বজন তার কিছু জানেনও না, শুনেনও নাই। তাঁদের সঙ্গে তোমার তর্ক-বিতর্ক তবে কেমন করিয়া চলিতে পারে? তাতেই বলিতেছি, তর্ক বিতর্ক করিও না, হাতে কলমে করিয়া হাতে হাতে ফল দেখাইয়া দেও, তবে তাঁদের দিব্য জ্ঞান জন্মিবে।

৫২৭র পাতে বলিছি, বুদ্ধি, বিবেচনা, ধৈর্য্য বা প্রতিজ্ঞার একটু ত্রুটি হইলে, চিকিৎসকের আর রক্ষা নাই। সেই একটু ত্রুটিতেই তাঁর মান সম্ভ্রম সবই যায়। পিচ্‌কিরি দিবারও বেলায় যেন এ সব কথা মনে থাকে। বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীর পেট ফাঁপিলে পিচ্‌কিরি দিতে হয়, জান; তাই বলিয়া রোগীর শ্বাস হইলেও পিচ্‌কিরি দিতে হবে, এমন কিছু কথা নাই। সব কাজেই বিবেচনার দরকার। তোমারও পিচ্‌কিরি দেওয়া সারা হইল—রোগীও খাবি খাইয়া মরিল। রটনা হইল, পিচ্‌কিরি দিয়াই তুমি রোগীটেকে মারিলে। ঘটনা কিন্তু তা নয়। রোগী

মরিতই। তবে তফাত এই যে, তুমি স্থির হইয়া রোগীর কাছে যদি খানিক ক্ষণ বসিতে, আর তার অবস্থা বেশ ঠাউরে দেখিতে, তবে তোমাকে পিচ্‌কিরিও করিতে হইত না, কলঙ্কের ডালিও মাথায় করিতে হইত না। অনেক ডাক্তর অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া মিছামিছি অপযশ কিনিয়াছেন। চাপরাশ-ওয়ালা খুব নাম-জাদা ডাক্তরদের এ রকম অপযশে কিছু যায় আসে না। এ রকম অপযশ তাঁরা গ্রাহ্যই করেন না। তাঁদের বেলায় এ রকম অপযশের কথা কেউ ফুটিয়া বলিতেই সাহস পায় না। কিন্তু পাড়াগাঁয়ের ডাক্তরদের বেলায়, রোগীর আত্মীয় স্বজনেরা, পাড়া প্রতিবাসিরা তিলে তাল করিয়া থাকেন। তাতেই বলিতেছি, যে কাজ করিবে, খুব বিবেচনা করিয়া করিবে। ধীরে, সুস্থে, খুব ঠাউরে দেখিয়া তবে কাজ করিবে। আগ পাছ বিবেচনা না করিয়া তাড়াতাড়ি যে কাজ করিবে, তাতেই ঠকিবে, তাতেই অপ্রতিভ হইবে, তাতেই কলঙ্কের ভাগী হইবে। রোগীর কাছে অনেক ক্ষণ স্থির হইয়া বসিয়া তার ভাব গতিক বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিবে। তার পর, পিচ্‌কিরি দেওয়া বিবেচনা হয়, পিচ্‌কিরি দিবে; আর যা যা করিতে হয়, করিবে। থাকে ফাঁড়া উৎরে যাবে বলিয়া, হাঁকা দম্‌কা কোনও কাজ করিও না। রোগী কাল্‌ ঘাম ঘামিতেছে, নাড়ী খুঁজিয়া পাওয়া যায় না, নিশ্বাস জোরে জোরে পড়িতেছে—এ সব দেখিয়াও পেট ফাঁপিলে পিচ্‌কিরি দিতে হয় জান বলিয়া, আগ পাছ না ভাবিয়া পিচ্‌কিরি দিলে। এ রকম অবিবে-

চনার ফল কি ? ফল মন্দ নয়। আমার ছেলেটীর বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছে। কাল্ রাত্রি থেকে পেটটা কিছু বেশী ফাঁপিয়াছে। আপনাকে আমার বাড়ীতে এখনই একবার যাইতে হবে। অনুগ্রহ করিয়া পিচ্‌কিরির বাক্সটা রাখিয়া আর যা যা লইতে হয়, লইয়া শীঘ্র আসুন। আজি আবার কাকে খুন করেন দেখ। ডাক্তর মহাশয় ত পিচ্‌কিরির বাক্স হাতে করিয়া পাড়ার ভিতর ঢুকিলেন—অনেক দিন পর্য্যন্ত তাঁকে এই রকম ভাবের কথা বার্ত্তা শুনিতে হয়। এতে তাঁর পসার কেমন হয়, মান সম্ভ্রম কেমন বাড়ে, যাঁরা এ রকম দায়ে ঠেকিয়াছেন, তাঁরাই তা জানেন।

পেট-ফাঁপার কথা লিখিতে গিয়া অনেক ফাল্‌তো কথা লিখিয়া ফেলিলাম। যাঁদের জন্যে বৈ লিখিতেছি, তাঁরা যদি সাবধান আর চৌকোশ হইতে চান, তবে এ সব ত ফাল্‌তো কথা মনে করিবেন না।

(৩) তার্পিণের সেক।

৬৬০র পাতে কার্ব্বণেট্ অব্ য়্যামোনিয়া মিক্‌শ্চরের সঙ্গে ১০ ফোটা করিয়া তার্পিণ দিতে বলিছি। ক্যাষ্টর অইল, হিঙের আরোক আর সাবানের জলের সঙ্গে তার্পিণ পিচ্‌কিরি করিয়া দিতে বলিছি। এ ছাড়া, রোগীর সকল পেটে তার্পিণের সেক দিবে। তার্পিণের সেক কেমন করিয়া দিতে হয় ১৭২র পাতে তা বলিছি। পেটে তার্পিণের সেক দিলে যে কেবল পেট-ফাঁপাই কমে, তা নয়; রোগী চাঙ্গা হয়, আর তার সন্নিপাত ঘুচিয়া যায়। তার্পিণের সেকে রোগীর পেটের দোষ কাটিয়া যায়। তবেই দেখ, পেট-ফাঁপায় এক

তার্পিণ তিন রকম করিয়া ব্যবহার করিতে হয়। এতেই বলিতেছি, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের পেট-ফাঁপার যেমন অসুদ তার্পিণ, তেমন অসুদ আর নাই। সন্নিপাতের পেট-ফাঁপারও তার্পিণ খুব ভাল অসুদ। যে কারণেই হোক, শরীরের বল একবারে কমিয়া গেলে, রোগী একবারে নেতিয়ে পড়িলে, তার যে অবস্থা হয়, সেই অবস্থাকেই সন্নিপাত বলে। এই জন্যে, বাতশ্লেষ্ম-বিকারের পেট-ফাঁপাকেও সন্নিপাতের পেট-ফাঁপা বলিতে পার।

(৪) বাতশ্লেষ্ম-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেওয়া যায়, পেটে গিয়া তা না পচিতে পারে, তার অসুদ।

এর আগে অনেক বার বলিছি, হজম বল, পরিপাক বল, সবই পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির বলে হয়। বাতশ্লেষ্ম বিকারে অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির সেই বল যেমন কমিয়া যায়, অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির যেমন দুর্দ্দশা ঘটে, তেমন আর কোনও রোগে নয়। এই জন্যে, বাত-শ্লেষ্ম-বিকারে রোগীকে যা পথ্য দেও, পেটে গিয়া তা পচে, আর তা থেকে গ্যাস উঠিয়া পেটের ফাঁপ করে। এখন দেখ, রোগীকে যা পথ্য দিবে, তার পেটে গিয়া তা পচিতে না পারে এমন কোনও অসুদ আছে কি না? আছে, ভাল অসুদই আছে। সে অসুদ আর কি? সল্‌ফো কার্ব্বণেট অব্ সোডা। রোগীকে পথ্য দিবার একটু আগে দশ গ্রেন্ কি পোনর গ্রেন্ সল্‌ফো কার্ব্বলেট অব্ সোডা খাওয়াইয়া দিলে তার পেটে আহার আর পচিতে পারে না। সল্‌ফো-কার্ব্বলেট অব্ সোডা সে আহার পচিতে দেয় না, কাজে

কাজেই, তার পেট-ফাঁপার কারণই দূর করিয়া দেয়। সল্‌ফো কার্ব্বলেট অব্‌ সোডার এটী ভারি গুণ। তাতেই বলি, যদি ধর ত বাতশ্লেষ্ম-বিকারের পেট-ফাঁপার যত অসুদ আছে, সল্‌ফো কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা সব চেয়ে ভাল অসুদ। কেন না, রোগীর আহার বন্ধ রাখিলে শুদ্ধু অসুদে তার জীবন রক্ষা হয় না। এ দিকে আবার এক গুণ আহার দিলে, পেটের-ফাঁপ তার দশ গুণ হয়। এ অবস্থায় কি করিবে? আহার বন্ধ রাখ ত রোগী মরে। আবার আহার দেও ত, যে পেট-ফাঁপা কমাইবার জন্যে এত যত্ন— এত চেষ্টা করিতেছ, সেই পেট-ফাঁপা বাড়িয়া যায়। এ বিষম বিপত্তি থেকে তোমাকে উদ্ধার করিবার উপায়ই সল্‌ফো কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা। ডিল্‌-ওয়াটরের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইয়া সল্‌ফো কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা খাওয়াইয়া দিবে। রোগীকে এ অসুদ রোজ তিন বারের বেশী খাওয়াইবার দরকার নাই। সকালে একবার, দুপর বেলা একবার, আর সন্ধ্যার পর একবার, নিয়ম করিয়া এ অসুদ এই তিন বার খাওয়াইবে। তার পর, যে পথ্য দিবে, মাত্রায় কম করিয়া বারে বেশী দিবে। সল্‌ফো কার্ব্বলেট অব্‌ সোডা যে সে ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায় না; সাহেবদের ডিস্পেন্সরিতে পাওয়া যায়। এর দাম বেশী নয়। তবে সাহেবদের ডিস্পেন্সরির সব অসুদেরই দাম কিছু বেশী। তাই বলিয়াই যা কিছু বেশী লয়।

তার পর, এখন পেট-ফাঁপার রোগীর পথ্যের কথা বলি।

পথ্য—১২৭র পাতে বলিছি, পেট-ফাঁপা থাকিলে সাগু য়্যারারুট, খৈ, যব (বার্লি), এ সব দেওয়া ভাল নয়; দিলে পেট-ফাঁপা বাড়ে। পেট-ফাঁপায় মাংসের ক্কাথ আর চূণের জল মিশনো এক বল্কা দুধ ভাল। মাংসের ক্কাথ কেমন করিয়া তয়ের করে, ১২৮—১৩১র পাতে তা বলিছি। চূণের জলের কথা ৫৯৫—৫৯৭র পাতে বলিছি। অনেকেই বলেন, মাংসের ক্কাথ আর দুধ, দুই-ই সেই এক রোগীকে দেওয়া যায় না; দিলে তার পেটের দোষ ঘটে। আমি তাঁদের এ যুক্তি বা নিদান বুঝিতে পারি না। রোগীর আহার লঘু, মাত্রায় কম, বারে বেশী—যুক্তি করিয়া এই তিনের মিল ঠিক্ রাখিতে পারিলে, সে পথ্যে, রোগীর কোনও অপকার করে না। মোটামুটি এইটী জানিয়া রাখ। এ ছাড়া, মাংসের ক্কাথ, আর দুধ একত্র দিবার দরকার নাই। দুই জিনিষ একত্র মিশিয়া গুরুপাক হইতে পারে। এই জন্যে, যখন মাংসের ক্কাথ দিবে, তখন নিয়ম করিয়া বারে বারে একটু একটু শুদ্ধ মাংসের ক্কাথই দিবে। তার পর, যখন দুধ দিবে, তখন নিয়ম করিয়া বারে বারে একটু একটু শুধু দুধই দিবে। এ নিয়মে সেই এক রোগীকেই মাংসের ক্কাথ আর দুধ, দুই-ই নির্ব্বিঘ্নে দিতে পার।

১০। প্রস্রাব-বন্ধ——প্রস্রাব না হওয়াকে প্রস্রাব-বন্ধ বলে। মূত্রের থলিতে (ব্লাডরে) মূত্র জমিয়া থাকে, কিন্তু প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত্র বাহির হইতে পারে না। এ এক রকম প্রস্রাব-বন্ধ। এ রকম

প্রস্রাব-বন্ধকে প্রস্রাব আটকান বলে। প্রস্রাব আটকানকে ডাক্তরেরা রিটেন্‌শন্ অব ইয়ুরিন্ বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রাবরোধ বলে। আর এক রকম প্রস্রাব-বন্ধ আছে। তাতে আদৌ মূত সৃষ্টিই হয় না। কাজে কাজেই, মূতের থলিতে মূত মোটে আসেই না। রক্ত থেকে আলাদা আলাদা জিনিষ তয়ের করিবার জন্যে, শরীরের ভিতর আলাদা আলাদা যন্ত্র আছে। রক্ত থেকে মূত তয়ের করিবার যে যন্ত্র, তাকে ডাক্তরেরা কিড্‌নি বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় মূত্র-গ্রন্থি বলে। মূত্র-গ্রন্থির কথা ৫৭১র পাতে বলিছি। ওলাউঠার রোগীর গা যখন পাঁকের মত ঠাণ্ডা হইয়া যায়, তখন রক্ত থেকে মূত আর তয়ের হয় না—মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। এ ছাড়া, খুব শক্ত এক রকম স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) আছে। সে জ্বরে রোগীর সব গা হল্‌দে হইয়া যায়, আর রোগী ঠিক্ যেন শিয়াই কালি বমি করে। সে জ্বরকে ডাক্তরেরা ইয়লো ফীবর বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় পীত-জ্বর বলিতে পার। হল্‌দের ভাল কথা পীত। সে জ্বরেও রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। সে জ্বরের কথা এর পর বলিব। আরও অনেক রোগে—আরও অনেক কারণে রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে, কাজে কাজেই মূতের থলিতে মূত মোটে আসেই না। এ রকম প্রস্রাব-বন্ধকে ডাক্তরেরা সপ্রেশন্ অব ইয়ুরিন বলেন; ভাল বাঙ্গালায় মূত্রাঘাত বলে। মূত্রাঘাতকে সোজা বাঙ্গালায় মূতের অভাব বলিতে পার। তবেই দেখ, প্রস্রাব-বন্ধ

দু রকমে হয়। প্রস্রাব আট্‌কাইয়া গেলে, রোগীর প্রস্রাব হয় না; একেও আমরা প্রস্রাব-বন্ধ বলি। আবার রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলে রোগীর প্রস্রাব হয় না। একেও আমরা প্রস্রাব-বন্ধ বলি। এখন, রোগীর প্রস্রাব-বন্ধ হইয়াছে বলিয়া তোমাকে ডাকিয়া লইয়া গেল। তুমি কেমন করিয়া ঠিক্ করিবে, রোগীর প্রস্রাব আট্‌কাইয়া তার প্রস্রাব-বন্ধ হইয়াছে? কি, রক্ত থেকে মূত তয়ের হয় নাই বলিয়া তার প্রস্রাব-বন্ধ হইয়াছে? তা ঠিক্ করা শক্ত নয়। প্রস্রাব আট্‌কাইয়া যে প্রস্রাব-বন্ধ হয়, তাতে মূতের থলিতে মূত- জমিয়া থাকে। মূতের থলিতে মূত যত বেশী জমিয়া থাকে, রোগীর তল্‌-পেটের নীচের দিক তত উচু উচু মালুম হয়, নজরেও উচু মালুম হয়, হাতেও সে উচু বেশ মালুম হয়। সেই উচু জায়গার উপর বাঁ হাতের একটী কি দুটী আঙুল উপুড় করিয়া রাখিয়া, তার উপর ডাইন হাতের মাঝের তিনটী আঙুলের আগা দিয়া আস্তে আস্তে ঘা দিলে নিরেট শব্দ বাহির হয়। ফাঁপা শব্দ আর নিরেট শব্দের কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। নিরেট শব্দ বাহির হইলেই ঠিক্ করিবে, মূতের থলিতে (ব্ল্যাডরে) মূত জমিয়া আছে। মূতের থলিতে মূত যদি বেশীও না থাকে, নজরে তল্‌-পেটের নীচেটা যদি বেশ উচু উচু মালুম না হয়, আর হাত দিয়াও সে উচু যদি বেশ টের পাওয়া না যায়, তবু আঙুলের ও রকম ঘা দিলে কিছু না কিছু নিরেট শব্দ বাহির হয়-ই। মূতের থলিতে মূত না থাকিলে, তল-পেটের নীচে আঙুলের ও রকম ঘা দিলে ফাঁপা শব্দ

বাহির হয়। এ ছাড়া, মূতের থলিতে মূত জমিয়া থাকিলে, তল্‌-পেটের নীচে দিক্‌টের যেমন পূরন্ত বা উচু উচু ভাব হয়, মূতের থলিতে মূত না থাকিলে তল্‌-পেটের নীচের দিকটের সে রকম ভাবে কিছুই থাকে না। পূরন্ত বা উচু উচু ভাবের ঠিক্ উল্টই দেখা যায়। কাহিল বা হাড়ে মাসে জড়িত মানুষের পেটে কিছু না থাকিলে, আমরা বলি, তার পেটের মধ্যে পেট সাঁদিয়ে গিয়াছে। তেম্‌নি কাহিল বা হাড়ে মাসে জড়িত রোগীর মূতের থলিতে মূত না থাকিলে, তার তল্‌-পেটের মধ্যে তল্‌-পেট সাঁদিয়ে গিয়াছে, বলিতে পার। মোটা মানুষের বেলায় এ সব কথা খাটে না। খুব চর্ব্বি-ওয়ালা মোটা মানুষের পেটে কিছু থাকিলেও যা, না থাকিলেও তাই। তার মূতের থলিতে মূত জমিয়া আছে কি না, তার তল্‌-পেটের আকার প্রকার দেখিয়া তা বেশ মালুম করিতে পারা যায় না।

প্রস্রাব করাইবার এক রকম শলা আছে। সে শলাকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটর্ বলেন। মূতের থলিতে মূত জমিয়া আছে কিনা, প্রস্রাবের দুওর দিয়া সেই শলা মূতের থলির মধ্যে চালাইয়া দিলে, তা যেমন ঠিক্ করিয়া জানিতে পারা যায়, তেমন আর কিছুতেই নয়। মূতের থলিতে যদি মূত থাকে, তবে মূতের থলির মধ্যে শলা যে যায়, সেই অমনি তার ভিতর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসে। মূতের থলিতে মূত যদি না থাকে, তবে শলার ভিতর দিয়া কিছুই বাহির হইয়া আসে না। তাতেই বলিতেছি, মূতের থলিতে মূত জমিয়া আছে কি না, প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূতের থলির

মধ্যে শলা চলাইয়া তা যেমন ঠিক্ করিয়া বলিতে পারা যায়, এমন আর কিছুতেই নয়। প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূতের থলির মধ্যে শলা চালানকে ডাক্তরেরা ক্যাথিটর্ পাস্ করা বলেন।

স্বল্পবিরাম-জ্বরের (রিমিটেণ্ট ফীবরের) একটী উপসর্গ বলিয়া যে প্রস্রাব-বন্ধের কথা এখানে বলিতেছি, সে প্রস্রাব-বন্ধ, প্রস্রাব-আট্কান বৈ আর কিছুই নয়। প্রস্রাব-আট্কানকে ডাক্তরেরা রিটেনশন্ অব্ ইয়ুরিন্ বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি।

প্রস্রাব-আট্কানর কারণ অনেক। অনেক কারণে প্রস্রাব-আট্কাইতে পারে—আট্কাইয়াও থাকে। মোটা-মুটি ধর ত প্রস্রাব-আট্কানর কারণ দু রকম। মূতের থলির নিজের একটী বল আছে। সেই বলেই মূতের থলি প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত্র বাহির করিয়া দেয়। সেই বলের অভাব প্রস্রাব আট্কানর একটী কারণ। আর, প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার কোন রকম ব্যাঘাত প্রস্রাব আট্কানর আর একটী কারণ। এই দু রকম কারণের কথা এখন এক এক করিয়া বলি।

(১) মূতের থলিতে মূত জমিলে সে মূত বাহির করিয়া দেয় কে ? মূতের থলি নিজেই সে মূত বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ড জড়-শড় হইয়া তার ভিতর-কার রক্ত যেমন সব শিরের ভিতর চালাইয়া দেয়, মূতের থলিও তেম্নি জড়-শড় হইয়া তার ভিতরকার মূত প্রস্রা-বের দুওর দিয়া বাহির করিয়া দেয়। হৃৎপিণ্ড যেমন

মাংসের থলি, মূতের থলিও তেম্‌নি মাংসের থলি। তবে হৃৎপিণ্ডের থলি খুব মোটা, মূতের থলি তেমন মোটা নয়—ঢের পাতলা। হৃৎপিণ্ড যেমন নিজের বলে জড়-শড় হইয়া ভিতরকার রক্তের উপর চাপ দিতে পারে, মূতের থলিও তেম্‌নি নিজের বলে জড়-শড় হইয়া ভিতরকার মূতের উপর চাপ দিতে পারে। শরীর যত দিন বেশ সবল আর সুস্থ থাকে, মূতের থলির সে বল ঠিক্ সমান থাকে। এই জন্যে, সহজ বেলায় প্রস্রাবের চেষ্টা হইলে, তখনই প্রস্রাব করিতে পারি। শরীরের ভিতর এম্‌নি সব কল বল আছে যে, মূতের থলির ভিতর মূত জমিলেই প্রস্রাবের চেষ্টা হয়। তেম্‌নি মলের নাড়ীতে (রেক্টমে) মল জমিলেই বাহ্যের চেষ্টা হয়। তার পর বলি। মূতের থলির সে বল যত দিন ঠিক্ থাকে, প্রস্রা-বের চেষ্টা হইলেও প্রস্রাব করিতে পারি। যে কার-ণেই হোক্, মূতের থলির সে বল গেলে, প্রস্রাবের চেষ্টা হইলে আমরা আর প্রস্রাব করিতে পারি না। মূতের থলির সে বল কিসে যায়—সে বল কিসে নষ্ট হয়, এখন তাই বলি।

(ক) সহজ শরীরে মূতের থলিতে যদি অনেকক্ষণ পর্য্যন্ত খুব বেশী মূত জমিয়া থাকে, তবে মূতের থলির সে বল নষ্ট হয়—মূতের থলি জড় শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিয়া মূত আর বাহির করিয়া দিতে পারে না। যদি বল, সহজ শরীরে মূতের থলিতে কেমন করিয়া এত মূত জমিয়া থাকিবে? মূতের থলিতে মূত জমিলেই ত প্রস্রাবের চেষ্টা

হয় ? সে কথা সত্য। কিন্তু প্রস্রাবের চেষ্টা হইলেও—প্রস্রাবের পীড়া হইলেও যদি প্রস্রাব না কর—প্রস্রাবের বেগ ধারণ করিয়া রাখ—প্রস্রাবের বেগ সম্বরণ কর, তবে তোমার মূতের থলিতে মূত জমিয়া থাকিবে বৈ আর কি হবে ? মূতের থলিতে মূত ক্রমেই বেশী জমিতে থাকে। যত বেশী জমে, রবারের থলির মত মূতের থলি ততই বাড়িয়া যাইতে থাকে। মূতের থলি মূতের ভরে যখন খুব বাড়িয়া যায়, জড়-শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিবার তখন তার আর শক্তি থাকে না। তখন প্রস্রাব করিবার চেষ্টা করিলেও প্রস্রাব করিতে পার না। এ অবস্থায় শলা দিয়া প্রস্রাব করান ভিন্ন তোমাকে বাঁচাইবার আর উপায় নাই। দু দিকের দুটী মূত্র-নলী (মূতের নলী) দিয়া মূতের থলিতে ফি মিনিটে ৫। ৬ ফোটা করিয়া মূত পড়ে। মূতের নলির কথা ৫৭১—৫৭২র পাতে বলিছি। এতেই মনে কর, মূতের থলিতে মূত কত শীঘ্র শীঘ্র জমে। সন্ধ্যার পর আহারাদি করিয়া গান বাজনা শুনিতে বসিলে, রাত্রি দশটার সময় তোমার প্রস্রাবের চেষ্টা হইল। প্রস্রাব করিবার জন্যে তখন উঠিয়া বাহিরে যাওয়া ঢের অসুবিধা মনে করিয়া, ভোর পর্য্যন্ত অনেক কষ্টে প্রস্রাবের বেগ সম্বরণ করিয়া রাখিলে। শেষে গান ভাঙিয়া গেলে তাড়াতাড়ি গিয়া প্রস্রাব করিতে বসিলে। অনেক চেষ্টা করিলে, কিন্তু কিছুতেই প্রস্রাব করিতে পারিলে না। প্রস্রাব করিতে পারিবে কেমন করিয়া ? মূতের থলি জড়-শড় হইয়া ভিতরকার মূতের উপর চাপ দিতে না পারিলে ত আর

প্রস্রাবের ছুণ্ডর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিতে পারে না। মূতের থলির জড় শড় হইবার যে শক্তি, তার দফা ত তুমি ইচ্ছা করিয়াই নিকেশ করিয়াছ। এ রকম ঘটিলে উপায় কি? উপায় আর কি? শলা দিয়া প্রস্রাব না করাইয়া দিলে জীবন রক্ষা হওয়াই ভার। শলা দিয়া প্রস্রাব না করাইয়া দিলে, মূতের থলি ছাপাইয়া মূত ফিরে মূত্র-গ্রন্থিতে গিয়া উপস্থিত হয়। মূতের থলি থেকে মূত ফিরে আবার মূত্র গ্রন্থিতে কেমন করিয়া যায়? মূতের যে দুটী নলী দিয়া মূত, মূত্র-গ্রন্থি থেকে মূতের থলিতে আসিয়া পড়ে, সেই দুই নলী দিয়াই মূত ফিরে মূত্র-গ্রন্থিতে যায়। মূতের ভরে মূতের থলিও যেমন বাড়িয়া যায়, মূতের নলি দুইটিও তেমনি বাড়িয়া যায়, আর মূত্র-গ্রন্থি দুটীও তেমনি বাড়িয়া যায়। এ রকম ঘটনার ফল কি? ফল আর কি? মৃত্যু! রক্ত থেকে মূত তয়ের করাই মূত্র গ্রন্থির কাজ। এখন মূত্র-গ্রন্থির নিজেরই যে দুর্দ্দশা, তাতে সে কাজ করে কে? কাজে কাজেই, রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া যায়। রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলেই আর কি, সর্ব্বনাশ! মূতের সঙ্গে শরীরের যে বিষ বাহির হইয়া যায়, সে বিষ আর বাহির হইয়া যাইতে পারে না। সে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিয়া রোগীর বিকার উপস্থিত করে। রোগী একবারে অজ্ঞান, অচৈতন্য হইয়া পড়ে। এ অবস্থা ঘটিলে রোগী বেশী ক্ষণ বাঁচে না। মূতের সঙ্গে শরীরের যে বিষ বাহির হইয়া যায়, ডাক্তারেরা সে বিষকে ইয়ুরীয়া বলেন। সে বিষ রক্তের সঙ্গে মিশিলে রোগীর যে বিকার উপস্থিত হয়, সে বিকারকে ডাক্তারেরা ইয়ুরীমিয়া বলেন। যে কারণেই হোক,

রক্ত থেকে মূত তয়ের হওয়া বন্ধ হইয়া গেলেই রোগীর এই রকম বিকার (ইয়ুরীমিয়া) হয়। ওলাউঠা-রোগীর এ রকম বিকার সচরাচরই হইয়া থাকে। ওলাউঠা-রোগের কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। ওলাউঠা-রোগের বৈ এক খানি আলদা করিয়া লিখিব।

(খ) শির দাঁড়ার ভিতরকার মাইজে বেশী রকম কোন ঘা ঘো লাগিলে, কি শির দাঁড়ার মাইজের কোন ব্যামো স্যামো হইলে মূতের থলির সে বল থাকে না—সে বল নষ্ট হইয়া যায়। মাথার খোলের ভিতর মগজ থাকে। মগজকে ডাক্তরেরা ব্রেইন বলেন, ভাল বাঙ্গালায় মস্তিষ্ক বলে। মগজকে সোজাসুজি মাথার ঘিলুও বলে। এ সব কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। শির দাঁড়ার খোলের ভিতর এক রকম মাইজ থাকে। সে মাইজকে ডাক্তরেরা স্পাইনাল্ কর্ড বলেন। স্পাইনাল্ কর্ডকে স্পাইন্যাল্ ম্যারোও বলে। স্পাইনাল কর্ডকে ভাল বাঙ্গালায় কাশেরুক মজ্জা বলে; সোজাসুজি শির-দাঁড়ার মাইজ বলিতে পার; শির-দাঁড়ার ভাল কথা কশেরুকা, আর মাইজের ভাল কথা মজ্জা। মাথার ঘিলু আর শির-দাঁড়ার মাইজ এক স্যাতা। শির দাঁড়ার মাইজ সুদ্ধ মাথার ঘিলু যদি দেখ, তবে শঙ্কর মাছের আকার প্রকারের কথা তোমার মনে পড়িবে। যারা শঙ্কর মাছ দেখিয়াছেন, তাঁদের বুঝাইবার জন্যে আর বেশী কথা বলিবার দরকার নাই। যাঁরা শঙ্কর মাছ দেখেন নাই, শঙ্কর মাছের গড়ন তাঁদের জোড়তাড়ে বুঝাইয়া দিতে হবে। মনে কর গোখুরো সাপে কাছিমের শুঁড় কামড়াইয়া ধরিল। কাছিম সাপের মুখ শুদ্ধ শুঁড় টানিয়া ভিতরে

রহিল। খানিক পরে এই অবস্থায় কাছিমও মরিল, সাপও মরিল। এখন কোনও জায়গায় বাঁকা চোঁকা না থাকে, এ রকম ভাবে সাপটী খোজা করিয়া রাখ। কাছিম সুদ্ধ এই সাপের গড়ন যে রকম, মাথার ঘিলু সুদ্ধ শির-দাঁড়ার মাইজের গড়ন মোটামুটি সেই রকম ভাবিয়া লও। পক্ষাঘাত রোগের কথা বলিবার সময়, মাথার মগজের কথা আর শির-দাঁড়ার মাইজের কথা ভাল করিয়া বলিব। শির দাঁড়ার এই মাইজে বেশী রকম কোন ঘা ঘো লাগিলে, কি শির-দাঁড়ার মাইজের কোন রকম ব্যামো স্যামো হইলে মূতের থলির সে বল থাকে না—সে বল নষ্ট হইয়া যায়—জড় শড় হইয়া মূতের উপর মূতের থলির চাপ দিবার শক্তি থাকে না।

(গ) মাথার মগজের কোন রকম ব্যামো স্যামো হইয়া রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে, মূতের থলির সে বল কাজে কাজেই আর থাকে না। এর আগেই বলিছি, শরীরের ভিতর এমনি সব কল বল আছে যে, মূতের থলিতে মূত জমিলেই প্রস্রাবের চেষ্টা হয়। প্রস্রাবের চেষ্টা হইলেই মূতের থলি নিজের সেই বলে জড় শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়। রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে মূতের থলিতে মূত জমিয়াছে কি না, সে তা মোটে জানিতেই পারে না। কাজে কাজেই, প্রস্রাবেরও কোনও চেষ্টা হয় না,—চেষ্টা হইতেই পারে না। প্রস্রাবের চেষ্টা না হইলে, মূতের থলি জড় শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দিতে পারে না। কাজে কাজেই, প্রস্রাব আটকাইয়া যায়, মাথার মগজের ব্যামোর কথা এর পর বলিব।

(ঘ) বাতশ্লেষ্ম বিকারেও আর আর অনেক রকম শক্ত জ্বরেও, রোগী অজ্ঞান হইয়া গেলে ঠিক ঐ রকম করিয়া প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। সন্নিপাত অবস্থায়ও এই রকম করিয়া রোগীর প্রস্রাব আটকাইয়া যায়।

জ্বর জাড়িতে রোগী অজ্ঞান হইয়া না গেলে যে প্রস্রাব আটকায় না, তা নয়। অনেক জায়গায় রোগীর জ্ঞানের কোনও বৈলক্ষণ্য হয় না; কিন্তু তার প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। এখানে প্রস্রাব আটকানর কারণ কি? এখানে প্রস্রাব আটকায় কেন? মূতের থলি নিজের যে বলে জড় শড় হইয়া মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়, জ্বরের তাড়শে—জ্বরের ধমকে সে বল একবারে খাটো হইয়া যায়। কাজেই, প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) একটু শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে অনেক জায়গায় এই রকম করিয়া রোগীর প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। তাতেই বলিছি যে, স্বল্প-বিরাম-জ্বরের প্রস্রাব বন্ধ একটা উপসর্গ।

(২) তার পর এখন প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাতের কথা বলি।

(ক) মূতের থলির মুখ খেঁচিয়া ধরিলে প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। খেঁচিয়া ধরাকে ডাক্তারেরা স্প্যাজম্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় আক্ষেপ বলে। মূতের থলির মুখ যদি খেঁচিয়া ধরে, তবে হাজার চেষ্টা করিলেও মূতের থলি মূত বাহির করিয়া দিতে পারে না। মূতের থলি মূত কেমন করিয়া বাহির করিয়া দেয়? জড় শড় হইয়া ভিতরকার মূতের উপর চাপ দিয়া মূত বাহির করিয়া দেয়। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি।

মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাইতে কখন কখন মূতের থলির মুখ এই রকম করিয়া খেঁচিয়া ধরে। খেঁচিয়া ধরিলে কাজে কাজেই প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাইকে ডাক্তারেরা হিষ্টিরিয়া বলেন; বৈদ্যরা গুল্মবায়ু বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি।

(খ) ধাতের-ব্যামো হইয়া ঝিল্ হইলে প্রস্রাব আট্কাইয়া যায়। ধাতের ব্যামোকে ডাক্তারেরা গনোরীয়া বলেন। ঝিল্‌কে তাঁরা ষ্ট্রীকচর বলেন। ধাতের ব্যামোর কথা, আর ঝিল্ হইয়া প্রস্রাব আট্কানর কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। মূতের থলির মূত বাহির করিয়া দিবার বল নাই বলিয়া রোগীর প্রস্রাব আট্কাইয়া আছে, কি প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার ব্যঘাত ঘটিয়াছে বলিয়া তার প্রস্রাব আট্কাইয়াছে? এ দু রকম প্রস্রাব আটকানর কোন রকম ঘটিয়াছে, কেমন করিয়া ঠিক করিবে? রোগীর লক্ষণে এর কোনও ইতর বিশেষ বুঝিতে পারা যায় কি না? বুঝিতে পারা যায়—বেশই বুঝিতে পারা যায়। মূতের থলির মূত বাহির করিয়া দিবার বল গেলে রোগীর যে প্রস্রাব আটকাইয়া যায়, সে প্রস্রাব-আটকানয় রোগীর কষ্টের বিশেষ কোন পরিচয় পাওয়া যায় না; রোগী কোন কষ্ট প্রকাশও করে না। কিন্তু প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত বাহির হইয়া আসিবার ব্যাঘাত ঘটিলে, রোগী খুবই যাতনা পায়। নিয়ত প্রস্রাব করিতে চায়, কিন্তু প্রস্রাব করিতে পারে না। কোঁত দেয়, বেগ দেয়, আর তার মুখে তার যাতনা যেন স্পষ্ট অক্ষরে লেখা থাকে। শিরু-দাঁড়ার মাইজ্জে কোন রকম বেশী ঘা ঘো লাগিলে, কি সেই

মাইজের কোন রকম রোগ ঘোগ হইলে যে পক্ষাঘাত হয়, সেই পক্ষাঘাতে মূতের থলির মূত বাহির করিয়া দিবার শক্তি একবারে নষ্ট হইয়া যায়। এ রকম ঘটিলে মূতের থলিতে মূত ক্রমেই জমিতে থাকে, তার পর মূতের থলি ছাপাইয়া প্রস্রাবের দুওর দিয়া মূত উপ্‌চে পড়িতে থাকে। এ ছাড়া, এ সব রোগীর মূতে শীঘ্রই ভারি দুর্গন্ধ হয়, আর ক্ষার ক্ষার ঝাঁজ হয়। পক্ষাঘাতের কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব।

এখন স্বল্পবিরাম-জ্বরের প্রস্রাব-বন্ধ উপসর্গের চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা—শক্ত রকম জ্বর জাড়িতে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইলে—প্রস্রাব আটকাইয়া গেলে, তার যে রকম চিকিৎসা করিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

শক্ত রকম জ্বর জাড়িতে জ্বরের তাড়শে—জ্বরের ধমকে অনেক জায়গায় রোগীর মূতের থলির বল খুব খাটো হইয়া যায়। মূতের থলির বল খুব খাটো হইয়া গেলে রোগীর প্রস্রাব বন্ধ হইয়া যায়—প্রস্রাব আটকাইয়া যায়। এ রকম ঘটিলে কি করিবে? এ অবস্থায় কি রকম চিকিৎসা করিবে? এ অবস্থায় রোগীর দু রকম চিকিৎসার দরকার। রোগী যে কয় দিন আপনি প্রস্রাব করিতে না পারিবে, সে কয় দিন শলা দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে। আর, রোগী যাতে আপনি শীঘ্রই প্রস্রাব করিতে পারে, তারও উপায় করিয়া দিবে। শলা দিয়া প্রস্রাব করান শক্ত নয়, খুব সোজা। তবে জুত বরাত, কল কৌশল জানা না থাকিলে, আর অভ্যাস না থাকিলে; খুব

সোজা কাজও শক্ত বলিয়া বোধ হয়। রোগী যাতে আপনি শীঘ্রই প্রস্রাব করিতে পারে, তার কোনও উপায় আছে, কি না? আছে। ভাল উপায়ই আছে। সে উপায় আর কি? অর্গট্ অব্ রাই। মূতের থলির বল খাটো হওয়ার দরুণ রোগীর প্রস্রাব বন্ধের যেমন অসুদ অর্গট্ অব্ রাই তেমন অসুদ আর নাই। অর্গট অব্ রাই গাছড়া অসুদ। অর্গট অব্ রাই আর আমাদের ধান, এক জাতি। অর্গট অব্ রাইয়ের কথা মেটি-রিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব। ৫ গ্রেন্ করিয়া অর্গট অব্ রাইয়ের গুঁড়ো রোজ চারি বার খাইতে দিলে, রোগী ৩।৪ দিনের মধ্যে আপনিই প্রস্রাব করিতে পারে। অর্গট অব্ রাইয়ের গুঁড়ো খুব টাটকা না হইলে, তাতে তেমন উপকার হয় না। এ ছাড়া, বেশী দিন ঘরে থাকিলেও অর্গট অব্ রাই খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, সাহেবদের ডিস্পেন্সরি থেকে টাট্কা অর্গট্ অব্ রাই আনিয়া তার গুঁড়ো সদ্য তয়ের করিয়া লইবে। অর্গট অব্ রাই রৌদ্রে শুকাইয়া হামাম দিস্তেতে গুঁড়ো করিতে হয়। বর্ষাকালে অর্গট্ অব্ রাইয়ের গুঁড়ো তয়ের করা বড় মস্কিল। এই জন্যে, বর্ষাকালে অর্গট্ অব্ রাইয়ের গুঁড়োর বদলে লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গট্ ব্যবহার করিবে। লিকুইড্ এক্‌ষ্ট্রাক্ট অব্ অর্গটের মাত্রা বিশ (২০) মিনিম্। যে কয় দিন রোগী আপনি প্রস্রাব করিতে না পারিবে, শলা দিয়া রোজ তিন বার করিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে। কেন না, মূতের থলিতে বেশী মূত জমিতে দিলে, মূতের থলির যে বল খাটো হইয়া গিয়াছে, সে বল শীঘ্র ফিরিয়া আসিতে পারে না। মূতের থলিতে সহজ শরীরেও খুব বেশী

মূত জমিতে দিলে যখন মূতের থলির বল থাকে না, তখন এ কথা কি আর বেশী করিয়া বুঝাইয়া বলিতে হবে ?

প্রস্রাব আট্‌কাইয়া গেলে প্রস্রাব করাইবার মুষ্টিযোগ।

(১) ক্ষুদে নুনি শাক ... ... ১ ছটাক
সোরা ... ... ½ তোলা
একত্রে বাটিয়া তল্‌পেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়।

(২) তেলাকুচর শিকড় :–
কাঁজিতে বাটিয়া তল্‌পেটে প্রলেপ দিলে প্রস্রাব হয়।

(৩) কর্পূরের গুঁড়ো প্রস্রাবের দুওরে দিলে প্রস্রাব হয়।

(৪) কর্পূরের গুঁড়ো খুব সরু ন্যাক্‌ড়ায় মাখাইয়া তার বাতি তয়ের করিয়া, প্রস্রাবের দুওরের ভিতর চালাইয়া দিলে প্রস্রাব হয়।

বালকের পক্ষে।

(১) পিপুল। মরিচ। চিনি। মধু। ছোট এলাইচ। সৈন্ধব। এই সব জিনিষ সমান ভাগে একত্র মিশাইয়া তার অবলেহ তয়ের করিয়া, ছেলেকে মাঝে মাঝে চাটিতে দিবে।

(২) শুদ্ধ ছোট এলাইচ মধু দিয়া মাড়িয়া অবলেহ করিয়া দিলেও হয়। চাটিবার অষুদকে বৈদ্যরা অবলেহ বলেন, ডাক্তরেরা ইলেক্‌চুয়ারি বলেন। এ কথা এর আগেই বলিছি।

(৩) শসার বিচির শাঁস
ছোট এলাইচ
কুম্‌ড়োর বিচির শাঁস
একত্রে মিশাইয়া অবলেহ করিয়া দিবে।

এর আগেই বলিছি, রোগী যে কয় দিন আপনি প্রস্রাব করিতে না পারিবে, সে কয় দিন শলা দিয়া প্রস্রাব করাইয়া দিবে। যাঁদের জন্যে, এ বৈ লিখিতেছি, তাঁদের পক্ষে এ

ব্যবস্থা যে ব্যবস্থাই নয়, তা বলাই বাহুল্য। এই জন্যে, এখানে গুটি কতক মুষ্টিযোগ লিখিয়া দিলাম। এ মুষ্টিযোগ গুলির কেমন ফল পাওয়া যায়, আমি নিজে কোন খানে তা পরীক্ষা করিয়া দেখি নাই। তবে আমার পরিচিত এক জন বৈদ্য (কবিরাজ) বলিয়া দিয়াছেন, এ মুষ্টিযোগ গুলিতে অনেক জায়গায় বেশ ফল পাওয়া যায়। তাতেই বলি মুষ্টি-যোগ গুলি জানিয়া রাখিলে অনেক জায়গায় কাজে লাগিতে পারে।

১১। **বাহ্যে বন্ধ**—জ্বর-চিকিৎসার প্রথম ভাগে জোলাপ দেওয়ার কথা কিছুই বলি নাই। দ্বিতীয় ভাগেও জোলাপের কথা কিছু লেখা নাই। এতে পাঠকেরা একবারে ক্ষেপিয়া উঠিয়াছেন, বলিলেই হয়। পত্রে পত্রে তাঁরা আমার ঘর ছাইয়া ফেলিয়াছেন। বেশ করিয়া ভাবিয়া দেখিলে এতে তাঁদের কোন দোষই নাই! তাঁদের এ রকম করিবারই কথা বটে। যাঁরা জোলাপ দেওয়ার জন্যে ব্যস্ত—জোলাপ না দিয়া কোন রোগের চিকিৎসাই হয় না, যাঁরা জানিয়া বসিয়া আছেন —জ্বর-চিকিৎসার বৈতে জোলাপ দেওয়ার কোন কথাই লেখা নাই বলিয়া তাঁরা দ্বন্দ্ব মারি উপস্থিত করিবেন, আশ্চর্য্য কি? সুস্থ শরীরেও যখন প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের নিত্য দরকার;— প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘাম, এ তিনের কোনটার ব্যতিক্রম ঘটিলেই যখন শরীর অসুস্থ হয়;—তখন রোগে প্রস্রাব বাহ্যে, ঘামের কত দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে। রোগ হইলেই প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের ব্যতিক্রম ঘটে। এই জন্যে, রোগীদের আমরা মূত্রকারক অসুদ দিই—রেচক অসুদ দিই—ঘর্ম্মকারক অসুদ

দিই। যে অসুদ খাইলে প্রস্রাব হয়, সে অসুদকে ডাক্তরেরা ডায়ুরেটিক্ বলেন;—ভাল বাঙ্গালায় মূত্রকারক অসুদ বলে। যে অসুদ খাইলে বাহ্যে হয়, ডাক্তরেরা সে অসুদকে পগেটীব বলেন;—ভাল বাঙ্গালায় রেচক অসুদ বলে। যে অসুদ খাইলে ঘাম হয়,সে অসুদকে ডাক্তরেরা ডায়াকোরেটিক বলেন; –ভাল বাঙ্গালায় ঘর্ম্মকারক অসুদ বলে। প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘাম,এ তিনের কোনটির ব্যতিক্রম ঘটিলেই শরীর অসুস্থ হয়, রোগের চিকিৎসা করিবার সময় এ কথাটা যেন মনে থাকে। যে রোগেই কেন হোক না, আর যে উপসর্গই কেন উপস্থিত থাক না, প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের যত ব্যতিক্রম ঘটিবে, রোগীর অবস্থা তত মন্দ হইবে। এই জন্যে, রোগী দেখিতে গিয়া আগে তার প্রস্রাব, বাহ্যে, ঘামের কথা বিশেষ করিয়া জিজ্ঞাসা করিবে। তার পর অসুদের ব্যবস্থা করিবে। জ্বর জাড়িতে প্রায়ই কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। এই জন্যে, জ্বর জাড়ির চিকিৎসায় রোগীকে জোলাপ দেওয়ার দরকার প্রায়ই হইয়া থাকে। তাই বলিয়া জোলাপ দেওয়ার অনুরোধে রোগের প্রকৃতি ভুলিয়া গেলে চলিবে না। তুমি গিয়া দেখিলে, রোগীর জ্বর ছাড়িতেছে। এখন তাকে কুইনাইন দিবে—না, তার পেটটা অপরিষ্কার আছে, কোষ্ঠবদ্ধ আছে, বলিয়া জোলাপ দিবে? ম্যালেরিয়া-জ্বরের প্রকৃতি যদি তোমার বিশেষ রকম জানা না থাকে, তবে তুমি রোগীর পেট্‌টা পরিষ্কার করিয়া দিবারই ব্যবস্থা আগে করিবে। পেট্‌টা অপরিষ্কার থাকিতে কুইনাইন্ দেওয়া হবে না—এই বলিয়া তুমি জোলাপের ব্যবস্থা করিয়া চলিয়া গেলে। রোগী জোলাপ আনাইয়া খাইল। দু তিন

ঘণ্টার মধ্যেই তার জোলাপ খুলিল। বাহ্যে হওয়ায় তার শরীর বেশ খোলসা হইয়া গেল। এদিকে তার পেট যেমন পরিষ্কার হইতে লাগিল—শরীর যেমন খোলসা হইতে লাগিল ও দিকে জ্বর আসার পথও তেমনি পরিষ্কার হইতে লাগিল—তেমনই খোলসা হইতে লাগিল। তোমার আসার পর ১২ঘণ্টার মধ্যেই রোগীর ফের কম্প দিয়া জ্বর আসিল। ফের কম্পদিয়া জ্বর আসার খবর লইয়া রোগীর লোক তোমার কাছে দৌড়িল। তুমি দেরি না করিয়া সেই লোকেরই সঙ্গে রোগীর বাড়ীতে গেলে। গিয়া দেখিলে, রোগী জ্বরে এক বারে বেহুঁস হইয়া পড়িয়া আছে। কুইনাইন খাওয়াইবার এমন জুত—এমন অবকাশ ছাড়িয়া দিয়া কি দুষ্কর্ম্মই করিছি! এখন, দেখিতেছি, রোগীকে বাঁচানই ভার। চিকিৎসকের বুদ্ধির ভুল হওয়া—বিবেচনার ত্রুটি হওয়া সোজা নয়! সে ভুলে—সে ত্রুটিতে রোগীর জীবন নষ্ট হয়! এ রকম ভাবিয়া চিন্তিয়া তুমি বিস্তর চেষ্টা চরিত্র করিলে, কিন্তু কিছুতেই রোগীটিকে বাঁচাইতে পারিলে না। রোগীর গায়ের তাতও কমিল না—তার আর জ্ঞানও হইল না। শেষে জ্বরও ছাড়িল—সেই সঙ্গে সঙ্গে নাড়ীও ছাড়িল। তখন তুমি যার পর নাই অপ্রতিভ হইয়া নীরব হইয়া বিদায় হইলে। অনেকে বলিবেন, এ রকম দুর্ঘটনা প্রায়ই ঘটে না। চিকিৎসককেও এ রকম অপ্রতিভ প্রায়ই হইতে হয় না। আমি তা বলি না—আমি বলি ম্যালেরিয়া-জ্বরে এ রকম দুর্ঘটনা খুবই ঘটে। যে ম্যালেরিয়া-জ্বরে যে দুর্ঘটনা একবার ঘটিয়াছে, সেই ম্যালেরিয়া-জ্বরে সে দুর্ঘটনা যে আর ঘটিবে না, তা কে ঠিক্ করিয়া

বলিতে পারে ? ম্যালেরিয়া-জ্বরে অমুক রোগীর যে দুর্ঘটনা ঘটিয়াছিল, এরও কি তাই ঘটিবে ? না তা বোধ হয় না; সে ভয় এখানে কিছুই দেখিতেছি না। ঠিক এই রকম ভাবিয়া অনেকে অনেক জায়গায় অনেক রোগীর জীবনে জলাঞ্জলি দিয়াছেন। প্রথম ভাগে ৮৵০ র পাতে বলিছি, আজ জ্বর হইয়াছে, আজই কি কুইনাইন্ দেওয়া যায় ? আর দুই একটা জ্বর না দেখে কুইনাইন্ দেওয়া হবে না। এ রকম বন্দোবস্ত কোনও রোগেরই সঙ্গে—বিশেষ ম্যালেরিয়া-জ্বরের সঙ্গে খাটে না। আজ যেমন জ্বর ছাড়িল, কাল তেমন ছাড়িবে কি না, তার ঠিক কি ? কাল জ্বরে রোগীর কি অবস্থা ঘটিবে, কে বলিতে পারে ? তাতেই বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরের হাত থেকে রোগীর জীবন রক্ষা করিবার অবকাশ এক বার পাইলে, সে অবকাশ কিছুতেই ছাড়িবেন না। সে অবকাশ ছাড়িয়া দিলে, আর তা ফিরে পাইবে কি না, কে বলিতে পারে ? তাতেই মাথার দিব্যি দিয়া বলিতেছি, ম্যালে-রিয়া-জ্বরের ব্রহ্মাস্ত্র কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ পাইলে, সে অবকাশ কিছুতে ছাড়িবে না। ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর যে অবস্থাই কেন হোক না, আর যে উপসর্গই কেন উপ-স্থিত থাক্ না, কুইনাইন্ খাওয়াইবার অবকাশ পাইলেই কুইনাইন্ খাওয়াইবে; কুইনাইন খাওয়াইবার অবকাশ কাকে বলে, এখানে তা কি আবার বলিতে হবে ? সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্ম্মিটেণ্ট ফীবরে) ঘাম হইতে আরম্ভ হইলেই কুইনাইন্ খাওয়াইবে। স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রীমিটেণ্ট ফীবরে) জ্বরের প্রকোপ—গায়ের তাপ যে কমিতে আরম্ভ হইবে, সেই

কুইনাইন্ খাওয়াইতে আরম্ভ করিবে। রোগীর পেট পরিষ্কারই থাক, আর অপরিষ্কারই থাক—কোষ্ঠ পরিষ্কারই থাক, আর কোষ্ঠবদ্ধই থাক, জিব পরিষ্কারই থাক, আর অপরিষ্কারই থাক; পেটের কোন দোষ থাক, আর নাই থাক, কুইনাইন খাওয়াইবার অবকাশ ঘুচাইবে কেন? জ্বরের সঙ্গে যে কোন দোষই থাক, আর উপসর্গই থাক তার অসুদ আলাদা দিবে। তার অসুদ আলাদাও দিতে পার, কুইনাইনের সঙ্গেও দিতে পার। (১২০ থেকে ১২২র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়)। সে সব অসুদ দিবার অনুরোধে আসল অসুদ দিবার অবকাশ যেন ঘুচাইও না। ম্যালেরিয়া-জ্বরের আসল অসুদই কুইনাইন। কুইনাইন খাওয়াইবার অবকাশ হাতে পাইয়া, যিনি তা ছাড়িয়া দিয়া বসিয়া থাকেন, ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিৎসায় তাঁকে যেন কেউ ভুলেও না ডাকে। বেশী আর কি বলিব?

অনেকের বিশ্বাস, রোগীর পেট পরিষ্কার থাকিলে অসুদে শীঘ্র কাজ করে, অসুদের কাজও ভাল হয়। এ কথা খুব সত্য। কিন্তু ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর পেট পরিষ্কার করিতে গিয়া, পাছে জো হারাইয়া বসিয়া থাক, তাই ভাবি। রোগী ঘুমাইলে জাগাইয়া অসুদ খাওয়াইবার দরকার নাই—ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিৎসার বেলায় এ কথা বলিবার যো নাই। কেন না, জ্বর আসিবার সময় হইলে, রোগী জাগিয়া থাকিলেও জ্বর আসে, ঘুমাইয়া থাকিলেও জ্বর আসে। তাতেই বলিতেছি, রোগী জাগিয়াই থাক, আর ঘুমাইয়া থাক, কুইনাইন খাওয়াইবার সময় হইলেই কুইনাইন খাওয়াইয়া দিবে। ছোট ছেলে-

দের ম্যালেরিয়া-জ্বরের চিকিৎসার বেলায় এ কথাটা যেন খুব মনে থাকে। কেন না, সবিরাম-জ্বরে (ইণ্টর্মিটেণ্ট ফীবরে) যতক্ষণ জ্বর থাকে, জ্বরের তাড়শে তারা একবারে ছট-ফট করে। তার পর, জ্বর যে ছাড়িতে আরম্ভ করে, সেই একটু স্বস্তি পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। স্বল্পবিরাম-জ্বরেও (রিমিটেণ্ট ফীবরেও) ঠিক সেই রকম ঘটে। জ্বরের প্রকোপ—গায়ের তাত কমিতে আরম্ভ হইলে, ওরই মধ্যে একটু স্বস্তি পাইয়া তারা অমনি ঘুমাইয়া পড়ে। কুইনাইন খাওয়াইবার সময় এই বটে। কিন্তু কি করি? এখন ত জাগাইতে পারি না। অনেক কষ্টের পর একটু ঘুম আসিয়াছে। ছেলের উপর এ রকম মিছে মায়া মমতা করিয়া, কুইনাইন খাওয়াইবার সুযোগটা ঘুচাইয়া দেওয়া হবে না। কুইনাইন খাওয়াইবার সুযোগ ঘুচাইয়া দিলে, ম্যালেরিয়া-জ্বরে রোগীর কি বিপদ ঘটিতে পারে, আর ঘটিয়া থাকে, এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

বাহ্যে বন্ধ—কোষ্ঠবদ্ধ সহজ শরীরের হয়—রোগেও হয়। সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হইলে ক্যাষ্টর অইলই খাওয়া সব চেয়ে ভাল। ক্যাষ্টর অইল খুব ঠাণ্ডা জোলাপ। ক্যাষ্টর অইলে কোনও অগুণ করে না। আর আর জোলাপ লওয়ার পর দু এক দিন এক আধটু কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে। ক্যাষ্টর অইল জোলাপের সে দোষ নাই বলিলেই হয়। সোণামুখী জোলাপেরও সে দোষ নাই। এ ছাড়া আর আর জোলাপে বাহ্যে বেশীও হইতে পারে, কমও হইতে পারে, চাই কি, বাহ্যে নাও হইতে পারে। ক্যাষ্টর অইল জোলাপে সে রকম আশঙ্কা

কিছুই নাই। আর আর জোলাপে পেট যে রকম গরম হয়, ক্যাষ্টর অইলের সে রকম হয় না। তাতেই বলি ক্যাষ্টর অইলের মত ভাল জোলাপ আর নাই। তবে ক্যাষ্টর অইল সহজে কেহ খাইতে চায় না। ক্যাষ্টর অইলের গন্ধেও ন্যাকার আসে, আস্বাদনেও ন্যাকার আসে, গিলিতে গেলেও ন্যাকার আসে। খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইয়া খাইলে ক্যাষ্টর অইলের ও সব দোষ অনেক কাটিয়া যায়। গরম দুধের ভাবে ক্যাষ্টর অইলের দুর্গন্ধটা অনেক লুকায়। খুব গরম দুধের সঙ্গে বেশ করিয়া মিশাইলে, ক্যাষ্টর অইলের আটা আটা ভাবও অনেক কমিয়া যায়। ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আধ ছটাক। আধ ছটাক ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে ছটাক খানেক খুব গরম দুধ মিশাইয়া লইলেই হইতে পারে।

এমন কি কোনও অসুদ নাই, যার সঙ্গে মিশাইলে ক্যাষ্টর অইলের আটা আটা ভাবও কাটিয়া যায়—দুর্গন্ধও যায়? থাকিবে না কেন? আছে। ভাল অসুদই আছে। ক্যাষ্টর অইলের যদি বড়মানুষি রকম জোলাপ তয়ের করিয়া দিতে চাও, তবে এমনি করিয়া তয়ের করিবে।

ক্যাষ্টর অইল	...	...	...	১ ঔন্স
লাইকর পোটাসি	...	...	...	৩০ মিনিম
টিংচর কার্ডেমম কো		...	...	৩০ মিনিম
টিংচর ল্যাবেণ্ডর কো		...	...	৩০ মিনিম
সিরপ জিঞ্জর	...	...	...	৪ ড্রাম
গোলাপ জল	..	...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

এই যে অসুদ খানি তয়ের করিলে, এ একবার খাইবার মত, অর্থাৎ এক মাত্রা।

আর আর অসুদ মিশাইবার আগে, ক্যাষ্টর অইলের সঙ্গে লাইকর পোটাসি খুব করিয়া মিশাইয়া লইবে। তিন ঔন্স জল ধরে এমন একটা শিশিতে এক ঔন্স ক্যাষ্টর অইল লইয়া, তার উপর আধ ড্রাম লাইকর পোটাসি ঢালিয়া দিবে। তার পর, দুটো জিনিশ যতক্ষণ না বেশ মিশিয়া যায়, ততক্ষণ শিশিটা নিয়ত নাড়িতে থাকিবে—নিয়ত ঝাঁকাইতে থাকিবে। কাক্ দিয়া বেশ করিয়া মুখ আঁটিয়া তবে শিশিটা ও রকম করিয়া ঝাঁকাইবে। শেষে ক্যাষ্টর্ অইল্ আর লাইকর পোটাসি, দুই একত্র মিশিয়া ঠিক্ দৈয়ের মত হইয়া গেলে, টিংচর কার্ডেমম্ কো আর টিংচর ল্যাবেণ্ডর কো ঢালিয়া দিবে, ঢালিয়া দিয়া শিশিটে আবার ঐ রকম করিয়া ঝাঁকাইবে। তার পর, সিরপ জিঞ্জর ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়া দিয়া শিশিটে ফের ঐ রকম করিয়া নাড়িয়া লইবে। সব শেষে গোলাপ জল ঢালিয়া দিবে; ঢালিয়া দিয়া শিশিটে অনেক ক্ষণ ধরিয়া খুব ঝাঁকাইবে। এই তোমার বড়-মানুষি জোলাপ তোয়ের হইয়া গেল! খাইবার আগে শিশিটে আর একবার নাড়িয়া লইতে বলিবে। এই যে বড় মানুষি জোলাপ তয়ের করিলে, এ এক রকম খোষবয় শর্বত বলিলেই হয়।

ক্যাষ্টর অইল ছাড়া আরও অনেক জোলাপ আছে। সে সব জোলাপের কথা মেটিরিয়া মেডিকায় বলিব।

ক্যাস্টর্ অইল্ সহজ কোষ্ঠবদ্ধেরও যেমন অসুদ, কোষ্ঠ শুদ্ধি না হওয়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদেরও সে

রকম কোষ্ঠবদ্ধের তেমনি অসুদ। সহজ শরীরে মাঝে মাঝে যে কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া থাকে, সেই কোষ্ঠবদ্ধকেই সহজ কোষ্ঠবদ্ধ বলিতেছি। কোষ্ঠশুদ্ধি না হওয়া যাদের অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাদের সে রকম কোষ্ঠবদ্ধ রোগকে আমাদের বৈদ্যরা কোষ্ঠাশ্রিত বায়ু বলেন। ডাক্তরেরা সে রকম কোষ্ঠবদ্ধকে হেবিচুয়েল কন্‌ষ্টিপেশন বলেন, ভাল বাঙ্গালায় আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধ বলে। আভ্যাসিক কোষ্ঠবদ্ধকে সোজাসুজি অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ বলিতে পার। অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধকে সোজা জ্ঞান করা হবে না। কোষ্ঠবদ্ধ হইয়া, শেষে অন্ত্রের ভিতর মল এত শক্ত আর এমন গুটলে হইয়া জমিয়া যাইতে পারে যে, বাহ্যে হইবার পথই বন্ধ হইয়া যায়। বাহ্যে হইবার—মল বাহির হইয়া আসিবার পথ বন্ধ হইয়া গেলে কি সর্ব্বনাশ, তা বুঝিতেই পারিতেছ। বাহ্যে হইবার পথ বন্ধ হইয়া গেলে তোমার জোলাপেই বা কি করিবে? পিচকিরিতেই বা কি করিবে? অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, ডাক্তরেরা তাকে ইন্টেষ্টাইনেল অবষ্ট্রক্‌শন্ বলেন; ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ) বলে। অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ যদি বন্ধ হইয়া যায়, আর চিকিৎসক যদি রোগীর বাহ্যে করাইয়া দিতে না পারেন, তবে তাঁকে তার মৃত্যু দাঁড়াইয়া দেখিতে হয়। অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া যাওয়ার চিকিৎসাও সোজা নয়। এ চিকিৎসার কথা এখনই বলিব। এমন অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের চিকিৎসার কথা বলি।

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের আমি দুটী অসুদ জানি। সে দুটী অসুদ আর কি? ক্যাষ্টর অইল আর বেলাডনা। আগে ক্যাষ্টর অইলের কথা বলি। তার পর বেলাডনার কথা বলিব।

অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যখন এত বিপদ ঘটিতে পারে আর ঘটিয়াও থাকে, তখন যত শীঘ্র পার এ রকম কোষ্ঠ-বদ্ধ ঘুচাইয়া দিবে; কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, প্রথম দিন ছটাক খানেক গরম দুধের সঙ্গে মিশাইয়া দেড় ঔন্স (১২ ড্রাম) ক্যাষ্টর অইল তাকে খাওইয়া দিবে। তার পর দিন সাড়ে এগার ড্রাম ক্যাষ্টর অইল খাওয়াইয়া দিবে। তিন দিনের দিন এগার ড্রাম ক্যাষ্টর অইল দিবে। চারি দিনের দিন সাড়ে দশ ড্রাম দিবে। পাঁচ দিনের দিন দশ ড্রাম দিবে। ছ দিনের দিন সাড়ে নয় ড্রাম দিবে। সাত দিনের দিন নয় ড্রাম দিবে। আট দিনের দিন সাড়ে আট ড্রাম দিবে। নয় দিনের দিন আট ড্রাম (এক ঔন্স) দিবে। এ রকম করিয়া রোজ ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আধ ড্রাম করিয়া কমাইয়া কমাইয়া দিবে। এই রকম করিয়া মাত্রা কমাইতে কমাইতে যখন ক্যাষ্টর অইলের মাত্রা আট ড্রাম আসিয়া দাঁড়াইবে, তখন ক্যাস্টর অইল না খাইলেও রোগীর বাহ্যে আপনিই হবে। কোষ্ঠ শুদ্ধির জন্যে তার কোনও জোলাপ লইতে হবে না। যথার্থই ক্যাষ্টর অইলের এটী বড় আশ্চর্য্য গুণ। আর কোনও জোলাপের এ গুণ আছে কি না, বলিতে পারি না। এর আগেই বলিছি, আর আর জোলাপ লওয়ার পর দু এক দিন কোষ্ঠবদ্ধ হয়। কিন্তু ক্যাষ্টর অইল জোলাপ লইলে সে

রকম কোষ্ঠবদ্ধ হয় না। সোণামুখী জোলাপেরও এ গুণ আছে। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তার যখন এই রকম করিয়া চিকিৎসা করিবে, তখন তাকে লঘু লঘু আহার দিবে। কেন না, এ অবস্থায় রোগী যদি আহারের কোনও অত্যাচার করে, তবে তার পেটের ব্যামো হয়। লঘু আহার আর কি ? সাগু, য়্যারারুট, একবল্কা দুধ, সরু চাইলের ভাত আর মাছের ঝোল।

তার পর এখন বেলাডনার কথা বলি।

বেলাডনা অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবদ্ধের আর একটী খুব ভাল অসুদ। কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, তাকে রোজ সকালে বেলাডনার বড়ি খাইতে দিবে। বেলাডনার বড়ি যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

একষ্ট্রাক্ট বেলাডনা	...	...	১ ড্রাম।
একষ্ট্রাক্ট জেনশন	...	...	৩ গ্রেন।

একত্র মিশাইয়া এতে ৬টা বড়ি তয়ের কর।

রোজ সকালে একটী করিয়া বড়ি খাইতে দিবে। একটী বড়িতেও বেশ কোষ্ঠশুদ্ধি হয়। একটা বড়িতে যার বাহ্যে পরিষ্কার না হবে, তাকে দুটো তিনটে বড়ি একবারে দিবে। তিনটের বেশী দিবার দরকার হয় না। সচরাচর একটা বড়িতেই বেশ কাজ হয়।

কোষ্ঠবদ্ধ যার অভ্যাস পাইয়া গিয়াছে, বেশ করিয়া জিজ্ঞাসা করিলে তার অপাকের কিছু না কিছু পরিচয় পাইবেই পাইবে। আর বেশ করিয়া যদি ঠাউরে দেখ, তবে তার

জিবের উপর খুব পাতলা আর শাদা এক রকম ছাতা দেখিতে পাইবে। এ ছাড়া, তার জিবের আগায় ফুট্‌কি ফুট্‌কি গুলি উচু আর রাঙা মালুম হবে। হাত দিয়া উপর-পেট (বুকের কড়ার নীচেটা) চাপিলে তার ব্যথা লাগে। সহজ শরীরে আহারের পর যে রকম একটু স্বস্তি বোধ হইয়া থাকে, তার সে রকম স্বস্তি হয় না। স্বস্তি হওয়া দূরে থাক, আহারের পর তার বরং কষ্টই হয়। কষ্ট আর কোথায়? পেটে আহারের পর পেট কেমন এক রকম ভার ভার বোধ হয়; আর কেমন এক রকম অসুখ অসুখ করে। এ ছাড়া এর এক আধটু মাথা ধরা প্রায় থাকেই। এ রকম রোগী যদি বেশ নিয়ম করিয়া বেলাডনার ঐ বড়ি খায়, তবে তার কোষ্ঠবদ্ধ নির্দ্দোষ সারিয়া যায়। বেলাডনার বড়ি ক দিন খাইতে হয়, তার কিছু নিয়ম এমন ধরা নাই। কারো কারো সাত দিনেই বেশ উপকার হয়। কারো কারো চৌদ্দ দিনের কমে তেমন উপকার হয় না। আবার কারো কারো কোষ্ঠবদ্ধ নির্দ্দোষ সারিয়া যাইতে একুশ দিনও লাগে। রোগী যে দিন সকালে বেলাডনার বড়ি খায়, সেই দিনই খাওয়া দাওয়ার পর তার বাহ্যে পরিষ্কার হয়—খানিক শক্ত মল নির্গত হইয়া যায়। যখন দেখিবে, বেলাডনা না খাইয়াও কোষ্ঠশুদ্ধি হইতেছে, তখনই জানিবে যে, বেলাডনা ও রকম নিয়ম করিয়া খাওয়ার যে কাজ, তা হইয়াছে। সাত দিনই হোক, চৌদ্দ দিনই হোক, আর একুশ দিনই হোক, নিয়ম করিয়া বেলাডনার বড়ি খাইলে, তার পর রোজ আপনিই কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে। বেলাডনা আর খাইতে হয় না। বেলাডনা না খাইয়াও যখন রোজ নিয়ম

মত কোষ্ঠশুদ্ধি হইতে থাকে, তখন আগেকার কোষ্ঠবদ্ধ দরুণ তার আর কোন কষ্টই থাকে না।

বিলেতে একটী মেমের এই রকম কোষ্ঠবদ্ধ হইয়াছিল। মেম সাহেবের বয়স পঞ্চাশ বছরের কাছাকাছি। তাঁর বয়স যখন একুশ বছর, তখন তাঁর কোষ্ঠবদ্ধ রোগ আরম্ভ হয়। তার পর ৪৭ বছর বয়স পর্য্যন্ত কোষ্ঠবদ্ধ থেকে তিনি নানা রকম কষ্ট পান। কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে তিনি হপ্তায় একবার করিয়া জোলাপ লইতেন। তার পর এক ডাক্তর সাহেব তাঁর চিকিৎসা করেন। ডাক্তর সাহেবের পরামর্শে তিনি বেলাডনার ঐ বড়ি দু হপ্তা খান। চৌদ্দ দিন নিয়ম করিয়া বেলাডনা খাইয়া তাঁর অত প্রাচীন কোষ্ঠবদ্ধ রোগও বেশ সারিয়া গিয়াছিল। কোন কোন জায়গায় বেলাডনা বেশ নিয়ম করিয়া খাইয়াও রোগী কোষ্ঠবদ্ধের হাত একবারে এড়াইতে পারে না। এ রকম ঘটনা কিন্তু খুবই কম ঘটে। যাই হোক এ রকম ঘটিলে রোগী যদি এক দিন অন্তর, কি দু দিন অন্তর, বেলাডনার বড়ি খায়, তবে তার কোষ্টবদ্ধ মোটে হইতেই পারে না। কেন না, সচরাচর জোলাপ লওয়ার পর এক আধটু কোষ্ঠবদ্ধ যা হইয়া থাকে, বেলাডনা খাওয়ার পর তা হয় না। এ ছাড়া, বেলাডনার মাত্রা বাড়াইবার দরকার হয় না।

কোষ্ঠবদ্ধ রোগ বেশী দিনের না হইলে, বেলাডনায় খুব শীঘ্র উপকার হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে এক জন পাঁচ হপ্তা ধরিয়া একদিন অন্তর জোলাপ লইয়াছিল। উপরো উপরি এত বার জোলাপ লইয়া উপকারের চেয়ে তার

অপকারই বেশী হইল। শুনিলে আশ্চর্য্য হবে, শেষে সেই রোগী বেলাডনার ঐ বড়ি নিয়ম করিয়া খাইয়া, ছ দিনে তেমন কোষ্ঠবদ্ধ রোগের হাত থেকে নিস্তার পাইল!

কোষ্ঠবদ্ধের সঙ্গে যদি অপাক থাকে, কি অগ্নিমান্দ্য থাকে, তবে বেলাডনা খাওয়াইবার আগে রোগীর যাতে বেশ পরিপাক হয়, অগ্নিবৃদ্ধি হয়, এমন অসুদ দিবে। খাওয়া দাওয়ার ধরাধর করিলে আর নিয়ম করিয়া স্যালিসিনের পূরিয়া দিন কতক খাইলে, অপাক দোষ বেশ সারিয়া যায়। স্যালিসিনের পূরিয়া ৫৯১র পাতে লেখা আছে।

এর আগেই বলেছি, কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে বেলাডনার ঐ বড়ি তিন হপ্তার বেশী খাইতে হয় না। এ ছাড়া কোষ্ঠ বদ্ধ দূর করিবার ক্ষমতা বেলাডনার এতই আছে যে, বেলাডনা খাইয়া আমার কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচিল না—রোগীকে এ কথা প্রায়ই বলিতে হয় না অসুদের গুণ এর বাড়া আর কি হইতে পারে?

সচরাচর আমরা যে সব জোলাপ ব্যবস্থা করিয়া থাকি, বেলাডনার সঙ্গে সে সব জোলাপের তুলনাই হইতে পারে না। কেন না,

(১) বেলাডনা খাইলে পেট কামড়ায় না; পেটের ভিতর কোন রকম অসুখই বোধ হয় না।

(২) বেলাডনা খাওয়ার পর একবার সহজ বাহ্যে হয়; বাহ্যে বেশ পরিষ্কার হয়। বেলাডনা খাওয়ার পর বাহ্যে হইতে বেশী দেরিও হয় না।

(৩) বেলাডনা খাইয়া যে বাহ্যে হয়, তার পর কোষ্ঠবদ্ধ বাড়ে না।

(৪) বেলাডনা খাইলে অন্ত্রের দোষ সব ঘুচিয়া যায়, অন্ত্রের অবস্থা সহজ হয় ; কাজেই কোন রকম জোলাপ লইবার দরকারই হয় না।

(৫) খুব কম মাত্রায় খাইলেও কাজ হয়। যে অসুদ খাইতে হবে, তার মাত্রা যত কম হয় ততই ভাল। অসুদের আস্বাদন ভাল হওয়া রোগীর যেমন প্রার্থনা,অসুদের মাত্রা কম হওয়াও তার তেমনি প্রার্থনা। যিনি রোগ ভোগ করিয়াছেন— যাঁকেঅসুদ খাইতে হইয়াছে, তাঁকে এ সব কথা আর বেশী করিয়া বলিতে হবে না। অসুদের মাত্রা খুবই কম (নাই বলিলেও হয়), আর খাইতে কোন কষ্টই নাই বলিয়া রোগীদের কাছে হোমিওপেথিক অসুদের এত আদর! যাই হোক্, অসুদের মাত্রা যত কম হয়, আর তার আস্বাদন যত ভাল হয়, রোগীর পক্ষে ততই ভাল ; সব চিকিৎসকেরই যেন এ কথাটা মনে থাকে। চিকিৎসক অসুদের ব্যবস্থা করিয়া খালাস। এত খানি বিকট অসুদ কেমন করিয়া খাইব ; এ চিন্তা চিকিৎসকের নয়—এ চিন্তা রোগীর। এ চিন্তার ভাগ চিকিৎসককেও কিছু কিছু লইতে হইলে ভাল হইত। তা হলে অসুদের মাত্রা আর আস্বাদনের দিকে সব চিকিৎসকেরই নজর থাকিত। ছেলে-দের চিকিৎসার বেলায় অসুদের মাত্রা আর আস্বাদনের দিকে চিকিৎসকের বিশেষ নজর রাখা চাই। নৈলে, তারা অসুদ কিছুতেই পেটে রাখিতে পারে না—বমি করিয়া ফেলে। এ সব কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

তার পর এখন খতিয়ে দেখ, বেলাডনার যে কয়টা গুণের কথা বলিলাম, আর কোনও জোলাপের সে কয়টা গুণ আছে কি না। সে কয়টা গুণ থাকা দূরে থাক্ আর কোনও জোলাপের তার একটা গুণ আছে কি না সন্দেহ। তাতেই বলিতেছি, গুণে বেলাডনার কাছে আর কোনও জোলাপই নয়। জোলাপকে ডাক্তারেরা পর্গেটিব বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় রেচক বলে। যে অসুদে এক আধ বার অল্প অল্প বাহ্যে হয়, ডাক্তরেরা তাকে ল্যাক্সেটিব বলেন ; ভাল বাঙ্গালায় মৃদু-রেচক বলে।

তার পর, এখন অন্ত্রাবরোধের চিকিৎসার কথা বলি।

এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, ডাক্তরেরা তাকে ইণ্টেষ্ট্যাইনেল অব্‌ষ্ট্রাক্‌শন্ বলেন, ভাল বাঙ্গালায় অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ) বলে। অভ্যাস পাওয়া কোষ্ঠবন্ধ থেকেই যে বাহ্যে হওয়ার পথ শেষে বন্ধ হইয়া যায়, এ কথাও এর আগে বলিছি। তার পর এখন কেমন করিয়া জানিবে, রোগীর অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গিয়াছে ? তা জানা শক্ত নয়। তা জানিবার বেশ উপায় আছে। সে উপায় আর কি ? রোগের লক্ষণ। রোগীর অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া তার বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, লক্ষণ দেখিয়া তা জানা যায়—লক্ষণ দেখিয়া তা ঠিক করিতে পারা যায়। এখন সেই লক্ষণের কথা বলি

এর আগেই বলিছি, অন্ত্রের ভিতর মল জমিয়া বাহ্যে হওয়ার পথ বন্ধ হইয়া গেলে, ভাল কথায় তাকে অন্ত্রাবরোধ বলে। এই

জন্যে, বারে বারে অত গুলি কথা না বলিয়া, তার বদলে এখন থেকে অন্ত্রাবরোধ (অন্ত্রের অবরোধ) বলিব। অন্ত্রা-বরোধ কথাটা শক্ত বলিয়া যেন আসল রোগটার কথা বুঝিতে গোলমাল করিয়া ফেলিও না।

অন্ত্রাবরোধের লক্ষণ——অন্ত্রাবরোধ অনেক রকম। অন্ত্রের ভিতর মল ক্রমে জমিয়া বাহ্যে হবার পথ বন্ধ হইয়া যায়; অন্ত্রের এই রকম অবরোধই সচরাচর ঘটে। এই রকম অন্ত্রাবরোধেরই রোগী আমাদের হাতে সচরাচর আসে। এই জন্যে, এখানে কেবল মল বদ্ধরই দরুণ অন্ত্রাবরোধের কথা বলিলাম। সুবিধা পাই ত আর কয় রকম অন্ত্রাবরোধের কথা এর পর বলিব। মল বদ্ধর দরুণ অন্ত্রাবরোধ যে এক দিনই ঘটে, তা নয়। অনেক দিনের কোষ্ঠবদ্ধ থেকে তবে এ রোগটা ঘটে। এক দিন মোটেই বাহ্যে হইল না, তার পর দিন নামে মাত্র বাহ্যে হইল। হয় ত দশ পোনর দিন কি মাসেক কারণ এই রকম করিয়া নামে মাত্র রোজ বাহ্যে হইতে লাগিল। রোজ রোজ কোষ্ঠ পরিষ্কার না হইয়া অন্ত্রের ভিতর এই রকম করিয়া মল জমিতে লাগিল। এই বদ্ধ মল ক্রমে গুট্‌লে বাঁধিতে লাগিল, আর শুকাইয়া শক্ত জমাট হইতে লাগিল। শেষে বাহ্যে হবার পথ বন্ধ হইয়া গেল। বাহ্যে হইবে বলিয়া রোগী বাহ্যে যায়, কিন্তু মোটেই বাহ্যে হয় না। উপরো উপরি দু তিন দিন এই রকম হইল দেখিয়া সে জোলাপ লইল। জোলাপ মোটেই খুলল না। খুলিবে কেমন করিয়া? বাহ্যে হবাব পথই যে বন্ধ। রোগী তা জানে না। এ জোলাপে কোনও কাজ হইল না বলিয়া,

একটা কড়া রকম জোলাপ লইল। এ বারেও জোলাপ খুলিল না। এ বারে, বাড়তির ভাগ, পেটের একটু ফাঁপ হইল, আর পেট-ব্যথা করিতে লাগিল। পেটের ফাঁপ আর পেট-ব্যথা ক্রমে বাড়িতে লাগিল। পেটের-ফাঁপ আর পেট-ব্যথা বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে বমি আরম্ভ হইল। পেট ডাকিতে লাগিল, আর পেটের ভিতর থেকে আঁত গুলি ঢেউ খেলিয়ে খেলিয়ে উঠিতে লাগিল। এই সব দেখিয়া গৃহস্থ আর নিশ্চিন্ত থাকিতে না পারিয়া ডাক্তার ডাকিলেন। ডাক্তার আসিয়া আগা গোড়া সব বেশ করিয়া শুনিলেন। জোলাপ খোলে নাই শুনিয়া তিনি পিচ্‌কিরির ব্যবস্থা করিলেন। জুত বরাত করিয়া পিচ্‌কিরি দিলেন বটে; কিন্তু পিচ্‌কিরির জল সব বাহির হইয়া আসিল। পিচ্‌কিরির জল সব ভিতরে গেলও না। যাবে কেমন করিয়া? ভিতরকার পথ যে বন্ধ! বাহ্যে হবারও পথ বন্ধ; পিচ-কিরির জল যাবারও পথ বন্ধ। শক্ত গুটলে মলে অন্ত্রের ভিতর বুজন। পিচকিরিতেও বাহ্যে হইল না; ডাক্তার মহাশয় বিষম মস্কিলে পড়িলেন; কি উপায়ে রোগীকে বাঁচাইবেন, ভাবিয়া অস্থির হইলেন। এখন দেখ, রোগীকে বাঁচাইবার সত্য সত্যই কোন উপায় আছে কি না? আছে। ভাল উপায়ই আছে। সে উপায় আর কি? বাহ্যে করাইবার উপায়। এ অবস্থায় যে অসুদ খাওয়াইলে রোগীর বাহ্যে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

সল্‌ফেট অব্‌ ম্যাগ্নীশিয়া	...	৪ ড্রাম্‌
ডাইলিউট্‌ সলফিউরিক্‌ য়্যাসিড্‌	...	৪০ মিনিম্‌

লাইকর য়্যাট্রোপীন্	...	...	২০ মিনিম্
টিংচর অরানশিয়াই	...	...	৪ ড্রাম্
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	.	...	৩ ঔন্স ৩ ড্রাম্

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৪টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক এক দাগ তিন ঘণ্টা অন্তর খাইবে।

আমি অনেক জায়গায় এ অসুদটী ব্যবহার করিয়া হাতে হাতে ফল পাইয়াছি। ফল কথা, এই ভয়ানক রোগের এমন অসুদ আর আছে কি না, বলিতে পারি না। আমার বিশ্বাস, এ রোগের এমন অসুদ আর নাই। আমি দেখিয়াছি, অসুদটী একবার খাইলেই রোগীর যাতনা অনেক কম পড়ে। দু বার খাইলেই পেট নরম হয়, আর বায়ু সরে। তিন বারের পর খুব শক্ত এক আধটা গুটলে মল বাহির হইয়া আসে। চারি বার অসুদ খাওয়ার পর খানিকটে পাতলা মল বাহির হয়। পাঁচ বারের পর ঢের গুটলে বাহির হইয়া আসে। এর পর থেকেই বিনা কষ্টে তার বাহ্যে হইতে থাকে। সব জায়গাতেই যে ঠিক এই নিয়মে এই রকম ঘটিতে চায় বা ঘটিয়া থাকে, তা নয় তবে খতিয়ে দেখ ত, প্রায়ই এই রকম দেখিতে পাবে।

এই অসুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে রোগীকে যদি গরম জলের টপে বসান যায়, আর গরম জলের পিচকিরি দেওয়া যায়, তবে রোগীর বাহ্যে হইতে বেশী দেরি হয় না। এ ছাড়া, রোগীর পেটের চামড়ার নীচে ৫ মিনিম্ করিয়া লাইকর য়্যাট্রোপীন মাঝে মাঝে পিচকিরি করিয়া দিতে পারিলে

রোগী আরও শীঘ্র ভাল হয়। চামড়ার নীচে কেমন করিয়া পিচ্‌কিরি করিতে হয়, ৯৩—৯৪র পাতে তা বলিছি।

অন্ত্রাবরোধ ভারি শক্ত রোগ। এ রোগ হইলে রোগীর জীবন লইয়া টানাটানি করিতে হয়। এ ছাড়া, এ রোগের চিকিসায় চিকিৎসককে একবারে নাকানি চোকানি খাইতে হয়। এ রোগ একটু শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে চিকিৎসককে মাথায় হাত দিয়া ভাবিতে হয়। জোলাপ দিলে বমি হইয়া উঠিয়া যায়। পিচকিরি দিলে পিচকিরির জল বাহির হইয়া আসে। বিষম দায়। চিকিৎসক কিছুতেই রোগীব যাতনা কমাইতে পারেন না। অনেক জায়গায় চিকিৎসককে হারি মানিয়া চলিয়া আসিতে হয়। তাতেই বলি, কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যখন এমন ভয়ানক রোগ জন্মে, তখন কোষ্ঠবদ্ধকে কখনই সোজা ব্যাপার মনে করা হবে না। কোষ্ঠবদ্ধ রোগটা খুব সাধারণ। কোষ্ঠবদ্ধ সচরাচরই ঘটে। তাই বলিয়া, কোষ্ঠবদ্ধ থেকে যে অমন ভয়ানক রোগ জন্মিতে পারে; আর জন্মিয়া থাকে, তা যেন ভুলিয়া যাইও না। কোষ্ঠবদ্ধ হইলে তখনই তার প্রতীকার করিবে; কখনও অবহেলা করিয়া থাকিবে না।

বেলাডনা কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার খুব ভাল অসুদ। এ কথা এর আগেই বলিছি। আবার য়্যাট্রোপীন অন্ত্রাবরোধের তেমনি ভাল অসুদ। এ কথাও এই মাত্র বলিলাম। কোষ্ঠবদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। কোষ্ঠবদ্ধ নিজে সোজা রোগ। অন্ত্রাবরোধ ঢের শক্ত রোগ—শক্ত রোগ কেন? ভয়ানক রোগ। তেমনি আবার এ দিকে ধর। বেলাডনা

আর য়্যাট্রোপীন একই জিনিস। সিঙ্কোনার সঙ্গে কুই-নাইনের যে রকম সম্বন্ধ, আফিঙের সঙ্গে মার্ফিয়ার যে রকম সম্বন্ধ, বেলাডনার সঙ্গে য়্যাট্রোপীনের ঠিক সেই রকম সম্বন্ধ। বেলাডনা থেকে য়্যাটোপীন তয়ের হয়! বেলাডনার চেয়ে য়্যাট্রোপীন ঢের তেজাল বিষ—ভয়ানক বিষ। তবেই দেখ, কোষ্ঠবদ্ধ আর অন্ত্রাবরোধ, এ দুটী রোগের সঙ্গে, বেলাডনা আর য়্যাট্রোপীন, এ দুটী অসুদের কেমন চমৎকার মিল! কোষ্ঠবদ্ধ থেকে অন্ত্রাবরোধ ঘটে। বেলাডনা থেকে য়্যাট্রোপীন তয়ের হয়। কোষ্ঠবদ্ধ ঢের সোজা রোগ, এর অসুদও (বেলাডনা) তেমনি ঢের নরম বিষ। অন্ত্রাবরোধ খুব ভয়ানক রোগ, এর অসুদও (য়্যাট্রোপীন) তেমনি কড়া—তেমনি ভয়ানক বিষ।

য়্যাট্রোপীয়া, য়্যাট্রোপাইনা, য়্যাট্রোপীন—য়্যাট্রো-পীনের এই তিনটী নাম। য়্যাট্রোপীন নামটীই বেশী চলিত। য়্যাট্রোপীন-ঘটিত ও অসুদটী খাওয়াইবার সময় রোগীর চোকের পুতলো মাঝে মাঝে পরীক্ষা করিয়া দেখিবে। যে দেখিবে, চোকের পুতলো বড় হইয়াছে, সেই অমনি য়্যাট্রোপীনের মাত্রা কমাইয়া দিবে। চোকের পুতলো বড় হওয়া, চোকে ঝাপ্সা দেখা, মাথা-ঘোরা, ভুল-বকা, ঠোঁট, জিব, টাকরা শুকাইয়া যাওয়া, আর সেই জন্যে গিলিবার কষ্ট, নাড়ীর বল কমা আর বেগ বাড়া;—এ সব লক্ষণ দেখা দিলে তখনই অসুদ বন্ধ করিয়া দিবে। এ সব লক্ষণ না মানিয়া যদি অসুদ খাওয়াইতে থাক, কি চামড়ার নীচে য়্যাট্রোপীন পিচকিরি করিতে থাক, তবে খেঁচুনি হইয়া

রোগী শীঘ্রই মরিয়া যায়। তা হইলেই অন্ত্রাবরোধের চূড়ান্ত চিকিৎসা করিলে! খেঁচুনিও হয়, পক্ষাঘাতও হয়। ছোট ছেলেদের তড়্কা হইলে যেমন খেঁচুনি হয়, জোআন রোগিদের মৃগি রোগে যেমন খেঁচুনি হইয়া থাকে, এখানেও সেই রকম খেঁচুনি হয়। বেলাডনা খাইয়া বিষাক্ত হইলেও রোগীর এই সব লক্ষণ ঘটে। এ সব কথা মেটিরিয়া মেডি-কায় ভাল করিয়া বলিব।

সহজ শরীরে বাহ্যে বন্ধর কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। এখন জ্বর জাড়িতে বাহ্যে বন্ধ হওয়ার কথা বলিব।

কোষ্ঠবদ্ধ থাক বা না থাক, জ্বর হইলেই জোলাপ লইতে হয়—ছেলে বুড়ো জোআনের এ ব্যবস্থা জানা আছে। এ ব্যবস্থা জানিবার জন্য চিকিৎসকের দরকার হয় না। এ ব্যবস্থা গৃহস্থেরা নিজেই করিয়া থাকেন। জ্বর হইলে আগে জোলাপের খোঁজ—তার পর অসুদ বিসুদের খোঁজ। ব্যবস্থা যা আছে, তা বেশই আছে। সে সম্বন্ধে আমি এখন আর কিছু বেশী বলিতে চাই না। এর আগে দু চারি কথা যা বলিছি, তাই যথেষ্ট। তবে মোটামুটি জানিয়া রাখ, জ্বর-গায়ে জোলাপ লওয়া ভাল নয়। অনেক জায়গায় তাতে অনিষ্ট হয়। গায়ের তাত যত বেশী, জ্বরের তাড়না যত বেশী, জোলাপ লওয়াও তত দোষ। ছেলেদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে; তেমন আর কারু বেলায় নয়। জ্বরে ছেলেদের জোলাপ দেওয়া আর তাদের তড়কা ডাকিয়া আনা—দুই-ই সমান। আমার বেশ মনে আছে,

অনেক দিন হইল, মাঝারি রকম শহরের চাপরাস-ওআলা এক জন ভাল ডাক্তর, পাঁচ বছরের একটী ছেলেকে খুব জ্বরের উপর জোলাপ দিয়া তার সাংঘাতিক তড়কা আনিয়া উপস্থিত করিয়াছিলেন। সেই তড়কাতেই ছেলেটী মারা যায়। ছেলেটীকে বাঁচাইবার জন্যে শেষে আমরা বিস্তর চেস্টা করিছিলাম। কিন্তু আমাদের সব চেষ্টা নিষ্ফল হইছিল। তড়কার সূত্রপাতেই বিশেষ তদ্বির হইলে কি রকম ফল হইত, বলিতে পারি না। তড়কার ভয়ে ছেলেদের জ্বর জাড়িতে জোলাপ দেওয়া ত উচিত নয় জানিয়া রাখিলাম। তাদের কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার তবে উপায় কি ? কেন ? পিচ্‌কিরি দিলে তখনই তাদের বাহ্যে হইয়া যায়। পিচ্‌কিরি দেওয়ার মত সোজা কাজ আর নাই। পিচ্‌কিরি দেওয়া ব্যাপারও খুব সোজা—পিচ্‌কিরি দেওয়ায় কোন ভয়ও নাই—পিচ্‌কিরি দেওয়ায় কোন কষ্টও নাই। খানিকটে গরম জলে সাবান গুলিয়া, তাতে একটু ক্যাষ্টর অইল আর একটু তার্পিন দিয়া তাই পিচ্‌কিরি করিয়া দিবে। ছেলের বয়স বুঝিয়া সাবানগোলা জলের ক্যাষ্টর অইলের, আর তার্পিনের মাত্রার ইতর বিশেষ করিবে। ৮১২—৮১৩র পাতে এ সব বেশ করিয়া বলিছি। ছেলের গায়ের তাত খুববেশী হইলে তাদের তড়কা হইবারই কথা—অনেক জায়গায় তড়কা হইয়াও থাকে। এ অবস্থায় তাদের জোলাপ দেওয়া আর "ঘুমন্ত বাঘ চিওন" দুই-ই সমান—এ কথাটা যেন সকলেরই মনে থাকে পিচ্‌কিরি দিলে দুই উপকার একবারে হয়। বাহ্যে ত তখনই হয়—তড়কা হইবার ভয়ও অনেক কমিয়া যায়।

জ্বরের উপর জোয়ান রোগিদেরও জোলাপ দেওয়া পরামর্শ নয়। জ্বরের প্রকোপের সময় জোলাপ দিলে তাদের আমাশাও হইতে পারে—রক্ত-আমাশাও হইতে পারে। কোষ্ঠবদ্ধ বেশী রকম থাকিলে, পিচ্‌কিরি দিয়া তাদের বাহ্যে করাইয়া দিতে পার। ৬২র পাতে যে ডাই-লিউট হাইড্রোক্লোরিক য়্যাসিড মিকশ্চর লেখা আছে, সে মিকশ্চরেও বাহ্যে হয়। যে সব অসুদে সহজ বাহ্যে হয়, ভাল কথায় তাদের মৃদু রেচক বলে। ডাইলিউট হাইড্রো-ক্লোরিক য়্যাসিড একটী মৃদু-রেচক। এই জন্যে জ্বরে যারা মিকশ্চর খায়, তাদের আর কোনও জোলাপ দিবার বড় একটা দরকার হয় না। ও মিকশ্চরে যদি বাহ্যে না হয়, তবে পিচ্‌কিরি দিয়া বাহ্যে করাইয়া দিবে। কি কি জিনিস দিয়া, কি রকম জুত বরাত করিয়া পিচ্‌কিরি দিতে হয়, এর আগে তা অনেক বার বলিছি।

পেট-ফাঁপার কথা বলিবার সময় পিচ্‌কিরি দিবার কথা ঢেরই বলিছি। সে সব কথা যদি মনে করিয়া রাখ, আর জায়গা বিশেষ রোগীর অবস্থা বুঝিয়া সে সব খাটাইয়া লও, তবে পিচ্‌কিরি দিবার কথা তোমাকে আর আমার বেশী কিছু বলিতে হবে না। বাতশ্লেষ্ম-বিকারেই হোক, আর অন্য কোন রকম শক্ত জ্বর জাড়িতেই হোক, জোলাপ দিয়া কখনও বাহ্যে করাইবে না—পিচ্‌কিরি দিয়া রোগীর বাহ্যে করাইয়া দিবে। এ একটা নিয়ম জানিয়া রাখ। ভুলেও কখনও এ নিয়মের এদিক ওদিক করিও না। বাতশ্লেষ্ম-বিকার কাকে বলে, এর আগে তা অনেক বার বলিছি।

অনেক জায়গায় স্বল্পবিরাম-জ্বরে (রিমিটেণ্ট ফীবরে) শেষে পেটের-ব্যামো (ডায়ারীয়া) আপনই আসিয়া উপস্থিত হয়। জোলাপ দিলে সে সব জায়গায় "ঘুমন্ত বাঘ চিওন" হয় মাত্র। তাতেই বলি, জ্বরে জোলাপ টোলাপ দেওয়া ভাল নয়। তবে সোজাসুজি জ্বরে জ্বর ছাড়িয়া গেলে বেশ সবল রোগীকে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিয়া তার কোষ্ঠ-বদ্ধ ঘুচাইতে পার। কিন্তু জোলাপের অনুরোধে কুইনাইন খাওয়াইবার সুযোগ যেন হারাইও না। একথা এর আগেই বলিছি, দরকার হয় ত কুইনাইন আর জোলাপ এক সঙ্গেই দিতে পার। কুইনাইনের সঙ্গে জোলেফা (জ্যালপ পাউডর) বেশ দেওয়া যায়। এ কথাও এর আগে বলিছি।

বাহ্যে বন্ধের কথা মোটামুটি এক রকম বলিলাম। এখন আর একটা মোটা কথা বলিয়া বাহ্যে-বন্ধের কথা শেষ করিব। এ মোটা কথাটা বড় কাজের। এ কথাটায় রোগীর যেমন দরকার, সহজ মানুষেরও তেমনি দরকার।

বেশ খিদে হওয়া; বেশ হজম হওয়া, বেশ ঘুম হওয়া, আর রোজ নিয়ম মত সহজ বাহ্যে হওয়া, (বাহ্যে পরিষ্কার হওয়া) সুস্থ শরীরের চিহ্ন। এ সব, সুস্থ শরীরেই হইয়া থাকে। এ চারিটার একটার তফাত হইলেই শরীর অসুস্থ হয়। শরীর যাদের ভারি অসুস্থ, এ চারিটার একটাও তাদের নিয়ম মত হয় না! ডাক্তরেরা বলেন, তুমি যদি মাথা ঠাণ্ডা রাখ, পা গরম রাখ, আর কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখ, তবে তোমার ডাক্তরের তক্কা রাখিবার দরকার নাই। এখন এই তিনটী কথার মানে একবার বেশ তলিয়ে বুঝ দেখি।

তাঁরা (ডাক্তরেরা) ওডিকলোঁ, ল্যাবেণ্ডর মাথায় দিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে বলেন নাই। রোজ নিয়ম মত ঠাণ্ডা জলে স্নান করিয়া মাথা ঠাণ্ডা রাখিতে হয়। তাঁরা গরম মোজা পায়ে দিয়া পা গরম রাখিতে বলেন নাই। পথ চলিয়া বেড়াইয়া পা গরম রাখিতে হয়। তাঁরা জোলাপ লইয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে বলেন নাই। খাওয়া দাওয়ার ধরাধর করিয়া—খাওয়া দাওয়ার তদ্বির করিয়া কোষ্ঠ পরিষ্কার রাখিতে হয়। যদি বল, খাওয়া দাওয়ার ধরাধরই বা কি রকম? খাওয়া দাওয়ার তদ্বিরই বা কি রকম? কি রকম তা বলি। খিদে রাখিয়া খাইতে হয় খিদে না রাখিয়া খাইলে অগ্নিমান্দ্য হয়। অগ্নিমান্দ্য হইলে ভাল পরিপাক হয় না। পরিপাক না হইলে, রোজ নিয়ম মত সহজ বাহ্যে হওয়ার ব্যাঘাত ঘটে। তার পর ধর। যে সব জিনিস সহজে পরিপাক হয়, কেবল সেই সব জিনিসই খাইলে অগ্নি ঠিক থাকে—অগ্নিমান্দ্য হইতে পারে না—পরিপাকেরও কোন ব্যাঘাত হয় না—রোজ নিয়ম মত সহজ বাহ্যে হইবারও কোন ব্যাঘাত ঘটে না। তার পর ধর। বাহ্যে যে হয়, সেটা কি? যা খাওয়া যায়, তারই অবশিষ্ট অসার ভাগ মল হইয়া নামিয়া যায়। তবেই দেখ, যা খাওয়া যায়, তা যদি সবই পরিপাক হইয়া যায়, তবে তার অবশিষ্টই বা কি থাকিবে? মল হইয়াই বা কি নামিয়া যাবে? তাতেই বলি, পরিপাক হবে না বলিয়া, সন্দেশের খোসা ছাড়াইয়া খাওয়ার গোচ নিতান্ত বাছিয়া গুছিয়াও খাওয়া ভাল নয়। যাঁরা এ

রকম করিয়া নিতান্ত বাছিয়া গুছিয়া খান, তাঁরা কোষ্ঠবদ্ধর হাত কখনও এড়াইতে পারেন না। যুক্তি সব তাতেই চাই। আহারের ত্রুটিতে তাঁদের কোষ্ঠবদ্ধ হইতেছে, তাঁরা তা না বুঝিয়া কোষ্ঠবদ্ধ ঘুচাইবার জন্যে জোলাপ লইয়া লইয়া সারা হন। আপনারাও সারা হন, কোষ্ঠবদ্ধ ঘোচে না কেন বলিয়া চিকিৎসককেও তিত বিরক্ত করেন। তাতেই বলি, আমাদের দেশে আহারাদির যে ব্যবস্থা আছে, তার চেয়ে ভাল ব্যবস্থা আর হইতে পারে না। ডাইল আর তরকারি দিয়া যাঁরা রোজ নিয়ম মত জুত বরাত করিয়া ভাত খান, তাকিয়া ঠেশ দিয়া বসিয়া যারা দিন কাটান না, কোষ্ঠবদ্ধ কি তাদের তা জানিতে হয় না। বসিয়া থাকিলে—শ্রম না করিলে—শরীরকে না খাটাইলে কোষ্ঠবদ্ধ হয়; যাঁদের খাওয়া পরার কষ্ট নাই, তাঁদের সেটা জানিয়া রাখিলে ভাল হয়। ঘরে ভাত কাপড়ের অভাব না থাকে—খাটিবার দরকার না থাকে—রোজ দু বেলা আধ কোশ করিয়া এক কোশ পথ হাঁটিয়া আসিবে—বেড়াইয়া আসিবে—তাতে ত আর কোনও দোষ নাই।

এখানে সহজ শরীরে কোষ্ঠবদ্ধ হওয়ার কারণও এক রকম মোটামুটি বলিলাম। গৃহস্থও সাবধান হইতে পারিবেন, চিকিৎসকও তাঁর রোগীকে পরামর্শ দিতে পারিবেন।

তার পর এখন পক্ষাঘাতের কথা বলি।

১২। **পক্ষাঘাত**—ম্যালেরিয়া-বিষে না ঘটাইতে পারে, এমন রোগই নাই। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। তাতেই বলি, ম্যালেরিয়া-জ্বরেরও উপসর্গ না

হইতে পারে, এমন রোগই নাই। আর তাতেই বলিতেছি, ম্যালেরিয়া-জ্বরের সব রকম রোগী যদি বাঁচাইতে চাও, তবে তোমাকে অনেক রকম রোগের চিকিৎসা বেশ করিয়া জানিয়া রাখিতে হবে। তার পর বলি।

যদি ধর ত পক্ষাঘাত, রোগের একটী লক্ষণ বৈ আর কিছুই নয়। উদরী যেমন রোগের একটী লক্ষণ, পক্ষাঘাতও তেমনি রোগের একটী লক্ষণ জানিবে। পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা প্যারালিসিস বলেন; সোজা ইংরিজিতে পলজি বলে। মগজের (মাথার ঘিলুর) অনেক রকম ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মগজে বেশী রকম ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। শির-দাঁড়ার মাইজের অনেক রকম ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। শির-দাঁড়ার মাইজে বেশী রকম ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মগজ ঢাকা পর্দ্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। শির দাঁড়ার মাইজ ঢাকা পর্দ্দারও ব্যামো স্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। মগজের কথা আর শির-দাঁড়ার মাইজের কথা ৮৪০—৮৪১র পাতে বলিছি। মগজ-ঢাকা পর্দ্দার কথা ৪৯০র পাতে বলিছি। মগজ থেকে আর শির-দাড়ার মাইজ থেকে যে সব শির বাহির হইয়াছে, সে সব শিরকে ডাক্তরেরা নর্ব্ব বলেন। নর্ব্বকে ভাল বাঙ্গালায় স্নায়ু বলে। স্নায়ুর সোজা কথা খুজিয়া পাইলাম না। এই জন্যে, স্নায়ু কথাই ব্যবহার করিতে হইল। রাঙা রক্তের

শির, কাল রক্তের শির, আর রসের শির—এ সব শির, ফাঁপা, স্নায়ু ফাঁপা নয় নিরেট। স্নায়ুর কথা ৭০৬র পাতে বলিছি। এই স্নায়ুর ব্যামো স্যামো থেকেও কখন কখন পক্ষাঘাত হয়। তবে স্নায়ুর ব্যামো স্যামো হইয়া, কি স্নায়ুতে ঘা ঘো লাগিয়া পক্ষাঘাত সচরাচর হয় না। ডিফ্‌থীরিয়া রোগ থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। ডিফ্‌থীরিয়া, টাকরার এক রকম ছোঁয়াচে রোগ। এ রোগের কথা এর পর বলিব। বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। বাতকে ডাক্তরেরা রিয়ুম্যাটিজম্ বলেন। গুল্মবায়ু থেকেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। গুল্মবায়ুকে ডাক্তরেরা হিষ্টিরিয়া বলেন। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। সীসে (ধাতু), কি পারা শরীরে প্রবেশ করিলে তা থেকেও পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে। কড়ি বরগায় আর সাসি খড়খড়েতে লাগাইবার জন্যে যারা রং তয়ের করে, আর যারা ঐ সব জিনিশে রং লাগায়, তাদের শরীরে সীসে প্রবেশ করে। সেই রঙে সীসে আছে। সর্ব্বদা সেই রং নাড়াচাড়া করিলে, ক্রমে শরীরের মধ্যে সীসে প্রবেশ করে। পারা অনেক রকমে শরীরে প্রবেশ করে। গর্ম্মির ব্যামোতে রোগীরা ত কত রকম করিয়াই পারা ব্যবহার করে। মার্কুলি খায়, বাতি লয়, গুল টানে। পারাকে ইংরিজিতে মর্করি বলে। "মর্করি" কথাটা বাঙ্গালায় "মার্কুলি" বলিয়া চলিত হইয়া গিয়াছে। সীসে আর পারা শরীরে প্রবেশ করিয়া স্নায়ুর বল আর মাংসের বল ক্রমে নষ্ট করিয়া ফেলে। স্নায়ুর বল আর

মাংসের বল গেলেই, আর কি পক্ষাঘাত হইল। মাংসকে ডাক্তরেরা মসল বলেন, ভাল বাঙ্গালায় পেশী বলে।

তার পর বলি।

পক্ষাঘাত কি? পক্ষাঘাত কাকে বলে? কোন অঙ্গের শান না থাকিলে, সে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, বলিতে পার। কোন অঙ্গ নাড়িবার চাড়িবার শক্তি না থাকিলে, সে অঙ্গেরও পক্ষাঘাত হইয়াছে বলিতে পার। তবেই ধর, কোন অঙ্গের শান গেলেও পক্ষাঘাত বলে; কোন অঙ্গ নাড়িবার চাড়িবার শক্তি গেলেও পক্ষাঘাত বলে। শরীরের কোন জায়গা ছুঁইলে যে জানিতে পারা যায়, ভাল কথায় তাকে স্পর্শজ্ঞান বলে। ছোঁওয়ার ভাল কথা স্পর্শ। স্পর্শজ্ঞানকে সোজা কথায় শান বলে। শরীরের কোন জায়গায় ছুঁইলে যদি জানিতে না পারা যায়, তবে সোজা কথায় সে জায়গায় শান নাই বলিয়া থাকি। তবেই জানিয়া রাখ, কোন অঙ্গের শুদু শান গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে; কোন অঙ্গ নাড়িবার চাড়িবার শক্তি গেলেও তাকে পক্ষাঘাত বলে; আবার শান আর নাড়িবার চাড়িবার শক্তি, তুই-ই একবারে গেলে তাকেও পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শান আর নাড়িবার চাড়িবার শক্তি, দুই-ই একবারে যায়, সে পক্ষাঘাতকে সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শুদু শান যায়, সে পক্ষাঘাতকে অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। যে পক্ষাঘাতে শুদু নাড়িবার চাড়িবার শক্তি যায়, সে পক্ষাঘাতকেও অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত বলে। "সম্পূর্ণ"র সোজা কথা পূর; আর "অসম্পূর্ণ"র সোজা কথা পূর নয়। সম্পূর্ণ পক্ষাঘাত আর অসম্পূর্ণ পক্ষা-

ঘাত, এই দু জাতি পক্ষাঘাতের কথা মনে করিয়া রাখা চাই। কেন না, যত রকম পক্ষাঘাত আছে, সে সব রকমই এই দু জাতির ভিতর,—এমন কোন রকম পক্ষাঘাত নাই, যা দু জাতির ভিতর নয়। তার পর বলি।

পক্ষাঘাত ১৩ রকম।

১। সব শরীরের পক্ষাঘাত—সর্ব্বাঙ্গের পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে জেনরল প্যারালিসিস বলেন। এ পক্ষাঘাত ধর্ত্তব্যের মধ্যে নয়। কেন না, সব শরীরের পক্ষাঘাত হইলে রোগী জীয়ন্ত থাকিতে পারে না। সব শরীরের সম্পূর্ণ (পূর) পক্ষাঘাত যে হয়, রোগী সেই মরে।

২। শরীরের ডাইন আধ-খানার (ডাইন অঙ্গের) কি বাঁ আধ খানার (বাঁ অঙ্গের) পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে হেমিপ্লীজিয়া বলেন। আর আর যত রকম পক্ষাঘাত আছে, সব চেয়ে এইটাই সাধারণ। ডাইন অঙ্গের চেয়ে বাঁ অঙ্গেরই পক্ষাঘাত বেশী ঘটে। পায়ের গোছের পক্ষাঘাতের চেয়ে হাতের বাউর পক্ষাঘাত বেশী পূর রকম হয়। কখন কখন যে দিকের হাতের আর পায়ের পক্ষাঘাত হয়, তার বিপরীত দিকের মুখের আর জিবের পক্ষাঘাত হয়। মগজের ব্যামো থেকে এ পক্ষাঘাত হয়।* মগজে কোন রকম ঘা ঘো লাগিলেও এ পক্ষাঘাত হয়।

৩। শরীরের নীচের আধ খানা অঙ্গের পক্ষাঘাত। ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে প্যারাপ্লীজিয়া বলেন। কোমর থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত অঙ্গ খানির পক্ষাঘাত হয়—সাঁনও থাকে না, নড়িবার চড়িবার শক্তিও থাকে না। শির-দাঁড়ার

মাইজের ব্যামো থেকেই এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাঁড়ার মাইজ-ঢাকা পর্দ্দারও ব্যামো থেকে এ পক্ষাঘাত হয়। শির-দাঁড়ার মাইজে কোন রকম ঘা ঘো লাগিলেও পক্ষাঘাত হয়।

৪। মুখের পক্ষাঘাত—ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে ফেশিয়েল প্যারালিসিস বলেন। সচরাচর মুখের কেবল এক দিকের পক্ষাঘাত হয়। এ পক্ষাঘাতে রোগীর জীবনের আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়।

৫। শরীরের নীচেকার আধ খানা অঙ্গের অসম্পূর্ণ পক্ষাঘাত এও এক রকম প্যারাপ্লীজিয়া বলিলেই হয়। এ পক্ষাঘাতে রোগীর চলন দেখিলে হাসি পায়। রোগী যখন চলে, তখন বোধ হয়, সে যেন আর কারু বিশ্রী চলনের নকল করিয়া দেখাইতেছে। রোগীর বিশ্রী চলনেই এ পক্ষাঘাতের পরিচয়। এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা লকো মোটর এটাক্সি বলেন।

৬। ছেলেদের পক্ষাঘাত—ডাক্তরেরা এ পক্ষাঘাতকে ইনফ্যাণ্টাইল প্যারালিসিস বলেন, ভাল বাঙ্গালায় শৈশব পক্ষাঘাত বলে। শৈশব মানে শিশুদের; শিশু বয়সের; শিশু বেলার। দুধে দাঁত পড়িয়া ফের দাঁত উঠিবার সময় এ পক্ষাঘাত হয়; তার আগেও হয়। মোটামুটি জানিয়া রাখ, পাঁচ মাস বয়সের আগে, আর চারি বছর বয়সের পর এ পক্ষাঘাত প্রায় হয় না। প্রায়ই সুস্থ আর সবল ছেলেদেরই এ পক্ষাঘাত হয়। রোগা আর দুর্ব্বল ছেলেদের এ পক্ষাঘাত না হয়, এমন নয়। এ পক্ষাঘাত এত শীঘ্র হয় যে, কখন কি রকম করিয়া হইল, তা মোটে বুঝিয়া উঠিতে পারা যায় না। সচরা-

চর জ্বর হইয়াই এ পক্ষাঘাত হয়। তড়কা হইয়াও এ পক্ষাঘাত হয়। তড়কাকে ডাক্তরেরা (কনবলশন্স) বলেন। জ্বরের সময়েই হোক, আর জ্বরের পরই হোক, ছেলেদের পক্ষাঘাতের পরিচয় পাওয়া যায়। যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হয়, সে অঙ্গটী একবারে অকেজো হইয়া যায়; কখন কখন অঙ্গটী হঠাৎই অকেজো হইয়া যায়। এক দিকেরই হোক, আর দু দিকেরই হোক, কুচ্‌কি থেকে পায়ের তলা পর্য্যন্ত সব অঙ্গ-খানির পক্ষাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে; কিম্বা হাতের বাউর আর পায়ের গোছের পক্ষাঘাত হইতে পারে। কিন্তু এ পক্ষাঘাতে সেই এক দিকের হাতের বাউর আর পায়ের গোছের পক্ষাঘাত কখনও হয় না। এ পক্ষাঘাত আপনা হইতেই ভাল হইয়া যাইতে পারে; কি বরাবরি থাকিয়া যাইতেও পারে। এ পক্ষাঘাতে ছেলের প্রস্রাব বাহ্যের কোনও ব্যতিক্রম ঘটে না। পক্ষাঘাত যদি থাকিয়া যায়, তবে সে অঙ্গ একবারে শুকিয়ে যায়, আর জড়শড় হইয়া কেমন এক রকম বিশ্রী হইয়া যায়। কেবল সেই অঙ্গেরই যা কিছু দুর্দ্দশা ঘটে, নৈলে ছেলে বেশ সবল আর সুস্থ দেখা যায়। সে অঙ্গের দিকে নজর না পড়িলে ছেলের কোনও রোগ আছে, এমন বোধই হয় না।

চিকিৎসা——পক্ষাঘাতের সূত্রপাতেই ছেলের মাড়ি চিরিয়া দাঁত বাহির করিয়া দিবে। অনেক জায়গায় শুদ্ধু মাড়ি চিরিয়া দেওয়াতেই কাজ হয়; আর কিছুই করিতে হয় না। আমি এ হাতে কলমে করিয়া দেখিছি। নীচে মালিশের যে অষুদটী লিখিয়া দিলাম, ছেলের পিঠের দাঁড়ায় আর যে অঙ্গের

পক্ষাঘাত হইয়াছে, সেই অঙ্গে মালিশ করিলে খুব উপকার হয়।

য়্যামোনিয়া লিনিমেণ্ট (লিনিমেণ্ট বলেণ্টাইন)			১ ঔন্স
ক্যাজুপট অইল	...	...	১ ঔন্স
তার্পিণ ...	...	...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

মাঝে মাঝে ক্যাষ্টর অইলের জোলাপ দিবে। যে অঙ্গের পক্ষাঘাত হইয়াছে, সে অঙ্গ খুব গরমে রাখিবে; আর রোজ নিয়ম করিয়া ঐ অসুদ সে অঙ্গে বেশ করিয়া মালিশ করিবে। তার পর তাতে বিদ্যুতের কল লাগাইবে। বিদ্যু-তের কলের কথা এর পর বলিব। এ ছাড়া, ভাল আহার আর বলকারক অসুদ দিয়া ছেলের শরীর খুব সবল রাখিবে। বল-কারক অসুদকে ডাক্তরেরা টনিক বলেন। এখানে কড্‌লি-বর অইল আর সিরাপ ফেরি আয়োডাইডে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোনও অসুদে নয়। ছেলের আর জ্বর না হইতে পারে, তার উপায় বিধিমতে করিবে। শরীর যত দিন বেশ সবল আর সুস্থ না হবে, রোজ নিয়ম করিয়া কুইনাইন খাইতে দিবে।

এ পক্ষাঘাত সচরাচর ঘটে। এই জন্যে, এখানে এ পক্ষাঘাতের কথা একটু বিশেষ করিয়া লিখিলাম। বাকী আর কয় রকম পক্ষাঘাতের কেবল নাম করিলাম মাত্র।

৭। গুল্মবায়ু (মেয়েদের মূর্চ্ছাগত বাই) থেকে পক্ষা-ঘাত, আর বাতের ব্যামো থেকে পক্ষাঘাত। গুল্মবায়ু থেকে যে পক্ষাঘাত হয়, সে পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা হিষ্টেরিক্যাল

প্যারালিসিস বলেন। বাতের ব্যামো থেকে যে পক্ষাঘাত হয়, সে পক্ষাঘাতকে তাঁরা রিয়ুম্যাটিক প্যারালিসিস্ বলেন।

৮। যে পক্ষাঘাতে, শরীরের জায়গায় জায়গায় মাংস শুকাইয়া যায় — ক্ষয় পাইয়া যায়— এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা ওয়েষ্টিং পল্‌জি বলেন।

৯। পারা থেকে পক্ষাঘাত—এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা মর্কুরিয়্যাল পল্‌জি বলেন। পারাকে ইংরাজিতে মর্করি বলে। এ কথা এর আগেই বলিছি।

১০। সীসে থেকে পক্ষাঘাত—এ পক্ষাঘাতকে ডাক্তরেরা লেড্ পল্‌জি বলেন। সীসেকে ইংরাজিতে লেড বলে।

১১। যে পক্ষাঘাতে দু খানি হাত আর বাউ নিয়ত কাঁপে—এ পক্ষাঘাতকে, ডাক্তরেরা প্যারালিসিস্ য়্যাজিটান্‌স বলেন।

১২। ছেলেদের আর এক রকম পক্ষাঘাত আছে। সে পক্ষাঘাতে পায়ের ডিম আর পাছা খুব ডাগর হয়। কিন্তু পায়ের জোর কিছুই থাকে না। চলিতে চলিতে ছেলে নিয়ত আছাড় খায়, পড়িয়া গেলে আবার শীঘ্র উঠিতে পারে না।

এ বার (১২) রকম ছাড়া ছোট খাটো অনেক রকম পক্ষাঘাত আছে। পক্ষাঘাত রোগের কথা যখন ভাল করিয়া লিখিব, তখন সে সব রকম পক্ষাঘাতেরই কথা বিশেষ করিয়া বলিব। এ বৈতে এত রকম পক্ষাঘাতের কথা বিশেষ করিয়া লিখিলে, বৈ খানি ঢের বড় হইয়া যাইত। এই জন্যে, এ বৈতে পক্ষাঘাতের কথা এই পর্য্যন্ত লিখিলাম।

১৩। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা—

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথাকে ডাক্তরেরা টন্‌সিলাইটিস বলেন, সোজা ইংরাজিতে সোরথ্রোট বলে। আলজিবের দু পাশে মাংসের দুটী গুল্লি আছে। সেই গুল্লি দুটীর এক একটীকে ডাক্তরেরা টনসিল বলেন। ভাল বাঙ্গালায় টন্‌সিলকে তালু-মুল-গ্রন্থি বলে। গুল্লির ভাল কথা গ্রন্থি; (৬২৭র পাত দেখ) আর টাকরার ভাল কথা তালু। এই জন্যে টনসিলকে সোজা বাঙ্গালায় টাক্‌রার গুল্লি বলিতে পার। টনসিলাইটিস ডাক্তারি কথা। টন্‌সিলাইটিসের অর্থ টনসিলের ইন্‌ফ্ল্যামেশন। ২৪৮র পাতে বলিছি, শরীরের কোন জায়গায় খুব রক্ত জমিলে, ফুলিলে, আর ব্যাথা হইলে, সেই জায়গার সে রকম অবস্থাকে ইনফ্ল্যামেশন বলে। ইনফ্যামেশন্‌ ইংরিজি কথা; ভাল বাঙ্গা-লায় একে প্রদাহও বলে, সন্তাপও বলে। এই জন্যে, টনসি-লাইটিসকে সোজা বাঙ্গালায় টাকরার গুল্লির প্রদাহ বলিতে পার। টাক্‌রার গুল্লির প্রদাহের ভাল কথা তালুমুল-গ্রন্থি-প্রদাহ। বায়ুনলিভুজ-প্রদাহের চেয়ে ব্রংকাইটিস কথা যেমন ঢের সোজা, তালুমুলগ্রন্থি প্রদাহ আর টাকরার গুল্লির প্রদাহ, এ দুয়ের চেয়ে টনসিলাইটিস কথা তেমনি ঢের সোজা। এই জন্যে ব্রংকাইটিস কথাটী এ বৈতে যেমন চলিত কথার মত ব্যবহার করিছি, টন্‌সিলাইটিস কথাটী ও জায়গায় জায়গায় তেমনি চলিত কথার মত ব্যবহার করিলাম। দেখিও টন্‌সিলাইটিস বলিলে ওর অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। টাকরার গুল্লিতে (টন্‌সিলে, রক্ত জমিলে, ব্যথা হইলে, আর তা ফুলিলে ডাক্তরেরা তাকে টন্‌সিলাইটিস বলেন। দুটী গুল্লিরই যে

একবারে প্রদাহ হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। প্রদাহ একটী গুল্লিরও হইতে পারে; দুটী গুল্লিরও হইতে পারে। 'প্রদাহ' কথারও অর্থ বুঝিতে যেন ভুল করিও না। প্রদাহ বলিলে কি বুঝায়, ২৪৮র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। ২৪৮র পাতা ছাড়া আরও অনেক জায়গায় বলিছি।

এর আগেই বলিছি, ডাক্তরি টনসিলাইটিস্ কথার সোজা ইংরিজি সোর-থ্রোট্। আবার সোরথ্রোটের সোজা বাঙ্গালা ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা। তাতেই বলিতেছি, শুদ্ধু ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলেই সব চুকিয়া যায়। টনসিলাইটিসও বলিতে হয় না; সোর-থোটও বলিতে হয় না। তবে টন্সি-লাইটিস বলিলে, কি সোর-থ্রোট বলিলে, আলটাকরার গুল্লির যেমন প্রদাহ বুঝায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলেও ঠিক তাই বুঝিয়া লইবে। তার যেন কোনও গোলমাল করিও না। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা আর কোন কোন রোগে হয় বটে, কিন্তু টনসিলাইটিস রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ছাড়া যেমন আর কোনও বিশেষ লক্ষণের কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না, তেমন আর কোনও রোগেই নয়। এই জন্যে, সোর-থ্রোট বলিলে যেমন টনসিলাইটিস ছাড়া আর কোনও রোগ বুঝায় না, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলিলে তেমনি কেবল টনসিলাইটিস রোগটাই বুঝিয়া লইতে হবে। তবু গোলের কথা একেবারে দূর করিবার জন্যে "ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার" কাছে দু দিকে এলেক দিয়া "টনসিলাইটিস" কথা লিখিয়া দিব। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা এই কথাই আমি বারে বারে বলিছি; কেউ কেউ বলিতে পারেন, তবে কি

কেবল ঢোক গিলিতেই গলায় ব্যথা? আর কিছু গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে না? এ কথার উত্তর এই। চোকের পল্লব যেমন না ফেলিয়া থাকা যায় না—চোকের পল্লব যেমন আপনিই পড়ে—ঢোক না গিলিয়া তেমনি থাকা যায় না—ঢোকও তেমনি আপনিই গিলিতে হয়। ঢোক গেলার মত এমন সোজা অভ্যাসের কাজেও যখন ব্যথা লাগে, তখন আর যাই কেন হোক না, গিলিতে গেলেই যে ব্যথা লাগিবে, তা ত বেশ বুঝাই যাইতেছে। আর কোন কোন রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে, এর পর তা বলিব।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টনসিলাইটিস) রোগটী বড়ই সাধারণ। এর মত সাধারণ রোগ আর নাই বলিলেও বলা যায়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সচরাচরই ঘটে। কারো কারো ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ছুতোয় নাতায় হয়। একটু হিম লাগিলেই তাদের ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। শর্দ্দি হইলে ত তাদের শর্দ্দি লাগার সঙ্গে সঙ্গেই ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। এ রোগটীর এমনি প্রকৃতি যে, একবার হইলে ফিরে আবার হইবার গোড়া পত্তন যেন করিয়া যায়। একটু অছিলে পাইলেই ফের হয়। বিশেষ, একবারকার ব্যামোর দরুণ টাকরার গুল্লি যদি জখম থাকিয়া যায়, তবে ফিরে সে গুল্লির প্রদাহ হইতে বড় বেশী অছিলের দরকার হয় না; নামে মাত্র ছুতো পাইলেই অমনি ও গুলির প্রদাহ ঘটে। কারো কারো ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা পুরাণ পড়িয়া যায়; পুরাণ পড়িয়া গেলে তারা সহজে এ অস্বস্তির হাত এড়াইতে পারে না।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা যদি সহজ রকমের হয়, তবে ঢোক গিলিতে কষ্ট ছাড়া রোগীর আর কোনও কষ্ট বা যাতনার বড় একটা পরিচয় পাওয়া যায় না। সহজ রকমের এ অস্বস্তি সামান্য অত্যাচারেই ঘটে। অত্যাচার আর কি? শীত বাত ভোগ—ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা—বা বৃষ্টিতে ভেজা। দুর্ব্বল শরীরে এ রকম অত্যাচার ঘটিলে এ অস্বস্তির হাত কখনও এড়ান যায় না।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টনসিলাইটিস্) রোগটা যেমন সাধারণ, আবার তেমনি কষ্টদায়ক। এ রোগে সকলে সমান কষ্ট পায় না। এর কারণ আর কিছুই নয়; প্রদাহের কমি বেশীই এ রকম ইতর বিশেষের কারণ। যার কেবল একটা গুল্লির সামান্য রকম প্রদাহ হয়, ঢোক গিলিতে একটু কষ্ট ছাড়া তার আর কোনও রকম যাতনা বা ক্লেশ হয় না। কিন্তু যার দুটি গুল্লিরই খুব ভারি রকম প্রদাহ হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া পড়ে, তার ক্লেশের, তার কষ্টের, যাতনার পরিসীমা থাকে না। প্রদাহ ছড়াইয়া পড়ে, যে বলিলে—প্রদাহ ছড়াইয়া কোথায় যায়? প্রদাহ ছড়াইয়া টাকরায় যায়, আল-জিবে যায়, গলার ভিতর পর্য্যন্ত যায়। এ সব জায়গায় প্রদাহ হইলে রোগীর কি বিষম কষ্ট হয়, তা সহজেই বুঝা যাইতে পারে। এ সব কথা এর পরই বলিব।

এ রোগ সচরাচর আমরা যা দেখিতে পাই, তার লক্ষণ এই—প্রথমে ঢোক গিলিতে সামান্য একটু কষ্ট বোধ হয়। এর সঙ্গে সঙ্গেই আলটাকরার ভিতর শুক্‌নো শুক্‌নো, আর

যেন কষিয়া ধরার মত বোধ হয়। এ রকম বোধ যে মাঝে মাঝে হয়, তা নয়। সর্ব্বদাই এ রকম বোধ হয়। এ ছাড়া আলটাকরার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, এমনি বোধ হয়। এ রোগের প্রথম লক্ষণই এই। তার পর, বাইরের আলোতে রোগীর আলটাকরার ভিতর বেশ ঠাউরে দেখিলে, তার একটী গুল্লি (টন্সিল) কি দুটী গুল্লিই রাঙা হইয়াছে আর ফুলিয়াছে, দেখিতে পাইবে। কখন কখন দুটী গুল্লিরই প্রদাহ এক বারে হয়। কিন্তু সচরাচর তা হয় না। প্রথমে কেবল একটী গুল্লির প্রদাহ হয়; তার পর সেটির ফুলো যেমন কমে, আর একটার ফুলো তেমনি আরম্ভ হয়। কর্ণমূল-ফোলা রোগের অনেক জায়গায় ঠিক এই রকম ঘটে। এক দিকের কর্ণমূল-ফোলা যে একটু কমে, সেই অমনি আর এক দিকের কর্ণমূল ফুলিতে আরম্ভ হয়। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। তার পর বলি; আলজিব ডাগর হয়, লম্বা হয়, আর খুব রাঙা হয়। এ অস্বস্তিতে আলজিবের এ রকম ভাব সচরাচরই হয়। আল জিব প্রায়ই জীবের উপর ঠেকিয়া থাকে। জিবের উপর আল-জিব এই রকম করিয়া ঠেকিয়া থাকে বলিয়াই, রোগীকে এত কষ্ট করিয়া বারে বারে ঢোক গিলিতে হয়। এ রোগে ঢোক গেলা কত কষ্ট, এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন, তিনিই তা জানেন। আল-জিব জিবের উপর ঐ রকম করিয়া ঠেকিয়া থাকে বলিয়া বোধ হয়, সেই জায়গায় যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে। তাতেই বারে বারে অত কষ্ট করিয়া ঢোক গিলিতে হয়। আলটাকরার যে গুল্লিটী (টনসিল) খুব বেশী

ফোলে, আল-জিবটে প্রায়ই সেই গুল্লির গায়ে লাগিয়া থাকে। আলটাক্‌রার শুক্‌নো ভাব শীঘ্রই ঘুচিয়া যায়, তার বদলে শ্লেষ্মা আসিয়া জমে। সে শ্লেষ্মা সহজ শ্লেষ্মার মত নয়। সে শ্লেষ্মা ফেণা ফেণা, আর চট্‌চটে আটা। সেই চটচটে আটা শ্লেষ্মা, গুল্লির (টনসিলের) গায়ে আর তার চারি পাশে জড়াইয়া লাগিয়া থাকে। সেই চট্‌চটে আটা শ্লেষ্মা তুলিয়া ফেলিবার জন্যে রোগী নিয়ত চেষ্টা করে। নিয়ত এ রকম গলা খাঁকা দেওয়াতে আর শ্লেষ্মা গিলিয়া ফেলিবার জন্যে নিয়ত এ রকম গলা খাঁকা দিতে থাকে, আবার সেই চট্‌চটে আটা শ্লেষ্মা গিলিয়া ফেলিবারও জন্যে সে নিয়ত চেষ্টা করাতে, তার যে কি কষ্ট, তা সেই-ই জানে। শ্লেষ্মাকে ডাক্তারেরা মিয়ুকস্‌ বলেন। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি।

আলটাক্‌রার গুল্লির প্রদাহ (টন্সিলাইটিস) খুব ভারি রকম হইলে, কখন কখন কর্ণমূলের গুল্লি আর চোয়ালের নীচেকার গুল্লি ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়, আবার কখন কখন রোগীর মুখ দিয়া নিয়ত লাল গড়াইতে থাকে। আলটাক্‌রার গুল্লির (টনসিলের) প্রদাহ ছড়াইয়া লালের গুল্লিতে গেলে রোগীর এই দশা ঘটে। কর্ণমূলের গুল্লিকেও লালের গুল্লি বলে, চোয়ালের গুল্লিকেও লালার গুল্লি বলে। লালের গুল্লিকে ডাক্তারেরা স্যালিবারি গ্ল্যাণ্ড বলেন, ভাল বাঙ্গালায় লালাগ্রন্থি বলে। লালের ভাল কথা লালা; আর গুল্লির ভাল কথা গ্রন্থি। এই সব গুল্লি থেকে লাল বাহির হয়। এই সব গুল্লিতে লাল তয়ের হয়। লাল তয়ের করাই এই সব

গুল্লির কাজ। এই জন্যে, তাদের লালের গুল্লি বলে। লাল ভারি দরকারি জিনিশ। হজমের জন্যে—পরিপাকের জন্যে লালের ভারি দরকার। কর্ণমূল ফোলার কথা বলিবার সময় এ সব ভাল করিয়া বলিব।

কখন কখন দেখা যায়, রোগী ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলে, কিন্তু যে অস্বস্তিতে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়, ঠাউরে দেখিলে তার আলটাকরার ভিতর তার কোনও পরিচয় পাওয়া যায় না। অর্থাৎ তার আলটাকরার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহের কোন পরিচয়ই পাওয়া যায় না। তবে রোগী ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বলে কেন? এখানে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার কারণ কি? কারণ সেই এক—প্রদাহ। এখানে আলটাকরার গুল্লির আরও নীচের দিকে—গলার ভিতরে প্রদাহ হয়। সে প্রদাহ দেখিতে পাওয়া যায় না। সে জায়গার প্রদাহ যন্ত্র দিয়া দেখিতে হয়। সে জায়গার প্রদাহকে ডাক্তারেরা ফ্যারিঞ্জাইটিস বলেন, সোজা বাঙ্গালায় গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ বলে। গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহ সচরাচর ঘটে না। গলার নলির উপরকার থলির প্রদাহের কথা এর পর বলিব।

এই অস্বস্তিতে কেবল গিলিবারই সময় গলায় ব্যথা লাগে। গলার ভিতর ব্যথা আছে কি না, আর কোনও সময় তা বোধই হয় না, বলিলে হয়। আলটাকরার গুল্লিতে ব্যথা হয় বলিয়াই গিলিবার সময় ব্যথা লাগে আর অত কষ্ট হয়। তা ছাড়া, আলটাকরার গুল্লি ডাগর হয় বলিয়া গিলিবার পথ আঁটো হইয়া যায়; কাজেই গিলিবার সময় ব্যথার জায়গায়

আরও বেশী চাপ পায়, আর সেই জন্যে গিলিতে আরও বেশী কষ্ট হয়। দুটী গুল্লিরই প্রদাহ যদি একবারে হয়, আর দুটী গুল্লিই যদি একবারে খুব ফুলিয়া যায়, তবে মাংসের ডেলার মত গুল্লি দুটী সুমুখের দিকে ঠেলিয়া আসে। কখন কখন গুল্লি দুটি ফুলিয়া এত বড় হয় যে, তাদের গায়ে গায়ে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি হয়। গায়ে গায়ে ছোঁওয়া-ছুঁয়ি আর ঘেঁষা-ঘেঁষি হইলে চাপ পাইয়া দুই গুল্লিতেই ঘা হয়। চুমুক দিয়া খাইবার জিনিশ গিলিবার চেষ্টা করিলে, নাক দিয়া তা বাহির হইয়া আসে। এ অস্বস্তির এ একটী সাধারণ লক্ষণ। ব্যথা একটু বেশী হইলে এ রকম প্রায়ই ঘটে। খুব নরম জিনিশও রোগী গিলিতে পারে না। নরম গরমের কথা দূরে থাক; গিলিবার নামে রোগী ডরায়। খিদেতে জ্বলিয়া মরে, তবু খাবার জিনিশের দিকে চায় না। ব্যামো একটু শক্ত রকম হইলে, গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়। এ লক্ষণটী ভাল নয়। যে সব রোগীর গলার ভিতর-কার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়, তাদের মধ্যে অনেকের আল্টাকরার গুল্লি পাকে—আল্টাকরার গুল্লিতে পূয হয়। গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হইলেই যে আল্টাকরার গুল্লি পাকিয়া থাকে বা পাকিতে চায়, তা নয়। তবে আলটাকরার গুল্লিতে পূয হওয়ার আগে, গলার ভিতরকার ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়। এ কথাটা মনে করিয়া রাখা খুব দরকার বটে। কখন কখন কানের ভিতর কেমন এক রকম শব্দ হয়, আর রোগী কানে কম শুনে।

আল্টাকরার গুল্লির (টন্সিলের) প্রদাহ যদি খুব বেশী রকম হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া জিবের গোড়া পর্য্যন্ত যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই তার আল্টাকরার ভিতরকার অবস্থা দেখা মস্কিল হইয়া পড়ে। এ রকম ঘটিলে, আঙুল দিয়া আস্তে আস্তে বেশ করিয়া ঠাউরে দেখা ছাড়া, আলটাকরার ভিতরকার অবস্থা জানিবার আর কোনও উপায় নাই। কখন কখন রোগী মোটেই হা করিতে পারে না। তার মুখের ভিতর আঙুলটী পর্য্যন্ত দিতে পারা যায় না। এ ছাড়া, সে মোটেই জিব নাড়িতে পারে না।

এ অস্বস্তিতে নিশ্বাস লইতে বা নিশ্বাস ফেলিতে রোগীর কোনও রকম কষ্ট দেখা যায় না। ফল কথা নিশ্বাস লইতে বা নিশ্বাস ফেলিতে তার কোনও রকম কষ্ট হয়ও না। ব্যামোর বাড়াবাড়ি হইলেও তার নিশ্বাস প্রশ্বাসের কোনও রকম কষ্ট হয় না। এ কথাটী মনে করিয়া রাখা বড় দরকার। আর যে যে রোগে ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়, সে সব রোগ থেকে এ রোগটী (আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ—টনসিলাইটিস্) চিনিয়া লইবার সময় এ কথাটী বড় কাজে লাগিবে। এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। আল-টাকরার গুল্লি ফুলিয়া ডাগর হয় বলিয়া, গলার ছাঁদা তাতে এক রকম বুজিয়া যায় বলিলেই হয়। এই জন্যে, রোগীর স্বরও বদ্‌লে যায়, কথাও বদ্‌লে যায়। রোগীর গলার স্বর শুনিলে বোধ হয়, তার গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, ফল কথা, সে রকম স্বর যিনি একবার শুনিয়া বেশ করিয়া ঠাউরে রাখিয়াছেন। তাঁর আর কখনও ভুল হয় না।

সে রকম স্বর শুনিলেই তিনি রোগ ধরিয়া দিতে পারেন। আলটাকরার ভিতরকার অবস্থা তাঁকে দেখিতেও হয় না। গলার ব্যথা বেশী রকম হইলে, রোগীর কথা এত অস্পষ্ট হয় যে, মোটে তা বুঝিতেই পারা যায় না।

এর আগেই বলিছি, এ রোগে নিশ্বাস-প্রশ্বাসের কোনও ব্যাঘাত ঘটে না। কিন্তু আলটাকরার গুল্লি দুটী খুব বেশী রকম ফুলিলে, কখন কখন নিশ্বাস প্রশ্বাসের ব্যাঘাত ঘটে। ভাগ্য ক্রমে এ রকম প্রায়ই ঘটে না। কিন্তু যখন এ রকম ঘটে, তখন রোগীর প্রাণ লইয়া টানাটানি করিতে হয়।

এ রোগে জ্বর-ভাব সর্ব্বদাই থাকে। বগলে তাপমান যন্ত্র (থর্ম্মমিটর) দিলে পারা ১০০র দাগ ছাড়াইয়া উঠে। কারো কারো জ্বর খুব বেশী রকমই হয়। তাদের বগলে তাপমান-যন্ত্র দিলে পারা ১০৪ দাগে উঠে। জ্বর হইবার আগে কারো বা কেবল একটু শীত বোধ হয়, কারো বা স্পষ্ট কম্প হয়। কম্প যে বেশী, তা নয়। কম্প সামান্য রকমই হয়। শীত বা কম্পের পর জ্বর ফোটে। পিপাসা হয়, আর খিদে মোটেই থাকে না। জিব ভারি নোংরা হয়, মুখে দুর্গন্ধ হয়; আর কোষ্ঠবদ্ধ হয়। মাথা-ধরার জন্যে রোগী প্রায়ই খুব কষ্ট পায়। ধর ত, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্‌সিলাইটিস্‌) যে রকম রোগ,রোগীর জ্বর জ্বালা যাতনা তার চেয়ে ঢের বেশী।

আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ শেষে প্রায়ই আপনা হইতেই কমিতে আরম্ভ হয়; তারপর কমিতে কমিতে আপনিই বেশ সারিয়া যায়। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা যদি কমিয়া যায়; জ্বর জ্বালা ক্রমে কমিয়া আসে; শ্লেষ্মা বেশী বেশী নির্গত হয়;

আর শ্লেষ্মার আটা কমিয়া যায়, তবে আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ কমিয়া আসিতেছে, আর শীঘ্রই প্রদাহ সারিয়া যাবে, ঠিক করিবে। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ সরিয়া যাইবার আগে এই সব লক্ষণ দেখা দেয়। ফল কথা, আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ সারিবার লক্ষণই এই। তারপর, আলটাকরার গুল্লিতে পূয হইবার আগে—আল্‌টাকরার গুল্লি পাকিবার আগে যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, এখন সেই সব লক্ষণের কথা বলি। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ খুবই বেশী হয়—খুবই বাড়িয়া যায়। গুল্লি দুটী এত বেশী ফোলে যে, গলার ছাঁদা প্রায় বুজিয়া যাইবার মত হয়; কাজেই, রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের বেশ ব্যাঘাত ঘটে। গুল্লি দুটীতে এমন ব্যাথা হয় যে, তার ভিতর যেন তুলো ফুঁড়িতে থাকে। সেই ব্যথা কানের ভিতর পর্য্যন্ত মালুম হয়। রোগী মোটেই হা করিতে পারে না। সে জিব বাহির করিতেও পারে না, নাড়িতেও পারে না। এ রোগে বাইরের ফুলো সচরাচর বড় একটা মালুম হয় না। কিন্তু গুল্লিতে পূয হইবার আগে—গুল্লি পাকিবার আগে গাল গলা বেশই ফোলে। পাঁচ ছ দিনের পর যদি ব্যামো বাড়ে, কি ব্যামো নরম না পড়ে, তবে গুল্লি পাকিবে ঠিক করিবে। কখন কখন গুল্লিতে পূয হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই কম্প হয়। রোগীর এ রকম অবস্থায় কম্প হওয়া, গুল্লিতে পূয হওয়ার নিশ্চিত চিহ্ন জানিবে। সব জায়গাতেই যে কম্প হইয়া থাকে বা হইতে চায়, তা নয়। গুল্লিতে পূয হইলে তার উপরকার পর্দ্দার ভিতর দিয়া পূয বেশ দেখা যায়। কিন্তু অনেক জায়গায় পূয এত নীচে থাকে যে, খুব ঠাউরে

দেখিলেও তা মালুম করিতে পারা যায় না। শেষে গুল্লির ফোড়া ফাটিয়া পূয বাহির হইয়া যায়। পূয যে বাহির হইয়া যায়, অমনি আগুনে যেন জল পড়ে। রোগীর যে তেমন যাতনা, তা তখনই ঘুচিয়া যায়,যাতনাও থামিয়া যায়, গিলিবারও কষ্ট যায়। মোটামুটি ধরিতে গেলে, রোগী এক রকম ভাল হইয়াই যায়। পূয যা বাহির হয়, তার ভারি দুর্গন্ধ। পূযের তার (আস্বাদন) আরও বিশ্রী, জিবে লাগিলে গা ন্যাকার ন্যাকার করিয়া উঠে। পূযের এই বিশ্রী তার আর দুর্গন্ধেই ত জানা যায় যে, ফোড়া ফাটিয়া গিয়াছে। নৈলে, অনেক যায়গায় তা জানিতে পারা যায় না। কেন না, পূযে যা বাহির হয়, তা এত কম যে, তা টেরই পাওয়া যায় না। টের পাবে কি ? রোগী তা প্রায় গিলিয়া ফেলে। কখন কখন গুল্লিতে পূয না হইয়া গলার বাইরে চামড়া মাংসর ভিতর পূয হয়। এ রকম ঘটনা কিন্তু খুবই কম ঘটে।

আল্‌টাকরার গুল্লি পচিয়া যাইবার কথা অনেকে বলেন বটে, কিন্তু তা ধর্তব্যের মধ্যে আসে না।

আলটাকরার গুল্লির (টন্‌সিলের)প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারেও না, সারিতেও চায় না। এ ছাড়া, গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে সামান্য একটু হিমবাত ভোগ করিলেই গুল্লির আবার নূতন করিয়া প্রদাহ হয়। এখানে গুল্লি যত ফোলে, তত রাঙ্গা হয় না। গুল্লির উপরটা চট-চটে আটা শ্লেষ্মা দিয়া ঢাকা থাকে। সহজ শরীরে আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ এমন বারে বারেও

হয় না; বারে বারে প্রদাহ হইয়া গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়াও যায় না। ছেলেই হোক্, আর জোয়ানই হোক্, যাদের ধাত (ধাতু) খুব খারাপ, আর যারা খুব রোগা আর দুর্ব্বল, তাদেরই এ দশা ঘটে। গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়ার দূর কারণের কথা বলিবার সময় এ সব কথা ভাল করিয়া বলিব। গুল্লি দুটী এত ডাগর হয় যে, আলটাকরার ভিতর যেন একেবারে বুজিয়া যায়। কাজেই রোগীর কথাও অস্পষ্ট হয়; কানেও সে কম শুনে, আর তার গিলিবারও কিছু কষ্ট হয়। এ ছাড়া গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে, এমনি বোধ হয়। গুল্লি ডাগর হইয়া অলটাকরার ভিতরটা বুজিয়া যাইবার মত হইলে, রোগী কানে কম শুনে কেন? গলার নলীর উপরকার থলির সঙ্গে আর কানের ভিতরকার পর্দ্দার সঙ্গে যে যোগ আছে। গলার নলীর উপরকার থলিকে ডাক্তারেরা ফ্যারিংস বলেন, আর কানের ভিতরকার সে পর্দ্দাকে তাঁরা টিম্পেনম্ বলেন। সুবিধা পাই ত, এ সব কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। আলটাক-রার গুল্লি দুটি ওরকম ডাগর হওয়ার দরুণ কখন কখন এমন ঘটে যে, রোগী পূরে দীর্ঘনিশ্বাস লইতে পারে না। রোগী প্রায়ই মুখ একটু খুলিয়া রাখে। নিশ্বাস লইবার সময় আর নিশ্বাস ফেলিবার সময় কেমন একরকম শব্দ হয়। আর কথা কহিবার সময় তার গলার ভিতর থেকে যেন কেমন এক রকম ফোঁস ফোঁস, বা শিশ দেওয়ার মত শব্দ বাহির হয়। আল-টাকরার গুল্লি দুটী এ রকম ডাগর হইলে, তাদের গা উবড়ো-খাবড়ো আর খাঁচ-কাটা হয়। ঠাউরে দেখিলে, এ খাঁচ-কাটা

জায়গায় সাদা কি জর্দ্দা রঙের এক রকম রস দেখিতে পাওয়া যায়। আলটাকরার গুল্লির এ রকম অবস্থা হয়, জানা শুনা না থাকিলে, আলটাকরার গুল্লিতে ঘা হইয়াছে বলিয়া সহজেই ভুল হইতে পারে।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা (টন্‌সিলাইটিস্) সচরাচর পাঁচ সাত দিনের বেশী থাকে না।

আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ আপনিই সারিয়া যাইতে পারে। ভাগ্যক্রমে সচরাচর এইটিই ঘটে। প্রদাহ খুব বাড়িয়া গুল্লি পাকিতে পারে—গুল্লিতে পূয হইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লিতে ঘা হইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যাইতে পারে। প্রদাহ হইয়া গুল্লির আর যে যে অবস্থা হয়, এর আগেই তা বলিছি। গুল্লিতে ঘা হওয়ার কথা এর পরই বলিব।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা। (টনসিইলাটিস্) আর কোন রোগের সঙ্গে গোলমাল হইয়া যাওয়া বড় একটা সম্ভব নয়। কেন না, রোগীকে হা করাইয়া বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলে আলটাকরার থলির প্রদাহ সহজেই ঠিক করিতে পারা যায়। আলটাকরার ভিতর ঠাউরে দেখিতে হইলে, রোগীর জিব চাপিয়া ধরিতে হয়। চামচের গোড়া দিয়া জিব বেশ চাপিয়া ধরা যায়। স্প্যাচুলা দিয়াও চাপিতে পারা যায়। অসুদ বিসুদ নাড়িবার জন্যে, আর মলম টলম তয়ের করিবার জন্যে, ডিস্পেন্‌সরিতে যে ছুরি থাকে ; ডাক্তারেরা সে ছুরিকে স্প্যাচুলা বলেন। চামচ বা স্প্যাচুলার অভাবে বাঁশের চেয়াড়ি ব্যবহার করিতে পার। বাঁশের চেচাঁড়ী নয়—বাঁশের চেয়াঁড়ি।

প্রতিমা গড়িবার সময় কর্ম্মিরা যে চেয়াড়ি ব্যবহার করিয়া থাকে, এখানে সেই চেয়াড়িরই কথা বলিতেছি। চেয়াড়ি যখন তখন, যে সে তয়ের করিয়া লইতে পারে। তার পর বলি। স্কার্ল্যাটীনা আর ডিফ্থীরিয়া, এই দুটি রোগে আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ হয়। এখন কেমন করিয়া জানিবে আলটাকরার গুল্লির এ প্রদাহ আসল রোগ, স্কার্ল্যাটিনা বা ডিফথীরিয়া রোগের অঙ্গ? রোগীর ঠাঁই তার রোগের পরিচয় বেশ করিয়া লইলে, আর তার রোগের লক্ষণগুলি বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিলে, তা জানিতে বাকী থাকে না। স্কার্ল্যাটীনা এক রকম ছোঁয়াচে জ্বর। জ্বরে রোগীর গায়ে মিল্মিলের মত কতকগুলি কি বাহির হইয়া সব গা একেবারে রাঙা হইয়া যায়। স্কার্ল্যাটীনাকে স্কার্লেট ফীবরও বলে। ডিফ্থীরিয়া টাকরার এক রকম ছোঁয়াচে রোগ। ডিফ্থীরিয়া ভারি ভয়ানক রোগ। এ রোগের হাতে নিস্তার পাওয়া কঠিন। স্কার্ল্যাটীনা আর ডিফ্থীরিয়ার কথা এর পর বলিব। ল্যারিঞ্জাইটিস রোগেও ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হয়। কিন্তু ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার চেয়ে নিশ্বাস প্রশ্বাসেরই কষ্ট ঢের বেশী হয়। ল্যারিঞ্জাইটিস ডাক্তারি কথা, ল্যারিঞ্জাইটিসকে বাঙ্গালায় গলার চুণ্ডির প্রদাহ বলে। গলার চুণ্ডিকে স্বর-যন্ত্রও বলে। গলার স্বরের যন্ত্রই গলার চুণ্ডি। ল্যারিঞ্জাইটিস রোগের কথা এর পর বলিব।

কারণ—দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা ২৯৯—৩০১র পাতে বলিছি। জোআন বয়সেই এ রোগ বেশী হয়; এই জন্যে জোআন

বয়স এ রোগের একটী দূর কারণ। রোগা দুর্ব্বল শরীরে এ রোগ বেশী হয়, এই জন্যে, রোগা দুর্ব্বল শরীর এ রোগের একটী দূর কারণ। গর্ম্মির ব্যামো হইলে এ রোগ বেশী হয়; এই জন্যে, গর্ম্মির ব্যামো এ রোগের একটি দূর কারণ। গর্ম্মির ব্যামোকে ডাক্তারেরা সিফিলিস বলেন; ভাল কথায় উপদংশ বলে। সিফিলিসকে স্যাঙ্কারও বলে। এ রোগ যার এক বার হইয়াছে, তারই এ রোগ বেশী হয়, এই জন্যে, এ রোগ একবার হওয়া এর আর একটী দূর কারণ।

তার পর এখন এ রোগের নিকট কারণ বলি। হিম বাত ভোগ করা—বৃষ্টিতে ভেজা—ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা, এ রোগের নিকট কারণ। খুব শ্রম করার পর বিশ্রাম না করিয়া ঠাণ্ডা জল খাওয়া এ রোগের একটী নিকট কারণ। শুদ্ধু ঠাণ্ডা জল বলিয়া কেন? চুমুক দিয়া খাইবার জিনিষ মাত্রেই।

এর আগেই বলিছি, আলটাকরার গুল্লির (টন্‌সিলের) প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারেও না, সারিতে চায়ও না। গুল্লি এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়ারও দূর কারণ আর নিকট কারণ আছে। গর্ম্মির ব্যামো হইলে গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে, এই জন্যে, গর্ম্মির ব্যামো গুল্লির এ অবস্থার একটী দূর কারণ। যাদের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), তাদেরই গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে। এই জন্যে, গণ্ডমালা ধাত (ধাতু), গুল্লির এ অবস্থার একটি দূর কারণ। গণ্ডমালা ধাত (ধাতু) কাকে বলে? গণ্ডমালা

ধাত (ধাতু) কি রকম ? ক্ষয়কাশের ধাত (ধাতু) আর গণ্ড-মালা ধাত এক—এখন মোটামুটি এইটী জানিয়া রাখ। যে ধাতে (ধাতুতে) ক্ষয়কাশ হয়, সেই ধাতকে (ধাতুকে) ক্ষয়কাশের ধাত (ধাতু) বলিতেছি। ক্ষয়কাশকে ডাক্তারেরা থাইসিস্ বলেন; সোজা ইংরিজিতে কন্‌জম্‌শন্ বলে। ক্ষয়কাশের কথা আর ক্ষয়কাশের ধাতের (ধাতুর) কথা এর পর ভাল করিয়া বলিব। গাল গলা বেড়িয়া গুল্লি হওয়া গণ্ডমালা ধাতের (ধাতুর) একটী চিহ্ন। যাদের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), তাদের গাল গলায় হাত দিয়া বেশ করিয়া টিপিয়া টিপিয়া দেখিলে, ছোট বড় সুপুরির মত গুল্‌লি হাতে মালুম হয়। গুল্‌লি গুলির ভাব সব সময় এক রকম থাকে না; কখনও ফোলে, কখনও তাতে ব্যথা হয়, কখনও পাকে, কখনও বা তাতে ঘা হয়। এ সব কথাও এর পর ভাল করিয়া বলিব। তার পর বলি। অনেক দিন থেকে যারা অপাক অজীর্ণ রোগ ভোগ করিতেছে, তাদেরই আলটাকরার গুল্‌লির ও রকম অবস্থা (ডাগর আর শক্ত হইয়া যাওয়া) বেশী ঘটে; এই জন্যে, অনেক দিনের অপাক অজীর্ণ রোগ গুল্লির ও রকম অবস্থার একটী দূর কারণ। গুল্লির ও রকম অবস্থার নিকট কারণ কেবল সেই একটী। সে নিকট কারণ আর কি ? গুল্লির প্রদাহ। গুল্লির প্রদাহ বারে বারে হইলেই না গুল্‌লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ কথা এর আগেই বলিয়াছি।

অনেক জায়গায় দেখা যায়, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যাথা (টন্‌সিলাইটি রোগ) একবারে অনেক লোকের হয়। এক

বাড়ীতে অনেকের একবারে এ রোগ হইতে দেখা যায়। এই সব দেখিয়া কেউ কেউ মনে করেন, এ রোগটি ছোঁয়াচে। ফল কিন্তু তা নয়। এ রোগের সে দোষ নাই। তবে এ রোগের কারণ—হিম বাত ভোগ, বৃষ্টিতে ভেজা, ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা—যে রকম সাধারণ, তাতে এক সময় অনেকের এ রোগ হওয়া একটুও আশ্চর্য্য নয়। এক বাড়ীতে এক সময় অনেকের এ রোগ হওয়া আরও সম্ভব। কেন না, এ রোগের কারণ ত সে রকম সাধারণ আছেই, তা ছাড়া, এক বাড়ীতে অনেকের ধাতও (ধাতুও) এক রকম মিলিয়া যায়। এক বাড়ীতে অনেকের যে এক রকম ধাত (ধাতু) হইতে পারে, আর হইয়াও থাকে, তা বেশ বুঝাই যাইতেছে। এক বংশ, তা ধাত (ধাতু) এক রকম হবে না ?

এ রোগে রোগীর জীবনের কোনও আশঙ্কা নাই বলিলেই হয়। এ রোগে রোগী প্রায়ই মারা যায় না। তবে প্রদাহ খুব ভয়ানক রকম হইলে, আর প্রদাহ বেশী ছড়াইয়া পড়িলে, রোগী মারা পড়ে। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ খুব ভয়ানক রকম হইলে যে সব লক্ষণ দেখা দেয়, এর আগেই তা বলিছি। আলটাকরার গুল্লির প্রদাহ ছড়াইয়া গলার চুণ্ডিতে গেলেই আর কি, সর্ব্বনাশ। নিশ্বাস লইতে না পারিয়াই রোগী মারা পড়ে। এই জন্যে, এ রোগে রোগীর নিশ্বাস প্রশ্বাসের সামান্য একটু কষ্ট হইলেও ও আশঙ্কা করিবে; আর খুব সাবধান হইয়া সব বেশ করিয়া ঠাউরে দেখিবে। আলটাকরার গুল্লি বেশী রকম ফুলিলে নিশ্বাস প্রশ্বাসের এক আধটু ব্যাঘাত হইতে পারে—হইয়াও থাকে

কিন্তু এ রকম হইতে পারে আর হইয়াও থাকে বলিয়া কখনও নিশ্চিন্ত থাকিবে না। খুব সাবধান হইয়া পরীক্ষা করিয়া দেখিতে কখনও ভুলিবে না। গলার চুড়ির প্রদাহ (ল্যারিঞ্জাইটিস্) কি ভয়ানক ব্যাপার, ল্যারিঞ্জাইটিস্ রোগের কথা বলিবার সময় তা বলিব।

এখন আলটাকরার গুল্‌লির প্রদাহের (টনসি-লাইটিস-রোগের) চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা—ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলেই আমি রোগীকে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাওয়াইয়া দিই। নিজেরও বেলায় আমি ঠিক এই রকম ব্যবস্থা করিয়া থাকি। সব দিকেই সুবিধা বলিয়া কুইনাইনের বড়িই ব্যবস্থা করি। একষ্ট্রাক্ট জেনশনেরই সঙ্গে কুইনাইনের বড়ি তয়ের করা সব চেয়ে ভাল। এ কথা এর আগে অনেক বার বলিছি। এ রোগের গোড়ায় কুইনাইন খাইলে আর কিছুই করিতে হয় না—আর কোনও রকম চিকিৎসার দরকারই হয় না। ছেলেরা পর্য্যন্ত কুইনাইনের এ গুণটি ভুলিতে চায় না। ভুলিতে চায় না কেন, তা বলি—এখানে তার একটা গল্পও বলি। বছর তিনেক হইল, এক দিন সন্ধ্যা বেলা বসিয়া আছি, আমার একটি মেয়ে (এখন তার বয়স এগার বছর) আসিয়া বলিল, "বাবা আমার গলায় ব্যথা হইয়াছে—ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা লাগে। আমি কিন্তু গলার ভিতর অসুদ লাগাইতে পারিব না—বড়ি খাব।" আমার উত্তরের অপেক্ষা না করিয়া সে আপনি আপনার চিকিৎসার ব্যবস্থা করিল। 'ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে এর আগে কাষ্টকির জল

(কষ্টিক লোশন) তার আলটাকরায় দু একবার লাগান হইছিল। সে কষ্ট তার বেশ মনে ছিল। শুদু বড়ি খাইলেই গলার ব্যথা সারিয়া যায়—গলার ভিতর অসুদ লাগাইতে হয় না; দুই এক বার কুইনাইনের বড়ি খাওয়াইয়া তাকে তাও জানাইয়া দেওয়া হইছিল। এই জন্যে, এ বারে সে আপনিই বড়ি খাওয়ার ব্যবস্থা করিল। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে, ছেলেদের জন্যে এখন আর আমাকে কোনও ব্যবস্থা করিতে হয় না। তারা আপনারাই কুইনাইনের বড়ি চাহিয়া খায়। বছর দুই হইল, এক দিন সকাল বেলা একটী ভদ্র লোকের সঙ্গে দেখা করিতে গিইছিলাম। কথায় কথায় তিনি বলিলেন, আজ আমার গলায় ব্যথা হইয়াছে—ঢোক গিলিতে ব্যথা করিতেছে। এখন ত আফিসে যাই; তার পর দেখি, অসুখ যদি বাড়ে, তখন তার একটা উপায় করা যাবে। তাঁর এই কথা শুনিয়া আমি বলিলাম, অসুখ বাড়ে কি না, দেখিবার জন্যে আপনাকে অপেক্ষা করিতে হইবে না—অপেক্ষা করা উচিতও না। আপনি এখনই ৫ গ্রেন কুইনাইন্ খান, আর আজ, কাল, পরশু, তিন দিন স্নান করিবেন না; একটু গরমে থাকিবেন—আপনাকে আর কিছুই করিতে হইবে না। পাঁচ সাত দিন পরে ফের দেখা হইলে বলিলেন, কুইনাইন খাইয়া সত্য সত্যই আমাকে আর কিছুই করিতে হয় নাই। কুইনাইন্ খাইলে গলার ব্যথা সারে, এ ত আমি কখনও শুনি নাই। আমি জানিতাম, গলায় কাষ্টকির জল (কষ্টিক্ লোশন্) লাগান ছাড়া, সোর্-থ্রোটের অসুদ আপনাদের আর নাই। তবে হোমিওপ্যাথির দু একটা অসুদে গলার

ব্যথায় খুব চটক দেখায়। এখন দেখিতেছি, কুইনাইনের কাছে কেউ না। যাই হোক, এ রোগের একটা খুব ভাল অসুদই জানা থাকিল ৩২৪র পাতে—২০র ছত্রে "ছেলে দুটীর মাতামহ" বলিয়া যাঁর উল্লেখ করিছি, এখানেও তাঁরই কথা বলিলাম। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা হইলে কি রকম নিয়মে থাকিতে হয়—অসুদ বিসুদই বা তার কি করিতে হয়, এখন তাই বলি। অনেক জায়গায় কুইনাইন এক বার খাইলেই কাজ হয়—আর খাইতে হয় না, খাইবার দরকারও হয় না। আবার কোন কোন জায়গায়, কুইনাইন দু তিন বারও খাইতে হয়। ফল কথা, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা বেশ সারিয়া না গেলে কুইনাইন খাওয়া বন্ধ করা উচিত নয়। কুইনাইনের বড়ি ভাল; খাইতে কোন কষ্টই নাই। কুই-নাইনের বড়ি দু বেলা দুটো খাওয়া ভাল। গলার ব্যথা দিনের বেলায় একটু কম থাকে, সন্ধ্যার আগে বাড়ে—রাত্রে বড় কষ্ট দেয়—এ অস্বস্তির গতিকই এই। এই জন্যে, সকালে আর বৈকালে দু বেলা দুটো বড়ি খাইলে অসুখ সদ্যই সারিয়া যায়। আজ সকালে উঠিয়া ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা জানিতে পারিলে; জানিতে পারিয়াই পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইলে; স্নান বন্ধ করিলে; কাপড় চোপড় গায়ে দিয়া সারা দিন খুব গরমে থাকিলে; বৈকালে ফের পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইলে; রাত্রে আহার না করিয়া একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া শুইয়া থাকিলে। পর দিন সকালে উঠিয়া গলায় ব্যথা কমা বুঝিতে পারিলে না। ঢোক গিলিয়া দেখিলে, ব্যথা প্রায় তেমনিই আছে। এখন কি করিবে? কাল যে রকম

নিয়মে ছিলে, আজও কি ঠিক সেই রকম নিয়মে থাকিবে, না আর কিছু নূতন রকম তদ্বির করিবে? নূতন রকম তদ্বির আর কি? কাল সকালে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইয়াছিলে, আজও সকালে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইবে। কাল স্নান কর নাই, আজও স্নান করিবে না। কাপড় চোপড় গায়ে দিয়া কাল যে রকম গরমে ছিলে, আজও সেই রকম গরমে থাকিবে। কাল দিনমানে আহার করিছিলে, আজ দিনমানে আহার করিবে না, একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাবে। আর গরম দুধ আর গরম জল সমান ভাগে মিশাইয়া, সারা দিনই তার কুলি করিবে। সচরাচর যে রকম করিয়া কুলি করিতে হয়, এখানে সে রকম করিয়া কুলি করিলে হবে না। এখানে কুলি একটু আলাদা রকম করিয়া করা চাই। গরম জল-মিশনো গরম দুধ মুখে লইয়া মুখ খুব উচু করিয়া, সেই দুধ জিবের গোড়ার দিকে, আলটাকরার ব্যথার জায়গায় লইয়া আসিবে। তার পর কাশ বা শ্লেস্মা তুলিবার সময় গলার ভিতর যে রকম শব্দ করিতে হয়, ইচ্ছা করিয়া খুব সহজে—খুব আস্তে সেই রকম শব্দ নিয়ত করিতে থাকিবে; তা হইলে সেই দুধ যেন গড়গড় করিয়া ফুটিবার মত হইয়া সব আলটাকরায় লাগিতে থাকিবে। এ রকম করিয়া কুলি করাকে "গলায় কুলি করা" বলিতে পার। আর সচরাচর যে রকম করিয়া কুলি করে, তাকে "গালে কুলি করা" বলিতে পার। গালের ভিতরকার দুধ জুড়াইয়া গেলে, সে দুধ ফেলিয়া দিয়া আর খানিক গরম দুধ মুখের মধ্যে লইবে, আর সেই রকম করিয়া গলায় কুলি করিবে। নিয়ত এই রকম

করিতে থাকিবে—সারাদিনই এই রকম করিবে, এই রকম করিয়া কুলি করিতে বিরক্ত হইবে না—বিরক্ত হইলে চলিবে না। গরম দুধের কুলি ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার বড় অসুদ। আজ আহার কর নাই, বৈকালে আর খানিক গরম দুধ চুমুক দিয়া খাবে। কাল সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাইয়াছিলে, আজও সন্ধ্যার আগে পাঁচ গ্রেন কুইনাইন খাবে। কাল রাত্রে শুদু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া শুইয়াছিলে, আজও রাত্রে শুদু একটু গরম দুধ চুমুক দিয়া খাইয়া শোবে। শুইবার আগে গরম দুধের কুলি অনেক বার করিবে। এই রকম নিয়মে থাকিলে, আর এই রকম তদ্বির করিলে ১০০র মধ্যে ৯৯ জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সারিয়া যায়। এখানে সোজা-সুজি রকম অস্বস্তিরই কথা বলিতেছি। দু দিনেই অসুখ সারিয়া গেল বলিয়া, দিন কত খুব সাবধানে থাকিতে কখনও ভুলিবে না। বিশেষ এ অস্বস্তি একবার হইলে ছুতোয় নাতায় ফের হয়—এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ অস্বস্তির দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা বলিবার সময় যা যা বলিছি, তা যদি মনে করিয়া রাখ, তবে কি রকম সাবধানে চলিতে হবে, কারো কাছে তা তোমাকে শুধাইতে হবে না।

হুঁকোয় নল লাগাইয়া যেমন করিয়া তামাক খায়, ফুটন্ত গরম জলের ভাব সেই রকম করিয়া টানিয়া আলটাকরার ব্যথার জায়গায় তার সেক লাগাইলে যেমন আরাম বোধ হয়, তেমনি উপকার হয়। ঐ রকম করিয়া গরম জলের ভাবের সেক লাগাইলে তখনই তখনই উপকার হয়। গলার ব্যথার

জন্যে আগে যে ভারি কষ্টে ঢোক গিলিতেছিল, ফুটন্ত গরম জলের ভাব ঐ রকম করিয়া চারি পাঁচবার টানিলে, সে ঢের সহজে ঢোক গিলিতে পারে। গরম জলের ভাবের এমনি গুণ! এতে ব্যথা এত নরম পড়ে ঐ রকম করিয়া গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবার সময় তোমার বোধ হবে, গলার ব্যথা যেন সারিয়া গিয়াছে। সেক বন্ধ করিলে খানিক পরে যে ব্যথা, সেই ব্যথাই জানিতে পারা যায়। তাতেই বলি, অনেকক্ষণ ধরিয়া সেক লাগাইলে, আর বারে বারে সেক লাগাইলে গলার ব্যথা সদ্যই নরম পড়ে— আর দু দিনেই সারিয়া যায়। গরম দুধের কুলির চেয়েও এতে বেশী উপকার হয়। এই জন্যে গরম দুধের কুলিতে তেমন উপকার না হইলে, ঐ রকম করিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবে। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেকে যদি বেশী উপকার হয়, তবে আগে গরম দুধের কুলি করিয়া দেখিবার দরকার কি? ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক ত আগেই দিলে হয়। তা না হয় এমন নয়। তবে সহজ উপায়টাই আগে করিয়া দেখিতে হয়। গরম দুধের কুলি করিবার জন্যে কোন রকম উদ্যোগ আয়োজনের দরকার নাই। ফুটন্ত গরম জলের ভাবের সেক লাগাইবার জন্যে উদ্যোগ আয়োজন এক আধটু চাই। কেট্‌লিতে করিয়া জল ফুটাও। তার পর ফুটন্ত গরম জলের সেই কেটলির নলের মুখে যে সে একটা নল জুত বরাত করিয়া লাগাও। তার পর, সেই নলের মুখ দিয়া ফুটন্ত গরম জলের ভাব এমনি জুত বরাত করিয়া টান যে, সেই ভাব যেন আল-

টাকরার ব্যথার জায়গায় ঠিক লাগে। কেট্‌লিটা গন্‌গনে আগুনের উপর বসান থাকিলে, গরম জলের ভাবের সেক অনেক ক্ষণ ধরিয়া লাগাইতে পারা যায়। কেট্‌লির নলের মুখে যে সে একটা নল যে জুত বরাত করিয়া লাগাইতে বলিলাম—কিসের নল লাগাইবে ? পেঁপের নল লাগাইতে পার—তল্‌দা বাঁসের নল লাগাইতে পার—হরেক রকম পাতার নল তয়ের করিয়া লাগাইতে পার—মোটা কাগজেরও নল তয়ের করিয়া লাগাইতে পার। পাড়াগাঁয়ে হুঁকোয় যাঁরা বড় বড় নল লাগাইয়া তামাক খাইতে ভাল বাসেন ; কোন্ পাতার ভাল নল হয়, তাঁরা তা বেশই জানেন। কেট্‌লির অভাবে হাঁড়িতে করিয়া জল গরম করিবে। জল সিদ্ধ করিবার সময়, হাঁড়ির মুখ শরা দিয়া ঢাকিয়া দিবে। হাঁড়ির মুখ ঢাকা থাকিলে, ভাব বাহির হইয়া যাইতে পারে না ; জল খুব শীঘ্র গরম হয়। জল গরম করিবার আগে শরার এক পাশে একটা ছাঁদা করিয়া লইবে। ছাঁদাটী এমন ভাবে করিবে যে, তাতে যেন জুত বরাত করিয়া নল লাগাইতে পারা যায়। তার পর, ছাঁদাটীতে ন্যাকড়ার বুজলো দিয়া শরা খানি উপুড় করিয়া হাঁড়ির মুখে দিবে। জল ফুটিয়া উঠিলে, হাঁড়ি নামাইয়া একটা উচু জায়গায় জুত বরাত করিয়া বসাইবে। তার পর, ন্যাকড়ার বুজলো খুলিয়া শরার ছাঁদায় নল লাগাইয়া, গরম জলের ভাব ঐ রকম করিয়া টানিবে।

মুখের মধ্যে খয়ের রাখা আর সেই খয়েরের ঢোক গেলা এ অস্বস্তির আর একটী ভাল অসুদ। আর আর রকম খয়েরের চেয়ে পাঁপড়ি খয়েরই রাখা ভাল। খয়ের মুখের মধ্যে সর্ব্বদাই

রাখা চাই। মুখের লালে খয়ের গুলিবে; আর তুমি তার ঢোক গিলিবে। খয়ের ফুরাইয়া গেলে মুখের মধ্যে আবার খয়ের লইবে। রাত্রে যখন শোবে, একটু খয়ের মুখে করিয়া শোবে। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সোজাসুজি রকমের হইলে, শুদু এই মুষ্টিযোগেই সারিয়া যায়—আর কিছু অসুদ বিসুদ করিতে হয় না। ঠুকো ঠাকা অসুদকে ভাল কথায় মুষ্টিযোগ বলে।

নিয়ত বরফ চুষিয়া খাওয়া এ অস্বস্তির আর একটী খুব ভাল মুষ্টিযোগ। জাঁতি দিয়া বরফ টুক্‌রো টুক্‌রো করিয়া কাটিয়া একটা পাত্রে করিয়া রাখ। তার পর, বরফের সেই টুক্‌রো এক এক খানি করিয়া মুখে দেও আর নিয়ত চুষিতে থাক। বরফের টুক্‌রো ফুরাইয়া গেলে জাঁতি দিয়া আবার সেই রকম করিয়া কাটিয়া লইবে। ফল কথা, বরফ চোষা যেন কামাই না যায়। ঢোক গিলিতে গলার ব্যথা বেশ সারিয়া না গেলে আর বরফ চোষা বন্ধ করিবে না। বরফের টুক্‌রো ঐ রকম করিয়া চুষিয়া, বরফগলা ঠাণ্ডা জল টুকু গিলিবার সময় কি আরামই বোধ হয়—কি স্বস্তিই বোধ হয়! এ অস্বস্তিতে যিনি বরফের টুক্‌রো চুষিয়া খাইয়া দেখিয়াছেন, সে আরামের কথা—সে স্বস্তির কথা কেবল তিনিই বলিতে পারেন। বরফ-গলা ঠাণ্ডা জল টুকু গিলিবার সময় বোধ হয়, গলার ব্যথা শূলো যন্ত্রণা সব যেন ধুয়ে নামাইয়া দিল। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার যেমন অসুদ বরফ চোষা, তেমন অসুদ আর নাই বলিলেও হয়। এ অস্বস্তিতে গলার ভিতর শ্লেষ্মা জমে বলিয়াই, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া নিয়ত গলা-খাঁকা দিতে হয়, আর ঢোক গিলিতে হয়। ঐ রকম করিয়া নিয়ত বরফ চুষিয়া খাইলে গলার ভিতর

এ অস্বস্তির যেমন অসুদ বরফ চোষা, তেমন আর নাই।

শ্লেষ্মা আর জমিতে পায় না—শ্লেষ্মা জমা বারণ হয়। তবেই দেখ, বরফ চুষিয়া খাওয়ার কত উপকার! গলার ব্যথা খুব বেশী রকম হইলেও এ মুষ্টিযোগে বিশেষ উপকার হয়। মুষ্টিযোগ বলিলে কি বুঝায়, এর আগেই তা বলিছি।

পাড়াগাঁয়ে বরফ পাওয়া যায় না। কাজেই বরফের এমন গুণ আছে জানিয়াও পাড়াগাঁয়ের ডাক্তারেরা কিছুই করিতে পারেন না। কি বলিব যে বরফ এখানে পাওয়া যায় না! নৈলে, তোমার গলার ব্যথা সদ্যই ভাল করিয়া দিতে পারিতাম। এ অস্বস্তির চিকিৎসায় রোগীর কাছে তাঁদের কেবল এই রকম করিয়া আক্ষেপ করিতে হয়। তবে, আজকাল কলের বরফ খুব শস্তা হইয়াছে। বরফ অনেক জায়গায় পাওয়াও যায়। আগে মার্কিন দেশ থেকে জাহাজে করিয়া বরফ কলিকাতায় আসিত। কাজেই, কলিকাতা ছাড়া আর কোনও জায়গায় বরফ পাওয়া যাইত না। এখন বরফ কলে তয়ের হইতেছে। পাড়াগাঁয়েও অনেক বড় মানুষে বরফ তয়েরি করার কল লইয়া গিয়াছেন। এ ছাড়া, রেলের গাড়ির প্রসাদে কলিকাতার সঙ্গে আজ কাল অনেক জায়গায় খুব নিকট সম্বন্ধ হইয়া দাঁড়াইয়াছে। এই জন্যে, পাড়াগাঁয়ে পয়সা-ওয়ালা লোকে মনে করিলে ডাক্তার মহাশয়দের ও রকম আক্ষেপ সহজেই ঘুচাইয়া দিতে পারেন। বরফের শেষ কথা—বরফ নৈলে যে এ অস্বস্তির চিকিৎসা হয় না, তা যেন কেউ মনে করেন না; তবে বরফ মিলাইতে পারিলে রোগীর বড়ই সুবিধা হয়।

"কাষ্টকি এ রোগের আর একটী খুব ভাল অসুদ। তুলি করিয়া কাষ্টকির জল আলটাকরারগুল্লিতে আর তার চারি পাশে

লাগাইয়া দিলে, অনেক জায়গায় ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা সদ্য ভাল হয়। অনেক জায়গায় কাষ্টকির জল একবারের বেশী লাগাইতে হয় না। ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা একটু বেশী রকম হইলে, কাষ্টকির জলও বেশী বার লাগাইতে হয়। ফল কথা, গলার ব্যথা নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে কাষ্টকির জল লাগান বন্ধ করা হবে না। এর আগেই বলিছি, এ অস্বস্তি দিনের বেলায় একটু কম থাকে---সন্ধ্যার আগে বাড়ে—রাত্রে বড়ই কষ্ট দেয়। এই জন্যে, গলার ব্যথা একটু বেশী রকম হইলে, কাষ্টকির জল সকালে বিকালে, দু বার লাগাইবে। তুলি করিয়া কাষ্টকির জল আলটাকরায় লাগাইবার সময় রোগীর বড় কষ্ট হয়। কাষ্টকির জল লাগান হইয়া গেলেও অনেক ক্ষণ পর্য্যন্ত কষ্ট থাকে। কষ্ট আর কিছুই নয়; মুখের ভিতর, আল্‌টাকরায়, গলায়, কেমন এক রকম কলঙ্কা কলঙ্কা স্বাদ পাওয়া যায়, আর লাল কাটিতে থাকে—শ্লেষ্মা উঠিতে থাকে। এ ছাড়া, আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগাইবার জন্যে, যে উদ্যোগ আয়োজন করিতে হয়, তাতেই রোগীর মন্দ কষ্ট হয় না। চামচের গোড়া দিয়াই হোক, স্প্যাচুলা দিয়াই হোক, আর চেয়াড়ি দিয়াই হোক, জিবের গোড়া পর্য্যন্ত বেশ করিয়া চাপিয়া ধরিয়া তবে কাষ্টকির জল লাগাইতে হয়। জিবের গোড়া পর্য্যন্ত ঐ রকম করিয়া চাপিয়া ধরিবার সময় রোগীর ওআক আসে—আল্‌টাকরায় তুলি করিয়া কাষ্টকির জল লাগাইবার সময় তার আরও ওআক উঠে। এই রকম করিয়া ওআক আসে আর ওআক উঠে বলিয়াই, রোগীর আল্‌টাক-রার সব জায়গায় কাষ্টকির জল বেশ করিয়া লাগাইবার বড়ই

সুবিধা হয়; আলটাকরার ভিতরকার সব বেশ করিয়া দেখিবারও খুব সুবিধা হয়। এই রকম কষ্ট হয় বলিয়া রোগীরা আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগাইতে সহজে স্বীকার হয় না। কষ্টই হোক, আর যাই হোক, তুলি করিয়া কাষ্টকির জল আল্‌টাকরার গুল্লিতে আর তার চারি পাশে লাগান, এ অস্বস্তির যেমন তেমন অসুদ্‌ নয়—একটা খুব ভাল অসুদ; এ কথাটা যেন মনে থাকে। কাষ্টকির জলের এমনি গুণ যে, আল্‌টাকরার গুল্লিতে একবার ভাল রকম করিয়া লাগাইতে পারিলে, ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা নরম পড়িতে চায়ই। কাষ্টকির জল লাগাইলে আলটাকরার সব জায়গা যেন কষিয়া ধরে। সেই কষিয়া ধরাতেই কাজ হয়। সেখানে আর তেমন রক্ত জমিয়া থাকিতে পারে না—শ্লেষ্মাও আর তেমন জমিতে পারে না। কাজেই, আলটাকরার গুল্লির ব্যথা আর ফুলো কমিয়া যায়। শ্লেষ্মা আর তেমন জমিতে পারে না বলিয়া, রোগীকে অত কষ্ট করিয়া নিয়ত গলা খাঁকাও দিতে হয় না—নিয়ত ঢোক গিলিতেও হয় না। তবেই দেখ, কাষ্টকির জল একবার লাগাইলেও কত উপকার হয়! যে রোগের যে অসুদই হোক, অসুদ যতই ভাল হোক, রোগের গোড়ায়—রোগ শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার আগে, সে অসুদ ব্যবহার না করিলে শীঘ্র ফল পাওয়া যায় না—শীঘ্র ফল পাইবার কথাও নয়। অন্য অন্য অসুদের বেলায় এ কথাটা যেমন খাটে, কাষ্টকির জলের বেলায় তার চেয়ে হাজার গুণ খাটে—হাজার গুণেরও বেশী খাটে। কেন, তা বলি। ৯০৪—৯০৫র পাতে বলিছি, আলটাকরার গুল্লির (টনসিলের) প্রদাহ যদি খুব

বেশী রকম্ হয়, আর সেই প্রদাহ ছড়াইয়া জিবের গোড়া পর্য্যন্ত যায়, তবে রোগী বেশ হা করিতে পারে না। কাজেই, তার আলটাকরার ভিতরকার অবস্থা দেখা মস্কিল হইয়া পড়ে। এ রকম ঘটিলে, আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগাইবার কথা ত ছাড়িয়াই দিতে হয়। রোগী হা করিতে না পারিলে, তার আলটাকরার ভিতরকার অবস্থাই বা কেমন করিয়া দেখিবে? তুলি করিয়া কাষ্টকির জলই বা কেমন করিয়া লাগাইবে? তাতেই বলিতেছি, এ রোগ শক্ত হইয়া দাঁড়াইবার আগে কাষ্টকির জল না লাগাইলে শীঘ্র ফল ত পাওয়া যায়ই না—আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগানই মস্কিল হইয়া পড়ে। কাষ্টকির জলকে ডাক্তরেরা কষ্টিক্ লোশন বলেন। প্রেস্ক্রপ্‌শনে কাষ্টকি লেখেন না—নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌বর্ লেখেন। ব্রাণ্ডির ডাক্তরি কথা যেমন বাইনম্ গ্যালিসাই, কাষ্টকির ডাক্তরি কথা তেমনি নাইট্রেট্ অব্ সিলবর্। কাষ্টকির জল যেমন করিয়া তয়ের করে নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

নাইট্রেট্ অব্ সিল্‌বর (কাষ্টকি)	...	৩০ গ্রেন্
ডিষ্টিল্ড ওয়াটর (চোঁয়ান জল)	...	৪ ড্রাম

নীল কি সবুজ কাগজে মোড়া একটা শিশিতে ৪ ড্রাম ডিষ্টিল্ড ওয়াটর (চোয়ান-জল) ঢালিয়া দেও, তারপর ৩০ গ্রেন (আধ ড্রাম) কাষ্টকি ওজন করিয়া শিশির জলে ফেল। কাক আঁটিয়া শিশিটে বার কতক নাড়িলেই কাষ্টকি গুলিয়া যায়। কাষ্টকি যে সে জলে গোলে না, ডিষ্টিল্‌ড ওয়াটর (চোয়ান-জল) বৃষ্টির জল, আর গোলাপ-জল ছাড়া আর কোনও জলে কাষ্টকি গোলে না। আর কোনও জলে

কাষ্টকি ফেলিয়া দিবা মাত্রই সব জল একবারে শাদা হইয়া যায়।' কাষ্টকির জল (কষ্টিক লোশন) তয়ের করিবার সময়, কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাটা যেন মনে থাকে। এ ছাড়া, আলো লাগিলে কাষ্টকির জল খারাপ হইয়া যায়। এই জন্যে, নীল কি সবুজ কাগজ দিয়া শিশি বেশ করিয়া মুড়িয়া, তবে তাতে ঐ রকম করিয়া কাষ্টকির জল তয়ের করিবে। আলোতে কাষ্টকিও ভাল থাকে না। এইজন্যে কাল কাগজে কাষ্টকির বাতি মোড়া থাকে। কাষ্টকির জল তয়ের করিবার সময়, কি ব্যবস্থা করিবার সময়, এ কথাটাও যেন মনে থাকে। ডিষ্টিল্ড ওয়াটর (চোয়ান-জল) ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এ জলের দাম বেশী নয়—চারি গণ্ডা পয়সায় এক বোতল জল পাওয়া যায়। আলটাকরায় কাষ্টকির জল লাগাইবার জন্যে ফি বারে নূতন তুলি ব্যবহার করিবে। যে তুলি একবার ব্যবহার করিয়াছ, কাষ্টকির জলে সে তুলি ডুবাইলে কাষ্টকির জলটি তখনই খারাপ হইয়া যায়—শাদা হইয়া যায়; সে জলে আর তেমন গুণ করে না। এ ছাড়া, একবার যে তুলি ব্যবহার করা হইয়াছে, সে তুলি নোংরা হইয়া যাওয়ার ত কথাই নাই।

এ অস্বস্তির আর একটা অসুদ আছে। সে অসুদটী খুব ভাল। সে অসুদটীর কথা এখনও বলি নাই। জ্বর না থাকিলে রোগীকে সে অসুদ দেয় না—সে অসুদ দেওয়া ব্যবস্থা নয়। সে অসুদ আর কি? য়্যাকোনাইট। কাঠ-বিষকে ইংরিজিতে য়্যাকোনাইট বলে। ১২৩র পাতে একথা বলিছি। জ্বর না থাকিলে রোগীকে যখন এ অসুদ দেওয়া নিষেধ, তখন এ

অসুদ ব্যবহার করিবার আগে তাপমান যন্ত্রের (থর্ম্মমিটরের) যে ভারি দরকার, তা বুঝাই যাইতেছে। রোগীর বগলে তাপমান যন্ত্র দিয়া জ্বর ঠিক করিয়া তবে য়্যাকোনাইট দিবে। দু ঔন্স (এক ছটাক) ঠাণ্ডা জলে ৮ ফোটা টিংচর য়্যাকোনাইট দিয়া, চা চামচের এক চামচ (ছোট ঝিনুকের এক ঝিনুক—এক ড্রাম) করিয়া সেইজল ১৫ মিনিট অন্তর উপরো উপরি ৮ বার খাওয়াইবে; তারপর ঘণ্টায় ঘণ্টায় দিবে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে, আবার ঐ রকম করিয়া তয়ের করিয়া লইবে। রোগীকে যদি ভারি কাবু দেখ, আর তার নাড়ী খুব দুর্ব্বল বোধ হয়, তবে টিংচর য়্যাকোনাইট আরও কম মাত্রায় দিবে। এক এক মাত্রায় এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগের বেশী দিবে না। যদি বল, এক ফোটাকে আবার কেমন করিয়া ৬ ভাগ করিব? দু ঔন্স (১৬ ড্রাম) জলে ৮ ফোটা মিশাইয়া এক ড্রাম করিয়া সেই জল এক একবারে খাইতে দিয়া, এক ফোটাকে যখন দু ভাগ করিতে পারিয়াছ, তখন এক ফোটাকে ৬ ভাগ করা আর শক্তটা কি? তিন ঔন্স (২৪ ড্রাম) জলে ৪ ফোটা মিশাইয়া, এক ড্রাম করিয়া সেই জল এক একবারে খাইতে দিলে, ফি বারে এক ফোটার ৬ ভাগের এক ভাগ খাওয়ান হয়। টিংচর য়্যাকোনাইট এই নিয়মে খাওয়াইলে, রোগীর তেমন শুকনো খশ-খশে গরম গা ঘামে বেশ ভিজে-ভিজে আর নরম হয়। তারপর ঘাম এত হয় যে, গা দিয়া গড়াইয়া পড়িতে থাকে। ঘাম হওয়ার সঙ্গে সঙ্গেই নাড়ীর বেগ কমিয়া যায়, আর দু এক দিনের মধ্যেই নাড়ী ও গায়ের তাত সহজ হয়।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার সূত্রপাতেই যদি টিংচর য়্যাকোনাইট ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে পার, তবে রোগীকে ভাল করিতে তোমার দু দিনও লাগে না—অনেক জায়গায় সদ্যই ভাল করিতে পার। জ্বর না থাকিলে য়্যাকোনাইট দেয় না—দিলে কোনও ফল হয় না—এ কথাটা যেন মনে থাকে। টিংচর য়্যাকোনাইট খাইয়া এদিকে রোগীর গায়ের তাত আর নাড়ী যেমন সহজ হইয়া আসে, ও দিকে তার আল্টাকরার গুল্লির (টন্‌সিলের) অবস্থাও তেমনি ফিরিয়া যায়। আল্টাকরার গুল্লি আর তেমন ডাগর, রাঙা, চকচকে, আর শুকনো থাকে না; গুল্লির ফুলো আর রাঙা প্রায় থাকে না; গুল্লি দুটী বেশ ভিজে ভিজে হয়; যে গুল্লি একবারে চকচকে শুকনো ছিল, সেই গুল্লি শ্লেষ্মায় ঢাকিয়া যায়—কখন পূযেও ঢাকিয়া যায়। শ্লেষ্মাকে ডাক্তরেরা মিয়ুকস্ বলেন—এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি। গুল্লি দুটী, শ্লেষ্মায় কি পূযে ঢাকিয়া গিয়াছে দেখিয়াই যদি তাতে কাষ্টকির জল ঐ রকম করিয়া লাগাইয়া দেও, তবে ব্যামোর কসুর এক আধটু যা থাকে, তা মিটিয়া যায়। এখানে ব্যামো আর কি, প্রদাহ। টিংচর য়্যাকোনাইট খাইয়া গুল্লির ফুলো, রাঙা, ব্যথা, যা কিছু অবশিষ্ট থাকে, তাকেই এখানে ব্যামোর কসুর বলিতেছি; এখানে আমার একটী রোগীর কথা বলি।

বছর পাঁচ ছয় হইল, একটী রোগী দেখিতে গিইছিলাম। রোগী নয় রোগিণী—মেয়ে মানুষ। রোগিণীর বয়স ত্রিশ বছরের বেশী নয়। সর্দ্দি লাগিয়া ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা

(সোর-থ্রোট—টনসিলাইটিস) হয়। এর আগেই বলিছি, "ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা" রোগটি এমনি সাধারণ যে, এর জন্যে কোনও অসুদ বিসুদ করা বা কোনও তদ্বির করা, লোকে দরকারই মনে করে না। এই জন্যে, এ রোগ একটু শক্ত হইয়া না দাঁড়াইলে আর ডাক্তর বৈদ্যের খোঁজ হয় না। এখানেও ঠিক তাই ঘটিছিল। বাড়ীর লোক যখন দেখিলেন যে, রোগিণীর আহার বন্ধ হইল—কথা বন্ধ হইল, তখন তাঁরা আমাকে ডাকিয়া লইয়া গেলেন। আমার আগে তাঁরা আর কোনও ডাক্তর ডাকিয়াছিলেন কিনা, জানি না। আমি গিয়া দেখিলাম, রোগিণীর গাল গলা পর্য্যন্ত ফুলিয়া গিয়াছে। গায়ের বেশ তাত ; তাপমান যন্ত্র দিয়া দেখিলে বোধ হয়, পারা ১০২র দাগ ছাড়াইয়া উঠিত। অনেক কষ্টে দুটি আঙুল তার মুখের মধ্যে দিতে পারিলাম। এ অবস্থায় তার আণ্টাকরায় তুলি করিয়া কাষ্টকির জল লাগান সম্ভবই নয় মনে করিয়া, টিংচর য়্যাকোনাইট ঐ রকম নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে বলিলাম। রোগিণীকে তেমন কাবু আর তার নাড়ী তত দুর্ব্বল দেখিলাম না বলিয়া, এক এক মাত্রায় আধ ফোটা করিয়া টিংচর য়্যাকোনাইট দিলাম। এ ছাড়া, বরফের টুকরো জুত বরাত করিয়া চুষাইতে বলিলাম। (রোগিণীর বাড়ী কলিকাতায় ; কাজেই বরফ ব্যবস্থা করিবার কোন আপত্তিই ছিল না।) জাঁতি দিয়া বরফ খুব ছোট ছোট করিয়া কাটিয়া একটা পাত্রে রাখিবে। তারপর এক এক খানি সেই টুকরো বরফ আঙুল দিয়া জুত বরাত করিয়া জিবের উপর চালাইয়া দিবে। বরফের টুকরো চুষিতে, আর বরফ গলা হিম জলটুকু

গিলিতে প্রথম প্রথম তার যত কষ্ট হবে, পাঁচ সাত বারের পর আর তত কষ্ট হবে না। মাঝে মাঝে একটু একটু গরম গরম দুধ খাওয়াইবে। এই বলিয়া আমি বিদায় হইলাম। তারপর দিন সকালে গিয়া দেখিলাম, রোগিণীর অবস্থা অনেক ভাল; ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথা ঢের কম, গায়ের তাতও কম। যার মুখের মধ্যে দুটী আঙুলও সহজে দিতে পারা যাইতেছে না, সে অল্প হা করিতে পারিল। বাইরের ফুলোও অনেক কম দেখিলাম। কাল সন্ধ্যার আগে অসুদ বিসুদের ব্যবস্থা করিয়া গিইছি, আজ বেলা ৮ টার সময় আসিয়া রোগিণীকে যখন এত ভাল দেখিতেছি, তখন কাল বেলা ৮টা পর্য্যন্ত সেই নিয়মে অসুদ খাওয়াইলে আর সেই রকম করিয়া বরফ চুষাইলে ব্যামো নিশ্চয়ই দশ আনা ছ আনা তফাত পড়িবে। পূর ছ আনা কসুর থাকে কিনা, তাও সন্দেহ। এই বলিয়া অসুদ বিসুদের ব্যবস্থা ঠিক সেই রকম রাখিয়া আমি চলিয়া গেলাম। তারপর দিন সকালে একবারে কাষ্টকির জল তয়ের করিয়া লইয়া গেলাম। যা ভাবিয়া গেলাম, গিয়াও তাই দেখিলাম। রোগিণী হা করিতে পারিল। তাকে হা করাইয়া, চামচের গোড়া দিয়া জিব চাপিয়া ধরিয়া তার আলটাকরার গুল্লিতে আর তার চারি পাশে কাষ্টকির জল বেশ করিয়া লাগাইয়া দিলাম। বাইরের ফুলো বড় একটা মালুম করিতে পারিলাম না। গায়ের তাত আর নাড়ী প্রায় সহজই দেখিলাম। উপরো উপরি তিন চারি দিন সকালে আর বিকালে রোগিণীর আলটাকরায় কাষ্টকির জল (কষ্টিক লোশন) ঐ রকম করিয়া লাগাইয়া দিতে হইবে। টিংচর য়্যাকোনাইট

ঘণ্টায় ঘণ্টায় না দিয়া তিন ঘণ্টা অন্তর দিবে। বরফের টুকরো তেমনি করিয়া চুষিয়া খাইতে বলিবে। রোজ সকালে পাঁচ গ্রেন্ কুইনাইন্ খাওয়াইয়া দিবে। উপরো উপরি আট দিন কুইনাইন দিবে। ব্যামোটী নির্দ্দোষ সারিয়া না গেলে অন্ন পথ্য দিবে না। হিম বাত ভোগ একবারে নিষেধ করিয়া দিবে। এক মাসের এ দিকে স্নান্ করিতে দিবে না। রোগিণীর আত্মীয় স্বজনকে এই সব কথা বলিয়া আমি বিদায় হইলাম।

৯০৯র পাতে বলিছি, আলটাকরার ও গুল্লির (টনসিলের) প্রদাহ বারে বারে হইলে গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া যায়। এ রকম ডাগর আর শক্ত হইয়া গেলে, গুল্লির এ ভাব আর সারে না, সারিতে চায়ও না। গণ্ডমালা ধাতেই গুল্লির এ অবস্থা বেশী ঘটে। গর্ম্মির ব্যামো হইলেও গুল্লির এ রকম অবস্থা হয়। বছর দশেক হইল, একজন ভদ্র লোক একটী ছেলে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে আসিয়াছিলেন। ছেলেটীর বয়স ১২।১৩ বছরের বেশী নয়। তার শরীরে বিশেষ কোন রোগ আছে, বাইরে থেকে তার কোনও পরিচয় পাওয়া গেল না। তবে তার শরীর দেখিয়া তার গণ্ডমালা ধাতের (ধাতুর) পরিচয় পাইলাম। তার অসুখ কি, জিজ্ঞাসা করিলে তার বাপ উত্তর করিলেন, অসুখ ছোট খাটো নয়। চুমুক দিয়া কিছু খাইবার জো নাই; খাইলে নাক দিয়া বাহির হইয়া আসে। যে জিনিসই হোক, গিলিতে খুব কষ্ট হয়। যখন ঘুমোয়, তখন নিশ্বাস ভারি জোরে পড়ে, আর নিশ্বাসের কেমন এক রকম বিশ্রী শব্দ হয়। এ ছাড়া, ঘুমুতে ঘুমুতে মাঝে মাঝে যেন একবারে হাঁপাইয়া উঠে। কথা কহিলে বোধ হয়, ওর

গলার ভিতর যেন কিছু আটকাইয়া রহিয়াছে। গলার স্বরও খারাপ হইয়া গিয়াছে। শুনিতেও খুব কম পায়। অনেক ডাক্তর দেখাইয়াছি, অসুদ. বিসুদ অনেক করিছি। কিন্তু রোগের কিছুই হয় নাই; রোগ যেমন তেমনিই আছে। ডাক্তর মহাশয়রা দেখিয়া বলিয়াছেন, এর গলার ভিতরকার মাংস বাড়িয়াছে। সে মাংস কাটিয়া দিতে হবে; সে মাংস কাটিয়া না ফেলিলে আর উপায় নাই। বাপের মুখে ছেলের রোগের এই রকম পরিচয় পাইয়া রোগীর আলটাকরা পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম। দেখিলাম আলটাকরার গুল্লি দুটী এত ডাগর হইয়াছে যে, তাতেই গলার ছাঁদা প্রায় বুজিয়া গিয়াছে। গুল্লি দুটী একবারে গায়ে গায়ে লাগিয়াছে। আপনি অনেক ডাক্তর দেখাইয়াছেন ; অসুদ বিসুদও অনেক করিয়াছেন। আমি আজ একখানি ব্যবস্থা লিখিয়া দিই। এই ব্যবস্থা মতে কাজ করিয়া পোনর দিনের মধ্যে যদি কোনও উপকার না দেখেন, তবে কাটা কোটাই স্থির করিবেন। ছেলের বাপকে এই কথা বলিয়া আমি অসুদের ব্যবস্থা লিখিয়া দিলাম।

অসুদের ব্যবস্থা। আলটাক্রার গুল্লিতে লাগাইবার অসুদ

আয়োডাইড্ অব য়্যামোনিয়ম্	...	৩০ গ্রেন্
গ্লিসেরীন	... ...	১ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

বড় একটা তুলি করিয়া রোজ রাত্রে এই অসুদ আল-টাকরার গুল্লি দুটীতে লাগাইয়া দিবে।

খাবার অসুদ।

আয়োডাইড্ অব্ পোটাসিয়ম্		...	২০ গ্রেন্
লাইকর পোটাসি	...	...	১ ড্রাম
কড্লিবর অইল	...	...	৩ ড্রাম
টিংচর সিংকোনি কো	...	...	৩ ড্রাম
টিংচর কার্ডেমম কো	...	...	৩ ড্রাম
ক্লরেট অব্ পটাশ	...	...	১ ড্রাম
ডিকক্শন্ সিংকোনা	...	...	৬ ঔন্স পুরাইয়া

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। রোজ ৩ বেলা ৩ দাগ খাবে। শিশি থেকে অসুদ ঢালিবার আগে, শিশি খুব করিয়া নাড়িয়া লইবে।

এ অসুদটী তয়ের করা একটু শক্ত। কেন না, লাইকর পোটাসির সঙ্গে আগে খুব ভাল করিয়া মিশাইয়া লইতে না পারিলে, কড্লিবর অইল উপরে ভাসিতে থাকিবে।

দিন পোনর এই নিয়মে অসুদ বিসুদ ব্যবহার করিলে ছেলেটীর ব্যামো অনেক নরম পড়িল। গিলিবার কষ্ট অনেক গেল, ঘুমুতে ঘুমুতে হাঁপাইয়া উঠাও ঢের কমিল, আগের চেয়ে বেশী শুনিতে পাইতে লাগিল, গলার স্বরও তত খারাপ রহিল না। দু হপ্তার মধ্যে এত উপকার হইল দেখিয়া, এই সুসংবাদ লইয়া বাপ ছেলেকে সঙ্গে করিয়া আমার কাছে আবার উপস্থিত হইলেন। আমি পরীক্ষা করিয়া দেখিলাম, অসুদে যথার্থই ভারি উপকার হইয়াছে। ব্যামোটী নির্দ্দোষ সারিতে বোধ হয় মাস দুই লাগিবে। আপনি এই নিয়মে ছেলেটীকে আর মাস দুই রাখুন, তা হইলে ছেলের ব্যামোর জন্যে, আপ-

নাকে আর কোন চিন্তাই করিতে হইবে না। ফল কথা, দু মাসের মধ্যেই ছেলেটী বেশ ভাল হইয়া গেল।

আল্টাক্‌রার গুল্লিতে ঘা—সহজ শরীরে আলটাকরার গুল্লিতে ঘা হয় না। যারা খুব রোগা আর দুর্ব্বল—যাদের শরীর খুব খারাপ হইয়া গিয়াছে, তাদের আলটাকরার গুল্লিতে ঘা হইতে পারে। কিন্তু যাদের গর্ম্মির ধাত (ধাতু), তাদেরই এ ঘা বেশী হয়। গর্ম্মির ভাল কথা উপদংশ—এ কথা এর আগেই বলিছি। এ ঘা দেখিলেই চেনা যায়। ঘায়ের উপরটা উব্‌ড়ো খাবড়ো আর যেন কেমন ছাই-পড়া ছাই-পড়া। এ ঘা শীঘ্র সারিতে চায় না। ঘা খুব আস্তে আস্তে বাড়িতে থাকে। ঘা ভাল করিবার কোনও চেষ্টা না করিলে, ঘা বাড়িয়া নাকের ভিতর পর্য্যন্ত আসে, গলার ভিতরেও ঘা হয়, স্বর-যন্ত্রেও ঘা হয়। স্বর-যন্ত্রকে ডাক্তরেরা লেরিংস বলেন। এ ঘায়ের চিকিৎসা শক্ত নয়। ৯৫২র পাতের কড্‌লিবর অইল মিক্‌শ্চর নিয়ম করিয়া খাওয়াইয়া রোগীর ধাত (ধাতু) শুধ্‌রে দিবে। আর ৯৩২—৯৩৩র পাতের কাস্টিকির জল রোজ সকালে বিকালে আল্‌টাকরার গুল্লিতে লাগাইয়া ঘা শুকাইয়া দিবে। এ ছাড়া, গায়ে বল হয় রোগীকে এমন আহার দিবে। ৯৫২র পাতে কড্‌লিবর অইল মিক্‌শ্চর অর্দ্ধেক মাত্রায় লেখা আছে। রোগীর বয়স বুঝিয়া অষুদের মাত্রা তা থেকেই ঠিক করিয়া লইবে।

গর্ম্মির ধাত (ধাতু) নৈলে আল্‌টাকরার গুল্লিতে ঘা হয় না—এ এক রকম মোটামুটি জানিয়া রাখ। যার গর্ম্মির ব্যামো হয়, কেবল তারই যে গর্ম্মির ধাত (ধাতু) হয়, তা

নয়। তার ছেলে মেয়েরাও তার সেই গর্ম্মির ধাত (ধাতু) পায়। এই জন্যে, ছেলেদের আলটাকরার গুল্লিতে ঘা হইলে, মা বাপের কাছে তারা গর্ম্মির ধাত (ধাতু) পাইয়াছে, ঠিক্ করিবে। তবেই জানিয়া রাখ, রোগীর নিজের গর্ম্মির ব্যামো না হইলেও তার গর্ম্মির ধাত (ধাতু) হইতে পারে। গর্ম্মির ধাত (ধাতু) চৌদ্দ পুরুষেও ঘোচে কি না সন্দেহ।

ঢোক গিলিতে গলায় ব্যথার আর একটা কথা বলিতে বাকী আছে। আলটাকরার গুল্লি পাকিলে অস্ত্র করা হবে না। অনেকে অস্ত্র করিতে পরামর্শ দেন বটে, কিন্তু অস্ত্র করায় ঢের বিপদ। অস্ত্র করিবার সময় খুব সাবধান না হইলে শির কাটিয়া যায়। যে শিরটী কাটিয়া যায় বলিতেছি, সে শিরটী রাঙা রক্তের শির। রাঙা রক্তের শিরকে ডাক্তরেরা আর্টরি বলেন—ভাল বাঙ্গালায় ধমনী বলে—একথা এর আগে অনেক বার বলিছি। সে শিরটী আলটাকরার গুল্লির ঠিক কাছেই আছে। সে শির কাটিয়া গেলে, রক্ত ছুটে রোগী তখনই মারা যায়। অনেক ভাল ভাল ডাক্তরের হাতে এ দুর্ঘটনা ঘটিয়াছে। তাঁতেই বলিতেছি, আলটাকরার গুল্লি পাকিলে অস্ত্র করিবারই দরকার নাই। আপনিই ফাটিয়া যাইতে দেওয়া ভাল।

১৪। ঠোঁটে আর জিবে ঘা—

বাতশ্লেষ্ম-বিকারে ছেলেদেরই এ রকম ঘা বেশী দেখা যায়। স্বল্পবিরাম-জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবার) শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে,

আমরা তাকে বাতশ্লেষ্ম-বিকার বলিয়া থাকি। এ কথা এর আগে অনেকবার বলিছি। পেটের দোষ এ রকম ঘায়ের আসল কারণ। পেটের দোষ কাকে বলে? পেটের দোষ বলিলে কি বুঝায়? ৮১৭র পাতে তা বেশ করিয়া বলিছি। বাতশ্লেষ্ম বিকারে জোআন রোগীদের ঠোঁটে আর জিবে এ রকম ঘা হয় না, তা নয়। পেটের দোষ বেশী রকম হইলে, তাদেরও এ রকম ঘা হয়। তবে ছেলেদের এ রকম ঘায়ের যত বাড়াবাড়ি হইয়া থাকে, জোআন রোগীদের তত হয় না। ঠোঁটে আর জিবে এ রকম ঘা হইলে, রোগীকে আহার অষুদ দেওয়া মস্কিল হইয়া পড়ে। তা ছাড়া, রোগীর কষ্টের ত কথাই নাই। এই জন্যে, যত শীঘ্র পার, এ উপসর্গ সারিয়া দিবে। এ উপসর্গের চিকিৎসা শক্ত নয়। রোগীর পেটের দোষটী ভাল করিয়া দেও আর ঘায়ের উপর সোহাগার খৈ আর মধু (একত্র মিশাইয়া) নিয়ত লাগাও। শুধু এতেই ঘা সারিয়া যাবে। কি উপায় করিলে পেটের দোষ সারে, পেট-ফাঁপার কথা বলিবার সময় তা বলিছি। ক্লরেট অব্ পটাশ এ ঘায়ের আর একটী খুব ভাল অষুদ। ক্লরেট অব পটাশ মাঝে মাঝে খাইতে দিলে ঘা আরও শীঘ্র সারিয়া যায়।

এক বছরের ছেলেকে এক গ্রেন্ করিয়া ক্লরেট অব পটাশ দু তিন ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইতে পার। রোগীর বয়স বুঝিয়া এই রকম হিসাব করিয়া ক্লরেট অব পটাশের মাত্রা ঠিক করিবে। ছেলেদের অষুদ একটু মিষ্টি করিয়া দিলে ভাল হয়। এই জন্যে, এক ঝিনুক জলে এক গ্রেন্ ক্লরেট অব পটাশ দিয়া, তাতে একটু সিরপ কি মধু দিয়া মিষ্টি করিয়া

দিবে। বারে বারে এই রকম করিয়া তয়ের না করিয়া, সুবিধার জন্যে, একবারে ১২ বারের অসুদ তয়ের করিয়া লইবে। ১২ বারের অসুদ নীচে লিখিয়া দিলামঃ—

ক্লরেট অব পটাস	...	...	১২ গ্রেন্
সিরপ্ জিঞ্জর	...	...	২ ড্রাম
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	...	...	২ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ১২টা দাগ কাটিয়া দেও। এক এক দাগ ২। ৩ ঘণ্টা অন্তর খাওয়াইবে।

ক্লরেট অব পটাশ খাওয়াইলে ত উপকার হয়ই—তা ছাড়া ঘায়ে লাগাইলেও উপকার হয়। বিশ ঔন্স (এক পাইণ্ট—আড়াই পোয়া) জলে ২ ড্রাম ক্লরেট অব পটাশ গুলিয়া, সেই জল ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগাইলে ঘা খুব শীঘ্র শুকাইয়া যায়। ৫২র পাতে পিপাসার যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, তা থেকে সিট্রিক য়্যাসিড্ বাদ দিয়া ঘায়ে সেই জল লাগাইয়া দিলেও হয়। ক্লরেট অব পটাশের জল খুব ফর্শা সরু ন্যাকড়ায় করিয়া ঘায়ে বারে বারে লাগাইবে। তবেই ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে লাগাইবার তোমার দুটী অসুদ জানা থাকিল। একটী অসুদ ক্লরেট অব্ পটাশ। সোহাগাকে ডাক্তারেরা বাইবোরেট অব সোডা বলেন; সোজা ইংরাজিতে বোরাক্স বলে। সোহাগার চেয়ে সোহাগার খৈ মধুর সঙ্গে মিশাইয়া লওয়া ঢের সোজা। সোহাগা তত সহজে গুঁড়ো করিতে পারা যায় না। সোহাগা আগুনে দিলেই

৬৫৪ ঠোঁটে আর জিবে ঘা—মেল বোরেসিস্ (সোহাগা আর মধু)।

তার খৈ তয়ের হয়। সোহাগা গুঁড়ো করিয়া মধুর সঙ্গে মিশাইয়া ডাক্তরেরা যে অসুদ তয়ের করিয়া থাকেন, সে অসুদকে তাঁরা মেল বোরেসিস্ বলেন। মেল বোরেসিস্ লিখিয়া ডিস্পেনস্‌রিতে প্রেস্কৃপশন (ব্যবস্থা পত্র) পাঠাইয়া দিলে, কম্পাউণ্ডরেরা তখনই তা তয়ের করিয়া দেয়। মেল বোরেসিস্ যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলামঃ—

সোহাগার খুব মিহি গুঁড়ো	...	৬৪ গ্রেন্ (১ ড্রাম্ ৪ গ্রেন্)
ছাঁকিয়া লওয়া পরিষ্কার মধু	...	১ ঔন্স

একত্র বেশ করিয়া মিশাইয়া একটি শিশিতে রাখ।

শিশির মুখ কাক দিয়া আঁটিয়া রাখ। আঙুলে করিয়াই হোক, আর তুলি করিয়াই হোক, ঠোঁটের আর জিবের ঘায়ে বারে বারে লাগাইয়া দিবে।

এখানে একটা কথা বলিবার সুবিধা পাইলাম বলিয়াই বলিলাম। ৫২র পাতে পিপাসার যে অসুদ লিখিয়া দিইছি, সে যে কেবল পিপাসারই অসুদ, তা নয়। তাতে মুখ শোষ আর পিপাসা ত শান্তি হয়ই—ছাতা-পড়া, নোংরা, অপরিষ্কার, কটা শুক্‌নো জিবও পরিষ্কার আর সরস হয়। ক্লরেট অব পটাশে যে কেবল এই উপকারই হয়, তা নয়। তা ছাড়া, আরও ঢের উপকার হয়। ক্লরেট অব্ পটাশে জ্বরের বাগ ফিরাইয়া দেয়—বাঁকা, শক্ত জ্বর সোজা করিয়া দেয় ; রোগ সারিবার পথে লইয়া আসে। এক অসুদে আর কত উপকার

করিবে? একটা অসুদের কাছে আর কত উপকার চাও? তার পর ধর। ক্লরেট অব্ পটাশ খাওয়াইলে ঠোঁটের আর জিবের ও রকম ঘা সারিয়া যায়। ক্লরেট অব্ পটাশের জল ন্যাক্ড়ায় করিয়া বা তুলি করিয়া বারে বারে লাগাইলেও ঘা সারিয়া যায়। তবেই জানিয়া রাখ, ক্লরেট অব্ পটাশ শুদু পিপাসার অসুদ নয়—জ্বরেরও (তা যে রকম জ্বরই হোক) একটি খুব ভাল অসুদ। এ কথাটা কখনও ভুলিও না—জ্বরের রোগীকে ক্লরেট অব্ পটাশের জল—৫২র পাতে পিপাসার জল—নিয়ম করিয়া খাওয়াইতে কখনও ভুলিও না।

ঠোঁটের আর জিবের এ ঘাকে ডাক্তরেরা য়্যাফ্থি বলেন; সচরাচর লোকে শ্লেষ্মার ঘা বলে। শ্লেষ্মার ঘা কথাটীর বেশ মানে আছে। পেটের (পাকস্থলীর) আর অন্ত্রের শ্লেষ্মা-ঝিল্লির উদ্দীপনা থেকেই এ ঘা হয়। এই জন্যে, এ ঘাকে শ্লেষ্মার ঘা বলা বেশ যুক্তি। এ ছাড়া, এ ঘা হইলে মুখ দিয়া বেশী লালও পড়ে। লাল আর শ্লেষ্মা একই কথা। এই জন্যে, এ ঘাকে শ্লেষ্মার ঘা বলা আরও মানায়। লালের ভাল কথা লালা। সোজাসুজি লাল বলাই ভাল। বৈদ্যরা বলেন, শ্লেষ্মার কোপ না হইলে বিকার হয় না। গৃহস্থেরাও এ কথাটী বেশ করিয়া জানিয়া রাখিয়াছেন—বেশ করিয়া শিখিয়া রাখিয়াছেন। রোগীর অবস্থা যত খারাপ হয়, তাঁরা বলেন, শ্লেষ্মার কোপ তত বেশী হইয়াছে। আবার এ দিকে রোগীর অবস্থা এই রকম খারাপ হইলেই ও রকম ঘা ফোটে। ঘা ফুটিলেই তাঁরা বলেন, শ্লেষ্মার ঘা ফুটিয়াছে। এই জন্যে ডাক্তারি, কবিরাজি দু মতেই এ ঘাকে শ্লেষ্মার ঘা বলিতে

পারা যায়। এ ঘা যে কেবল ঠোঁটে আর জিবেই হয়, তা নয়; মুখের ভিতর সব জায়গাতেই হয়। জিবে, ঠোঁটে, আর কলশায়—এই তিনি জায়গায় এ ঘা বেশী হয়। এ ঘা যখন প্রথম হয়, তখন ঠিক ছোট ছোট ফোস্কার মত দেখায়; কিন্তু ফোস্কা ফাঁপা, এ ঘা ফাঁপা নয়—নিরেট। আমের আটা লাগিয়া ছেলেদের ঠোঁটে, গালে যে রকম ঘা হইয়া থাকে, এ ঘায়েরও আকার প্রকার প্রায় সেই রকম। আমের আটার ঘায়ের মত এ ঘাও দু পাঁচ খান একত্র মিলে যায়। জ্বলন্ত বাতি কাইত করিয়া ধরিলে মোম কি চর্ব্বি গলিয়া টোপে টোপে পড়ে। মোমের কি চর্ব্বির ছোট ছোট সেই টোপ গুলি দেখিতে যে রকম, এ ঘাও দেখিতে সেই রকম। বাতি মোমেরও হয়, চর্ব্বিরও হয়; এই জন্যে, মোমেরও কি চর্ব্বির টোপ বলিলাম।

কচি ছেলে পিলের এ রকম ঘাকে ডাক্তরেরা থ্রুশ বলেন; মেয়েরা দয়ে-খয়ে বলে। দয়ে-খয়ে ঠোঁটে হয়, কলশায় হয়, জিবে হয়, গালের ভিতরপিঠে হয়, টাকরায় হয়। দয়ে-খয়ে ঘা আঁতুড়ে ছেলেদেরই বেশী হয়—দাঁত উঠিবার সময়ও ছেলেদের এ ঘা হইয়া থাকে। খাওয়াইবার দোষেই ছেলেদের এ ঘা বেশী হয়। ঝিনুকে করিয়া আঁতুড়ে ছেলেদের দুধ খাওয়াইলে, এ রকম ঘা তাদের হইতেই চায়। এ ছাড়া, পেটের দোষে ত ছেলেদের এ রকম ঘা হইয়াই থাকে। দয়ে-খয়ে ঘায়ে ছেলেদের কষ্ট নিতান্ত কম হয় না। ব্যথার জন্যে, বেশ জুত বরাত করিয়া মাই তেমন টানিয়া খাইতে পারে না। সহজ বেলার মত টানিয়া খাইতে গেলেই তাদের

ব্যথা লাগে। ঘায়ের ব্যথা—ঘায়ের কষ্ট ছাড়া, তাদের আর কোনও অসুখ হয় কি না ? হয়। গা গরম হয়, বারে বারে ওয়াক তোলে, দুধ তোলে, পাতলা বাহ্যে যায়, আর যেন ঝিমুতে থাকে। এ ছাড়া, তাদের মুখে দুর্গন্ধও হয়।

ছেলেদের দয়ে খয়ে ঘা হইলেই ঠিক করিবে, তাদের পেটে অম্বল হইয়াছে। পেটে অম্বল হইলে ছেলেরা দুধও তোলে, পাতলা পাতলা বাহ্যেও যায়। চূণের জল ছেলেদের এ রকম হাগা, দুধতোলার খুব ভাল অসুদ। চূণের জল ছেলেদের কেমন করিয়া খাওয়াইতে হয়, ৭৩৯র পাতে তা বলিছি। বিস্মথও ছেলেদের হাগা, দুধ-তোলার খুব ভাল অসুদ। বিস্মথের কথা ৫৭০—৫৭১র পাতে বলিছি। বিস্মথেও পেটের অম্বল নষ্ট করে।

এ ছাড়া, দয়ে খয়ের সঙ্গে পেটের-ব্যামো থাকিলে ৬৭৪র পাতের (১)র দাগের পুরিয়া অসুদ ছেলেকে নিয়ম করিয়া খাওয়াইলে, পেটের দোষ আরও শীঘ্র শুধরে যায়। সেখানে পুরিয়া অসুদের যে মাত্রা লিখিয়া দিইছি, সে মাত্রা তিন বছরের ছেলের পক্ষে। ছেলের বয়স বুঝিয়া তা থেকেই মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে। ৬৭৫র পাতে বলিছি, খুব কম মাত্রায় হাইড্রার্জ কম ক্রীটা, ইপেকা, আর পেপসিন, ছোট ছেলেদের পেটনাবার আর রক্ত-আমাশার যেমন অসুদ, তেমন অসুদ আর নাই। এ সব কথা যেন সর্ব্বদা মনে থাকে।

দয়ে-খয়ে ঘায়ে লাগাইবার অসুদ আর কি ? সেই সোহাগার খৈ আর মধু। ৯৫৯র পাতের মেল্ বোরেসিস্ তয়ের করিয়া তুলি করিয়া ঘায়ে লাগাইতে পার।

পুরাণ রোগে বুড়োদের এ ঘা হইলে, তাদের জীবনের আশা ভঁরসা ছাড়িয়া দিবে। এ ঘা ফোটার পর তারা আর বেশী দিন বাঁচে না। মোটামুটি জানিয়া রাখ, এ ঘা বুড়োদের পুরাণ রোগের একবারে শেষ লক্ষণ। এ লক্ষণ দেখা দিলে রোগীর আর বড় বেশী অপেক্ষা নাই, ঠিক করিবে। রোগী অনেক দিন ধরিয়া যে রোগে ভোগে, সেই রোগকেই পুরাণ রোগ বলিতেছি।

এর আগেই বলিছি, বাঁতশ্লেস্ম-বিকারে জোআন রোগীদের এ ঘা হইতে পারে—হইয়াও থাকে। স্বল্পবিরাম জ্বর (রিমিটেণ্ট ফীবর) শক্ত হইয়া দাঁড়াইলে, তাকে আমরা বাতশ্লেস্ম-বিকার বলিয়া থাকি। আমাদের ডাক্তরেরা তাকে টাইফয়িড ফীবর বলেন। একথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

তার পর এখন উর্ব্বাণের কথা বলি।

১৫। **উর্ব্বাণ**——জ্বর-বিকারে রোগী ক্ষেপিলে—তেড়ে ফুঁড়ে উঠিলে বেশী রকম জোর জবর করিলে—চীৎকাব করিলে—চেঁচাইলে—বৈদ্যরা বলেন তার উর্ব্বাণ হইয়াছে। উর্ব্বাণকে ডাক্তরেরা ফিয়ুরিয়স ডিলীরিয়ম বলেন, বায়োলেণ্ট ডিলীরিয়মও বলেন। প্রলাপকে ইংরিজিতে ডিলীরিয়ম বলে। "ফিয়ুরিয়স" আর "বায়োলেণ্ট"—এই দুইটী ইংরিজি কথা। এই দুটী কথারই মানে প্রচণ্ড। "প্রচণ্ড" কথার মানে ভয়ানক। এই জন্যে উর্ব্বাণের বদলে প্রচণ্ড প্রলাপও বলিতে পার, উগ্র প্রলাপও বলিতে পার, ভয়ানক প্রলাপও বলিতে পার। ভুল বকার ভাল কথা প্রলাপ। প্রলাপ বলিলে যে শুদু ভুল বকাই বুঝায়, তা নয়; জ্বর-বিকারে রোগীর ভুল কাজও

বুঝায়। কেন না, রোগী বিছানা বালিশ হাতড়ায়; হাত বাড়াইয়া কি যেন ধরিতে যায়; বিছানা টানে; বালিশ টানে আপনার গায়ের কি পরণের কাপড় ধরিয়া টানে; কাছে যে বসিয়া থাকে, তার হাত ধরিয়া টানে, তার কাপড় ধরিয়া টানে; আরও কত রকম কি করে। এ সব ত ভুল-বকা নয়; এ সব ভুল-কাজ। বিকারের ঝোঁকে যেমন ভুল বকে, বিকারের ঝোঁকে তেমনি ভুল-কাজও করে। তাতেই বলিতেছি, এ সব ভুল কাজও প্রলাপের অঙ্গ। তার পর বলি। জ্বর-বিকারে রোগীর দু রকম প্রলাপ দেখা যায়। মৃদু প্রলাপ আর উগ্র প্রলাপ। জ্বরে একবারে অবসন্ন হইয়া নেতিয়ে প'ড়ে রোগী যে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে, তাকেই মৃদু প্রলাপ বলে ২১৬র পাতে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকার কথা বলিছি। কি রকম রোগী মালা-জপার মত বিড়্ বিড়্ করিয়া বকে, ২১১—২১৬র পাতে আর একবার ভাল করিয়া পড়িলে, বেশ বুঝিতে পারিবে। জ্বরের প্রথম অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয় না। জ্বর খুব বাড়িয়া না গেলে—রোগীর বল একবারে খাটো হইয়া না গেলে মৃদু প্রলাপ হয় না। মৃদু প্রলাপ সন্নিপাত বিকারেরই অঙ্গ। যে অবস্থা দেখিয়া আমাদের ডাক্তরেরা বলেন, রোগীর টাইফয়িড ফীবর হইয়াছে, বৈদ্যরা বলেন, আমরাও বলি, রোগীর বাতশ্লেষ্ম-বিকার হইয়াছে—রোগীর ঘোর সন্নিপাত উপস্থিত, সেই অবস্থাতেই রেগীর মৃদু প্রলাপ হইয়া থাকে। মৃদু প্রলাপের রোগীর গায়ে হাত দিয়া চেঁচিয়ে ডাকিলে তার চৈতন্য হয়, খানিক ক্ষণের জন্যে বিড়্ বিড়্ করিয়া বকা থামিয়া যায়, জিজ্ঞাসা করিলে দু একটা উত্তরও পাওয়া যায়, বলিলে

জিব বাহির করিয়াও দেখায়। কিন্তু এ অবস্থা বিস্তর ক্ষণ থাকে না, তার পরই আবার সেই রকম বিড়্ বিড়্ করিয়া বকিতে থাকে। অনেক জায়গায় রোগীর কাছের লোক বেশ বুঝিতে পারে, রোগী ঠিক যেন স্বপন দেখিতেছে—স্বপনে কথা বার্ত্তা কহিতেছে; এ সব জায়গায় রোগী প্রলাপে সত্য সত্যই জানা শুনা লোকের সঙ্গে যেন কথা বার্ত্তা কহিতে থাকে। কোন কোন জায়গায় দেখা যায়, ব্যামোর আগে রোগী যে কাজ করিতেছিল—যে কাজে ব্যস্ত ছিল, প্রলাপে সেই কাজেরই কথা বার্ত্তা কয়। তার পর বলি। মোটামুটি জানিয়া রাখ, জ্বরের প্রথম অবস্থায়—রোগী সবল থাকিতে মৃদু প্রলাপ হয় না, মৃদু প্রলাপ সন্নিপাত বিকারের অঙ্গ। সন্নিপাত-বিকারে রেগীর যে অবস্থা হয়, সে অবস্থার যেমন অসুদ মৃগনাভি (কস্তুরী) আর কর্পূর, তেমন অসুদ আর নাই। ২৪২র পাতে এ কথা বলিয়াছি। মৃগনাভি আর কর্পূর খাইয়া রোগীর সে অবস্থা শুধ্‌রে গেলে, মৃদু প্রলাপ ভাল হইয়া যায়। তার পর বলি।

রোগীর যে অবস্থায় মৃদু প্রলাপ হয়, উগ্র প্রলাপ—উর্ব্বাণ তার ঠিক্ বিপরীত অবস্থায় হয়। মৃদু প্রলাপে রেগীর বলের অভাবেরই পরিচয় পাওয়া যায়। উগ্র প্রলাপে—উর্ব্বাণে রোগীর বলের বাড়াবাড়িরই পরিচয় পাওয়া যায়। বায়ু রোগে—উন্মাদ রোগে ভারি রকম ক্ষেপিয়া রোগী যে রকম দৌরাত্ম্য করে—যে রকম উপদ্রব করে—যে রকম উৎপাত করে—বলের বাড়াবাড়ির যে রকম পরিচয় দেয়, উর্ব্বাণেও রোগীর ঠিক্ সেই রকম ভাব গতিক দেখা

যায়। এমন কি, কোন কোন জায়গায় এ রকমও ঘটিয়াছে যে, জ্বর বিকারে রোগের উর্ব্বাণ হইয়াছে. চিকিৎসক তা বুঝিতে না পারিয়া, উন্মত্ত, ক্ষেপা পাগল বলিয়া তার চিকিৎসা করিয়াছেন! উর্ব্বাণ কখন কখন জ্বরের প্রথম অবস্থাতেই ঘটে।

তার পর এখন উর্ব্বাণের চিকিৎসার কথা বলি।

চিকিৎসা——উচু থেকে. মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালা; দু পায়ের তলায়, দু পায়ের ডিমে আর দু উরতে রাইয়ের খুব ঝাঁজাল পলস্তরা বসান; আর হাইড্রেট অব্ ক্লোরাল খাওয়ান —উর্ব্বাণের এই তিন রকম চিকিৎসা। উর্ব্বাণের রোগীকে আয়ত্ত করিবার জন্যে দু তিন জন খুব সবল লোকের দরকার। রোগীর আপনার এমন কেউ না থাকিলেও, এ বিপদে পাড়া প্রতিবাসীরা আপনারাই আসিয়া উপস্থিত হয়। রোগীকে বেশ আয়ত্ত করিয়া বিছানায় জুত বরাত করিয়া শোওয়াইবে। তার পর, বিছানা বালিশ ভিজিয়া না যাইতে পারে, এমন করিয়া ঠাণ্ডা জল তার মাথায় নিয়ত ঢালিতে থাকিবে। ঘটি করিয়াই হোক, আর গাড়ু করিয়াই হোক্, হাত খানেক কি হাত দেড়েক উচু থেকে জল ঢালিবে। জল যত ঠাণ্ডা হবে; ততই ভাল। জল একবারে হুড় হুড় করিয়া ঢালিয়া দেওয়া হবে না। গাড়ুর নল দিয়া জল যেমন ধারে পড়ে, জুত বরাত করিয়া ঢালিলে, ঘটি করিয়াও সেই রকম ধারে জল ঢালিতে পারা যায়। এক ঘটি কি এক গাড়ু জল ঢালিয়া ক্ষান্ত হইলে চলিবে না। রোগীর উগ্র ভাব থাকিতে জল ঢালা কমাইয়া দেওয়া হবে না। তোমার ঘটির কি গাড়ুর জল ফুরাব ফুরাব হইলে, অমনি আর এক

জন জল যোগাইয়া দিবে। মাথায় জল ঢালিয়া দিলে, সে জল বিছানার দিকে গড়াইয়া আসিতে না পারে এমন জায়গা দেখিয়া আর এমন জুত বরাস্ত করিয়া রোগীর বিছানা করিয়া দিবে। বালিশ ভিজিয়া না যাইতে পারে, এই জন্যে, কলা-পাত দিয়া বালিশ ঢাকিয়া দিবে। সহরে বড়-মানুষেরা অইল ক্লথ দিয়া কি রবরের চাদর দিয়া রোগীর বিছানা বালিশ ঢাকিয়া দিতে পারেন। রোগীর মাথার তেলোয়—মাথার চাঁদিতে ঐ রকম করিয়া ঠাণ্ডা জল ঢালা চাই।

ও দিকে, রোগীর মাথায় ঠাণ্ডা জল ঐ রকম করিয়া নিয়ত একজন ঢালিতে থাক। এ দিকে রোগীর দু পায়ের তলায়, দু পায়ের ডিমে, আর দু উরুতে রাইয়ের পলস্তরা বসাইয়া দাও। এখানে রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল করিয়া দেওয়া চাই। রাইয়ের পলস্তরা দু রকম করিয়া তেজাল করিতে পার। খানিকটে বাটা লঙ্কামরিচের (গাছ-মরিচের) সঙ্গে মিশাইয়া রাইয়ের পলস্তরা তয়ের করিতে পার। খানিকটে তার্পিণেরও সঙ্গে মিশাইয়া রাইয়ের পলস্তরা তয়ের করিতে পার। লঙ্কামরিচের (গাছ-মরিচের) সঙ্গে কি তার্পিণের সঙ্গে মিশাইয়া, রাইয়ের পলস্তরা খুব তেজাল করিয়া লইয়া রোগীর দু পায়ের তলায়, দু পায়ের ডিমে, আর দু উরতে বসাইয়া দিলে তার মাথার মগজের রক্ত খুব শীঘ্র নামিয়া আসে। মগজে রক্ত উঠিয়া—মগজে রক্ত জমা হইয়াই ত রোগীর অমন দুর্দ্দশা ঘটায়। রাইয়ের পলস্তরা পায়ের ডিমের ভিতর দিকে, আর উরতের ভিতর দিকে বসাইতে হবে। শরীরের কোনও অঙ্গের ভিতর দিক আর বাহির দিক

বলিলে কি বুঝায়? অঙ্গের যে দিক শরীরের দিকে থাকে, সেই দিককেই সে অঙ্গের ভিতর দিক বলে, আর তার বিপরীত দিককে বাহির দিক বলে। দৃষ্টান্ত দিয়া বুঝাইয়া দিলেই বেশ বুঝিতে পারিবে। হাতের বাউর যে দিক পাঁজরের দিকে থাকে, সেই দিককেই বাউর ভিতর দিক বলে। যে দিককে ভিতর দিক বলে, তার ঠিক বিপরীত দিককে যে বাহির দিক বলে, তা কি আর বলিতে হবে? যে দিকে ইংরিজি টিকে পরে, বাউর সে দিককে বাহির দিক বলে। উরতের ভিতর দিক বলিলে কি বুঝায়? বাঁ উরতের যে দিক ডাইন উরতের দিকে থাকে, সেই দিককে বাঁ উরতের ভিতর দিক বলে। ডাইন উরতের যে দিক বাঁ উরতের দিকে থাকে, সেই দিককে ডাইন উরতের ভিতর দিক বলে। পায়ের ডিমেরও বেলায় ঠিক এই রকম ধরিয়া লইবে। যেখানে দেখবে দুটী অঙ্গ কাছাকাছি আছে, সেইখানেই ঠিক এই রকম ধরিয়া লইবে। তারপর বলি। রাইয়ের পলস্তরা কতক্ষণ রাখিতে হবে; পলস্তরা উঠাইয়া তারপরই বা কি করিতে হবে, ৭৭২র পাতে তা বলিছি। এখানে রোগীর যে অবস্থা, যে উগ্র ভাব, যে দৌরাত্ম্য, তাতে ব্যাণ্ডেজ দিয়া বেশ করিয়া জড়াইয়া বাঁধিয়া না দিলে পলস্তরা গুলি ঠিক জায়গায় থাকিবে না। কাপড়ের কম চৌড়া লম্বা ফালিকে ডাক্তরেরা ব্যাণ্ডেজ বলেন। একথা এর আগে অনেক বার বলিছি।

হাইড্রেট অব ক্লোরাল উর্ব্বাণের খুব ভাল অসুদ। হাইড্রেট অব ক্লোরালের মাত্রা বিশ ২০ গ্রেন। খুব সম্ভব, জুত বরাত করিয়া পূর এক মাত্রা খাওয়াইয়া দিতে পারিলে,

রোগীর উগ্র ভাব ঢের কমিয়া যায়—রোগী ঢের ঠাণ্ডা হয়—রোগী ঘুমাইয়া পড়ে। এক মাত্রায় তেমন কাজ না হয় ত ঘণ্টা খানেক কি ঘণ্টা দেড়ক পরে আর এক মাত্রা দিতে পার। উর্ব্বাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিবার জন্যে উপরো উপরি তিন মাত্রা হাইড্রেট অব ক্লোরাল দিবার দরকার প্রায়ই হয় না। হাইড্রেট অব ক্লোরাল খাইয়া রোগী ঘুমাইলে তাকে সহজেই জাগাইয়া আহার দেওয়া যায়। আহারের পর রোগী আবার ঘুমাইয়া পড়ে। হাইড্রেট অব ক্লোরালের এটী চমৎকার গুণ। হাইড্রেট অব ক্লোরাল খাইয়া ঘুমাইলে, ফুলকোর নলিতে শ্লেষ্মা জমিলে, রোগী কাশিয়া নলি পরিষ্কার করিয়া ফেলিতে পারে। এটীও হাইড্রেট অব ক্লোরালের খুব চমৎকার গুণ। তবেই দেখ, হাইড্রেট অব ক্লোরালের ঘুম আর সহজ বেলার ঘুম, প্রায় সমান। আফিঙের ঘুমে রোগী কাশিয়া ফুলকোর নলি পরিস্কার করিয়া ফেলিতে পারে না; কাজেই, আফিঙের ঘুমে ব্রংকাইটিস রোগের সুবিধার চেয়ে অসুবিধাই বেশী–বিপদই বেশী। আফিঙের ঘুম থেকে রোগীকে তেমন সহজে জাগাইয়া আহার দিতে পারা যায় না; আহারের পর রোগী আবার তেমন ঘুমাইয়াও পড়ে না। তাতেই বলি, এ জায়গায় হাইড্রেট অব ক্লোরালের কাছে আফিঙকে হারি মানিতে হইয়াছে। এ সব কথা মেটিরিয়া মেডিকায় ভাল করিয়া বলিব।

উর্ব্বাণের রোগীকে আয়ত্ত করিয়া বিছানায় জুত বরাত করিয়া শোওয়াইয়া তার মাথায় ঠাণ্ডা জল ও রকম করিয়া ঢালিতে পারা যায়। রাইয়ের ও রকম ঝাঁজাল পলস্তরাও

তার দু পায়ের তলায় দু পায়ের ডিমে, আর দু উরতে বসাইয়া দিতে পারা যায়। কিন্তু উর্ব্বাণের রোগীকে অসুদ খাওয়ানই মস্কিল। এইজন্যে, অনেক জায়গায় মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া আর রাইয়ের ঐ রকম ঝাঁজাল পলস্তরা বসাইয়া উর্ব্বাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিতে হয়। রোগী ঠাণ্ডা হইলে—সহজে অসুদ খাওয়াইয়া দিবার মত রোগীর অবস্থা হইলে, তার ঘুম পাড়াইবার জন্যে হাইড্রেট অব ক্লোরাল খাওয়াইয়া দিবে। যদি বল, রোগী যদি ঠাণ্ডাই হইল, তবে তাকে হাইড্রেট অব ক্লোরাল খাওয়াইয়া দিবার দরকার কি? দরকার এক আধটু নয়—খুবই দরকার। হাইড্রেট অব ক্লোরাল খাইয়া রোগী ঘুমোয়—ঘুম থেকে ঠিক যেন সহজ রোগী হইয়া উঠে। তবেই দেখ, রোগীর একবার ঘুম হওয়া ভারি দরকার। মাথায় ঠাণ্ডা জল ঢালিয়া আর ঐ সব জায়গায় রাইয়ের ঝাঁজাল পলস্তরা বসাইয়া রোগীকে যদিই কখনও তেমন ঠাণ্ডা না করিতে পার,—আর তাকে হাইড্রেট অব ক্লোরাল খাওয়াইয়া দেওয়া মস্কিল দেখ, তবে তার বাউর চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচকিরি করিয়া দিবে। চামড়ার নীচে মর্ফিয়া পিচকিরি করিয়া দিলে রোগী ঠাণ্ডা হইয়া খানিক পরে ঘুমাইয়া পড়ে। উর্ব্বাণের রোগীকে ঠাণ্ডা করিবার আর তার ঘুম পাড়াইবার এত গুলি উপায় তোমার জানা থাকিল। কতটুকু মর্ফিয়া কি রকম করিয়া চামড়ার নীচে পিচকিরি করিতে হয়, ৭৩৪—৭৩৫র পাতে তা বলিছি। অনেক জায়গায় মর্ফিয়া একবার পিচকিরি করিয়া দিলেই কাজ হয়। কোন কোন জায়গায় দু বারও দিতে হয়; তিন বারও দিতে হয়।

৭৭৬ কাচের সিপিওয়ালা শিশিতে হাইড্রেট অব ক্লোরাল রাখিবে।

কতটুকু হাইড্রেট অব ক্লোরাল কি রকম করিয়া তয়ের করিয়া রোগীকে খাওয়াইয়া দিতে হয়, নীচে তা লিখিয়া দিলাম :—

হাইড্রেট অব ক্লোরাল	...	...	১ ড্রাম
সিম্পল্ সিরপ ...	...	...	১ ঔন্স
পরিষ্কার ঠাণ্ডা জল	...	...	২ ঔন্স

একত্র মিশাইয়া একটা শিশিতে রাখ।

শিশির গায়ে কাগজের ৩টে দাগ কাটিয়া দেও।

হাইড্রেট অব ক্লোরাল অস্তুদটী শীঘ্রই খারাপ হইয়া যায়। এইজন্যে, এ অস্তুদটী সাহেবদের ডিস্পেন্সরি থেকে কেনা ভাল। আর কাচের সিপি-ওয়ালা শিশিতে এ অস্তুদটী খুব যত্ন করিয়া রাখা চাই। হাইড্রেট অব ক্লোরালের দাম বেশী নয়। আট গণ্ডা পয়সার হাইড্রেট অব ক্লোরালে উর্দ্ধবাণের দু তিনটে রোগ ভাল করিতে পারা যায়। হাইড্রেট অব ক্লোরাল আরও ঢের রোগের খুব ভাল অস্তুদ। মেটিরিয়া মেডিকায় সে সব ভাল করিয়া বলিব।

উর্দ্ধবাণের রোগী ঠাণ্ডা হইলে, তার মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিবে। কেন না, মগজে রক্ত উঠিয়া—রক্ত জমা হইয়া যার এমন উগ্র ভাব একবার হইয়াছে, তার মাথা ঠাণ্ডা রাখিবার জন্যে বিধিমতে চেষ্টা করা চাই। রোগীর উগ্র ভাব থাকিতে, তার মাথা ন্যাড়া করিয়া দেওয়া সম্ভবই নয়। এই জন্যে, ঐ সব উপায়ে সে ঠাণ্ডা হইলে, তার মাথা ন্যাড়া করিয়া জল-পটি দিতে বলিলাম। রোগীর মাথায় জল-পটি দিবার কথা ২৭—২৮র পাতে বলিছি।

ফোজ্‌দারি হঙ্গাম গেলে—উর্ব্বাণ থামিয়া গেলে আসল রোগের চিকিৎসা আরম্ভ করিবে। উর্ব্বাণ আসল রোগ নয়—আসল রোগের উপসর্গ—এ কথাটা যেন মনে থাকে।

তাঁর পর এখন বাক-রোধের কথা বলি।

বাক্‌-রোধ ——বাক্‌রোধকে ডাক্তরেরা এফেশিয়া বলেন। খুব শক্ত রকম জ্বর জাড়ির ধাক্কা সাম্‌লাইবার সময় রোগীর বাক্‌রোধ হইতে পারে—হইয়াও থাকে। এ বাক্‌-রোধ বেশী দিন থাকে না—আপনিই সারিয়া যায়। এ বাক্‌-রোধ দুই এক হপ্তাও থাকিতে পারে, দু পাঁচ দিনও থাকিতে পারে; এক আধ দিনও থাকিতে পারে; আবার চাই কি, ক ঘণ্টা বা ক মিনিটেরও বেশী না থাকিতে পারে। মগজে রক্ত জমিলে এ বাক্‌-রোধ হইতে পারে; মগজের রক্ত খুব কমিয়া গেলেও এ বাক্‌-রোধ হইতে পারে। এ বাক্‌-রোধ হঠাৎই হয়। এ বাক্‌-রোধে রোগীর মুখ চোক দেখিলে তার জ্ঞানের বৈলক্ষণ্য হইয়াছে, এমন বোধ হয় না। তার মুখ চোকের ভাবে বোধ হয়, সে কথা বার্ত্তা বুঝিতে পারে, কেবল আপনার মনের ভাবই ব্যক্ত করিতে পারে না। আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে না পারিয়া মনের দুঃখে তার চোক দিয়া জল পড়ে; অনেক জায়গায় এটা স্পষ্ট বুঝিতে পারা যায়। রোগী ঠোঁট জিব সহজ বেলার মত নাড়িতে পারে। এ বাক্‌রোধে রোগী লিখিয়া, কি ইঙ্গিত করিয়াও, আপনার মনের ভাব ব্যক্ত করিতে পারে না। এ বাক্‌রোধে রোগী জিনিশ পত্রের ব্যবহার ভুলিয়া যায় না। বালিশ দিলে বালিশ মাথায় দেয়; পাকা দিলে পাকা লইয়া

আপনিই সহজ বেলার মত বাতাস করে ; খাবার কোনও জিনিশ দিলে আপনিই খায়। এ বাক্‌-রোধ পূরও হইতে পারে, আবার পূর না হইতেও পারে। পূর বাক্‌-রোধে রোগী একবারে বোবা হইয়া যায়। বাক্‌-রোধ পূর না হইলে, রোগী দু একটা কথা স্পষ্ট করিয়া কৈতে পারে, কিন্তু সেই দু একটা কথাই তার পুঁজি। তুমি তাঁকে যা জিজ্ঞাসা করিবে, সেই দু একটা কথা দিয়াই সে তার উত্তর দিবে। "কেমন আছ" বলিলেও, সেই দু একটা কথা বলিয়া তার উত্তর দিবে ;— "আজ কি খাবে" বলিলেও, সেই দু একটা কথা তার উত্তর দিবে। সেই দু একটা কথা বৈ তার আর পুঁজি নাই, ত সে আর কি করিবে ?

এ বাক্‌-রোধ আপনিই সারিয়া যায়, কোনও অসুদ বিসুদ করিতে হয় না—করিবার দরকারও নাই ! অসুদ বিসুদ করিলে বরং রোগী আরও খারাপ হয়।

বাক্‌-রোধের সঙ্গে ডাইন আধ-খানা অঙ্গের পক্ষাঘাত প্রায়ই ঘটে। খাটি নির্ভাজ বাক-রোধ যেমন আপনিই সারিয়া যায়, অসুদ বিসুদ কিছুই করিতে হয় না ; পক্ষাঘাতের বাক্‌-রোধে অসুদ বিসুদে তেমনি কিছুই করিতে পারে না, হাজার অসুদ বিসুদ দেও, রোগের কিছুই হয় না। তবে গর্ম্মির ব্যামো থেকে যদি পক্ষাঘাত আর বাক-রোধ হয়, তবে আয়োডাইড অব পোটাসিয়ম খাওয়াইয়া রোগীকে ভাল করিতে পারা যায়।

তার পর এখন কানে পূজ হওয়ার কথা বলি।

১৬। কানে পূয হওয়া——কানে পূয

হওয়াকে ডাক্তরেরা অটরীয়া বলেন। কানে পূয হওয়া আর কান দিয়া পূয পড়া একই কথা। কানে পূয বেশী হইলেই গড়াইয়া পড়ে। এই রকম করিয়া পূয যখন গড়াইয়া পড়ে, তখনই কান দিয়া পূয পড়া বলিতে পার। ফলে, দুই-ই এক কথা। কানে পূয হওয়াকে কান পাকাও বলে। কানের অনেক রকম ব্যামো থেকে কানে পূয হয়—কান পাকে। কানে পূয হইবার মানে—কানে পাকিবার আগে প্রায়ই কান কামড়ায়; কানের ভিতর ব্যথা করে। কানে পূয ছেলেদের বেশী হয়। দাঁত উঠিবার সময়ই ছেলেদের এ অস্বস্তি বেশী হয়। ধরিতে গেলে, কান-পাকা ছেলে বয়সেরই রোগ। তবে জোয়ান বয়সে কান না পাকে, এমন নয়। হাম-জ্বর, পানি-বসন্ত, কি এলো-বসন্ত হইলে ছেলেদের প্রায়ই কান পাকিয়া থাকে। হাম কি বসন্তের গোড়ায় কান পাকে না; শেষে কান পাকে। যে সব ছেলের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু) হাম কি বসন্ত হইয়া তাদেরই কান পাকা বেশী ঘটে। গণ্ডমালা ধাতের (ধাতুর) কথা ৯১৫র পাতে মোটামুটি এক রকম বলিছি, এর পর আরও বিশেষ করিয়া বলিব।

কারণ—দূর কারণ আর নিকট কারণ। রোগের দূর কারণ আর নিকট কারণের কথা ২৯৯—৩০১র পাতে বলিছি। ছেলে বয়সেই কান পাকা বেশী হয়, এই জন্যে, ছেলে বয়স কান পাকার একটী দূর কারণ। যাদের গণ্ডমালার ধাত (ধাতু), তাদেরই কান পাকা বেশী হয়, এই জন্যে, গণ্ডমালার ধাত (ধাতু) কান-পাকার আর একটী দূর কারণ।

তার পর কান-পাকার নিকট কারণ বলি। হিম বাত ভোগ

করা—বৃষ্টিতে ভেজা—ভিজে কাপড় চোপড়ে থাকা—যে কোন রকমে হোক, কানের ভিতর বেশী ঠাণ্ডা লাগান, কান-পাকার নিকট কারণ। কানের ভিতর কিছু গেলেও কান পাকে। এই জন্যে, কানের ভিতর কিছু যাওয়া কান-পাকার আর একটা নিকট কারণ। হাম-জ্বর, পানি বসন্ত আর এলো বসন্ত —এ সব রোগও কান-পাকার নিকট কারণ।

কান-পাকা আপনিই ভাল হইয়া যাইতে পারে, আবার পুরাণ পড়িয়াও যাইতে পারে। পুরাণ পড়িয়া গেলে কান-পাকা শীঘ্র সারে না—সারিতে চায়ও না। কান পাকা অনেক দিন থাকিলে কানের ভিতরকার পর্দ্দাও খারাপ হইয়া যাইতে পারে; কানের ভিতরকার ছোট ছোট হাড়ও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে। কানের ভিতরকার পর্দ্দা কি ছোট হাড় নষ্ট হইয়া গেলে, কান কালা হইয়া যায়। এই জন্যে, কানপাকাকে সোজা রোগ মনে করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নয়। কান-পাকিলে, কান দিয়া পূয-পড়া যাতে শীঘ্র শীঘ্র সারিয়া যায়, তার চেষ্টা বিধিমতে করিবে। কান-পাকা কখনও পুরাণ পড়িতে দিবে না। কান-পাকা পুরাণ পড়িলেই মস্কিল; পুরাণ পড়িতে দিলে এ অস্বস্তির হাত এড়ানই ভার।

চিকিৎসা—কান-পাকার-চিকিৎসা সোজা। অল্প গরম জলে সাবান গুলিয়া, সেই সাবান গোলা জলের পিচকিরি করিয়া কানের ভিতর বেশ পরিষ্কার করিয়া দিবে। তার পর, গ্লিসেরীন অব ট্যানিন ফোটা ফোটা করিয়া কানের ভিতর ঢালিয়া দিবে; তার পর কাপাসের তুলো দিয়া কান বন্ধ

করিয়া দিবে। গ্লিসেরীন অব ট্যানিন এ রকম করিয়া অনেক বার দিতে হয় না। অনেক জায়গায় দু একবার দিলেই কান-পাকা ভাল হইয়া যায়। ফল কথা, গ্লিসেরীন অব ট্যানিনের মত কান-পাকার ভাল অসুদ আর নাই। কান-পাকা নির্দ্দোষ সারিয়া গেলেও, রোজ পিচকিরি করিয়া ধোওয়া আর গ্লিসেরীন অব ট্যানিন কানের ভিতর দেওয়া বন্ধ করিবে না।

শক্ত রকম রোগ ভোগ করিয়া ছেলেরা খুব দুর্ব্বল ও অসুস্থ হইয়া পড়িলে, তাদের কান প্রায়ই পাকে—তাদের কানে প্রায়াই পূয হয়। কানের ভিতর ঠাণ্ডা বাতাস লাগিলে ছেলেদের কান পাকে—এ কথা এর আগেই বলিছি। কানপাকার চিকিৎসার বেলায় এ সব কথা যেন মনে থাকে।

কান-পাকা পুরাণ পড়িয়া গেলে, কডলিবর অইল আর সিরাপ ফেরি আয়োডাইড্—এ দুটী অসুদে যেমন উপকার হয়, তেমন আর কোনও অসুদে নয়। এক বছরের ছেলেকে ৫ ফোটা কডলিবর অইল আর এক ফোটা সিরপ ফেরি আয়োডাইড, রোজ দু বার করিয়া দিতে পার। এ থেকেই হিসাব করিয়া, ছেলের বয়স বুঝিয়া অসুদ দুটার মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে। বাজারে দু রকম কডলিবর অইল্ বিক্রি হয়। ডি জোন্স কডলিবর অইল, মুওলস কডলিবর অইল। ডি জোন্স কডলিবর অইল বোতলে করিয়া বিক্রি হয়। আর মুওলস কডলিবর অইল শিশিতে করিয়া বিক্রি হয়। ডি জোন্স (বোতলের) কডলিবর অইলই ভাল।

জ্বর থেকে উঠে যে সব ছেলের কানে পূয হয়—কান পাকে, কুইনাইন আর কার্ব্বণেট অব আয়র্ণ তাদের কান-

পাকার ভারি অসুদ। ডাক্তরেরা প্রেস্কৃপশনে কার্বনেট্ অব আয়র্ণ লেখেন না; ফেরি কার্ব্ব. লেখেন। কুইনান আর কার্ব্বণেট অব আয়র্ণের পুরিয়া এই রকম করিয়া তয়ের করিয়া দিবেঃ—

কুইনাইন্	...	৩ গ্রেন।
ফেরি কার্ব্ব (কার্ব্বনেট্ অব আয়র্ণ)		৬ গ্রেন।
কলম্বো পাউডর	...	৬ গ্রেন।

একত্র মিশাইয়া এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর।

রোজ ৩ বেলা ১টে খাইতে দিবে। অসুদ ফুরাইয়া গেলে আবার তয়ের করিয়া দিবে। ছেলে বেশ সবল না হইলে, আর কান-পাকা বেশ সারিয়া না গেলে, এ অসুদ বন্ধ করিবে না। এ অসুদ খাওয়ানর সঙ্গে সঙ্গে, রোজ পিচকিরি করিয়া কান পরিষ্কার করিয়া দিবে, আর গ্লিসেরীন অব ট্যানীন কানের ভিতর ঐ রকম করিয়া ফোটায় ফোটায় ঢালিয়া দিবে।

এখানে যে মাত্রায় অসুদ লিখিয়া দিলাম, সে মাত্রা এক বছরের ছেলের পক্ষে। এ থেকেই হিসাব করিয়া, ছেলের বয়স বুঝিয়া, অসুদের মাত্রা ঠিক করিয়া লইবে।

গ্লিসেরীন অব ট্যানীন যেমন করিয়া তয়ের করে, নীচে তা লিখিয়া দিলাম।

১ ড্রাম ট্যানিক য়্যাসিড আর এক ঔন্স গ্লিসেরীন খলে একত্র ঘুঁটিয়া বেশ করিয়া মিশাও। তার পর, চীনের বাসনে খলের অসুদ ঢালিয়া দেও। তার পর বাসনের অসুদ যতক্ষণ না বেশ গলিয়া যায়, ততক্ষণ ওতে আগুনের অল্প অল্প তাত লাগাও

গ্লিসেরীন অব ট্যানীন ভাল ভাল ডিস্পেন্সরিতে কিনিতে পাওয়া যায়। এর দাম বেশী নয়। এক টাকার গ্লিসেরীন অব ট্যানীনে দশটা কান-পাকা রোগী ভাল হয়। গ্লিসেরীন অব ট্যানীন বলিয়া ডিস্পেন্সরিতে লিখিযা পাঠাইলে, কম্পাউণ্ডরেরা তখনই তা তয়ের করিয়া দেয়।

ট্যানিক্ য়্যাসিডকে ট্যানিনও বলে। এই জন্যে, গ্লিসেরীন অব ট্যানিন্ও বলিতে পার; গ্লিসেরীন অব ট্যানিক্ য়্যাসিডও বলিতে পার। তবে গ্লিসেরীন অব ট্যানিক্ য়্যাসিডের চেয়ে গ্লিসেরীন্ অব ট্যানিন বলা সোজা।

কডলিবর অইলের সঙ্গে হাইপোফস্ফাইট্ অব্ লাইমের সিরপ খাওয়াইলেও ছেলেদের কান-পাকার খুব উপকার হয়। হাইপোফস্ফাইট অব লাইমের সিরপের কথা ৩১১—৩১২র পাতে বলিছি।

কানে পূয হইবার আগে—কান পাকিবার আগে, কান কামড়ায়—কানের ভিতর ব্যথা করে। কান কামড়ামকে—কানের ভিতর ব্যথা করাকে ডাক্তরেরা ওটালজিয়া বলেন, সোজা ইংরিজিতে ইয়ার এক্ বলে; কান কামড়ানর যে যাতনা—যে যন্ত্রণা—যে কস্ট, এ অস্বস্তি যিনি একবার ভোগ করিয়াছেন, তিনিই তা জানেন। কান-কামড়ানর যন্ত্রণায় ছেলেরা ত একেবারে আর্ত্তনাদ করিতে থাকে। কানে পূয হইলে—কান পাকিলে তবে কান কামড়ান ক্ষান্ত হয়, কানের ভিতরকার যাতনা যায়। এমন যে যাতনা, এর কোনও অসুদ নাই? ভাল অসুদই আছে। অসুদও খুব সোজা। টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্—আফিঙের আরক) আর

অলিব্ অইল (সুইট অইল) সমান ভাগে মিশাইয়া, কানের ভিতর তাই একটু ঢালিয়া দিয়া তুলো দিয়া কান বন্ধ করিয়া দিলে, কান কামড়ান তখনই নরম পড়ে। কান কামড়ানর এমন অসুদ আর নাই। এই আরকে তুলো ভিজাইয়া কানের ভিতর সেই তুলো দিয়া দিলেও কান কামড়ান সারে। কানের ভিতরে সহজেই দিতে পারা যায়, তুলোটা এমন জুত বরাত করিয়া লইয়া তবে আরকে ভিজাইবে। আরোকে ভিজনো তুলোর খানিকটে কানের ভিতরে যাওয়া চাই—আর কানের ভিতরে সেটা থাকাও চাই। তুলের আগাটা সরু আর গোড়াটা মোটা হওয়া চাই। টিংচর ওপিয়াই (লডেনম্) আর অলিব অইল্ (সুইট আইল) বেশ মেশে না; এই জন্যে, সেই আরোকে তূলো ভিজাইবার আগে, কি সে আরোক কানের ভিতর দিবার আগে, আরকের শিশিটে বেশ করিয়া নাড়িয়া লইবে। কান কামড়ানর জন্যে, যখন বেশী যাতনা হবে, তখনই এ আরোক ঐ রকম করিয়া ব্যবহার করিবে। অনেক জায়গায় এ আরক একবারে বেশী ব্যবহার করিতে হয় না। কোন কোন জায়গায় ২। ৩। ৪ বারও ব্যবহার করিবে।

পেটের অসুখ হইলেও ছেলেদের কান-কামড়ায়—কান কামড়ানর চিকিৎসার বেলায় এ কথাটা মনে থাকিলে ভাল হয়। কেন না, পেটের অসুখ ভাল করিতে না পারিলে, কানে শুদু অসুদ দিয়া তাদের কান-কামড়ান ভাল করিতে পারা যায় না।

১৭। **কানে কম শুনা**—বল ত, কানে কম শুনা স্বল্পবিরাম-জ্বরের '(রিমিটেণ্ট ফীবরের) উপসর্গের মধ্যে ধর্ত্তব্যই না। কেন না, জ্বরে ভুগিয়া বেশী দুর্ব্বল হইয়া পড়িলেই, রোগী কানে কম শুনে। আবার আহার অসুদ পাইয়া রোগী সবল হইলে, কানে কম শুনা আপনিই সারিয়া যায়। ২৬৮র পাতের শেষ ছত্রে আর ২৬৯র পাতের প্রথম তিন ছত্রে লিখিছি, " মেয়েটী জ্বরে ভুগে এত কাহিল হইছিল যে, প্রায় এক রকম কালা হইয়া গিইছিল। খুব বড় করিয়া না বলিলে শুনিতে পাইত না"। আবার ২৭৫র পাতে ছোট অক্ষরের শেষ ছত্র থেকে সেই মেয়েটীর কথা লিখিয়াছি— "১৯শে তারিখে ভোর পাঁচটায় গায়ের তাত ১০৪ আর নাড়ী ফি মিনিটে ১০৬। জিব ভিজে আর পরিষ্কার। আগের চেয়ে কানে বেশী বেশী শুনিতে লাগিল"। ২৬৮—২৭৫র পাত আর একবার ভাল করিয়া পড়িয়া দেখিলে জানিতে পারিবে, সে মেয়েটির কানে কম শুনার জন্যে আলাদা করিয়া কোনও অসুদ বিসুদ দিতে হয় নাই। আসল রোগের যে অসুদ আর পথ্য, তাতেই রোগও সারিয়া গেল; সেই সঙ্গে সঙ্গে কানে কম শুনাও ভাল হইয়া গেল। তবে কোন কোন জায়গায় রোগী সত্য সত্যই কালা হইয়া যায়। ব্যামো সারিয়া গেলেও কানে আর তেমন শুনিতে পায় না। এ রকম দুর্ঘটনা কুচিকিৎসার ফল বৈ আর কিছুই নয়। ব্যামো সারিয়া গেলেও রোগী যদি কানে কম শুনিতে থাকে, তবে ৮৬র পাতের বলকারক অসুদ (টনিক) তাকে নিয়ম করিয়া খাইতে বলিবে। আর তার কানে রোজ এক ফোটা করিয়া গ্লিসে-

রীন্ দিবে। এ ছাড়া, সে কড্লিভর অইল নিয়ম করিয়া খাইলে, তার কানে কম শুনা আরও শীঘ্র ভাল হইয়া যায়।

১৮। **কর্ণমূল-ফোলা**——কর্ণমূল-ফোলা আদত রোগটা কি? কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহকে আমরা সোজাসুজি কর্ণমূল ফোলা বলিয়া থাকি। লালের গুল্লি যত আছে, কানের গোড়ার লালের গুল্লি সব চেয়ে বড়। কানের গোড়ার লালের গুল্লিকে ডাক্তারেরা প্যারটিড গ্ল্যাণ্ড্ বলেন। কর্ণমূল-ফোলাকে—কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহকে—ডাক্তারেরা প্যারটাইসিস বলেন; সোজা ইংরিজিতে মম্পস বলে। এ রোগ যখন হয়, তখন একবারে অনেক লোকের হয়। এ রকম যে সর্ব্বদাই ঘটে, তা নয়, তবে অনেক সময় এ রকম দেখা যায়। গাল, গলা, কর্ণমূল ফোলার যেন এক একটা সময় ধরা আছে, এমনি বোধ হয়। কেন না, যখন গাল, গলা, কর্ণমূল ফুলিতে আরম্ভ হয়, তখন ঘরে ঘরে, পাড়ায় পাড়ায়, গাঁয়ে গাঁয়ে ও অস্বস্তি দেখা যায়। এ রোগ হঠাৎই হয়, এ রোগটী হইবার সঙ্গে সঙ্গেই একটু শীত শীত বোধ হয়; স্পষ্ট কম্প কখনও হয় না; তার পরই গা গরম হয়; জ্বরের যে সব লক্ষণ, তা দেখা দেয়। জ্বর বেশী হয় না, জ্বর সামান্য রকমই হয়। অনেক জায়গায় ব্যথার তাড়শে—যাতনায় কেবল একটু জ্বর-ভাব হয় মাত্র। খানিক পরেই, এক দিকেরই হোক্, আর দু দিকেরই হোক্, কর্ণমূল ফোলে; তার পর সেই ফুলো চারি দিকে ছড়াইয়া পড়ে। কখন কখন কেবল এক দিকেরই কর্ণমূল ফোলে; কখন কখন দু দিকেরই কর্ণমূল একবারে ফোলে। কিন্তু প্রায়ই দেখা

যায়, প্রথমে কেবল এক দিকেরই কর্ণমূল ফোলে ; তার পর সে দিকের ফুলো যেমন কমে, আর এক দিকের কর্ণমূল তেমনি ফুলিতে আরম্ভ হয়। ৭২৫—৭২৬র পাতে বলেছি, "কখন কখন (আলটাকরার) দুটী গুল্লিরই প্রদাহ একবারে হয়। কিন্তু সচরাচর তা হয় না। প্রথমে কেবল একটা গুল্লিরই প্রদাহ হয়, তার পর সেটীর ফুলো যেমন কমে, আর একটার ফুলো তেমনি আরম্ভ হয়"। কর্ণমূল-ফোলা রোগেও অনেক জায়গায় ঠিক এই রকম ঘটে। এক দিকের কর্ণমূল ফোলা যেই একটু কমে, সেই অমনি আর এক দিকের কর্ণমূল ফুলিতে আরম্ভ হয়। ফুলোটা প্রথমে একটু চেপটা ভাবের থাকে, তার পর বেশ উচু হইয়া উঠে। কানের ঠিক সুমুকেই ফুলোটা খুব বেশী মালুম হয়। ফুলোর উপর আঙুল দিয়া টিপিলে টোপ খায় না। বাদামের (ফলের) গা টিপিলে যেমন শক্ত মালুম হয়, এ ফুলোর উপর আঙুল দিয়া টিপিলেও প্রায় তেমনি শক্ত মালুম হয়। ফুলোর উপরকার গায়ের রং সহজও থাকিতে পারে ; আবার রাঙাও হইতে পারে। আঙুল দিয়া চাপিলে ফুলোর উপরকার রাঙাটা চলিয়া যায় ; আবার আঙুল তুলিয়া লইলে যে রাঙা, সেই রাঙাই হয়। ফুলোটা দু তিন দিনও থাকিতে পারে ; পাঁচ ছ দিনও থাকিতে পারে। ফল কথা, কর্ণমূল-ফোলা গড়ে আট দশ দিনের বেশী থাকে না। ফুলো যখন কমিতে আরম্ভ হয়, তখন ক্রমে কমে না। ফুলোটা সম ভাবেই থাকিয়া, তার পর অমনি দেখিতে দেখিতে একবারেই কমিয়া যায়। কর্ণমূল ফোলার সঙ্গে গাল গলাও ফুলিতে পারে—ফুলিয়াও থাকে। কর্ণমূল ফোলার ব্যথার

কথা আর কি বলিব ? যিনি এ রোগ একবার ভোগ করিয়াছেন, কেবল তিনিই সে ব্যথা জানেন। ব্যথা ত যেমন তেমন নয়,—ফুলোর ভিতর, গুল্লির ভিতর যেন নিয়ত করাত করিতে থাকে। হা করিবার চেষ্টা করিলে আর রক্ষা নাই, প্রাণ একবারে বেরিয়ে যায়। এ রোগে হা করিবারও জো নাই, চিবাইবারও জো নাই। হা করিবার চেষ্টা করিলে যে কষ্ট হয়, চিবাইবার চেষ্টা করিলে তার হাজার গুণ কষ্ট হয়। কাজেই, এ রোগে কথা কহিবারও জো নাই, কিছু খাইবারও জো নাই। না খাইলে নয়, তাই চুমুক দিয়া খাইবার জিনিষ রোগী কোন গতিকে অনেক কষ্ট করিয়া খায়। এ রোগে চোআল নাড়িবার জো কি ? কর্ণমূল প্রায়ই পাকে না। কর্ণমূল ফোলার ব্যথা শূলো গেলেও অনেক দিন পর্য্যন্ত গুল্লি ডাগর আর শক্ত হইয়া থাকিতে পারে। কর্ণমূল ফোলার যাতনা আগে যায়, তার পর ব্যথা যায়। এ রোগটি ছোঁয়াচে। ধরিতে গেলে কর্ণমূল ফোলা কম বয়সেরই রোগ। পাঁচ সাত বছর বয়সে আর পোনর ষোল বছর বয়সে এ রোগ বেশী হয়। তবে এ রোগ বেশী বয়সে না হয়, এমন নয়। স্ত্রী লোকদের চেয়ে পুরুষদেরই এ রোগ বেশী হয়। ফাল্গুন চৈত্র, ভাদ্র, আর আশ্বিন এই চারিটে মাসই কর্ণমূল ফোলার সময়। আর কোনও সময় এ রোগ হয় না, তা নয়। তবে অন্য সময় এ রোগটা খুবই কম হয়। অনেকে বলেন, এ রোগ একবার হইলে আর হয় না। আমি তা বলি না। আমি নিজের শরীরে তার পরিচয় বেশই পাইয়াছি। দেড় বছরের মধ্যে কিছু না হবে ত, দশবার আমি এ অস্বস্তি ভোগ করিয়াছি।

জায়গা বদলান ঐ রোগের একটি স্বভাব। স্বভাবকে আমরা প্রকৃতিও বলি। এ রোগের এ প্রকৃতিটী অতি আশ্চর্য্য। এ রোগের এ প্রকৃতির কথাটা মনে করিয়া রাখা ভাল। জায়গা বদলান আরও কোন কোন রোগের স্বভাব আছে। জায়গা বদলান স্বভাব বাত রোগের আছে। বাত রোগের কথা বলিবার সময় সে কথা বিশেষ করিয়া বলিব। কোন রোগ শরীরের এক জায়গা থেকে আর এক জায়গায় গেলে—রোগের সে রকম করিয়া জায়গা বদলানকে ডাক্তরেরা মেটাস্‌টেসিস্ বলেন। জোআন রোগীদেরই কর্ণমুল-ফোলা রোগের এ প্রকৃতি (জায়গা বদলান প্রকৃতি) বেশী দেখা যায়। কর্ণমুলের ফুলো যেখানে খুব শীঘ্র কমিয়া যায়, সেই খানেই এ রোগের এ প্রকৃতির পরিচয় বেশী পাওয়া যায়। কর্ণমুল-ফোলা কানের গোড়ার লালের গুল্লির প্রদাহ—আপনার জায়গা বদলাইয়া কোথায় যায়? পুরুষদের অণ্ডে যায়। অণ্ড কথাটা আমরা সচরাচর ব্যবহার করি না। সচরাচর আমরা বিচিই বলি। পুরুষদের এ রোগ আপনার জায়গা বদলাইয়া যেমন তাদের বিচিতে যায়, স্ত্রীলোকদের এ রোগ আপনার জায়গা বদলাইয়া তেমনি তাদের মাইতে কি তাদের ডিম্বকোষে যায়। ডিম্বকোষের কথা ৫৭২ পাতে বলিছি। পুরুষদের কর্ণমূলের ব্যথা ফুলো যেই কমিয়া যায়, সেই অমনি তাদের বিচি ফোলে, আর তাতে ব্যথা হয়, অর্থাৎ বিচির প্রদাহ হয়। প্রদাহ কি? প্রদাহ কাকে বলে, এর আগে অনেক বার ত বলিছি। বিচির প্রদাহকে ভাল কথায় অণ্ড-প্রদাহ বলে। অণ্ড-প্রদাহকে ডাক্তরেরা অর্কাই-

টিস্ বলেন। বিচির ব্যথা ফুলোর সঙ্গে অণ্ডকোষও ফোলে—বিচির থলিতে জলও জমে। বিচির থলিতে জল-জমাকে কোষবৃদ্ধিও বলে—এক-শিরেও বলে। এক-শিরেকে ডাক্তারেরা হাইড্রোসীল বলেন। কখন কখন কর্ণমূল ফোলার সঙ্গে সঙ্গেই বিচিও ফোলে আর তাতে ব্যথা হয়। আবার কখন কখন একবার বা বিচি ফোলে একবার বা কর্ণমূল ফোলে। পাল্টে পাল্টে বারে বারে এই রকম ঘটে। সচরাচর বিচির প্রদাহ আপনিই ভাল হইয়া যায়। কোন কোন জায়গায় বিচির সেই প্রদাহ থেকে বিচি একবারে যেন শুকাইয়া যায়—ক্ষয় পাইয়া যায়। স্ত্রীলোকদের কর্ণমূল ফোলা এই রকম করিয়া জায়গা বদলাইলে তাদের মাইয়ের কি ডিম্ব-কোষের ব্যথা ফুলো হয়।

কর্ণমূলের প্রদাহ কখন কখন মাথার মগজেও যায়; কিন্তু এ ঘটনা এত কম যে, এই ধর্ত্তব্যই না।

চিকিৎসা—কর্ণমূল-ফোলার দুটী অসুদ আমি জানি। সে দুটী অসুদ আমি কেবল জানি, তা নয়। সে দুটী অসুদের প্রসাদে আমি বারে বারে বিষম যন্ত্রণার—বিষম যন্ত্রণা কেন, অসহ্য যন্ত্রণার হাত থেকে নিস্তার পাইয়াছি। সে দুটী অসুদ আর কি? হাইড্রার্জ্ কম্ ক্রীটা আর বেলাডনা। হাইড্রার্জ্ কম্ ক্রীটাকে সোজা ইংরিজিতে গ্রে-পাউডর বলে। গ্রে-পাউডর খাইতে হয়, আর একষ্ট্রাক্ট বেলাডনার প্রলেপ লাগাইতে হয়। এক গ্রেনের তিন ভাগের এক ভাগ গ্রে-পাউডর ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাইলে, তিন চারি ঘণ্টার মধ্যে তেমন যে যাতনা, তাও যেন একবারে আগুনে জল-পড়ার মত কমিয়া

যায়। অসুদ একবার খাইলেই, যাতনার খুব বাড়াবাড়িটে যেন একটু কমে, এমনি বোধ হয়। দু বার খাওয়ার পর রোগীকে যাতনায় তেমন আর ছট্‌ফট্ করিতে হয় না। তিন-বার খাওয়ার পর যাতনা নরম পড়া বেশ বুঝিতে পারা যায়। তার পর, যাতনাটা যতক্ষণ একবারে না বেশ যায়, ততক্ষণ ঘণ্টায় ঘণ্টায় নিয়ম করিয়া ½ গ্রেন্ করিয়া গ্রে-পাউডর খাবে। তার পর, যাতনা গেলে ব্যথা যে ক দিন থাকিবে, রোজ চারি পাঁচ বার করিয়া গ্রে পাউডর খাবে। গ্রে-পাউডরের একটা ব্যবস্থা (প্রেস্ক্রপ্‌শন্) নীচে লিখিয়া দিলাম।

হাইড্রার্জ্ কম্ ক্রীটা (গ্রে পাউডর) ৪ গ্রেন্

এতে ১২টা পুরিয়া তয়ের কর।

এক একটা পুরিয়া ঘণ্টায় ঘণ্টায় খাবে। গালে জল লইয়া পুরিয়া ঢালিয়া খাবে। এ রোগে হা করিবার জো নাই—এ কথা এর আগেই বলিছি! এই জন্যে, খুব জুত বরাত করিয়া গালে জল লইবে—আর তেমনি জুত বরাত করিয়া গালের ভিতর পুরিয়া ঢালিয়া দিবে। পুরিয়ার কাগজের মুখ্‌টো একটু ছুঁচলো মত করিয়া সুমুখের দাঁতের ভিতর চালাইয়া দিয়া অসুদ ঢালিয়া দিবে।

তার পর, খানিকটে এক্‌ষ্ট্রাক্ট বেলাডনা পিত্তলের একটা বাটিতে করিয়া লও। তার পর, তাতে একটু জল দিয়া আঙুল দিয়া নাড়িয়া প্রলেপের মত কর। তার পর, সেই বেলাডনা আগুনে ফুটাইয়া লও। শেষে, ফুলোর জায়গায় খুব গরম গরম বেলাডনার প্রলেপ দেও। প্রলেপ শুকাইয়া গেলে নূতন করিয়া আবার গরম প্রলেপ দিবে। কর্ণমূলে

ফোলা একবারে নির্দ্দোষ হইয়া সারিয়া না গেলে বেলাডনার প্রলেপ বন্ধ করিবে না। বেলাডনার প্রলেপের আশ্চর্য্য গুণ— আশ্চর্য্য শক্তি। ব্যথা কমাইয়া দিতে এমন অসুদ আর নাই। বেলাডনার এ গুণটী ছেলেরা পর্য্যন্ত ভুলিতে চায় না। আমার ছোট ছেলের বয়স চারি বছরের বেশী নয়। কানের গোড়ায় ব্যথা হইলেই বলে "বাবা আমার কানের গোড়ায় ব্যথা হইয়াছে। আমি বেলাডনা পরিব"। বেলাডনার প্রলেপ দেওয়াকে সে "বেলাডনা পরা" বলে। তার একবার কর্ণমূল ফুলিয়া ছিল; শুদ্ধু বেলাডনার গরম গরম প্রলেপেই বেশ সারিয়া গিইছিল। তাতেই সে বেলাডনা নামটাও শিখিয়া রাখিয়াছে, বেলাডনা লাগাইলে ব্যথা যায়, তাও জানিয়া রাখিয়াছে। বেলাডনার প্রলেপ শুকাইয়া গেলে, তার উপর নুনের পুঁটলির সেক করিলে কর্ণমূলের ব্যথা ফুলো আরও শীঘ্র কমিয়া যায়। নুনের পুঁটলির সেকে ভারি আরাম বোধ হয়। কর্ণমূল ফোলার চিকিৎসা করিবার সময় এ রোগের জায়গা বদলান স্বভাবের কথাটা যেন মনে থাকে। কর্ণমূলের ব্যথা ফুলো শীঘ্র শীঘ্র কমাইয়া দিবার জন্যে, তাতে জল-পটি কি ঠাণ্ডা কোন জিনিশ যেন লাগাইও না—যাতে বেশী বাহ্যে হয়, এমন জোলাপ টোলাপও যেন রোগীকে দিও না।

চিবাইবার কষ্ট কিছু থাকিতে, রোগী যেন চিবাইয়া খাইবার জিনিশ মোটে না খায়।

কর্ণমূল ফোলা বেশ সারিয়া গেলেও, কিছু দিন খুব সাবধানে থাকা চাই। বেশী হা করা; বেশী চিবানো; স্নান করা আর হিম বাত্ত ভোগ নিষেধ। যে দিকের কর্ণমূল ফোলে,

কিছুদিন পর্য্যন্ত কাপড় চোপড় দিয়া ঢাকিয়া সে দিকটে গরমে রাখিলে ভাল হয়।

কর্ণমূল ফোলা ভাল হইয়া গেলে রোগীর শরীর যত দিন না বেশ সুস্থ আর সবল হয়, রোজ নিয়ম করিয়া তাকে একটু একটু কুইনাইন খাইতে দিবে। কুইনাইনের মাত্রা আর কি! ম্যালেরিয়ার দেশে রোগীকে কুইনাইন এক আধটু বেশী দিলে হানি নাই—তাতে উপকার বৈ অপকার হয় না।

বিচির, মাইয়ের কি ডিম্বকোষের ব্যথা ফুলো হইলে, বিচিতে, মাইতে কি ডিম্বকোষের জায়গায় বেলাডনার গরম গরম প্রলেপ দিবে।

তৃতীয় ভাগ সারা।